



তফসীরে  
মা'আরেফুল-কোরআন  
পঞ্চম খণ্ড

। সূরা ইউসুফ, সূরা রাদ, সূরা ইবরাহীম, সূরা হিজর, সূরা নাহল,  
সূরা বনী ইসরাঈল ও সূরা কাহফ ।

**Download Islamic PDF Books Visit:**

<https://alqurans.com>

মূল  
হযরত মাওলানা  
মুফতী মুহাম্মদ শফী' (র)

অনুবাদ  
মাওলানা মুহিউদ্দীন খান

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

## অনুবাদের আরম্ভ

সমসাময়িক কালে প্রকাশিত সর্ববৃহৎ এবং সর্বাধুনিক তফসীর গ্রন্থ 'মা'আরেফুল কোরআন' যুগশ্রেষ্ঠ সাধক আলেম হযরত মওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী' সাহেবের এক অসাধারণ কীর্তি। এতে পবিত্র কুরআনের প্রথম ব্যাখ্যাতা খোদ রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের তফসীর সম্পর্কিত বাণীগুলোর উদ্ধৃতি, সাহাবায়ে কিরাম, তাবয়ীন ও তৎপরবর্তী সাধক মনীষিগণের ব্যাখ্যা বর্ণনার সাথে সাথে আধুনিক জিজ্ঞাসা ও তৎসম্পর্কিত পাক কালামের যুক্তিপূর্ণ জবাবও অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে প্রদান করা হয়েছে। এ কারণেই এ তফসীর গ্রন্থটি পাঠক সমাজে বিপুলভাবে সমাদৃত। বাংলা ভাষায় এ মহান গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে সুধী পাঠকগণের তরফ থেকে যে সাড়া লক্ষ্য করা গেছে, তাতে আমরা উৎসাহিত হয়েছি। পাঠকগণের তাকীদেই যেমন এ মহাগ্রন্থের আটটি খণ্ডই দ্রুত অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি পাঠকগণের উৎসাহ লক্ষ্য করেই এ গ্রন্থের প্রায় সবগুলো খণ্ডেরই চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয়েও সেগুলি পাঠকগণের হাতে চলে গেছে।

'মা'আরেফুল-কোরআন'-এর বঙ্গানুবাদ পাঠ করে বহু বিজ্ঞ পাঠক পত্রযোগে এবং অনেকেই ব্যক্তিগতভাবেও আমাদের সাথে যোগাযোগ করেছেন। অনেকেই কিছু কিছু ত্রুটি-বিচ্ছাতির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ফলে পরবর্তী সংস্করণগুলো অধিকতর ত্রুটিমুক্ত করে প্রকাশ করার ব্যাপারে বিস্তর সহযোগিতা লাভ করেছি। আমরা তাঁদের সকলের প্রতিই কৃতজ্ঞ। আল্লাহ তা'আলা তাঁদের সে সহৃদয়তার যোগ্য ফল দান করবেন বলে আশা করি।

'মা'আরেফুল-কোরআন'-এর অনুবাদ ও মুদ্রণ এবং একাদিক্রমে সবগুলো খণ্ডের পুনঃ নিরীক্ষণ আপাতত আমার সর্বাপেক্ষা বড় সাধনা। এ মহৎ গ্রন্থটির আরো সংশোধন ও পরিমার্জনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে আমি মনে করি। তাই আমি সুধী পাঠকগণের খেদমতে অব্যাহত সহযোগিতা প্রার্থী।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সকলের শ্রম কবুল করুন। আমীন।

বিনয়াবনত

মুহিউদ্দীন খান

# সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
সূরা ইউসুফ	১	উদ্ধাপিও	২৭৬
স্বপ্ন নবুয়তের অংশ	৭	মাবনদেহে আত্মা সঞ্চারিত করা এবং	
স্বপ্ন সম্পর্কিত মাস'আলা	৯	তাকে ফেরেশতাগণের সিঁজদার প্রসঙ্গ	২৮৬
হযরত ইউসুফের স্বপ্নও পরবর্তী কাহিনী	১৬	রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বিশেষ সম্মান	২৯৬
কতিপয় বিধান ও মাস'আলা	৪৪	আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের কসম খাওয়া	২৯৬
মানুষের মন	৭৪	কোরআনের সারমর্ম	৩০৩
সরকারী পদ প্রার্থনা করা	৭৮	হাশরের জিজ্ঞাসা	৩০৩
হযরত ইউসুফ (আ) সম্পর্কে তাঁর		সূরা নাহুল	৩০৫
পিতাকে অবহিত	৮৭	বিজ্ঞানের আবিষ্কার সম্পর্কে	৩১০
সন্তানের ভুল-ত্রুটি : পিতার কর্তব্য	৯২	উপমহাদেশে কোন রসূল	
কুদৃষ্টির প্রভাব	৯৭	আগমন করেছেন কি?	৩২৮
ইউসুফ (আ)-এর প্রতি হযরত		হিজরত : সচ্ছল জীবন	৩৩০
ইয়াকুব (আ)-এর মহশ্বতের কারণ	১১৮	মুজ্তাহিদ ইমামগণের অনুসরণ	৩৩৬
ইউসুফ (আ)-র সবর ও শোকরের স্তর	১৩৬	কোরআন ও হাদীস	৩৩৯
সূরা রা'দ	১৫৪	কোরআন বোঝার জন্য আরবী	
প্রত্যেক কাজের পরিচালক		ভাষা শিক্ষা	৩৪২
একমাত্র আল্লাহ্	১৫৮	আযাবে পতিত হওয়া আল্লাহর রহমত	৩৪৩
মৃত্যুর পর পুনর্জীবনের প্রমাণ	১৬৩	কতিপয় বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয়	৩৫৮
সূরা ইবরাহীম	২০৮	সম্পদ পুঞ্জীভূত করার বিরুদ্ধে	
হিদায়ত শুধু আল্লাহর কাজ	২১০	গৃহ নির্মাণ	৩৭৫
কোরআন পাকের তিলাওয়াত	২১১	সৎকর্ম : কোরআনের নির্দেশ	৩৮১
কোরআন বোঝার ব্যাপারে কিছু ভ্রান্তি	২১৩	অঙ্গীকার প্রসঙ্গ	৩৮৫
কোরআন আরবী ভাষায় কেন?	২১৬	ঘুষ প্রসঙ্গ	৩৮৮
আরবী ভাষার কতিপয় বৈশিষ্ট্য	২১৭	দুনিয়ার সুখ ধ্বংসশীল	৩৮৯
কাফিরদের দৃষ্টান্ত	২৩৮	হায়াতে তায়োবা	৩৯০
কবরে শান্তি ও শাস্তি	২৩৯	শয়তানের আধিপত্য থেকে মুক্তির পথ	৩৯৪
হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দোয়া	২৫৪	নবুয়ত সম্পর্কে কাফিরদের	
সূরা হিজর	২৬৭	সন্দেহের জবাব	৩৯৫
মামুনের দরবারের একটি ঘটনা	২৭০	ধর্মে জবরদস্তি	৩৯৯
হাদীস সংরক্ষণ	২৭২	হারাম ও গোনাহ প্রসঙ্গ	৪০৪

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
দীনে-ইরবারহীমীর অনুসরণ	৪০৯	সৃষ্ট জীবের উপর আদমের শ্রেষ্ঠত্ব	৫০১
দাওয়াত ও প্রচারের মূলনীতি	৪১১	শত্রু থেকে আত্মরক্ষার উপায়	৫০৯
তর্ক-বিতর্কের অনিষ্টকারিতা	৪১২	তাহাজ্জুদের নামায ও বিধান	৫১২
দাওয়াতদাতাকে কষ্ট দেওয়া	৪১৪	মাকামে মাহমুদ : শাফা'আত	
সূরা বনী ইসরাঈল	৪২৮	প্রসঙ্গ	৫১৫
মি'রাজ প্রসঙ্গ	৪২৯	শিরক ও কুফরের চিহ্ন	৫১৮
মসজিদে আকসা প্রসঙ্গ	৪৩৪	রুহ সম্পর্কে প্রশ্ন	৫২২
বনী ইসরাঈলের ঘটনাবলী	৪৩৮	অসামঞ্জস্য প্রশ্নের পয়গম্বরসুলভ	
আমলনামা : গলার হার হওয়া	৪৪৭	জবাব	৫২৯
পয়গম্বর প্রেরণ ব্যতীত আযাব		মানবের রসূল মানবই হতে	
না হওয়া	৪৪৮	পারে	৫৩০
মুশরিকের সন্তান-সন্ততি	৪৪৮	সূরা কাহুফ	৫৪২
ধনীদেব প্রভাব প্রতিপত্তি	৪৫০	আসহাবে কাহুফ ও রকীমের	
বিদ'আত ও মনগড়া আমল	৪৫৩	কাহিনী	৫৪৮
পিতামাতার আদব ও আনুগত্য	৪৫৫	বিরোধপূর্ণ আলোচনায় কথাবার্তার	
আত্মীয়দের হক	৪৬২	উত্তম পন্থা	৫৭৫
খরচ করার ব্যাপারে মধ্যবর্তিতার		আসহাবে কাহুফের নাম	৫৭৬
নির্দেশ	৪৬৫	ভবিষ্যত কাজের জন্য	
অন্যায় হত্যার ব্যাখ্যা	৪৭০	ইনশাআল্লাহ বলা	৫৭৯
এতীমদের মাল	৪৭২	দাওয়াত ও তবলীগের	
মাপে কম দেওয়া	৪৭৪	বিশেষ রীতি	৫৮৪
কান, চক্ষু ও অন্তর সম্পর্কে		জান্নাতীদের অলংকার	৫৮৫
জিজ্ঞাসাবাদ	৪৭৫	কর্মানুযায়ী প্রতিদান	৫৯৪
পনেরটি আয়াত : তাওরাতের		ইবলিসের সন্তান-সন্ততি	৫৯৯
সারসংক্ষেপ	৪৭৮	হযরত মুসা ও যিযিরের কাহিনী	৬০৪
যমিন ও আসমানের তসবীহ পাঠ	৪৮১	শিষ্যের জন্য গুরুর অনুসরণ	৬১০
পয়গম্বরগণের উপর যাদুক্রিয়া	৪৮৪	পিতামাতার সৎকর্মের উপকার	৬১৯
হাশরে কাফিররাও আল্লাহর		পয়গম্বরসুলভ আদবের দৃষ্টান্ত	৬২০
প্রশংসা করবে	৪৮৯	যুলকারনাইন প্রসঙ্গ	৬২৫
কটুভাষা কাফিরদের সঙ্গেও		ইয়াজ্জ-মাজ্জ প্রসঙ্গ	৬৩৬
জায়েয নয়	৪৯১	যুলকারনাইনের প্রাচীর	৬৪৯



# سورة يوسف

## সূরা ইউসুফ

মক্কায় অবতীর্ণ, ১১ রুকু, ১১১ আয়াত

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الذِّكْرِ ۚ إِنَّكَ أَيْتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ۝ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا  
 لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا  
 أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ ۚ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ ۝  
 إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ  
 وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ۝ قَالَ يَبْنَئِي لَكَ تَقْصُصُ رُؤْيَاكَ  
 عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ  
 مُبِينٌ ۝ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ  
 الْأَحَادِيثِ وَيُرِيكَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا  
 عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلِ إِبْرَاهِيمَ ۚ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

অসীম মেহেরবান ও পরম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু।

(১) আলিফ-লা-ম-রা; এগুলো সুস্পষ্ট গ্রন্থের আয়াত। (২) আমি একে আরবী ভাষায় কোরআন রূপে অবতীর্ণ করেছি, যাতে তোমরা বুঝতে পার। (৩) আমি তোমার নিকট উত্তম কাহিনী বর্ণনা করেছি, যেমতে আমি এ কোরআন তোমার নিকট অবতীর্ণ করেছি। তুমি এর আগে অবশ্যই এ ব্যাপারে অনবহিতদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে। (৪) যখন ইউসুফ পিতাকে বলল : পিতা, আমি স্বপ্নে দেখেছি এগারটি নক্ষত্রকে, সূর্যকে এবং চন্দ্রকে। আমি তাদেরকে আমার উদ্দেশে সিজদা করতে দেখেছি। (৫) তিনি বললেন : বৎস, তোমার ভাইদের সামনে এ স্বপ্ন বর্ণনা করো না। তাহলে তারা তোমার বিরুদ্ধে

চক্রান্ত করবে। নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। (৬) এমনিভাবে তোমার পালনকর্তা তোমাকে মনোনীত করবেন এবং তোমাকে বাণীসমূহের নিগূঢ় তত্ত্ব শিক্ষা দেবেন এবং পূর্ণ করবেন স্বীয় অনুগ্রহ তোমার প্রতি ও ইয়াকুব পরিবার-পরিজনদের প্রতি; যেমন ইতিপূর্বে তোমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম ও ইসহাকের প্রতি পূর্ণ করেছেন। নিশ্চয় তোমার পালনকর্তা অত্যন্ত জানী, প্রজ্ঞাময়।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আলিফ-লা-ম-রা (এর তাৎপর্য আল্লাহ তা'আলাই জানেন)। এগুলো একটি সুস্পষ্ট গ্রন্থের আয়াত, (যার ভাষা ও বাহ্যিক মর্ম খুবই পরিষ্কার)। আমি একে আরবী ভাষায়, কোরআন (হিসাবে) অবতীর্ণ করেছি, যাতে তোমরা (এ ভাষাভাষী হওয়ার কারণে) অন্যদের আগেই বুঝ (অন্তঃপর তোমাদের মাধ্যমে অন্যরাও বোঝে)। আমি যে এ কোরআন আপনাদের কাছে পাতিয়েছি, এর মাধ্যমে আমি আপনাদের কাছে একটি উৎকৃষ্ট কাহিনী বর্ণনা করব। ইতিপূর্বে আপনি (এ কাহিনী সম্পর্কে) সম্পূর্ণ অনবগত ছিলেন; (কারণ না আপনি কোন গ্রন্থ পাঠ করেছিলেন, না কোন শিক্ষকের কাছ থেকে কিছু শিখেছিলেন এবং এ কাহিনীটি এমন সুবিদিতও ছিল না যে, সর্বস্তরের জনগণের তা জানা থাকবে। কাহিনীর সূচনাঃ সে সময়টি স্মরণযোগ্য) যখন ইউসুফ (আ) স্বীয় পিতা ইয়াকুব (আ)-কে বললেনঃ পিতা আমি (স্বপ্নে) এগারটি নক্ষত্র, সূর্য এবং চন্দ্র দেখেছি—তাদেরকে আমার সামনে সিজদা করতে দেখেছি। (উত্তরে) তিনি বললেন, বৎস! এ স্বপ্ন (তোমার) ভাইদের কাছে বর্ণনা কর না। (কেননা, নবী-পরিবারের লোক বিধায় তারা এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা অনুধাবন করতে পারবে যে, এগারটি নক্ষত্র হচ্ছে এগার জন ভাই, সূর্য পিতা এবং চন্দ্র মাতা। সিজদা করার তাৎপর্য হচ্ছে তোমার প্রতি তাদের অনুগত ও আজাবহ হওয়া)। তাহলে তারা তোমার (অনিষ্ট সাধনের) জন্য চক্রান্ত করবে। (অর্থাৎ ভাইদের অধিকাংশই একাজ করবে। কারণ, দশ ভাই ছিলেন বৈমানয়ে। তাদের পক্ষ থেকেই বিপদাশঙ্কা ছিল। 'বেনিয়ামিন' নামে একজন মাত্র সহোদর ভাই ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে বিরোধিতার আশংকা ছিল না। কিন্তু তার মুখ থেকে কথা ফাঁস হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল)। নিঃসন্দেহে শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। (তাই সে ভাইদের মনে কুমন্ত্রণা জাগিয়ে তুলবে)। এবং (আল্লাহ তা'আলা এভাবে তোমাকে এ সম্মান দেবেন যে, সবাই তোমার অনুগত ও আজাবহ হবে)। এমনিভাবে তোমার পালনকর্তা তোমাকে (নবুয়তের সম্মানের জন্যও) মনোনীত করবেন, তোমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কে জ্ঞান দান করবেন; যেমন ইতিপূর্বে তোমার পিতামহ ইবরাহীম ও ইসহাক (আ)-এর প্রতি স্বীয় নিয়ামত পূর্ণ করেছেন। নিশ্চয় তোমার পালনকর্তা অত্যন্ত জানী, প্রজ্ঞাময়।

### আনুমানিক জাতব্য বিষয়

একটি আয়াত ছাড়া সমগ্র সূরা-ইউসুফ মক্কায় অবতীর্ণ এ সূরায় হম্বরত ইউসুফ (আ)-এর কাহিনী ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ কাহিনীটি শুধুমাত্র এ সূরাতেই

উল্লিখিত হয়েছে। সমগ্র কোরআনে কোথাও এর পুনরাবৃত্তি করা হয়নি। এটা একমাত্র ইউসুফ (আ) সম্পর্কিত কাহিনীরই বৈশিষ্ট্য। এছাড়া অন্য সব আয়িয়া (আ)-এর কাহিনী ও ঘটনাবলী সমগ্র কোরআনে প্রাসঙ্গিকভাবে খণ্ড খণ্ডভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং বার বার উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে বিশ্ব-ইতিহাস এবং অতীত অভিজ্ঞতার মধ্যে মানুষের ভবিষ্যত জীবনের জন্য বিরাট শিক্ষা নিহিত থাকে। এসব শিক্ষার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া মানুষের মন ও মস্তিষ্কের মধ্যে সাধারণ শিক্ষার চাইতে অধিক গভীর ও অনাক্সাসলম্ব হয়। এ কারণেই গোটা মানবজাতির জন্য সর্বশেষ নির্দেশ-নামা হিসাবে প্রেরিত কোরআন পাকে সমগ্র বিশ্বের জাতিসমূহের ইতিহাসের নির্বাচিত অধ্যায়সমূহ সন্নিবেশিত করে দেওয়া হয়েছে, যা মানুষের বর্তমান ও ভবিষ্যত সংশোধনের জন্য অমোঘ ব্যবস্থাপন। কিন্তু কোরআন পাক বিশ্ব-ইতিহাসের এসব অধ্যায়কেও স্বীয় বিশেষ ও অনুপম রীতিতে এমনভাবে উদ্ধৃত করেছে যে, এর পাঠক অনুভবই করতে পারে না যে, এটি কোন ইতিহাস গ্রন্থ বরং প্রতিটি ক্ষেত্রে কোন কাহিনীর স্বতন্ত্র অংশ শিক্ষা ও উপদেশের জন্য অত্যাবশ্যক মনে করা হয়েছে, সেখানে ঠিক ততটুকু অংশই বিরত করা হয়েছে। অতঃপর অন্য কোন ক্ষেত্রে এ অংশের প্রয়োজন অনুভূত হলে পুনর্বার তা বর্ণনা করা হয়েছে। এ কারণেই এসব কাহিনীর বর্ণনায় ঘটনার সাংঘটনিক ধারাবাহিকতার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়নি। কোথাও কাহিনীর প্রথম অংশ পরে এবং শেষ অংশ আগে উল্লেখ করা হয়েছে। কোরআনের এ বিশেষ বর্ণনা রীতিতে স্বতন্ত্র নির্দেশ এই যে, জগতের ইতিহাস ও অতীত ঘটনাবলী পাঠ করা এবং স্মরণ রাখা স্বয়ং কোন লক্ষ্য নয় বরং প্রত্যেক কাহিনী থেকেই কোন না কোন শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করা মানুষের লক্ষ্য হওয়া উচিত। সুতরাং জ্ঞানক অনুসন্ধানবিদ বলেছেন : মানুষের বাক্যাবলীর দুটি প্রকারের মধ্যে **خبر** (ঘটনা বর্ণনা) ও **نشأه** (রচনা)-এর মধ্যে শেষোক্ত প্রকারই আসল উদ্দেশ্য। **خبر** স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে কখনও উদ্দেশ্য হয় না বরং প্রত্যেক খবর ও ঘটনা শোনা ও দেখার মধ্যে ভাবী ব্যক্তির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য একমাত্র স্বীয় অবস্থা ও কর্মের সংশোধন হওয়া উচিত।

হয়রত ইউসুফ (আ)-এর ঘটনাকে ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করার একটি সম্ভাব্য কারণ এই যে, ইতিহাস রচনাও একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র। এতে ইতিহাস রচয়িতাদের জন্য বিশেষ নির্দেশ রয়েছে যে, বর্ণনা এমন সংক্ষিপ্ত না হয় যাতে পূর্ণ বিষয়বস্তু হাদয়ঙ্গম করা কষ্টকর হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে বর্ণনা এত দীর্ঘ হওয়াও সমীচীন নয় যাতে তা পড়া ও স্মরণ রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। বস্তুত আলোচ্য কাহিনীর কোরআনী বর্ণনা থেকে এ বিষয়টিও প্রতীয়মান হয়।

দ্বিতীয় সম্ভাব্য কারণ এই যে, কোন কোন রেওয়াজে বলা হয়েছে, ইহুদীরা পরীক্ষার্থে রসুলুল্লাহ (সা)-কে বলেছিল : যদি আপনি সত্যিই আল্লাহর নবী হন, তবে বলুন ইয়াকুব-পরিবার সিরিয়া থেকে মিসরে কেন স্থানান্তরিত হয়েছিল এবং ইউসুফ

(আ)-এর ঘটনা কি ছিল? প্রত্যুত্তরে ওহীর মাধ্যমে পূর্ণ কাহিনী অবতারণ করা হয়। এটা নিঃসন্দেহে রসুলুল্লাহ্ (সা)-র মো'জেযা ও তাঁর নবুয়তের একটি বড় প্রমাণ। কেননা, তিনি ছিলেন নিরক্ষর এবং জীবনের প্রথম থেকেই মক্কা বসবাসকারী। তিনি কারও কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন নি এবং কোন গ্রন্থও পাঠ করেন নি। এতদসঙ্গেও তওরাতে বর্ণিত আদ্যোপাঙ্গ ঘটনাটি বিস্তারিত বর্ণনা করে দেন। বরং কিছু এমন বিষয়ও তিনি বর্ণনা করেন, যেগুলো তওরাতে উল্লিখিত ছিল না। এ কাহিনীতে প্রসঙ্গক্রমে অনেক বিধি-বিধানেরও অবতারণা করা হয়েছে। এগুলো পরে যথাস্থানে বর্ণিত হবে।

সর্বপ্রথম আয়াতে **الر** অক্ষরসমূহ হচ্ছে কোরআনের শব্দবাক্য। এগুলো

সম্পর্কে অধিক সংখ্যক সাহাবী ও তাবয়ীগণের সিদ্ধান্ত এই যে, এগুলো বক্তা ও সম্বোধিত ব্যক্তি অর্থাৎ আল্লাহ্ ও রসুলের মধ্যকার একটি গোপন রহস্য, যা কোন তৃতীয় ব্যক্তি বুঝতে পারে না এবং এগুলোর মর্ম উদ্ধার করার জন্য তৎপর হওয়াও সমীচীন নয়।

**تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ**—অর্থাৎ এগুলো সে গ্রন্থের আয়াত,

যা হালাল ও হারামের বিধি-বিধান এবং প্রত্যেক কাজের সীমা ও শর্ত বর্ণনা করে। মানুষকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রের জন্য একটি সুখ ও সরল জীবন ব্যবস্থা দান করে। এগুলো অবতীর্ণ করার অস্বীকার তওরাতে পাওয়া যায় এবং ইহদীরা এ সম্পর্কে অবহিতও বাটে।

**إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ**—অর্থাৎ আমি একে

আরবী কোরআন হিসাবে নাছিল করেছি, হয়তো এতে তোমরা বুঝতে পারবে।

এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইউসুফ (আ)-এর কাহিনী সম্পর্কে যারা প্রশ্ন তুলেছিল, তারা ছিল আরবের ইহুদী। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরই ভাষায় এ কাহিনী নাছিল করেছেন, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে রসুলুল্লাহ্ (সা)-র সত্যতা ও সত্যতায় বিশ্বাস স্থাপন করে এবং কাহিনীতে বর্ণিত বিধান ও নির্দেশাবলীকে চলার পথের আলোকবর্তিকা হিসাবে গ্রহণ করে।

এ জন্যই এখানে **لعل** শব্দটি 'সম্ভবত' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা, এসব সম্বোধিত ব্যক্তির অবস্থা জানা ছিল যে, সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী সামনে এসে যাবার পরেও তাদের কাছ থেকে সত্য গ্রহণের আশা করা ছিল সুদূর পরাহত।

**نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا**

**الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ**—

অর্থাৎ আমি এ কোরআনকে ওহীর মাধ্যমে আপনাদের প্রতি অবতীর্ণ করে আপনার কাছে সর্বোত্তম কাহিনী বর্ণনা করেছি। নিঃসন্দেহে আপনি ইতিপূর্বে এসব ঘটনা সম্পর্কে অনবগত ছিলেন।

এতে ইহুদীদেরকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, তোমরা আমার পয়গম্বরের হেতাবে পরীক্ষা নিতে চেষ্টা কর, তাতেও তাঁর গুণগত উৎকর্ষ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কেননা, তিনি পূর্বে থেকে নিরক্ষর এবং বিশ্ব-ইতিহাস সম্পর্কে অনভিজ্ঞও ছিলেন। সুতরাং তিনি এখন যে বিজ্ঞতার পরিচয় দিচ্ছেন, তার মাধ্যমে আল্লাহর শিক্ষা ও ওহী ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।

إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ۝

অর্থাৎ ইউসুফ (আ) তাঁর পিতাকে বললেন : পিতঃ, আমি স্বপ্নে এগারটি নক্ষত্র এবং সূর্য ও চন্দ্রকে দেখেছি। আরও দেখেছি যে, তারা আমাকে সিজদা করছে।

এটা ছিল হযরত ইউসুফ (আ)-এর স্বপ্ন। এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন : এগারোটি নক্ষত্রের অর্থ হচ্ছে ইউসুফ (আ)-এর এগার ডাই, সূর্য ও চন্দ্রের অর্থ পিতা ও মাতা।

তফসীরে কুরআনীতে বলা হয়েছে : হযরত ইউসুফ (আ)-এর মাতা এ ঘটনার পূর্বে যুত্মুখে পতিত হয়েছিলেন এবং তাঁর খালা তখন তাঁর পিতার বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। খালা এমনিতেও মায়ের সমতুল্য গণ্য হয়। বিশেষত যদি পিতার ভারী হয়ে যায়, তবে সাধারণত পরিভাষায় তাকে মা-ই বলা হবে।

قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝

অর্থাৎ বৎস! তুমি এ স্বপ্ন ভাইয়ের কাছে বর্ণনা করো না। আল্লাহ না করুন, তারা এ স্বপ্ন শুনে তোমার মাহাত্ম্য সম্পর্কে অবগত হয়ে তোমাকে বিপর্যস্ত করার মত্বস্ত্রে লিপ্ত হতে পারে। কেননা, শয়তান হল মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। সে পাণ্ডিত্য-প্রতিপত্তি ও অর্থকড়ির লোভ দেখিয়ে মানুষকে এহেন অপকর্মে লিপ্ত করে দেয়।

উল্লিখিত আয়াতসমূহে কয়েকটি বিষয় প্রাধান্যপ্রাপ্য।

স্বপ্নের তাৎপর্য ভুল ও প্রকারভেদ : সর্বপ্রথম আলোচ্য বিষয় হচ্ছে স্বপ্নের স্বরূপ এবং তা থেকে স্রেসব ঘটনা ও বিষয় জানা যায়, সেগুলোর গুরুত্ব ও পর্যায়। তফসীরে

মাযহারীতে কাযী সানাউল্লাহ্ (র) বলেন : স্বপ্নের তাৎপর্য এই যে, নিদ্রা কিংবা সংস্কারহীনতার কারণে মানুষের মন যখন দেহের বাহ্যিক ক্রিয়াকর্ম থেকে মুক্ত হয়ে যায়, তখন সে কল্পনাশক্তির পাথে কিছু কিছু আকার-আকৃতি দেখতে পায়। এরই নাম স্বপ্ন। স্বপ্ন তিন প্রকার। তন্মধ্যে দু-প্রকার সম্পূর্ণ অবাস্তব ও ভিত্তিহীন। এগুলোর কোন বাস্তবতা নেই। অবশিষ্ট একটি প্রকার মৌলিকত্বের দিক দিয়ে নিতুল ও বাস্তব। কিন্তু এতে মাঝে মাঝে নানা উপসর্গ মুক্ত হয়ে এগুলোকেও অবাস্তব এবং অবিশ্বাস্য করে দেয়।

এ উক্তির ব্যাখ্যা এই যে, কোন কোন সময় মানুষ জাগ্রত অবস্থায় যেসব বিষয় ও ঘটনা প্রত্যক্ষ করে, সেগুলোই স্বপ্নে নানা আকার-আকৃতি নিয়ে দৃষ্টিগোচর হয়। আবার কোন কোন সময় শয়তান আনন্দদায়ক ও ভয়ানক উভয় প্রকার দৃশ্য ও ঘটনাবলী মানুষের স্মৃতিতে জাগিয়ে দেয়। বলা বাহুল্য, এ উভয় প্রকার স্বপ্নই ভিত্তিহীন ও অবাস্তব। এগুলোর কোন বাস্তব ব্যাখ্যা হতে পারে না। এতদুভয়ের প্রথম প্রকারকে

تسويل شيطان অর্থাৎ শয়তানের বিভ্রান্তি বলা হয়।

দ্বিতীয় প্রকার স্বপ্ন সত্য ও বিস্ময়। এটি আঞ্জাহর পক্ষ থেকে এক প্রকার ইলহাম (আঞ্জাহর ইশারা), যা বান্দাকে আনন্দ অথবা সুসংবাদ দানের উদ্দেশ্যে করা হয়। আঞ্জাহ্ তা'আলা স্বীয় অদৃশ্য ভাণ্ডার থেকে কোন কোন বিষয় বান্দার মন ও মস্তিষ্কে জাগিয়ে দেন।

এক হাদীসে রসুলুল্লাহ্ (স) বলেন : মু'মিন ব্যক্তির স্বপ্ন একটি সংস্রোগ বিশেষ। এর মাধ্যমে সে তার পালনকর্তার সাথে বাক্যালাপ করার গৌরব অর্জন করে। তিবরানী বিস্ময় সনদে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।—(মাযহারী)

সূফী বুয়ুর্গগণের বর্ণনা অনুযায়ী এর স্বরূপ এই যে, জগতে অস্তিত্ব লাভের পূর্বে প্রত্যেক বস্তুর একটি বিশেষ আকৃতি 'আলমে মিসাল' অর্থাৎ উপমা-জগতে বিদ্যমান থাকে, তেমনি 'মাআমী' তথা অবস্তবচক বিষয়াদিরও বিশেষ আকার-আকৃতি বিদ্যমান থাকে। নিদ্রিত অবস্থায় মানুষের মন যখন বাহ্যিক দেহের ক্রিয়া-কর্ম থেকে মুক্ত হয়ে পড়ে, তখন মাঝে মাঝে উপমা জগতের সাথে তার সম্পর্ক স্থাগিত হয়ে যায় এবং সেখানকার আকার-অবয়ব সে দেখতে পায়। এছাড়া এসব আকার-অবয়ব অদৃশ্য জগৎ থেকে দেখানো হয়। মাঝে মাঝে এগুলোতেও এমন সব উপসর্গ সৃষ্টি হয়ে যায় যে, আসল সত্যের সাথে কিছু কিছু অবাস্তব কল্পনা মিশ্রিত হয়ে পড়ে। একারণে ব্যাখ্যাদাতাদের পক্ষেও এর সঠিক মর্ম উপলব্ধি করা কঠিন হয়ে পড়ে। মাঝে মাঝে উপলব্ধি আকার-অবয়ব হাবতীয় উপসর্গ থেকে পরিচ্ছন্ন থাকে। তখনই সেগুলো হয় আসল সত্য। কিন্তু এগুলোর মধ্যেও কোন কোন স্বপ্ন থাকে ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। কারণ, তাতে বাস্তব ঘটনা সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় না। এমতাবস্থায়ও যদি ব্যাখ্যা দ্রাস্ত হয়, তবে ঘটনা ভিন্ন আকারে প্রকাশ পায়। তাই একমাত্র সে স্বপ্নই আঞ্জাহর তরফ থেকে প্রদত্ত ইলহাম ও

বাস্তব সত্য বলে বিবেচিত হবে, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে হবে, তাতে কোন উপসর্গের সংমিশ্রণ হবে না এবং ব্যাখ্যাও বিস্কন্ধ দেওয়া হবে।

পয়গম্বরগণের সব স্বপ্ন ছিল এই পর্যায়ের। তাই তাদের স্বপ্নও ওহীর সমপর্যায়-ভুক্ত। সাধারণ মুসলমানদের স্বপ্নে নানাবিধ সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকে। তাই তা কান্নাও জন্য প্রমাণ হয় না। তাদের স্বপ্নে কোন কোন সময় প্রকৃতি ও প্ররুত্তিগত আকার-আকৃতির মিশ্রণ সংঘটিত হয়ে যায়, কোন সময় পাপের অন্ধকার ও মালিন্য স্বপ্নকে আচ্ছন্ন করে দুর্বোধ্য করে দেয়। মাঝে মাঝে এবং বিবিধ কারণে বিস্কন্ধ ব্যাখ্যাও উপনীত হওয়া যায় না।

স্বপ্নের বর্ণিত তিনটি প্রকারই রসুলুল্লাহ (স) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : স্বপ্ন তিন প্রকার। এক প্রকার শয়তানী। এতে শয়তানের পক্ষ থেকে কিছু কিছু বিষয় মনে জাগ্রত হয়। দ্বিতীয় প্রকার স্বপ্ন হচ্ছে মানুষ জাগ্রত অবস্থায় যা কিছু দেখে, নিদ্রায়ও তাই সামনে আসে। তৃতীয় প্রকার স্বপ্ন সত্য ও অপ্রান্ত। এটি নবুয়তের ৪৬তম অংশ অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে ইলহাম।

স্বপ্ন নবুয়তের অংশ—এর অর্থ ও ব্যাখ্যা : স্বপ্নের এ সত্য ও বিস্কন্ধ প্রকার সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত আছে। কোন হাদীসে নবুয়তের ৪০তম অংশ, কোন হাদীসে ৪৬তম অংশ এবং কোন হাদীসে ৪৯তম, ৫০তম এবং ৭০তম অংশ হওয়ার কথা বর্ণিত আছে। এসব হাদীস তফসীলে কুরতুবীতে একত্রে সম্মিলিত করে ইবনে আবদুল বারের বিশ্লেষণে এরূপ বর্ণিত আছে যে, এগুলোর মধ্যে কোনরূপ পরস্পর বিরোধিতা নেই। বরং প্রত্যেকটি হাদীস স্ব-স্থানে বিস্কন্ধ ও সঠিক। যারা স্বপ্ন দেখে, তাদের অবস্থানভেদে বিভিন্নরূপ অংশ ব্যক্ত করা হয়েছে। যে ব্যক্তি সত্যতা, বিশ্বস্ততা, ধর্মপরায়ণতা ও পরিপূর্ণ ঈমান দ্বারা বিভূষিত, তার স্বপ্ন নবুয়তের ৪০তম অংশ হবে। পক্ষান্তরে যার মধ্যে এসব গুণ কম, তার স্বপ্ন ৪৬তম অথবা ৫০তম অংশ হবে এবং যার মধ্যে এসব গুণ আরও কম, তার স্বপ্ন নবুয়তের ৭০তম অংশ হবে।

এখানে এ বিষয়টি চিন্তাসাপেক্ষ যে, সত্য স্বপ্ন নবুয়তের অংশ—এর অর্থ কি? তফসীলে মাহাহারীতে এর তাৎপর্য সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ (স)-র কাছে তেইশ বৎসর পর্যন্ত ওহী আগমন করতে থাকে। তন্মধ্যে প্রথম ছয়মাস স্বপ্নের আকারে এ ওহী আগমন করে। অবশিষ্ট পর্যায়তাল্লিশ মাসমাসিকে জিবরাঈলের মধ্যস্থতায় ওহী আগমন করে। এ হিসাব অনুযায়ী দেখা যায় যে, সত্য স্বপ্ন নবুয়তের ৪৬তম অংশ। যেসব হাদীসে কম-বেশী সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলোতে হয় কাছাকাছি হিসাবে বলা হয়েছে, না হয় সনদের দিক দিয়ে এসব হাদীস ধর্তব্য নয়।

ইমাম কুরতুবী বলেন : স্বপ্ন নবুয়তের অংশ হওয়ার তাৎপর্য এই যে, মানুষ মাঝে মাঝে স্বপ্নে এমন বিষয় দেখে, যা তার সাধ্যাতীত। উদাহরণত, কেউ দেখে যে সে আকাশে উড়ছে। অথবা অদৃশ্য জগতের এমন কোন বিষয় দেখে, যার জ্ঞান অর্জন করা তার পক্ষে সম্ভবপর নয়। অতএব এরূপ স্বপ্নের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য ও প্রেরণা

ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না, যা প্রকৃতপক্ষে নবুয়তের বৈশিষ্ট্য। তাই স্বপ্নকে নবুয়তের অংশ স্থির করা হয়েছে।

**কাদিয়ানী দাআলমের একটি বিদ্রাভি খণ্ডন :** এ সম্পর্কে কিছু সংখ্যক লোক একটি অভিনব বিদ্রাভিতে পতিত হয়েছে। তারা বলে : নবুয়তের অংশ যখন দুনিয়াতে অবশিষ্ট ও প্রচলিত আছে, তখন নবুয়তও অবশিষ্ট ও প্রচলিত রয়েছে। অথচ এটা কোরআনের অকাট্য আয়াত ও অসংখ্য সহীহ হাদীসের পরিপন্থী এবং সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায়ের খতমে নবুয়ত সম্পর্কিত সর্বসম্মত বিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিপরীত। তারা এ সহজ সত্যটি বুঝতে পারেন না যে, কোন বস্তুর একটি অংশ বিদ্যমান থাকলে বস্তুটি বিদ্যমান থাকা জরুরী হয়ে পড়ে না। যদি কোন ব্যক্তির একটি নখ অথবা একটি চুল কোথাও বিদ্যমান থাকে, তবে কেউ একথা বলতে পারে না যে, এখানে ঐ ব্যক্তি বিদ্যমান আছে। মেশিনের অনেক কলকব্জার মধ্য থেকে কোন একটি কলকব্জা অথবা একটি স্ক্রু যদি কারও কাছে থাকে এবং সে দাবী করে বসে যে, তার কাছে অমুক মেশিনটি আছে, তবে বিশ্ববাসী তাকে হয় মিথ্যাবাদী, না হয় আস্ত আত্মশ্লোক বলতে বাধ্য হবে।

হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী সত্য স্বপ্ন অবশ্যই নবুয়তের অংশ কিন্তু নবুয়ত নয়। নবুয়ত তো আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) পর্যন্ত এসে শেষ হয়ে গেছে।

সহীহ বুখারীর এক হাদীসে রসুলুল্লাহ (সা) বলেন : **لم يبق من**

**النيرة إلا لمبشرات** অর্থাৎ ভবিষ্যতে 'মুবাশিরাত' ব্যতীত নবুয়তের কোন অংশ বাকী থাকবে না। সাহাবায়ে কিরাম আরম্ভ করলেন : 'মুবাশিরাত' বলতে কি বোঝায় ? উত্তর হল : সত্য স্বপ্ন। এতে প্রমাণিত হয় যে, নবুয়ত কোন প্রকারে অথবা কোন আকারেই অবশিষ্ট নেই। শুধুমাত্র এর একটি ক্ষুদ্রতম অংশ অবশিষ্ট আছে যাকে মুবাশিরাত অথবা সত্য স্বপ্ন বলা হয়।

কোন সময় কাফির ও ফাসিক ব্যক্তির স্বপ্নও সত্য হতে পারে : মাঝে মাঝে পাপচারী, এমন কি কাফির ব্যক্তিও সত্য স্বপ্ন দেখতে পারে। একথা কোরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এবং অভিজ্ঞতার জানা। সূরা ইউসুফে হযরত ইউসুফ (আ)—এর দুজন কারা-সঙ্গীর স্বপ্ন সত্য হওয়া এবং মিসর-সম্রাটের স্বপ্ন ও তা সত্য হওয়ার কথা উল্লিখিত হয়েছে। অথচ তারা সবাই ছিল অনুসন্ধানী। হাদীসে রসুলুল্লাহ (সা)—র আবির্ভাব সম্পর্কে পারস্য সম্রাটের স্বপ্নের কথা বর্ণিত আছে, যা সত্যে পরিণত হয়েছে। অথচ পারস্য সম্রাট মুসলমান ছিলেন না। রসুলুল্লাহ (সা)—র ক্ষুফু আতেকা কাফির থাকা অবস্থায় রসুলুল্লাহ (সা) সম্পর্কে সত্য স্বপ্ন দেখেছিলেন। এ ছাড়া কাফির বাদশাহ বখতে নসরের স্বপ্ন সত্য ছিল, যার ব্যাখ্যা হযরত দানিয়াল (আ) দিয়েছেন।

এতে বোঝা যায় যে, সত্য স্বপ্ন দেখা এবং তদনুরূপ ঘটনা সংঘটিত হওয়া—এতটুকু বিষয়ই কারও সৎ, ধার্মিক এমনকি মুসলমান হওয়ারও প্রমাণ নয়। তবে এটা ঠিক যে, সৎ ও সাধু ব্যক্তিদের স্বপ্ন সাধারণত সত্য হবে—এটাই আল্লাহর সাধারণ রীতি। ফাসিক ও পাপচারীদের সাধারণত মনের সংলাপ ও শয়তানী প্ররোচনা ধরনের মিথ্যা স্বপ্ন হয়ে থাকে। কিন্তু মাঝে মাঝে এর বিপরীতও হওয়া সম্ভব।



মোট কথা, সত্য স্বপ্ন সাধারণ মুসলমানদের জন্য হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী সুসংবাদ কিংবা হাদীসের চাইতে অধিক মর্যাদা রাখেনা। এটা স্বপ্ন তাদের জন্য কোন ব্যাপারে প্রমাণরূপে গণ্য নয় এবং অন্যের জন্যও নয়। কোন কোন অজ্ঞ লোক এ ধরনের স্বপ্ন দেখে নানা রকম কুমন্ত্রণায় লিপ্ত হয়। কেউ একে নিজের ওজীহের লক্ষণ মনে করতে থাকে এবং কেউ স্বপ্নলব্ধ বিষয়াদিকে শরীয়তের নির্দেশের মর্যাদা দিতে থাকে। এসব বিষয় সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, বিশেষত যখন একথাও জানা হয়ে গেছে যে, সত্য স্বপ্নের মধ্যেও প্রচুর পরিমাণে প্রবৃত্তিগত অথবা শয়তানী অথবা উভয় প্রকার ধ্যান-ধারণার মিশ্রণ জাসতে পারে।

স্বপ্ন প্রত্যেকের কাছে বর্ণনা করা ঠিক নয় : মাস'আলা : **قَالَ يَا بَنِيَّ**

আয়াতে ইস্মাকুব (আ) ইউসূফ (আ)-কে স্বীয় স্বপ্ন ভাইদের কাছে বর্ণনা করতে নিষেধ করেছেন। এতে বোঝা যায় যে, হিতাকাঙ্ক্ষী ও সহানুভূতিশীল নয়—এরূপ লোকের কাছে স্বপ্ন বর্ণনা করা উচিত নয়। এছাড়া স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কে পারদর্শী নয়—এমন ব্যক্তির কাছেও স্বপ্ন ব্যক্ত করা সঙ্গত নয়।

তিরমিযীর এক হাদীসে রসুলুল্লাহ (সা) বলেন : সত্য স্বপ্ন নবুয়তের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ। কারও কাছে বর্ণনা না করা পর্যন্ত স্বপ্ন খুলন্ত থাকে। যখন বর্ণনা করা হয় এবং শ্রোতা কোন ব্যাখ্যা দেয়, তখন ব্যাখ্যার অনুরূপ বাস্তবে প্রতিফলিত হয়ে যায়। তাই এমন ব্যক্তি ছাড়া স্বপ্ন কারও কাছে বর্ণনা করা উচিত নয়, যে জানী ও বুদ্ধিমান অথবা কমপক্ষে বজ্জ ও হিতাকাঙ্ক্ষী নয়।

তিরমিযী ও ইবনে মাজার হাদীসে রসুলুল্লাহ (সা) বলেন : স্বপ্ন তিন প্রকার। এক. আঞ্জাহর পক্ষ থেকে সুসংবাদ, দুই. প্রবৃত্তিগত চিন্তাভাবনা এবং তিন. শয়তানী কুমন্ত্রণা। অতএব যদি কেউ স্বপ্ন দেখে এবং তা তার কাছে ভাল লাগে, তবে ইচ্ছা করলে অন্যের কাছে বর্ণনা করতে পারে। পক্ষান্তরে যদি খারাপ কিছু দেখে, তবে অন্যের কাছে বর্ণনা করবে না এবং গাঢ়োথান করে নামায পড়বে। মুসলিমের হাদীসে আরও বলা হয়েছে : খারাপ স্বপ্ন দেখলে বাম দিকে তিন বার হুঁ মারবে, আঞ্জাহর কাছে এর অনিচ্ছা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করবে এবং কারও কাছে উল্লেখ করবে না। এরূপ করলে এ স্বপ্ন দ্বারা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কোন ক্ষতি হ'বে না। কারণ এই যে, কোন কোন স্বপ্ন শয়তানী ওয়াসওয়াসা হয়ে থাকে। উপরোক্ত নিয়ম পালন করলে শয়তানী প্রভাব দূর হয়ে যাবে। সত্য স্বপ্ন হলে এ নিয়মের মাধ্যমে স্বপ্নের অনিচ্ছা দূর হয়ে যাবে বলেও আশা করা যায়।

মাস'আলা : স্বপ্ন যে ব্যাখ্যার উপর নির্ভরশীল থাকে, এর অর্থ তফসীরে মায-হারীতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, কোন কোন 'তকদীর' (ভাগ্য) অকাটা হয় না বরং খুলন্ত থাকে। অর্থাৎ অমুক কাজ হয়ে গেলে এ বিপদ টলে যাবে, নতুবা বিপদ এসে যাবে। একে বলা হয় 'কাযানে-মুয়াজ্জাহ' অর্থাৎ খুলন্ত ফয়সালা। এমতাবস্থায় মন্দ

ব্যাখ্যা দিলে ব্যাপার মন্দ এবং ভাল ব্যাখ্যা দিলে ভাল হয়ে যায়। এ জন্যই তিরমিশীর উল্লিখিত হাদীসে বৃদ্ধিমান নয় কিংবা হিতকামক্ষী ও সহানুভূতিশীল নয়—এমন লোকের কাছে স্বপ্ন বর্ণনা করতে নিষেধ করা হয়েছে। এরূপ কারণও হতে পারে যে, স্বপ্নের ধারণা ব্যাখ্যা শুনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মনে এরূপ ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, এখন তার উপর বিপদ পতিত হবে। হাদীসে আল্লাহর উক্তি বর্ণনা করা হয়েছে যে,

**إنا عند ظن عبدي بي** —অর্থাৎ 'হাস্দা আমার সম্পর্কে যেসকল ধারণা গোষণ করে,

আমি তার জন্য তদ্রূপই হয়ে যাব।' আল্লাহর পক্ষ থেকে বিপদ আসার ব্যাপারে যখন সে দৃঢ়বিশ্বাসী হয়ে যায়, তখন আল্লাহর এ রীতি অনুসারী তার উপর বিপদ আসা অবশ্য-জ্ঞাবী হয়ে পড়ে।

**মাস'আলা :** এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, কল্টদায়ক ও বিপজ্জনক স্বপ্ন কারও কাছে বর্ণনা করতে নেই। হাদীসের বর্ণনা অনুসারী এ নিষেধাজ্ঞা শুধুমাত্র দয়া ও সহানুভূতির উপর ভিত্তিশীল—আইনগত হারাম নয়। সহীহ হাদীসসমূহে বলা হয়েছে, ওহদ যুদ্ধের সময় রসূলুল্লাহ (সা) বলেন : আমি স্বপ্নে দেখেছি আমার জরবারি 'মুলফাকার' ভেঙ্গে গেছে এবং আরও কিছু গাভীকে জবাই হতে দেখেছি। এর ব্যাখ্যা ছিল হম্মরত হামযা (রা)-সহ অনেক মুসলমানের শাহাদত বরণ। এটা একটা আশু মারাত্মক বিপর্যয় সম্পর্কিত ইঙ্গিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি সাহাবীদের কাছে এ স্বপ্ন বর্ণনা করেছিলেন।—(কুরতুবী)

**মাস'আলা :** এ আয়াত থেকে আরও জানা যায় যে, মুসলমানকে অপরের অনিষ্ট থেকে বাঁচানোর জন্য অপরের কোন মন্দ অভি্যাস অথবা কুনিয়ত প্রকাশ করা জায়েয। এটা গীবত তথা অসাক্কাতে পরনিন্দার অন্তর্ভুক্ত নয়। উদাহরণত কেউ জানতে পারল যে, শায়েদ বকরের গুহে চুরি করার অথবা তাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছে। এমতাবস্থায় বকরকে অবহিত করা তার কর্তব্য। এটা গীবতের মধ্যে গণ্য হবে না। আয়াতে ইয়াকুব (আ) ইউসুফ (আ)-কে বলে দিয়েছেন যে, ভাইদের পক্ষ থেকে তার প্রাণ নাশের আশংকা রয়েছে।

**মাস'আলা :** এ আয়াত থেকেই আরও জানা যায় যে, যদি একজনের সুখ-স্বাস্থ্য ও মাহাত্ম্যের কথা শুনে কারও মনে হিংসা জাগরিত হওয়ার এবং ক্ষতি সাধনের চেষ্টায় মেতে উঠার আশংকা থাকে, তবে তার সামনে স্বীয় মাহাত্ম্য, ধনসম্পদ ও মান-সম্মানের কথা উল্লেখ করবে না। রসূলুল্লাহ (সা) বলেন :

স্বীয় অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সফল হতে হলে তাকে গোপন রাখ। এটা লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হবে। কেননা, জগতে প্রত্যেক সুখী ব্যক্তির প্রতি হিংসা পোষণ করা হয়।

**মাস'আলা :** এ আয়াত এবং পরবর্তী যেসব আয়াতে ইউসুফ (আ)-কে হত্যা করা অথবা কুপে নিক্ষেপ করার পরামর্শ ও বাস্তবায়নের বিষয় উল্লিখিত হয়েছে, এগুলো থেকে আরও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠবে যে, ইউসুফ (আ)-এর ভ্রাতারা আল্লাহর নবী ও পয়গম্বর ছিল না। পয়গম্বর হলে ইউসুফ (আ)-কে হত্যার পরামর্শ, তাঁকে ধ্বংস করার অপকৌশল এবং

পিতার অবাধ্যতার মত জঘন্য কাজ তাদের দ্বারা সম্ভবপর হত না। কেননা, পয়গম্বরদের জন্য স্বাভাবিক গোনাহ থেকে পবিত্র ও নিষ্পাপ হওয়া জরুরী। অতএব তাবারী গ্রন্থে তাদেরকে যে পয়গম্বর বলা হয়েছে, তা সন্দ্বন্দনয়। —(কুরতুবী)

ষষ্ঠ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইউসুফ (আ)-কে কতিপয় নিয়ামত দানের ওয়াদা করেছেন। প্রথম—

كَذٰلِكَ يَجْتَبِيْكَ رَبُّكَ — অর্থাৎ আল্লাহ স্বীয় নিয়ামত ও অনুগ্রহরাজির

জন্য আপনাকে মনোনীত করবেন। মিসর দেশে রাজ্য, সম্মান ও ধনসম্পদ লাভের মাধ্যমে এ ওয়াদা পূর্ণতা লাভ করেছে। দ্বিতীয়, **وَيُعَلِّمُكَ مِنَ تَارِيْلِ الْاَحَارِيْثِ**

এখানে **اَحَارِيْث** বলে মানুষের স্বপ্ন বোঝান হয়েছে। অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা আপনাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কিত জ্ঞান শিক্ষা দেবেন। এতে আরও জানা গেল যে, স্বপ্নের ব্যাখ্যা একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র, যা আল্লাহ তা'আলা কোন কোন ব্যক্তিকে দান করেন। সবাই এর স্বোগ্য নয়।

মাস'আলা : তফসীরে কুরতুবীতে শাদ্দাদ ইবনুল-হাদের উক্তি বর্ণিত আছে যে, ইউসুফ (আ)-এর এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা চল্লিশ বৎসর পর প্রকাশ পায়। এতে বোঝা যায় যে, তাৎক্ষণিকভাবে স্বপ্ন ফলে যাওয়া জরুরী নয়।

তৃতীয় ওয়াদা **وَيُؤْتِيْكُمْ فِئْمَتًا مَّالِيَةً** — অর্থাৎ আল্লাহ আপনার প্রতি স্বীয়

নিয়ামত পূর্ণ করবেন। এতে নব্বুয়ত দানের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে এবং পরবর্তী বাক্য সমূহেও এর প্রতি ইঙ্গিত আছে। **كَمَا اَتَمَّهَا عَلٰى اَبْوَيْكَ مِنْ قَبْلِ اِبْرَاهِيْمَ**

**وَاِسْحٰقَ** — অর্থাৎ যেভাবে আমি স্বীয় নব্বুয়তের নিয়ামত আপনার পিতৃ-পুরুষ

ইবরাহীম ও ইসহাকের প্রতি ইতিপূর্বে পূর্ণ করেছি। এতে এদিকেও ইশারা হয়েছে যে, স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কিত শাস্ত্র যেমন ইউসুফ (আ)-কে দান করা হয়েছিল, তেমনি ভাবে ইবরাহীম ও ইসহাক (আ)-কেও শেখানো হয়েছিল।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে : **اِنَّ رَبَّكَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ** — অর্থাৎ আপনার

পালনকর্তা অত্যন্ত জ্ঞানবান, সুবিজ্ঞ। কাউকে কোন শাস্ত্র শেখানো তাঁর পক্ষে কঠিন নয় এবং তিনি প্রত্যেককেই তা শেখান না। বরং বিজ্ঞতা অনুযায়ী বেছে বেছে কোন কোন ব্যক্তিকে এ কৌশল শিখিয়ে দেন।

لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٍ لِّلْسَائِلِينَ ۝ إِذْ قَالُوا لِيُوسُفَ  
 وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ آبَائِنَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ آبَاءَنَا لَفِي ضَلَالٍ  
 مُّبِينٍ ۝ اقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَظْهِرُوا أَرْضَنَا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهَ أَبِيكُمْ  
 وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ ۝ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا  
 يُوسُفَ وَالْقُوَّةَ فِي عَيْبَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطُهَا بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن  
 كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ۝ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَىٰ يُوسُفَ  
 وَإِنَّا لَهُ لَنَصِحُونَ ۝ أَرْسَلَهُ مَعَنَا غَدًا يَزْتَعُ وَيَلْعَبُ وَ إِنَّا لَهُ  
 لَحَفِظُونَ ۝ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنَّ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ  
 الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غٰفِلُونَ ۝ قَالُوا لَئِن آكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ  
 عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَّخٰسِرُونَ ۝ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَاجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي  
 غَيْبَتِ الْجُبِّ ، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا  
 يَشْعُرُونَ ۝ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ ۝ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا  
 ذَهَبْنَا لَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَآكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ  
 بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صٰدِقِينَ ۝ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ  
 قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبِّرْ بِحَمِيلِهِ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ  
 عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ۝ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَةً  
 قَالَ يُبْتَلَىٰ هٰذَا أَغْلَمٌ وَاسْرَوْهُ بِضَاعَتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ۝  
 وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ ، وَكَانُوا فِيهِ مِن

الزَّاهِدِينَ ۝

(৭) অবশ্যই ইউসূফ ও তাঁর ভাইদের কাহিনীতে জিজাসুদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে। (৮) যখন তারা বলল : অবশ্যই ইউসূফ ও তাঁর ভাই আমাদের পিতার কাছে আমাদের চাইতে অধিক প্রিয় অথচ আমরা একটা সংহত শক্তি বিশেষ। নিশ্চয় আমাদের পিতা স্পষ্ট দৃষ্টিতে রয়েছেন। (৯) হত্যা কর ইউসূফকে কিংবা ফেলে আস তাকে অন্য কোন স্থানে। এতে শুধু তোমাদের প্রতিই তোমাদের পিতার মনোযোগ নিবিল্ট হবে এবং এরপর তোমরা যোগ্য কিংবাচিত হয়ে থাকবে। (১০) তাদের মধ্য থেকে একজন বলল, তোমরা ইউসূফকে হত্যা করো না বরং ফেলে দাও তাকে অজ্ঞকূপে যাতে কোন পথিক তাকে উঠিয়ে নিয়ে যায়, যদি তোমাদের কিছু করতেই হয়। (১১) তারা বলল : পিতা, ব্যাপার কি, আপনি ইউসূফের ব্যাপারে আমাদেরকে বিশ্বাস করেন না? আমরা তো তাঁর হিতাকাঙ্ক্ষী। (১২) আগামীকাল তাকে আমাদের সাথে প্রেরণ করুন—তুপ্তিসহ থাকবে এবং খেলাধুলা করবে এবং আমরা অবশ্যই তাঁর রক্ষণাবেক্ষণ করব। (১৩) তিনি বললেন : আমার দুশ্চিন্তা হয় যে, তোমরা তাকে নিয়ে যাবে এবং আমি আশংকা করি যে, ব্যামু তাঁকে খেয়ে ফেলবে এবং তোমরা তাঁর দিক থেকে গাফিল থাকবে। (১৪) তারা বলল : আমরা একটি ভারী দল থাকা সত্ত্বেও যদি ব্যামু তাকে খেয়ে ফেলে, তবে আমরা সবই হারালাম। (১৫) অতঃপর তারা যখন তাকে নিয়ে চলল এবং অজ্ঞকূপে নিক্ষেপ করতে একমত হল এবং আমি তাকে ইজিত করলাম যে, তুমি তাদেরকে তাদের একাজের কথা বলবে এমনতাবস্থায় যে, তারা তোমাকে চিনবে না। (১৬) তারা রাতের বেলায় কাঁদতে কাঁদতে পিতার কাছে এল। (১৭) তারা বলল : পিতা আমরা দৌড় প্রতিযোগিতা করতে গিয়েছিলাম এবং ইউসূফকে আসবাব-পত্রের কাছে রেখে গিয়েছিলাম। অতঃপর তাকে বাসে খেয়ে ফেলেছে। আপনিতো আমাদেরকে বিশ্বাস করবেন না যদিও আমরা সত্যবাদী। (১৮) এবং তারা তাঁর জামায় কৃত্রিম রক্ত লাগিয়ে আনল। বললেন : এটা কখনই নয় বরং তোমাদের মন তোমাদেরকে একটা কথা সাজিয়ে দিয়েছে। সুতরাং এখন সবার করাই আমার পক্ষে শ্রেয়। তোমরা যা বর্ণনা করছ, সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহই আমার সাহায্য স্থল। (১৯) এবং একটি কাকেলা এল। অতঃপর তাদের গানি সংগ্রাহককে প্রেরণ করল। সে বাসতি ফেলল। বলল : কি আনন্দের কথা! এ তো একটি কিশোর! তারা তাকে পণ্যপ্রব্য গণ্য করে গোপন করে ফেলল। আল্লাহ খুব জানেন যা কিছু তারা করেছিল। (২০) ওরা তাকে কম মূল্যে বিক্রি করে দিল শুনাগুনাতি কয়েক দিরহামে এবং তাঁর ব্যাপারে নিরাসক্ত ছিল।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

ইউসূফ (আ) ও তাঁর (বৈমাত্রেয়) ভ্রাতাদের কাহিনীতে [আল্লাহর কুদরত ও রসূল (সা)-র নবুয়তের] নিদর্শনাবলী রয়েছে তাদের জন্য, যারা (আপনার কাছে তাঁদের কাহিনী) জিজ্ঞেস করে। [কেননা, ইউসূফ (আ)-কে গ্রহণ নিঃসহায় ও নিরুপায় অবস্থা থেকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় পৌঁছে দেওয়া একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই কাজ ছিল। এতে মুসলমানদের জন্য শিক্ষা ও ঈমানী শক্তি অর্জিত হবে। যেসব ইহুদী রসূলুল্লাহ (সা)-কে

পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে এ কাহিনী জিজ্ঞেস করেছিল, তারাও এতে নবয়ুগের প্রমাণ পেতে পারে।] সে সময়টি স্মরণ্য, যখন তারা (বৈমানের ভ্রাতারা পারম্পরিক পরামর্শ হিসেবে) বলাবলি করল : (একি ব্যাপার যে) ইউসুফ ও তার (সহোদর) ভাই (বেনি-য়ামিন) আমাদের পিতার অধিক প্রিয় অথচ (অল্প বয়স্ক হওয়ার কারণে তারা উভয়েই তাঁর সেবাস্বত্বের যোগ্যও নয় এবং) আমরা একটি ভারী দল ; (আমরা আমাদের শক্তি ও সংখ্যাধিক্যের কারণে সর্বপ্রথমে তাঁর সেবাস্বত্বও করি) ! নিশ্চয় আমাদের পিতা সুস্পষ্ট ভ্রান্তিতে পতিত আছেন। (কাজেই ইউসুফ যেহেতু উভয়ের মধ্যে অধিক প্রিয়, তাই কৌশলে তাকে পিতার কাছ থেকে সরিয়ে দিতে হবে। এর উপায় এই যে) হয় ইউসুফকে হত্যা করে ফেল, না হয় তাকে কোন (দূর-দুরান্ত) দেশে রেখে এস। এতে করে (আবার) তোমাদের পিতার দৃষ্টি একান্তভাবে তোমাদের প্রতি নিবদ্ধ হয়ে যাবে এবং শেষ পর্যন্ত তোমরাই তাঁর কাছে যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। তাদের মধ্যেই একজন বলল : ইউসুফকে হত্যা করো না। (এটা জঘন্য অপরাধ)। এবং তাকে কোন অন্ধকূপে নিক্ষেপ করে দাও, (যাতে ডুবে সাওয়ার মত পানি না থাকে। নতুবা তাও এক প্রকার হত্যাই। তবে জনবসতি ও লোক চলাচলের পথ দূরে না থাকা চাই) যাতে কোন পথিক তাকে বের করে নিয়ে যায়। যদি তোমরা একাজ করতেই চাও, (তবে এভাবে কর। এতে সবাই একমত হয়ে গেল এবং) সবাই (মিলে পিতাকে) বলল : আক্বাজান, এর কারণ কি যে, ইউসুফের ব্যাপারে আপনি আমাদেরকে বিশ্বাস করেন না (এবং কখনও কোথাও আমাদের সাথে প্রেরণ করেন না) অথচ আমরা (মনেপ্রাণে) তার হিতাকাঙ্ক্ষী? (এরূপ করা সঙ্গত নয় বরং) আপনি তাকে আগামীকাল আমাদের সাথে (জঙ্গলে) প্রেরণ করুন, যাতে সে খায় ও খেলা-খুলা করে। আমরা তার পুরোপুরি দেখাশোনা করব। ইয়াকুব (আ) বললেন : (তোমাদের সাথে প্রেরণ করতে দুটি বিষয় আমাকে বাধা দান করে : এক, চিন্তা-ভাবনা এবং দুই, বিপদাশংকা। ভাবনা এই যে) তোমরা তাকে (আমার দৃষ্টির সামনে থেকে) নিয়ে যাবে—এটা আমার জন্য ভাবনার কারণ এবং (বিপদাশংকা এই যে) আমার অশংকা হয় যে, তাকে ব্যাঘ্র খেয়ে ফেলবে এবং তোমরা (নিজ কাজকর্মে ব্যস্ত থাকার কারণে) তার দিক থেকে গাফিল থাকবে (কেননা ঐ জঙ্গলে অনেক ব্যাঘ্র ছিল)। তারা বলল : যদি তাকে ব্যাঘ্র খেয়ে ফেলে এবং আমরা দলকে দল (বিদ্যমান) থাকি, তবে আমরা সম্পূর্ণই অকর্মণ্য প্রমাণিত হব। [মোটকথা তারা বলেকয়ে ইউসুফকে ইয়াকুব (আ)-এর কাছ থেকে নিয়ে চলল] যখন তাকে (সাথে করে জঙ্গলে) নিয়ে গেল এবং (পূর্ব প্রস্তাব অনুসারী) সবাই তাকে কোন অন্ধকূপে নিক্ষেপ করতে কৃতসংকল্প হল (এবং তা কার্যেও পরিণত করে ফেলল), তখন আমি (ইউসুফের সাঙ্গুনার জন্য) তার কাছে প্রত্যাদেশ করলাম যে, (তুমি চিন্তিত হয়ো না। আমি তোমাকে এখান থেকে উদ্ধার করে উচ্চ পদ-মর্যাদায় আসীন করব। একদিন আসবে, যখন) তুমি তাদেরকে একথা ব্যস্ত করবে এবং তারা তোমাকে (অপ্রত্যাশিতভাবে শাহী পোশাকে দেখার কারণে) চিনবেও না। [ব্যস্তবে তাই হয়েছিল। ইউসুফের ভ্রাতারা মিসরে গিয়েছিল এবং অবশেষে ইউসুফ তাদেরকে বলেছিলেন :

هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ —এ হচ্ছে ইউসুফ (আ)-এর ঘটনা] এবং (এদিকে)

তার সন্মান পিতার কাছে কঁাদতে কঁাদতে পৌঁছল (পিতা যখন রুদ্দনের কারণ জিজ্ঞেস করলেন, তখন) বললঃ আক্বাজান, আমরা সবাই তো পরল্পরে দৌড় প্রতিযোগিতায় ব্যাপৃত হলাম এবং ইউসুফকে (এমন জায়গায়, যেখানে ব্যাঘ্র থাকার ধারণা ছিল না) আসবাবপত্রের কাছে ছেড়ে দিলাম। অতঃপর (ঘটনাক্রমে) একটি ব্যাঘ্র (আসল এবং) তাকে খেয়ে ফেলল। আর আপনি তো আমাদের কথা বিশ্বাস করবেন না, যদিও আমরা সত্যবাদী। [যখন তারা ইয়াকুব (আ)-এর কাছে আসছিল, তখন] ইউসুফের জামায় কুন্নিম রক্তও লাগিয়ে এনেছিল। (অর্থাৎ কোন জন্তুর রক্ত তাঁর জামায় মাখিয়ে নিজেদের বস্ত্র-বোর সপক্ষে প্রমাণ হিসেবে উপস্থিত করল)। ইয়াকুব (আ) দেখলেন যে, জামায় কোন অংশ ছিল ছিল না। (তাবারী কর্তৃক ইবনে-আক্বাস থেকে বর্ণিত) তখন বললেনঃ (ইউসুফকে ব্যাঘ্র কিছুতেই খায়নি) বরং তোমরা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে একথা বলছ। অতএব আমি সবারই করব, যাতে অভিযোগের লেশমাত্রও থাকবে না। (সে সবারে বিন্দুমাত্র অভিযোগ নেই; তাই 'সবারে জামীল'—এ তফসীরি বিশুদ্ধ হাদীসের বরাত দিয়ে তাবারী বর্ণনা করেছেন)। তোমরা যা বর্ণনা করছ, তাতে আলাহ্ তা'আলাই সাহায্য করুন [অর্থাৎ আপাতত এ বিষয়ে আমার সবার করার সামর্থ্য হোক এবং ভবিষ্যতে তোমাদের মিথ্যার মুখোশ উল্লেখচিত হোক। মোটকথা, হযরত ইয়াকুব (আ) সবার করে বসে রইলেন এবং ইউসুফ (আ)-এর ঘটনা হল এই যে, ঘটনাক্রমে সেদিকে] একটি কাফেলা আগমন করল [যা মিসর যাচ্ছিল। তারা নিজেদের লোককে পানি আনার জন্য (কুপে) প্রেরণ করল। সে বাজতি ফেলল। ইউসুফ বাজতি ধরে ফেললেন। বাজতি উপরে আনার পর ইউসুফকে দেখে আনন্দিত হয়ে] সে বলতে লাগলঃ কি আনন্দের বিষয়! এ তো চমৎকার এক কিশোর বের হয়ে এসেছে। (কাফিলার লোকেরা জানতে পেরে তারাও আহলাদে আটখানা) তারা তাকে (পণ্য) দ্রব্য সাব্যস্ত করে (এ ধারণার বশবর্তী হয়ে) গোপন করে ফেলল (যেন কোন দাবীদার বের না হয় এবং একে মিসরে নিয়ে উচ্চমূল্য বিক্রয় করা যায়) তাদের সব কার্যক্রম আলাহ্ তা'আলার জানি ছিল। [এদিকে ভ্রাতারীও আশেপাশে হোরাকিরি করছিল এবং কুপের ডেতরে ইউসুফের দেখাশোনা করত। তাকে কিছু খাদ্যও তারা পৌঁছাত। উদ্দেশ্য এই ছিল যে, ইউসুফ না মরুক, কেউ এসে তাকে অন্য দেশে নিয়ে যাক এবং ইয়াকুব (আ) যেন ঘুণাক্ষরেও তা জানতে না পারেন। সেদিন ইউসুফকে কুপের ডেতরে না দেখে এবং নিকটেই একটি কাফেলাকে অবস্থান করতে দেখে ঝঁজতে ঝঁজতে সেখানে উপস্থিত হল, তারা ইউসুফের সন্ধান পেয়ে কাফেলার লোকদেরকে বললঃ ছেলটি আমাদের ক্রীতদাস। সে পলায়ন করে এসেছে। এখন আমরা তাকে রাখতে চাই না]। এবং (এ কথা বলে) তাকে খুবই কম মূল্যে (কাফিলার লোকদের কাছে) বিক্রি করে দিল; অর্থাৎ গুণা-গুণ্টি কয়েকটি দিরহামের পরিবর্তে এবং (কারণ ছিল এই যে,) তারা তো তার সস্তিক মূল্যায়নকারী ছিলই না (সে, উৎকৃষ্ট মাল মনে করে উচ্চমূল্যে বিক্রি করত। আসলে তাকে সেখান থেকে সরিয়ে দেওয়াই ছিল তাদের উদ্দেশ্য)।

### আনুমানিক জাতব্য বিষয়

উল্লিখিত আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে হাশিমার করা হয়েছে যে, এ সূরায় বণিত ইউসুফ (আ)-এর কাহিনীকে শুধুমাত্র একটি কাহিনীর নিরিখে দেখা উচিত নয় বরং এতে জিজ্ঞাসু ও অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিবর্গের জন্য আলাহ তা'আলার অপার শক্তির বড় বড় নিদর্শন ও নির্দেশাবলী রয়েছে।

এর উদ্দেশ্য এরূপও হতে পারে যে, যেসব ইহদী পরীক্ষার উদ্দেশ্যে নবী করীম (সা)-কে এ কাহিনী জিজ্ঞেস করেছিল, তাদের জন্য এতে বড় বড় নিদর্শন রয়েছে। বণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (সা) যে সময় মক্কায় অবস্থানরত ছিলেন এবং তাঁর সংবাদ মদীনায় পৌঁছেছিল, তখন মদীনায় ইহদীরা তাঁকে পরীক্ষা করার জন্য একদল লোক মক্কায় প্রেরণ করেছিল। তারা অস্পষ্ট ভঙ্গিতে এরূপ প্রশ্ন করেছিল যে, আপনি সত্য নবী হলে বলুন, কোন্ পয়গম্বরের এক পুত্রকে সিরিয়া থেকে মিসরে স্থানান্তর করা হয় এবং তার বিরহব্যথায় ক্রন্দন করতে করতে পিতা অন্ধ হয়ে যান ?

জিজ্ঞাসার জন্য এ ঘটনাটি মনোনীত করার পেছনে কারণ ছিল এই যে, এ ঘটনা সাধারণভাবে প্রসিদ্ধ ছিল না এবং মক্কার কেউ এ সম্পর্কে জ্ঞাতও ছিল না। তখন মক্কায় কিতাবী সম্প্রদায়ের কেউ বাস করত না যে, তওরাত ও ইনজীলের বরাতে তার কাছ থেকে এ ঘটনার কোন অংশবিশেষ জানা যেত। বলা বাহুল্য, তাদের এ প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতেই পূর্ণ সূরা ইউসুফ অবতীর্ণ হয়। এতে হযরত ইয়াকুব ও ইউসুফ (আ)-এর সম্পূর্ণ কাহিনী এমন বিস্তারিতভাবে বণিত হয়েছে যে, তওরাত ও ইনজীলেও তেমনটি হয়নি। তাই এর বর্ণনা ছিল রসূলুল্লাহ (সা)-র একটি প্রকাশ্য মু'জিবা।

আলোচ্য আয়াতের এরূপ অর্থও হতে পারে যে, ইহদীদের প্রশ্ন বাদ দিলেও স্বয়ং এ কাহিনীতে এমন এমন বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছে, যেগুলোতে আলাহ তা'আলার অপার মহিমার নিদর্শন এবং অনুসন্ধানকারীদের জন্য বড় বড় নির্দেশ বিধান ও মাস'আলা বিদ্যমান রয়েছে। যে বালককে ভ্রাতারা ধ্বংসের গর্ভে নিক্ষেপ করেছিল, আলাহর অপারসীম শক্তি তাকে কোথা থেকে কাথায় পৌঁছে দিয়েছে, কিভাবে তার হিফাযত হয়েছে! এবং আলাহ তা'আলা তাঁর বিশেষ বাপ্পাদেরকে স্বীয় নির্দেশাবলী পালনের কেমন গভীর আগ্রহ দান করে থাকেন! যৌবনাবস্থায় অবাধ ভোগের চমৎকার সুযোগ হাতে আসা সত্ত্বেও ইউসুফ (আ) আলাহর ভয়ে প্ররৃত্তিকে কিভাবে পরাজিত করে অক্ষত অবস্থায় এ বিপদের কবল থেকে বের হয়ে আসেন। আরও জানা যায় যে, যে ব্যক্তি সাধুতা ও আলাহভীতির পথে চলে, আলাহ তা'আলা তাকে শত্রুদের বিপরীতে কিরূপ ইহুযত দান করেন এবং শত্রুদেরকে কিভাবে তার পদতলে লুটিয়ে দেন। এগুলোই হচ্ছে এ কাহিনীর শিক্ষা এবং আলাহর শক্তির মহান নিদর্শন। চিন্তা করলেই এগুলো বোঝা যায়। —(কুরতুবী, মাযহারী)

আলোচ্য আয়াতে ইউসুফ (আ)-এর ভাইদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ইউসুফ (আ) সহ হযরত ইয়াকুব (আ)-এর বারজন পুত্র সন্তান ছিল। তাদের প্রত্যেকেরই সন্তান-সন্ততি হয় এবং বংশ বিস্তার লাভ করে। ইয়াকুব (আ)-এর উপাধি ছিল 'ইসরাঈল'। তাই বারটি পরিবার সবাই 'বনী ইসরাঈল' নামে খ্যাত হয়।



বার পুত্রের মধ্যে দশজন জ্যেষ্ঠপুত্র ইয়াকুব (আ)-এর প্রথমা স্ত্রী লাইয়্যা বিনতে লাইয়্যানের গর্ভে জন্মলাভ করে। তাঁর মৃত্যুর পর ইয়াকুব (আ) লাইয়্যার ভগিনী রাহীলকে বিবাহ করেন। রাহীলের গর্ভে দু'পুত্র ইউসুফ ও বেনিয়ামিন জন্মগ্রহণ করেন। তাই ইউসুফ (আ)-এর একমাত্র সহোদর ভাই ছিলেন বেনিয়ামিন এবং অবশিষ্ট দশজন বৈমান্নেয় ভাই। ইউসুফ জননী রাহীলও বেনিয়ামিনের জন্মের পর মৃত্যুমুখে পতিত হন।—(কুরতুবী)

দ্বিতীয় আয়াত থেকে ইউসুফ (আ)-এর কাহিনী শুরু হয়েছে। ইউসুফ (আ)-এর ভ্রাতারা পিতা ইয়াকুব (আ)-কে দেখল যে, তিনি ইউসুফের প্রতি অসাধারণ মহব্বত রাখেন। ফলে তাদের মনে হিংসা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। এটাও সম্ভবপর যে, তারা কোনরূপে ইউসুফ (আ)-এর স্বপ্নের বিষয়ও অবগত হয়েছিল, স্বদরুন তারা ইউসুফ (আ)-এর বিরাট মাহাত্ম্যের কথা টের পেয়ে তাঁর প্রতি হিংসাপরায়ণ হয়ে উঠল। তারা পরস্পর বলাবলি করল : আমরা পিতাকে দেখি যে, তিনি আমাদের তুলনায় ইউসুফ ও তার অনুজ বেনিয়ামিনকে অধিক ভালবাসেন। অথচ আমরা দশ জন এবং তাদের জ্যেষ্ঠ হওয়ার কারণে গৃহের কাজকর্ম করতে সক্ষম। তারা উভয়েই ছোট বালক বিধায় গৃহস্থালীর কাজ করার শক্তি রাখে না। আমাদের পিতার উচিত হল এ বিষয় অনুধাবন করা এবং আমাদেরকে অধিক মহব্বত করা। কিন্তু তিনি প্রকাশ্যে অবিচার করে যাচ্ছেন। তাই তোমরা হয় ইউসুফকে হত্যা কর, না হয় এমন দূরদেশে নির্বাসিত কর, যেখান থেকে সে আর ফিরে আসতে না পারে।

এ আয়াতে ভ্রাতারা নিজেদের সম্পর্কে

عَمِيَّة

শব্দ ব্যবহার করেছে।

আরবী ভাষায় পাঁচ থেকে দশজনের একটি দলের অর্থে এ শব্দ ব্যবহৃত হয়। পিতা সম্পর্কে তারা বলেছে : **إِنَّ أَبَانَا لَنَفِي ضَالٍّ مِّمِّينِ**—এতে **ضَالٍّ** শব্দের

আভিধানিক অর্থ পথভ্রষ্টতা। কিন্তু এখানে ধর্মীয় পথভ্রষ্টতা বোঝানো হয়নি। নতুবা এরূপ ধারণা করার কারণে তারা সবাই কাফির হয়ে যেত। কেননা, ইয়াকুব (আ) ছিলেন আল্লাহ তা'আলার মনোনীত পয়গম্বর। তাঁর সম্পর্কে এরূপ ধারণা পোষণ করা নিশ্চিত কুফর।

ইউসুফ (আ)-এর ভ্রাতাদের সম্পর্কে স্বয়ং কোরআন পাকে উল্লিখিত রয়েছে যে, পরবর্তীকালে তারা দোষ স্বীকার করে পিতার কাছে মাগফিরাতের দোয়া প্রার্থনা করেছিল। পিতা তাদের এ প্রার্থনা কবুল করেছিলেন। এতে বাহ্যত বোঝা যায় যে, তাদের অপরাধ ক্ষমা করা হয়েছে। এগুলো তখনই সম্ভবপর, যখন তাদের মুসলমান ধরা হয়। নতুবা কাফিরের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করা বৈধ নয়। এ কারণেই ভ্রাতাদের পয়গম্বর হওয়ার ব্যাপারে তো আলিমরা মতভেদ করেছেন কিন্তু মুসলমান হওয়ার ব্যাপারে কারও দ্বিমত নেই। এতে বোঝা যায় যে, এখানে **ضَالٍّ** শব্দটি শুধু এ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে যে, তিনি সন্তানদের প্রতি সমতাপূর্ণ ব্যবহার করেন না।

তৃতীয় আয়াতে ভাইদের পরামর্শ বর্ণিত হয়েছে। কেউ মত প্রকাশ করল যে, ইউসুফকে হত্যা করা হোক। কেউ বলল : তাকে কোন অন্ধকূপের গভীরে নিক্ষেপ কর হোক—স্নাতে মাঝখান থেকে এ কষ্টক দূর হয়ে যায় এবং পিতার সমগ্র মনোযোগ তোমাদের প্রতিই নিবদ্ধ হয়ে যায়। হত্যা কিংবা কূপে নিক্ষেপ করার কারণে যে গোনাহ্ হবে, তার প্রতিকার এই যে, পরবর্তীকালে তওবা করে তোমরা সাধু হয়ে যেতে পারবে। আয়াতের

وَ تَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ বাক্যের এক অর্থ তাই বর্ণনা করা হয়েছে।

এ ছাড়া এরূপ অর্থও হতে পারে যে, ইউসুফকে হত্যা করার পর তোমাদের অবস্থা ঠিক হয়ে যাবে। কেননা, পিতার মনোযোগের কেন্দ্র শেষ হয়ে যাবে। অথবা অর্থ এই যে, হত্যার পর পিতামাতার কাছে দোষ স্বীকার করে তোমরা আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে আসবে।

ইউসুফ (আ)-এর ভ্রাতারা যে পয়গম্বর ছিল না, উগরোক্ত পরামর্শ তার প্রমাণ। কেননা, এ ঘটনায় তারা অনেকগুলো কবিরী গোনাহ্ করেছে। একজন নিরপরাধকে হত্যার সংকল্প, পিতার অবাধ্যতা ও তাঁকে কষ্ট প্রদানে, চুক্তির বিরুদ্ধাচরণ ও মিথ্যা চক্রান্ত ইত্যাদি! বিজ্ঞ আলিমগণের বিশ্বাস অনুযায়ী পয়গম্বরগণ দ্বারা নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বেও এরূপ গোনাহ্ হতে পারে না।

চতুর্থ আয়াতে বলা হয়েছে : ভ্রাতাদের মধ্যেই একজন সমস্ত কথাবার্তা শুনে বলল : ইউসুফকে হত্যা করো না। যদি কিছু করতেই হয় তবে কূপের গভীরে এমন জায়গায় নিক্ষেপ কর, যেখানে সে জীবিত থাকে এবং পথিক যখন কূপে আসে, তখন তাকে উত্তিয়ে নিয়ে যায়। এভাবে একদিকে তোমাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে যাবে এবং অপরদিকে তাকে নিয়ে তোমাদেরকে কোন দূর দেশে যেতে হবে না। কোন কাফিলা আসবে, তারা স্বয়ং তাকে সাথে করে দূর-দূরান্তে পৌঁছে দেবে।

এ অভিমত প্রকাশকারী ছিল তাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইয়াহুদা। কোন কোন রেওয়াজে আছে যে, সবার মধ্যে রুবীল ছিল জ্যেষ্ঠ। সে-ই এ অভিমত দিয়েছিল। এ ব্যক্তি সম্পর্কেই পরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মিসরে যখন ইউসুফ (আ)-এর ছোট ভাই বেনিয়ামিনকে আটক করা হয়, তখন সে বলেছিল : আমি ফিরে গিয়ে পিতাকে কিভাবে মুখ দেখাব? তাই আমি কেনানে ফিরে যাব না।

আয়াতে غِيَابَةَ الْجَبِّ বলা হয়েছে; যা কোন বস্তুকে থেকে ফেলে

দৃষ্টির আড়াল করে দেয়, তাকেই غِيَابَةَ বলা হয়। এ কারণেই কবরকেও غِيَابَةَ

বলা হয়। যে কূপের পাড় তৈরী করা হয় না, তাকে جَبِّ বলা হয়।

يَلْتَقِطُ لِقْطَهُ مِنَ السَّيْرِ এখানে يَلْتَقِطُ লক্ষ্যটি থেকে উদ্ধৃত। যে পড়ে

থাকা বস্তু অশেষণ বাতিরেকেই কেউ পেয়ে ফেলে, তাকে لِقْطَهُ বলা হয়। অ-প্রাণী-

বাচক বস্তু হলে **القلم** এবং প্রাণীবাচক হলে ফিকাহবিদদের পরিভাষায় **القلم** বলা হয়। অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও অপরিপক্ব বাচক হলেও কুড়িয়ে পাওয়া মানুষকে **القلم** বলা হবে। কুরতুবী এশব্দ দ্বারাই প্রমাণ করেছেন যে, ইউসুফ (আ)-কে যখন কূপে নিষ্কপ করা হয়, তিনি তখন অপ্রাপ্ত বয়স্ক বাচক ছিলেন। এ ছাড়া ইয়াকুব (আ)-এর এরূপ বলাও তাঁর বাচক হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করে যে, আমার আশংকা হয় ব্যাপ্ত তাকে খেয়ে ফেলবে। কেননা, ব্যাপ্তে খেয়ে ফেলা বাচকদের ক্ষেত্রেই কল্পনা করা যায়। ইবনে জারীর ও ইবনে আবী শায়বার রেওয়াজেতে বলা হয়েছে যে, তখন ইউসুফ (আ)-এর বয়স ছিল সাত বছর।—(মাহহারী)

ইমাম কুরতুবী এ হলে **القلم** এর বিস্তারিত বিধানাবলী বর্ণনা করেছেন। এখানে সেগুলো বর্ণনা করার অবকাশ নেই। তবে এ সম্পর্কে একটি মৌলিক বিষয় বুঝে নেওয়া দরকার যে, ইসলামী রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় সাধারণ মানুষের জান ও মালের হিফাজত পথঘাট ও সড়ক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নকরণ ইত্যাদি একমাত্র সরকারী বিভাগসমূহের দায়িত্ব নয়; প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষেত্রে এ দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে। পথঘাটে ও সড়কে দাঁড়িয়ে অথবা নিজের কোন আসবাবপত্র ফেলে দিয়ে দ্বারা পথিকদের চলার পথে অসুবিধা সৃষ্টি করে, তাদের সম্পর্কে হাদীসে কঠোর শাস্তির সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। বলা হয়েছে : যে ব্যক্তি মুসলমানদের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করে, তার জিহাদও গ্রহণীয় নয়। এমনিভাবে রাস্তায় কোন বস্তু পড়ে থাকার কারণে যদি অপরের কষ্ট পাওয়ার আশংকা থাকে; যেমন কাঁটা, কাঁচের টুকরা, পাথর ইত্যাদি, তবে এগুলোকে সরানো শুধু উদ্ভাষণপ্রাপ্ত কর্তৃ-পক্ষেরই দায়িত্ব নয় বরং প্রত্যেক মুসলমানকেই এ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এবং দ্বারা এ কাজ করে তাদের জন্য অশেষ প্রতিদান ও সওয়াবের অঙ্গীকার করা হয়েছে।

এ মূলনীতি অনুযায়ীই কারও হারানো মাল পেলে তা আশ্বাসে না করাই শুধু তার দায়িত্ব নয় বরং এটাও তার দায়িত্ব যে, মালটি উঠিয়ে সন্মুখে রেখে দেবে এবং ঘোষণা করে মালিকের সন্ধান নেবে। সন্ধান পাওয়া গেলে এবং লক্ষণাদি বর্ণনার পর যদি নিশ্চিত হওয়া যায় যে, এ মাল তারই; তবে তাকে প্রত্যর্পণ করবে। পক্ষান্তরে ঘোষণা ও ঘোঁজা-খুঁজি সত্ত্বেও যদি মালিক না পাওয়া যায় এবং মালের গুরুত্ব অনুযায়ী অনুমিত হয় যে, মালিক আর তালাশ করবে না, তবে প্রাপক নিঃস্ব দরিদ্র হলে নিজেই তা ভোগ করতে পারবে। অন্যথায় ফকির-মিসকীনকে দান করে দেবে। উভয় অবস্থায় সেটি প্রকৃত মালিকের পক্ষ থেকে দান রূপে গণ্য করা হবে। দানের সওয়াব সে-ই পাবে; যেন পরকালের হিসাবে সেটি তার নামেই জমা করে দেওয়া হবে।

এগুলো হচ্ছে জনসেবা ও পারস্পরিক সহযোগিতার মূলনীতি। এগুলোর দায়িত্ব মুসলিম সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। আফসোস! মুসলমানরা নিজেদের দীনকে বুঝে এবং তা স্বাধিক পালন করলে বিশ্ববাসীর চোখ খুলে যাবে। তারা দেখবে যে, সরকারের বড় বড় বিভাগ কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে যে কাজ সম্পন্ন করতে পারে না, তা অনাস্থাসে কিভাবে সম্পন্ন হয়ে যায়।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ আয়াতে বলা হয়েছে যে, ভাইয়েরা পিতার কাছে এরূপ ভাষায় আবেদন পেশ করল : আক্বাজান! ব্যাপার কি যে, আপনি ইউসুফ সম্পর্কে আমাদের প্রতি আস্থা রাখেন না অথচ আমরা তার পুরোপুরি হিতাকাঙ্ক্ষী। আগামীকাল আপনি তাকে আমাদের সাথে প্রমোদ ভ্রমণে পাঠিয়ে দিন, যাতে সে-ও স্বাধীনভাবে পানাহার ও খেলাধুলা করতে পারে। আমরা সবাই তার পুরোপুরি দেখাশোনা করব।

তাদের এ আবেদন থেকেই বোঝা যায় যে, তারা ইতিপূর্বেও এ ধরনের আবেদন কোন সময়ে করেছিল, যা পিতা অগ্রাহ্য করেছিলেন। তাই এবার কিঞ্চিৎ জোর ও গীড়াগীড়ি সহকারে পিতাকে নিশ্চিত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

এ আয়াতে হযরত ইয়াকুব (আ)-এর কাছে প্রমোদ-ভ্রমণ এবং স্বাধীনভাবে পানাহার ও খেলাধুলার অনুমতি চাওয়া হয়েছে। হযরত ইয়াকুব (আ) তাদেরকে এ ব্যাপারে নিষেধ করেন নি। তিনি শুধু ইউসুফকে তাদের সাথে দিতে ইতস্তত করেছেন, যা পরবর্তী আয়াতে বর্ণিত হবে। এতে বোঝা গেল যে, প্রমোদ ভ্রমণ ও খেলাধুলা বিধিবদ্ধ সীমার ভেতরে নিষিদ্ধ নয় বরং সহীহ হাদীস থেকেও এর বৈধতা জানা যায়। তবে শর্ত এই যে, খেলাধুলার শরীয়তের সীমানাঘন বাঙ্কনীয় নয় এবং তাতে শরীয়তের বিধান লংঘিত হতে পারে এমন কোন কিছু মিশ্রণও উচিত নয়।—( কুরতুবী )

ইউসুফ (আ)-এর ভ্রাতারা যখন আগামীকাল ইউসুফকে তাদের সাথে প্রমোদ ভ্রমণে প্রেরণের আবেদন করল, তখন ইয়াকুব (আ) বললেন : তাকে প্রেরণ করা আমি দু'কারণে পছন্দ করি না। প্রথমত, এ নব্বনের মণি আমার সামনে না থাকলে আমি শান্তি পাই না। দ্বিতীয়ত, আশংকা আছে যে, জঙ্গলে তোমাদের অসাবধানতার মুহূর্তে তাকে বাঘ খেয়ে ফেলতে পারে।

বাঘে খাওয়ার আশংকা হওয়ার কারণ এই যে, কেনানে বাঘের বিস্তার প্রাদুর্ভাব ছিল। কিংবা ইয়াকুব (আ) স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, তিনি পাহাড়ের উপর আছেন। নিচে পাহাড়ের পাদদেশে ইউসুফ (আ)। হঠাৎ দশটি বাঘ এসে তাকে ঘেরাও করে ফেলে এবং আক্রমণ করতে উদ্যত হয় কিন্তু একটি বাঘই এগিয়ে এসে তাকে মুক্ত করে দেয়। অতঃপর ইউসুফ (আ) মৃত্তিকার অভ্যন্তরে গা-ঢাকা দেন।

এর ব্যাখ্যা এ ভাবে প্রকাশ পায় যে, দশটি বাঘ ছিল দশজন ভাই এবং যে বাঘটি তাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে, সে ছিল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইয়াহদা। মৃত্তিকার অভ্যন্তরে গা-ঢাকা দেওয়ার অর্থ কূপের মধ্যে নিষ্কিন্ত হওয়া।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আক্বাস (রা) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, এ স্বপ্নের ভিত্তিতে হযরত ইয়াকুব (আ) স্বপ্নে এ ভাইদের পক্ষ থেকেই আশংকা করেছিলেন এবং তাদেরকেই বাঘ বলেছিলেন। কিন্তু নানা কারণে ওদের কাছে এই কথা প্রকাশ করেন নি।—( কুরতুবী )

ভ্রাতারা ইয়াকুব (আ)-এর কথা শুনে বলল : আপনার উন্নতি অমূলক। আমাদের দশ জনের শক্তিশালী দল তার হিফাযতের জন্য বিদ্যমান রয়েছে। আমাদের দাবার বর্তমান স্থান সত্ত্বেও যদি বাঘেই তাকে খেয়ে ফেলে, তবে আমাদের অস্তিত্বই নিঃশূন্য হয়ে যাবে। এমনভাবেই আমাদের দ্বারা কোন কাজের আশা করা যেতে পারে?

হমরত ইয়াকুব (আ) পয়গম্বর সুলভ পান্ডার্যের কারণে পুত্রদের সামনে এ কথা প্রকাশ করলেন না যে, আমি স্বয়ং তোমাদের পক্ষ থেকেই অঙ্গীকার করি। কারণ, এতে প্রথমত তাদের মনোকষ্ট হত, দ্বিতীয়ত পিতার এরূপ বলার পর ভ্রাতাদের শত্রুতা আরও বেড়ে যেতে পারত। ফলে এখন ছেড়ে দিলেও অন্য কোন সময়ে কোন ছলছুঁতায় তাকে হত্যা করার ফিকিরে থাকত। তাই তিনি অনুমতি দিয়ে দিলেন। কিন্তু ভাইদের কাছে থেকে অঙ্গীকারও নিয়ে নিলেন, যাতে ইউসুফের কোনরূপ কষ্ট না হয়। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রুবীল অথবা ইয়াহুদার হাতে বিশেষ করে তাকে সোপর্দ করে বললেন : তুমি তার ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও অন্যান্য প্রয়োজনের ব্যাপারে দেখাশোনা করবে এবং শীঘ্র ফিরিয়ে আনবে। ভ্রাতারা পিতার সামনে ইউসুফকে কাঁধে তুলে নিল এবং পালাক্রমে সবাই উঠাতে লাগল। কিছু দূর পর্যন্ত হমরত ইয়াকুব (আ)ও তাদেরকে বিদায় দেওয়ার জন্য গেলেন।

কুরতুবী ঐতিহাসিক রেওয়াজেতের বরাত দিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, তারা যখন ইয়াকুব (আ)-এর দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল, তখন ইউসুফ (আ) যে ভাইয়ের কাঁধে ছিলেন, সে তাকে মাটিতে ফেলে দিল। তখন ইউসুফ (আ) পায়ে হেঁটে চলতে লাগলেন কিন্তু অল্প বয়স্ক হওয়ার কারণে তাদের সাথে সাথে দৌড়াতে অক্ষম হয়ে অন্য একজন ভাইয়ের আশ্রয় নিলেন। সে কোনরূপ সহানুভূতি প্রদর্শন না করায় তৃতীয়, চতুর্থ এমনিভাবে প্রত্যেক ভাইয়ের কাছে সাহায্য চাইলেন। কিন্তু সবাই উত্তর দিল যে, 'তুই যে এগারটি নক্ষত্র এবং চন্দ্র-সূর্যকে সিজদা করতে দেখেছিলিস, তাদেরকে ডাক দে। তারাই তোকে সাহায্য করবে।'

কুরতুবী এর ভিত্তিতেই বলেন যে, এ থেকে জানা গেল, ভাইয়েরা কোন না কোন উপায়ে ইউসুফ (আ)-এর স্বপ্নের বিষয়বস্তু অবগত হয়েছিল। সে স্বপ্নই তাদের তীব্র ক্রোধ ও কঠোর ব্যবহারের কারণ হয়েছিল।

অবশেষে ইউসুফ (আ) ইয়াহুদাকে বললেন : আপনি জ্যেষ্ঠ। আপনিই আমার দুর্বলতা ও অল্পবয়স্কতা এবং পিতার মনোকষ্টের কথা চিন্তা করে দয়াল্প হোন। আপনি ঐ অঙ্গীকার স্মরণ করুন, যা পিতার সাথে করেছিলেন। একথা শুনে ইয়াহুদার মনে দয়ার সঞ্চার হল এবং তাকে বলল : স্বতন্ত্র আমি জীবিত আছি এসব ভাই তোকে কোন কষ্ট দিতে পারবে না।

ইয়াহুদার অন্তরে আত্মা তা'আলার দয়া ও ন্যায়ানুগ কাজ করার প্রেরণা জাগ্রত করে দিলেন। সে অন্যান্য ভাইকে সম্বোধন করে বলল : নিরপরাধকে হত্যা করা মহাপাপ। আত্মাকে উন্নত কর এবং বালককে তার পিতার কাছে ফিরিয়ে নিয়ে চল। তবে তার কাছে থেকে অঙ্গীকার নিয়ে নাও যে, সে পিতার কাছে তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করবে না।

ভাইয়েরা উত্তর দিল : আমরা জানি, তোমার উদ্দেশ্য কি। তুমি পিতার অন্তরে নিজের মর্মান্দার আসন সর্বোচ্চ পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত করতে চাও। শুনে রাখ, যদি তুমি আমাদের ইচ্ছার পথে প্রতিবন্ধক হও, তবে আমরা তোমাকেও হত্যা করব। ইয়াহুদা

দেখল যে, নয় ভাইয়ের বিপরীতে সে একা কিছুই করতে পারবে না। তাই সে বলল, তোমরা যদি এ বাজককে নিপাত করতে মনস্থ করে থাক, তবে আমার কথা শোন। নিকটেই একটি প্রাচীন কূপ রয়েছে। এতে অনেক বোপ-জঙ্গল গজিয়েছে। সর্প, বিলু ও হরেক রকমের ইতর প্রাণী এখানে বাস করে। তোমরা তাকে কূপে ফেলে দাও। যদি কোন সর্প ইত্যাদি দংশন করে তাকে শেষ করে দেয়, তবে তোমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ এবং নিজ হাতে হত্যা করার দোষ থেকে তোমরা মুক্ত হবে। পক্ষান্তরে যদি সে জীবিত থাকে, তবে হয়তো কোন কাফিলা এখানে আসবে এবং পানির জন্য কূপে বাসতি ফেলবে। ফলে সে বের হয়ে আসবে। তারা তাকে সাথে করে অন্য কোন দেশে পৌঁছিয়ে দেবে। এমতাবস্থায়ও তোমাদের উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যাবে।

এ প্রস্তাবে ভাইয়েরা সবাই একমত হল। এ বিষয়টি তৃতীয় আয়াতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে :

فَلَمَّا زَهَبُوا بِهِ وَاجْتَمَعُوا أَن يُجْعَلُوا فِي غِيَابَةِ الْجَبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝

অর্থাৎ ভাইয়েরা যখন ইউসুফ (আ)-কে জঙ্গলে নিয়ে গেল এবং তাকে হত্যা করার ব্যাপারে কূপের গভীরে নিক্ষেপ করতে সবাই একমত্যে পৌঁছল, তখন আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে ইউসুফ (আ)-কে সংবাদ দিলেন যে, একদিন আসবে, যখন তুমি ভাইদের কাছে তাদের এ কুকর্মের কথা ব্যক্ত করবে। তারা তখন কিছুই বুঝতে পারবে না।

وَإِذْ أَخْبَرْنَا جُوبَ بْنَ جَرَاءٍ أَنَّ فُلَانًا زَهَبَ بِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝ (কুরতুবী)

উদ্দেশ্য এই যে, ভাইয়েরা যখন মিলিতভাবে তাকে কূপে নিক্ষেপ করার সংকল্প করেই ফেলল, তখন আল্লাহ তা'আলা ইউসুফ (আ)-এর সাক্ষনার জন্য ওহী প্রেরণ করলেন। এতে ভবিষ্যতে কোন সময় ভাইদের সাথে সাক্ষাত এবং সাথে সাথে এ বিষয়েরও সুসংবাদ দেওয়া হল যে, তখন সে ভাইদের প্রতি অমুখাপেক্ষী এবং তাদের ধরা-হোঁয়ার উর্ধ্বে থাকবে। ফলে সে তাদের অনিয়ম-অত্যাচারের বিচার করবে অথচ তারা এ সম্পর্কে কিছুই জানবে না।

ইমাম কুরতুবী বলেন : এ ওহী সম্পর্কে দু'প্রকার ধারণা সম্ভবপর। এক, কূপে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর তাঁর সাক্ষনার ও মুক্তির সুসংবাদ দানের জন্য এ ওহী আগমন করেছিল। দুই, কূপে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে ইউসুফ (আ)-কে ভবিষ্যত ঘটনাবলী বলে দিয়েছিলেন। এতে আরও বলে দিয়েছিলেন যে, তুমি এভাবে ধ্বংস হওয়ার কবজ থেকে মুক্ত থাকবে এবং এমনি পরিস্থিতি দেখা দেবে যে, তুমি তাদের তিরস্কার করার সুযোগ পাবে অথচ তারা তোমাকে চিনবেও না যে, তুমিই তাদের ভাই ইউসুফ।

ইউসুফ (আ)-এর প্রতি শৈশবে অবতীর্ণ এ ওহী সম্পর্কে তফসীরে মাহমহারীতে বলা হয়েছে যে, এটা নবুয়তের ওহী ছিল না। কেননা, নবুয়তের ওহী চল্লিশ বছর বয়ঃক্রমকালে অবতীর্ণ হয়। বরং এ ওহীটি ছিল এ খরনের, যেমন মুসা (আ)-এর জননীকে ওহীর মাধ্যমে জ্ঞাত করানো হয়েছিল। ইউসুফ (আ)-এর প্রতি নবুয়তের ওহীর আগমন মিসর পৌছা ও যৌবনে পদার্গদের পর শুরু হয়েছিল। বলা হয়েছে :

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ

حُكْمًا وَعِلْمًا

ইবনে জারীর, ইবনে আবীহাতেম প্রমুখ একে ব্যতিক্রমধর্মী নবুয়তের ওহীই আখ্যা দিয়েছেন; যেমন ইসা (আ)-কে শৈশবেই নবুয়তের ওহী দান করা হয়েছিল।— (মাহমহারী)

হমরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন : মিসর পৌছার পর আল্লাহ তা'আলা ইউসুফ (আ)-কে স্বীয় অবস্থা জানিয়ে হমরত ইয়াকুব (আ)-এর নিকট খবর পাঠাতে ওহীর মাধ্যমে নিষেধ করে দিয়েছিলেন।—(কুরতুবী) একারণেই ইউসুফ (আ)-এর মত একজন পয়গম্বর জেল থেকে মুক্তি এবং মিসরের রাজত্ব লাভ করার পরও ব্রহ্মপিতাকে স্বীয় নিরাপত্তার সংবাদ পৌছিয়ে নিশ্চিত করার কোন ব্যবস্থা করেন নি।

এ কর্মপন্থার মধ্যে আল্লাহ তা'আলার কি কি রহস্য লুক্কায়িত ছিল, তা জানার সাধ্য কার? সম্ভবত আল্লাহ হাড়া অন্য যে কোন কিছুর প্রতি অপরিসীম ভালবাসা রাখা যে আল্লাহর নিটক পছন্দনীয় নয়, এ বিষয়ে ইয়াকুব (আ)-কে সতর্ক করাও এর লক্ষ্য ছিল। এ হাড়া শেষ পর্যন্ত স্বাধিকারীর বেশে তাইদেরকেই ইউসুফ (আ)-এর সামনে উপস্থিত করে তাদেরকেও তাদের পূর্বকৃত দুর্কর্মের কিছু শাস্তি দেওয়া উদ্দেশ্য থাকতে পারে।

ইমাম কুরতুবী প্রমুখ তফসীরবিদ এখানে ইউসুফ (আ)-কে কূপে নিক্ষেপ করার ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন : যখন ওরা তাঁকে কূপে নিক্ষেপ করতে লাগল, তখন তিনি কূপের প্রাচীর জড়িয়ে ধরলেন। তাইয়েরা তার জামা খুলে তন্দ্বারা হাত বেঁধে দিল। তখন ইউসুফ (আ) পুনরায় তাদের কাছে দয়া ভিক্ষা চাইলেন। কিন্তু তখনও সেই একই উত্তর পাওয়া গেল যে, যে এগারটি নক্ষত্র তোকে সিজদা করে, তাদেরকে ডাক দে। তারাই তোঁর সাহায্য করবে। অতঃপর একটি বাজতিতে রেখে তা কূপে ছাড়তে লাগল। মাথাপথে যেতেই উপর থেকে রশি কেটে দিল। আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং ইউসুফের হিফাজত করলেন। পানিতে পড়ার কারণে তিনি কোনরূপ অঘাত পান নি। নিকটেই একখণ্ড জাসমান প্রস্তর দৃষ্টিগোচর হল। তিনি সুস্থ ও বহাল তবিয়তে তার উপর বসে গেলেন। কোন কোন রেওয়াজেতে রয়েছে, জিবরাঈল (আ) আল্লাহর আদেশ পেয়ে তাঁকে প্রস্তর খণ্ডের উপর বসিয়ে দেন।

ইউসুফ (আ) তিনদিন কূপে অবস্থান করলেন। ইয়াহদা প্রত্যহ গোপনে তাঁর জন্য কিছু খাদ্য আনত এবং বাজতির সাহায্যে তাঁর কাছে পৌঁছে দিত।

وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ — অর্থাৎ সন্ধ্যাবেলায় তারা রুন্দন করতে

করতে পিতার নিকট পৌঁছল। ইয়াকুব (আ) রুন্দনের শব্দ শুনে বাইরে এলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন : ব্যাপার কি? তোমাদের ছাগপালের উপর কেউ আক্রমণ করেনি তো? ইউসুফ কোথায়? তখন ভাইয়েরা বলল :

يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا  
فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ۝

অর্থাৎ পিতাঃ, আমরা দৌড় প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হলাম এবং ইউসুফকে আস-বাবপলের কাছে রেখে দিলাম। ইতিমধ্যে বাঘ এসে ইউসুফকে খেয়ে ফেলেছে। আমরা স্বত সত্যবাদীই হই কিন্তু আপনি তো আমাদের কথা বিশ্বাস করবেন না।

ইবনে আরাবী 'আহকামুল কোরআনে' বলেন : পারস্পরিক (দৌড়) প্রতিযোগিতা শরীয়তসিদ্ধ এবং একটি উত্তম খেলা। এটা জিহাদেও কাজে আসে। এ কারণেই রসুলুল্লাহ্ (স)-র স্বপ্ন এ প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়ার কথা সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে। অশ্ব-প্রতিযোগিতা করানো (অর্থাৎ ঘোড়দৌড়)ও প্রমাণিত রয়েছে। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে সালামা ইবনে আকওয়া' জনৈক ব্যক্তির সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হন।

উল্লিখিত আয়াত ও রেওয়াজে দ্বারা আসল ঘোড়দৌড়ের বৈধতা প্রমাণিত হয়। এছাড়া ঘোড়দৌড় ছাড়া দৌড়, তীরে লক্ষ্যভেদ ইত্যাদিতেও প্রতিযোগিতা করা বৈধ। প্রতিযোগিতায় বিজয়ী পক্ষকে তৃতীয় পক্ষ থেকে পুরস্কৃত করাও জায়েয। কিন্তু পরস্পর হারজিতে কোন টাকার অংশ শর্ত করা জুয়ার অন্তর্ভুক্ত বা কোরআন পাকে হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। আজকাল ঘোড়দৌড়ের স্বত.প্রকার পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে, তার কোনটিই জুয়া থেকে মুক্ত নয়। তাই এগুলি হারাম ও না-জায়েয।

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বলা হয়েছিল যে, ইউসুফ (আ)-এর ভ্রাতারা পারস্পরিক আলোচনার পর অবশেষে তাকে একটি অন্ধকূপে ফেলে দিল এবং পিতাকে এসে বলল যে, তাকে বাঘে খেয়ে ফেলেছে। পরবর্তী আয়াতসমূহে অতঃপর কাহিনী এভাবে বর্ণিত হয়েছে :

وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ — অর্থাৎ ইউসুফ (আ)-এর ভ্রাতারা তার

জামায় কৃত্রিম রক্ত লাগিয়ে এনেছিল, যাতে পিতার মনে বিশ্বাস জন্মাতে পারে যে, বাঘই তাকে খেয়ে ফেলেছে।

কিন্তু আক্বাহ তা'আলা তাদের মিথ্যা স্বীকৃতি করে দেওয়ার জন্য তাদেরকে একটি



জরুরী বিষয় থেকে গাফিল করে দিয়েছিলেন। তারা যদি রক্ত লাগানোর সাথে সাথে জামাটিও ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিত, তবে ইউসুফকে বাঘে খাওয়ার কথাটা বিশ্বাসযোগ্য হতে পারত। কিন্তু তারা অন্ধত ও আস্ত জামায় ছাগল ছানার রক্ত লাগিয়ে পিতাকে ধোঁকা দিতে চাইল। ইয়াকুব (আ) অন্ধত ও আস্ত জামা দেখে বললেন : বাছারা, এ বাঘ কেমন বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান ছিল যে, ইউসুফকে তো খেয়ে ফেলেছে কিন্তু জামার কোন অংশ ছিন্ন হতে দেয়নি।

এভাবে ইয়াকুব (আ)-এর কাছে তাদের জালিয়াতি ক্রীস হয়ে গেল। তিনি বললেন :

بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ

—অর্থাৎ ইউসুফকে বাঘে খায়নি বরং তোমাদেরই মন একটি বিষয় খাড়া করেছে। এখন আমার জন্য উত্তম এই যে, ধৈর্যধারণ করি এবং তোমরা যা বল, তাতে আজ্ঞাহর সাহায্য প্রার্থনা করি।

মাস'আলা : ইয়াকুব (আ) জামা অন্ধত হওয়া দ্বারা ইউসুফ ভ্রাতাদের মিথ্যা সপ্নমাণ করেছেন। এতে বোঝা যায় যে, বিচারকের উচিত, উভয় পক্ষের দাবী ও মুক্তি প্রমাণের সাথে সাথে পান্নিপান্নিক অবস্থা ও অলামতের প্রতি লক্ষ্য রাখা।

মাওয়ারদি বলেন : হযরত ইউসুফের জামাও কিছু আশ্চর্যজনক বিষয়াদির স্মারক হয়ে রয়েছে। তিনটি বিরাট ঘটনা এ জামার সাথেই জড়িত রয়েছে।

প্রথম ঘটনা হল, রক্ত রঞ্জিত করে পিতাকে ধোঁকা দেওয়া এবং জামার সাক্ষ্য দ্বারাই তাদের মিথ্যা প্রমাণিত হওয়া; দ্বিতীয়, যুলানখার ঘটনা। এতেও ইউসুফ (আ)-এর জামাটিই সাক্ষী হিসাবে উপস্থিত হয়েছে। তৃতীয়, ইয়াকুব (আ)-এর দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসার ঘটনা। এতেও তাঁর জামাটিই মো'জেহার প্রতীক প্রমাণিত হয়েছে।

মাস'আলা : কোন কোন আলিম বলেন : কাহিনীর এ পর্যায়ে ইয়াকুব (আ) পুত্রদেরকে বলেছেন :

بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا

অর্থাৎ তোমাদের মন একটি

বিষয় খাড়া করে নিয়েছে। তিনি হবহ এই উক্তি তখনও করেছিলেন, যখন মিসরে ইউসুফ (আ)-এর সহোদর ভাই বেনিয়ামিন কথিত একটি চুরির অভিযোগে ধৃত হয় এবং তার ভ্রাতারা ইয়াকুব (আ)-কে এক সংবাদ দেন। এ সংবাদ শুনেও তিনি

بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا বলেছিলেন। এখানে চিন্তা করার বিষয় এই যে,

ইয়াকুব (আ) উভয় ক্ষেত্রে নিজ অভিমত অনুসারে একথা বলেছিলেন কিন্তু প্রথম ক্ষেত্রে তা নির্ভুল প্রমাণিত হয় এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ভ্রান্ত। কেননা, এক্ষেত্রে ভাইদের কোন

দেখি ছিল না। এতে বুঝা যায় যে, পরগণ্ডরগণের অভিমতও প্রথম পর্যায়ে ভ্রান্ত হতে পারে। তবে পরবর্তী পর্যায়ে ওহীর মাধ্যমে তাঁদেরকে ভ্রান্তির উপর কায়েম থাকিতে দেওয়া হয় না।

কুরতুবী বলেন : এতে বুঝা যায় যে, অভিমতের ভ্রান্তি বড়দের তরফ থেকেও হতে পারে। কাজেই প্রত্যেক অভিমত প্রদানকারীর উচিত, নিজ অভিমতকে ভ্রান্তির সম্ভাবনামুক্ত মনে করা এবং নিজ মতামতের উপর কারও অটল অনড় হয়ে থাকা উচিত নয় যে, অপরের মতামত শুনতে এবং তা মেনে নিতে সশ্রমত নয়।

سِيَرَةٌ—এখানে—وَجَاءَتْ سَيَرَةٌ فَرَسُلًا وَأَوْرَدَهُمْ فَادِلِي دَلْوَةً

শব্দের অর্থ কাফিলা। **وَأَوْرَدَهُمْ** বলে কাফিলার অগ্রবর্তী লোকদেরকে বুঝান হয়েছে।

কাফিলার পানি ইত্যাদি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করা তাদের দায়িত্ব। **دَلْوَةً**

শব্দের অর্থ কূপে বাজতি নিক্ষেপ করা। উদ্দেশ্য এই যে, ঘটনাটিকে একটি কাফিলা এ স্থানে এসে যায়। তরুসীরে কুরতুবীতে বলা হয়েছে : এ কাফিলা সিরিয়া থেকে মিসর হাফিজ। পথ ভুলে এ জনমানবহীন জঙ্গলে এসে উপস্থিত হয়। তারা পানি সংগ্রহকারীদের কূপে প্রেরণ করল।

মিসরীয় কাফিলার পথ ভুলে এখানে পৌঁছা এবং এই অঞ্চল কূপের সম্মুখীন হওয়া সাধারণ দৃষ্টিতে একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা হতে পারে। কিন্তু হারা সৃষ্টি-রহস্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত, তারা জানে যে, এসব ঘটনা একটি পরস্পর সংযুক্ত ও অটুট ব্যবস্থাপনার মিলিত অংশ। ইউসূফের প্রলটা ও রফকই কাফিলাকে পথ থেকে সরিয়ে এখানে নিয়ে এসেছেন এবং কাফিলার লোকদেরকে এই অঞ্চল কূপে প্রেরণ করেছেন। সাধারণ মানুষ যেসব ঘটনাকে আকস্মিক ব্যাপারধীন মনে করে, সেগুলোর অবস্থা ও তত্ত্বপ। দার্শনিকরা এগুলোর দৈবধীন ঘটনা আখ্যা দিয়ে থাকে। বলা বাহুল্য, এটা প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টিজগতের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জ্ঞাতার পরিচায়ক। নতুবা সৃষ্টি পরম্পরায় দৈবাৎ কোন কিছু হয় না। আল্লাহ তা'আলার অবস্থা হচ্ছে **فَعَالٌ لَّيَالِيهِ** (তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন)।

তিনি গোপন রহস্যের অধীনে এমন অবস্থা সৃষ্টি করে দেন যে, বাহ্যিক ঘটনাবলীর সাথে তার কোন সম্পর্ক বুঝা যায় না। মানুষ একেই দৈব ঘটনা মনে করে বসে।

মোট কথা, কাফিলার মালেক ইবনে সোবর নামে জনৈক ব্যক্তি সম্পর্কে কথিত আছে, তিনি এই কূপে পৌঁছলেন এবং বাজতি নিক্ষেপ করলেন। ইউসূফ (আ) সর্বশক্তিমানের সাহায্য প্রত্যক্ষ করে বাজতির রশি শক্ত করে ধরলেন। পানির পরিবর্তে বাজতির সাথে একটি সমুজ্জল মুখমণ্ডল দৃষ্টিতে ভেসে উঠল। এ মুখমণ্ডলের ভবিষ্যৎ মাহাত্ম্য থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেও উপস্থিত ক্ষেত্রেও অনুপম সৌন্দর্য ও গুণগত উৎকর্ষের নিদর্শনাবলী তার মহত্বের কম পরিচায়ক ছিল না। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে কূপের তলদেশ থেকে ভেসে উঠা এই অল্পবয়স্ক, অপরাপ ও বুদ্ধিদীপ্ত বালককে দেখে মালেক সোজাসে

চিৎকার করে উঠল : **يَا بَطْرِي هَذَا غلامٌ**—আরে, আনন্দের কথা—এ তো

বড় চমৎকার এক কিশোর বের হয়ে এসেছে ! সহীহ মুসলিমের মিরাজ রজনীর হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : আমি ইউসুফ (আ)—এর সাথে সাক্ষাতের পর দেখলাম যে, আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র বিশ্বের রূপ-সৌন্দর্যের অর্ধেক তাঁকে দান করেছেন এবং অবশিষ্ট অর্ধেক সমগ্র বিশ্বে বণ্টন করা হয়েছে ।

**وَاسْرُودَ بِمَا عَمِي**—অর্থাৎ তাকে একটি পগাঘবা মনে করে গোপন করে ফেলল ।

উদ্দেশ্য এই যে, শুরুতে তো মালেক ইবনে দৌবর এ কিশোরকে দেখে অর্থাৎ বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠল কিন্তু পরে চিন্তা-ভাবনা করে স্থির করল যে, এটা জানাজানি না হওয়া উচিত এবং গোপন করে ফেলা দরকার, যাতে একে বিক্রি করে প্রচুর অর্থ আদায় করা যায় । সমগ্র কাফিলার মধ্যে এ বিষয় জানাজানি হয়ে গেলে সবাই এতে অংশীদার হয়ে যাবে ।

এরূপ অর্থও হতে পারে যে, ইউসুফ (আ)—এর ভ্রাতারা বাস্তব ঘটনা গোপন করে তাকে পগাঘবা করে নিল, স্বয়ং কোন কোন রেওয়াজেতে আছে যে, ইয়াহুদী প্রত্যহ ইউসুফ (আ)—কে কুপের মধ্যে খানা পৌঁছানোর জন্য যেতো । তৃতীয় দিন তাকে কুপের মধ্যে না পেয়ে সে ফিরে এসে ভাইদের কাছে ঘটনা বর্ণনা করল । অতঃপর সব ভাই একত্রে সেখানে পৌঁছল এবং অনেক খোঁজাখুঁজির পর কাফিলার লোকদের কাছ থেকে ইউসুফকে বের করল । তখন তারা বলল : এই ছেলেরি আমাদের গোলাম । পলায়ন করে এখানে এসেছে । তোমরা একে কসজায় নিয়ে খুব খারাপ কাজ করেছে । একথা শুনে মালেক ইবনে দৌবর ও তার সঙ্গীরা ভীত হয়ে গেল যে, তাদেরকে চোর সাব্যস্ত করা হবে । তাই ভাইদের সাথে তাকে ক্রয় করার ব্যাপারে কথাবার্তা বলতে লাগল ।

এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ এই হবে যে, ইউসুফ ভ্রাতারা নিজেরাই ইউসুফকে পগাঘবা স্থির করে বিক্রি করে দিল ।

**وَاللَّهُ عَلَيْهِم بِمَا يَعْمَلُونَ**—অর্থাৎ তাদের সব কর্মকাণ্ড আল্লাহ্ তা'আলার

জানা ছিল ।

উদ্দেশ্য এই যে, ইউসুফ ভ্রাতারা কি করবে এবং তাদের কাছ থেকে ক্রেতা কাফিলা কি করবে—সব আল্লাহ্ তা'আলার জানা ছিল । তিনি তাদের সব পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দেওয়ারও শক্তি রাখতেন । কিন্তু বিশেষ কোন রহস্যের কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা এসব পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করেন নি বরং নিজস্ব পথে চলতে দিয়েছেন ।

ইবনে কাসীর বলেন : এ বাক্যে রসূলুল্লাহ্ (সা)—র জন্যও নির্দেশ রয়েছে যে, আপনায় কণ্ডম আপনার সাথে যা কিছু করছে অথবা করবে, তা সবই আমার জান ও শক্তির আওতাধীন রয়েছে । আমি ইচ্ছা করলে মুহূর্তের মধ্যে সব বানচাল করে দিতে



وَكُنَّا نَحْنُ الْمُحْسِنِينَ ۝ وَرَأَوُوهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ  
وَعَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْبْ لَكَ، قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّ رَبِّي  
أَحْسَنُ مَثْوَىٰ إِنَّهُ لَا يَفْلِحُ الظَّالِمُونَ ۝

(২৬) মিসরে যে ব্যক্তি তাকে ক্রয় করল, সে তার স্ত্রীকে বলল : একে সম্মানে রাখ। সম্ভবত সে আমাদের কাজে আসবে অথবা আমরা তাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করে নেব। এমনিভাবে আমি ইউসুফকে এদেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম এবং এ জন্য যে তাকে বাক্যদির পূর্ণ মর্ম অনুধাবনের পদ্ধতি বিষয়ে শিক্ষা দেই। আলাহ নিজ কাজে প্রবল থাকেন কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না। (২২) যখন সে পূর্ণ বয়সে পৌঁছে গেল, তখন তাকে প্রজ্ঞা ও ব্যুৎপত্তি দান করলাম। এমনিভাবে আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে প্রতিদান দেই। (২৩) আর সে যে মহিলার ঘরে ছিল, ঐ মহিলা তাকে ফুসলিতে লাগল এবং দরজাসমূহ বন্ধ করে দিল। সে মহিলা বলল : ওন! তোমাকে বলছি, এদিকে আস! সে বলল : আলাহ রক্ষা করুন, তোমার স্বামী আমার মালিক। তিনি আমাকে সম্বন্ধে থাকতে দিয়েছেন। নিশ্চয় সীমা লংঘনকারিগণ সফল হয় না।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(কান্নার লোকেরা ইউসুফকে ভাইদের কাছ থেকে ক্রয় করে মিসরে নিয়ে গেল এবং 'আজীজে মিসরের' হাতে বিক্রয় করে দিল)। আর যে ব্যক্তি মিসরে তাকে ক্রয় করল (অর্থাৎ আজীজ), সে (তাকে গৃহে এনে স্ত্রীর হাতে সোপর্দ করল এবং) স্ত্রীকে বলল : তাকে সম্বন্ধে রাখ। আশ্চর্য কি যে, সে (বড় হয়ে) আমাদের কাজে আসবে কিংবা আমরা তাকে পুত্ররূপেই গ্রহণ করে নেব। (কথিত আছে যে, তাদের সন্তান-সম্পত্তি ছিল না তাই এ কথা বলেছিল)। আমি (যেভাবে ইউসুফকে বিশেষ রূপায় অল্প কৃপ থেকে মুক্তি দিয়েছি) তেমনিভাবে ইউসুফকে এ দেশে (মিসরে) প্রতিষ্ঠিত করেছি (অর্থাৎ রাজত্ব দিয়েছি) এবং (এ মুক্তিদান এ উদ্দেশ্যেও ছিল) স্বাভাবিক আশ্রয় থেকে ব্যাখ্যা শিক্ষা দেই। (উদ্দেশ্য এই যে, মুক্তিদানের লক্ষ্য ছিল তাকে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ ধনসম্পদে ধনী করা) এবং আলাহ তা'আলা স্বীয় (ঐঙ্গিত) কাজে প্রবল (ও শক্তিমান; যা ইচ্ছা, তাই করেন), কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না। [কেননা, ঈমানদার বিশ্বাসীদের সংখ্যা কম। এ বিষয়টি কাহিনীর মাঝখানে 'অসম্পর্কশীল' বাক্য হিসাবে আনা হয়েছে। কারণ, ইউসুফ (আ)-এর বর্তমান অবস্থা অর্থাৎ ক্রীতদাস হয়ে থাকা বাহ্যিক উত্তম অবস্থা ছিল না। কিন্তু আলাহ তা'আলা বলেন যে, এ অবস্থাটি ক্ষণস্থায়ী এবং অন্য একটি অবস্থার উপায় ও অবলম্বন মাত্র। তাকে উচ্চস্থান দান করাই আসল লক্ষ্য। আজীজে মিসর ও তার গৃহে লালিত-পালিত হওয়াকে এর উপায় করা হয়েছে।

কেননা, উচ্চপদস্থ লোকদের ঘরে লালিত-পালিত হলে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা বাড়ে এবং রাজকীয় বিষয়াদির জ্ঞান জন্মে। এ বিষয়বস্তুরই অবশিষ্টাংশ পরবর্তী বাক্যে বর্ণিত হয়েছে : ] এবং যখন সে যৌবনে (অর্থাৎ পরিণত বয়স অথবা ডরা যৌবনে) পদার্পণ করল, তখন আমি তাকে প্রজ্ঞা ও ব্যুৎপত্তি দান করলাম [এর অর্থ নবুয়তের জ্ঞান দান করা। কূপে নিষ্কিন্ত হওয়ার সময় তাঁর কাছে যে ওহী প্রেরণের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, তা নবুয়তের ওহী ছিল না বরং সেটা ছিল মুসা (আ)-র জননীর কাছে প্রেরিত ওহীর অনুরূপ]। এবং আমি সৎকর্মশীলদেরকে এমনিভাবে প্রতিদান দিয়ে থাকি। [ইউসুফ (আ)-এর প্রতি অপবাদ আরোপের যে কাহিনী পরবর্তীতে বর্ণনা করা হবে, তার পূর্বে এ বাক্যগুলোতে বলে দেওয়া হয়েছে যে, তা নিছক মিথ্যা ও অপপ্রচার হবে। কারণ, যাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রজ্ঞা ও ব্যুৎপত্তি দান করা হয়, তার দ্বারা এ ধরনের কোন দুর্কর্ম অনুষ্ঠিত হতেই পারে না। অতঃপর এ অপবাদ আরোপের কাহিনী উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, ইউসুফ (আ) আজীজে মিসরের গৃহে সুখে-শান্তিতে বাস করতে লাগলেন] এবং (ইতিমধ্যেই এ পরীক্ষার সম্মুখীন হলেন যে) যে মহিলার গৃহে ইউসুফ (আ) বাস করতেন, সে (তার প্রতি প্রেমাসক্ত হয়ে পড়ল এবং) তার সাথে স্বীয় কুবাসনা চরিতার্থ করার জন্য ফুসলাতে লাগল এবং (গৃহের) সব দরজা বন্ধ করে দিল এবং (তাঁকে) বলতে লাগল : এদিকে এসো, তোমাকেই বলছি। ইউসুফ (আ) বললেন : (প্রথমত এটা একটা মহাপাপ) আল্লাহ রক্ষা করুন, (দ্বিতীয়ত) তিনি (অর্থাৎ তোমার স্বামী) আমার লালন-পালনকারী (ও অনুগ্রহকারী)। তিনি আমার বসবাসের সুবন্দোবস্ত করেছেন। (অতএব আমি কি করে তাঁর সত্ৰম নষ্ট করব?) নিশ্চয় অকৃতজ্ঞতা সফলতা অর্জন করতে পারে না। (বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুনিয়াতেই তারা লালিত ও অপমানিত হয়। পরন্তু পরকালের শাস্তি তো নিশ্চিতই)।

### আনুষ্ঠানিক জাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ইউসুফ (আ)-এর প্রাথমিক জীবন-বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ কাফিলার লোকেরা যখন তাঁকে কূপ থেকে উদ্ধার করল, তখন ভ্রাতারা তাঁকে নিজেদের পলাতক ক্রীতদাস আখ্যা দিয়ে গুটিকতক দিরহামের বিনিময়ে তাঁকে বিক্রি করে দিল। প্রথমত এ কারণে যে, তারা এ মহাপুরুষের সঠিক মূল্য সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল। দ্বিতীয়ত তাদের আসল লক্ষ্য তাঁর দ্বারা টাকা-পয়সা উপার্জন করা ছিল না, বরং পিতার কাছ থেকে তাঁকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়াই ছিল মূল লক্ষ্য। তাই শুধু বিক্রি করে দিয়েই তারা ক্ষান্ত হয়নি বরং তারা আশঙ্কা করছিল যে, কাফিলার লোকেরা তাঁকে এখানেই ছেড়ে রাবে এবং অতঃপর সে কোন রকমে পিতার কাছে পৌঁছে আপাগোড়া চক্রান্ত ফাঁস করে দেবে। তাই তফসীরবিদ মুজাহিদেয় বর্ণনা অনুযায়ী, তারা কাফিলা রওয়ানা হয়ে যাওয়া পর্যন্ত সেখানেই অপেক্ষা করল। যখন কাফিলা রওয়ানা হয়ে গেল, তখন তারা কিছু দূর পর্যন্ত কাফিলার পেছনে পেছনে গেল এবং তাদেরকে বলল : দেখ, এর পলায়নের অভ্যাস রয়েছে। একে মুক্ত ছেড়ে দিলো না বরং বেঁধে রাখ। এ

অমূল্য নিধির মূল্য ও মর্যাদা সম্পর্কে অজ্ঞ কাফিলার লোকেরা তাঁকে এমনিভাবে মিসরে নিয়ে গেল।—(ইবনে কাসীর)

এর পরবর্তী ঘটনা আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত রয়েছে। কোরআনের নিজস্ব সংক্ষিপ্তকরণ পদ্ধতি অনুযায়ী কাহিনীর স্বতন্ত্র অংশ আপনা-আপনি বুঝা যায়, তার বেশী উল্লেখ করা প্রয়োজনীয় মনে করা হয়নি; উদাহরণত কাফিলার বিভিন্ন মনসিল অভিক্রম করে মিসর পর্যন্ত পৌঁছা, সেখানে পৌঁছে ইউসুফ (আ)-কে বিক্রি করে দেওয়া ইত্যাদি। এগুলো ছেড়ে দিয়ে অতঃপর বলা হয়েছে :

وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِمِثْرًا أَكْرَمِي مَثْوَاهُ

ইউসুফ (আ)-কে মিসরে ক্রয় করল, সে তার স্ত্রীকে বলল : ইউসুফের বসবাসের সুবন্দোবস্ত কর।

তফসীর কুরতুবীতে বলা হয়েছে : কাফিলার লোকেরা তাঁকে মিসর নিয়ে হাওয়ান পর বিক্রয়ের কথা ঘোষণা করতেই ক্রেতার প্রতিযোগিতামূলকভাবে দাম বলতে লাগল। শেষ পর্যন্ত ইউসুফ (আ)-এর ওজনের সমান স্বর্ণ, সমপরিমাণ মুগনাড়ি এবং সমপরিমাণ রেশমী বস্ত্র দাম সর্বাস্ত্র হয়ে গেল।

আল্লাহ তা'আলা এর পর আজীজে মিসরের জন্য অবধারিত করেছিলেন। তিনি বিনিময়ে উল্লিখিত দ্রব্যসামগ্রী দিয়ে ইউসুফ (আ)-কে ক্রয় করে নিলেন।

কোরআনের পূর্ববর্তী বক্তব্য থেকে জানা গেছে যে, এগুলো কোন দৈবাৎ ঘটনা নয় বরং বিশ্ব পালাকের রচিত অষ্টটি ব্যবস্থাপনার অংশমাত্র। তিনি মিসরে ইউসুফ (আ)-কে ক্রয় করার জন্য এ দেশের সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তিকে মনোনীত করেছিলেন। ইবনে কাসীর বলেন : যে ব্যক্তি ইউসুফ (আ)-কে ক্রয় করেছিলেন, তিনি ছিলেন মিসরের অর্থমন্ত্রী। তাঁর নাম 'কিতফীর' কিংবা 'ইতফীর' বলা হয়ে থাকে। তখন মিসরের সম্রাট ছিলেন আমালেকা জাতির জনৈক ব্যক্তি 'রাইয়ান ইবনে ওসায়দ'। তিনি পরবর্তীকালে ইউসুফ (আ)-এর হাতে মুসলমান হয়েছিলেন এবং তাঁরই জীবদ্দশায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন।—(মাযহারী) ক্রেতা আজীজে মিসরের স্ত্রীর নাম ছিল 'রাইল' কিংবা 'জুলায়খা'। আজীজে মিসর 'কিতফীর' ইউসুফ (আ) সম্পর্কে স্ত্রীকে নির্দেশ দিলেন : তাঁকে বসবাসের উত্তম জায়গা দাও—স্বীকৃতিস্বত্ব মত রাখো না এবং তার প্রয়োজনাদির সুবন্দোবস্ত কর।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা) বলেন : দুনিয়াতে তিন ব্যক্তি অত্যন্ত বিচক্ষণ এবং চেহারা দেখে শুভাশুভ নিরূপণকারী প্রমাণিত হয়েছেন। প্রথম, আজীজে মিসর। তিনি স্বীয় নিরূপণ শক্তি দ্বারা ইউসুফ (আ)-এর গুণাবলী অবহিত করে স্ত্রীকে উপরোক্ত নির্দেশ দিয়েছিলেন। দ্বিতীয়, হযরত শো'আব (আ)-এর ঐ কন্যা,

يَا بَتِ اسْتَأْجِرِي أَنْ خَيْرَ مِنِّي

যে মুসা (আ) সম্পর্কে পিতাকে বজ্ঞেছিল :

سَأْتَا جِرَاتِ الْقُرَى الْأَمِينِ —পিতঃ, 'তাকে চাকর রেখে দিন। কেননা উত্তম

চাকর ঐ ব্যক্তি, যে সবল, সূঠাম ও বিশ্বস্ত হয়।' তৃতীয়, হযরত আবুবকর সিদ্দীক, যিনি ফারাকে আমম (রা)-কে পরবর্তী খলীফা মনোনীত করেছিলেন।—(ইবনে কাসীর)

وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُؤَسِّفَ فِي الْأَرْضِ —অর্থাৎ এমনিভাবে আমি ইউসুফকে

সে দেশে প্রতিষ্ঠা দান করলাম। এতে ভবিষ্যৎ ঘটনার সুসংবাদ রয়েছে যে, যে ইউসুফ এখন ক্রীতদাসের বেশে আজীজে মিসরের গৃহে প্রবেশ করেছে, অতি সত্বর সে মিসরের সর্ব-প্রধান ব্যক্তি হবে এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করবে।

عَطْفًا كَيْ وَوَلْنَعْلَمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ —এখানে শুরুতে

অর্থে নিজে এ অর্থেরই একটি বাক্য উহা মেনে নেওয়া হবে। অর্থাৎ আমি ইউসুফ (আ)-কে রাজত্ব দান করেছি, যাতে সে পৃথিবীতে ন্যায় ও সুবিচারের মাধ্যমে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করে এ দেশবাসীর সুখ ও সমৃদ্ধির ব্যবস্থা করতে পারে এবং তাকে আমি বাক্য-দির পরিপূর্ণ মর্ম অনুধাবনের পদ্ধতি শিক্ষা দেই। উপরোক্ত কথাটি ব্যাপক অর্থবহ। ওহী মখাম্বাথ হাদয়সম করা, তাকে বাস্তবে রূপায়িত করা, স্বাভাবিক জরুরী জ্ঞান অর্জিত হওয়া, স্বপ্নের বিগুঞ্জ ব্যাখ্যা ইত্যাদি সবই এর অন্তর্ভুক্ত।

وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ —অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কর্মে প্রবল ও শক্তিমান।

স্বাভাবিক বাহ্যিক কারণ তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী সংঘটিত হয়। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সা) বলেনঃ যখন আল্লাহ তা'আলা কোন কাজ করার ইচ্ছা করেন, তখন দুনিয়ার সব উপ-করণ তাঁর জন্য প্রস্তুত করে দেন।

وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ —কিন্তু অধিকাংশ লোক এ সত্য বুঝে না।

তাঁরা বাহ্যিক উপকরণাদিকেই সব কিছু মনে করে এগুলোর চিন্তায় ব্যাপৃত থাকে এবং উপ-করণ সৃষ্টিকারী ও সর্বশক্তিমানের কথা ভুলে যায়।

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا —অর্থাৎ যখন ইউসুফ (আ) পূর্ণ শক্তি

ও যৌবনে পদার্পণ করলেন, তখন আমি তাকে প্রজ্ঞা ও ব্যুৎপত্তি দান করলাম।

'শক্তি ও যৌবন' কোন বয়সে অর্জিত হয়, এ সম্পর্কে তফসীরবিদগণের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, কাতাদাহ (রা) বলেনঃ তখন বয়স ছিল তেরিশ বছর। সাহহাক বিশ বছর এবং হাসান বসরী তেরিশ বছর বর্ণনা করেছেন।



তবে এ বিষয়ে সবাই একমত যে, প্রজা ও ব্যুৎপত্তি দান করার অর্থ এখানে নবুয়ত দান করা। এতে আরও জানা গেল যে, ইউসুফ (আ) মিসর পৌঁছানোর অনেক পরে নবুয়ত লাভ করেছিলেন। কূপের গভীরে যে ওহী তার কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল, তা নবুয়তের ওহী ছিল না বরং আভিধানিক 'ওহী' ছিল, যা পয়গম্বর নব্ব—এমন ব্যক্তির কাছেও প্রেরণ করা যায়; যেমন মুসা (আ)-র জননী এবং হযরত ঈসা (আ)-র মাতা মরিয়ম সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে।

كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ—আমি সৎকর্মশীলদেরকে এমনভাবে প্রতিদান

দিয়ে থাকি। উদ্দেশ্য এই যে, নিশ্চিত ধ্বংসের কবল থেকে মুক্তি দিয়ে রাজত্ব ও সম্মান পর্যন্ত পৌঁছানো ছিল ইউসুফ (আ)-এর সদাচরণ, আল্লাহ্ ভীতি ও সৎ কর্মের পরিণতি। এটা শুধু তাঁরই বৈশিষ্ট্য নয়, যে কেউ এমন সৎকর্ম করবে, সে এমনভাবে আমার পুরস্কার লাভ করবে।

وَأرَادَتْ الَّتِي هَرَفْنَا بَيْتَهَا عَنْ نَفْسِهَا وَغَلَقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ

অর্থাৎ যে মহিলার গৃহে ইউসুফ (আ) থাকতেন, সে তাঁর প্রতি প্রেমাসক্ত হয়ে পড়ল এবং তাঁর সাথে কুবাসনা চরিতার্থ করার জন্য তাঁকে ফুসলাতে লাগল। সে গৃহের সব দরজা বন্ধ করে দিল এবং তাঁকে বলল : শীগ্ধ এসে যাও, তোমাকেই বলছি।

প্রথম আয়াতে জানা গিয়েছিল যে, এ মহিলা ছিল আজীজে মিসরের স্ত্রী। কিন্তু এ স্থলে কোরআন 'আজীজ-পত্নী' এই সংক্ষিপ্ত শব্দ ছেড়ে 'যার গৃহে সে ছিল' এ শব্দ ব্যবহার করেছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ইউসুফ (আ)-এর গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকা এ কারণে আরও অধিক কঠিন ছিল যে, তিনি তারই গৃহে—তারই আশ্রয়ে থাকতেন। তার আদেশ উপেক্ষা করা তাঁর পক্ষে সহজসাধ্য ছিল না।

গোনাহ্ থেকে বাঁচার প্রধান অবলম্বন স্বয়ং আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা : এর বাহ্যিক কারণ ঘটে এই যে, ইউসুফ (আ) স্বখন নিজেকে চতুর্দিক থেকে বেষ্টিত দেখলেন, তখন পয়গম্বরসুলভ ভঙ্গিতে সর্বপ্রথম আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করলেন।

قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ

তিনি শুধু নিজ ইচ্ছা ও সংকল্পের ওপর ভরসা করেন নি। এটা

জানা কথা যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর আশ্রয় লাভ করে, তাকে কেউ বিগুহ পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারে না। অতঃপর তিনি পয়গম্বরসুলভ বিজ্ঞতা ও উপদেশ প্রয়োগ করে স্বয়ং মুলায়ম্বাকে উপদেশ দিতে লাগলেন যে, তারও উচিত আল্লাহকে ভয় করা এবং মন্দ বাসনা

থেকে বিরত থাকা। তিনি বললেন : إِنَّ رَبِّي أَحْسَنُ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يَفْلِحُ الظَّالِمُونَ

তিনি আমার পালনকর্তা। তিনি আমাকে সুখে রেখেছেন। মনে রেখো, অত্যাচারীরা কল্যাণ-প্রাপ্ত হয় না।

বাহ্যিক অর্থ এই যে, তোমার স্বামী আজীজে মিসর আমাকে লালন-পালন করেছেন, আমাকে উত্তম জায়গা দিয়েছেন। অতএব তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহকারী। আমি তাঁর ইচ্ছাতে হস্তক্ষেপ করব? এটা জঘন্য অন্যায় অথচ অন্যায়রা কখনও কল্যাণ-প্রাপ্ত হয় না। এভাবে তিনি যেন স্বয়ং যুলায়খাকেও এ শিক্ষা দিলেন যে, আমি কয়েক-দিন লালন-পালনের কৃতজ্ঞতা স্বখন এতটুকু স্বীকার করি, তখন তোমাকে আরও বেশী স্বীকার করা দরকার।

এখানে ইউসুফ (আ) আজীজে মিসরকে স্বীয় 'রব'—পালনকর্তা বলেছেন। অথচ এ শব্দটি আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা বৈধ নয়। কারণ, এধরনের শব্দ শিরকের ধারণা সৃষ্টিকারী এবং মুশরিকদের সাথে সাদৃশ্য সৃষ্টি করার কারণ হয়ে থাকে। এ কারণেই ইসলামী শরীয়তে এ ধরনের শব্দ ব্যবহার করাও নিষিদ্ধ। সহীহ মুসলিমের হাদীসে রয়েছে, কোন দাস স্বীয় প্রভুকে 'রব' বলতে পারবে না এবং কোন প্রভু স্বীয় দাসকে 'বান্দা' বলতে পারবে না। কিন্তু এ হচ্ছে ইসলামী শরীয়তের বৈশিষ্ট্য। এতে শিরক নিষিদ্ধ করার সাথে সাথে এমন বিষয়বস্তুকেও নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যা শিরকের উপায় হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের শরীয়তে শিরককে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হলেও কারণ এবং উপায়াদির উপর কোন নিষেধাজ্ঞা ছিল না। এ কারণে পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহে চিত্রনির্মাণ নিষিদ্ধ ছিল না। কিন্তু ইসলামী শরীয়ত কিয়ামত পর্যন্ত জারি থাকবে বিধায় একে শিরক থেকে পূর্ণরূপে মুক্ত রাখার কারণে শিরকের উপায়াদি তথা চিত্র ও শিরকের ধারণা সৃষ্টিকারী শব্দাবলীও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মোটকথা, ইউসুফ (আ)-এর <sup>أَنَا رَبِّي</sup> 'তিনি আমার পালনকর্তা' বলা স্বস্থানে ঠিকই ছিল।

পক্ষান্তরে <sup>أَنَا</sup> শব্দের সর্বনামটি আল্লাহর দিকে ফিরানোও সম্ভবপর। অর্থাৎ ইউসুফ (আ) আল্লাহকেই 'রব' বলেছেন। বসবাসের উত্তম জায়গাও প্রকৃতপক্ষে তিনিই দিয়েছেন। সেমতে তাঁর অবাধ্যতা সর্বরহৎ জুলুম। এরূপ জুলুমকারী কখনও সফল হয় না।

সুদী ইবনে ইসহাক প্রমুখ তফসীরবিদ বর্ণনা করেন যে, এ নির্জনতায় যুলায়খা ইউসুফ (আ)-কে আকৃষ্ট করার জন্য তাঁর রূপ ও সৌন্দর্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে লাগল। সে বলল : তোমার মাথার চুল কত সুন্দর! ইউসুফ (আ) বললেন : মৃত্যুর পর এই চুল সর্বপ্রথম আমার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। এরপর যুলায়খা বলল : তোমার নেত্রদ্বয় কতই না মনোহর! ইউসুফ (আ) বললেন : মৃত্যুর পর এগুলো পানি হয়ে আমার মুখমণ্ডলে প্রবাহিত হবে। যুলায়খা আরও বলল : তোমার মুখমণ্ডল কতই না কমনীয়! ইউসুফ (আ) বললেন : এগুলো সব মৃত্তিকার খোরাক। আল্লাহ তা'আলা তাঁর মনে পরকালের চিন্তা এত বেশী প্রবল করে দেন যে, ডরা যৌবনেও জগতের খাবতীয় ভোগবিলাস তাঁর দৃষ্টিতে তুচ্ছ হয়ে যায়। সত্য বলতে কি পরকালের চিন্তাই মানুষকে সর্বত্র সব অনিষ্ট থেকে নিলিপ্ত রাখতে পারে।

اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا آيَاتَهُ

وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ ۖ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا اَنْ رَّا بُرْهَانَ رَبِّهٖ ۚ كَذٰلِكَ  
لِنَصْرِفَ عَنْهٗ السُّوْءَ وَالْفَحْشَآءَ ۗ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْخٰلَصِيْنَ ﴿۷۷﴾

(২৪) নিশ্চয় মহিলা তার বিষয়ে চিন্তা করেছিল এবং সেও মহিলার বিষয়ে চিন্তা করত। যদি না সে স্বীয় পালনকর্তার মহিমা অবলোকন করত। এমনভাবে হয়েছে, যাতে আমি তার কাছ থেকে মন্দ বিষয় ও নির্লজ্জ বিষয় সরিয়ে দেই। নিশ্চয় সে আমার মনোনীত বান্দাদের একজন।

#### তক্ষসীরের সার-সংক্ষেপ

এ মহিলার অন্তরে তাঁর কল্পনা (দৃঢ় সংকল্পরূপে) প্রতিষ্ঠিতই হচ্ছিল এবং তাঁর মনেও এ মহিলার কিছু কিছু কল্পনা (স্বাভাবিক পর্যায়ে) হতে স্বাচ্ছন্দ্য হচ্ছিল। (যা ইচ্ছার বাইরে, যেমন গ্রীষ্মকালের রোষায় পানির প্রতি স্বাভাবিক ঘোঁক হয়, যদিও রোষা উজ্জ্বল করার সামান্যতম ইচ্ছাও মনে জাগে না) যদি স্বীয় পালনকর্তার নিদর্শন (অর্থাৎ এ কর্ম যে গোনাহ্, তার প্রমাণ—যা শরীয়তের নির্দেশ) প্রত্যক্ষ না করত, (অর্থাৎ শরীয়তের জ্ঞান ও কর্মপ্রেরণা যদি তার অজিত না থাকত) তবে কল্পনা বদ্ধমূল হওয়া অশির্ঘ্য ছিল না। (কেননা, এর শক্তিশালী কারণ ও উপকরণ উপস্থিত ছিল কিন্তু) আমি এমনিভাবে তাঁকে জ্ঞান দান করেছি, যাতে আমি তাঁর কাছ থেকে সগীরা ও কবীরা গোনাহ্-সমূহকে দূরে সরিয়ে রাখি (অর্থাৎ ইচ্ছা ও কর্ম উভয় বিষয় থেকে রক্ষা করেছি; কেননা,) সে ছিল আমার মনোনীত বান্দাদের অন্যতম।

#### আনুমানিক জাতক-বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতে ইউসূফ (আ)-এর বিরাট পরীক্ষা উল্লেখ করে বলা হয়েছিল যে, আজীজে মিসরের স্ত্রী যুলায়খা গৃহের দরজা বন্ধ করে তাকে পাপকাজের দিকে আহ্বান করতে সচেষ্ট হল এবং নিজের প্রতি আকুলত ও প্ররত্ত করার সব উপকরণ উপস্থিত করে দিল কিন্তু ইশ্বতের মালিক আল্লাহ্ এ সব যুবককে এহেন অগ্নিপরীক্ষায় দৃঢ়পদ রাখলেন। এর আরও বিবরণ আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, যুলায়খা তো পাপকাজের কল্পনায় বিভোরই ছিল, ইউসূফ (আ)-এর মনেও মানবিক স্বভাববশত কিছু কিছু অনিচ্ছাকৃত ঘোঁক সৃষ্টি হতে স্বাচ্ছন্দ্য হচ্ছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা ঠিক সেই মুহূর্তে স্বীয় যুক্তি প্রমাণ ইউসূফ (আ)-এর সামনে তুলে ধরেন, যদ্বন্দ্বন সেই অনিচ্ছাকৃত ঘোঁক ক্রমবধিত হওয়ার পরিবার্তে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হয়ে পেল এবং তিনি মহিলার নাগপাশ ছিন্ন করে উর্ধ্বস্থানে ছুটতে লাগলেন

এ আয়াতে <sup>৩-</sup> هِم শব্দটি (কল্পনা অর্থে) যুলায়খা ও ইউসুফ (আ) উভয়ের প্রতি সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে। বলা হয়েছে : **وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهٖ وَهَمَّ بِهَا** একথা সুনি-

শ্চিত যে, যুলায়খার কল্পনা ছিল পাপকাজের কল্পনা। এতে ইউসুফ (আ) সম্পর্কেও এ ধরনের ধারণা হতে পারত। অথচ মুসলিম সম্প্রদায়ের সর্বসম্মত অডিমত অনুসারী এটা নব্বুয়ত ও রিসালতের পরিপন্থী। কেননা, সকল মুসলিম মনীষীই এ বিষয়ে একমত যে, পয়গম্বরগণ সর্বপ্রকার সঙ্গীরা ও কবীরা গোনাহ্ থেকে পবিত্র থাকেন। তাঁদের দ্বারা কবীরা গোনাহ্ ইচ্ছা, অনিচ্ছা বা ভুলবশত কোনরূপেই হতে পারে না। তবে সঙ্গীরা গোনাহ্ অনিচ্ছা ও ভুলবশত হয়ে যাওয়ার আশংকা আছে। কিন্তু তাঁদেরকে এর উপরও সক্রিয় থাকতে দেওয়া হয় না বরং সতর্ক করে তা থেকে সরিয়ে আনা হয়।

পয়গম্বরগণের পবিত্রতার এ বিষয়টি কোরআন ও সুন্নাহ্ দ্বারা প্রমাণিত হওয়া ছাড়াও তাঁদের যোগ্যতার প্রমাণও জরুরী। কেননা, যদি পয়গম্বরগণের দ্বারা গোনাহ্ সংঘটিত হওয়ার আশংকা থাকে, তবে তাঁদের আনীত ধর্ম ও ওহীর প্রতি আস্থার কোন উপায় থাকে না এবং তাঁদেরকে প্রেরণ ও তাঁদের প্রতি গ্রহ অবতারণার কোন উপকারিতাও অবশিষ্ট থাকে না। একারণেই আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক পয়গম্বরকেই গোনাহ্ থেকে পবিত্র রেখেছেন।

তাই, সাধারণভাবে এ ব্যাপারে সুনিশ্চিত ও নিঃসন্দেহ হওয়া গেছে যে, ইউসুফ (আ)-এর মনে যে কল্পনা ছিল তা পাপ পর্যায়ের ছিল না। এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা এই যে,

আরবী ভাষায় <sup>৩-</sup> هِم শব্দটি দু'অর্থে ব্যবহৃত হয়। এক. কোন কাজের ইচ্ছা ও সংকল্প করে ফেলা। দুই. শুধু অন্তরে ধারণা ও অনিচ্ছাকৃত ভাব উদয় হওয়া। প্রথমেই প্রকারটি পাপের অন্তর্ভুক্ত এবং শাস্তিযোগ্য। হ্যাঁ, যদি ইচ্ছা ও সংকল্পের পর একমাত্র অ'ল্লাহ্‌র ডয়ে কেউ এ গোনাহ্ স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে, তবে হাদীসে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা এ গোনাহ্‌র পরিবর্তে তার আমলনামায় একটি পুণ্য লিপিবদ্ধ করে দেন। দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ শুধু অন্তরে ধারণা ও অনিচ্ছাকৃত ভাব উদয় হওয়া এবং তা কার্যে পরিণত করার ইচ্ছা মোটেই না থাকা। যেমন, প্রীমকাজীন রোমায় পানির দিকে স্বাভাবিক ও অনিচ্ছাকৃত ঝোক প্রায় সবারই জাগ্রত হয় অথচ রোমা অবস্থা হওয়ার ফলে তা পান করার ইচ্ছা মোটেই জাগ্রত হয় না। এই প্রকার কল্পনা মানুষের ইচ্ছাধীন নয় এবং এ জন্য কোন শাস্তি বা গোনাহ্ নেই।

সহীহ্ বুখারীর হাদীসে আছে, রসূলুল্লাহ (স), বলেন : আল্লাহ্ তা'আলা আমার উম্মতের এমন পাপচিন্তা ও কল্পনা ক্ষমা করে দিয়েছেন, যা সে কার্যে পরিণত করে না।—(কুরতুবী)

বুখারী ও মুসলিমে আবু হুরায়রা (রা)-র রেওয়াজেতে রসুলুল্লাহ্ (সা)-র উক্তি বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে বলেন : আমার বান্দা যখন কোন সৎ কাজের ইচ্ছা করে, তখন শুধু ইচ্ছার কারণে তার আমলনামায় একটি নেকী লিখে দাও। যদি সে সৎ কাজটি সম্পন্ন করে, তবে দশটি নেকী লিপিবদ্ধ কর। পক্ষান্তরে যদি কোন পাপকাজের ইচ্ছা করে, অতঃপর আল্লাহ্‌র উয়ে তা পরিত্যাগ করে, তখন পাপের পরিবর্তে তার আমলনামায় একটি নেকী লিখে দাও এবং যদি পাপ কাজটি করেই ফেলে, তবে একটি গোনাহ্‌ই লিপিবদ্ধ কর। —(ইবনে কাসীর)

তফসীর কুরতুবীতে উপরোক্ত দু'অর্থে <sup>قَسَمَ</sup> শব্দের ব্যবহার প্রমাণিত করা হয়েছে এবং এর সমর্থনে আরবদের প্রচলিত বাকপদ্ধতি ও কবিতার সাক্ষ্য বর্ণনা হয়েছে।

এতে বুঝা গেল যে, আয়াতে যদিও <sup>قَسَمَ</sup> শব্দটিকে মূল্যমখা ও ইউসুফ (আ) উভয়ের প্রতি সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে, তবুও উভয়ের <sup>قَسَمَ</sup> অর্থাৎ কল্পনার মধ্যে ছিল বিরাট পার্থক্য। প্রথমটি গোনাহ্‌র অন্তর্ভুক্ত এবং দ্বিতীয়টি অনিচ্ছাকৃত ধারণা, যা গোনাহ্‌র অন্তর্ভুক্ত নয়। কোরআনের বর্ণনাভঙ্গিও এ দাবীর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। কেননা, উভয়ের কল্পনা যদি একই প্রকার হত, তবে এ ক্ষেত্রে <sup>قَسَمَ</sup> তথা দ্বিবাচক পদ ব্যবহার করে <sup>وَلَقَدْ هَمَّتْ</sup> বলা হত, যা সংক্ষিপ্ত ছিল। কিন্তু এটা ছেড়ে উভয়ের কল্পনা পৃথক পৃথক বর্ণনা করে <sup>هَمَّتْ بِهَا وَهَمَّتْ بِهَا</sup> বলা হয়েছে। মূল্যমখার কল্পনার সাথে তাকিদের শব্দ <sup>لَقَدْ</sup> যোগ করা হয়েছে এবং ইউসুফ (আ)-এর <sup>قَسَمَ</sup> ও কল্পনার সাথে তা যোগ করা হয়নি। এতে বুঝা যায় যে, এ বিশেষ শব্দটির মাধ্যমে একথাই বুঝানো উদ্দেশ্য যে, মূল্যমখার কল্পনা এবং ইউসুফ (আ)-এর কল্পনা ছিল ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির।

সহীহ মুসলিমের হাদীসে বলা হয়েছে : যখন ইউসুফ (আ) এ পরীক্ষার সম্মুখীন হন, তখন ফেরেশতার আল্লাহ্ তা'আলার সমীপে আরম্ভ করল : আপনার এ খাঁটি বান্দা পাপচিন্তা করছে অথচ সে এর কুপরিণাম সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত আছে। আল্লাহ্ তা'আলা বললেন : অপেক্ষা কর। যদি সে এ গোনাহ্‌ করে ফেলে, তবে মেরুপ কাজ করে, তদ্রূপই তার আমলনামায় লিখে দাও ; আর যদি সে বিরত থাকে, তবে পাপের পরিবর্তে তার আমলনামায় নেকী লিপিবদ্ধ কর। কেননা, সে একমাত্র আমার উয়ে স্বীয় খাৎশে পরিত্যাগ করেছে। এটা খুব বড় নেকী।—(কুরতুবী)

মোটকথা এই যে, ইউসুফ (আ)-এর অন্তরে যে কল্পনা অথবা বৌক স্থষ্টি হয়েছিল, তা নিছক অনিচ্ছাকৃত ধারণার পর্যায়ে ছিল। এটা গোনাহ্‌র অন্তর্ভুক্ত নয়। অতঃপর এ ধারণার বিপক্ষে কাজ করার দরুন আল্লাহ্ তা'আলার কাছে তাঁর মর্ষাদা আরও বেড়ে গেছে।

কোন কোন তফসীরবিদ এ স্থলে একথাও বলেছেন যে, আয়াতের বাক্যাংশ অপ্র-পশ্চাৎ হয়েছে।

لَوْلَا أَنْ رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ — অংশটি পরে উল্লেখ করা হলেও তা আসলে

অগ্র রয়েছে। অতএব আয়াতের অর্থ এই যে, ইউসুফ (আ)-এর মনেও কল্পনা সৃষ্টি হত, যদি তিনি আল্লাহর প্রমাণ অবলোকন না করতেন। কিন্তু পালনকর্তার প্রমাণ অবলোকন করার কারণে তিনি এ কল্পনা থেকে বেঁচে গেলেন। এ বিষয়বস্তুটি সঠিক কিন্তু কোন কোন তফসীরবিদ এ অগ্র-পশ্চাৎকে ব্যাকরণিক ভুল আখ্যা দিয়েছেন। এদিক দিয়েও প্রথম তফসীরই অগ্রগণ্য। কারণ, এতে ইউসুফ (আ)-এর আল্লাহভীতি ও পবিত্রতার মাহাত্ম্য আরও উচ্চে চলে যায়। কেননা, তিনি স্বাভাবিক ও মানবিক বোঁক সত্ত্বেও গোনাহ থেকে মুক্ত থাকতে সক্ষম হয়েছিলেন।

পরবর্তী বাক্য হচ্ছে لَوْلَا أَنْ رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ — এখানে এর جزء উহ্য

রয়েছে। অর্থ এই যে, যদি তিনি পালনকর্তার প্রমাণ অবলোকন না করতেন, তবে এ কল্পনাতেই লিপ্ত থাকতেন। পালনকর্তার প্রমাণ দেখে নেওয়ার কারণে অনিচ্ছাকৃত কল্পনা ও ধারণাও অন্তর থেকে দূর হয়ে গেল।

স্বীয় পালনকর্তার যে প্রমাণ ইউসুফ (আ)-এর দৃষ্টির সামনে এসেছিল, তা কি ছিল কোরআন পাক তা ব্যক্ত করেনি। এ কারণেই এ সম্পর্কে তফসীরবিদগণ নানা মত ব্যক্ত করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ, সাঈদ ইবনে জুবায়র, মুহাম্মদ ইবনে সিরীন, হাসান বসরী (র) প্রমুখ বলেছেন : আল্লাহ তা'আলা মু'জেযা হিসাবে এ নির্জন কক্ষে হযরত ইয়াকুব (আ)-এর চিত্র এভাবে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত করে দেন যে, তিনি হাতের অঙ্গুলি দাঁতে চেপে তাঁকে হুঁশিয়ার করেছেন। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন : আজীজে-মিসরের মুখচ্ছবি তাঁর সম্মুখে ফুটিয়ে তোলা হয়। কেউ বলেন : ইউসুফ (আ)-এর দৃষ্টি ছাদের দিকে উঠতেই সেখানে কোরআন পাকের এ আয়াত লিখিত দেখলেন :

لَا تَقْرُبُوا الزُّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا — অর্থাৎ ব্যাভিচারের

নিকটবর্তী হরো না। কেননা, এটা খুবই নির্লজ্জতা, (আল্লাহর শাস্তির কারণ) এবং (সমাজের জন্য) অত্যন্ত মন্দ পথ। কেউ কেউ বলেছেন : যুলায়খার গৃহে একটি মূর্তি ছিল। সে বিশেষ মহত্বটিতে যুলায়খা সেই মূর্তিটি কাপড় দ্বারা আবৃত করলে ইউসুফ (আ) এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। সে বলল : এটা আমার উপাস্য। এর সামনে গোনাহ করার মত সাহস আমার নেই। ইউসুফ (আ) বললেন : আমার উপাস্য আরও বেশী লজ্জা করার যোগ্যতাসম্পন্ন। তাঁর দৃষ্টিকে কোন পর্দা ঠেঁকাতে পারে না। কারণ ও কারণে মতে ইউসুফ (আ)-এর নবুয়ত ও বিজ্ঞানই ছিল স্বয়ং পালনকর্তার প্রমাণ।

তফসীরবিদ ইবনে কাসীর এসব উক্তি উদ্ধৃত করার পর যে মন্তব্য করেছেন, তা সব সুধীজনের কাছেই সর্বাপেক্ষা সাবলীল ও গ্রহণযোগ্য। তিনি বলেছেন : কোরআন-পাক মতটুকু বিষয় বর্ণন করেছে, ততটুকু নিয়েই ফাঙ্ক থাকা দরকার। অর্থাৎ ইউসুফ

(আ) এমন কিছু বস্তু দেখেছেন, মন্দরূপ তাঁর মন থেকে সীমানাঘন করার সামান্য ধারণাও বিদূরিত হয়ে গেছে। এ বস্তুটি কি ছিল—তফসীরবিদগণ যেসব বিষয়ের উল্লেখ করেছেন; সেগুলোর যে কোন একটাই হতে পারে। তাই নিশ্চিতরূপে কোন একটিকে নির্দিষ্ট করা সম্ভব না।—(ইবনে কাসীর)

كَذَلِكَ لِلضَّرِيفِ عَذَابُ السَّوْءِ وَالْفَحْشَاءِ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُتَّخِصِينَ

অর্থাৎ আমি ইউসুফ (আ)-কে এ প্রমাণ এজন্য দেখিয়েছি, স্বাভাবিক কাছ থেকে মন্দ কাজ ও নির্লজ্জতাকে দূরে সরিয়ে দেই। ‘মন্দ কাজ’ বলে সগীরা গোনাহ্ এবং ‘নির্লজ্জতা’ বলে কবীরা গোনাহ্ বুঝানো হয়েছে।—(মাযহারী)

এখানে একটি প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, মন্দ কাজ ও নির্লজ্জতাকে ইউসুফ (আ)-এর কাছ থেকে সরানোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং ইউসুফ (আ)-কে মন্দ কাজ ও নির্লজ্জতা থেকে সরানোর কথা বলা হয়নি। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইউসুফ (আ) নবু-য়তের কারণে এ গোনাহ্ থেকে নিজেই দূরে ছিলেন কিন্তু মন্দ কাজ নির্লজ্জতা তাঁকে আবে-ল্টন করার উপক্রম হয়েছিল। কিন্তু আমি এর জাল ছিন্ন করে দিয়েছি। কোরআন পাকের এ ভাষাও সাক্ষ্য দেয় যে, ইউসুফ (আ) কোন সামান্যতম গোনাহেও লিপ্ত হননি এবং তাঁর মনে যে কল্পনা জাগরিত হয়েছিল, তা গোনাহর অন্তর্ভুক্ত ছিল না। নতুবা এখানে এভাবে ব্যক্ত করা হত যে, আমি ইউসুফকে গোনাহ্ থেকে বাঁচিয়ে দিলাম—এভাবে বলা হত না যে, গোনাহ্কে তাঁর কাছ থেকে সরিয়ে দিলাম।

কেননা, ইউসুফ আমার মনোনীত বান্দাদের একজন। এখানে **مُتَّخِصِينَ**

শব্দটি নামের স্বর-স্রোতে **مُتَّخِصِينَ** -এর বহুবচন। এর অর্থ মনোনীত। উদ্দেশ্য এই যে, ইউসুফ (আ) আল্লাহ্ তা‘আলার ঐ সব বান্দার অন্যতম, যাঁদেরকে স্বয়ং আল্লাহ্ রিসালতের দায়িত্ব পালন ও মানবজাতির সংশোধনের জন্য মনোনীত করেছেন। এমন লোকদের চারপাশে আল্লাহর পক্ষ থেকে হিফাজতের পাহারা থাকে, স্বাভাবিকভাবে তাঁরা কোন মন্দ কাজে লিপ্ত হতে না পারেন। স্বয়ং শয়তানও তার বিরুদ্ধে একথা স্বীকার করেছে যে, আল্লাহর মনোনীত বান্দাদের ওপর তার কনাকৌশল অচল। শয়তানের উক্তি এই:

فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُتَّخِصِينَ ۝

আপনার ইচ্ছাত ও শক্তির কসম, আমি সব মানুষকে সরল পথ থেকে বিচ্যুত করব, তবে যে সব বান্দাকে আপনি মনোনীত করেছেন, তাদেরকে ছাড়া।

কোন কোন কিরা‘আতে এ শব্দটি **مُتَّخِصِينَ** নামের স্বর-স্রোতে পঠিত হয়েছে।

**مُتَّخِصِينَ**—ঐ ব্যক্তি, যে আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্য আন্তরিকতার সাথে করে—এতে কোন পাখিব ও প্রকৃতিগত উদ্দেশ্য, সুখ্যাতি ইত্যাদির প্রভাব থাকে না। এমতাবস্থায়

আল্লাহের উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তিই স্বীয় কর্ম ও ইবাদতে আন্তরিক হয়, পাপ থেকে বেঁচে থাকার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা তাকে সাহায্য করেন।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা দুটি শব্দ **فحشاء و سوء** ব্যবহার করেছেন। প্রথমটির শাস্তিক অর্থ মন্দ কাজ এবং এর দ্বারা সগীরা গোনাহ বুঝানো হয়েছে। **فحشاء** শব্দের অর্থ নির্লজ্জতা। এর দ্বারা কবীরা গোনাহ বুঝান হয়েছে। এত দ্বারা বোঝা গেল যে, আল্লাহ তা'আলা ইউসূফ (আ)-কে সগীরা ও কবীরা উভয় প্রকার গোনাহ থেকেই মুক্ত রেখেছেন।

এ থেকে আরও বোঝা গেল যে, কোরআনে ইউসূফ (আ)-এর প্রতি যে **هم** অর্থাৎ কল্পনা শব্দটিকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে, তা নিছক অনিচ্ছাকৃত ধারণার পর্যায়ে ছিল, যা কবীরা ও সগীরা কোন প্রকারের গোনাহেরই অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং মাক।

وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَالْفِيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ  
 قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ  
 أَلِيمٌ ۝ قَالَ هِيَ رَأَوْدُ نَبِيِّ عَنِ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا  
 إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قَبْلِ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ۝ وَإِنْ  
 كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَلَا بَتَّ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝ فَلَمَّا  
 رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ  
 عَظِيمٌ ۝ يُوسُفُ أَعْرَضَ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرَ لِيذُنَيْكَ ۝ إِنَّكَ  
 كُنْتَ مِنَ الْخَاطِئِينَ ۝

(২৫) তারা উভয়ে ছুটে দরজার দিকে গেল এবং মহিলা ইউসূফের জামা পেছন দিক থেকে ছিঁড়ে ফেলল। উভয়ে মহিলার স্বামীকে দরজার কাছে গেল। মহিলা বলল : যে ব্যক্তি তোমার পরিজনের সাথে কুকর্মের ইচ্ছা করে, তাকে কারাগারে পাঠানো অথবা অন্য কোন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেওয়া ছাড়া তার আর কি শাস্তি হতে পারে? (২৬) ইউসূফ (আ) বললেন : সে-ই আমাকে আত্মসংরক্ষণ না করতে ফুসলিয়েছে। মহিলার পরিবারের জনৈক সাক্ষী সাক্ষ্য দিল যে, যদি তার জামা সামনের দিক থেকে ছিন্ন থাকে, তবে মহিলা সত্যবাদিনী এবং সে মিথ্যাবাদী। (২৭) এবং যদি তার জামা পিছন দিক থেকে ছিন্ন থাকে, তবে মহিলা মিথ্যাবাদিনী এবং সে সত্যবাদী। (২৮) অতঃপর গৃহস্থানী ঘটন দেখল



যে, তার জামা পেছন দিক থেকে ছিন্ন, তখন সে বলল : নিশ্চয় এটা তোমাদের ছলনা। নিঃসন্দেহে তোমাদের ছলনা খুবই মারাত্মক। (২৯) ইউসুফ এ প্রসঙ্গ ছাড়! আর হে স্ত্রীলোক এ পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিঃসন্দেহে তুমি-ই পাপাচারিনী।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

[ যখন মহিলা আবার সীড়াপীড়ি করল, তখন ইউসুফ (আ) প্রাণপণে সেখান থেকে দৌড় দিলেন এবং সে তাকে ধরার জন্য পেছনে দৌড় দিল ] এবং তারা উভয়ে আগে পিছে দরজার দিকে দৌড় দিল এবং (দৌড় দেওয়া অবস্থায় যখন তাঁকে ধরতে চাইল, তখন) মহিলা তার জামা পেছন দিক থেকে ছিঁড়ে ফেলল [ অর্থাৎ সে জামা ধরে টান দিতে চেয়েছিল এবং ইউসুফ (আ) সামনের দিকে দৌড় দিয়েছিলেন। ফলে জামা ছিঁড়ে গেল কিন্তু ইউসুফ (আ) দরজার বাইরে চলে গেলেন ] আর (মহিলাও তাঁর পশ্চাতে ছিল। তখন) উভয়ে (ঘটনাচক্রে) মহিলার স্বামীকে দরজার কাছে (দণ্ডায়মান) পেল। মহিলা স্বামীকে দেখে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল এবং (তৎক্ষণাৎ কথা বানিয়ে) বলল : যে ব্যক্তি তোমার পরিজনের সাথে কুকর্মের ইচ্ছা করে, তার শাস্তি এছাড়া আর কি (হতে পারে) যে, তাকে কারাগারে পাঠানো হবে অথবা অন্য কোন মন্ত্রপাদায়ক শাস্তি হবে (যেমন দৈহিক নির্যাতন)। ইউসুফ (আ) বললেন : (সে যে আমাকে অভিযুক্ত করার ইঙ্গিত করছে, সে সম্পূর্ণ মিথ্যা বাদিনী বরং ব্যাপার উল্টো)। সে-ই আমার দ্বারা স্বীয় কুবাসনা চরিতার্থ করার জন্য আমাকে ফসলাচ্ছিল এবং (এসময়) সেই মহিলার পরিবারের একজন সাক্ষী [ যে ছিল দুঃখপায়ী শিশু। ইউসুফ (আ)-এর মু'জেহায্বরূপ সে কথা বলতে শুরু করল এবং তাঁর পবিত্রতার ] সাক্ষ্য দিল [ এ শিশুর কথা বলাই ছিল ইউসুফ (আ)-এর একটি মু'জেহা। তদুপরি দ্বিতীয় মু'জেহা এই প্রকাশ পেল যে, এ দুঃখপায়ী শিশু একটি হুজিঙ্গত আলামত বর্ণনা করে বিজ্ঞানোচিত ফসলালাও প্রদান করল এবং বলল ] যে, তার জামা (দেখ, তা কোন দিকে ছিন্ন রয়েছে;) যদি সামনের দিক থেকে ছিঁড়ে থাকে, তবে মহিলা সত্য-বাদিনী এবং সে মিথ্যাবাদী এবং যদি জামাটি পেছন দিক থেকে ছিঁড়ে থাকে, তবে মহিলা মিথ্যাবাদিনী এবং সে সত্যবাদী। অতঃপর যখন (আজিজ) তার জামা পেছন দিক থেকে ছিন্ন দেখল, তখন (মহিলাকে) বলল : এটা তোমাদের ছলনা। নিঃসন্দেহে তোমাদের ছলনাও বড় মারাত্মক হয়ে থাকে। [ অতঃপর ইউসুফ (আ)-এর দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল : ] ইউসুফ, এ বিষয়টি ছেড়ে দাও (অর্থাৎ এর আলোচনা করো না কিংবা কিছু মানে নিও না)। এবং (মহিলাকে) বলল : তুমি (ইউসুফের কাছে) স্বীয় অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় তুমিই অপরাধিনী।

### আনুষ্ঠানিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বর্ণিত আছে যে আজীজে-মিসরের পত্নী যখন ইউসুফ (আ)-কে পাপে লিপ্ত করার চেষ্টায় ব্যাপৃত ছিল এবং ইউসুফ (আ) তা থেকে আত্ম-

রক্ষার চেষ্টা করছিলেন কিন্তু মনে স্বাভাবিক ও অনিচ্ছাকৃত কল্পনার দ্বিধাম্বলও ছিল, তখন আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মনোনীত পয়গম্বরের সাহায্যার্থে অলৌকিকভাবে কোন এমন বস্তু তাঁর দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত করে দেন, যার ফলে সে অনিচ্ছাকৃত কল্পনাও তাঁর মন থেকে উঠাও হয়ে যায়। সে বস্তুটি পিতা ইয়াকুব (আ)-এর আকৃতিই হোক কিংবা ওহীর কোন আয়াত।

আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, ইউসুফ (আ) এ নির্জন কক্ষে আল্লাহর প্রমাণ প্রত্যক্ষ করার সাথে সাথেই সেখান থেকে পলায়নোদ্ভূত হলেন এবং বাইরে চলে যাওয়ার জন্য দরজার দিকে দৌড় দিলেন। আজীজ-পত্নী তাঁকে ধরার জন্য পেছনে দৌড় দিল এবং তাঁর জামা ধরে তাঁকে বহির্গমনে বাধা দিতে চাইল। তিনি পবিত্রতা রক্ষার ব্যাপারে ছিলেন দৃঢ়সংকল্প, তাই থামলেন না। ফলে জামা পেছন দিক থেকে ছিন্ন হয়ে গেল। ইত্যবসরে ইউসুফ (আ) দরজার বাইরে চলে গেলেন এবং তাঁর পশ্চাতে শূলুয়ুখাও তথায় উপস্থিত হন। ঐতিহাসিকসুলে বর্ণিত আছে যে, দরজা তালাবদ্ধ ছিল। ইউসুফ (আ) দৌড়ে দরজায় পৌঁছ-তেই আপনা-আপনি তালা খুলে নিচে পড়ে গেল।

উত্তরে দরজার বাইরে এসে আজীজে-মিসরকে সামনেই দণ্ডায়মান দেখতে পেল। তার পত্নী চমকে উঠল এবং কথা বানিয়ে ইউসুফ (আ)-এর উপর দোষ ও অপবাদ চাপা-নোর জন্য বলল : যে ব্যক্তি তোমার পরিজনের সাথে কুকর্মের ইচ্ছা করে, তার শাস্তি এ ছাড়া কি হতে পারে যে, তাকে কারাগারে নিষ্ক্রেপ করা হবে অথবা অন্য কোন কঠোর দৈহিক নির্যাতন।

ইউসুফ (আ) পয়গম্বরসুলভ উদ্বৃত্তার খাতিরে সত্ত্বত সেই মহিলার গোপন অভি-সঙ্গির তথ্য প্রকাশ করতেন না কিন্তু যখন সে নিজেই এগিয়ে এসে ইউসুফ (আ)-এর প্রতি অপবাদ আরোপের ইঙ্গিত করল, তখন বাধ্য হয়ে তিনিও সত্য প্রকাশ করে বললেন :

هِيَ رَأُوْدَتْنِي عَنْ نَفْسِي — অর্থাৎ সে-ই আমার ঘারা স্বীয় কুমতলব চরিতার্থ

করার জন্য আমাকে ফুসলাচ্ছিল।

ব্যাপার ছিল খুবই নাজুক এবং আজীজে-মিসরের পক্ষে কে সত্যবাদী, তার মীমাংসা করা সুকঠিন ছিল। সাক্ষ্য-প্রমাণের কোন অবকাশ ছিল না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যেভাবে স্বীয় মনোনীত বান্দাদেরকে গোনাহ্ থেকে বাঁচিয়ে নিষ্পাপ ও পবিত্র রাখেন, এমনভাবে দুনিয়াতেও তাঁদেরকে গোনাহ্ থেকে বাঁচিয়ে রাখার অলৌকিকভাবে ব্যবস্থা করে দেন। সাধারণত এরূপ ক্ষেত্রে স্বভাবত কথা বলতে অক্ষম —এরূপ কচি শিশুদেরকে কাজে লাগানো হয়েছে। অলৌকিকভাবে তাদেরকে বাকশক্তি দান করে প্রিয় বান্দাদের পবিত্রতা সপ্রমাণ করা হয়েছে। যেমন হযরত মরিয়মের প্রতি যখন লোকেরা অপবাদ আরোপ করতে থাকে, তখন একদিনের ব-চি শিশু ঈসা (আ)-কে আল্লাহ তা'আলা বাকশক্তি দান করে তাঁর মুখে জননীর পবিত্রতা প্রকাশ করে দেন এবং স্বীয় কুদরতের একটি বিশেষ দৃশ্য সবার সামনে প্রকাশ করেন। বনী ইসরাঈলের একজন সাধু ব্যক্তি জুরাইজের প্রতি গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে এমনি ধরনের একটি অপবাদ আরোপ করা হলে নবজাত শিশু

সেই ব্যক্তির পবিত্রতার সাক্ষ্য দান করে। মুসা (আ)-এর প্রতি ফিরাতুনের মনে সন্দেহ দেখা দিলে ফিরাতুন-পন্নীর কেশ পরিচর্যাকারিণী মহিলার সদ্যজাত শিশু বাকশক্তি প্রাপ্ত হয়। সে মুসা (আ)-কে শৈশবে ফিরাতুনের কবল থেকে রক্ষা করে।

ঠিক এমনিভাবে ইউসুফ (আ)-এর ঘটনায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও আবু হুরায়রা (রা)-র বর্ণনা অনুযায়ী একটি কচি শিশুকে আল্লাহ তা'আলা বিত্ত ও দার্শনিক সুলভ বাকশক্তি দান করলেন। এ কচি শিশু এ গৃহেই দোলনায় লালিত হচ্ছিল। তার সম্পর্কে কার খারণা ছিল যে, সে এসব কর্মকাণ্ড দেখবে এবং বুঝবে, অতঃপর অত্যন্ত বিত্ততার সাথে তা বর্ণনাও করে দেবে। কিন্তু সর্বশক্তিমান স্বীয় আনুগত্যের পথে সাধনাকারীদের সঠিক মর্মান্দা ফুটিয়ে তোলার জন্য জগদ্বাসীকে দেখিয়ে দেন যে, বিশ্বে প্রত্যেকটি জন্ম-পরমাণু তাঁর গুপ্ত পুলিশ (গোলেন্দা বাহিনী)। এরা অপরাধীকে ভালভাবেই চেনে, তাঁর অপরাধের রেকর্ড রাখে এবং প্রয়োজন মুহূর্তে তা প্রকাশও করে দেয়। হাশরের ময়দানে হিসাব-কিতাবের সময় মানুষ দুনিয়ার পুরাতন অভ্যাস অনুযায়ী যখন স্বীয় অপরাধসমূহ স্বীকার করতে অস্বীকার করবে, তখন তারই হস্তপদ, চর্ম ও গৃহপ্রাচীরকে তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদাতারূপে দাঁড় করানো হবে। তারা তার প্রত্যেকটি কর্মকাণ্ড হাশরের লোকারণের মধ্যে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে দেবে। তখন মানুষ বুঝতে পারবে যে, হস্তপদ, গৃহপ্রাচীর ও রক্ষা ব্যবস্থাসমূহের মধ্যে কোনটিই তার আপন ছিল না বরং এরা সবাই ছিল রাক্বুল আলামীনের গোপন পুলিশ বাহিনী।

মোট কথা এই যে, যে ছোট্ট শিশুটি বাহ্যত জগতের সবকিছু থেকে উদাসীন ও নিবিকার অবস্থায় দোলনায় পড়েছিল, সে ইউসুফ (আ)-এর মূ'জিযা হিসেবে ঠিক ঐ মুহূর্তে মুখ খুলল, যখন আজীজে-মিসর ছিল এ ঘটনা সম্পর্কে নানা দ্বিধাধ্বন্দ্বের জড়িত।

এ শিশুটি যদি এতটুকুই বলে দিত যে, ইউসুফ (আ) নির্দোষ এবং দোষ মূল্যায়কার, তবে তাও একটি মূ'জিযারূপে ইউসুফ (আ)-এর পক্ষে তাঁর পবিত্রতার বিরাট সাক্ষ্য হয়ে যেত কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এ শিশুর মুখে একটি দার্শনিকসুলভ উক্তি উচ্চারণ করিয়েছেন যে, ইউসুফ (আ)-এর জামাটি দেখ—যদি তা সামনের দিক থেকে ছিন্ন থাকে, তবে মূল্যায়কার কথা সত্য এবং ইউসুফ (আ) মিথ্যাবাদীরূপে সাব্যস্ত হবেন। পক্ষান্তরে যদি জামাটি পেছন দিক থেকে ছিন্ন থাকে, তবে এতে এ ছাড়া অন্য কোন আশংকাই নেই যে, ইউসুফ (আ)-পলায়নরত ছিলেন এবং মূল্যায়কার তাঁকে পলায়নে বাধা দিতে চাচ্ছিল।

শিশুর বাকশক্তির অলৌকিকতা ছাড়াও এ বিষয়টি প্রত্যেকের হৃদয়ঙ্গম হতে পারত। অতঃপর যখন বণিত আলামত অনুযায়ী জামাটি পেছন দিক থেকে ছিন্ন দেখা গেল, তখন বাহ্যিক আলামত দৃষ্টেও ইউসুফ (আ)-এর পবিত্রতা সপ্রমাণ হয়ে গেল।

'সাক্ষ্যদাতা'র ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আমরা বলেছি যে, সে ছিল একটি কচি শিশু, স্বাক্ষর আল্লাহ তা'আলা অলৌকিকভাবে বাকশক্তি দান করলেন। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সা) থেকে এ ব্যাখ্যা প্রমাণিত রয়েছে। ইমাম আহমদ স্বীয় মসনদে, ইবনে হাব্বান স্বীয় গ্রন্থে এবং হাকিম তাঁর মুস্তাদরাকে এটি উল্লেখ করে বর্ণনাটিকে সহীহ হাদীস আখ্যা দিয়েছেন।

হাদীসে বলা হয়েছে : আল্লাহ্ তা'আলা চারটি শিশুকে দোজনায় বাকশক্তি দান করেছেন। এ শিশু চতুষ্ঠম তারাই, স্বাদের কথা এইমাত্র বর্ণনা করা হয়েছে।—(মাযহারী) কোন কোন রেওয়াজেতে 'সাক্কাদাতা'র অন্যান্য ব্যাখ্যাও বর্ণিত রয়েছে। কিন্তু ইবনে জরীর, ইবনে-কাসীর প্রমুখ তফসীরবিদের মতে প্রথম ব্যাখ্যাই অগ্রগণ্য।

কতিপয় বিধান ও মাস'আলা : আনোচ্য আয়াতসমূহ থেকে কতিপয় বিধান ও মাস-আলা বুঝা যায় :

মাস'আলা : (১) **وَاسْتَبَقَا الْهَابَ** আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, যে জায়গায় পাপে লিপ্ত হওয়ার আশংকা থাকে, সে জায়গাকেই পরিভ্রাণ করা উচিত ; যেমন ইউসুফ (আ) সেখান থেকে পলায়ন করে এর প্রমাণ দিয়েছেন।

মাস'আলা : (২) আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশাবলী পালনে সাধ্যানুসারী চেষ্টার ছুটি না করা মানুষের অবশ্যই-কর্তব্য ; যদিও এর ফলাফল বাহ্যত বের হতে দেখা না যায়। ফলাফল আল্লাহ্র হাতে। মানুষের কাজ হল স্বীয় শ্রম ও সাধ্যকে আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে দাসত্বের পরিচয় দেওয়া ; যেমন ইউসুফ (আ)—সব দরজা বন্ধ হওয়া এবং ঐতি-হাসিক বর্ণনা অনুসারী তালাবন্ধ হওয়া সত্ত্বেও দরজার দিকে দৌড় প্রদানে নিজের সমস্ত শক্তি ব্যয় করে দিয়েছেন। এহেন অবস্থায় আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সাহায্যের আগমনও অনেক ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করা হয়। বান্দা যখন নিজের চেষ্টা পূর্ণ করে ফেলে তখন আল্লাহ্র সাফল্যের উপকরণাদিও সরবরাহ করে দেন। মওনানা রাসূমী এ বিষয়বস্তু সম্পর্কেই বলেন :

گرچه رخنه نیست عالم را پدید  
خیره یوسف و ارمی با ید و ید

এমতাবস্থায় বাহ্যিক সফলতা অর্জিত না হলেও এ অকৃতকার্যতা বান্দার জন্য কৃত-কার্যতার চাইতে কম নয় —

گر مراد ت را مذار شکرست  
نامرادی نے مراد دلبرست

জৈনক বুয়ূর্গ আলিম কারাগারে ছিলেন। তিনি শুক্রবার দিন স্বীয় সামর্থ্য ও ক্ষমতা অনুসারী গোসল করতেন, কাপড়-চোপড় ধুতেন, অতঃপর জুম'আর জন্য তৈরী হয়ে কারাগারের ফটক পর্যন্ত যেতেন। সেখানে পৌঁছে বসতেন : ইয়া আল্লাহ্, এতটুকুই আমার সাধ্য ছিল। এরপর আপনান্ন মজি। আল্লাহ্ তা'আলার ব্যাপক অনুগ্রহদৃষ্টি এটা অসম্ভব ছিল না যে, কারাগারের দরজা খুলে যেত এবং তিনি জুম'আর নামায পড়ে নিতেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা এই বুয়ূর্গকে এমন উচ্চমর্যাদা দান করলেন, যার সামনে, হাজারো কেরামত তুচ্ছ। তাঁর এ কর্মের কারণে কারাগারের দরজা খোলেনি কিন্তু এতদসত্ত্বেও তিনি স্বীয় কর্মে সাহস হারালেন না। প্রতি শুক্রবারে অবিরাম এ কর্ম করে গেলেন। কর্মের এ দৃঢ়তাকেই শীর্ষস্থানীয় সুফী-বুয়ূর্গগণ কেরামতের উর্ধ্ব স্থান দিয়েছেন।

মাস'আলা : (৩) এ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, কারও প্রতি কোন মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা হলে আত্মপক্ষ সমর্থন করে সাফাই বলা পয়গম্বরগণের স্মৃত। এসময় চুপ থেকে নিজেই নিজেকে দোষী সাব্যস্ত করা কোন তাওয়াক্কুল বা বুয়ুগী নয়।

মাস'আলা : (৪) **شاهد** শব্দটি যখন লেনদেন ও মামলা-মোকদ্দমার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় তখন ঐ ব্যক্তিকে বোঝায়, যে বিচারার্থীন ব্যাপার সম্পর্কে কোন চাক্ষুষ ঘটনা বর্ণনা করে। আলৌচ্য আয়াতে হাযে **شاهد** শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে, সে কোন ঘটনা অথবা তৎসম্পর্কিত নিজের কোন চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেনি বরং ফয়সালায় একটি প্রকারের দিকে ইঙ্গিত করেছে মাত্র। পরিভাষার দিক দিয়ে তাকে **شاهد** বা সাক্ষ্যদাতা বলা হয় না।

কিন্তু এসব পরিভাষা পরবর্তীকালের আলিম ও ফিকাহবিদগণ বিষয়টা সহজে বোঝানোর জন্য রচনা করেছেন। এগুলো কোরআন পাকের পরিভাষা নয় এবং এগুলো মেনে চলতে কোরআন বাধ্যও নয়। কোরআন এখানে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে এ অর্থের দিক দিয়ে **شاهد** তথা সাক্ষ্যদাতা বলেছে যে, সাক্ষ্যদাতার বর্ণনা দ্বারা যেমন বিচারের মীমাংসা সহজ এবং এক পক্ষের সত্যবাদী হওয়া প্রমাণিত হয়ে যায়, এ শিশুর বর্ণনার দ্বারাও এমনি ধরনের উপকার সাধিত হয়েছে। তার অলৌকিক বাকশক্তিই আসলে ইউসুফ (আ)-এর পবিত্রতার প্রমাণ ছিল। তদুপরি সে যেসব আলামত ব্যক্ত করেছে, সেগুলোও পরিণামে ইউসুফ (আ)-এরই পবিত্রতার সাক্ষী। তাই একথা বলা নির্ভুল যে, সে ইউসুফ (আ)-এর পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছে অথচ ইউসুফ (আ)-কে সত্যবাদী বলেনি বরং উত্তম সন্তানবীর কথা উল্লেখ করেছে। সে যুলায়খার সত্যবাদিতা এমন এক অবস্থায় ধরে নেওয়ার পর্যায়ে স্বীকার করে নিয়েছিল যাতে তার সত্যবাদিনী হওয়া নিশ্চিত ছিল না বরং বিপরীত হওয়ার আশংকা বিদ্যমান ছিল। কেননা, সামনের দিকে জামা ছিন্ন হওয়া উত্তম অবস্থাতেই সম্ভবপর। পক্ষান্তরে ইউসুফ (আ)-এর সত্যবাদিতাকে সে এমন এক অবস্থায় স্বীকার করে নিয়েছিল, যাতে এছাড়া অন্য কোন সন্তানবানাই ছিল না। কিন্তু ইউসুফ (আ)-এর পবিত্রতা প্রমাণিত হওয়াই ছিল এ কর্মপন্থার শেষ পরিণতি।

মাস'আলা : (৫) এ থেকে বোঝা যায় যে, মামলা-মোকদ্দমা ও বিচার-আচারের মীমাংসায় ইঙ্গিত ও আলামতের সাহায্য নেওয়া যায়, যেমন এ সাক্ষ্যদাতা, জামার পিছন দিক থেকে ছিন্ন হওয়াকে এ বিষয়ের আলামত সাব্যস্ত করেছে যে, ইউসুফ (আ) পলায়ন-রত ছিলেন এবং যুলায়খা তাঁকে পাকড়াও করার চেষ্টা করছিল। এ ব্যাপারে সব ফিকাহবিদ একমত যে, ঘটনাবলীর স্বরূপ উদ্ঘাটনে আলামত ও ইঙ্গিতকে অবশ্যই কাজে লাগানো উচিত, যেমন এখানে করা হয়েছে কিন্তু শুধু আলামত ও ইঙ্গিতকেই একমাত্র প্রমাণের মর্যাদা দেওয়া যায় না। ইউসুফ (আ)-এর ঘটনায়ও প্রকৃতপক্ষে পবিত্রতার প্রমাণ হচ্ছে কচি শিশুর অলৌকিকভাবে কথাবার্তা বলা। এর সাথে যেসব আলামত ও ইঙ্গিত উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোর দ্বারা বিষয়টি সমর্থিত হয়েছে।

মোট কথা, এ পর্যন্ত প্রমাণিত হয়েছে যে, যুলায়খা যখন ইউসুফ (আ)-এর চরিত্রে অপবাদ আরোপ করল, তখন আল্লাহ তা'আলা একটি কচি শিশুকে বাকশক্তি দান করে তার মুখ থেকে এ বিস্তৃতজনাচিত ফয়সলা প্রকাশ করলেন যে, ইউসুফ (আ)-এর জামাটি দেখা হোক। যদি তা পেছনদিক থেকে ছিন্ন থাকে, তবে তা এ বিষয়ের পরিষ্কার আলামত যে, তিনি পলায়ন করছিলেন এবং যুলায়খা তাঁকে ধরার চেষ্টা করছিল। কাজেই ইউসুফ (আ) নির্দোষ।

আলোচ্য আয়াতসমূহের শেষ দু'আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, আজীজে-মিসর শিশু-টির এভাবে কথা বলা দ্বারাই বুঝে নিয়েছিল যে, ইউসুফ (আ)-এর পবিত্রতা প্রকাশ করার জন্যই এ অস্বাভাবিক কথা অলৌকিক ঘটনার অবতারণা হয়েছে। অতঃপর তার বস্তব্য অনুসারী যখন দেখল যে, ইউসুফ (আ)-এর জামাটিও পেছন দিক থেকেই ছিন্ন, সে তখন নিশ্চিত হয়ে গেল যে, দোষ যুলায়খার এবং ইউসুফ (আ) পবিত্র। তদনুসারে সে যুলায়খাকে

সম্বোধন করে বলল : **إِنَّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ** অর্থাৎ এসব তোমার ছলনা। তুমি নিজের

দোষ অন্যের মাড়ে চাপাতে চাও। এরপর বলল : নারী জাতির ছলনা খুবই মারাত্মক। একে বোঝা এবং এর জাল ছিন্ন করা সহজ নয়। কেননা, তারা বাহ্যত কোমল, নাজুক ও অবলা হয়ে থাকে। যারা তাদেরকে দেখে, তারা তাদের কথায় দ্রুত বিশ্বাস স্থাপন করে ফেলে। কিন্তু বুদ্ধি ও ধর্মভীরুতার অভাববশত তা অধিকাংশ সময় ছলনা হয়ে থাকে।—

(মাঘহারী)

তফসীরে কুরতুবীতে আবু হুরায়রার রেওয়ামাতে রসুলুল্লাহ (সা)-র উক্তি বর্ণিত রয়েছে যে, নারীদের ছলনা ও চক্রান্ত শয়তানের ছলনা ও চক্রান্তের চাইতে গুরুতর।

কেননা, আল্লাহ তা'আলা শয়তানের চক্রান্ত সম্পর্কে বলেছেন : **إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ**

**كَانَ مُعِينًا** অর্থাৎ শয়তানের চক্রান্ত দুর্বল। পক্ষান্তরে নারীদের চক্রান্ত সম্পর্কে বলা

হয়েছে : **إِنَّ كَيْدَ كُنْ عَظِيمٌ**—অর্থাৎ তোমাদের চক্রান্ত খুবই জটিল। এটা জানা

কথা যে, এখানে সব নারী বুঝানো হয়নি বরং ঐসব নারী সম্পর্কেই বলা হয়েছে, যারা এ ধরনের ছল-চাতুরীতে লিপ্ত থাকে। আজীজে-মিসর যুলায়খার জুল বর্ণনা করার পর

ইউসুফ (আ)-কে বলল : **يُوسُفُ أَصْرَفُ عَنْ هَذَا** অর্থাৎ ইউসুফ, এ ঘটনাকে

উপেক্ষা কর এবং বলাবলি করো না, যাতে বেইজ্জতি না হয়। অতঃপর যুলায়খাকে

সম্বোধন করে বলল : **وَاسْتَغْفِرِي لَذَنْبِكَ إِنَّكَ كُنْتِ مِنَ الْغَاطِلِينَ** অর্থাৎ

জুল তোমারই। তুমি নিজ জুলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। এতে বাহ্যত বুঝানো হয়েছে

যে, স্বামীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। এ অর্থও হতে পারে যে, ইউসুফ (আ)-এর কাছে ক্ষমা চাও। কারণ, নিজে অন্যায় করেছে এবং দোষ তাঁর ঘাড়ে চাপিয়েছে।

এখানে চিন্তাসাপেক্ষ বিষয় এই যে, স্বামীর সামনে স্ত্রীর এহেন বিশ্বাসঘাতকতা ও নির্লজ্জতা প্রমাণিত হওয়ার পরও তার উত্তেজিত না হওয়া এবং পূর্ণ ধীরতা ও স্থিরতা সহকারে কথাবার্তা বলা মানবস্বভাবের পক্ষে বিস্ময়কর ব্যাপার বটে। ইমাম কুরতুবী বলেন : এর কারণ হয়তো এই যে, আজীজে-মিসরের মধ্যে আত্মসম্মানবোধ বলতে কোন কিছু ছিল না। দ্বিতীয়ত, এটাও সম্ভবপর যে, আল্লাহ্ তা'আলা ইউসুফ (আ)-কে সোনাহ্ থেকে অতঃপর বদনামী থেকে বাঁচাবার জন্য যে অলৌকিক ব্যবস্থা করেছিলেন, তারই অংশ হিসেবে আজীজে-মিসরকে ক্রোধে উত্তেজিত হতে দেননি। নতুবা সহজাত অভ্যাস অনুসারী এরূপ ক্ষেত্রে মানুষ সাধারণত প্রকৃত ঘটনা অনুসন্ধান না করেই ধৈর্য-হারী হয়ে পড়ে এবং মারপিট শুরু করে দেয়। মৌখিক গালিগালাজ তো মামুলী বিষয়। মানুষের সাধারণ অভ্যাস অনুসারী যদি আজীজে-মিসর উত্তেজিত হয়ে যেত, তবে তার মুখ কিংবা হাত দ্বারা ইউসুফ (আ)-এর পক্ষে মর্ষাদাহানিকর কোন কিছু ঘটে যাওয়া বিচিন্ত ছিল না। এটা আল্লাহ্‌র কুদরতেরই লীলা। তিনি আনুগত্যশীল বান্দাদের পদে পদে হিফাযত করেন। **فَمَا رَىٰ اللَّهُ أَحْسَىٰ الْعَاثِمِينَ**

পরবর্তী আয়াতসমূহে অন্য ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে যা পূর্ববর্তী কাহিনীর সাথেই সংশ্লিষ্ট। তা এই যে, এ ঘটনা গোপন করা সত্ত্বেও শাহী দরবারের পদস্থ ব্যক্তিদের অতঃপূরে তা ছড়িয়ে পড়ল। তারা আজীজে-মিসরের স্ত্রীকে উৎসনা করতে লাগল। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন : এরূপ মহিলার সংখ্যা ছিল পাঁচ এবং এরা সবাই ছিল আজীজে-মিসরের নিকটতম কর্মকর্তাদের স্ত্রী।—(কুরতুবী, মাসহরী)

তারা পরস্পর বলাবলি করতে লাগল : দেখ, কেমন বিস্ময় ও পরিতাপের বিষয়। আজীজে-মিসরের বেগম এতবড় পদমর্যাদা সত্ত্বেও নিজের তরুণ ক্রীতদাসের প্রতি প্রেমা-সক্ত হয়ে তাঁর দ্বারা কুমতলব চরিতার্থ করতে চায়! আমরা তাকে নিদারুণ পথভ্রষ্ট মনে করি। আয়াতে **فَمَا** শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ তরুণ। সাধারণের পরিভাষায় অল্পবয়স্ক ক্রীতদাসকে গোলাম, যুবক ক্রীতদাসকে **فَتَا** এবং যুবতী ক্রীতদাসীকে **فَتَا** বলা যায়। এখানে ইউসুফ (আ)-কে যুলায়খার ক্রীতদাস বলার কারণ হয়তো এই যে, স্বামীর জিনিসকেও স্ত্রীর জিনিস বলার অভ্যাস প্রচলিত রয়েছে অথবা যুলায়খা ইউসুফ (আ)-কে স্বামীর কাছ থেকে উপঢৌকন হিসেবে প্রাপ্ত হয়েছিল।—(কুরতুবী)

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ  
فَدَشَعَهَا حَبَاءً اِنَّا لَنَرُهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٥٠﴾ فَلَمَّا سَمِعَتْ

بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكًا وَأَتَتْ كُلَّ  
 وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سَكِينًا وَ قَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ ۚ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ  
 أَكْبَرْتَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ  
 هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ۝ قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِينَ لَمْتُنِنِي فِيهِ وَلَقَدْ  
 رَاوَدْتُهُ عَنِ نَفْسِهِ فَأَشْغَصَمُ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا أَمَرَهُ لَيَسْجَنَنَّ  
 وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّغِيرِينَ ۝ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي  
 إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ ۝  
 فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝  
 ثُمَّ بَدَأَ لَهُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لِيَسْجُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ ۝

(৩০) নগরে মহিলারা বলাবলি করতে লাগল যে, আজীজের স্ত্রী স্বীয় গোলামকে কুমতলব চরিতার্থ করার জন্য ফুসলায়। সে তার প্রেমে উন্মত্ত হয়ে গেছে। আমরা তো তাকে প্রকাশ্য জ্ঞানিতে দেখতে পাচ্ছি। (৩১) যখন সে তাদের চক্রান্ত শুনল, তখন তাদেরকে ডেকে পাঠাল এবং তাদের জন্য একটি ভোজসভার আয়োজন করল। সে তাদের প্রত্যেককে একটি ছুরি দিল। বলল : ইউসূফ, এদের সামনে চলে এস। যখন তারা তাকে দেখল, হতভম্ব হয়ে গেল এবং আপন হাত কেটে ফেলল। তারা বলল : কখনই নয়—এ ব্যক্তি মানব নয়। এ তো কোন মহান ফেরেশতা! (৩২) মহিলা বলল : এ ঐ ব্যক্তি, যার জন্য তোমরা আমাকে ডংসনা করছিলে। আমি ওরই মন জয় করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সে নিজেকে নিরস্ত রেখেছে। আর আমি যা আদেশ দেই, সে যদি তা না করে, তবে অবশ্যই সে কারাগারে প্রেরিত হবে এবং লাঞ্চিত হবে। (৩৩) ইউসূফ বলল : হে পালনকর্তা, তারা আমাকে যে কাজের দিকে আহ্বান করে, তার চাইতে আমি কারাগারই পছন্দ করি। যদি আপনি তাদের চক্রান্ত আমার উপর থেকে প্রতিহত না করেন, তবে আমি তাদের প্রতি আক্রান্ত হয়ে পড়ব এবং অজন্দের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। (৩৪) অতঃপর তার পালনকর্তা তার দোয়া কবুল করে নিলেন। অতঃপর তাদের চক্রান্ত প্রতিহত করলেন। নিশ্চয় তিনি সর্বপ্রোক্তা ও সর্বজ্ঞ। (৩৫) অতঃপর এসব নিদর্শন দেখার পর তারা তাকে কিছু দিন কারাগারে রাখা সমীচীন মনে করল।



তক্ষসীরের সার-সংক্ষেপ

শহরের কিছুসংখ্যক মহিলা বলাবলি করল যে, আশীষের স্ত্রী স্বীয় ক্রীতদাসকে তার দ্বারা (অবৈধ) মতলব হাসিলের জন্য ফুসলায় (কেমন নীচ কাণ্ড যে, ক্রীতদাসের জন্য মরে!) এ ক্রীতদাসের প্রেম তার অন্তরে আসন করে নিয়েছে। আমরা তো তাকে প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে দেখতে পাচ্ছি। অতঃপর যখন সে তাদের কুৎসা (সংবাদ) শুনল, তখন কারও মাধ্যমে তাদেরকে ডেকে পাঠাল (যে, তোমাদের দাওয়াত) এবং তাদের জন্য তাকিয়ামুত্তর আসন সজ্জিত করল এবং (যখন তারা আগমন করল এবং তাদের সামনে বিভিন্ন প্রকার খাদ্য ও ফল উপস্থিত করল—তন্মধ্যে কিছু খাদ্যবস্তু চাকু দ্বারা কেটে খাওয়ার ছিল। তাই) প্রত্যেককে এক-একটি চাকু (-ও) দিল, (যা বাহ্যত ফলকাটার উপলক্ষে ছিল এবং আসল লক্ষ্য পরে বর্ণিত হবে যে, তারা দিশাহারা হয়ে নিজ নিজ হাতই ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলবে) এবং [এসব আয়োজন সমাপ্ত করে এক কক্ষে অবস্থানকারী ইউসূফ (আ)-কে] বলল : এদের সামনে একটু আস। [ইউসূফ (আ) মনে করলেন যে, হয়তো কোন সদুদ্দেশ্যে বলা হয়েছে, তাই বাইরে আসলেন।] মহিলারা যখন তাঁকে দেখল, তখন (তাঁর রূপ-লাবন্য প্রত্যক্ষ করে) কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল এবং (এ হত-বুদ্ধিতায়) নিজ নিজ হাতই কেটে ফেলল। [তারা চাকু দিয়ে ফল কাটছিল। ইউসূফ (আ)-কে দেখে হতবুদ্ধিতায় এমন আচ্ছন্ন হল যে, চাকু হাতে লেগে গেল—] বলতে লাগল : আল্লাহর কসম, এ ব্যক্তি মানব কখনই নয়, সে তো একজন মহান ফেরেশতা। যুলায়খা বলল : (দেখে নাও) সে ঐ ব্যক্তি, যার সম্পর্কে তোমরা আমাকে উৎসর্না করতে, (আমি ক্রীতদাসের প্রেমে পড়েছি বলে রটনা করতে) এবং বাস্তবিকই আমি তার দ্বারা স্বীয় কুমত-লব চরিতার্থ করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সে নিষ্পাপ রয়েছে এবং [অতঃপর ইউসূফ (আ)-কে শাসনের উদ্দেশ্যে তাঁকে গুলিয়েই বলল :] যদি ভবিষ্যতে সে আমার আদেশ পালন না করে, (যেমন এ পর্যন্ত পালন করেনি) তবে অবশ্যই কারাগারে প্রেরিত হবে এবং লঙ্ঘিত হবে। [সমাগত মহিলারাও ইউসূফ (আ)-কে বলতে লাগল : যে মহিলা তোমার এতটুকু উপকার করেছে, তার প্রতি এমন বিমূঢ়তা তোমার জন্য উপযুক্ত নয়; তার আদেশ পালন করা উচিত।] ইউসূফ (এসব কথা শুনলেন এবং দেখলেন যে, তারা সবাই যুলায়খার সুরে সুর মিলাচ্ছে, তখন আল্লাহর কাছে) দোয়া করলেন : হে আমার পালন-কর্তা, যে অবৈধ কাজের দিকে মহিলারা আমাকে আহ্বান করছে, এর চাইতে কারাগারে যাওয়াই আমি অধিক পছন্দ করি। যদি আপনি তাদের চক্রান্ত আমার উপর থেকে প্রতিহত না করেন, তবে আমি হয়ত তাদের দিকে ঝুঁকে পড়ব এবং বিবুদ্ধিতার কাজ করে বসব। অতঃপর তাঁর পালনকর্তা তাঁর দোয়া কবুল করলেন এবং মহিলাদের চক্রান্ত প্রতিহত করে দিলেন। নিশ্চয় তিনি দোয়া শ্রবণকারী (তাঁর হাল-হকিকত সম্পর্কে) জানিবান। এরপর (ইউসূফের পবিত্রতার) বিভিন্ন নিদর্শন দেখার পর (যদ্বারা ইউসূফের সচ্চরিত্রতা সম্পর্কে স্বয়ং তাদের মনে কোন সন্দেহ রইল না, কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে বিষয়টি প্রচার হয়ে গিয়েছিল, তা দূর করার উদ্দেশ্যে) তাদের কাছে (অর্থাৎ আশীষ ও

তার পরিষদবর্গের কাছে) এটাই সমীচীন মনে হল যে, তাকে কিছু দিনের জন্য কারাগারে রাখা হবে।

আনুশঙ্গিক জাতব্য বিষয়

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ

মহিলাদের চক্রান্তের কথা জানতে পারল, তখন তাদেরকে একটি ভোজসভায় ডেকে পাঠাল।

এখানে মহিলাদের কানামুসাবে যুলায়খা মকর অর্থাৎ চক্রান্ত বলেছে। অথচ বাহ্যত তারা কোন চক্রান্ত করেনি। কিন্তু যেহেতু তারা গোপনে গোপনে কুৎসা রটনা করত, তাই একে চক্রান্ত বলা হয়েছে।

وَاعْتَدَتْ لَهُنَّ مَتَكًا

অর্থাৎ তাদের জন্য তাকিয়ামুক্ত আসন সজ্জিত করল।

وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا

হল, তাদের সামনে বিভিন্ন প্রকার খাদ্য ও ফল উপস্থিত করা হল। তন্মধ্যে কিছু খাদ্য চাকু দিয়ে কেটে খাওয়ার ছিল। তাই প্রত্যেককে এক একটি চাকুও দেওয়া হল। এর বাহ্যিক উদ্দেশ্য তো ছিল ফল কাটা; কিন্তু মনে অন্য ইচ্ছা লুক্কায়িত ছিল, যা পরে বর্ণিত হবে। অর্থাৎ আগত মহিলারা ইউসুফ (আ)-কে দেখে হতভম্ব হয়ে যাবে এবং চাকু দিয়ে ফলের পরিবর্তে নিজ নিজ হাত কেটে ফেলবে।

وَقَالَتْ أَخْرِجْ عَلَيْنَ

এক কক্ষে অবস্থানরত ইউসুফ (আ)-কে যুলায়খা বলল : একটু বের হয়ে এস। ইউসুফ (আ) তার কু-উদ্দেশ্য জানতেন না। তাই বাইরে এসে ভোজসভায় উপস্থিত হলেন।

فَلَمَّا رَأَيْتَهُ أَكْهَرَتْهُ وَقَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا

بَشَرًا إِنَّ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ

অর্থাৎ সমাগত মহিলারা ইউসুফ (আ)-কে দেখল, তখন তাঁর রূপ ও সৌন্দর্য দর্শনে বিমোহিত হয়ে গেল এবং নিজ নিজ হাত কেটে ফেলল। অর্থাৎ ফল কাটার সময় যখন এ বিস্ময়কর ঘটনা দৃষ্টিগোচর হল, তখন চাকু হাতেই লেগে গেল। অন্য-মনস্কতার সময় প্রায়ই এরূপ হয়ে থাকে। তারা বলতে লাগল : হায় আল্লাহ্, এ ব্যক্তি কখনই মানব নয়। সে তো মহানুভব ফেরেশতা। উদ্দেশ্য এই যে, ফেরেশতায়াই এরূপ নূরানী চেহারামুক্ত হতে পারে।

قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاودَنِي عَنْ نَفْسِي  
فَأَسْتَعِصِمُ وَلَكِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا أُمِرَ لِيَسْجُنَنِي وَلِيَكُونَا مِنَ الصَّاغِرِينَ ۝

যুলায়খা বলল : দেখে নাও, এ ঐ ব্যক্তি, যার সম্পর্কে তোমরা আমাকে ডংসনা করত। বাস্তবিকই আমি তার কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে চেয়েছিলাম; কিন্তু সে নিষ্পাপ রয়েছে। ভবিষ্যতে সে আমার আদেশ পালন না করলে অবশ্যই কারাগারে প্রেরিত হবে এবং লঙ্ঘিত হবে।

যুলায়খা যখন দেখল যে, সমাগত মহিলাদের সামনে তার গোপন ভেদ ফাঁস হয়ে গেছে, তখন সে তাদের সামনেই ইউসুফ (আ)-কে ভীতি প্রদর্শন করতে লাগল। কোন কোন তফসীরবিদ বর্ণনা করেছেন যে, তখন আমন্ত্রিত মহিলারাও ইউসুফ (আ)-কে বলতে লাগল : তুমি যুলায়খার কাছে ঋণী। কাজেই তার ইচ্ছার অবমাননা করা উচিত নয়।

পরবর্তী আয়াতের কোন কোন শব্দ দ্বারাও মহিলাদের উপরোক্ত বক্তব্য সম্পর্কে আভাস পাওয়া যায়; যেমন—

كَيْدُ هُنَّ — এগুলোতে বহুবচনে

কয়েকজনের কথা বলা হয়েছে :

ইউসুফ (আ) দেখলেন যে, সমবেত মহিলারাও যুলায়খার সুরে সুর মিলিয়েছে এবং তাকে সমর্থন করছে। কাজেই তাদের চক্রান্তের জাল ছিন্ন করার বাহ্যিক কোন উপায় নেই! এমতাবস্থায় তিনি আত্মাহ্বর দিকে প্রত্যাভর্তন করলেন এবং তাঁর দরবারে আরম্ভ করলেন :

رَبِّ السِّجْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي

كَيْدُ هُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ۝

অর্থাৎ হে আমার পালনকর্তা! এই মহিলারা আমাকে যে কাজের দিকে আহ্বান করছে, এর চাইতে জেলখানাই আমার অধিক পছন্দনীয়। যদি আপনি আমা থেকে ওদের চক্রান্ত প্রতিহত না করেন, তবে সম্ভবত আমি তাদের দিকে যুঁকে পড়ব এবং নিবৃদ্ধিতার কাজ করে ফেলব। “আমি জেলখানা পছন্দ করি”—ইউসুফ (আ)-এর এ উক্তি বন্দীজীবন প্রার্থনা বা কামনা নয়; বরং পাপকাজের বিপরীতে এই পার্শ্বিক বিপদকে সহজ মনে করার বহিঃপ্রকাশ। কোন কোন রেওয়াজে বলা হয়েছে : যখন ইউসুফ (আ) জেলে প্রেরিত হলেন, তখন আত্মাহ্বর পক্ষ থেকে ওহী আসল, আপনি নিজেকে

জেলে নিক্ষেপ করেছেন। কারণ, আপনি বলেছিলেন رَبِّ السِّجْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ অর্থাৎ

এর চাইতে আমি জেলখানাকে অধিক পছন্দ করি। আপনি নিরাপত্তা চাইলে আপনাকে পুরাপুরি নিরাপত্তা দান করা হতো। এ থেকে বোঝা গেল যে, কোন বড় বিপদ থেকে বাঁচার জন্য দোয়ায় 'এর চাইতে অমুক ছোট বিপদে পতিত করা আমি ভাল মনে করি'—বলা সমীচীন নয়; বরং প্রত্যেক বিপদাপদের সময় আল্লাহর কাছে নিরাপত্তাই প্রার্থনা করা উচিত। এ কারণেই রসুলুল্লাহ (সা) এক ব্যক্তিকে সবরের দোয়া করতে নিষেধ করেছেন। কেননা, সবরের অর্থ হচ্ছে বিপদাপদে পতিত হওয়ার পর তা সহ্য করার ক্ষমতা। কাজেই আল্লাহর কাছে সবরের দোয়া করার পরিবর্তে নিরাপত্তার দোয়া করা উচিত। --- (তিরমিযী)

একবার হযরত (সা)-এর পিতৃবা হযরত আব্বাস (রা) আরম্ভ করলেন; আমাকে কোন একটি দোয়া শিক্ষা দিন। তিনি বললেন: পালনকর্তার কাছে নিরাপত্তার দোয়া করুন। হযরত আব্বাস (রা) বলেন: কিছুদিন পর আমি আবার তাঁর কাছে দোয়া শিক্ষা দেওয়ার আবেদন করলাম। তিনি বললেন: আল্লাহর কাছে ইহকাল ও পরকালের নিরাপত্তা প্রার্থনা করুন।

“যদি আপনি ওদের চক্রান্তকে প্রতিহত না করেন তবে সম্ভাবত আমি ওদের দিকে ঝুঁকে পড়ব”---ইউসুফ (আ)-এর এ কথা বলা নবুয়তের জন্য যে পবিত্রতা জরুরী, তার পরিপন্থী নয়। কারণ, এ পবিত্রতার সারমর্ম হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিগত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কোন ব্যক্তিকে গোনাহ্ থেকে বাঁচিয়ে নেবেন। যদিও নবুয়তের কারণে এ গুণ্য পূর্ব থেকেই অর্জিত ছিল, তথাপি শিষ্টাচার প্রসূত চূড়ান্ত ভীতির কারণে এরূপ দোয়া করতে বাধ্য হয়েছেন। এ থেকে আরও জানা গেল যে, আল্লাহ তা'আলার সাহায্য ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তিই গোনাহ্ থেকে বাঁচতে পারে না। আরও জানা গেল যে, প্রত্যেক গোনাহ্র কাজ মুখ্তাবশত হয়ে থাকে। জ্ঞান মানুষকে গোনাহ্র কাজ থেকে বিরত রাখে।--- (কুরতুবী)

فَاَسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَ هِيَ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

অর্থাৎ তাঁর পালনকর্তা দোয়া কবুল করলেন এবং মহিলাদের চক্রান্তকে তাঁর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখলেন। নিশ্চয় তিনি পরম জ্ঞাতা ও জ্ঞানী।

আল্লাহ তা'আলা মহিলাদের চক্রান্তজাল থেকে ইউসুফ (আ)-কে বাঁচানোর জন্য একটি ব্যবস্থা করলেন। ইউসুফ (আ)-এর সচ্চরিত্রতা, আল্লাহ্ভীতি ও পবিত্রতার সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী দেখে আশীষে-মিসর ও তাঁর বন্ধুদের মনে নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মেছিল যে, ইউসুফ সৎ। কিন্তু শহরময় এ বিষয়ে কানাঘুসা হতে থাকে। এ কানাঘুসার অবসান করার জন্য এটাই উত্তম পথ বিবেচিত হল যে, ইউসুফ (আ)-কে কিছুদিনের জন্য জেলে আবদ্ধ রাখাই সমীচীন হবে। এ দ্বারা নিজের ঘরও রক্ষা পাবে এবং জনগণের মধ্যেও এ বিষয়ের আলোচনা স্তিমিত হয়ে পড়বে।

যখন তিনি জ্ঞান-বুদ্ধির বয়সে পৌঁছেন, তখন ইয়াকুব (আ) তাঁকে নিজের কাছে আনতে চান। ফুফু তাঁকে খুব আদর করতেন। তাই নিজেই রাখতে চাইলেন। সেমতে কোমরে একটি হাঁসুলি কাপড়ের ভেতরে বেঁধে প্রচার করে দিলেন যে, তার হাঁসুলি চুরি হয়েছে। সবার তন্মুগ্ধি নেওয়ার পর ইউসুফ (আ)-এর কোমর থেকে তা বের হল। ফলে ইয়াকুবী শরীয়তের বিধান অনুযায়ী ইউসুফ (আ)-কে ফুফুর কাছেই থাকতে হল। ফুফুর মৃত্যুর পর তিনি পিতা ইয়াকুব (আ)-এর কাছে চলে আসেন। সম্ভবত এখানেও ইউসুফ (আ)-এর সম্মতিক্রমেই তাঁকে গোলাম বানানোর প্রহসন করা হয়েছিল। তাই এতে 'আমাদকে গোলাম বানানোর' অভিযোগ আসে না; ইউসুফ (আ)-এর চরিত্র ও বিভিন্ন আলামতদৃষ্টে ভাইয়েরা অবশ্যই জানত যে, ইউসুফ চুরি করেনি--সে পবিত্র; কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে বেনিয়ামিনের প্রতি তাদের যে চরম আক্রোশ ছিল সে কারণে এ কথাও বলে দিল। অতঃপর ইউসুফ সে কথাটি (যা এখনই উল্লিখিত হবে) আপন মনে গোপন রাখলেন এবং তাদের সামনে (মুখে) প্রকাশ করলেন না (অর্থাৎ মনে মনে) বললেন : এ (চুরির) সুরে তোমরা তো আরও ধারাপ (অর্থাৎ আমরা ভ্রাতৃত্ব প্রকৃত চুরি করিনি; কিন্তু তোমরা এমন জঘন্য কাজ করেছ যে, টাকা-পয়সার বিনিময়ে মানুষই গায়েব করে দিয়েছ অর্থাৎ আমাকে পিতার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছ। বলা বাহুল্য, মানুষ চুরি টাকা-পয়সা চুরির চাইতে জঘন্য অপরাধ)। এবং তোমরা (আমাদের ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে) যা কিছু বর্ণনা করছ (যে আমরা চোর) এ সম্পর্কে (অর্থাৎ এর স্বরূপ সম্পর্কে) আল্লাহ তা'আলা উত্তম রূপে জ্ঞাত আছেন (যে, আমরা চোর নই। ভাইয়েরা যখন দেখল যে, তিনি বেনিয়ামিনকে প্রেফতার করে কসজ করে নিয়েছেন, তখন খোশামোদের ছলে) তারা বলতে লাগল : হে আশীয, এর (বেনিয়ামিনের) পিতা রয়েছে, যিনি খুবই বয়োবৃদ্ধ (তিনি একে অত্যধিক আদর করেন। এর বিরহ-বাধ্যয় আল্লাহ জানে তাঁর কি অবস্থা হবে। আমাদেরকে এত আদর করেন না)। অতএব আপনি (এমন করুন যে) এর স্থলে আমাদের একজনকে রেখে দিন (এবং গোলাম করে নিন)। আমরা আপনাকে হৃদয়বান দেখতে পাচ্ছি। (আশা করি এ দরখাস্ত মনজুর করবেন)। ইউসুফ (আ) বললেন : এমন (অন্যায়) ব্যাপার থেকে আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন যে, যার কাছে আমরা মাল পেয়েছি, তাকে ছাড়া অন্য ব্যক্তিকে প্রেফতার করে রেখে দেব। (যদি আমরা এমন করি, তবে) এমতাবস্থায় আমরা খুবই অন্যায়কারী বিবেচিত হব। (কোন মুক্ত ব্যক্তিকে গোলাম বানানো এবং তার সাথে গোলামের মত ব্যবহার করা তার সম্মতিক্রমেও হারাম)। অতঃপর যখন তারা (তার পরিষ্কার জবাবের কারণে), ইউসুফ (এর কাছ) থেকে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে গেল, তখন (সেখান থেকে) সরে গিয়ে পরস্পর পরামর্শ করতে লাগল (যে, কি করা যায়? অধিকাংশের মত হল যে, উপায় নেই। সবারই দেশে ফিরে যাওয়া উচিত। কিন্তু) তাদের মধ্যে যে জ্যেষ্ঠ, সে বলল : (তোমরা সবাই ফিরে যাওয়ার যে মত প্রদান করছ, জিজ্ঞেস করি) তোমরা কি জান না যে, পিতা তোমাদের কাছ থেকে আল্লাহর নামে শপথ নিয়েছেন (যে তোমরা তাকে সাথে আনবে। কিন্তু সবাই বিপদগ্রস্ত হয়ে গেলে ভিন্ন কথা। অতএব আমরা সবাই তো আর বিপদে পরিলেপিত হইনি যে, তদবীরের কোন অবকাশ নেই। তাই যথাসম্ভব তদবীর করা দরকার)। এবং ইতিপূর্বে ইউসুফ সম্পর্কে তোমরা কতটুকু ভুলি করেছ। (তার সাথে যে ব্যবহার করা হয়েছে, তাতে পিতার অধিকার সম্পূর্ণরূপে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। সেই পুরানো

লজ্জাই কি কম নাকি যে, নতুন আরেকটি লজ্জা নিয়ে যাব ?) অতএব আমি তো এখান থেকে নড়ব না, যে পর্যন্ত না পিতা আমাকে ( উপস্থিতির ) অনুমতি দেন কিংবা আল্লাহ্ তা'আলা এর একটা সূরাহা করেন এবং তিনিই সর্বোত্তম সূরাহাকারী। ( অর্থাৎ কোন-না-কোন উপায়ে বেনিয়ামিন ছাড়া পাক। মোট কথা আমি হয় তাকে নিয়ে যাব, না হয় ডাকার পরে যাব। অতএব আমাকে এখানেই থাকতে দাও এবং ) তোমরা পিতার কাছে ফিরে যাও এবং ( গিয়ে ) বল : আব্বা আপনার ছেলে ( বেনিয়ামিন ) চুরি করে ( তাই গ্রেফতার হয়েছে )। আমরা তো তাই বর্ণনা করি, যা ( প্রত্যক্ষভাবে ) জেনেছি। এবং আমরা ( ওয়াদা-অঙ্গীকার দেওয়ার সময় ) অদৃশ্য বিষয়ে জানী ছিলাম না ( যে, চুরি করবে। জ্ঞাত থাকলে কখনও ওয়াদা-অঙ্গীকার দিতাম না )। এবং ( যদি আমাদের কথা বিশ্বাস না করেন, তবে ) ঐ জনপদ ( অর্থাৎ মিসর ) বাসীদের কাছে ( কোন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির মাধ্যমে ) জিজ্ঞেস করে নিন, যেখানে আমরা ( তখন ) বিদ্যমান ছিলাম ( যখন চুরিতে ধরা পড়ে )। এবং ঐ কাফেলার লোকজনকেও জিজ্ঞেস করুন, যাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে আমরা ( এখানে ) এসেছি। ( এতে বোঝা যায় যে, কেনান অথবা তৎপায়বতী এলাকার আরও লোক খাদ্যশস্য আনার জন্য গিয়েছিল )। এবং বিশ্বাস করুন, আমরা সম্পূর্ণ সত্য কথা বলছি। ( সেমতে জেইহকে সেখানে রেখে সবাই দেশে ফিরে পিতার কাছে সমুদয় রুস্তান্ত বর্ণনা করল )।

### জানুশরিক জাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছিল যে, মিসরে ইউসুফ (আ)-এর সহোদর ভাই বেনিয়ামিনের রসদপত্রের মধ্যে একটি শাহী পাত্র লুকিয়ে রেখে অতঃপর কৌশলে তা বের করে তাকে চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়।

আলোচ্য প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে যে, যখন ভাইদের সামনে বেনিয়ামিনের আস-বাবপত্র থেকে চোরাই মাল বের হল এবং লজ্জায় তাদের মাথা হেট হয়ে গেল, তখন বিরক্ত হয়ে তারা বলতে লাগল :

أَنْ يَسْرُقَ نَقَدَ سَرَقَ أَخٌ لَنَا مِنْ قَهْلٍ --- অর্থাৎ সে যদি চুরি করে থাকে

তাতে আশ্চর্যের কি আছে। তার এক ভাই ছিল। সেও এমনিভাবে ইতিপূর্বে চুরি করেছিল। উদ্দেশ্য এই যে, সে আমাদের সহোদর ভাই নয়--বৈমাত্রেয় ভাই। তার এক সহোদর ভাই ছিল সে-ও চুরি করেছিল।

ইউসুফ-ভ্রাতারা এখন স্বয়ং ইউসুফ (আ)-এর প্রতি চুরির অপবাদ আরোপ করল। এতে ইউসুফ (আ)-এর শৈশবকালীন একটি ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। এখানে বেনিয়ামিনের বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ উত্থাপনের জন্য যেভাবে চক্রান্ত করা হয়েছে, তখন হবহ তেমনিভাবে ইউসুফ (আ)-এর বিরুদ্ধেও তার অজান্তে চক্রান্ত করা হয়েছিল। তখন এই ভ্রাতারা ভালোভাবেই জানত যে, উক্ত অভিযোগের ব্যাপারে ইউসুফ (আ) সম্পূর্ণ নির্দোষ। কিন্তু এখন বেনিয়ামিনের প্রতি আক্রোশের আধিক্যবশত সে ঘটনাটিকে চুরি আখ্যা দিয়ে ইউসুফ (আ)-কেও তাতে অভিযুক্ত করে দিয়েছে।

ঘটনাটি কি ছিল, এ সম্পর্কে বিভিন্ন স্বেচ্ছায়িত বর্ণিত রয়েছে। ইবনে কাসীর মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ও মুজাহিদেদ বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন যে, ইউসুফ (আ)-এর জন্মের পর কিছুকালের মধ্যেই বেনিয়ামিন জন্মগ্রহণ করে। ফলে এ সন্তান-প্রসবই জননীর মৃত্যুর কারণ হয়। ইউসুফ ও বেনিয়ামিন উভয়েই মাতৃহীন হয়ে পড়েন। তাদের লালন-পালন ফুফুর কোলে সম্পন্ন হতে লাগল। আন্নাহ্ তা'আলা ইউসুফ (আ)-কে শিশুকাল থেকেই এমন রূপ-সৌন্দর্য দান করেছিলেন যে, তাকে যে-ই দেখত, সে-ই আদর করতে বাধ্য হত। ফুফুর অবস্থাও ছিল তাই। তিনি এক মূহূর্তের জন্যও তাকে দৃষ্টি থেকে দূর হতে দিতেন না এবং দিতে পারতেন না। এদিকে পিতা হযরত ইয়াকুব (আ)-এর অবস্থাও এর চাইতে কম ছিল না। কিন্তু কচি শিশু হওয়ার কারণে কোন মহিলার রক্ষণাবেক্ষণে থাকা জরুরী বিষয় তাকে ফুফুর হাতে সমর্পণ করে দেন। শিশু যখন চলাফেরার যোগ্য হয়ে গেল, তখন ইয়াকুব (আ) তাকে নিজের সাথেই রাখতে চাইলেন। ফুফুকে একথা বললে প্রথমে আপত্তি করলেন। অতঃপর অধিক পীড়াপীড়িতে বাধ্য হয়ে ইউসুফকে পিতার হাতে সমর্পণ করলেন। কিন্তু ফেরত নেওয়ার জন্য গোপন একটি ফন্দি আঁটলেন। ফুফু হযরত ইসহাক (আ)-এর কাছ থেকে একটি হাঁসুলি পেয়েছিলেন। এটিকে অত্যন্ত মূল্যবান মনে করা হত। ফুফু এই হাঁসুলিটাই ইউসুফ (আ)-এর কাপড়ের নিচে কোমরে বেঁধে দিলেন।

ইউসুফ (আ)-এর চলে যাওয়ার পর ফুফু জোরেশোরে প্রচার শুরু করলেন যে, তার হাঁসুলিটি চুরি হয়ে গেছে। অতঃপর তন্নাশি নেওয়ার পর ইউসুফ (আ)-এর কাছ থেকে তা বের হল। ইয়াকুবী শরীয়তের বিধান অনুযায়ী ফুফু ইউসুফকে গোলাম করে রাখার অধিকার পেলেন। ইয়াকুব (আ) যখন দেখলেন যে, আইনত ফুফু ইউসুফের মালিক হয়ে গেছেন, তখন তিনি বিরুদ্ধি না করে ইউসুফকে তার হাতে সমর্পণ করলেন। এরপর যতদিন ফুফু জীবিত ছিলেন, ইউসুফ (আ) তাঁর কাছেই রইলেন।

এই ছিল ঘটনা, যাতে ইউসুফ (আ) চুরির অপরাধে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। এরপর সবার কাছেই এ সত্য দিবালোকের মত ফুটে উঠেছিল যে, ইউসুফ (আ) চুরির এতটুকু সন্দেহ থেকেও মুক্ত ছিলেন। ফুফুর আদরই তাঁকে ঘিরে এ চক্রান্ত-জাল বিস্তার করেছিল। এ সত্য ভাইদেরও জানা ছিল। এদিক দিয়ে ইউসুফ (আ)-কে কোন চুরির ঘটনার সাথে জড়িত করা তাদের পক্ষে শোভনীয় ছিল না। কিন্তু তাঁর ব্যাপারে তাদের যে বাড়াবাড়ি ও অবৈধাচরণ আজ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল, এটা তারই সর্বশেষ অংশ ছিল।

فَاَسْرَهَا يُّوسُفُ نَبِيٌّ نَفْسَهُ وَلَمْ يُبَدِّهَا لَهُمْ

ভাইদের কথা শুনে একথা মনে মনেই রাখলেন যে, এরা দেখি এখনও পর্যন্ত আমার পেছনে লেগে রয়েছে। এখনো তারা আমাকে চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত করছে। কিন্তু তিনি ভাইদের কাছে এ কথা প্রকাশ হতে দিলেন না যে, তিনি তাদের একথা শুনেছেন এবং তন্দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছেন।

قَالَ أَنْتُمْ شَرُّكُمْ لَنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ

মনে মনে বললেন : তোমাদের স্ত্র ও অবস্থাই মন্দ যে, জেনেছনে ভাইয়ের প্রতি চুরির দোষারোপ করছ। আরও বললেন : তোমাদের কথা সত্য কি মিথ্যা সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলাই অধিক জানেন। প্রথম বাক্যটি মনে মনে বলেছেন এবং দ্বিতীয় বাক্যটি সন্তুষ্ট জোরেই বলেছেন।

قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَكَ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا  
مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ۝

ইউসুফ ভ্রাতারা যখন দেখল যে, কোন চেষ্টাই ফলবতী হচ্ছে না এবং বেনিয়ামিনকে এখানে ছেড়ে যাওয়া ছাড়া গত্যস্তর নেই, তখন তারা প্রার্থনা জানাল যে, এর পিতা নিরতিশয় ব্যয়োরুদ্ধ ও দুর্বল। এর বিচ্ছেদের যাতনা সহ্য করা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর নয়। তাই আপনি এর পরিবর্তে আমাদের কাউকে গ্রেফতার করে নিন। আমরা দেখছি, আপনি খুবই অনুগ্রহশীল। এ উরসায়ই আমরা এ প্রার্থনা জানাচ্ছি। অথবা অর্থ এই যে, আপনি পূর্বেও আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন।

قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنٌ وَجَدْنَا مَتَّصِنًا صِدْقًا وَإِنَّا  
إِنِ الظَّالِمُونَ ۝

ইউসুফ (আ) ভাইদেরকে আইনানুগ উত্তর দিয়ে বললেন : যাকে ইচ্ছা গ্রেফতার করার ক্ষমতা আমাদের নেই, বরং যার কাছ থেকে চোরাই মাল বের হয়েছে, তাকে ছাড়া যদি অন্য কাউকে গ্রেফতার করি, তবে আমরা তোমাদেরই ফতোয়া ও ফয়সালা অনুযায়ী জালিম হয়ে যাব। কারণ, তোমরাই বলেছ যে, যার কাছ থেকে চোরাই মাল বের হবে, সে-ই তার শাস্তি পাবে।

إِنَّمَا اسْتَسْتَأْذِنُكُمْ وَإِنَّمَا اسْتَسْتَأْذِنُكُمْ وَإِنَّمَا اسْتَسْتَأْذِنُكُمْ  
إِنَّمَا اسْتَسْتَأْذِنُكُمْ وَإِنَّمَا اسْتَسْتَأْذِنُكُمْ

মিনেঞ্জ মুক্তির ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেল, তখন পরস্পর পরামর্শ করার জন্য একটি পৃথক জায়গায় একত্রিত হল।

قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَيْسَ لَنَا  
قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَيْسَ لَنَا

যে, পিতা তোমাদের কাছ থেকে বেনিয়ামিনকে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য কঠিন শপথ নিয়েছিলেন? তোমরা ইতিপূর্বেও ইউসুফের ব্যাপারে একটি মারাম্বক অন্যান্য করেছ। তাই আমি তত্ত্বরণ পর্যন্ত মিসর ত্যাগ করব না, যতক্ষণ পিতা নিজেই আমাকে এখান থেকে



ফিরিয়ে নেওয়ার আদেশ না দেবেন অথবা আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে আমার এখান থেকে চলে যাওয়ার নির্দেশ না আসে। আল্লাহ তা'আলাই সর্বোত্তম নির্দেশদাতা।

এখানে যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার উক্তি বর্ণিত হয়েছে, কেউ কেউ বলেন, তিনি হচ্ছেন ইয়াহুদা। তিনি ছিলেন বয়সে সবার বড়। একদা ইউসূফ (আ)-কে হত্যা না করার পরামর্শ তিনিই দিয়েছিলেন। কালও মতে তিনি হচ্ছেন শামউন। তিনি প্রভাব-প্রতিপত্তির ও মর্যাদার দিক দিয়ে সবার বড় গণ্য হতেন।

ارْجِعُوا إِلَىٰ آبَائِكُمْ --- অর্থাৎ বড় ভাই বললেন—আমি তো এখানেই থাকব।

তোমরা সবাই পিতার কাছে ফিরে যাও এবং তাঁকে বল যে, আপনার ছেলে চুরি করেছে। আমরা যা বলছি তা আমাদের প্রত্যক্ষদৃষ্ট চাক্ষুষ ঘটনা। আমাদের সামনেই তার আসবাবপত্র থেকে চোরাই মাল বের হয়েছে।

وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ --- অর্থাৎ আমরা আপনার কাছে ওয়াদা-

অঙ্গীকার করেছিলাম যে, বেনিয়ামিনকে অবশ্যই ফিরিয়ে আনব। আমাদের এ ওয়াদা ছিল বাহ্যিক অবস্থা বিচারে। অদৃশ্যের অবস্থা আমাদের জানা ছিল না যে, সে চুরি করে প্রেফতার হবে এবং আমরা নিরুপায় হয়ে পড়ব। এ বাক্যের এ অর্থও হতে পারে যে, আমরা ভাই বেনিয়ামিনের যথাসাধ্য হিফায়ত করেছি, যাতে সে কোন অনুচিত কাজ করে বিপদে না পড়ে। কিন্তু আমাদের এ চেষ্টা বাহ্যিক অবস্থা পর্যন্তই সত্ত্বপন্ন ছিল। আমাদের দৃষ্টির আড়ালে ও অজ্ঞাতে সে এমন কাজ করবে, আমাদের জানা ছিল না।

ইউসূফ-ভ্রাতারা ইতিপূর্বে পিতাকে একবার ধোঁকা দিয়েছিল। ফলে তারা জানত যে, এ বর্ণনায় পিতা কিছুতেই আশ্বস্ত হবেন না এবং তাদের কথা বিশ্বাস করবেন না। তাই অধিক জোর দেওয়ার জন্য বলল : আপনি যদি আমাদের কথা বিশ্বাস না করেন, তবে যে শহরে আমরা ছিলাম (অর্থাৎ মিসরে), তথাকার লোকদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখুন এবং আপনি ঐ কাফেলার লোকজনকেও জিজ্ঞেস করতে পারেন যারা আমাদের সাথেই মিসর থেকে কেনান এসেছে। আমরা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সত্যবাদী।

এ ক্ষেত্রে তফসীরে-মাযহারীতে এ প্রশ্নটি পুনর্বাঞ্ছ করা হয়েছে যে, ইউসূফ (আ) পিতার সাথে এমন নির্দয় ব্যবহার কেন করলেন? নিজের অবস্থা তো পিতাকে জানালেনই না, তদুপরি ছোট ভাইকেও রেখে দিলেন। ভ্রাতারা বারবার মিসরে এসেছে; কিন্তু তিনি তাদের কাছে আত্মপরিচয় প্রকাশ করলেন না এবং পিতার কাছেও সংবাদ পাঠালেন না। এসব প্রশ্নের উত্তরে তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে :

اذن عمل ذ لك باسم الله تعالى ليزيد في بلاه يعقوب --- অর্থাৎ

ইউসূফ (আ) এসব কাজ আল্লাহর নির্দেশেই করেছিলেন, ইয়াকুব (আ)-এর পরীক্ষাকে পূর্ণতা দান করাই ছিল এ সবার উদ্দেশ্য।

বিধান ও মাস'আলা : **وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمَنَا**---দ্বারা প্রমাণিত হয়

যে, মানুষ যখন কারও সাথে কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হয়, তখন তা বাহ্যিক অবস্থার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয়---অজানা বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না। ইউসুফ-দ্রাতার পিতার সাথে বেনিয়ামিনের হিফাযত সম্পর্কে যে অঙ্গীকার করেছিল, তা ছিল তাদের অায়ত্বাধীন বিষয়ের সাথে সম্পর্কহীন। বেনিয়ামিনের চুরির অভিযোগে গ্রেফতার হওয়াতে অঙ্গীকারে কোন ত্রুটি দেখা দেয়নি।

তফসীরে-কুরতুবীতে এ আয়াত থেকে আরও একটি মাস'আলা বের করে বলা হয়েছে : এ বাক্য দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সাক্ষ্যদান জানার উপর নির্ভরশীল। ঘটনা সম্পর্কে জান যে কোন ভাবে হোক, তদনুযায়ী সাক্ষ্য দেওয়া যায়। তাই কোন ঘটনার সাক্ষ্য যেমন চাক্ষুশ দেখে দেওয়া যায়, তেমনি কোন বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির কাছে শুনেও দেওয়া যায়। তবে আসল সূত্র গোপন করা যাবে না---বর্ণনা করতে হবে যে, ঘটনাটি সে নিজে দেখেনি---অমুক নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির কাছে শুনেছে। এ নীতির ভিত্তিতেই মালেকী মাযহাবের ফিরাহ'বিদগণ অন্ধ ব্যক্তির সাক্ষ্যকেও বৈধ সাব্যস্ত করেছেন।

আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে আরও প্রমাণিত হয় যে, কোন ব্যক্তি যদি সৎ ও সঠিক পথে থাকে; কিন্তু ক্ষেত্র এমন যে, অন্যরা তাকে অসৎ কিংবা পাপ কাজে লিপ্ত বলে সন্দেহ করতে পারে তবে তার পক্ষে এ সন্দেহের কারণ দূর করা উচিত, যাতে অন্যরা কু-ধারণার গোনাহে লিপ্ত না হয়। ইউসুফ (আ)-এর সাথে কৃত পূর্ববর্তী আচরণের আলোকে বেনিয়ামিনের ঘটনায় ভাইদের সম্পর্কে এরূপ সন্দেহ সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক ছিল যে, এবারও তারা মিথ্যা ও সত্যের আশ্রয় গ্রহণ করেছে। তাই এ সন্দেহ দূরীকরণের জন্য জনপদ অর্থাৎ মিসরবাসীদের এবং মুগপৎ কাফেলার লোকজনের সাক্ষ্য উপস্থিত করা হয়েছে।

রসুলুল্লাহ্ (সা) ব্যক্তিগত আচরণের মাধ্যমেও এ বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। একবার তিনি উম্মুল-মু'মিনীন হযরত সাকিয়া (রা)-কে সাথে নিয়ে মসজিদ থেকে এক গলি দিয়ে যাচ্ছিলেন। গলির মাথায় দু'জন লোককে দেখে তিনি দূর থেকেই বলে দিলেন : আমার সাথে 'সাকিয়া বিনতে হযাই' রয়েছে। ব্যক্তিদ্বয় আরম্ভ করল : ইয়া রাসুলান্নাহ্, আপনার সম্পর্কেও কেউ কু-ধারণা করতে পারে কি? তিনি বললেন : হ্যাঁ শয়তান মানুষের শিরা-উপশিরায় প্রডাব বিস্তার করে। কাজেই কারও মনে সন্দেহ সৃষ্টি করে দেওয়া বিচিত্র নয়।--- (বুখারী, মুসলিম, কুরতুবী)

قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبِّرْ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ  
يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۝ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَ

قَالَ يَا سَفِي عَلَى يُونُسَ وَأَبْيَضَتْ عَيْنُهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ  
 ৞ قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَوْا تَذَكَّرُ يُونُسَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ  
 مِنْ أَهْلِكَ ۞ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ  
 مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ يَلْبِسُ إِذْ هَبُوا قَتَصَسُوا مِنْ يُونُسَ وَ  
 أَحْبَبَهُ وَلَا تَأْتِسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْتِسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ  
 إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ۞

(৮৩) তিনি বললেন : কিছুই না, তোমার মনগড়া একটি কথা নিয়েই এসেছ। এখন ধৈর্য ধারণই উত্তম। সম্ভবত আল্লাহ তাদের সবাইকে একসঙ্গে আমার কাছে নিয়ে আসবেন। তিনিই সুবিজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (৮৪) এবং তাদের দিক থেকে তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং বললেন : হায় আফসোস ইউসুফের জন্য! এবং দুঃখে তাঁর চক্ষুদ্বয় সাদা হয়ে গেল। এবং অসহনীয় মনস্তাপে তিনি ছিলেন ক্লিষ্ট। (৮৫) তারা বলতে লাগল : আল্লাহর কসম! আপনি তো ইউসুফের স্মরণ থেকে নিবৃত্ত হবেন না। যে পর্যন্ত মরণাপন্ন না হয়ে যান কিংবা মৃত্যুবরণ না করেন। (৮৬) তিনি বললেন : আমি তো আমার দুঃখ ও অস্থিরতা আল্লাহর সমীপেই নিবেদন করছি এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে আমি যা জানি, তা তোমরা জান না! (৮৭) বৎসগণ! যাও, ইউসুফ ও তাঁর ভাইকে তালাশ কর এবং আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহর রহমত থেকে কাফির সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য কেউ নিরাশ হয় না।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

ইয়াকুব (আ) (ইউসুফের ব্যাপারে তাদের সবার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। তাই পূর্বকার ঘটনার অনুরূপ মনে করে) বলতে লাগলেন : (বেনিয়ামিন চুরিতে ধৃত হয়নি;) বরং তোমরা মনগড়া একটি বিষয় গড়ে নিয়েছ। অতএব (পূর্বকার মত) সবরই করব, যাতে অভিযোগের লেশমাত্র থাকবে না। আল্লাহর কাছ থেকে (আমার) আশা যে, তিনি তাদের সবাইকে (অর্থাৎ ইউসুফ বেনিয়ামিন ও মিসরে অবস্থানরত বড় ভাই---এই তিনজনকে) আমার কাছে একসঙ্গে পৌঁছে দেবেন। কেননা তিনি (বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে) খুবই জ্ঞাত, (তাই তিনি সবারই খবর জানেন যে, তারা কোথায় এবং কি অবস্থায় আছে। তিনি) খুবই প্রজ্ঞাময়। (যখনই মিলিত করতে চাইবেন, তখন হাজারো কারণ ও পস্থা ঠিক করে দেবেন)। এবং (এ উত্তর দিয়ে

তাদের পক্ষ থেকে ব্যথা পাওয়ার কারণে) তাদের দিক থেকে অন্যদিকে মুখ ফিঙ্গিয়ে নিলেন এবং (এ নতুন ব্যথার ফলে পুরাতন ব্যথা তাজা হয়ে যাওয়ার কারণে ইউ-সুফকে স্মরণ করে বলতে লাগলেন; হায় ইউসুফ! আফসোস! এবং ব্যথায় কাঁদতে কাঁদতে) তাঁর চোখ দুটি স্বেত বর্ণ হয়ে গেল। (কেননা অধিক কান্নার ফলে চোখের কৃষ্ণতা হ্রাস পায় এবং চোখ অনুজ্জ্বল অথবা জ্যোতিহীন হয়ে পড়ে) এবং তিনি (মনো-বেদনায় ভেতরে ভেতরেই) ক্ষয়িত হচ্ছিলেন (কেননা, তীব্র মনোকষ্টের সাথে তীব্র দমন সংযুক্ত হলে ক্ষয়ের অবস্থা সৃষ্টি হয়; ধৈর্যশীলরা এ ধরনের অবস্থার সম্মুখীন হন)। ছেলেরা বলতে লাগল: আল্লাহর কসম, (মনে হয়), আপনি সদাসর্বদা ইউ-সুফের স্মরণেই ব্যাপৃত থাকবেন; এমন কি শুকিয়ে মরণাপন্ন হয়ে যাবেন কিংবা মরেই যাবেন (অতএব এত দুঃখে ফার্সদা কি?) ইয়াকুব (আ) বললেন: (আমার কান্নায় তোমাদের অসুবিধা কি?) আমি তো আমার দুঃখ ও ব্যথা একমাত্র আল্লাহর কাছেই প্রকাশ করি (তোমাদেরকে তো কিছু বলি না) এবং আল্লাহর ব্যাপার আমি মতটুকু জানি তোমরা জান না। ('আল্লাহর ব্যাপার' বলে হয় অনুগ্রহ, কৃপা ও রহমত বোঝানো হয়েছে, না হয় সবার সাথে মিলনের ইলহাম বোঝানো হয়েছে: প্রত্যক্ষভাবে হোক কিংবা ইউসুফের সেই স্বপ্নের মাধ্যমে, যার ব্যাখ্যা এখনও পর্যন্ত বাস্তবায়িত হচ্ছিল না কিন্তু অবশ্যতাবী ছিল)। বৎসগণ! (আমি তো শুধু আল্লাহর দরবারেই দুঃখ প্রকাশ করি। কান্নাদির শ্রুতি তিনিই। কিন্তু বাহ্যিক তদবীর তোমরাও কর এবং একবার আবার সফরে) যাও (এবং) ইউসুফ ও তার ভাইকে খোঁজ কর (অর্থাৎ এমন পন্থা অন্বেষণ কর, যদ্বারা ইউসুফের সন্ধান মেলে এবং বেনিয়ামিনকে মুক্ত করা যায়) এবং আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহর রহমত থেকে তারাই নিরাশ হয়, যারা কাফির।

### আনুঘটিক জাতব্য বিষয়

ইয়াকুব (আ)-এর ছোট ছেলে বেনিয়ামিন মিসরে গ্রেফতার হওয়ার পর তাঁর ভ্রাতারা দেশে ফিরে এল এবং ইয়াকুব (আ)-কে যাবতীয় বৃত্তান্ত শুনা। তারা তাঁকে আশ্বস্ত করতে চাইল যে, এ ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণ সত্যবাদী। বিশ্বাস না হলে মিসর-বাসীদের কাছে কিংবা মিসর থেকে কেনানে আগত কাফেলার লোকজনের কাছে জিজ্ঞেস করা যায়। তারাও বলবে যে, বেনিয়ামিন চুরির কারণে গ্রেফতার হয়েছে। ইউসুফ (আ)-এর ব্যাপারে ছেলেদের মিথ্যা একবার প্রমাণিত হয়েছিল। তাই এবারও ইয়াকুব (আ) বিশ্বাস করতে পারলেন না; যদিও বাস্তবে এ ব্যাপারে তারা বিন্দুমাত্রও মিথ্যা বলেনি। এ কারণে এ ক্ষেত্রেও তিনি ঐ বাক্যই উচ্চারণ করলেন, যা ইউসুফ (আ)-এর নিখোঁজ হওয়ার সময় উচ্চারণ করেছিলেন।

بَل سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ

مَرًّا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ — অর্থাৎ তোমরা যা বলছ সত্য নয়। তোমরা মনগড়া কথা বলছ।

কিন্তু আমি এবারও সবর করব। সবরই আমার জন্য উত্তম।

এ থেকেই কুরতুবী বলেন : মুজতাহিদ ইজতিহাদের মাধ্যমে যে কথা বলেন তা ভ্রান্তও হতে পারে। এমনকি, পয়গম্বরও যদি ইজতিহাদ করে কোন কথা বলেন, তবে প্রথম পর্যায়ে তা সঠিক না হওয়াও সম্ভবপর। যেমন, এ ব্যাপারে হয়েছে। ইয়াকুব (আ) ছেলেরদের সত্যকেও মিথ্যা মনে করে নিয়েছেন। কিন্তু পয়গম্বরগণের বৈশিষ্ট্য এই যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে ভ্রান্তি থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। কাজেই পরিণামে তাঁরা সত্যে উপনীত হন।

এমনও হতে পারে যে, ‘মনগড়া কথা’ বলে ইয়াকুব (আ) ঐ কথা বুঝিয়েছেন যা মিসরে গড়া হয়েছিল। অর্থাৎ একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত কৃত্রিম চুরি দেখিয়ে বেনিয়ামিনকে প্রেফতার করে নেওয়া। অবশ্য ভবিষ্যতে এর পরিণাম চমৎকার আকারে প্রকাশ পেল। আয়াতের পরবর্তী বাক্যে এ দিকে ইঙ্গিতও হতে পারে। বলা

হয়েছে : **عَسَىٰ اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا**—অর্থাৎ আশা করা যায় যে সম্ভবত শীঘ্রই আল্লাহ তাদের সবাইকে আমার কাছে পৌঁছে দেবেন।

মোট কথা, ইয়াকুব (আ) এবার ছেলেরদের কথা মেনে নেন নি। এই না-মানার তাৎপর্য ছিল এই যে, প্রকৃতপক্ষে কোন চুরিও হয়নি এবং বেনিয়ামিনও প্রেফতার হয়নি। এটা যথাস্থানে নিভুল ছিল। কিন্তু ছেলেরা নিজ জ্ঞানমতে যা বলেছিল, তাও ভ্রান্ত ছিল না।

**وَتَوَلَّىٰ مِنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسْفَىٰ عَلَىٰ يَوْسُفَ وَآيِسُفَ عَيْنَاهُ مِنْ**

**الْعُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ**—অর্থাৎ দ্বিতীয়বার আঘাত পাওয়ার পর ইয়াকুব (আ) এ ব্যাপারে

ছেলেরদের সাথে বাক্যলাপ ত্যাগ করে পালনকর্তার কাছেই ফরিয়াদ করতে লাগলেন এবং বললেন : ইউসুফের জন্য বড়ই পরিতাপ। এ ব্যাথায় ক্রন্দন করতে করতে তাঁর চোখ দুটি স্নেহ বর্ণ ধারণ করল। অর্থাৎ দৃষ্টিশক্তি লোপ পেল কিংবা দুর্বল হয়ে গেল। তফসীরবিদ মুকাতিল বলেন : ইয়াকুব (আ)-এর এ অবস্থা হয় বছর পর্যন্ত অব্যাহত

ছিল। এ সময় দৃষ্টিশক্তি প্রায় লোপ পেয়েছিল। **فَهُوَ كَظِيمٌ**—অর্থাৎ অতঃপর তিনি

স্বপ্ন হয়ে গেলেন। কারণ কাছে নিজের মনোবেদনা প্রকাশ করতেন না। **كَظِيمٌ** শব্দটি

থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং ভরে যাওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, দুঃখ ও বিষাদে তাঁর মন ভরে গেল এবং মুখ বন্ধ হয়ে গেল। কারণ কাছে তিনি দুঃখের কথা বর্ণনা করতেন না।

এ কারণেই <sup>৯৮-</sup> **كُظِمَ** শব্দটি ক্রোধ সংবরণ করা অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ মন ক্রোধে পরিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও মুখ অথবা হাত দ্বারা ক্রোধের কোন কিছু প্রকাশ না পাওয়া। হাদীসে আছে : **وَمَنْ يَكْظِمُ الْغَيْظَ يَأْجُرْهُ اللَّهُ**---অর্থাৎ যে ব্যক্তি ক্রোধ সংবরণ করে এবং শক্তি থাকা সত্ত্বেও ক্রোধ প্রকাশ করে না, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বড় প্রতিদান দেবেন।

এক হাদীসে আছে, হাশরের দিন আল্লাহ্ তা'আলা একাপ লোকদেরকে প্রকাশ্য সমাবেশে এনে বলবেন : জাম্মাতের নিয়ামতসমূহের মধ্যে যেটি ইচ্ছা, গ্রহণ কর।

ইমাম ইবনে জরীর এ প্রসঙ্গে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, বিপদ মুহূর্তে **أَنَا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهُهُ رَا جَعُونَ** বলার শিক্ষা এ উশ্মতেরই অন্যতম বৈশিষ্ট্য। দুঃখ-

কষ্ট থেকে মুক্তি দেওয়ার ব্যাপারে এ বাক্যটি অত্যন্ত ক্রিয়াশীল। উশ্মতে মুহাম্মদীর বৈশিষ্ট্য এভাবে জানা গেছে যে, তীব্র দুঃখ ও আঘাতের সময় ইয়াকুব (আ) এ বাক্যটির পরিবর্তে **يَا أَسْفَىٰ عَلَىٰ يَوْسُفَ** বলেছেন।---বায়হাকী 'শোআবুল-ঈমানে'ও

এ হাদীসটি ইবনে আক্বাসের রেওয়াজে বর্ণনা করেছেন।

ইউসুফের প্রতি ইয়াকুব (আ)-এর গভীর মহক্বাতের কারণ : ইউসুফ (আ)-এর প্রতি হমরত ইয়াকুব (আ)-এর অসাধারণ মহক্বত ছিল। ইউসুফ (আ) নিখোঁজ হয়ে গেলে তিনি একবারেই হতোদ্যম হয়ে পড়েন। কোন কোন রেওয়াজে পিতা-ছেলের বিচ্ছেদের সময়কাল চল্লিশ বছর এবং কোন কোন রেওয়াজে আশি বছর বলা হয়েছে। দীর্ঘ সময় তিনি ছেলের শোকে কাঁদতে কাঁদতে অতিবাহিত করেন। ফলে তাঁর দৃষ্টি-শক্তি রহিত হয়ে যায়। সন্তানের মহক্বতে এতটা বাড়াবাড়ি বাহ্যত পয়গম্বরসুলভ পদ-মর্যাদার পক্ষে শোভনীয় নয়। কোরআন পাকে সন্তান-সন্ততিকে 'ফিতনা' আখ্যা দিয়ে

বলা হয়েছে : **إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ** অর্থাৎ তোমাদের ধনসম্পদ

ও সন্তান-সন্ততি ফিতনা ও পরীক্ষা বৈ নয়। পক্ষান্তরে কোরআন পাকের ভাষায় পয়গ-ম্বরগণের শান হচ্ছে এই **إِنَّا آخِضْنَا لَهُمْ بِخِصْمَتِنَا كُرَىٰ الدُّارِ**---অর্থাৎ আমি

পয়গম্বরগণকে একটি বিশেষ গুণে গুণান্বিত করেছি। সে গুণ হচ্ছে পরকালের সমরণ। মালেক ইবনে দীনারের মতে এর অর্থ এই যে, আমি তাঁদের অন্তর থেকে সাংসারিক মহক্বত বের করে দিয়েছি এবং শুধু আখিরাতের মহক্বত দ্বারা তাদের অন্তর পরিপূর্ণ করে দিয়েছি। কোন বস্তু গ্রহণ ও প্রত্যাখ্যানের ব্যাপারে তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে আখিরাত।

এ বর্ণনা থেকে এ সন্দেহ আরও কঠিনভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ইয়াকুব (আ)-এর সন্তানের মহব্বতে এতটুকু ব্যাকুল হয়ে পড়া কেমন করে শুদ্ধ হতে পারে?

কাফী সানাউল্লাহ পানিপথী (র) তফসীরে মামহারীতে এ প্রশ্ন উল্লেখ করে হযরত মুজাদ্দিদে-আলফেসানীর এক বিশেষ বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। এর সারসর্ম্ম এই যে, নিঃসন্দেহে সংসার ও সংসারের উপকরণাদির প্রতি মহব্বত নিন্দনীয়। কোরআন ও হাদীসের অসংখ্য বর্ণনা এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু সংসারের যেসব বস্তু আখিরাতের সাথে সম্পর্কযুক্ত, সেগুলোর মহব্বত প্রকৃতপক্ষে আখিরাতেরই মহব্বত। ইউসুফ (আ)-এর গুণ-গরিমা শুধু দৈহিক রূপ-সৌন্দর্যের মাধ্যমেই সীমাবদ্ধ ছিল না বরং পয়গম্বরসুলভ পবিত্রতা ও চারিত্রিক সৌন্দর্যও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ সমষ্টির কারণে তাঁর মহব্বত সংসারের মহব্বত ছিল না বরং প্রকৃতপক্ষে আখিরাতের মহব্বত ছিল।

এখানে এ বিষয়টিও প্রবিধানযোগ্য যে, এ মহব্বত যদিও প্রকৃতপক্ষে সংসারের মহব্বত ছিল না, কিন্তু সর্বাবস্থায় এতে একটি সাংসারিক দিকও ছিল। এ জন্যই এটা হযরত ইয়াকুব (আ)-এর পরীক্ষার কারণ হয়েছে এবং তাঁকে চল্লিশ বছরের সুদীর্ঘ ক্লিষ্টদের অসহনীয় যাতনা ভোগ করতে হয়েছে। এই ঘটনার আদ্যোপান্ত এ বিষয়ের সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এমন সব পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছে, যাতে ইয়াকুব (আ)-এর যাতনা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে গেছে। নতুবা ঘটনার শুরুতে এত গভীর মহব্বত পোষণকারী পিতার পক্ষে পুত্রদের কথা শুনে নিশ্চুপ ঘরে বসে থাকা কিছুতেই সম্ভবপর হত না, বরং তিনি অবশ্যই অকুস্থলে পৌঁছে খোঁজ-খবর নিতেন। ফলে তখনই যাতনার পরিসমাপ্তি ঘটতে পারত। কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকেই এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে যে, তখন এদিকে দৃষ্টি যায়নি। এরপর ইউসুফ (আ)-কে পিতার সাথে যোগাযোগ করতে ওহীর মাধ্যমে নিষেধ করা হল। ফলে মিসরের শাসন-কর্ত্তা হাতে পেয়েও তিনি যোগাযোগের কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নি। এর চাইতে বেশি ঋষের বাঁধ ভেঙ্গে দেওয়ার মত ঘটনাবলী তখন ঘটেছে, যখন ইউসুফ-ভ্রাতারা বার বার মিসর গমন করতে থাকে। তিনি তখনও ভাইদের কাছে গোপন রহস্য খোলেন নি এবং পিতাকে সংবাদ দেওয়ার চেষ্টা করেন নি, বরং একটি কৌশলের মাধ্যমে অপর ভাইকেও নিজের কাছে আটকে রেখে পিতার মর্মবেদনাকে দ্বিগুণ করে দেন। এসব কর্মকাণ্ড ইউসুফ (আ)-এর মত একজন মনোনীত পয়গম্বর দ্বারা ততক্ষণ সম্ভবপর নয়, যতক্ষণ না তাঁকে ওহীর মাধ্যমে নির্দেশ দেওয়া হয়। এ কারণেই কুরতুবী প্রমুখ তফসীরবিদ ইউসুফ (আ)-এর এসব কর্মকাণ্ডকে আল্লাহর ওহীর ফলশ্রুতি সাব্যস্ত করেছেন। কোর-

আনের **وَاللّٰهُ اَعْلَمُ** বাক্যেও এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে।

**قَالُوا تَاللّٰهِ تَفْتَرُ تَذَكُرُ يٰسُفَا**—অর্থাৎ ছেলেরা পিতার এহেন মনোবেদনা

সঙ্গেও এমন অভিযোগহীন সবর দেখে বলতে লাগল : আল্লাহর কসম, আপনি তো সদা-সর্বদা ইউসুফকেই স্মরণ করতে থাকেন। ফলে হয় আপনি অসুস্থ হয়ে পড়বেন, না হয়

মনেই যাবেন। (প্রত্যেক আঘাত ও দুঃখের একটা সীমা আছে। সাধারণত সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে মানুষ দুঃখ-বেদনা ভুলে যায়। কিন্তু আপনি এত দীর্ঘদিন অতি-বাহিত হওয়ার পরও প্রথম দিনের মতই রয়েছেন এবং আপনার দুঃখ তেমনি সতেজ রয়েছে।)

ইয়াকুব (আ) ছেলের কথা শুনে বললেন : **إِنَّمَا أَشْكُوا بَنِيَّ وَحَزَنِي**

**إِنَّمَا أَشْكُوا بَنِيَّ وَحَزَنِي**—অর্থাৎ আমি আমার ফরিদাদ ও দুঃখ-কষ্টের বর্ণনা তোমাদের অথবা অন্য কারও কাছে করি না বরং আল্লাহর কাছে করি। কাজেই আমাকে আমার অবস্থায় থাকতে দাও। সাথে সাথে একথাও প্রকাশ করলেন যে, আমার সমরণ করা রুখা যাবে না। আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন কিছু জানি, যা তোমরা জান না। অর্থাৎ আল্লাহ ওয়াদা করেছেন যে, তিনি আমাকে সবার সাথে মিলিত করবেন।

**يَا بَنِيَّ إِذْ هَبُوا دَعَحَسُوا مِن يُونُسَ وَأَخِيَةَ**—অর্থাৎ বৎসরা, যাও।

ইউসুফ ও তার ভাইকে খোঁজ কর এবং আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ে না। কেননা, কাফির ছাড়া কেউ তাঁর রহমত থেকে নিরাশ হয় না।

ইয়াকুব (আ) এতদিন পর ছেলেরদেরকে আদেশ দিলেন যে, যাও। ইউসুফ ও তার ভাইয়ের খোঁজ কর এবং তাদেরকে পাওয়ার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে না। ইতিপূর্বে কখনও তিনি এমন আদেশ দেন নি। এটা তুফসীরেরই ব্যাপার। ইতিপূর্বে তাদেরকে পাওয়া তুফসীরে ছিল না। তাই এরূপ কোন কাজও করা হয়নি। এখন মিলনের মুহূর্ত ঘনিয়ে এসেছিল। তাই আল্লাহ তা'আলা এর উপযুক্ত তদবীরও মনে জাগিয়ে দিলেন।

উভয়কে খোঁজ করার স্থান মিসরই সাব্যস্ত করা হল। এটা বেনিয়ামিনের বেলায় নির্দিষ্টই ছিল কিন্তু ইউসুফ (আ)-কে মিসরে খোঁজ করার বাহ্যত কোন সন্দেহ ছিল না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যখন কোন কাজের ইচ্ছা করেন, তখন এর উপযুক্ত কারণাদিও উপস্থিত করে দেন। তাই এবার ইয়াকুব (আ) সবাইকে খোঁজ করার জন্য ছেলেরদেরকে আবার মিসর যেতে নির্দেশ দিলেন। কেউ কেউ বলেন : আশীষে-মিসর কর্তৃক ছেলেরদের রসদপত্রের মধ্যে পণ্য ক্ষেপিত দেওয়ার ঘটনা থেকে ইয়াকুব (আ) প্রথম বার আঁচ করতে পেরেছিলেন যে, এই আশীষে-মিসর খুবই উদ্র ও দয়ালু ব্যক্তি। বিচিত্র নয় যে, সে-ই তাঁর হারানো ইউসুফ।

নির্দেশ ও মাস'আলা : ইমাম কুরতুবী বলেন : ইয়াকুব (আ)-এর ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, জান, মাল ও সন্তান-সন্ততির ব্যাপারে কোন বিপদ ও কষ্ট দেখা দিলে প্রত্যেক মুসলমানের উপর ওয়াজিব হচ্ছে সবার ও আল্লাহর ফয়সালায় সমস্তটু থাকার মাধ্যমে এর প্রতিকার করা এবং ইয়াকুব (আ) ও অন্যান্য পয়গম্বরের অনুসরণ করা।



হাসান বসরী (রহ) বলেন : মানুষ যত চোক গিলে, তন্মধ্যে দু'টি চোকই আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়। এক বিপদে সবার ও দুই ক্রোধ সংবরণ।

হাদীসে আবু হুরায়রার রেওয়াজেতে রসুলুল্লাহ (সা)-এর উক্তি বর্ণিত রয়েছে যে, **من بئس لم يصبر** অর্থাৎ যে ব্যক্তি স্থায়ী বিপদে সবার কাছে বর্ণনা করে, সে সবার করেনি।

হযরত ইবনে আব্বাস বলেন : আল্লাহ তা'আলা ইয়াকুব (আ)-কে সবারের কারণে শহীদদের সওয়াব দান করেছেন। এ উশ্মতের মধ্যেও যে ব্যক্তি বিপদে সবার করবে, তাকে এমনি প্রতিদান দেওয়া হবে।

ইমাম কুরতুবী ইয়াকুব (আ)-এর এই অগ্নি পরীক্ষার কারণে বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন : একদিন ইয়াকুব (আ) ত হাজ্জদের নামায পড়ছিলেন। আর তাঁর সামনে ঘুমিয়ে ছিলেন ইউসুফ (আ)। হঠাৎ ইউসুফ (আ)-এর নাক ডাকার শব্দ শুনে তাঁর মনোযোগ সেদিকে নিবন্ধ হয়ে গেল। এরপর দ্বিতীয় ও তৃতীয়বারও এমনি হল। তখন আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতা-দেরকে বললেন : দেখ, আমাদের দোস্ত ও মকবুল বান্দা আমাদের সন্দেহন করার মাঝখানে অন্যের দিকে মনোযোগ দিচ্ছে। আমার ইশ্বত ও প্রতাপের কসম, আমি তার চক্ষুয় উৎপাটিত করে দেব, যখনই সে অন্যের দিকে তাকায় এবং যার দিকে মনোযোগ দিয়েছে, তাকে দীর্ঘকালের জন্য বিচ্ছিন্ন করে দেব। কোন কোন রেওয়াজেতেও এ ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে।

তাই বুখারী হাদীসে হযরত আয়েশা (রা)-র রেওয়াজেতে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি রসুলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞেস করলেন : নামাযে অন্য দিকে তাকানো কেমন? তিনি বললেন : এর মাধ্যমে শয়তান বান্দার নামায ছোঁমেরে নিয়ে যায়।

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَكْنَا الضَّرَّ  
وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَمَةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا ۗ إِنَّ  
اللَّهَ بِحَزَنِ الْمُتَصَدِّقِينَ ﴿١٠﴾ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَ  
أَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ ﴿١١﴾ قَالُوا إِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ ۗ قَالَ أَنَا  
يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي ۖ قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا ۗ إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ  
فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٢﴾ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ أَشْرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا  
وَإِنْ كُنَّا لَخُطِيبِينَ ﴿١٣﴾ قَالَ لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَيَغْفِرُ اللَّهُ

## لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ﴿٥٠﴾

(৮৮) অতঃপর যখন তারা ইউসূফের কাছে পৌঁছল তখন বলল : হে আযীয, আমরা ও আমাদের পরিবারবর্গ কল্টের সম্মুখীন হয়ে পড়েছি এবং আমরা অপরাপ্ত পূঁজি নিয়ে এসেছি। অতএব আপনি আমাদেরকে পুরাপুরি বরাদ্দ দিন এবং আমাদেরকে দান করুন। আল্লাহ্ দাতাদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকেন। (৮৯) ইউসূফ বললেন : তোমাদের জানা আছে কি, যা তোমরা ইউসূফ ও তার ভাইয়ের সাথে করছ, যখন তোমরা অপরিণামদশী ছিলে? (৯০) তারা বলল, তবে কি তুমিই ইউসূফ! বললেন : আমিই ইউসূফ এবং এ হল আমার সহোদর ভাই। আল্লাহ্ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। নিশ্চয়, যে তাকওয়া অবলম্বন করে এবং সবর করে, আল্লাহ্ এহেন সৎকর্মশীলদের প্রতিদান বিনশুণ্ড করেন না। (৯১) তারা বলল : আল্লাহ্‌র কসম, আমাদের চাইতে আল্লাহ্ তোমাকে পছন্দ করেছেন এবং আমরা অবশ্যই অপরাধী ছিলাম। (৯২) বললেন, আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন। তিনি সব মেহেরবানের চাইতে অধিক মেহেরবান।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

অতঃপর [ ইব্রাহীম (আ)-এর **فَتَذَكَّرْنَا لَهُمْ مِنْ دُونِ آلِهِمْ** নির্দেশ মোতাবেক তারা মিসর রওয়ানা হল। কেননা, বেনিয়ামিনকে মিসরেই রেখে এসেছিল। তারা হয়ত মনে করে থাকবে যে, যার ঠিকানা জানা আছে, প্রথমে তাকেই বাদশাহ্‌র কাছে চেয়ে আনার চেষ্টা করা দরকার। এরপর ইউসূফের ঠিকানা তালাশ করা যাবে। মোট কথা, মিসরে পৌঁছে ] যখন ইউসূফ (আ)-এর কাছে ( যাকে তারা আযীয মনে করত ) পৌঁছল, (এবং খাদ্য-শস্যেরও প্রয়োজন ছিল। তাই মনে করল যে, খাদ্যশস্যের বাহানায় আযীযের কাছে পৌঁছব এবং খন্নিদ প্রসঙ্গে খোশামোদের কথাবার্তা বলব। যখন মন নরম ও প্রফুল্ল দেখব, তখন বেনিয়ামিনের মুক্তির দরখাস্ত করব। তাই প্রথমে খাদ্যশস্য নেওয়ার ব্যাপারে কথাবার্তা শুরু করল এবং ) বলতে লাগল : হে আযীয! আমরা এবং আমাদের পরিবারের সবাই ( দুর্ভিক্ষের কারণে ) খুবই কল্টে আছি। ( আমরা এমনভাবে দারিদ্র্যে বেষ্টিত আছি যে, খাদ্যশস্য ক্রয় করার জন্য প্রয়োজনীয় মুদ্রাও যোগাড় করা সম্ভব হয়নি )। আমরা কিছু একেজো বস্তু নিয়ে এসেছি। অতএব আপনি ( এ ছুটি উপেক্ষা করে ) খাদ্যশস্যের পুরাপুরি বরাদ্দ দিয়ে দিন ( এবং এ ছুটির কারণে খাদ্যশস্যের পরিমাণ হ্রাস করবেন না ) এবং ( আমাদের কোন অধিকার নেই ) আমাদেরকে খয়রাত ( মনে করে ) দিয়ে দিন। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা খয়রাত দাতাদেরকে (সত্যিকার খয়রাত দিক বা সুযোগ-সুবিধা দান করুক, এটাও খয়রাতেরই মত ) উত্তম প্রতিদান দেন ( মু'মিন হলে আখিরাতেও, নতুবা শুধু দুনিয়াতেই )। ইউসূফ ( তাদের কাতরোক্তি শুনে স্থির থাকতে পারলেন না এবং নিজেকে প্রকাশ করে দিতে চাইলেন। এটাও আশ্চর্য নয় যে, তিনি অন্তরের নূর ছাড়া জেনে নিয়েছিলেন যে, এবার তারা তালাশ

করার উদ্দেশ্যে আগমন করেছে এবং তাঁর কাছে এটাও হয় তো প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল যে, বিশ্বেদের দিন ফুরিয়ে এসেছে। অতঃপর পরিচয়ের ভূমিকা হিসেবে) বললেন : (বল, ) তোমাদের স্মরণ আছে কি, যা তোমরা ইউসূফ ও তাঁর ভাইয়ের সাথে (ব্যবহার) করেছিলে, যখন তোমাদের মূর্খতার দিন ছিল? [এবং ভালমন্দের বিচার ছিল না। এ কথা শুনে প্রথমে তারা স্তম্ভিত হয়ে গেল যে, ইউসূফের ঘটনার সাথে আযীযে-মিসরের কি সম্পর্ক? ইউসূফ (আ) বালাকাজে যে স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং যে জন্য তারা তাঁর প্রতি হিংসাপরায়ণ হয়ে উঠেছিল তন্দ্বারা প্রবল সম্ভাবনা ছিলই যে, ইউসূফ সত্ত্বব্য খুব উচ্চ মর্তব্যায় পৌছবে। ফলে তাঁর সামনে আমাদেরকে মস্তক নত করতে হবে। এ কারণে এ কথা শুনে তাদের মনে সন্দেহ দেখা দিল এবং চিন্তা করে কিছু কিছু চিনল। আরও অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে] তারা বলতে লাগল : সত্যি সত্যি তুমিই কি ইউসূফ? তিনি বললেন : (হ্যাঁ) আমিই ইউসূফ, আর এ হল (বেনিয়ামিন) আমার সহোদর ভাই। (এ কথা জুড়ে দেওয়ার কারণ নিজের পরিচয়কে জোরদার করা কিংবা এটা তাদের মিশনের সাফল্যের সুসংবাদ যে, তোমরা যাদেরকে তালাশ করতে বেরিয়েছ, আমরা উভয়েই এক জায়গায় একত্র রয়েছি।) আমাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ করেছেন (যে, আমাদের উভয়কে প্রথমে সবার ও তাকওয়ার তওফিক দিয়েছেন। এরপর এর বরকতে আমাদের কণ্টকে সুখে, বিশ্বেদকে মিলনে এবং অর্থ ও প্রভাব-প্রতিপত্তির স্বল্পতাকে প্রাচুর্যে রূপান্তরিত করে দিয়েছেন।) বাস্তবিকই যে গোনাহ থেকে বেঁচে থাকে এবং (বিপদাপদে) সবার করে, আল্লাহ তা'আলা এহে মসকমীদের প্রতিদান নষ্ট করেন না। তারা (সব অতীত কাহিনী স্মরণ করে অনুতপ্ত হল এবং ক্ষমা প্রার্থনার সূত্রে) বলতে লাগল : আল্লাহর কসম, নিশ্চয় তিনি তোমাকে আমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন (এবং তুমি এরই যোগ্য ছিলে) এবং (আমরা যা কিছু করেছি) নিশ্চয় আমরা (তাতে) দোষী ছিলাম (আল্লাহর ওয়াস্তে মাফ করে দাও)। ইউসূফ (আ) বললেন : না, তোমাদের বিরুদ্ধে আজ (আমার পক্ষ থেকে) কোন অভিযোগ নেই। (নিশ্চিত থাক। আমার মন পরিষ্কার হয়ে গেছে)। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের দোষ ক্ষমা করুন এবং তিনি সব মেহেরবানের চাইতে অধিক মেহেরবান। [তিনি তওবাকারীর দোষ ক্ষমাই করেন! এ দোষা থেকে আরও জানা গেল যে, ইউসূফ (আ)-ও তাদেরকে ক্ষমা করেছেন।]

### আনুঘজিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে ইউসূফ (আ) ও তাঁর ভাইদের অবশিষ্ট কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। তাদের পিতা ইয়াকুব (আ) তাদেরকে আদেশ করেন যে যাও ইউসূফ ও তাঁর ভাইকে তালাশ কর। এ আদেশ পেয়ে তারা তৃতীয়বার মিসর সফরে রওয়ানা হয়। কেননা বেনিয়ামিন যে সেখানে আছে, তা জানাই ছিল। তাই তাঁর মৃত্তির জন্য প্রথমে চেষ্টা করা দরকার ছিল। ইউসূফ (আ) মিসরে রয়েছেন বলে যদিও জানা ছিল না কিন্তু যখন কোন কাজের সময় এসে যায়, তখন মানুষের চেষ্টা-চরিত্র অজান্তেও সঠিক পথেই এগুতে থাকে। এক হাদীসে রয়েছে, যখন আল্লাহ তা'আলা কোন কাজের ইচ্ছা করেন, তখন তার কারণাদি আপনা-আপনি উপস্থিত করে দেন। তাই ইউসূফকে তালাশ করার জন্যও অজান্তে মিসর সফরই উপযুক্ত ছিল। এছাড়া খাদ্যশস্যেরও প্রয়োজন ছিল। এটাও এক কারণ ছিল যে, খাদ্যশস্য চাওয়ার

বাহানায় আযীযে-মিসরের সাথে সাক্ষাত হবে এবং তাঁর কাছে বেনিয়ামিনের মুক্তির ব্যাপারে আবেদন করা যাবে।

فَلَمَّا رَخَّلُوا عَلَيْهِمْ فَاصْلَحُوا مِنْهُم مِّمَّنْ رِجْوَاهُ فَتَلَّوْا عَلَيْهِم مِّنْ مَّوَالِيهِمْ  
— অর্থাৎ ইউসুফ-ভ্রাতারা যখন পিতার

নির্দেশ মোতাবেক মিসরে পৌঁছল এবং আযীযে-মিসরের সাথে সাক্ষাত করল, তখন নিতান্ত কাতরভাবে কথাবার্তা শুরু করল। নিজেদের দরিদ্রতা ও নিঃস্বতা প্রকাশ করে বলতে লাগল : হে আযীয! দুর্ভিক্ষের কারণে আমরা পরিবারবর্গ নিয়ে খুবই কষ্টে আছি। এমন কি, এখন খাদ্যশস্য কেনার জন্য আমাদের কাছে উপযুক্ত মূল্যও নেই। আমরা অপারক হয়ে কিছু অকেজো বস্ত্র খাদ্যশস্য কেনার জন্য নিয়ে এসেছি। আপনি নিজ চরিত্রগুণে এসব অকেজো বস্ত্র কবুল করে নিন এবং পরিবর্তে আমাদেরকে পুরা পুরি খাদ্যশস্য দিয়ে দিন, যা উত্তম মূল্যের বিনিময়ে দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য, আমাদের কোন অধিকার নেই। আপনি খয়রাত মনে করেই দিয়ে দিন। নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা খয়রাতদাতাকে উত্তম পুরস্কার দান করেন।

অকেজো বস্ত্রগুলো কি ছিল, কোরআন ও হাদীসে তার কোন সুস্পষ্ট বর্ণনা নেই। তফসীরবিদগণের উক্তি বিভিন্নরূপ। কেউ বলেন : এগুলো ছিল কৃত্রিম রৌপ্য মুদ্রা, যা বাজারে অচল ছিল। কেউ বলেন : কিছু ঘরে ব্যবহারযোগ্য আসবাবপত্র ছিল। এ হচ্ছে **مَرْجَاتُ** শব্দের অনুবাদ। এর আসল অর্থ এমন বস্ত্র যা নিজে সচল নয় বরং জোরজবরদস্তি সচল করতে হয়।

ইউসুফ (আ) ভাইদের এহেন মিসকীনসুলত কথাবার্তা শুনে এবং দুরবস্থা দেখে স্বভাবগতভাবে প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ করে দিতে বাধ্য হচ্ছিলেন। ঘটনা প্রবাহে অনুমিত হয় যে, ইউসুফ (আ)-এর উপর স্বীয় অবস্থা প্রকাশের ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে বিধি-নিষেধ ছিল, এখন তা অবসানের সময়ও এসে গিয়েছিল। তফসীরে কুরতুবী ও মাযহারীতে ইবনে আব্বাসের রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে যে, এসময় হযরত ইয়াকুব (আ) আযীযে-মিসরের নামে একটি পত্র লিখে দিয়েছিলেন। পত্রের বিষয়বস্তু ছিল এরূপ :

ইয়াকুব সফিউল্লাহ্ ইবনে ইসহাক যবিহুল্লাহ্ ইবনে ইবরাহীম খলীলুল্লাহর পক্ষ থেকে আযীযে-মিসর সমীপে।

বিনীত আরম্ভ!

বিপদাপদের মাধ্যমে পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়া আমাদের পারিবারিক ঐতিহ্যেরই অঙ্গবিশেষ। নমরূদের আগুনের দ্বারা আমার পিতামহ ইবরাহীম খলীলুল্লাহর পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। অতঃপর আমার পিতা ইসহাকেরও কঠোর পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। এরপর আমার সর্বাধিক প্রিয় এক পুত্রের মাধ্যমে আমার পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। তার বিরহ-ব্যথায় আমার দৃষ্টিশক্তি রহিত হয়ে গেছে। তারপর তার ছোট ভাই ছিল ব্যথিতের সান্ধন্যের একমাত্র সম্বল যাকে আপনি চুন্নির অভিযোগে প্রেফতার করেছেন। আমি বলি, আমরা পয়গম্বরদের সন্তান-সন্ততি। আমরা কখনও চুন্নি করিনি এবং আমাদের সন্তানদের মধ্যেও কেউ চোর হয়ে জন্ম নেয়নি। ওয়াস্বালাম।

পন্ন পাঠ করে ইউসুফ (আ) কোঁপে উঠলেন এবং কাল্লা রোধ করতে পারলেন না। এরপর নিজের গোপন ভেদ প্রকাশ করে দিলেন। পরিচয়ের ভূমিকা হিসেবে ভাইদেরকে প্রন্ন করলেন : তোমাদের সম্বন্ধ আছে কি, তোমরা ইউসুফ ও তার ভাইয়ের সাথে কি ব্যবহার করছিলেন, যখন তোমাদের মূর্খতার দিন ছিল এবং যখন তোমরা ভাল-মন্দের বিচার করতে পারতে না ?

এ প্রন্ন শুনে ইউসুফ-প্রাতাদের মাথা ঘুরে গেল যে, ইউসুফের কাহিনীর সাথে আযীযে-মিসরের কি সম্পর্ক! অতঃপর তারা একথাও চিন্তা করল যে, শৈশবে ইউসুফ একটি স্বপ্ন দেখে-ছিল, যার ব্যাখ্যা ছিল এই যে, কালে ইউসুফ কোন উচ্চ মর্তব্যয় পৌঁছবে এবং তার সামনে আমাদের সবাইকে মাথা নত করতে হবে। অতএব এ আযীযে-মিসরই স্বপ্ন ইউসুফ নয় তো! এরপর আরও চিন্তা-ভাবনার পর কিছু কিছু আলামত দ্বারা চিনে ফেলল এবং আরও তথ্য জানার জন্য বলল :

أَأَنْتَ يٰٓأَيُّهَا يُوسُفُ ۚ سত্যি সত্যিই কি তুমি ইউসুফ? ইউসুফ (আ)

বললেন : হ্যাঁ, আমিই ইউসুফ এবং এ হচ্ছে আমার সহোদর ভাই। ভাইয়ের প্রসঙ্গ জুড়ে দেওয়ার কারণ, যাতে তাদের পুরোপুরি বিশ্বাস হয়। আরও কারণ এই যে, যাতে তাদের লক্ষ্য অর্জনে পুরোপুরি সাফল্যের ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, যে দু'জনের খোঁজে তারা বের হয়েছিল তারা উভয়েই এক জায়গায় বিদ্যমান রয়েছে। এরপর ইউসুফ (আ) বললেন :

قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا ۚ إِنَّهُ مَن يَّتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ

الْمُحْسِنِينَ—অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের প্রতি অনুগ্রহ ও রূপা করেছেন।

প্রথমে আমাদের উভয়কে সবার ও তাকওয়ার দু'টি গুণ দান করেছেন। এগুলো সাফল্যের চাবিকাঠি এবং প্রত্যেক বিপদাপদের রক্ষা কবচ। এরপর আমাদের কষ্টকে সুখে, বিচ্ছেদকে মিলনে এবং অর্থ-সম্পদের স্বল্পতাকে প্রাচুর্যে রূপান্তরিত করেছেন। নিশ্চয় যারা পাপকাজ থেকে বেঁচে থাকে এবং বিপদাপদে সবার করে, আল্লাহ্ এহেন সংকমীদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না।

এখন নিজেদের অপরাধ স্বীকার ও ইউসুফ (আ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেওয়া ছাড়া ইউসুফ

প্রাতাদের উপায় ছিল না। সবাই একযোগে বলল : تَبَّٰلِلَّهِ لَقَدْ أَثَرْنَا لِلَّهِ عَلَيْهِنَا

وَأَنْ كُنَّا لَخٰطِئِينَ—আল্লাহ্‌র কসম, তিনি তোমাকে আমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান

করেছেন। তুমি এরই যোগা ছিলে। আমরা নিজেদের কৃতকর্মে দোষী ছিলাম। আল্লাহ্‌ মাফ করুন। উক্তরে ইউসুফ (আ) পয়গম্বরসুলভ গাভীর্ষের সাথে বললেন :

لَا تَنْوِيْبَ عَلَيْهِمْ — অর্থাৎ তোমাদের অভ্যাচারের প্রতিশোধ নেওয়া তো দূরের

কথা, আজ তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগও নেই। এ হচ্ছে তাঁর পক্ষ থেকে ক্ষমার সুসংবাদ। অতঃপর আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন :

يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ — অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের

অন্যান্য ক্ষমা করুন। তিনি সব মেহেরবানের চাইতে অধিক মেহেরবান।

অতঃপর বললেন :

إِنْ هُوَ إِلَّا بِقَوْمِي هَذَا فَا لِقَوْلِ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَاتٍ بِصُورٍ وَأَنَا تُونِي

بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ — অর্থাৎ আমার এই জামাটি নিয়ে যাও এবং আমার পিতার

চেহারার উপর রেখে দাও, এতে তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন। ফলে এখানে আসতেও সম্ভব হবেন। পরিবারের অন্য সবাইকেও আমার কাছে নিয়ে এস যাতে সবাই দেখা-সাক্ষাত করে আনন্দিত হতে পারি; আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামত দ্বারা উপকৃত ও কৃতজ্ঞ হতে পারি।

বিধান ও নির্দেশ : আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে অনেক বিধান এবং মানবজীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ জানা যায়।

تَصَدَّقْ عَلَيْهَا — বাকো প্রসন্ন দেখা দেয় যে, ইউসুফ-দ্রাতারা পয়গম্বরগণের আওলাদ।

তাদের জন্য সদকা-খয়রাত কেমন করে হালাল ছিল? এছাড়া সদকা হালাল হলেও চাওয়া কিভাবে বৈধ ছিল? ইউসুফ-দ্রাতারা পয়গম্বর না হলেও ইউসুফ (আ) তো পয়গম্বর ছিলেন। তিনি এ দ্রাস্তির কারণে তাঁদেরকে হা'শিয়া'র করলেন না কেন?

এর একটি পরিষ্কার উত্তর এই যে, এখানে 'সদকা' শব্দ বলে সত্যিকার সদকা বুঝানো হয়নি বরং কারবারে সুযোগ-সুবিধা দেওয়াকেই 'সদকা' 'খয়রাত' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। কেননা, তারা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে খাদ্যাশস্যের সওয়াল করেনি বরং কিছু অকেজো বস্তু পেশ করেছিল। অনুন্নোদের সারমর্ম ছিল এই যে, এসব স্বল্প মূল্যের বস্তু রয়্যাত করে গ্রহণ করুন। এ উত্তরও সম্ভবপর যে, পয়গম্বরগণের আওলাদের জন্য সদকা-খয়রাতের অবৈধতা শুধু উম্মতে মুহাম্মদীর সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কগুক্ত। তুফসীরবিদগণের মধ্যে মুজাহিদে'র উক্তি তাই।—(বয়ানুল কোরআন)

إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ — দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ তা'আলা

সদকা-খয়রাতদাতাদেরকে উত্তম প্রতিদান দেন। এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ এই যে, সদকা-খয়রাতের এক প্রতিদান হচ্ছে ব্যাপক, যা মু'মিন ও কাফির নির্বিশেষে সবাই দুনিয়াতেই পায়

এবং তা হচ্ছে বিপদাপদ দূর হওয়া। অপর একটি প্রতিদান শুধু পরকালেই পাওয়া যাবে, অর্থাৎ জান্নাত। এটা শুধু ঈমানদারদের প্রাপ্য। এখানে অযীশে মিসরকে সম্বোধন করা হয়েছে। ইউসূফ-ভ্রাতারা তখনও পর্যন্ত জানত না যে, তিনি ঈমানদার, না কাফির। তাই তারা এমন ব্যাপক বাক্য বলেছে, যাতে ইহ-কাল ও পরকাল উভয়কালই বোঝা যায়। ---(বয়ানুল কোরআন)

এ ছাড়া এখানে বাহাত অযীশে-মিসরকে সম্বোধন করে বলা উচিত ছিল যে, 'আপনাকে আল্লাহ্ তা'আলা উত্তম প্রতিদান দেবেন।' কিন্তু তারা জানত না যে, অযীশে মিসর ঈমানদার। তাই সদকাদাতা মাল্লকেই আল্লাহ্ প্রতিদান দিয়ে থাকেন, এরূপ ব্যাপক ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে, বিশেষভাবে তিনিই প্রতিদান পাবেন এমন বলা হয়নি। ---(কুরতুবী)

قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ عِبَادِهِ  
 দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মানুষ যখন কোন বিপদ ও কষ্টে

পতিত হয়, এরপর আল্লাহ্ যখন তাকে বিপদ থেকে মুক্তি দিয়ে নিয়ামত দ্বারা ভূষিত করেন, তখন তার উচিত অতীত বিপদ ও কষ্টের কথা উল্লেখ না করে উপস্থিত নিয়ামত ও অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করা। বিপদ মুক্তি ও আল্লাহ্‌র নিয়ামত লাভ করার পরও অতীত দুঃখ-কষ্টের কথা স্মরণ করে হাহতাশ করা অকৃতজ্ঞতা। কোরআন পাকে এ ধরনের অকৃতজ্ঞকে

বলা হয়েছে (إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ) এ ব্যক্তিকে বলা হয়,

যে অনুগ্রহ স্মরণ না করে—শুধু কষ্ট ও বিপদাপদের কথাই স্মরণ করে।

এ কারণেই ইউসূফ (আ) ভাইদের যড়যন্ত্রে দীর্ঘকাল ধরে যেসব বিপদাপদ ভোগ করেছিলেন, এ সময় সেগুলোর কথা মোটেই উল্লেখ করেন নি বরং আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহরাজির কথাই উল্লেখ করেছেন।

সবর ও তাকওয়া সমস্ত বিপদের প্রতিকার : إِنَّكَ مِنَ الْيَقِينِ وَإِنَّمَا  
 শীর্ষক

আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, তাকওয়া অর্থাৎ গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকা এবং বিপদে সবর ও দৃঢ়তা অবলম্বন এ দুটি গুণ মানুষকে বিপদাপদ থেকে মুক্তি দেয়। কোরআন পাক অনেক জায়গায় এ দুটি গুণের উপরই মানুষের সাফল্য ও কামিয়ারাবী নির্ভরশীল বলে উল্লেখ

করেছে। বলা হয়েছে : إِنَّ تَصْبِرُوا وَاتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُ هُمْ شَيْئًا

অর্থাৎ তোমরা যদি সবর ও তাকওয়া অবলম্বন কর তবে শত্রুদের শত্রুতামূলক কলা-কৌশল তোমাদের বিন্দুমাত্র ক্ষতিসাধন করতে পারবে না।

এখানে বাহাত বোঝা যায় যে, ইউসূফ (আ) দাবী করেছেন যে, তিনি মুত্তাকী ও সবর-কারী, তাঁর তাকওয়া ও সবরের কারণে বিপদাপদ দূর হয়েছে এবং উচ্চ মর্যাদা অর্জিত হয়েছে। অথচ কোরআন পাকে এরূপ দাবী করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

لَا تُزَكُّوا





(৯৩) তোমরা আমার এ জামাটি নিয়ে যাও। এটি আমার পিতার মুখমণ্ডলের উপর রেখে দিও, এতে তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসবে। আর তোমাদের পরিবারবর্গের সবাইকে আমার কাছে নিয়ে এস। (৯৪) যখন কাফেলা রওয়ানা হল, তখন তাদের পিতা বললেন : যদি তোমরা আমাকে অপকৃতিস্থ না বল, তবে বলি : আমি নিশ্চিতরূপেই ইউসূফের গন্ধ পাচ্ছি। (৯৫) লোকেরা বলল : আল্লাহর কসম, আপনি তো সেই পুরানো ড্রাক্তিতেই পড়ে আছেন। (৯৬) অতঃপর যখন সুসংবাদদাতা পৌঁছল, সে জামাটি তাঁর মুখে রাখল। অমনি তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেন। বললেন : আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, আমি আল্লাহর গন্ধ থেকে যা জানি তোমরা তা জান না? (৯৭) তারা বলল : পিতঃ, আমাদের অপরাধ ক্ষমা করান। নিশ্চয় আমরা অপরাধী ছিলাম। (৯৮) বললেন, সত্বরই আমি পালনকর্তার কাছে তোমাদের জন্য ক্ষমা চাইব। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু। (৯৯) অতঃপর যখন তারা ইউসূফের কাছে পৌঁছল, তখন ইউসূফ পিতা-মাতাকে নিজের কাছে জায়গা দিলেন এবং বললেন : আল্লাহ চাহেন তো শান্ত চিত্তে মিসরে প্রবেশ করুন (১০০) এবং তিনি পিতামাতাকে সিংহাসনের উপর বসালেন এবং তারা সবাই তাঁর সামনে সিজদাবন্দ হল। তিনি বললেন : পিতঃ, এ হচ্ছে আমার ইতিপূর্বে-কার স্বপ্নের বর্ণনা। আমার পালনকর্তা একে সত্যে পরিণত করেছেন এবং তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন; আমাকে জেল থেকে বের করেছেন এবং আপনাদেরকে গ্রাম থেকে নিয়ে এসেছেন শয়তান আমার ও আমার ডাইদের মধ্যে কলহ সৃষ্টি করে দেওয়ার পর। আমার পালনকর্তা যা চান, কৌশলে সম্পন্ন করেন। নিশ্চয় তিনি বিজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এখন তোমরা ( গিয়ে পিতাকে সুসংবাদ দাও এবং সুসংবাদের সাথে সাথে ) আমার এ জামাটি (ও) নিয়ে যাও এবং এটি পিতার মুখমণ্ডলের উপর রেখে দাও। এতে তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসবে ( এবং এখানে চলে আসবেন ) এবং (অন্যান্য) সব পরিবারবর্গকে ( -ও ) আমার কাছে নিয়ে এস ( যাতে সবাই সাক্ষাত করে আনন্দিত হতে পারি। কেননা, বর্তমান অবস্থায় আমার যাওয়া কঠিন। তাই পরিবারবর্গই চলে আসুক ) এবং যখন [ ইউসূফ (আ)-এর সাথে কথাবার্তা হয়ে গেল এবং তাঁর কথামত জামা নিয়ে রওয়ানা হওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করল এবং ] কাফেলা ( মিসর থেকে ) রওয়ানা হল ( যার মধ্যে তারাও ছিল ) তখন তাদের পিতা কাফেলার লোকদেরকে বলতে শুরু করলেন : 'তোমরা যদি আমাকে বৃদ্ধ বয়সে প্রজ্ঞাপ করছি' মনে না কর, তবে আমি একটি কথা বলব যে, আমি ইউসূফের গন্ধ পাচ্ছি। ( মুজিয়া ইচ্ছাশীন হয় না। তাই ইতিপূর্বে তা বোঝা যায়নি। নিকটের ) লোকেরা বলতে লাগল : আল্লাহর কসম আপনি তো পুরানো ড্রাক্তিতেই পড়ে রয়েছেন [ যে, ইউসূফ জীবিত আছে এবং তাকে ফিরে পাবেন। এ ধারণার প্রাবল্যেই এখন গন্ধ অনুভূত হচ্ছে। নতুবা বাস্তবে গন্ধ বা কোন কিছুই না। ইয়াকুব (আ) চূপ হয়ে গেলেন ]। অতঃপর যখন ( ইউসূফের সহি-সালামত হওয়ার ) সুসংবাদবাহীরা ( জামা সহ এখানে ) এসে পৌঁছল, তখন

(এসেই) সে জামাটি তাঁর মুখের উপর রেখে দিল। অতঃপর (চোখে লাগাতেই মস্তিষ্কে সুগন্ধি পৌঁছে গেল এবং) তৎক্ষণাৎ তাঁর চক্ষু খুলে গেল। (এবং তারা সমস্ত রক্তাক্ত তাঁর কাছে বর্ণনা করল)। তিনি (ছেলেদেরকে) বললেনঃ (কেমন), আমি কি বলিনি যে, আল্লাহর ব্যাপারাদি আমি যতটুকু জানি, তোমরা জান না? (এ জন্যই আমি তোমাদেরকে ইউসুফের খোঁজে পাঠিয়েছিলাম। দেখ, অবশেষে আল্লাহ আমার আশা পূর্ণ করেছেন। তাঁর কথা পূর্ববর্তী রুকুতে বর্ণিত হয়েছে। তখন) ছেলেরা বললঃ পিতঃ, আমাদের জন্য (আল্লাহর কাছে) মাগফিরাতের দোয়া করুন। (আমরা ইউসুফের ব্যাপারে আপনাকে যে সব কণ্ট দিয়েছি তাতে) আমরা অবশ্যই দোষী ছিলাম। (উদ্দেশ্য এই যে, আপনিও মাফ করে দিন। কেননা, স্বভাবত অন্যের জন্য মাগফিরাতের দোয়া সে-ই করে, যে নিজেও ধরপাকড় করতে চায় না)। ইয়াকুব (আ) বললেনঃ সত্ত্বরই পালনকর্তার কাছে তোমাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করব। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু। [এ থেকে তাঁর মাফ করে দেওয়াও বোঝা গেল। 'সত্ত্বরই' বলার উদ্দেশ্য এই যে, তাহাজ্জুদের সময় আসতে দাঁড়। এ সময় দোয়া কবুল হয়। (لذا في الدر المنثور) মোটকথা, সবাই তৈরী হয়ে মিসর অভিমুখে রওজানা হল। ইউসুফ (আ) খবর পেয়ে অর্ডারনার জন্য শহরের বাইরে আগমন করলেন এবং বাইরেই সাক্ষাতের ব্যবস্থা করা হল]। অতঃপর যখন সবাই ইউসুফ (আ)-এর কাছে পৌঁছল, তখন তিনি (সবার সাথে দেখা-সাক্ষাত করে) পিতামাতাকে (সাম্মানার্থ) নিজের কাছে স্থান দিলেন এবং (কথাবার্তা শেষ করে) বললেনঃ সবাই শহরে চলুন (এবং) ইনশাআল্লাহ (সেখানে) সুখ-শান্তিতে থাকুন। (বিচ্ছেদের যাতনা ও দুর্ভিক্ষের কণ্ট সব দূর হয়ে গেল। মোটকথা সবাই, মিসরে পৌঁছল এবং (সেখানে পৌঁছে সাম্মানার্থ)। পিতামাতাকে (রাজ) সিংহাসনে বসালেন এবং (তখন সবার অন্তরে ইউসুফের মাহাত্ম্য এমনভাবে প্রভাব বিস্তার করল যে) সবাই তাঁর সামনে সিজদায় অবনত হয়ে গেল। (এ অবস্থা দেখে) তিনি বললেনঃ পিতঃ, এই হচ্ছে আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা, যা আমি পূর্বে দেখে-ছিলাম (যে, সূর্য-চন্দ্র ও এগারটি নক্ষত্র আমাকে সিজদা করছে)। আমার পালনকর্তা এ (স্বপ্ন) কে সত্যে পরিণত করেছেন। (অর্থাৎ এর সত্যতা প্রকাশ করেছেন)। এবং (এ সাম্মান ছাড়া আমার পালনকর্তা আমার প্রতি আরও অনুগ্রহ করেছেন। সেমতে এক) তখন অনুগ্রহ করেছেন, যখন আমাকে জেল থেকে বের করেছেন (এবং এ রাজকীয় মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন)। এবং (দুই) শয়তান আমার ও ভাইদের মধ্যে কলহ সৃষ্টি করার পর (যে কারণে সারা জীবন মিলিত ও ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না, কিন্তু আল্লাহর অনুগ্রহ এই যে) তিনি আপনাদের সবাইকে (যাদের মধ্যে আমার ভাইও আছে)। বাইরে থেকে (এখানে) নিয়ে এসেছেন (এবং সবাইকে মিলিয়ে দিয়েছেন)। নিশ্চয়ই আমার পালনকর্তা সূক্ষ্ম তদবীর দ্বারা সম্পন্ন করেন, যা চান। নিশ্চয় তিনি জ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। (দ্বীয় জ্ঞান ও হিকমত দ্বারা সবকিছুর তদবীর ঠিক করে দেন)।

### আনুশঙ্গিক জাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহ থেকে জানা গেল যে, আল্লাহ তা'আলার ইঙ্গিতে যখন ইউসুফ (আ) এর গোপন রহস্য ফাঁস করে দেওয়ার সময় এসে যায়, তখন তিনি ভাইদের সামনে

বাস্তব অবস্থা প্রকাশ করে দেন। ভাইয়েরা ক্ষমা প্রার্থনা করলে তিনি শুধু ক্ষমাই করেন নি, বরং অতীত ঘটনাবলীর জন্য তিরস্কার করাও গৃহস্থ করেন নি। তাদের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করেন। এরপর তিনি পিতার সাথে সাক্ষাতের চিন্তা করেন। পরিস্থিতি লক্ষ্য করে এটাই উপযোগী মনে করেন যে, পিতাই পরিবারবর্গসহ এখানে আগমন করুন। কিন্তু একথাও জানা হয়ে যায় যে, পিতা বিচ্ছেদ কালে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছেন। তাই সর্বপ্রথম এ বিষয়টি চিন্তা করে ভাইদেরকে বললেন :

— اذْهَبُوا بِتَمِيمٍ هَذَا فَالْتَمُوا

مَلَىٰ وَجْهَ أَبِي يَاقَانَ بِمِيمٍ

অর্থাৎ তোমরা আমার এ জামাটি নিয়ে যাও এবং পিতার মুখমণ্ডলে রেখে দাও। এতে তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসবে। বলাবাহুল্য, কারও জামা মুখমণ্ডলে রেখে দেওয়া দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসার বস্তুগত কারণ হতে পারে না, বরং এটা ছিল ইউসুফ (আ)-এর একটি মু'জিযা। আল্লাহর পক্ষ থেকে তিনি জানতে পারেন যে, যখন তাঁর জামা পিতার চেহারায় রাখা হবে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর দৃষ্টিশক্তি বহাল করে দেবেন।

যাহাঁক ও মুজাহিদ প্রমুখ তফসীরবিদ বলেন : এটা এ জামার বৈশিষ্ট্য ছিল। কারণ, এ জামাটি সাধারণ কাপড়ের মত ছিল না, বরং হযরত ইবরাহীম (আ)-এর জন্য এটি জামাত থেকে তখন আনা হয়েছিল, যখন নমরুদ তাঁকে উলঙ্গ করে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করেছিল। এরপর এই জামাতী পোষাকটি সব সময়ই হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কাছে সংরক্ষিত ছিল। তাঁর ওফাতের পর হযরত ইসহাক (আ)-এর কাছে আসে। তাঁর মৃত্যুর পর হযরত ইয়াকুব (আ) লাভ করেন। তিনি একে খুবই পবিত্র বস্তুর মর্যাদায় একটি নলের মধ্যে পুরে ইউসুফ (আ)-এর গলায় তাবিজ হিসাবে বেঁধে দিয়েছিলেন, যাতে বদ নযর থেকে নিরাপদ থাকেন। ভাইয়েরা পিতাকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য যখন তাঁরা জামা খুলে নেয় এবং উলঙ্গ অবস্থায় তাঁকে কুপে নিক্ষেপ করে, তখন জিবরাঈল এসে গলায় ঝুলানো নল খুলে এ জামা বের করে ইউসুফ (আ)-কে পরিয়ে দেন। এরপর থেকে জামাটি সর্বদাই তাঁর কাছে সংরক্ষিত ছিল। এ সময়েও জিবরাঈল ইউসুফ (আ)-কে পরামর্শ দেন যে এটি জামাতের পোশাক। এর বৈশিষ্ট্য এই যে, অন্ধ ব্যক্তির চেহারায় রাখলে সে দৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে যায়। এটিই তিনি পিতার কাছে পাঠিয়েছিলেন। যশ্ভারা তিনি দৃষ্টিশক্তি লাভ করেন।

হযরত মুজাম্বিদে আলফে সানীর সূচিন্তিত বক্তব্য এই যে, ইউসুফ (আ)-এর রূপ-সৌন্দর্য এবং তাঁর সত্যই ছিল জামাতী বস্তু। তাই তাঁর দেহের স্পর্শপ্রাপ্ত প্রত্যেক জামার মধ্যেই এ বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে।—( মাযহাবী )

— وَاتُّوْنِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ

অর্থাৎ তোমরা সব ভাই আপন আপন পরিবার-বর্গকে আমার কাছে মিসরে নিয়ে এস। পিতাকে আনাই আসল উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু এখানে স্পষ্টত পিতার পরিবর্তে পরিবারবর্গকে আনার কথা উল্লেখ করেছেন সম্ভবত একারণে যে,

পিতাকে এখানে আনার কথা বলা আদবের খেলাফ মনে করেছেন। এছাড়া এ বিশ্বাস তো ছিলই যে যখন পিতার দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসবে এবং এখানে আসতে কোন বাধা থাকবে না, তখন পিতা নিজেই আগ্রহী হয়ে চলে আসবেন। কুরতুবী বর্ণিত এক রেওয়ামায়েতে আছে যে, ভাইদের মধ্যে ইয়াহুদা বলল : এই জামা আমি নিয়ে যাব। কারণ, তাঁর জামায় কৃত্রিম রক্ত লাগিয়েও আমিই নিয়ে গিয়েছিলাম। ফলে পিতা অনেক আঘাত পেয়েছিলেন। এখন এর ক্ষতিপূরণও আমার হাতেই হওয়া উচিত।

وَلَمَّا ذَمَلْتِ الْغَيْرَ—অর্থাৎ কাফেলা শহর থেকে বের হতেই কেনানে ইয়াকুব

(আ)-নিকটস্থ লোকদেরকে বললেন : তোমরা যদি আমাকে বোকা না ঠাওরাও, তবে আমি বলছি যে, আমি ইউসুফের গন্ধ পাচ্ছি। মিসর থেকে কেনান পর্যন্ত হযরত ইবনে আক্বাসের বর্ণনা অনুযায়ী আট দিনের দূরত্ব ছিল। হযরত হাসান বসরীর বর্ণনা মতে আমি ফরসখ অর্থাৎ প্রায় আড়াইশ' মাইলের ব্যবধান ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা এত দূর থেকে ইউসুফ (আ)-এর জামার মাধ্যমে তাঁর গন্ধ ইয়াকুব (আ)-এর মস্তিষ্কে পৌঁছে দেন। এটা অত্যশ্চর্য ব্যাপার বটে! অথচ ইউসুফ যখন কেনানেরই এক কূপের ডেতরে তিন দিন পড়ে রইলেন, তখন ইয়াকুব (আ) এ গন্ধ অনুভব করেন নি। এ থেকেই জানা যায় যে, মু'জিয়া পয়গম্বরগণের ইচ্ছাধীন ব্যাপার নয়। এবং প্রকৃতপক্ষে মু'জিয়া পয়গম্বরগণের নিজস্ব কর্মকাণ্ড নয়—সরাসরি আল্লাহ্ তা'আলার কর্ম। আল্লাহ্ তা'আলা যখন ইচ্ছা করেন, মু'জিয়া প্রকাশ করেন। ইচ্ছা না হলে নিকটতম বস্তুও দূরবর্তী হয়ে যায়।

قَالُوا يَا لَئِيْنَمَا لَكَ الْاَقْدِيْمُ—অর্থাৎ উপস্থিত লোকেরা বলল :

আল্লাহর কসম আপনি তো সেই পুরানো দ্রাক্ত ধারণায়ই পড়ে রয়েছেন যে, ইউসুফ জীবিত আছে এবং তার সাথে মিলন হবে।

فَلَمَّا اَنْ جَاءَ الْبَشِيْرُ—অর্থাৎ যখন সুসংবাদদাতা কেনানে পৌঁছল এবং

ইউসুফের জামা ইয়াকুব (আ)-এর চেহারায় রাখল, তখন সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে এল। সুসংবাদদাতা ছিল জামা বহনকারী ইয়াহুদা।

قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَكُمْ اِنِّيْ اَعْلَمُ مِنْ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ—অর্থাৎ আমি কি

বলিনি যে, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে আমি এমন বিষয় জানি, যা তোমরা জান না? অর্থাৎ ইউসুফ জীবিত আছে এবং তার সাথে মিলন হবে।

قَالُوا يَا اَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا زُنُوْبَنَا اِنَّا كُنَّا خٰطِئِيْنَ—বাস্তব ঘটনা

যখন সবার জানা হয়ে গেল, তখন ইউসূফের ভ্রাতারা স্বীয় অপরাধের জন্য পিতার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে বলল : আপনি আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে মাগফিরাতের দোয়া করুন। বলাবাহুল্য, যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে মাগফিরাতের দোয়া করবে, সে নিজেও তাদের অপরাধ মাক করে দেবে।

قَالَ سَوْفَ أَسْتَفْرِئُكُمْ رَبِّي — ইয়াকুব (আ) বললেন : আমি সত্ত্বরই

তোমাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করব।

ইয়াকুব (আ) এখানে তৎক্ষণাৎ দোয়া করার পরিবর্তে অতিসত্ত্বরই দোয়া করার ওয়াদা করেছিলেন। তফসীরবিদগণ এর কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে, এর উদ্দেশ্য ছিল বিশেষ গুরুত্ব সহকারে শেষ রাত্রে দোয়া করবেন। কেননা, তখনকার দোয়া বিশেষ ভাবে কবুল হয়। বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে বর্ণিত আছে আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক রাত্রির শেষ তৃতীয়াংশে পৃথিবী থেকে নিকটতম আকাশে অবতরণ করেন এবং ঘোষণা করেন : কেউ আছে কি, যে দোয়া করবে---আমি কবুল করব? কেউ আছে কি, যে ক্ষমা প্রার্থনা করবে---আমি ক্ষমা করব?

فَلَمَّا رَاكَ خَلُوعًا عَلَيْهِ ---কোন কোন রেওয়াজেতে আছে, ইউসূফ (আ) ভাইদের

সাথে দু'শ উট বোঝাই করে অনেক আসবাবপত্র বস্ত্র ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পাঠিয়ে দিলেন, যাতে গোটা পরিবার মিসরে আসার জন্য ভালভাবে প্রস্তুতি নিতে পারে। ইয়াকুব (আ) তাঁর আওলাদ ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির প্রস্তুত হয়ে মিসরের উদ্দেশে রওনা হলে---এক রেওয়াজেতে অনুযায়ী তাদের সংখ্যা বাহাত্তর এবং অন্য রেওয়াজেতে অনুযায়ী তিরানব্বই জন পুরুষ ও মহিলা ছিল।

অপরদিকে মিসর পৌঁছার সময় নিকটবর্তী হলে ইউসূফ (আ) ও শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ তাঁদের অভ্যর্থনার জন্য শহরের বাইরে আগমন করলেন। তাদের সাথে চার হাজার সশস্ত্র সিপাহীও সামরিক কায়দায় অভিনন্দন জানানোর উদ্দেশ্যে জমায়েত হল। সবাই যখন মিসরে ইউসূফ (আ)-এর ঘরে প্রবেশ করলেন, তখন তিনি পিতামাতাকে নিজের কাছে জায়গা দিলেন।

এখানে <sup>١٠٠</sup>١٠٠ --- (পিতামাতা) উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ ইউসূফ (আ)-এর

মাতা তাঁর শৈশবেই ইন্তিকাল করেছিলেন। কিন্তু তারপর ইয়াকুব (আ) মৃত্যুর ডগিনী লাগ্যাকে বিয়ে করেছিলেন। তিনি ইউসূফ (আ)-এর খালা হওয়ার দিক দিয়েও মায়ের মতই ছিলেন এবং পিতার বিবাহিতা স্ত্রী হওয়ার দিক দিয়েও মাতা অভিহিত হওয়ার যোগ্য ছিলেন।

মায়ের মতই ছিলেন এবং পিতার বিবাহিতা স্ত্রী হওয়ার দিক দিয়েও মাতা অভিহিতা হওয়ার যোগ্য ছিলেন। (১)

—ইউসূফ (আ) পরিবারের  
 وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ اِنَّ شَاءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ ۝

সবাইকে বললেন, আপনারা সবাই আল্লাহ্‌র ইচ্ছা অনুযায়ী নির্ভয়ে, অবাধে মিসরে প্রবেশ করুন। উদ্দেশ্যে এই যে, ভিনদেশীদের প্রবেশের ব্যাপারে স্বভাবত যে সব বিধি-নিষেধ থাকে আপনারা সেগুলো থেকে মুক্ত।

—অর্থাৎ ইউসূফ (আ) পিতামাতাকে রাজ

সিংহাসনে বসালেন।

وَاٰخِرُ اٰیٰتِ السُّرٰتِ ۝ وَخَرُوْا لَهَا سَجْدًا—অর্থাৎ পিতামাতা ও ভ্রাতারা সবাই ইউসূফ (আ)-এর সামনে

সিজদা করলেন। আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস বলেন : এ বৃত্তান্তসূচক সিজদাটি ইউসূফ (আ)-এর জন্য নয়—আল্লাহ্‌ তা'আলার উদ্দেশ্যেই করা হয়েছিল। কেউ কেউ বলেন : উপাসনামূলক সিজদা প্রত্যেক পয়গম্বরের শরীয়তে আল্লাহ্‌ ছাড়া কারও জন্য বৈধ ছিল না ; কিন্তু সম্প্রদায়সূচক সিজদা পূর্ববর্তী পয়গম্বরের শরীয়তে বৈধ ছিল। শিরকের সিঁড়ি হওয়ার কারণে ইসলামী শরীয়তে তাও সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ হয়েছে। বৃথারী ও মুসলিমের হাদীসে বলা হয়েছে : আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কাউকে সিজদা করা বৈধ নয়।

وَقَالَ يَا اٰبَتِ هٰذَا تَا وَذٰلِ رُوٰی اٰیٰتِ سِنِ قَهْلٍ ইউসূফ (আ)-এর সামনে

যখন পিতামাতা ও এগার ভাই একযোগে সিজদা করল, তখন শৈশবের স্বপ্নের কথা তাঁর মনে পড়ল। তিনি বললেন : পিতা :, এটা আমার শৈশবে দেখা স্বপ্নের ব্যাখ্যা যাতে দেখেছিলাম যে, সূর্য, চন্দ্র ও এগারটি নক্ষত্র আমাকে সিজদা করছে। আল্লাহ্‌র শোকর যে তিনি এ স্বপ্নের সত্যতা চোখে দেখিয়ে দিয়েছেন।

(১) কারণটি ঐ রেওয়াজে অনুযায়ী বর্ণিত হয়েছে, যাতে বেনিয়ামিনের জন্মের সময় তাঁর মাতার ইন্তিকালের কথা বলা হয়েছে। এ জন্য এখানে লেখকের বক্তব্য সূরার প্রারম্ভে বর্ণিত বক্তব্যের সাথে পরস্পর বিরোধী হয়ে গেছে। সেখানে ইউসূফ (আ)-এর বিমাতার নাম রাহীল বলা হয়েছে। আসলে এ ব্যাপারে কোন নির্ভরযোগ্য রেওয়াজে নেই। যা আছে সবই ইসরাঈলী রেওয়াজে। এগুলোও পরস্পর বিরোধী। রূহুল মাআনীর গ্রন্থকার লেখেন : বেনিয়ামিনের জন্মের সময় তার মাতার ইন্তিকাল ইহুদীরা স্বীকার করে না। এই রেওয়াজে অনুযায়ী কোন প্রমাণ উঠে না। এমতাবস্থায় আয়াতে ইউসূফ (আ)-এর আপন মাতাই বোঝানো হয়েছে। ইবনে-জরীর ও ইবনে-কাসীরের মতে এ রেওয়াজেই অগ্রগণ্য। ইবনে-জরীর বলেন : ইউসূফ (আ)-এর মাতার ইন্তিকালের কোন প্রমাণ নেই। কোরআনের ভাষা থেকেও বাহ্যিক তাই বুঝা যায়।—মোঃ তকী ও সমানী

নির্দেশ ও হাস'আলা : (১) ছেলোদের ক্রমা প্রার্থনা ও মাগফিরাতের দরখাস্ত শুনে ইয়াকুব (আ) বলেছিলেন : অতিসম্ভব তোমাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করব। তিনি তৎক্ষণাৎ দোয়া করেন নি।

এ বিলম্বের কারণ হিসেবে কেউ কেউ একথাও বলেছেন যে, ইয়াকুব (আ) চেয়েছিলেন, প্রথমে ইউসূফের সাথে দেখা করে জেনে নেওয়া যাক যে, সে তাদের অন্যান্য ক্রমা করেছে কি না। কারণ, ময়লুম ক্রমা না করা পর্যন্ত আলাহ্ তা'আলাও ক্রমা করেন না। এমতাবস্থায় মাগফিরাতের দোয়া সমন্বয়যোগ্য ছিল না।

একথা সম্পূর্ণ সত্য ও নীতিগত যে, বান্দা তার হক আদায় না করা কিংবা ক্রমা না করা পর্যন্ত বান্দার হকের ব্যাপারে তওবা দুরন্ত হয় না। এমতাবস্থায় শুধু মৌখিক তওবা ও ইস্তিগফার যথেষ্ট নয়।

(২) হযরত সুফিয়ান সওরী (রহ) বর্ণনা করেন : ইয়াহুদা ইউসূফ (আ)-এর জামা এনে যখন ইয়াকুব (আ)-এর মুখমণ্ডলে রাখল, তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন : ইউসূফ কেমন আছে ? ইয়াহুদা বলল : সে মিসরের বাদশাহ। ইয়াকুব (আ) বললেন : সে বাদশাহ না ফকীর আমি তা জিজ্ঞেস করি না। আমার জিজ্ঞাসা এই যে, ইমান ও আমলের দিক দিয়ে তার অবস্থা কিরূপ ? তখন ইয়াহুদা তাঁর তাকওয়া ও পবিত্রতার অবস্থা বর্ণনা করল। এ হচ্ছে পয়গম্বরগণের মহক্বত ও সম্পর্কের স্বরূপ। তাঁরা সন্তানদের দৈহিক সুখ-শান্তির চাইতে আত্মিক উন্নতির জন্য অধিক চিন্তা করেন। প্রত্যেক মুসলমানেরও তা অনুসরণ করা উচিত।

(৩) হযরত হাসান বসরী থেকে বর্ণিত রয়েছে, সুসংবাদাতা যখন ইউসূফ (আ)-এর জামা নিয়ে পৌঁছল, তখন ইয়াকুব (আ) তাকে পুরস্কৃত করতে চাইলেন। কিন্তু আর্থিক অবস্থা শোচনীয় থাকায় অক্ষমতা প্রকাশ করে বললেন : সাত দিন ধরে আমাদের ঘরে রুটিও পাকানো হয়নি। এমতাবস্থায় আমি তোমাকে কোন বস্তগত পুরস্কার দিতে অক্ষম। কিন্তু দোয়া করি, আলাহ্ তা'আলা তোমার মৃত্যু-মন্ত্রণা সহজ করুন। কুরতুবী বলেন : এ দোয়া ছিল তাঁর জন্য সর্বোত্তম পুরস্কার।

(৪) এ ঘটনা থেকে আরও জানা গেল যে, সুসংবাদাতাকে পুরস্কৃত করা পয়গম্বরগণের সূন্নত। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে হযরত কা'ব ইবনে মালেকের ঘটনাটি সুপ্রসিদ্ধ। তানুক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করার কারণে যখন তাঁর উপর আলাহ্‌র ক্রোধ নাযিল হয় এবং পরে তওবা কবুল করা হয়, তখন যে ব্যক্তি তওবা কবুলের সংবাদ নিয়ে এসেছিল, তাকে তিনি তাঁর মূল্যবান বস্ত্রজোড়া খুলে পরিয়ে দিয়েছিলেন।

এ থেকে আরও প্রমাণিত হয় যে, আনন্দের সময় উল্লাস প্রকাশার্থে বন্ধু-বান্ধবকে ভোজে দাওয়াত করাও সূন্নত। হযরত ফাররাকে আযম (রা) যখন সূরা বাক্বারা খতম করতেন, তখন আনন্দের আতিশয্যে একটি উট যবেহ করে সবাইকে ভোজে আপ্যায়িত করতেন।

(৫) ইয়াকুব (আ)-এর ছেলেরা বাস্তব ঘটনা ফাঁস হয়ে যাওয়ার পর পিতা ও ডাইয়ের

কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলে। এতে বোঝা গেল যে, হাতে বা মুখে কাউকে কণ্ট দিলে অথবা কারও কোন পাওনা থাকলে তৎক্ষণাৎ তা পরিশোধ করা অথবা ক্ষমা করিয়ে নেওয়া জরুরী।

সহীহ বুখারীতে আবু হোরাইরা (রা) বণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ (সা) বলেনঃ যার মিস্তাম্ব অপরের কোন আর্থিক প্রাপ্য থাকে কিংবা সে অপরকে হাতে কিংবা মুখে কণ্ট দেয়, তার সঙ্গে সঙ্গে তা পরিশোধ করে দেওয়া কিংবা ক্ষমা প্রার্থনা করে দায়িত্বমুক্ত হওয়া উচিত। মিস্তাম্বের পূর্বেই তা করা উচিত। মিস্তাম্বের দিন আর্থিক পাওনা পরিশোধ করা যাবে না। তাই তার সৎকর্মসমূহ প্রাপ্যকে দিয়ে দেওয়া হবে। ফলে সে নিস্তহস্ত হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে তার কর্মসমূহ যদি সৎ না হয়, তবে প্রতিপক্ষের গোনাহর বোঝা তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে।

إِلَٰهَا رَبِّ اللَّهِ

ইউসূফ (আ)-এর সবর ও শোকের স্তর : এরপর ইউসূফ (আ) পিতামাতার সামনে কিছু অতীত কাহিনী বর্ণনা করতে শুরু করলেন। এখানে এক দণ্ড খেমে একটু চিন্তা করুন, আজ যদি কেউ এতটুকু দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হয়, যতটুকু ইউসূফ (আ)-এর উপর দিয়ে অভিযাহিত হয়েছে এবং এত দীর্ঘদিনের বিচ্ছেদ ও নৈরাশ্যের পর পিতামাতার সাথে মিলন ঘটে, তবে সে পিতামাতার সামনে নিজের কাহিনী কিভাবে বর্ণনা করবে? কতটুকু কাঁদবে এবং কাঁদবে? দুঃখ-কষ্টের করুণ কাহিনী বর্ণনা করতে কতদিন লাগবে? কিন্তু এখানে উদয়পক্ষই আল্লাহর রসূল ও পয়গম্বর। তাঁদের কর্মপদ্ধতি লক্ষ্য করুন, ইয়াকুব (আ)-এর বিরহী প্রিয় ছেলে হাজারো দুঃখ-কষ্টের প্রান্তর অতিক্রম করে যখন পিতার সাথে মিলিত হন, তখন

وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذَا أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ

مِنْ بَعْدَ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي — অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা

আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, যখন কারাগার থেকে আমাকে বের করেছেন এবং আপনাকে বাইরে থেকে এখানে এনেছেন; অথচ শয়তান আমার ও আমার ভাইদের মধ্যে কলহ সৃষ্টি করে দিয়েছিল।

ইউসূফ (আ)-এর দুঃখ-কণ্ট যথাক্রমে তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত হয়। এক, ভাইদের অত্যাচার ও উৎপীড়ন। দুই, পিতামাতার কাছ থেকে দীর্ঘদিনের বিচ্ছেদ। এবং তিন, কারাগারের কণ্ট। আল্লাহর মনোনীত পয়গম্বর স্বীয় বিবৃতিতে প্রথমে ঘটনাবলীর ধারাবাহিকতা পরিবর্তন করে কারাগার থেকে কথা শুরু করেছেন। কিন্তু এতে কারাগারে প্রবেশ করা এবং সেখানকার দুঃখ-কষ্টের প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেছেন। বরং কারাগার থেকে অব্যাহতির কথা আল্লাহর কৃতজ্ঞতাসহ বর্ণনা করেছেন। কারাগার থেকে মুক্তি এবং তত্ত্বয় আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মাধ্যমে যেন একথাও বলে দিয়েছেন যে, তিনি কোন সময় কারাগারেও ছিলেন।

এখানে এ বিষয়টিও প্রনিধানযোগ্য যে, ইউসূফ (আ) কারাগার থেকে বের হওয়ার কথা ভো উল্লেখ করেছেন, কিন্তু ভ্রাতারা যে তাঁকে---কপে নিষ্কপ করেছিল, তা এদিক দিয়েও উল্লেখ করেন নি যে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে ঐ কপ থেকে বের করেছেন। কারণ এই যে,



ভাইদের অপরাধ পূর্বেই মাফ করে দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন : **لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْهِمْ**

**اٰلِیَوْمِ** তাই যে কোনভাবে কুপেত্র কথা উল্লেখ করে ভাইদেরকে লজ্জা দেওয়া তিনি সমীচীন মনে করেন নি।—(কুরতুবী)

এসপন্ন ছিল পিতামাতা থেকে সুদীর্ঘ বিচ্ছেদ ও তার প্রতিক্রিয়াদি বর্ণনা করার পালা। তিনি সব বিষয় থেকে পাশ কাটিয়ে শুধু শেষ পরিণতি ও পিতামাতার সাথে সাক্ষাতের কথা আল্লাহর কৃতজ্ঞতাসহ উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহ্ আপনাকে গ্রাম থেকে মিসর শহরে এনে দিয়েছেন। এখানে এই নিয়ামতের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইয়াকুব (আ)-এর বাসভূমি গ্রামে ছিল সেখানে জীবন যাপনের সুযোগ-সুবিধা কম ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে শহরে রাজকীয় সম্মানের মাঝে পৌঁছে দিয়েছেন।

এখন প্রথম অধ্যায়টি অবশিষ্ট রইল—অর্থাৎ ভাইদের অত্যাচার ও উৎপীড়ন। একেও শয়তানের ছাড়ে চাপিয়ে এভাবে চুকিয়ে দিলেন যে, আমার ভ্রাতারা এরূপ ছিল না। শয়তান তাদেরকে ধোঁকায় ফেলে কলহ সৃষ্টির এ কাজটি করিয়েছে।

এ হচ্ছে নবুয়তের শান! নবীগণ দুঃখ-কষ্টে শুধু সবরই করেন না, বরং সর্বত্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দিকও আবিষ্কার করে ফেলেন। এ কারণেই তাঁদের এমন কোন অবস্থা নেই, যেখানে তাঁরা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি কৃতজ্ঞ নন। সাধারণ মানুষের অবস্থা এর বিপরীত। তারা আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামত পেয়েও কোন নিয়ামতের কথা উল্লেখ করে না, কিন্তু কোন সময় সামান্য কষ্ট পেলে জীবনভর তা গেয়ে বেড়ায়। কোঁরআনে এ বিষয়েই অভিযোগ করে বলা হয়েছে : **اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُورٌ** অর্থাৎ মানুষ পালনকর্তার প্রতি খুবই

অকৃতজ্ঞ।

ইউসুফ (আ) দুঃখ-কষ্টের ইতিকথা সংক্ষেপে তিন শব্দে বাস্তব করার পন্থা বললেন :

**اِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ** ---অর্থাৎ আমার পালনকর্তা

যে কাজ করতে চান, তার তদবীর সূক্ষ্ম করে দেন। নিশ্চয় তিনি সুবিজ্ঞ, প্রজ্ঞাবান।

**رَبِّ قَدْ اْتَيْتَنِي مِنَ الْمَلِكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ  
 قَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَنْتَ وَاَنْتَ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ  
 تَوْفٰنِيْ مُسْلِمًا وَّالْحَقِيْقِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ**

(১০১) হে পালনকর্তা, আপনি আমাকে রাজত্বের অংশবিশেষ দান করেছেন এবং আমাকে বিভিন্ন বিষয় মথায়থ তাৎপর্যসহ ব্যাখ্যা করার বিদ্যা শিখিয়ে দিয়েছেন। হে নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের স্রষ্টা, আপনিই আমার কার্যনির্বাহী ইহকাল ও পরকালে। আমাকে ইসলামের উপর যত্নাদান করুন এবং আমাকে সজ্জনদের সাথে মিলিত করুন।

### তক্ষসীরের সার-সংক্ষেপ

[এরপর সবাই হাসিখুশি জীবন অতিবাহিত করতে থাকেন। এক সময় ইয়াকুব (আ)-এর আয়ুষ্কাল ফুরিয়ে আসে। ওফাতের পর ওসিয়ত মোতাবেক মৃতদেহ সিরিয়ান স্থানান্তরিত করা হয়। পূর্বপুরুষগণের সমাধিপার্শ্বে দাফন করা হয়। এরপর ইউসূফ (আ)-এর মনেও পরকালের ঔৎসুক্য বৃদ্ধি পায় এবং তিনি দোয়া করেন : ] হে আমার পালনকর্তা, আপনি আমাকে ( সব রকম নিয়ামতই দিয়েছেন, বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণও। বাহ্যিক এই যে, উদাহরণত ) রাজত্বের বড় অংশ দিয়েছেন এবং ( আভ্যন্তরীণ এই যে, উদাহরণত ) আমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়েছেন ( যা একটি মহান বিদ্যা, বিশেষ করে তা যদি নিশ্চিত হয়। ব্যাখ্যার নিশ্চয়তা নির্ভর করে ওহীর উপর। সুতরাং এর অস্তিত্ব নবুওয়তের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত )। হে নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের স্রষ্টা, আপনি আমার কার্যনির্বাহী ইহকালে ও পরকালে ( অতএব ইহকালে যেমন আমার সব কাজ নির্বাহ করেছেন, রাজত্ব দান করেছেন এবং জ্ঞান দান করেছেন, তেমনি পরকালের কাজও সুষ্ঠু ও সঠিক করে দিন। অর্থাৎ আমাকে) আনুগত্যশীল অবস্থায় দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নিন এবং সব বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। ( অর্থাৎ আমার যে সব পূর্বপুরুষ মহান পয়গম্বর ছিলেন, আমাকেও তাঁদের স্তরে পৌঁছে দিন। )

### আনুমানিক জাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ইউসূফ (আ) পিতাকে স্মোধন করেছিলেন। এরপর পিতামাতা ও ভাইদের সাথে সাক্ষাতের ফলে যখন জীবনে শান্তি এল, তখন সরাসরি আল্লাহর প্রশংসা, গুণকীর্তন ও দোয়ায় মশগুল হয়ে গেলেন। বললেন :

رَبِّ قَدْ أَتَيْتَنِي مِنَ الْمَلِكِ وَهَدَانِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ  
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّ فِئَتِنَا وَالْآخِرَةُ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا  
وَالْحَقُّنِي بِالْمَالِحِينَ •

অর্থাৎ হে আমার পালনকর্তা, আপনি আমাকে রাজত্বের অংশবিশেষ দান করেছেন এবং আমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিখিয়েছেন। হে আসমান ও যমীনের স্রষ্টা, আপনিই ইহকাল

ও পরকালে আমার কার্যনির্বাহী। আমাকে পূর্ণ আনুগত্যশীল অবস্থায় দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নিন এবং আমাকে পল্লিপূর্ণ সৎ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত রাখুন। পল্লিপূর্ণ সৎ বান্দা পয়গম্বরগণই হতে পারেন। তাঁরা যাবতীয় গোনাহ্ থেকে পবিত্র।—(মায়হারী)

এ দোয়ায় 'খাতেমা-বিলখায়র' অর্থাৎ অন্তিম সময়ে পূর্ণ আনুগত্যশীল হওয়ার প্রার্থনাটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। আল্লাহ্ তা'আলার প্রিয়জনদের বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁরা ইহকাল ও পরকালে যত উচ্চ মর্তবাই লাভ করুন এবং যত প্রভাব-প্রতিপত্তি ও পদ-মর্যাদাই তাঁদের পদচুম্বন করুক, তাঁরা কখনও গর্বিত হন না, বরং সর্বদাই এ সব অবস্থা বিমূপ্ত হওয়ার অথবা হুস পাওয়ার আশংকা করতে থাকেন। তাই তাঁরা দোয়া করতে থাকেন, যাতে আল্লাহ্-প্রদত্ত বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ নিয়ামতসমূহ জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অব্যাহত থাকে, বরং সেগুলো আরও যেন বৃদ্ধি পায়।

এ পর্যন্ত কোরআনে বর্ণিত ইউসূফ (আ)-এর বিস্ময়কর কাহিনী এবং এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন নির্দেশের বর্ণনা সমাপ্ত হল। এর পরবর্তী কাহিনী কোরআন পাক অথবা কোন মরফু' হাদীসে বর্ণিত হয়নি। অধিকাংশ তফসীরবিদ ঐতিহাসিক কিংবা ইসরাঈলী রেওয়াজেত্তর বরাত দিয়ে তা বর্ণনা করেছেন।

তফসীর ইবনে-কাসীরে হযরত হাসানের রেওয়াজেতে বর্ণিত আছে যে, ইউসূফ (আ) যখন কুপে নিষ্ক্রান্ত হন, তখন তাঁর বয়স ছিল (১৭) সতের বছর। এরপর পিতার কাছ থেকে আশি বছর নিরুদ্দেশ থাকেন এবং পিতামাতার সাথে সাক্ষাতের পর তেইশ বছর জীবিত থাকেন। একশ বিশ বছর বয়সে ওফাত পান।

মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক বলেন : কিতাবী সম্প্রদায়দের রেওয়াজেতে আছে যে, ইউসূফ (আ) ও ইয়াকুব (আ)-এর বিচ্ছেদের মেয়াদ ছিল চল্লিশ বছর। এরপর ইয়াকুব (আ) মিসরে আগমন করার পর ছেলের সাথে সতের বছর জীবিত থাকেন। অতঃপর তাঁর ওফাত হয়ে যায়।

তফসীর কুরতুবীতে ঐতিহাসিকদের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে যে, মিসরে চব্বিশ বছর অবস্থান করার পর ইয়াকুব (আ)-এর ওফাত হয়ে যায়। ওফাতের পূর্বে তিনি ইউসূফ (আ)-কে ওসিয়ত করেন যেন তাঁর মৃতদেহ দেশে পাঠিয়ে পিতা ইসহাক (আ)-এর পার্শ্বে দাফন করা হয়।

সায়ীদ ইবনে জুবায়ের বলেন : ইয়াকুব (আ)-কে শাল কাঠের শবাধারে রেখে বায়তুল-মুকাদ্দাসে স্থানান্তরিত করা হয়। এ কারণেই সাধারণ ইহুদীদের মধ্যে এ প্রথা প্রচলিত হয়ে যায় যে, তারা মৃতদেহ দূর-দূরান্ত থেকে বায়তুল-মুকাদ্দাসে এনে দাফন করে। ওফাতের সময় হযরত ইয়াকুব (আ)-এর বয়স ছিল একশ সাতচল্লিশ বছর।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ বলেন : ইয়াকুব (আ) পরিবারবর্গসহ যখন মিসরে প্রবেশ করেন, তখন তাঁদের সংখ্যা ছিল তিরানব্বই জন। পরবর্তীকালে ইয়াকুব (আ)-এর আওলাদ অর্থাৎ, বনী-ইসরাঈল যখন মুসা (আ)-এর সাথে মিসর থেকে বের হয়, তখন তাদের সংখ্যা ছিল ছয় লাখ সত্তর হাজার।—(কুরতুবী, ইবনে-কাসীর)

পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, সাবেক আযীযে-মিসরের মৃত্যুর পর বাদশাহর উদ্যোগে ইউসুফ (আ) যুলায়খাকে বিয়ে করেছিলেন।

তওরাত ও কিতাবী সম্প্রদায়ের ইতিহাসে আছে, তাঁর গর্ভে ইউসুফ (আ)-এর দুই ছেলে ইফরাইম ও মনশা এবং এক কন্যা 'রহমত বিনতে ইউসুফ' জন্মগ্রহণ করেন। রহমতের বিয়ে হয়রত আইউব (আ)-এর সাথে সম্পন্ন হয়। ইফরাইমের বংশধরের মধ্যে মুসা (আ)-এর সহচর ইউশা ইবনে-নুন জন্মগ্রহণ করেন।—( মাযহারী )

হয়রত ইউসুফ (আ) একশ বিশ বছর বয়সে ইস্তেকাল করেন এবং নীলনদের কিনারায় সমাহিত হন।

ইবনে ইসহাক হয়রত ওরওয়া ইবনে যুবায়র থেকে বর্ণনা করেন, মুসা (আ)-কে যখন বনী ইসরাঈলদের সাথে নিয়ে মিসর ত্যাগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়, তখন ওহীর মাধ্যমে একথাও বলা হয় যে, ইউসুফের মৃতদেহ মিসরে রেখে যাবেন না, বরং সাথে নিয়ে সিরিয়া চলে যান এবং তাঁর পিতৃপুরুষদের পাশে দাফন করুন। এ নির্দেশ পেয়ে মুসা (আ) খোঁজাখুঁজি করে তাঁর কবর আবিষ্কার করেন, যা মর্মর পাথরের একটি শবাধারে রক্ষিত ছিল। তিনি তাঁকে কেনান ভূমি অর্থাৎ, ফিলিস্তীনে নিয়ে যান এবং হয়রত ইসহাক ও ইয়াকুব (আ) এর পাশে দাফন করেন।—( মাযহারী )

ইউসুফ (আ)-এর পর মিসর দেশ 'আমালিক' গোত্রের ফেরআউনদের করতলগত হয়। বনী ইসরাঈল তাদের রাজত্বে বাস করে ইউসুফ (আ)-এর ধর্ম পালন করতে থাকে, কিন্তু বিদেশী হওয়ার অজুহাতে তাদের উপর নানাবিধ নির্যাতন চলতে থাকে। অবশেষে মুসা (আ)-এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে এ নির্যাতন থেকে উদ্ধার করেন।—( মাযহারী )

**নির্দেশ ও বিধান :** আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে প্রথমত জানা যায় যে, পিতামাতার প্রতি সম্মানসূচক সিজদা তখন জায়েয ছিল বলেই তাঁর পিতামাতা ও ভ্রাতারা সিজদা করেছিলেন। কিন্তু মুহাম্মদী শরীয়তে সিজদা হচ্ছে ইবাদতের বিশেষ আলামত। তাই আল্লাহ্ ছাড়া অন্যকে সিজদা করা হারাম। কোরআন পাকে বলা হয়েছে

لَا تَسْجُدْ وَاشْتُرِكْ لِلشَّمْسِ وَاللَّقَمَرِ —সূর্য ও চন্দ্রকে সিজদা কর না। হাদীসে আছে, হয়রত

মুন্নায সিরিয়া গমন করে যখন দেখলেন যে, খৃস্টানরা তাদের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গকে সিজদা করে, তখন ফিরে এসে রসুলুল্লাহ্ (সা)-কে সিজদা করতে উদ্যত হন। রসুলুল্লাহ্ (সা) তাঁকে নিষেধ করে বললেন : যদি আমি কাউকে সিজদা করা জায়েয মনে করতাম, তবে স্ত্রীদেরকে আদেশ দিতাম তারা যেন স্বামীদেরকে সিজদা করে। এমনিভাবে হয়রত সালমান ফারিসী রসুলুল্লাহ্ (সা)-কে সিজদা করতে চেয়েছিলেন। তিনি নিষেধ করে বলেছিলেন : لَا تَسْجُدْ لِي يَا سَلْمَانَ وَأَسْجُدْ لِلَّهِ الَّذِي لَا يَمُوتُ —অর্থাৎ

সালমান, আমাকে সিজদা করো না; বলতঃ ঐ চিরজীবীকে সিজদা কর, যার ক্ষয় নেই।—  
(ইবনে-কাসীর)

এতে বুঝা গেল যে, রসূলুল্লাহ (সা)-কে যখন সম্মানসূচক সিজদা করা জায়েয নয়, তখন আর কোন বুয়ুর্গ অথবা পীরের জন্য কেমন করে তা জায়েয হতে পারে?

هَذَا تَأْوِيلُ رَسَالَتِي --- থেকে জানা যায় যে, মাঝে মাঝে স্বপ্নের অর্থ দীর্ঘদিন

পরও প্রকাশ পায়। যেমন এ ঘটনায় চল্লিশ কিংবা আশি বছর পর প্রকাশ পেয়েছে।  
—(ইবনে-জরীর, ইবনে কাসীর)

قَدْ أَحْسَنَ بِي --- দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রোগ-শোক ও বিপদাপদে পতিত

হওয়ার পর যদি মুক্তি পাওয়া যায়, তবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা পয়গম্বরগণের সুমত এবং রোগ ও বিপদাপদের কথা উল্লেখ না করাও সুমত।

إِنَّ رَبِّي لَطَوِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ --- থেকে জানা গেল যে, আল্লাহ তা'আলা যে

কাজের ইচ্ছা করেন, তার জন্য ধারণাতীত সূক্ষ্ম ও গোপন তদবীরের ব্যবস্থা করে থাকেন, যা মানুষ কল্পনাও করতে পারে না।

تَوَنَّى سَلَامًا --- বাকো ইউসুফ (আ) ঈমান ও ইসলামের উপর মৃত্যুর জন্য

দোয়া করেছেন। এতে বুঝা গেল, বিশেষ অবস্থায় মৃত্যুর জন্য দোয়া নিষিদ্ধ নয়। সহীহ হাদীসে মৃত্যু কামনা করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এর অর্থ এই যে, সংসারের দুঃখ-কষ্টে পেনেশান ও অধৈর্য হয়ে মৃত্যু কামনা করা দুরন্ত নয়। বিপদের কারণে মৃত্যুর জন্য দোয়া করতে রসূলুল্লাহ (সা) নিষেধ করেছেন। যদি দোয়া করতেই হয় তবে এভাবে করবে, ইয়া আল্লাহ, যে পর্যন্ত জীবিত রাখ ঈমানের সাথে বেঁচে থাকার তাওফীক দাও এবং যখন মৃত্যু শ্রেয় হয়, তখনই আমাকে মৃত্যু দান কর।

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا

أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ ۝ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ

۝ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ۝

وَكَايِنٍ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ

عَنْهَا مَعْرُضُونَ ۝ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ  
 ۝ أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ  
 السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا  
 إِلَى اللَّهِ تَعَالَىٰ بِصِدْقٍ أَنَا وَمِنِ اتَّبَعِي ۖ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ  
 الْمُشْرِكِينَ ۝ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ مِّنْ  
 أَهْلِ الْقُرَىٰ ۖ أَقَلَّمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ  
 الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا ۖ أَفَلَا  
 تَعْقِلُونَ ۝

(১০২) এগুলো অদৃশ্যের খবর, আমি আপনার কাছে প্রেরণ করি। আপনি তাদের কাছে ছিলেন না, যখন তারা স্থায়ী কাজ সাব্যস্ত করছিল এবং চক্রান্ত করছিল। (১০৩) আপনি যতই চান, অধিকাংশ লোক বিশ্বাসকারী নয়। (১০৪) আপনি এর জন্য তাদের কাছে কোন বিনিময় চান না। এটা তো সারা বিশ্বের জন্য উপদেশ বৈ নয়। (১০৫) অনেক নিদর্শন রয়েছে নভোমণ্ডলে ও ভূ-মণ্ডলে যেগুলোর উপর দিয়ে তারা পথ অতিক্রম করে এবং তারা এসবের দিকে মনোনিবেশ করে না। (১০৬) অনেক মানুষ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, কিন্তু সাথে সাথে শিরকও করে। (১০৭) তারা কি নিভীক হয়ে গেছে এ বিষয়ে যে, আল্লাহর আযাবের কোন বিপদ তাদেরকে আর্হত করে ফেলবে অথবা তাদের কাছে হঠাৎ কিয়ামত এসে যাবে, অথচ তারা টেরও পাবে না? (১০৮) বলে দিন : এই আমার পথ। আমি আল্লাহর দিকে বুঝে সুঝে দাওয়াত দেই---আমি এবং আমার অনুসারীরা। আল্লাহ পবিত্র। আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই। (১০৯) আপনার পূর্বে আমি যতজনকে রসূল করে পাঠিয়েছি, তারা সবাই পুরুষই ছিল জন-পদবাসীদের মধ্য থেকে। আমি তাদের কাছে ওহী প্রেরণ করতাম। তারা কি দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করে না, যাতে দেখে নিত কিরূপ পরিণতি হয়েছে তাদের, যারা পূর্বে ছিল? সংঘমকারীদের জন্য পরকালের আবাসই উত্তম। তারা কি এখনও বুঝে না?

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এই কাহিনী (যা উপরে বর্ণিত হয়েছে, আপনার জন্য) অন্যতম অদৃশ্য সংবাদ। (কেননা এটা জানার কোন বাহ্যিক উপায় আপনার কাছে ছিল না, শুধু) আমি-(ই)

ওহীর মাধ্যমে আপনাকে এ কাহিনী বলছি এবং (বলা বাহুল্য) আপনি তাদের (ইউসুফ ভ্রাতাদের) কাছে তখন ছিলেন না, যখন তারা (ইউসুফকে কুপে নিক্ষেপ করার) স্বীয় অভিসন্ধি পাকাপোক্ত করেছিল এবং তারা (এ সম্পর্কে) তদবীর করেছিল (যে, তারা পিতার কাছে এমন বলবে, যাতে তারা তাকে এমনভাবে নিয়ে যায় ইত্যাদি। এভাবে এটা নিশ্চিত যে, আপনি এ কাহিনী করারও কাছে গুনে ন। অতএব, এটা নবুয়তের এবং ওহী প্রাপ্তির পরিষ্কার প্রমাণ) এবং (নবুয়তের প্রমাণাদি উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও) অধিকাংশ লোক বিশ্বাস স্থাপন করেন না; যদিও আপনি কামনা করেন আর (তাদের বিশ্বাস স্থাপন না করার কারণে অবশ্য আপনার কোন ক্ষতি নেই। কেননা) আপনি তাদের কাছে এর (কোরআনের) জন্য কোন বিনিময় চান না (যাতে এরূপ সম্ভাবনা থাকে যে, তারা এ কোরআন কবুল না করলে আপনার পারিশ্রমিক পণ্ড হয়ে যাবে)। এটা (অর্থাৎ কোরআন) তো শুধু বিশ্বাসীর জন্য একটি উপদেশ। (কেউ না মানলে তাতে তারই ক্ষতি।) এবং (এরা যেমন নবুয়ত অস্বীকার করে, এমনভাবে প্রমাণাদি সত্ত্বেও একত্ববাদ অস্বীকারকারীও রয়েছে। সেমতে) বহু নিদর্শন রয়েছে (যেগুলো একত্ববাদের প্রমাণ) নভোমণ্ডলে (যেমন, নক্ষত্ররাজি ইত্যাদি) এবং ভূ-মণ্ডলে; (যেমন পদার্থ ও উপাদান,) যেগুলোর উপর দিয়ে তারা পথ অতিক্রম করে (অর্থাৎ প্রত্যক্ষ করতে থাকে) এবং তারা এগুলোর প্রতি (সামান্যও) মনোযোগ দেয় না। (অর্থাৎ এগুলো দ্বারা কোন কিছু প্রমাণ করে না।) এবং অধিকাংশ লোক, যারা আল্লাহকে মানে, তারা সাথে সাথে শিরকও করে। (অতএব একত্ববাদ বাতীত আল্লাহকে মানা, না মানারই শামিল। সুতরাং তারা আল্লাহর সাথে কুফরী করে এবং নবুয়তের সাথেও কুফরী করে।) অতএব (আল্লাহ ও রসূলে অবিশ্বাসী হয়েও) তারা কি এ ব্যাপারে নিরুদ্বেগ হয়ে বসেছে যে, আল্লাহর আঘাবের কোন বিপদ এসে তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে অথবা তাদের কাছে অতিক্রম কিয়ামত এসে যাবে এবং তারা (পূর্ব থেকে) টেরও পাবে না? (উদ্দেশ্য, কুফরের পরিণাম হচ্ছে শাস্তি; দুনিয়াতে নাযিল হোক কিংবা কিয়ামতের দিন পতিত হোক। অতএব তাদের উচিত ভয় করা এবং কুফরী পরিত্যাগ করা।) আপনি বলে দিন : আমি (একত্ববাদ ও আল্লাহর পক্ষ থেকে আহ্বানক হওয়ার) প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে আল্লাহ তা'আলার দিকে দাওয়াত দেই—আমি নিজেও এবং আমার অনুসারীরাও। (অর্থাৎ আমার কাছেও তওহীদ ও রিসালতের প্রমাণ রয়েছে এবং আমার সঙ্গীরাও প্রমাণের ভিত্তিতে আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে। আমি প্রমাণহীন বিষয়ের প্রতি কাউকে দাওয়াত দেই না। প্রমাণ শোন এবং বুঝ। অতএব আমার পথের সারমর্ম এই যে, আল্লাহ এক এবং আমি দাওয়াতদাতা) এবং আল্লাহ (শিরক থেকে) পবিত্র এবং আমি (এ পথ কবুল করি এবং) মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। (তারা যে নবুয়তের ব্যাপারে সন্দেহ করে যে, নবীর ফেরেশতা হওয়া উচিত, এটা অর্থহীন বাজে কথা। কেননা) আমি আপনার পূর্বে বিভিন্ন জনপদবাসীর মধ্য থেকে যতজনকে (রসূল করে) প্রেরণ করেছি, তারা সবাই মানুষই ছিল, যাদের কাছে আমি ওহী প্রেরণ করতাম। (কেউ ফেরেশতা ছিল না। যারা তাদেরকে মানেনি এবং এ ধরনের অনর্থক প্রয় উপস্থাপন করেছে, তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। এমনভাবে এরাও শাস্তি পাবে—ইহকালে হোক কিংবা

পরকালে। এরা যে নিশ্চিত হয়ে বসে রয়েছে) এরা কি (কোথাও) দেশ ভ্রমণে যায়নি যে, (স্বচক্ষে) তাদের পরিণাম দেখে নিত, যারা তাদের পূর্বে (কাফির হিসাবে) গত হয়েছে? (এবং মনে রেখো, যে দুনিয়ার ভাগবাসায় মত্ত হয়ে তোমরা কুফরের পথ ধরোছ, তা ধ্বংসশীল ও তুচ্ছ,) নিশ্চয় পরজগত তাদের জন্য খুবই উত্তম, যারা (শিরক ইত্যাদি থেকে) সংযমী হয় (এবং একত্ববাদ ও আনুগত্য অবলম্বন করে)। অতএব, তোমরা কি এতটুকুও বুঝ না (যে ধ্বংসশীল ও ভিত্তিহীন বস্তু ভাল, না চিরস্থায়ী ও অক্ষয় বস্তু ভাল)?

### আনুমানিক জাতব্য বিষয়

ইউসুফ (আ)-এর কাহিনী পুরাপুরি বর্ণনা করার পর আলোচ্য আয়াতসমূহে নবী করীম (সা)-কে সম্বোধন করা হয়েছে।

ذٰلِكَ مِنْ اٰتِهَا ؕ اَلْغَيْبِ نُوْحِيَةً اِلَيْكَ

—অর্থাৎ এই কাহিনী ঐ সব অদৃশ্য সংবাদের অন্যতম, যেগুলো আমি ওহীর মাধ্যমে আপনাকে বলেছি। আপনি ইউসুফ-ভ্রাতাদের কাছে উপস্থিত ছিলেন না, যখন তারা ইউসুফকে কূপে নিক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এবং এজন্য কলাকৌশলের আশ্রয় নিচ্ছিল।

এ বর্ণনার উদ্দেশ্য এই যে, ইউসুফ (আ)-এর কাহিনীটি পূর্ণ বিবরণসহ তিক্তিক বলে দেওয়া আপনার নবুয়ত ও ওহীর সুস্পষ্ট প্রমাণ। কেননা, কাহিনীটি হাজারো বছর পূর্বকাল। আপনি সেখানে বিদ্যমান ছিলেন না যে, স্বচক্ষে দেখে বিবৃত করবেন এবং আপনি কারও কাছে শিক্ষাও গ্রহণ করেন নি যে, ইতিহাস গ্রন্থ পাঠ করে অথবা কারও কাছে শুনে বর্ণনা করবেন। অতএব, আল্লাহর ওহী ব্যতীত এ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার দ্বিতীয় কোন পথ নেই।

কোরআন পাক শুধু এতটুকু বিষয় উল্লেখ করেছে যে, (আপনি সেখানে বিদ্যমান ছিলেন না।) অন্য কোন ব্যক্তি অথবা গ্রন্থ থেকে এ বিষয়ে জ্ঞান অর্জিত না হওয়ার কথা উল্লেখ করা জরুরী মনে করা হয়নি। কারণ, সমগ্র আরবের জানা ছিল যে, রসুলুল্লাহ (সা) উম্মী বা নিরক্ষর। তিনি কারও কাছে লেখাপড়া করেন নি। সবার আরও জানা ছিল যে, তাঁর সমগ্র জীবন মক্কায় অতিবাহিত হয়েছে। একবার চাচা আবু তালিবের সাথে সিরিয়া সফরে গমন করে মাঝপথ থেকেই ফিরে এসেছিলেন। দ্বিতীয় সফর, বাগিঙ্গা ব্যাপদেশে করেছিলেন, কিন্তু মাত্র কয়েকদিন অবস্থান করেই ফিরে আসেন। এ সফরেও কোন পণ্ডিত ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত অথবা কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্কের বিন্দুমাত্র অবকাশ ছিল না। তাই এ ক্ষেত্রে তা উল্লেখ করা জরুরী মনে করা হয়নি। তবে

কোরআন পাকের অন্যত্র একথাও উল্লেখ করা হয়েছে :

مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا اَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا

পূর্বে এ সব ঘটনা আপনিও জানতেন এবং আপনার স্বজাতিও জানত না।



ইহাম বগভী বলেন : ইহদী ও কুরাইশরা সম্মিলিতভাবে পরীক্ষার্থে রসুলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রথ্ন করল : আপনি যদি সত্য নবী হন, তবে বলুন, ইউসুফ (আ)-এর ঘটনাটি কি এবং কিভাবে ঘটেছিল? যখন রসুলুল্লাহ্ (সা) ওহীর মাধ্যমে সব বলে দিলেন এবং এরপরও তারা কুমরী ও অস্বীকারে অটল রইল, তখন তিনি অন্তরে দারুন আঘাত পেলেন। এরই প্রেক্ষিতে পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যে, আপনার নিসালতের সুস্পষ্ট প্রমাণাদি সত্ত্বেও অনেক মানুষ বিশ্বাস স্থাপনকারী নয়—আপনি যত চেষ্টাই করুন না কেন। উদ্দেশ্য এই যে, আপনার কাজ হল প্রচার এবং সংশোধনের চেষ্টা করা। চেষ্টাকে সফল করা আপনার ক্ষমতাহীন নয়। অধিকন্তু এটা আপনার দায়িত্বও নয়। কাজেই দুঃখ করাও উচিত নয়। এরপর বলা হয়েছে :

وَمَا تَسْأَلُهُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنَّهُ لَازْكُرُ لَكُمْ لَمِينٌ ۝

প্রচার ও বিশুদ্ধ পথ বলে দেওয়ার যে চেষ্টা করছেন, সেজন্য তাদের কাছে তো কোন পারিশ্রমিক চান না যে, এটা মেনে নেওয়া বা শোনা তাদের পক্ষে কঠিন হবে। আপনার কথাবার্তা তো নির্ভেজাল মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা ও উপদেশ সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য। এতে এদিকেও ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, আপনার এ চেষ্টার লক্ষ্য যখন পাখিব উপকার লাভ নয়, বরং পরব্বালের সওয়াব ও জাতির হিতাকাঙ্ক্ষা, তখন এ লক্ষ্য অর্জিত হয়ে গেছে। সুতরাং আপনি কেন চিন্তিত হন?

وَكَايِنِ مِنْ آيَةِ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَهْرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ

অর্থাৎ শুধু তাই নয় যে এরা জেদ ও হঠকারিতাবশত কোন শুভাকাঙ্ক্ষীর উপদেশে শ্রবণ করে না, বরং তাদের অবস্থা হল এই যে, নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে আল্লাহর যেসব সুস্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে, সেগুলোর কাছ দিয়েও এরা উদাসীন হয়ে ও চোখ বুজে চলে যায়। একটুও লক্ষ্য করে না যে, এগুলো কান্ন অপার শক্তির নিদর্শন। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান ও শক্তির অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে। অতীতের আযাবপ্রাপ্ত জাতিসমূহের ধ্বংসাবশেষ তাদের দৃষ্টিগোচর হয়, কিন্তু তারা এগুলো থেকেও শিক্ষা গ্রহণ করেন না।

যারা আল্লাহর অস্তিত্ব ও শক্তিতেই বিশ্বাস করে না, উপরোক্ত বর্ণনা ছিল তাদের সম্পর্কে। অতঃপর এমন লোকদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে, যারা আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসী, কিন্তু তাঁর সাথে অন্য বস্তুকে অংশীদার সাব্যস্ত করে। বলা হয়েছে :

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ

যারা আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করে, তারাও শিরকের সাথে করে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান, শক্তি ইত্যাদি গুণের সাথে অন্যকে অংশীদার সাব্যস্ত করে, যা একান্ত অন্যায় ও নিছক মূর্খতা।

ইবনে কাসীর বলেন : যেসব মুসলমান ঈমান সত্ত্বেও বিভিন্ন প্রকার শিরকে লিপ্ত রয়েছে, তারাও এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। মসনদে আহমদের এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন : আমি তোমাদের জন্য যেসব বিষয়ের আশঙ্কা করি, তন্মধ্যে সবচাইতে বিপজ্জনক হচ্ছে ছোট শিরক। সাহাবায়ে কিরামের প্রম্নের উত্তরে তিনি বললেন : রিয়্যা (লোক-দেখানো ইবাদত) হচ্ছে ছোট শিরক। এমনিভাবে এক হাদীসে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের কসম খাওয়াকেও শিরক বলা হয়েছে।—(ইবনে কাসীর) আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও নামে মান্ত করা এবং নিম্নাজ দেয়াও ফিকাহ বিদগণের মতে শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

এরপর তাদের অমনোযোগিতা ও মূর্খতার কারণে পরিতাপ ও বিফময় প্রকাশ করা হয়েছে যে, তারা অস্বীকার ও অবাধ্যতা সত্ত্বেও কিরূপে নিশ্চিত হয়ে গেছে যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের উপর কোন আযাব এসে যাবে কিংবা অতর্কিতে কিয়ামত এসে যাবে তাদের প্রস্তুতি গ্রহণের পূর্বেই।

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ

اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝

অর্থাৎ আপনি তাদেরকে বলে দিন : তোমরা মান অথবা না মান—আমার তরীক এই যে, মানুষকে পূর্ণ বিশ্বাস সহকারে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিতে থাকব—আমি এবং আমার অনুসারীরাও।

উদ্দেশ্য এই যে, আমার দাওয়াত আমার কোন চিন্তাধারার উপর ভিত্তিশীল নয়; বরং এটা পরিপূর্ণ জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞার ফলশ্রুতি। এ দাওয়াত ও জ্ঞানে রসূলুল্লাহ (সা) তাঁর অনুসারীদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস বলেন : এতে সাহাবায়ে কিরামকে বুঝানো হয়েছে, যারা রসূলুল্লাহ (সা)-র জ্ঞানের বাহক এবং আল্লাহর সিপাহী। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ বলেন : সাহাবায়ে কিরাম এ উম্মতের সর্বোত্তম ব্যক্তিবর্গ। তাঁদের অন্তর পবিত্র এবং জ্ঞান সুগভীর। তাঁদের মধ্যে লৌকিকতার নাম-গন্ধও নেই। আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে স্থায়ী রসূলের সংসর্গ ও সেবার জন্য মনোনীত করেছেন। তোমরা তাঁদের চরিত্র অভ্যাস ও তরীকা আয়ত্ত কর। কেননা, তাঁরা সরল পথের পথিক।

وَمَنِ اتَّبَعَنِي

ব্যাপক অর্থেও হতে পারে। এতে ঐ সব ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে, যারা কিয়ামত পর্যন্ত রসূলুল্লাহ (সা)-র দাওয়াতকে উম্মত পর্যন্ত পৌঁছানোর কাজে নিয়োজিত থাকবেন। কলবী ও ইবনে যায়েদ বলেন : এ আয়াত থেকে আরও জানা গেল যে, যে ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সা)-র অনুসরণের দাবী করে, তার অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে তাঁর দাওয়াতকে ঘরে ঘরে পৌঁছানো এবং কোরআনের শিক্ষাকে ব্যাপকতর করা।

سُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَتَى مِنَ الْمُشْرِكِينَ

পবিত্র এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। উপরে বর্ণিত হয়েছিল যে, অধিকাংশ লোক ঈমানের সাথে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য শিরককেও যুক্ত করে দেয়। তাই শিরক থেকে নিজের সম্পূর্ণ পবিত্রতা প্রকাশ করেছেন। সারকথা এই যে, আমার দাওয়াতের উদ্দেশ্য মানুষকে নিজের দাসে পরিণত করা নয়; বরং আমি নিজেও আল্লাহর 'বান্দা' এবং মানুষকেও তাঁর দাসত্ব স্বীকার করার দাওয়াত দেই। তবে দাওয়াতদাতা হিসাবে আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ফরয।

মুশরিকরা এ ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করত যে, আল্লাহর রসূল ও দূত মানুষ নয়; বরং ফেরেশতা হওয়া দরকার। এর উত্তর পরবর্তী আয়াতে দেওয়া হয়েছে:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ

অর্থাৎ তাদের এ ধারণা ভিত্তিহীন ও নিরর্থক যে, আল্লাহর রসূল ফেরেশতা হওয়া দরকার—মানব হতে পারে না। বরং ব্যাপার উল্টা। মানব জাতির জন্য আল্লাহর রসূল সবসময় মানবই হয়েছেন। তবে সাধারণ লোকদের থেকে তাঁর স্বাতন্ত্র্য এই যে, তাঁর প্রতি সরাসরি আল্লাহর কাছ থেকে ওহী আগমন করে। এটা কারও প্রচেষ্টা ও কর্মের ফল নয়। আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে উপযুক্ত মনে করেন, এ কাজের জন্য মনোনীত করেন। এ মনোনয়ন এমন কতগুলো বিশেষ গুণের ভিত্তিতে হয়, যেগুলো সাধারণ মানুষের মধ্যে বিদ্যমান থাকে না।

পরবর্তী আয়াতে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে, যারা আল্লাহর দিকে দাওয়াত-দাতার ও রসূলের নির্দেশাবলী অমান্য করে আল্লাহর আযাবকে ডেকে আনে। বলা হয়েছে:

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَذِلَّةَ تَعَالُونَ

অর্থাৎ তারা কি দেশ-ভ্রমণে বের হয় না, যাতে পূর্ববর্তী জাতিসমূহের শোচনীয় পরিণতি স্বচক্ষে দেখে নিতে পারে? কিন্তু তারা ইহকালের বাহ্যিক আরাম-আয়েশ ও সাজ-সজ্জায় মত্ত হয়ে পরকাল ভুলে গেছে। অথচ পরহিযগারদের জন্য পরকাল ইহকালের চাইতে অনেক উত্তম। তারা কি এতটুকুও বুঝে না যে, দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী সুখ ভাল, না পরকালের চিরস্থায়ী আরাম-আয়েশ ও নিয়ামত ভাল?

বিধান ও নির্দেশঃ অদৃশ্যের সংবাদ ও অদৃশ্যের জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্যঃ

إِنَّ لَكَ مِنْ أَثْنَاءِ الْغَيْبِ نُوحًا إِلَيْكَ

—এগুলোর সব অদৃশ্যের সংবাদ,

যা আমি আপনাকে ওহীর মাধ্যমে বলি। এ বিষয়বস্তুটি প্রায় এমনি ভাষায় সূরা আলে ইমরানের ৪৩ আয়াতে মস্নুন্নমের কাহিনীতে ব্যক্ত হয়েছে। সূরা হদের ৪৮ আয়াতে

نُذِرْكَ مِنَ أَنْبَاءٍ لَغَيْبٍ نُوْحِيَهَا إِلَيْكَ

নূহ (আ)-এর ঘটনা সম্পর্কে বলা হয়েছে :

—এসব আয়াত থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে পয়গম্বরদেরকে অদৃশ্যের সংবাদ বলে দেন। বিশেষ করে আমাদের শ্রেষ্ঠতম পয়গম্বর মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-কে এসব অদৃশ্য সংবাদের বিশেষ অংশ দান করা হয়েছে, যার পরিমাণ পূর্ববর্তী পয়গম্বরদের তুলনায় বেশী। এ কারণেই তিনি উম্মতকে এমন অনেক ঘটনা বিস্তারিত অথবা সংক্ষেপে বলে দিয়েছেন, যেগুলো কিয়ামত পর্যন্ত সংঘটিত হবে। 'কিতাবুল ফিতান' শিরোনামে ভবিষ্যতে সংঘটিত হবে এমন বর্ণনা সম্বলিত বহুসংখ্যক ভবিষ্যদ্বাণী হাদীস-গ্রন্থসমূহে বিস্তারিত মওজুদ রয়েছে।

সাধারণ মানুষ 'অদৃশ্যের জ্ঞান' বলতে যে কোনরূপে অদৃশ্যের সংবাদ অবগত হওয়াকেই বোঝে। এ গুণ রসূলুল্লাহ (সা)-র মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। এ জন্যই তাদের মতে রসূলুল্লাহ (সা) 'আলিমুল-গায়ব' (অদৃশ্যে জ্ঞানী) ছিলেন। কিন্তু কোরআন

পাক পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে, لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

الْغَيْبِ إِلَّا اللَّهُ --- এতে জানা যায় যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ আলিমুল গায়ব

হতে পারে না। এটা আল্লাহ তা'আলার বিশেষ গুণ। এতে কোন রসূল অথবা ফেরেশ-তাকে শরীক মনে করা তাদেরকে আল্লাহর সমতুল্য করার নামাস্তর এবং তা খৃষ্টানদের অপকর্ম; তারা রসূলকে আল্লাহর পুত্র এবং আল্লাহর সত্য অংশীদার সাব্যস্ত করে। কোরআন পাকের উল্লিখিত আয়াত দ্বারা ব্যাপারটির পূর্ণ স্বরূপ ফুটে উঠেছে যে, অদৃশ্যের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা'আলার বিশেষ গুণ এবং 'আলিমুল-গায়ব', একমাত্র তিনিই। তবে অদৃশ্যের অনেক সংবাদ আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে পয়গম্বরগণকে অবহিত করেন। কোরআন পাকের পরিভাষায় একে অদৃশ্যের জ্ঞান বলা হয় না। সাধারণ মানুষ এই সূক্ষ্ম পার্থক্যটি বোঝে না। তারা অদৃশ্যের সংবাদকেই অদৃশ্যের জ্ঞান বলে আখ্যায়িত করে। এরপর কোরআনের পরিভাষায় যখন বলা হয় যে, অদৃশ্যের জ্ঞান আল্লাহ ছাড়া কারও নেই, তখন তারা এতে দ্বিমত প্রকাশ করতে থাকে। এর স্বরূপ এর বেশি নয় যে :

اخلاف خلق از نام او فتاد  
چون بمعنی رفت آرام او فتاد

অর্থ : জনসাধারণের মতভেদ নামের মধ্য থেকে সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু যখন তা-পর্ষে পৌঁছে গেছে, তখন সকল মতভেদ থেমে গেছে।

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا لَّا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ

এ আয়াতে পয়গম্বরগণের সম্পর্কে رِجَالًا শব্দের ব্যবহার থেকে বোঝা যায় যে,

পয়গম্বর সব সময় পুরুষই হন, নারীদের মধ্যে কেউ নবী কিংবা রসূল হতে পারেন না।

ইবনে কাসীর ব্যাপক সংখ্যক আলিমের এ অভিমত বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা কোন নারীকে নবী কিংবা রসূল নিযুক্ত করেন নি। কোন কোন আলিম কয়েকজন মহিলা সম্পর্কে নবী হওয়ার কথা স্বীকার করেছেন; উদাহরণত হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বিবি সারা, হযরত মুসা (আ)-এর জননী এবং হযরত ঈসা (আ)-এর জননী হযরত মরিয়ম। এ তিনজন মহিলা সম্পর্কে কোরআন পাকে এমন ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে, যম্বাদারা বোঝা যায় যে, আল্লাহর নির্দেশে ফেরেশতারা তাঁদের সাথে বাকলাপ করেছে, সুসংবাদ দিয়েছে কিংবা ওহীর মাধ্যমে স্বয়ং তারা কোন বিষয় জানতে পেরেছেন। কিন্তু ব্যাপক সংখ্যক আলিমের মতে এসব আয়াত দ্বারা উপলব্ধ তিন জন মহিলার মাহাত্ম্য এবং আল্লাহর কাছে তাঁদের উচ্চ মর্যাদাশালিনী হওয়া বোঝা যায় মাত্র। এই ভাষা নবুয়ত ও রিসালত প্রমাণের জন্য যথেষ্ট নয়।

এ আয়াতেই أَهْلُ الْقُرَى শব্দ দ্বারা জানা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা সাধারণত

শহর ও নগরবাসীদের মধ্য থেকে রসূল প্রেরণ করেছেন। অজ গ্রাম কিংবা বনাঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্য থেকে রসূল প্রেরিত হয় নি। কারণ, সাধারণত গ্রাম বা বনাঞ্চলের অধিবাসীরা স্বভাব-প্রকৃতি ও জ্ঞান-বুদ্ধিতে নগরবাসীদের তুলনায় পশ্চাদপদ হয়ে থাকেন।  
—(ইবনে-কাসীর, কুরতুবী প্রমুখ)

حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ وَكَانُوا اللَّائِمِينَ قَدْ كَذَّبُوا جَاءَهُمْ

نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ۝

لَقَدْ كَانَ فِي قَصصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا

يُفْتَرَىٰ وَلَكِنَّ صِدْقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ

شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝

(১১০) এমনকি, যখন পয়গম্বরগণ নৈরাশ্যে পতিত হয়ে যেতেন, এমনকি এরূপ ধারণা করতে শুরু করতেন যে, তাদের অনুমান হুন্নি মিথ্যায় পরিণত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল, তখন তাদের কাছে আমার সাহায্য পৌঁছে। অতঃপর আমি তাদের চেয়েছি তারা

উদ্ধার পেয়েছে। আমার শাস্তি অপরাধী সম্প্রদায় থেকে প্রতিহত হয় না। (১১১) তাদের কাহিনীতে বুদ্ধিমানদের জন্য রয়েছে প্রচুর শিক্ষণীয় বিষয়, এটা কোন মনগড়া কথা নয়, কিন্তু যারা বিশ্বাস স্থাপন করে তাদের জন্য পূর্বকার কালামের সমর্থন এবং প্রত্যেক বস্তুর বিবরণ রহমত ও হিদায়ত।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(আযাবের বিলম্ব দেখে যদি তোমরা কাফিরদের উপর আযাব আসবে না বলে সন্দেহ কর, তবে তা তোমাদের ভুল। কারণ, পূর্ববর্তী উম্মতের কাফিরদেরকেও সূদীর্ঘ অবকাশ দেওয়া হয়েছিল।) এমনকি (সময়ের মেয়াদ দীর্ঘ হওয়ার কারণে) রসূলগণ (এ ব্যাপারে) নিরাশ হয়ে গেলেন (যে আমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে কাফিরদের উপর আযাব আসার যে সময় নিজেদের অনুমানের ভিত্তিতে নির্ধারণ করেছিলাম যে, অমুক সময়ে কাফিরদের উপর আযাব আসবে, ফলে আমাদের প্রাধান্য ও সত্ততা প্রতিষ্ঠিত হবে) এবং তাদের প্রবল ধারণা হল যে, (আল্লাহর ওয়াদার সময় নির্ধারণে) আমরা ভুল করেছি, (কারণ, সুস্পষ্ট বর্ণনা ছাড়াই শুধু ইঙ্গিত অথবা আল্লাহর সাহায্য দ্রুত আসার কামনা ছাড়াই আমরা নিকটতম সময় নির্ধারণ করেছি, অথচ আল্লাহর ওয়াদা অনির্ধারিত। এমন নৈরাশোর অবস্থায়) তাদের কাছে আমার সাহায্য আগমন করে (অর্থাৎ কাফিরদের উপর আযাব আসে)। অতঃপর (ঐ আযাব থেকে) আমি হাকে চেয়েছি, তাকে (অর্থাৎ মু'মিনদেরকে) বাঁচানো হয়েছে এবং (এ আযাব দ্বারা কাফিরদেরকে ধ্বংস করা হয়েছে। কারণ) আমার শাস্তি অপরাধী সম্প্রদায়কে রেহাই দেয় না (বরং তাদেরকে অবশ্যই পাকড়াও করে, যদিও দেহীতে করে থাকে। কাজেই মক্কার কাফিরদেরও ধোঁকায় পড়ে থাকা উচিত নয়)। তাদের (পূর্ববর্তী পয়গম্বর ও উম্মতদের) কাহিনীতে বুদ্ধিমানদের জন্য (বিরাত) শিক্ষা রয়েছে (অর্থাৎ যারা শিক্ষা অর্জন করে, তারা বুঝতে পারে যে, আনুগত্যের এই পরিমাণ আর অবাধ্যতার এই পরিমাণ)। এ কোরআন (যাতে এসব কাহিনী রয়েছে) কোন মনগড়া কথা নয় (যে, এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা যাবে না), বরং এটি পূর্বে অবতীর্ণ আসমানী গ্রন্থসমূহের সমর্থক এবং প্রত্যেক (জরুরী) বিষয়ের বিবরণদাতা এবং ঈমানদারদের জন্য হিদায়ত ও রহমতের উপায়। (সুতরাং এমন গ্রন্থে শিক্ষা গ্রহণের যোগ্য বিষয়বস্তু থাকবে, সেগুলি দ্বারা শিক্ষা গ্রহণ করা অবশ্যই জরুরী।)

### আনুশঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে পয়গম্বর প্রেরণ ও সত্যের দাওয়াতের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল এবং পয়গম্বরদের সম্পর্কে কোন কোন সন্দেহের জওয়াব দেওয়া হয়েছিল। উল্লিখিত আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে হু'শিয়ার করা হয়েছে যে, তারা পয়গম্বরদের বিরুদ্ধাচরণের অন্তত পরিণতির প্রতি লক্ষ্য করে না। যদি তারা সামান্যও চিন্তা করত এবং পারিপার্শ্বিক শহর ও স্থানসমূহের ইতিহাস পাঠ করত, তবে নিশ্চয়ই জানতে পারত যে, পয়গম্বরগণের বিরুদ্ধাচরণকারীরা এ দুনিয়াতে কিরূপ ভয়ানক পরিণতির সম্মুখীন

হয়েছে। কওমে-লুতের জনপদসমূহ উল্টে দেওয়া হয়েছে। কওমে-আ'দ ও কওমে-সামুদকে নানাবিধ আযাব দ্বারা নাস্তানাবুদ করে দেওয়া হয়েছে। পরকালের আযাব আরও কঠোরতর হবে।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, দুনিয়ার সুখ-দুঃখ সর্বাবস্থায়ই ক্ষণস্থায়ী। আসল চিন্তা পরকালের হওয়া উচিত। সেখানকার অবস্থান চিরস্থায়ী এবং সুখ-দুঃখও চিরস্থায়ী। আরও বলা হয়েছে যে, পরকালের সুখ-শান্তি তাকওয়ার উপর নির্ভরশীল। তাকওয়ার অর্থ শরীয়তের যাবতীয় বিধি-বিধান পালন করা।

এ আয়াতের লক্ষ্য হচ্ছে পূর্ববর্তী পয়গম্বর ও তাঁদের উশ্মতের অবস্থা দ্বারা বর্তমান নোকাদেরকে সতর্ক করা। তাই পরবর্তী আয়াতে তাদের একটি সন্দেহ দূর করা হয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মুখে আল্লাহর আযাব থেকে ভয় প্রদর্শনের কথা অনেক লোক দীর্ঘ দিন থেকে শুনে আসছিল, কিন্তু তারা কোন আযাব আসতে দেখত না। এতে তাদের দুঃসাহস আরও বেড়ে যায়। তারা বলতে থাকে যে, আযাব যদি আসবারই হত, তবে এতদিনে কবেই এসে যেত। তাই বলা হয়েছে : আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় করুণা ও রহস্যবশত অনেক সময় অপরাধী সম্প্রদায়কে অবকাশ দান করেন। এ অবকাশ মাঝে মাঝে এত দীর্ঘতর হয় যে, অবাধ্যদের দুঃসাহস আরও বেড়ে যায় এবং পয়গম্বরগণ এক প্রকার অস্থির-তার সম্মুখীন হন। ইরশাদ হয়েছে :

حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْدَسَ الرُّسُلَ وَظَنُّوْا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا  
فَنَجَّىٰ مَن نَّشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا مِنَ الْقَوْمِ الْمَاجِرِينَ ۝

অর্থাৎ পূর্ববর্তী উশ্মতদের অবাধ্যদেরকে লক্ষ্য লক্ষ্য অবকাশ দেওয়া হয়েছে। এমনকি দীর্ঘদিন পর্যন্ত তাদের উপর আযাব না আসার কারণে পয়গম্বরগণ এরূপ ধারণা করে নিরাশ হয়ে পড়েছেন যে, আল্লাহ্ প্রদত্ত আযাবের সংক্ষিপ্ত ওয়াদার যে অবকাশ আমরা নিজেদের অনুমানের ভিত্তিতে স্থির করে রেখেছিলাম, সে সময়ে কাফিরদের উপর আযাব আসবে না এবং সত্যের বিজয় প্রকাশ পাবে না। পয়গম্বরগণ প্রবল ধারণা পোষণ করতে থাকেন, অনুমানের মাধ্যমে আল্লাহর ওয়াদার সময় নির্ধারণ করার ব্যাপারে আমাদের বোধশক্তি ভুল করেছে। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা তো কোন নির্দিষ্ট সময় বলেন নি। আমরা বিশেষ বিশেষ ইঙ্গিতের মাধ্যমেই একটি সময় নির্দিষ্ট করে নিয়েছিলাম। এমনকি নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতিতে তাঁদের কাছে আমার সাহায্য এসে যায়, অর্থাৎ ওয়াদা অনুযায়ী কাফিরদের উপর আযাব এসে যায়। অতঃপর এ আযাব থেকে আমি যাকে ইচ্ছা করেছি, বাঁচিয়ে নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ পয়গম্বরগণের অনুসারী মু'মিনদেরকে বাঁচানো হয়েছে এবং কাফিরদেরকে ধ্বংস করা হয়েছে। কেননা, আমার শক্তি অপরাধী সম্প্রদায় থেকে অপসৃত করা হয় না, বরং আযাব অবশ্যই তাদেরকে পাকড়াও করে। কাজেই আযাবে বিলম্ব দেখে মক্কার কাফিরদের ধোঁকায় পতিত হওয়া উচিত নয়।

এ আয়াতে **كَذِبُوا** শব্দটি প্রসিদ্ধ কিরাআত অনুযায়ী পাঠ করা হয়েছে। আমরা

এর যে তফসীর বর্ণনা করেছি, এটাই অধিকতর স্বীকৃত ও স্বচ্ছ। অর্থাৎ, **كَذِبُوا** শব্দের সার্বমর্ম হচ্ছে অনুমান ও ধারণা ভ্রান্ত হওয়া। এটা এক প্রকার ইজতেহাদী ভ্রান্তি। পয়গম্বর-গণের দ্বারা এরূপ ইজতেহাদী ভ্রান্তি সম্ভবপর। তবে পয়গম্বর ও অন্যান্য মুজতাহিদদের মধ্যে পার্থক্য এই যে, পয়গম্বরগণের ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময়ব্যাপী এরূপ ভুল ধারণার উপর স্থির থাকার সুযোগ দেওয়া হতো না, বরং তাদেরকে বাস্তব বিষয় জ্ঞাত করে প্রকৃত সত্য ফুটিয়ে তোলা হতো। অন্য মুজতাহিদদের জন্য এরূপ মর্যাদা নেই। হদায়বিয়ার সন্ধির ব্যাপারে রসুলুল্লাহ (সা)-র ঘটনা এ বিষয়বস্তুর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কোরআন পাকে উল্লিখিত আছে যে, এ ঘটনার ভিত্তি হচ্ছে রসুলুল্লাহ (সা)-র একটি স্বপ্ন। তিনি স্বপ্ন দেখেন যে, তিনি সাহাবীগণ সমভি-বাহারে খানায় কা'বার তওয়াফ করছেন। পয়গম্বরগণের স্বপ্ন ওহীর পর্যায়ভুক্ত। তাই এ ঘটনাটি যে ঘটবে, তা নিশ্চিত ছিল। কিন্তু স্বপ্নে এর কোন বিশেষ সময় বর্ণিত না হওয়ায় রসুলুল্লাহ (সা) নিজে অনুমান করে নিলেন যে, এ বছরই এরূপ হবে। তাই যথারীতি ঘোষণার মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক সাহাবী সঙ্গে নিয়ে তিনি ওমরার উদ্দেশে মক্কা রওয়ানা হয়ে গেলেন। কুরাইশরা বাধা দিল। ফলে সে বছর তওয়াফ ও ওমরা সম্পন্ন হল না। বরং দু'বছর পর অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের আফারে স্বপ্নটি পূর্ণাঙ্গ বাস্তবরূপে প্রকাশ পেল। এ ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে, রসুলুল্লাহ (সা) যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, তা সত্য ও নিশ্চিত ছিল। কিন্তু তিনি অনুমান বা ইঙ্গিতের মাধ্যমে এর যে সময় নির্ধারিত করেছিলেন, তাতে ভুল হয়েছিল। কিন্তু এ ভুল তখনই দূর করে দেওয়া হয়।

এমনিভাবে আয়াতে **كَذِبُوا** শব্দের মর্মও তাই যে, কাফিরদের উপর আযাব

আসতে বিলম্ব হয়েছিল এবং পয়গম্বরগণ অনুমানের মাধ্যমে যে সময় মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলেন সে সময়ে আযাব আসেনি। ফলে তাঁরা ধারণা করেন যে, আমরা সময় নির্দিষ্ট করার ব্যাপারে ভুল করেছি। এই তফসীরটি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে। আল্লামা তীবী বলেন : এই রেওয়াজেত নিতুল। কারণ, সহীহ বুখারীতে তা বর্ণিত আছে।

কোন কোন কিরাআতে এ শব্দটি যাল-এর তশদীদসহ **قَدْ كَذَّبُوا** ও পঠিত

হয়েছে। **قَدْ كَذَّبُوا** ক্রিয়াপদটি **كَمْ يَسِبُ** ধাতু থেকে উদ্ভূত। এমতাবস্থায় অর্থ হবে, পয়-

গম্বরদের অনুমিত সময়ে আযাব না আসার কারণে তাঁরা আশংকা করতে থাকেন যে, এখন যারা মুসলমান, তারাও বুঝি তাঁদের প্রতি মিথ্যারোপ করতে শুরু করে যে, তাঁরা যা কিছু



বলেছিলেন, তা পূর্ণ হল না। এহেন দুবিপাকের সময় আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ওয়াদা পূর্ণ করে দেখালেন। অবিশ্বাসীদের উপর আযাব এসে গেল এবং মুমিনদেরকে বাঁচিয়ে রাখা হল। ফলে পয়গম্বরগণের বিজয় সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়ে উঠলো।

لَقَدْ كَانَ نَفِيٍّ قَصَصَهُمْ مَهْرَةً لِّأُولَى الْأَلْبَابِ — অর্থাৎ পয়গম্বরগণের কাহিনীতে বুদ্ধিমানদের জন্য বিশেষ শিক্ষা রয়েছে।

এর অর্থ সব পয়গম্বরের কাহিনীতেও হতে পারে এবং বিশেষ করে ইউসুফ (আ)-এর কাহিনীতেও হতে পারে, যা এ সূরায় বর্ণিত হয়েছে। কেননা এ ঘটনায় পূর্ণরূপে প্রতিভাত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার অনুগত বান্দাদের কি কি ভাবে সাহায্য ও সমর্থন প্রদান করা হয় এবং কুপথেকে বের করে রাজসিংহাসনে এবং দুর্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে সুনামের উচ্চতম শিখরে কিভাবে পৌঁছে দেওয়া হয়! পক্ষান্তরে চক্রান্ত ও প্রতারণাকারীরা পরিণামে কিরূপ অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ করে!

مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ — অর্থাৎ এ

কাহিনী কোন মনগড়া কথা নয়, বরং পূর্বে অবতীর্ণ গ্রন্থসমূহের সমর্থনকারী। কেননা, তওরাত ও ইনজীলেও এ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। হযরত ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ্ বলেন : যতগুলো আসমানী গ্রন্থ ও সহীফা অবতীর্ণ হয়েছে, ইউসুফ (আ)-এর কাহিনী থেকে কোনটিই খালি নয়।—(মাযহারী)

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا كَلِمَٰتِي وَوَهَّدْتُ بُرُوجَهُ لِقَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ — অর্থাৎ এ কোরআন

সব বিষয়েরই বিস্তারিত বিবরণ। অর্থাৎ, কোরআন পাকে এমন প্রত্যেক বিষয়ের বিবরণ রয়েছে, যা, ধর্মীয় ক্ষেত্রে মানুষের জন্য জরুরী। ইবাদত, লেনদেন, চরিত্র, সামাজিকতা, রাষ্ট্র পরিচালনা, রাজনীতি ইত্যাদি মানবজীবনের প্রত্যেকটি বাস্তবিক ও সমষ্টিগত অবস্থার সাথে সম্পর্কযুক্ত বিধান ও নির্দেশ এতে রয়েছে। আরও বলা হয়েছে : এ কোরআন ঈমানদারদের জন্য হিদায়ত ও রহমত। এতে বিশেষ করে ঈমানদারদের কথা বলার কারণ এই যে, উপকারিতা ঈমানদারগণই পেতে পারেন। যদিও কাকিরদের জন্যও কোরআন রহমত ও হিদায়ত, কিন্তু তাদের কুকর্ম ও অবাধ্যতার কারণে এ রহমত ও হিদায়ত তাদের পক্ষে শক্তির কারণ হয়ে যায়।

শায়খ আবু মনসূর বলেন : সমগ্র সূরা ইউসুফ এবং এতে সম্মিলিত কাহিনী বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে রসূলুল্লাহ (স)-কে সান্ত্বনা প্রদান করা যে, স্বজাতির হাতে আপনি যেসব নির্ধাতন ভোগ করছেন, পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণও সেগুলো ভোগ করেছেন। কিন্তু পরিণামে আল্লাহ তা'আলা পয়গম্বরগণকেই বিজয়ী করেছেন। আপনার ব্যাপারটিও তদ্রূপই হবে।

# সূরা الرعد

## সূরা রাদ

মক্কায় অবতীর্ণ, ৪৩ আয়াত, ৬ রুকু

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْمَرَّةَ تِلْكَ آيَةُ الْكِتَابِ ۗ وَالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ

وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ

عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۗ

كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ

يَلْقَآءَ رَبِّكُمْ تَوْقِنُونَ ۝ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا

رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا ۗ وَمِنْ كُلِّ الشَّجَرِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ

يُغْشَى الْبَيْلَ النَّهَارَ وَإِن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝ وَفِي الْأَرْضِ

قِطْعٌ مَّتَّجِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزُرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنَوَانٌ وَغَيْرُ

صِنَوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدَةٍ وَنُفِضِلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي

الْأَكْلِ ۗ وَإِن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝

পন্নয় করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

- (১) আলিফ-লাম-মীম-রা; এগুলো কিতাবের আয়াত। যা কিছু আপনার পালন-কর্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে তা সত্য। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এতে বিশ্বাস করে না।
- (২) আল্লাহ, যিনি উর্ধ্বদেশে স্থাপন করেছেন আকাশমণ্ডলীকে স্তম্ভ বাতীত। তোমরা সেগুলো দেখ। অতঃপর তিনি আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন। এবং সূর্য ও চন্দ্রকে

কর্মে নিয়োজিত করেছেন। প্রত্যেকে নির্দিষ্ট সময়মতোবেক আবর্তন করে। তিনি সকল বিষয় পরিচালনা করেন, নিদর্শনসমূহ প্রকাশ করেন, যাতে তোমরা স্বীয় পালনকর্তার সাথে সাক্ষাত সময়ে নিশ্চিত বিশ্বাসী হও। (৩) তিনিই ভূমণ্ডলকে বিস্তৃত করেছেন এবং তাতে পাহাড়-পর্বত ও নদ-নদী সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেক ফলের মধ্যে দু' দু' প্রকার সৃষ্টি রেখেছেন। তিনি দিনকে রাত্রি দ্বারা আবৃত করেন। এতে তাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে, যারা চিন্তা করে। (৪) এবং স্বামীনে বিভিন্ন শস্যক্ষেত্র রয়েছে—একটি অপরটির সাথে সংলগ্ন এবং আলুরের বাগান আছে আর শস্য ও খজুর রয়েছে—একটির মূল অপরটির সাথে মিলিত এবং কতক মিলিত নয়। এগুলোকে একই পানি দেওয়া হয়। আমি স্বাদে একটিকে অপরটির চাইতে শ্রেষ্ঠত্ব দেই। এগুলোর মধ্যে তাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে, যারা চিন্তাভাবনা করে।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আলিফ-লাম-মীম-রা—(এর অর্থ আল্লাহ তা'আলাই জানেন)। এগুলো (অর্থাৎ যেগুলো আপনি শুনেছেন) আয়াত এক মহা-গ্রন্থের (অর্থাৎ কোরআনের)। এবং যা কিছু আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে অবতরণ করা হয়, তা সম্পূর্ণ সত্য (এবং তা বিশ্বাস করা সবার উচিত ছিল) কিন্তু অধিকাংশ লোক বিশ্বাস করে না। (এ পর্যন্ত কোরআনের স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর তওহীদের বিষয়বস্তু বর্ণিত হচ্ছে, যাকোরআনের প্রধান লক্ষ্য।) আল্লাহ এমন (শক্তিশালী) যে তিনি আকাশসমূহকে খুঁটি ব্যতীতই উর্ধ্বদেশে উন্নীত করে দিয়েছেন। তোমরা এগুলোকে (অর্থাৎ আকাশসমূহকে এমনভাবে) দেখছ। অতঃপর (স্বীয় সিংহাসনে) আরশের উপর (এমনভাবে) অধিষ্ঠিত (ও বিরাজমান) হয়েছেন (যা তাঁর অবস্থার পক্ষে উপযুক্ত)। এবং সূর্য ও চন্দ্রকে কাজে নিয়োজিত করেছেন। (এতদুভয়ের মধ্যে) প্রত্যেকটি (নিজ নিজ কক্ষপথে) নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চলমান হয়। তিনিই (আল্লাহ) প্রত্যেক কাজ (যা কিছু ঘটে) পরিচালনা করেন, (এবং সৃষ্টিগত ও আইনগত) প্রমাণাদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করেন—যাতে তোমরা আল্লাহর সাথে সাক্ষাতে (অর্থাৎ কিয়ামতে) বিশ্বাসী হও। (এর সম্ভাব্যতার বিশ্বাস এভাবে যে, আল্লাহ যখন এমন বিরাট বিরাট বস্তু সৃষ্টি করতে সক্ষম, তখন মৃতকে জীবিত করতে কেন সক্ষম হবেন না? বাস্তবতার বিশ্বাস এভাবে যে, সত্যবাদী সংবাদদাতা একটি সম্ভাব্য বিষয়ের বাস্তবতা সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন! অবশ্যই তা সত্য ও নিষ্ঠুর।) এবং তিনিই ভূমণ্ডলকে বিস্তৃত করেছেন এবং এতে (ভূমণ্ডলে) পাহাড় ও নদ-নদী সৃষ্টি করেছেন এবং এতে সব রকম ফলের মধ্যে দু' দু' প্রকার পয়দা করেছেন। উদাহরণত টক ও মিষ্ট অথবা ছোট ও বড়। কোনটির এক রঙ ও কোনটি ভিন্ন রঙ! এবং রাত্রি দ্বারা (অর্থাৎ রাত্রির আঁধার দ্বারা) দিন (এর উজ্জ্বলতা) কে আচ্ছন্ন করে দেন। (অর্থাৎ রাতের আঁধারের কারণে দিনের আলো আচ্ছাদিত ও দূর হয়ে যায়। উল্লিখিত) এসব বিষয়ের মধ্যে চিন্তাশীলদের (খোবার) জন্য (তওহীদের) প্রমাণাদি (বিদ্যমান) রয়েছে। (এর বিস্তারিত বর্ণনা দ্বিতীয় পারায়

চতুর্থ রুকূর শুরুতে দ্রষ্টব্য।) এবং (এমনভাবে তওহীদের আন্নও প্রমাণাদি আছে। সমতে) যমীনে পাশাপাশি (এবং এতদসঙ্গেও) বিভিন্ন খণ্ড রয়েছে (এগুলোর সংলগ্ন হওয়া সঙ্গেও ভিন্ন ভিন্ন প্রতিক্রিয়া বিশিষ্ট হওয়া বিস্ময়কর ব্যাপার বটে)। আর আসূরের বাগান আছে এবং (বিভিন্ন) শস্যক্ষেত্র রয়েছে এবং খজুর--(রুক) আছে! এগুলোর মধ্যে কতক এমন যে, একটি কাণ্ড উপরে পৌঁছে দু'কাণ্ড হয়ে যায় এবং কতকের মধ্যে দু'কাণ্ড হয় না; (বরং মূল থেকে ডালা পর্যন্ত এক কাণ্ডই উঠে যায় এবং) সবগুলোকে একই পানি সিঞ্চন করা হয়। (এতদসঙ্গেও) আগি এক প্রকার ফলকে অন্য প্রকার ফলের উপর প্রেরিত্ব দেই। এসব (উল্লিখিত) বিষয়ের মধ্যে (ও) বুদ্ধিমানদের (স্বোবার) জন্য (তওহীদের) প্রমাণাদি (বিদ্যমান) আছে।

### আনুশঙ্গিক জাতব্য বিষয়

আলোচ্য সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ। এতে সর্বমোট ৪৩টি আয়াত রয়েছে। এ সূরায়ও কোরআন পাকের সত্যতা, তওহীদ ও রিসালাতের বর্ণনা এবং বিভিন্ন সন্দেহের উত্তর উল্লিখিত হয়েছে।

۱ - ۲ - ۳ - ۴ - ۵ - ۶ - ۷ - ۸ - ۹ - ۱۰ - ۱۱ - ۱۲ - ۱۳ - ۱۴ - ۱۵ - ۱۶ - ۱۷ - ۱۸ - ۱۹ - ۲۰ - ۲۱ - ۲۲ - ۲۳ - ۲۴ - ۲۵ - ۲۶ - ۲۷ - ۲۸ - ۲۹ - ۳০ - ৩১ - ৩২ - ৩৩ - ৩৪ - ৩৫ - ৩৬ - ৩৭ - ৩৮ - ৩৯ - ৪০ - ৪১ - ৪২ - ৪৩

এগুলো খণ্ড বর্ণ। এসবের অর্থ আল্লাহ তা'আলাই জানেন।

উল্লেখ্যতক্কে এর অর্থ বলা হয়নি। সর্বসাধারণের পক্ষে এর পেছনে পড়াও সমীচীন নয়।

হাদীসও কোরআনের মত আল্লাহর ওহী : প্রথম আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, কোরআন পাক আল্লাহর কালাম এবং সত্য। কিতাব অর্থ কোরআনকেই বোঝানো

হয়েছে এবং **وَالَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ** বসেও কোরআন বোঝান যেতে

পারে। কিন্তু **طَف**-এবং **وَأُو** অক্ষরটি বাহাত বোঝায় যে, কিতাব এবং **الَّذِي أَنْزَلَ**

**الَّذِي**—এটি পৃথক পৃথক বস্তু। এমতাবস্থায় কিতাবের অর্থ কোরআন এবং **إِلَيْكَ**

**إِنْزَالِ إِلَيْكَ**—এর অর্থ ঐ ওহী হবে, যা কোরআন ছাড়া রসূলুল্লাহ (সা)-র কাছে

এসেছে। কেননা এ বিষয়ে কোন দ্বিমত থাকতে পারে না যে, রসূলুল্লাহ (সা)-র কাছে যে ওহী আসত, তা শুধু কোরআনেই সীমাবদ্ধ নয়। স্বয়ং কোরআনে বলা হয়েছে :

**وَمَا يَنْطِقُ مِنَ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ**—অর্থাৎ রসূলুল্লাহ (সা) নিজের

খেয়াল খুশি আনুযায়ী কোন কিছু বলেন না; বরং তাঁর উক্তি একটি ওহী, যা আল্লাহর

পক্ষ থেকে তাঁর কাছে প্রেরিত হয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) কোরআন ছাড়া অন্য যেসব বিধি-বিধান দিয়েছেন, সেগুলোও আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। পার্থক্য এতটুকু যে, কোরআনের তিলাওয়াত করা হয় এবং সেগুলোর তিলাওয়াত হয় না। এ পার্থক্যের কারণ এই যে, কোরআনের অর্থ ও শব্দ উভয়টি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এবং কোরআন ছাড়া হাদীসে যে সব বিধি-বিধান রয়েছে, সেগুলোরও অর্থ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ; কিন্তু শব্দ অবতীর্ণ নয়। এ জন্যই নামাযে এগুলোর তিলাওয়াত হয় না।

অতএব আয়াতের অর্থ এই যে, এই কোরআন এবং যেসব বিধি-বিধান আগনার প্রতি অবতীর্ণ হয়, সেগুলো সব সত্য এবং সন্দেহের অবকাশমুক্ত কিন্তু অধিকাংশ লোক চিন্তাভাবনা করার কারণে তা বিশ্বাস করে না।

দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্ব ও তওহীদের প্রমাণাদি বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ তাঁর সৃষ্টি ও কারিগরির প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বিশ্বাস করতে হবে যে, এগুলোর এমন একজন স্রষ্টা আছেন যিনি সর্বশক্তিমান এবং সমগ্র সৃষ্টিজগত যাঁর মুঠোর মধ্যে।

অর্থাৎ— **اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا** ; বলা হয়েছে :

আল্লাহ্ এমন, যিনি আকাশসমূহকে সুবিন্দুত ও বিশাল গম্বুজাকার খুঁটি ব্যতীত উল্টে উন্নীত করেছেন যেমন তোমরা আকাশসমূহকে এ অবস্থাই দেখ।

আকাশের দেহ দৃষ্টিগোচর হয় কি? সাধারণত বলা হয় যে, আমাদের মাথার উপরে যে নীল রঙ দৃষ্টিগোচর হয় তা আকাশের রঙ। কিন্তু বিজ্ঞানীরা বলেন : আলো ও অন্ধকারের সংমিশ্রণে এই রঙ অনুভূত হয়। নিচে তারকারাজীর আলো এবং এর উপরে অন্ধকার। উভয়ের সংমিশ্রণে বাইরে থেকে নীল রঙ অনুভূত হয়; যেমন গভীর পানিতে আলো বিচ্ছুরিত হলে তা নীল দেখা যায়। কোরআন পাকের কতিপয় আয়াতে

আকাশ দৃষ্টিগোচর হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে; যেমন এ আয়াতে **تَرَوْنَهَا** বলা

হয়ছে এবং অন্য এক আয়াতে **إِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ** বলা হয়েছে।

বিজ্ঞানীর বক্তব্য প্রথমত এর পরিপন্থী নয়। কেননা এটা সম্ভব যে, আকাশের রঙও নীলাভ হবে অথবা অন্য কোন রঙ হবে; কিন্তু মধ্যস্থলে আলো ও অন্ধকারের মিশ্রণের ফলে নীল দৃষ্টিগোচর হবে। শূন্যের রঙের মধ্যে যে আকাশের রঙও শামিল রয়েছে, এ কথা অস্বীকার করার কোন প্রমাণ নেই। দ্বিতীয়ত কোরআন পাকে যেখানে আকাশ দৃষ্টিগোচর হওয়ার কথা বলা হয়েছে, সেখানে অ-প্রাকৃত দেখাও অর্থ হতে পারে। অর্থাৎ আকাশের অস্তিত্ব নিশ্চিত যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত। ফলে তা সেন চাক্ষুস দেখার মতই।

এরপর বলা হয়েছে : **ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ** — অর্থাৎ অতঃপর আরশের

উপর প্রতিষ্ঠিত ও বিরাজমান হলেন, যা সিংহাসনের অনুরূপ। এ বিরাজমান হওয়ার স্বরূপ কারও বোধগম্য নয়। এতটুকু বিশ্বাস রাখা যথেষ্ট যে, যেরূপ বিরাজমান হওয়া তাঁর পক্ষে উপযুক্ত, সেইরূপেই বিরাজমান রয়েছেন।

**وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلَّ يَوْمٍ لِّاجَلٍ مُّسَمًّى** — অর্থাৎ আল্লাহ্

তা'আলা সূর্য ও চন্দ্রকে আজ্ঞাধীন করেছেন। প্রত্যেকটিই একটি নির্দিষ্ট গতিতে চলে।

আজ্ঞাধীন করার অর্থ এই যে, উভয়কে যে যে কাজে নিয়োজিত করেছেন, তারা অহনিশ তা করে যাচ্ছে। হাজারো বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে; কিন্তু কোন সময় তাদের গতি তুল পল্লিমাণ কম-বেশি হয়নি। তারা লগ্নত হয় না এবং কোন সময় নিজের নির্দিষ্ট কাজ ছেড়ে অন্য কাজে লিপ্ত হয় না। নির্দিষ্ট সময়ের দিকে ধাবিত হওয়ার এ অর্থও হতে পারে যে, তারা সমগ্র বিশ্বের জন্য নির্ধারিত সময় অর্থাৎ কিয়ামতের দিকে ধাবিত হচ্ছে। এ গন্তব্যস্থলে পৌঁছার পর তাদের গোটা ব্যবস্থাপনা তখনই হয়ে যাবে।

আরেকটি সম্ভাব্য অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক গ্রহের জন্য একটি বিশেষ গতি ও বিশেষ কক্ষপথ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তারা সবসময় নিজ নিজ কক্ষপথে নির্ধারিত গতিতে চলমান থাকে।

এ সব গ্রহের এক-একটির আয়তন পৃথিবীর চাইতে বহুগুণ বড়। এগুলো বিশেষ কক্ষপথে বিশেষ গতিতে হাজারো বছর যাবত একই ভঙ্গিতে চলমান রয়েছে। এদের কক্ষকাজী কখনও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না, ভাঙ্গে না এবং মেরামতেরও প্রয়োজন দেখা দেয় না। বিজ্ঞানের বর্তমান চূড়ান্ত উন্নতির পরও মানব নির্মিত বস্তুসমূহের মধ্যে এদের পূর্ণ নজির দুর্ব্বের কথা, হাজার ভাগের এক ভাগ পাওয়াও অসম্ভব। প্রকৃতির এই ব্যবস্থাপনা উচ্চৈঃ-স্বরে ডেকে বলাচ্ছে যে, এর পেছনে এমন একজন শ্রুট্টা ও পরিচালক রয়েছেন, যিনি মানুষের অনুভূতি ও চেতনার বহু উর্ধ্বে।

প্রত্যেক কাজের পরিচালক প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলা; মানবীয় পরিচালনা নামে-

মাত্র : **يُدِيرُ الْأُمُورَ** — অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক কাজ পরিচালনা করেন।

সাধারণত মানুষ নিজের কলাকৌশলের জন্য গর্ববোধ করে; কিন্তু একটু চোখ খুলে দেখলেই বোঝা যাবে যে, তার কলাকৌশল কোন বস্তু সৃষ্টি করতে পারে না। আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টিত বস্তুসমূহের নিতু'ন ব্যবহার বুঝে নেওয়াই তার কলাকৌশলের শেষ গন্তব্য। জাগতিক বস্তুসামগ্রী ব্যবহার করার যে ব্যবস্থা, তাও মানুষের সামর্থ্যের বাইরে। কেননা, মানুষ প্রত্যেক কাজে অন্য হাজারো মানুষ জানোয়ার ও অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর মুখাপেক্ষী, যেগুলোকে সে নিজ কলাকৌশলের মাধ্যমে নিজের কাজে নিয়োজিত করতে পারে না।

আল্লাহর শক্তিই প্রত্যেক বস্তুকে অন্য বস্তুর সাথে এমনভাবে জুড়ে দিয়েছে যে, আপনা-আপনি এসে জড়ো হয়। আপনার গৃহ নির্মাণের প্রয়োজন হলে স্থপতি থেকে শুরু করে রঙ পালিশকারী সাধারণ কর্মী পর্যন্ত শত শত মানুষ নিজেদের শারীরিক সামর্থ্য ও কালিগরী বিদ্যা নিয়ে আপনার সেবা করতে প্রস্তুত দেখা যাবে। বহু দোকানে বিক্ষিপ্ত নির্মাণ-সামগ্রী আপনি নিজ প্রয়োজনে প্রস্তুত পাবেন। কিন্তু নিজস্ব অর্থ অথবা কলাকৌশলের জোরে এসব বস্তুর মূল উপাদান সৃষ্টি করতে এবং সব মানুষকে স্ব স্ব ক্ষেত্রে দক্ষ ও কালিগরী প্রতিভা সম্পন্ন করে গড়ে তুলতে আপনি সক্ষম হবেন কি? আপনি কেন, কোন বৃহত্তর সরকারও আইনের জোরে এ ব্যবস্থা কায়ম করতে পারেন না। নিঃসন্দেহে স্ব স্ব ক্ষেত্রে দক্ষতা প্রদান এবং তদ্বারা বিশ্বব্যবস্থার নিখুঁত পরিচালনা একমাত্র চিরঞ্জীব ও মহা ব্যবস্থাপক আল্লাহরই কাজ। মানুষ একে নিজের কলাকৌশল মনে করলে তা মূর্খতা বৈ আর কিছু হবে না।

يُغْمَلُ الْآيَاتِ — অর্থাৎ তিনি আয়াতসমূহকে তন্ন তন্ন করে বর্ণনা করেন।

এর অর্থ কোরআনের আয়াতসমূহ হতে পারে। আল্লাহ তা'আলা এগুলো নাখিল করেছেন। অতঃপর রসুলুল্লাহ (সা)-র মাধ্যমে তা বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করেছেন।

অথবা আলোচ্য আয়াতের অর্থ আল্লাহ তা'আলার অপার শক্তির নিদর্শনাবলীও হতে পারে। অর্থাৎ আসমান, যমীন ও স্বয়ং মানুষের অস্তিত্ব, এগুলো বিস্তারিতভাবে সর্বদা ও সর্বত্র মানুষের দৃষ্টির সামনে বিদ্যমান রয়েছে।

لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُؤْتُونَ — অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টিজগৎ ও তার বিস্ময়কর

পরিচালন-ব্যবস্থা আল্লাহ তা'আলা এজন্য কায়ম করেছেন, যাতে তোমরা চিন্তাভাবনা করে পরকালে ও কিয়ামতে বিশ্বাসী হও। কেননা, এ বিস্ময়কর ব্যবস্থা ও সৃষ্টির প্রতি লক্ষ্য করার পর পরকালে মানুষকে পুনর্বীর সৃষ্টি করাকে আল্লাহর শক্তি বহির্ভূত মনে করা সম্ভবপর হবে না। যখন শক্তির অন্তর্ভুক্ত ও সম্ভবপর বোঝা যাবে, তখন দেখতে হবে যে, এ সংবাদ এমন একজন ব্যক্তি দিয়েছেন, যিনি জীবনে কোন দিন মিথ্যা বলেন নি। কাজেই তা বাস্তবতাসম্পন্ন ও প্রমাণিত হওয়ার ব্যাপারে কোনরূপ সন্দেহ থাকতে পারে না।

وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا — তিনিই

ভূমণ্ডলকে বিস্তৃত করেছেন এবং তাতে ভারী পাহাড়-পর্বত ও নদ-নদী সৃষ্টি করেছেন।

ভূমণ্ডলের বিস্তৃতি তার গোলাকৃতির পরিপন্থী নয়। কেননা, গোলাকার বস্তু যদি অনেক বড় হয়, তবে তার প্রত্যেকটি অংশ একটি বিস্তৃত পৃষ্ঠের মতই দৃষ্টিগোচর হয়। কোরআন পাক সাধারণ মানুষকে তাদের দৃষ্টিকোণে সন্ধান করে। বাহ্যদর্শী ব্যক্তি পৃথিবীকে একটি বিস্তৃত পৃষ্ঠরূপে দেখে। তাই একে বিস্তৃত করা শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। এরপর পৃথিবীর ভারসাম্য বজায় রাখা ও অন্যান্য অনেক উপকারিতার জন্য

এর উপর সুউচ্চ ও ভারী পাহাড় প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। এসব পাহাড় একদিকে ভূ-পৃষ্ঠের ভারসাম্য বজায় রাখে এবং অন্যদিকে সমগ্র সৃষ্টজীবকে পানি পৌঁছাবার ব্যবস্থা করে। পানির বিরাট ভাণ্ডার পাহাড়ের শৃঙ্গে বরফ আকারে সঞ্চিত রাখা হয়। এর জন্য কোন চৌবাচ্চা নেই। এবং তা তৈরী করারও প্রয়োজন নেই। অপবিত্র বা দূষিত হওয়ারও কোন সম্ভাবনা নেই। অতঃপর একে একটি ভূগর্ভস্থ প্রাকৃতিক ফল্গুধারার সাহায্যে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এ ফল্গুধারা থেকেই কোথাও প্রকাশ্য নদ-নদী ও খাল-বিল নির্গত হয় এবং কোথাও ভূগর্ভেই লুকিয়ে থাকে। অতঃপর কৃপের মাধ্যমে এ ফল্গুধারার সজ্ঞান করে তা থেকে পানি উত্তোলন করা হয়।

وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ—অর্থাৎ এ ভূ-পৃষ্ঠ থেকে

নানাবিধ ফল উৎপন্ন করছেন এবং প্রত্যেক ফলের দু'দু' প্রকার সৃষ্টি করছেন : মাল, সাদা, টক-মিষ্টি। زَوْجَيْنِ—এর অর্থ দু' না হয়ে একাধিক প্রকারও হতে পারে,

যেগুলোর সংখ্যা কমপক্ষে দুই হবে। তাই বিষয়টা اِثْنَيْنِ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত

করা হয়েছে। زَوْجَيْنِ—এর অর্থ নর ও মাদী হওয়াও অসম্ভব নয়। যেমন, অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, অনেক বৃক্ষ নর ও মাদী হয়। উদাহরণত খেজুর, পেঁপে ইত্যাদি। অন্যান্য বৃক্ষের মধ্যেও এরূপ সম্ভাবনা আছে; যদিও গবেষণা এখনো এতটা অগ্রসর হয়নি।

يَغْشَىٰ اللَّيْلَ النَّهَارَ—অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাই রাত্রি দ্বারা দিনকে ঢেকে

দেন। অর্থাৎ দিনের আলোর পর রাত্রি নিয়ে আসেন; যেমন কোন উজ্জ্বল বস্তুকে পর্দা দ্বারা আবৃত করে দেওয়া হয়।

أَنِّي فِي ذٰلِكَ لَا يَاتُ تَقْوِمٌ يَتَفَكَّرُونَ—নিঃসন্দেহে সমগ্র সৃষ্টি ও তার

পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে চিন্তাশীলদের জন্য আল্লাহ তা'আলার অপার শক্তির বহু নিদর্শন বিদ্যমান রয়েছে।

وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مَّتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزُرُوعٌ

وَفَيْحِيلٌ مِّثْوَانٌ وَغَيْرُ مِثْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُقُوعٌ بَعْضُهَا عَلَىٰ

بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ ०



অর্থাৎ অনেক ভূমি খণ্ড পরস্পর সংলগ্ন হওয়া সত্ত্বেও প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যে বিভিন্ন-  
রূপ। কোনটি উর্বর জমি ও কোনটি অনুর্বর, কোনটি নরম ও কোনটি শক্ত এবং কোনটি  
শস্যের উপযোগী এবং কোনটি বাগানের উপযোগী। এসব ভূখণ্ডে রয়েছে আঙ্গুরের বাগান,  
শস্য ক্ষেত্র এবং খেজুর বৃক্ষ; তন্মধ্যে কোন বৃক্ষ এমন যে এক কাণ্ড উপরে পৌঁছে দু'কাণ্ড  
হয়ে যায়; যেমন সাধারণ বৃক্ষ এবং কোনটিতে এক কাণ্ডই থাকে; যেমন খেজুর বৃক্ষ  
ইত্যাদি।

এসব ফল একই জমিতে উৎপন্ন হয় একই পানি দ্বারা সিক্ত হয় এবং চন্দ্র ও  
সূর্যের কিরণ ও বিভিন্ন প্রকার বাতাসও সবাই এক বৃক্ষম পায়; কিন্তু এ সত্ত্বেও এসবের  
রঙ ও স্বাদ বিভিন্ন এবং আকারের ছোট ও বড়।

সংলগ্ন হওয়া সত্ত্বেও নানা ধরনের বিভিন্নতা এ বিষয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণে, একই  
উৎস থেকে উৎপন্ন বিচিত্রধর্মী এসব ফল-ফসলের সৃষ্টি কোন একজন বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ  
সত্ত্বার আদেশের অধীনে চালু রয়েছে—শুধু বস্তুর রূপান্তরে নয়; যেমন এক শ্রেণীর অজ্ঞ  
লোক তাই মনে করে। কেননা, নিছক বস্তুর রূপান্তর হলে সব বস্তু অভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও  
এ বিভিন্নতা কিরূপে হত। একই জমি থেকে এক ফল এক ঋতুতে উৎপন্ন হয় এবং  
অন্য ফল অন্য ঋতুতে। একই বৃক্ষে একই ডালে বিভিন্ন প্রকার ছোট বড় এবং বিভিন্ন  
স্বাদের ফল ধরে।

إِن فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ—নিঃসন্দেহে এতে আল্লাহর শক্তি,

মাহাত্ম্য ও একত্বের অনেক নিদর্শন রয়েছে বুদ্ধিমানের জন্য। এতে ইঙ্গিত আছে যে, যারা  
এসব বিষয়ে চিন্তা করে না, তারা বুদ্ধিমান নয়—যদিও দুনিয়াতে তারা বুদ্ধিমান ও সমব-  
দার বলে কথিত হয়।

وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ إِذَا كُنَّا تَرَابًا إِنَّا لِفِي خَلْقٍ  
جَدِيدٍ ۖ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ  
ۖ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ  
بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَتُ ۖ وَإِنَّ  
رَبَّكَ لَذُو مَعْفَدَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ ۖ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ  
۝ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ ۖ

إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَبِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ۝ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَعْمَلُ كُلُّ  
أَنْتَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامَ وَمَا تَزْدَادُ مَوَاطِنَ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِإِقْدَارٍ ۝

(৫) যদি আপনি বিশ্বায়ের বিষয় চান, তবে তাদের একথা বিশ্বায়কর যে, আমরা যখন মৃত্তিকা হয়ে যাব, তখনও কি নতুনভাবে সৃজিত হব? এরাই স্বীয় পালনকর্তার সত্তার অবিশ্বাসী হয়ে গেছে, এদের গর্দানেই লৌহ-শুংখল পড়বে এবং এরাই দোষখী, এরা তাতে চিরকাল থাকবে। (৬) এরা আপনার কাছে মঙ্গলের পরিবর্তে দ্রুত অমঙ্গল কামনা করে। তাদের পূর্বে অনুরূপ অনেক শাস্তিপ্ৰাপ্ত জনগোষ্ঠী অতিক্রান্ত হয়েছে। আপনার পালনকর্তা মানুষকে তাদের অনায়্য সত্ত্বও ক্ষমা করেন এবং আপনার পালনকর্তা কঠিন শাস্তিদাতাও বাটেন। (৭) কাফিররা বলে : তাঁর প্রতি তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হল না কেন? আপনার কাজ তো জয় প্রদর্শন করাই এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য পথপ্রদর্শক হয়েছে। (৮) আল্লাহ্ জানেন প্রত্যেক নারী যা গর্ভধারণ করে এবং গর্ভাশয়ে যা সঙ্কুচিত ও বর্ধিত হয়। এবং তাঁর কাছে প্রত্যেক বস্তুরই একটা পরিমাণ রয়েছে।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং (হে মুহাম্মদ,) যদি আপনি ( তাদের কিয়ামত অস্বীকার করার কারণে ) আশ্চর্যান্বিত হন, তবে ( বাস্তবিকই ) তাদের এ উক্তি আশ্চর্যান্বিত হওয়ার যোগ্য যে, যখন আমরা ( মরে ) মৃত্তিকা হয়ে যাব, তখন ( মৃত্তিকা হয়ে ) আমরা আবার কি কিয়ামতে নতুনভাবে সৃজিত হব? ( আশ্চর্যান্বিত হওয়ার যোগ্য এ কারণে যে, যে সত্তা উপরোক্ত বস্তুসমূহ সৃষ্টি করতে প্রথমত সক্ষম, পুনর্বীর সৃষ্টি করা তাঁর পক্ষে কেন কঠিন হবে? এ থেকেই পুনরুত্থানকে অসম্ভব মনে করার জওয়াব হয়ে গেছে এবং নবুয়ত অস্বীকার করার জওয়াবও এতেই নিহিত রয়েছে। কেননা, পুনরুত্থানকে অসম্ভব মনে করার উপরই এটি ভিত্তিশীল। ফলে প্রথমটির জওয়াব দ্বারা দ্বিতীয়টির জওয়াব হয়ে গেছে। অতঃপর তাদের জন্য আমাদের সতর্কবাণী বর্ণিত হয়েছে যে) এরাই স্বীয় পালনকর্তার সাথে কুফরী করেছে। (কেননা পুনরুত্থানের অস্বীকৃতি দ্বারা পালনকর্তার শক্তি ও ক্ষমতা অস্বীকার করেছে এবং কিয়ামত অস্বীকার করা দ্বারা নবুয়ত অস্বীকার করা জরুরী হয়ে পড়ে।) এবং এদের গর্দানে (কিয়ামতে) শুংখল পরানো হবে এবং তারা দোষখী। তারা তাতে চিরকাল থাকবে। এরা বিপদ মুক্ততার (মেষাদ শেষ হওয়ার) পূর্বে আপনার কাছে বিপদের (অর্থাৎ বিপদ নাছিল হওয়ার) তাগাদা করে (যে, আপনি নবী হলে আম্রাব এনে দিন। এতে বোঝা যায় যে, তারা আযাবকে খুব আবাস্তর মনে করে) অথচ তাদের পূর্বে (অন্য কাফিরদের উপর) শাস্তির ঘটনাবলী ঘটেছে। (সুতরাং তাদের উপর শাস্তি এসে যাওয়া অসম্ভব কি?) এবং (আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়ালু—একথা শুনে তারা যেন ধোঁকায় না পড়ে যে তাহলে আমাদের আর কোন আযাব

হবে না। কেননা, তিনি শুধু ক্রমাশীল দয়ালুই নন এবং সবার জন্যই ক্রমাশীল দয়ালু নন; বরং উত্তম গুণ যথাস্থানে প্রকাশ পায়। অর্থাৎ) এটা নিশ্চিত যে, আপনার পালনকর্তা মানুষের অপরাধ তাদের (বিশেষ পর্যায়ের) অন্যায় সত্ত্বেও ক্ষমা করে দেন এবং এটাও নিশ্চিত যে, আপনার পালনকর্তা কঠোর শাস্তি দেন। (অর্থাৎ তাঁর মধ্যে উত্তম গুণ রয়েছে এবং প্রত্যেকটি প্রকাশ পাওয়ার শর্ত ও কারণ রয়েছে। অতএব, কাফিররা কারণ ছাড়াই নিজেদেরকে দয়া ও ক্ষমার যোগ্য কিরূপে মনে করে নিয়েছে; বরং কুফরীর কারণে তোমাদের পক্ষে আল্লাহ্ (তা'আলা কঠোর শাস্তিদাতা)। এবং কাফিররা (নবুয়ত অস্বীকার করার উদ্দেশ্যে) বলে : তাঁর প্রতি বিশেষ মু'জিযা (যা আমরা চাই) কেন নাযিল করা হল না? (তাদের এ আপত্তি নিরৈতি নিবৃদ্ধিতা ছাড়া আর কিছু নয়। কেননা, আপনি মু'জিযার মালিক নন, বরং) আপনি শুধু (আল্লাহ্র আযাব থেকে কাফিরদেরকে) ভীতি প্রদর্শনকারী (নবী। আর নবীর জন্য বিশেষ মু'জিযার প্রয়োজন নেই—যে কোন মু'জিযা হলেই চলে, যা প্রকাশিত হয়ে গেছে।) এবং (আপনি কোন একক নবী হন নি। বরং অতীতে) প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য পথ প্রদর্শক হয়েছে। (তাদের মধ্যেও এ রীতিই প্রচলিত ছিল যে, নবুয়ত দাবী করার জন্য যে কোন প্রমাণকে যথেষ্ট মনে করা হয়েছে—বিশেষ প্রমাণ জরুরী মনে করা হয়নি।) আল্লাহ্ তা'আলা জানেন যা কিছু নারী গর্ভে ধারণ করে এবং গর্ভাশয়ে যা সঙ্কোচন ও বর্ধন হয়। আল্লাহ্র কাছে প্রত্যেক বস্তু বিশেষ পরিমাণ নিয়ে আছে।

### আনুশঙ্গিক জাতব্য বিষয়

আলোচ্য প্রথম তিন আয়াতে কাফিরদের নবুয়ত সম্পর্কিত সন্দেহের জওয়াব রয়েছে এবং এর সাথে অবিশ্বাসীদের জন্য শাস্তির সতর্কবাণী বর্ণিত হয়েছে।

কাফিরদের সন্দেহ ছিল তিনটি। এক. তারা মৃত্যুর পর পুনর্জীবন এবং হাশরের হিসাব-কিতাবকে অসম্ভব ও যুক্তিবিরুদ্ধ মনে করত। এ কারণেই তারা পরকালের সংবাদদাতা পয়গম্বরগণকে অবিশ্বাসযোগ্য এবং তাঁদের নবুয়ত অস্বীকার করত। কোর-

আন পাকের এক আয়াতে তাদের এ সন্দেহ বর্ণনা করে বলা হয়েছে : **هَلْ نَدْرِكُهُمْ آلِي**

**وَجَلَّ يَنْبِغِكُمْ إِذَا مَرَّتْكُمْ ذُرِّيَّةٌ مِّنْ نَّسْرِكُمْ لَسْمِزِقَ أَلْنَمَ لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ** তারা এসব

কথা দ্বারা পয়গম্বরগণের প্রতি উপহাস করার জন্য বলত : এস, আমরা তোমাদেরকে এমন এক ব্যক্তির কথা বলি, যে বলে যে, তোমরা যখন মৃত্যুর পর খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যাবে এবং ধূলিকণা হয়ে দিগন্তে ছড়িয়ে পড়বে, তখন তোমাদেরকে আবার নতুনভাবে সৃষ্টি করা হবে।

মৃত্যুর পর পুনর্জীবনের প্রমাণ : আলোচ্য প্রথম আয়াতে তাদের এ সন্দেহের জওয়াব দেওয়া হয়েছে :

**وَأَن نَّعْجَبَ نَعْجَبٌ قَوْلُهُمْ ءَ إِذَا كُنَّا تُرَابًا ءَ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ**

এতে রসুলুল্লাহ (স)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে : আপনি আশ্চর্যান্বিত হবেন যে, কাফিররা আপনার সুস্পষ্ট মু'জিয়া এবং নবুয়তের প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী দেখা সত্ত্বেও আপনার নবুয়ত স্বীকার করে না। পক্ষান্তরে তারা নিষ্পাণ ও চেতনাহীন পাথরকে উপাসা মানে, যে পাথর নিজের উপকার ও ক্ষতি করতেও সক্ষম নয়, অপরের উপকার ও ক্ষতি কিরূপে করবে ?

কিন্তু এর চাইতে অধিক আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে তাদের এই উক্তি যে, আমরা মৃত্যুর পর স্বর্গে মাটি হয়ে যাব, তখন দ্বিতীয়বার আমাদেরকে কিরূপে সৃষ্টি করা হবে ? এটা কি সম্ভবপর ? কোরআন পাক এ আশ্চর্যের কারণ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেনি। কেমনা, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহর অপার শক্তির বিস্ময়কর বহিঃপ্রকাশ বর্ণনা করে প্রমাণিত করা হয়েছে যে, তিনি সর্বশক্তিমান। তিনি সমগ্র সৃষ্টজগতকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে এনেছেন, অতঃপর প্রত্যেক বস্তুর অস্তিত্বের মধ্যে এমন রহস্য নিহিত রেখেছেন, যা অনুভব করাও মানুষের সাধ্যাতীত। বলাবাহুল্য যে সত্তা প্রথমবার কোন বস্তুকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনতে পারেন তাঁর পক্ষে পুনর্বীর অস্তিত্বে আনা কিরূপে কঠিন হতে পারে ? কোন নতুন বস্তু তৈরী করা মানুষের পক্ষেও প্রথমবার কঠিন মনে হয়, কিন্তু পুনর্বীর তৈরী করতে চাইলে সহজ হয়ে যায়।

আশ্চর্যের বিষয়, কাফিররা এ কথা বিশ্বাস করে যে, প্রথমবার সমগ্র বিশ্বকে অসংখ্য হিকমতসহ আল্লাহ তা'আলাই সৃষ্টি করেছেন। এরপর পুনর্বীর সৃষ্টি করারূপে তারা কিরূপে অসম্ভব ও মুক্তিবিরুদ্ধ মনে করে ?

সম্ভবত অবিশ্বাসীদের কাছে বড় প্রশ্ন যে, মরে মাটি হয়ে যাওয়ার পর মানুষের অল-প্রত্যঙ্গ ধূলিকণার আকারে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে। বায়ু এসব ধূলিকণাকে কোথা থেকে কোথায় পৌঁছে দেয়। অতঃপর কিয়ামতের দিন এসব ধূলিকণাকে কিরূপে একত্রিত করা হবে, একত্রিত করে কিরূপে জীবিত করা হবে ?

কিন্তু তারা দেখে না যে, তাদের বর্তমান অস্তিত্বের মধ্যে সারা বিশ্বের কণা একত্রিত নয় কি ? বিশ্বের প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বস্তুসমূহ, পানি, বায়ু ও এদের আনীত কণা মানুষের খাদ্যের মধ্যে শামিল হয়ে তার দেহের অংশে পরিণত হয়। এ বেচারী অনেক সময় জানেও না যে, যে লোকমাটি সে মুখে পুরছে, তাতে কতগুলো কণা আফ্রিকার কতগুলো আমেরিকার এবং কতগুলো প্রাচ্য দেশসমূহের রয়েছে ? যে সত্তা অপারশক্তি ও কলা-কৌশলের মাধ্যমে সারা বিশ্বের বিক্ষিপ্ত কণাসমূহকে একত্রিত করে, এমন মানুষ ও জন্তুর অস্তিত্ব খাড়া করেছেন, আগামীকাল এসব কণা একত্রিত করা তাঁর পক্ষে কেন মুশকিল হবে ? অথচ বিশ্বের সমস্ত শক্তি—পানি, বায়ু ইত্যাদি তাঁর আজাবহ। তাঁর ইঞ্জিতে বায়ু তার ভিতরকার, পানি তার ভিতরকার এবং শূন্য তার ভিতরকার সব কণা যদি একত্রিত করে দেয়, তবে তা অবিশ্বাস হবে কেন ?

সত্যি বলতে কি, কাফিররা আল্লাহ তা'আলার শক্তি ও মহিমাকে চিনতেই পারেনি। তারা নিজদের শক্তির নিরিখে আল্লাহর শক্তিকে বোঝে। অথচ নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এত-দূরের মধ্যবর্তী সব বস্তু আপন মর্য়াদা সম্পর্কে সম্যক সচেতন এবং আল্লাহ তা'আলার আজ্ঞাধীন।

## خَاكٍ وَبَادٍ وَأَبٍ وَأُمَّسْ زَنْدَةً أَنْد بِأَمْنٍ وَتَوْمَرِدَةً بِأَحْسَنِ زَنْدَةً أَنْد

মোটকথা, সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী দেখা সত্ত্বেও কাফিরদের পক্ষে নব্বয়ত অস্বীকার করা যেমন আশ্চর্যের বিষয়, তার চাইতেও অধিক আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে কিয়ামতে পুনর্জীবন ও হাশমের দিন অস্বীকার করা।

এরপর অবিখ্যাসীদের শাস্তি উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, এরা শুধু আপনাকেই অস্বীকার করে না; বরং প্রকৃতপক্ষে পালনকর্তাকে অস্বীকার করে। তাদের শাস্তি এই যে, তাদের গর্দানে লৌহশুখল পরানো হবে এবং তারা চিরকাল দোখাখে বাস করবে।

কাফিরদের দ্বিতীয় সন্দেহ ছিল এই: যদি বাস্তবিকই আপনি আল্লাহর রসূল হয়ে থাকেন, তবে রসূলের বিরুদ্ধাচরণের কারণে আপনি যেসব শাস্তির কথা শুনান, সেগুলো আসে না কেন? দ্বিতীয় আয়াতে এর জওয়াব দেওয়া হয়েছে:

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلِ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قِبَالِهِمُ الْمَثَلَاتُ  
وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلذَّالِمِينَ وَلِيُظَلِّمَهُمُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ

অর্থাৎ তারা বিপদমুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে আপনার কাছে বিপদ নাযিল হওয়ার তাগাদা করে (যে আপনি নবী হয়ে থাকলে তাৎক্ষণিক আযাব এনে দিন। এতে বোঝা যায় যে, তারা আযাব আসাকে খুবই অবান্তর অথবা অসম্ভব মনে করে)। অথচ তাদের পূর্বে অন্য কাফিরদের উপর অনেক আযাব এসেছে। সবলেই তা প্রত্যক্ষ করেছে।

এমতাবস্থায় ওদের উপর আযাব আসা অবান্তর হল কিরূপে? এখানে <sup>و</sup>مَثَلَاتٍ শব্দটি

<sup>و</sup>مَثَلَاتٍ -এর বহুবচন। এর অর্থ অপমান কর ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি।

এরপর বলা হয়েছে: নিশ্চিতই আপনার পালনকর্তা মানুষের গোনাহ ও অবাধ্যতা সত্ত্বেও অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু। যারা এ ক্ষমা ও দয়া দ্বারা উপকৃত হয় না এবং অবাধ্যতার ভূবে থাকে, তাদের জন্য তিনি কঠোর শাস্তিদাতাও। কাজেই কোনরূপ ভুল বোঝাবুঝিতে লিপ্ত থাকা উচিত নয় যে, আল্লাহ যখন ক্ষমাশীল, দয়ালু তখন আমাদের উপর কোন আযাব আসতেই পারে না।

কাফিরদের তৃতীয় সন্দেহ ছিল এই: আমরা রসূল (স)-এর অনেক মু'জিযা দেখেছি কিন্তু বিশেষ ধরনের যেসব মু'জিযা আমরা দেখতে চাই, সেগুলো তিনি প্রকাশ করেন না কেন? এর উত্তর তৃতীয় আয়াতে দেওয়া হয়েছে:

يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ ط إِنَّهَا أَنْتَ مَنَّوْا

وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ -

অর্থাৎ কাফিররা আপনার নবুয়তের বিরুদ্ধে আপত্তি তুলে বলে যে, আমরা যে বিশেষ মু'জিয়া দেখতে চাই; তা তাঁর উপর নাযিল করা হল না কেন? এর উত্তর এই যে, মু'জিয়া জাহির করা পয়গম্বরের ইচ্ছাধীন নয়; বরং এটা সরাসরি আল্লাহর কাজ। তিনি যখন যে ধরনের মু'জিয়া প্রকাশ করতে চান, করেন। তিনি কারও দাবী ও খামেশ পূরণ

করতে বাধ্য নন। এ জন্যই বলা হয়েছে : **إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ** অর্থাৎ আপনার কাজ শুধু কাফিরদেরকে আল্লাহর আযাব সম্পর্কে উয় প্রদর্শন করা--মু'জিয়া জাহির করা নয়।

**وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ**—অর্থাৎ পূর্ববর্তী উম্মতের মধ্যে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য

পথপ্রদর্শক ছিল। আপনি একক নবী নন। জাতিকে পথপ্রদর্শন করা সব পয়গম্বরেরই দায়িত্ব ছিল। মু'জিয়া প্রকাশ করার ক্ষমতা কাউকে দেওয়া হয়নি। আল্লাহ তা'আলা যখন যে ধরনের মু'জিয়া প্রকাশ করতে চান, করেন।

প্রত্যেক সম্প্রদায় ও দেশে পয়গম্বরের আসা কি জরুরী? : আয়াতে বলা হয়েছে : প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য একজন পথপ্রদর্শক ছিলেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোন সম্প্রদায় ও ভূখণ্ড পথপ্রদর্শক থেকে খালি থাকতে পারে না; যে কোন পয়গম্বরের হোক কিংবা পয়গম্বরের প্রতিনিধিরূপে তাঁর দাওয়াতের প্রচারক হোক। উদাহরণত সূরা ইয়াসীনে পয়গম্বরের পক্ষ থেকে প্রথমে দু'ব্যক্তিকে কোন সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণের কথা উল্লিখিত রয়েছে। তাঁরা স্বয়ং নবী ছিলেন না। এরপর তাদের সাহায্য ও সমর্থনের জন্য তৃতীয় ব্যক্তিকে পাঠানোর কথা বর্ণিত হয়েছে।

তাই এ আয়াত থেকে এটা জরুরী হয় না যে, হিন্দুস্তানে কোন নবী ও রসূল জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তবে রসূলের দাওয়াত পৌছানোর জন্য এ দেশে প্রচুর সংখ্যক আলিমের আগমন প্রমাণিত রয়েছে। এ ছাড়া এ জাতীয় অসংখ্য পথপ্রদর্শক যে এখানে জন্মগ্রহণ করেছেন, তাও সবার জানা।

এ পর্যন্ত তিন আয়াতে নবুয়ত অস্বীকারকারীদের সন্দেহের জওয়াব বর্ণিত হয়েছে। চতুর্থ আয়াতে আবার তওহীদের আসিল বিষয়বস্তু উল্লিখিত হয়েছে। সূরার শুরু থেকেই এ সম্পর্কে আলোচনা হয়ে এসেছে। বলা হয়েছে :

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ كُلُّ أُمَّةٍ وَمَا تَغِيصُونَ الْأَرْحَامَ وَمَا تَزِدُّونَ وَكُلِّ شَيْعٍ

عِنْدَ رَبِّهِمْ قَدِيرٌ ۝

অর্থাৎ প্রত্যেক নারী যে গর্ভধারণ করে, তা ছেলে না মেয়ে, সূত্রী না কুত্রী, সৎ না অসৎ— তা সবই আল্লাহ্ জানেন এবং নারীদের গর্ভাশয়ে যে হ্রাসবৃদ্ধি হয়, অর্থাৎ কোন সময় এক সন্তান জন্মগ্রহণ করে, কোন সময় দু'ত কোন সময় দেরীতে—তাও আল্লাহ্ জানেন।

এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার একটি বিশেষ গুণ বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি 'আলিমুল-গায়্ব'। সৃষ্টিজগতের প্রতিটি অণু-পরমাণু ও সে সবেল পরিবর্তনশীল অবস্থা সম্পর্কে তিনি ওয়াকিফহাল। এর সাথেই মানব সৃষ্টির প্রতিটি স্তর প্রতিটি পরিবর্তন ও প্রতিটি চিহ্ন সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। গর্ভস্থ সন্তান ছেলে না মেয়ে না উভয়ই; না কিছুই না—শুধু পানি অথবা বায়ু রয়েছে— এসব বিষয়ের নিশ্চিত ও নির্ভুল জ্ঞান একমাত্র তিনিই রাখেন। লক্ষণাদিদৃষ্টে কোন হাকীম অথবা ডাক্তার এ ব্যাপারে যে মত ব্যক্ত করে, তার মর্যাদা, ধারণা ও অনুমানের চাইতে বেশি নয়। অনেক সময় বাস্তব ঘটনা এর বিপরীত প্রকাশ পায়। আধুনিক ঐক্সরে মেশিনও এ সত্য উদঘাটন করতে অক্ষম। এর সত্যিকার ও নিশ্চিত জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই রাখেন। এ বিষয়টিই অন্য এক আয়াতে বর্ণিত হয়েছে :

وَيَعْلَمُ مَا فِي الْاَرْحَامِ—অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন যাকিছু

গর্ভাশয়ে রয়েছে।

আরবী ভাষায় تَعْلَمُ শব্দটি হ্রাস পাওয়া শুরু হওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়। আলোচ্য আয়াতে এর বিপরীতে تَزَادُ শব্দ এসে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে যে, এখানে অর্থ হ্রাস পাওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, জননীর গর্ভাশয়ে যা কিছু হ্রাস-বৃদ্ধি হয়, তার বিস্তৃত জ্ঞান আল্লাহ্ তা'আলাই রাখেন। এ হ্রাস-বৃদ্ধির অর্থ গর্ভজাত সন্তানের সংখ্যায় হ্রাস-বৃদ্ধি হতে পারে, অর্থাৎ গর্ভে এক সন্তান আছে কিংবা বেশি এবং জন্মের সময়ও হ্রাস-বৃদ্ধি হতে পারে, অর্থাৎ গর্ভস্থ সন্তান কত মাস, কত দিন ও কত ঘণ্টায় জন্মগ্রহণ করে একজন বাহ্যিক মানুষের অস্তিত্ব লাভ করবে, তার নিশ্চিত জ্ঞানও আল্লাহ্ ছাড়া কেউ রাখতে পারে না।

তফসীরবিদ মুজাহিদ বলেন : গর্ভাবস্থায় নারীদের যে রক্তপাত হয়, তা গর্ভস্থ সন্তানের দৈহিক আয়তন ও স্বাস্থ্য হ্রাসের কারণে হয়। تَعْلَمُ الْاَرْحَامِ বলে এই হ্রাস বোঝানো হয়েছে। বাস্তব সত্য এই যে, হ্রাসের মত প্রকার রয়েছে, আয়াতের ভাষা সব-গুলোতেই পরিব্যপ্ত। কাজেই কোন বিরোধ নেই।

كُلُّ شَيْءٍ مَّعَدًا بِمَقْدَارٍ—অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার কাছে প্রত্যেক বস্তুর

একটি বিশেষ অনুমান ও মাপ নির্দিষ্ট রয়েছে। এর কমও হতে পারে না এবং বেশিও হতে পারে না। সন্তানের সব অবস্থাও এর অন্তর্ভুক্ত। তার প্রত্যেকটি বিষয় আল্লাহ্ তা'আলার কাছে নির্ধারিত আছে। কতদিন গর্ভে থাকবে, কতকাল দুনিয়াতে জীবিত থাকবে এবং

কি পরিমাণ বিখ্যিক পাবে---এসব বিষয়ে আল্লাহর অনুপম জ্ঞান তাঁর তওহীদের প্রকৃষ্টি প্রমাণ।

عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةُ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ ۝ سَوَاءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ  
 أَسَرَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ  
 بِالنَّهَارِ ۝ لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ  
 مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۝ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا  
 بِأَنْفُسِهِمْ ۝ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءَ آفَآكَ مَرَدًّا لَهُ ۚ وَمَا لَهُمْ  
 مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ۝ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنزِلُ  
 السَّحَابَ الثِّقَالَ ۝ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ  
 ۚ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ  
 فِي اللَّهِ ۚ وَهُوَ شَدِيدُ الْحَالِ ۝ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ  
 مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطٍ كَفِيهِ إِلَى الْمَاءِ  
 يَبْلَغُونَ قَاةً وَهُوَ بِأَلْغَمِ ۝ وَمَا دُعَاءُ الْكٰفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلٰلٍ ۝  
 وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظَلَمَهُمْ  
 بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ۝

(৯) তিনি সকল গোপন ও প্রকাশ্য বিষয় অবগত, মহোত্তম, সর্বোচ্চ মর্যাদাবান।

(১০) তোমাদের মধ্যে কেউ গোপনে কথা বলুক বা তা সশব্দে প্রকাশ করুক, রাতের অন্ধকারে সে আন্ধাগোপন করুক বা প্রকাশ্য দিবালােকে বিচরণ করুক; সবাই তাঁর নিকট সমান। (১১) তাঁর পক্ষ থেকে অনুসরণকারী রয়েছে তাদের অগ্রে এবং পশ্চাতে, আল্লাহর নির্দেশে তারা ওদের হিফাযত করে। আল্লাহ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন না করে। আল্লাহ যখন



কোন জাতির উপর বিপদ চান, তখন তা রূদ হওয়ার নয় এবং তিনি ব্যতীত তাদের কোন সাহায্যকারী নেই। (১২) তিনিই তোমাদেরকে বিদ্যাৎ দেখান ডয়ের জন্য এবং জাশার জন্য এবং উশ্রিত করেন ঘন মেঘমালা। (১৩) তাঁর প্রশংসা পাঠ করে বজ্র নির্ঘোষ এবং সব ফেরেশতা, সজ্জয়ে। তিনি বজ্রপাত করেন, অতঃপর যাকে ইচ্ছা, তাকে তা দ্বারা জাযাত করেন; তথাপি তারা আল্লাহ্ সম্পর্কে বিতণ্ডা করে, অথচ তিনি মহাশক্তিশালী। (১৪) সত্যের আহ্বান একমাত্র তাঁরই এবং তাঁকে ছাড়া যাদেরকে ডাকে, তারা তাদের কোন কাজে আসে না; ওদের দৃষ্টান্ত সেরূপ, যেমন কেউ দু'হাত পানির দিকে প্রসারিত করে যাতে পানি তার মুখে পৌঁছে যায়; অথচ পানি কোন সময় পৌঁছবে না। কাফিরদের যত আহ্বান তার সবই পথঘল্টতা। (১৫) আল্লাহ্কে সিজদা করে যা কিছু নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে আছে ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় এবং তাদের প্রতিচ্ছায়াও সকাল-সন্ধ্যায়।

### তুফসীরের সার-সংক্ষেপ

তিনি সব গোপন ও প্রকাশ্য বিষয়ে জানী, সবান বড় (এবং) সর্বোচ্চ মর্ষাদাবান। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি চুপি চুপি কথা বলে এবং যে উচ্চৈঃস্বরে বলে এবং যে রাতে কোথাও আত্মগোপন করে এবং সে দিবালোককে চলাফেরা করে, তারা সব (আল্লাহ্‌র জ্ঞান) সমান। (অর্থাৎ তিনি সবাইকে সমভাবে জানেন। তিনি যেমন তোমাদের প্রত্যেককে জানেন, তেমনিভাবে প্রত্যেকের হিফায়তও করেন। সেমতে তোমাদের মধ্যে থেকে) প্রত্যেকের (হিফায়তের) জন্য কিছু ফেরেশতা (নির্ধারিত) রয়েছে, যারা অদল-বদল হতে থাকে। কিছু তার সামনে এবং কিছু তার পশ্চাতে। তারা আল্লাহ্‌র নির্দেশে (অনেক বিপদাপদ থেকে) তার হিফায়ত করে। (এতে কেউ যেন মনে না করে যে, যখন ফেরেশতা আমাদের হিফায়ত করে, তখন যা ইচ্ছা, কর; তা কুকুরীই হোক না কেন। আযাব নাযিলই হবে না। এরূপ মনে করা সম্পূর্ণ ভুল। কেননা) নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা (প্রাথমিক পর্যায়ে তো কাউকে আযাব দেন না। তাঁর চিরাচরিত রীতি এই যে, তিনি) কোন জাতির (ডাল) অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত তারা নিজেদের যোগ্যতাবলে স্বীয় অবস্থা পরিবর্তন না করে। (কিন্তু এর সাথে এটাও আছে যে, যখন তারা নিজেদের প্রতিভায় ত্রুটি করতে থাকে, তখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাদের প্রতি বিপদ ও শাস্তি নেমে আসে)। এবং যখন আল্লাহ্‌র কোন জাতিকে বিপদে পতিত করতে চান, তখন তা রূদ করার কোন উপায়ই নেই। (তা পতিত হয়ে যায়)। এবং (এমন মুহূর্তে) আল্লাহ্ ব্যতীত (যাদের হিফায়তের ধারণা তারা পোষণ করে) তাদের কোন সাহায্যকারী নেই। (এমন কি, ফেরেশতাও তাদের হিফায়ত করে না—করলেও সে হিফায়ত তাদের কাজে আসবে না।) তিনি এমন (মহীয়ান) যে, তোমাদেরকে (বৃষ্টিপাতের সময়) বিদ্যাৎ (চমকানো অবস্থায়) দেখান, যদ্বকরন (তা পতিত হওয়ার) ভয়ও হয় এবং (তা থেকে বৃষ্টির) আশাও হয় এবং তিনি পানিভর্তি মেঘমালাকে (ও) উত্তোলন করেন এবং রূ'দ (ফেরেশতা) তাঁর প্রশংসা কীর্তন করে এবং অন্যান্য ফেরেশতাও তাঁর ভয়ে প্রশংসা ও গুণ কীর্তন করে)। এবং তিনি (পৃথিবীর দিকে) বজ্র প্রেরণ

করেন অতঃপর যার উপর ইচ্ছা ফেলে দেন এবং তারা আল্লাহ্ সম্পর্কে ( অর্থাৎ তাঁর তওহীদ সম্পর্কে, তাঁর এমন মহীয়ান হওয়া সত্ত্বেও ) তর্ক-বিতর্ক করে; অথচ তিনি প্রবল পরাক্রমশালী। ( ভয় করার যোগ্য; কিন্তু তারা ভয় করে না এবং তাঁর অংশীদার সাব্যস্ত করে। তিনি এমন দোয়া কবুলকারী যে, ) সত্য দোয়া বিশেষভাবে তাঁরই ( কেননা, তা কবুল করার শক্তি তাঁর আছে। ) আল্লাহ্ ছাড়া যাদেরকে তারা ( প্রয়োজনে ও বিপদে ) ডাকে, তারা ( শক্তিশূন্য হওয়ার কারণে ) তাদের আবেদন এতটুকুই মঞ্জুর করতে পারে, যতটুকু পানি ঐ ব্যক্তির দরখাস্ত মঞ্জুর করে যে উভয় হাত পানির দিকে প্রসারিত করে ( এবং ইঙ্গিতে নিজের দিকে ডাকে ), মাতে তা ( অর্থাৎ পানি ) তার মুখ পর্যন্ত ( উড়ে ) এসে যায়, অথচ তা ( নিজে নিজে ) তার মুখ পর্যন্ত ( কিছুতেই ) আসবে না। ( সূতরাং পানি যেমন তাদের আবেদন মঞ্জুর করতে অক্ষম তেমনিভাবে তাদের উপাস্যরাও অপারক। তাই তাদের কাছে ) কাফিরদের আবেদন নিষ্ফল বৈ নয়। আল্লাহ্ তা'আলারই সামনে ( অর্থাৎ তিনি এমন সর্বশক্তিমান যে, তাঁরই সামনে ) সবাই মাথা নত করে---যারা আছে নভোমণ্ডলে এবং যারা আছে ভূমণ্ডলে; ( কেউ ) ধূশীতে এবং ( কেউ ) বাধ্যবাধকতায়। ( ধূশীতে মাথা নত করার মানে স্বেচ্ছায় তাঁর ইবাদত করা এবং বাধ্যবাধকতার অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা যে সৃষ্টজীবের মধ্যে যে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে চান, সে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করতে পারে না )। এবং তাদের ( অর্থাৎ পৃথিবীবাসীদের ) প্রতিচ্ছায়াও ( মাথা নত করে ) সকালে ও বিকালে। অর্থাৎ ছায়াকে যতটুকু ইচ্ছা বাড়ান এবং যতটুকু ইচ্ছা সঙ্কুচিত করেন। যোহত্ এই হ্রাস-বৃদ্ধি, সকাল-বিকালে বেশী প্রকাশ পায়, তাই বিশেষভাবে সকাল-বিকাল উল্লেখ করা হয়েছে। নতুবা ছায়াও সর্বাবস্থায় অনুগত )।

### আনুমানিক জাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহের পূর্বে আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ গুণাবলী বর্ণিত হচ্ছিল। সে-গুলো ছিল প্রকৃতপক্ষে তওহীদের প্রমাণ। এ আয়াতে বলা হয়েছে :

عَلَّمَهُ غَيْبِ مَا لِمِ الْغُيُوبِ الشَّهَادَةِ الْكَبِيرِ الْمُتَعَالِ

হয়েছে যা মানুষের পক্ষ ইঞ্জিয়ের কাছে অনুপস্থিত; অর্থাৎ চক্ষু দ্বারা দেখা যায় না, কানে শোনা যায় না, নাকে শ্রাব নেওয়া যায় না, জিহ্বা দ্বারা স্বাদ বোঝা যায় না এবং হাতে স্পর্শ করা যায় না।

এর বিপরীত **شهادة** হচ্ছে ঐ সব বস্তু, যেগুলো উল্লিখিত পক্ষ ইঞ্জিয় দ্বারা অনুভব করা যায়। আয়াতের অর্থ এই যে, এটা আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ গুণ যে তিনি প্রত্যেক অনুপস্থিতকে এমনভাবে জানেন, যেমন উপস্থিত ও বিদ্যমানকে জেনে থাকেন।

**الْكَبِيرِ** শব্দের অর্থ বড় এবং **مُتَعَالِ** -এর অর্থ উচ্চ। উভয় শব্দ দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, তিনি সৃষ্ট বস্তুসমূহের গুণাবলীর উর্ধ্ব এবং সবার চেয়ে বড়। কাফির ও মুশরিকরা সংক্ষেপে আল্লাহ্ তা'আলার মহত্ত্ব ও উচ্চমর্যাদা স্বীকার করত, কিন্তু উপলব্ধি

দোষে তারা আল্লাহকে সাধারণ মানুষের সমতুল্য জ্ঞান করে তাঁর জন্য এমন গুণাবলী সাব্যস্ত করত, যেগুলো তাঁর মর্মান্বন পক্ষে খুবই অসম্ভব। উদাহরণত ইহদী ও খৃস্টানরা আল্লাহর জন্য পুত্র সাব্যস্ত করেছে। কেউ কেউ তাঁর জন্য মানুষের ন্যায় দেহ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সাব্যস্ত করেছে এবং কেউ কেউ বিশেষ দিক নির্ধারণ করেছে। অথচ তিনি এসব অবস্থা ও গুণ থেকে উচ্চে, উর্ধ্বে ও পবিত্র। কোরআন পাক তাদের বর্ণিত গুণাবলী থেকে পবিত্রতা প্রকাশের জন্য বার বার বলেছে :

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এসব গুণ থেকে পবিত্র, যেগুলো তারা বর্ণনা করে।

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ ۚ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ

বাক্যে আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানগত পরাকাষ্ঠা বর্ণিত হয়েছিল। দ্বিতীয় লম্বোক্তি

বাক্যে শক্তি ও মাহাত্ম্যের পরাকাষ্ঠা বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ তাঁর শক্তির ও সামর্থ্য মানুষের কল্পনার উর্ধ্বে। এর পরবর্তী আয়াতেও এ জ্ঞান ও শক্তির পরাকাষ্ঠা একটি বিশেষ আঙ্গিকে বর্ণনা করা হয়েছে :

سَوَاءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ أَسْرَأَ الْقَوْلَ مِنْ جَهْرٍ ۖ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ  
وَسَاءِ رَبُّ بِالذَّهَارِ

স্বরাস্ত্র শব্দটির অর্থ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ আস্ত্রে কথা বলা এবং জেহর শব্দের অর্থ, জোরে কথা বলা। অপরকে শোনানোর জন্য যে কথা বলা হয়, তাকে জেহর বলে এবং যে কথা স্বয়ং নিজেকে শোনানোর জন্য বলা হয়, তাকে লসর বলে মুস্তাখফ শব্দের অর্থ যে গা ঢাকা দেয় এবং সারব-এর অর্থ যে স্বাধীন নিশ্চিন্তভাবে পথ চলে।

আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান সর্বব্যাপী। কাজেই যে ব্যক্তি আস্ত্রে কথা বলে এবং যে ব্যক্তি উচ্চৈঃস্বরে কথা বলে, তারা উভয়েই আল্লাহর কাছে সমান। তিনি উভয়ের কথা সমভাবে শোনেন এবং জানেন। এমনিভাবে যে ব্যক্তি রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দেয় এবং যে ব্যক্তি দিবালোকে প্রকাশ্য রাস্তায় চলে, তারা উভয়েই আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান ও শক্তির দিক দিয়ে সমান। উভয়ের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক অবস্থা তিনি সমভাবে জানেন এবং উভয়ের উপর তাঁর শক্তি সমভাবে পরিব্যাপ্ত। কেউ তাঁর ক্ষমতার আওতা-বহির্ভূত নয়। এ বিষয়টিই পরবর্তী আয়াতে আরও ব্যক্ত করে বলা হয়েছে :

لَا سَعْيَ لَكُمْ فِيهَا مِنْ يَدَيْكُمْ وَمِنْ خَلْفِكُمْ يُحَافِظُهَا مِنْ أَمْرِ اللَّهِ

শব্দটি **سَعْيَاتٌ** এর বহুবচন। যে দল অপর দলের পেছনে কাছাকাছি

হয়ে আসে, তাকে **سَعْيَاتٌ** অথবা **سَعْيَاتٌ** বলা হয়। **مِنْ يَدَيْكُمْ**-এর শাসনিক

অর্থ উভয় হাতের মাঝখানে। উদ্দেশ্য মানুষের সম্মুখ দিক। **مِنْ خَلْفِكُمْ**-এর অর্থ পশ্চাদিক

**مِنْ أَمْرِ اللَّهِ** এখানে **مِنْ** কারণবোধক অর্থ দেয়; অর্থাৎ **بِأَمْرِ اللَّهِ** কোন কোন

কিন্মাত্তে এ শব্দটি **بِأَمْرِ اللَّهِ** বর্ণিতও আছে। (রূহুল-মা'আনী)

আয়াতের অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি কথা গোপন করতে কিংবা প্রকাশ করতে চায় এবং যে ব্যক্তি চলাফেরাকে রাতের অন্ধকারে ডেকে রাখতে চায় অথবা প্রকাশ্য সড়কে ঘোরাফেরা করে--এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে ফেরেশতাদের দল নিযুক্ত রয়েছে। তার সম্মুখ ও পশ্চাদিক থেকে তাকে ঘিরে রাখে। তাদের কাজ ও দায়িত্ব পরিবর্তিত হতে থাকে এবং তারা একের পর এক আগমন করে। আল্লাহর নির্দেশে মানুষের হিফায়ত করা তাদের দায়িত্ব।

সহীহ বুখারীর হাদীসে বলা হয়েছে : ফেরেশতাদের দুটি দল হিফায়তের জন্য নিযুক্ত রয়েছেন। একদল রাত্রির জন্য এবং একদল দিনের জন্য। উভয় দল ফজরের ও আসরের নামাযের সময় একত্রিত হন। ফজরের নামাযের পর রাতের পাহারাদার দল বিদায় যান এবং দিনের পাহারাদাররা কাজে বৃথ্বে নেন। আসরের নামাযের পর তাঁরা বিদায় হয়ে যান এবং রাতের ফেরেশতা দায়িত্ব নিয়ে চলে আসেন।

আবু দাউদের এক হাদীসে হযরত আলী মুর্তজা (রা)-এর রেওয়াজেতে বর্ণিত আছে, প্রত্যেক মানুষের সাথে কিছু সংখ্যক হিফায়তকারী ফেরেশতা নিযুক্ত রয়েছেন। তার উপর যাতে কোন প্রাচীর ধ্বংস না পড়ে কিংবা সে কোন গর্তে পতিত না হয় কিংবা কোন জন্তু অথবা মানুষ তাকে কষ্ট না দেয় ইত্যাদি বিষয়ে ফেরেশতাগণ তার হিফায়ত করেন। তবে কোন মানুষকে বিপদাপদে জড়িত করার জন্য যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ জারি হয়ে যায়, তখন হিফায়তকারী ফেরেশতারা সেখান থেকে সরে যায়।--(রূহুল-মা'আনী)

হযরত উসমান গনী (রা)-এর রেওয়াজেতে ইবনে-জরীরের এক হাদীস থেকে আরও জানা যায় যে, হিফায়তকারী ফেরেশতাদের কাজ শুধু পাখি বিপদাপদ ও দুঃখকষ্ট থেকে

হিফাযত করাই নয়, বরং তারা মানুষকে পাপ কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখারও চেষ্টা করেন। মানুষের মনে সাধুতা ও আল্লাহ্‌ভীতির প্রেরণা জাগ্রত করেন যাতে সে গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকে। এরপরও যদি সে ফেরেশতাদের প্রেরণার প্রতি উদাসীন হয়ে পাপে লিপ্ত হলে যায় তবে তারা দোয়া ও চেষ্টা করে যাতে সে শীঘ্র তওবা করে পাক হয়ে যায়। অগত্যা যদি সে কোনরূপেই হুঁশিয়ার না হয়, তখন তারা তার আমলনামায় গোনাহ্ লিখে দেয়।

মোটকথা এই যে, হিফাযতকারী ফেরেশতা দীন ও দুনিয়া উভয়ের বিপদাপদ থেকে মানুষের নিদ্রায় ও জাগরণে হিফাযত করে। হযরত কা'ব আহবার বলেন : মানুষের উপর থেকে আল্লাহ্‌র হিফাযতের এই পাহারা সন্নিবে দিলে জিনদের অত্যাচারে মানবজীবন অতিষ্ঠ হয়ে যাবে। কিন্তু এসব রক্ষামূলক পাহারা ততক্ষণ পর্যন্তই কার্যকর থাকে, যতক্ষণ তকদীরে-ইলাহী মানুষের হিফাযতের অনুমতি দেয়। যদি আল্লাহ্ তা'আলাই কোন বান্দাকে বিপদে জড়িত করতে চান, তবে এসব রক্ষামূলক পাহারা নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়।

পরবর্তী আয়াতে এ বিষয়টিই বর্ণনা করে বলা হয়েছে :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بَقِيَهُمْ حَتَّىٰ يَغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ آلٍ -

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ অন্যে তারাই নিজেদের অবস্থা ও কাজকর্ম মন্দ ও অশান্তিতে পরিবর্তিত করে না নেয়। (তারা যখন নিজেদের অবস্থা অবাধ্যতা ও নাফরমানীতে পরিবর্তিত করে নেয়, তখন আল্লাহ্ তা'আলাও স্বীয় কর্মপন্থা পরিবর্তন করে দেন। বলা বাহুল্য) যখন আল্লাহ্ তা'আলাই কাউকে আযাব দিতে চান, তখন কেউ তা রদ করতে পারে না এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশের বিপরীতে তার সাহায্যার্থে কেউ এগিয়ে আসতে পারে না।

সারকথা এই যে, মানুষের হিফাযতের জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ফেরেশতাদের পাহারা নিয়োজিত থাকে, কিন্তু সম্প্রদায় যখন আল্লাহ্‌র নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা ও তাঁর আনুগত্য ত্যাগ করে কুকর্ম, কুচরিত্র ও অবাধ্যতার পথ বেছে নেয়, তখন আল্লাহ্ তা'আলাও স্বীয় রক্ষামূলক পাহারা উঠিয়ে নেন। এরপর আল্লাহ্‌র গযব ও আযাব তাদের উপর নেমে আসে। এ আযাব থেকে আত্মরক্ষার কোন উপায় থাকে না।

এ ব্যাখ্যা থেকে জানা গেল যে, আলোচ্য আয়াতের অবস্থা পরিবর্তন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যখন কোন সম্প্রদায় আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতার পথ ত্যাগ করে স্বীয় অবস্থায় মন্দ পরিবর্তন সৃষ্টি করে, তখন আল্লাহ্ তা'আলাও স্বীয় অনুকম্পা ও হিফাযতের কর্মপন্থা পরিবর্তন করে দেন।

এ আয়াতের অর্থ সাধারণভাবে এরূপ বর্ণনা করা হয় যে, কোন জাতির জীবনে কল্যাণকর বিপ্লব ততক্ষণ পর্যন্ত আসে না, যতক্ষণ তারা এ কল্যাণকর বিপ্লবের জন্য

নিজেদের অবস্থা সংশোধন করে নিজেদেরকে তার যোগ্য করে না নেয়। এ অর্থেই নিম্নোক্ত কবিতাটি সুবিদিত :

خدا نے اچ تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی  
نہ وہ جس کو خیر ل آپ اپنی حالت سے بدلنے کا

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সে পর্বত কোন জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেন নি যে পর্বত না তারা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করার খেয়াল করেছে।

এ বিষয়বস্তুটি যদিও কিছুটা নির্ভুল; কিন্তু আলোচ্য আয়াতের অর্থ এরূপ নয়। কবিতার বিষয়বস্তুটি একটি সাধারণ আইন হিসেবে নির্ভুল। অর্থাৎ যে ব্যক্তি স্বয়ং নিজের অবস্থা সংশোধন করার ইচ্ছা করে না, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেও তাকে সাহায্য করার ওয়াদা নেই। সাহায্য করার ওয়াদা তখনই কার্যকর হয় যখন কেউ স্বয়ং

সংশোধনের চেষ্টা করে; যেমন এক আয়াত **اَلَّذِيْنَ جَاهَدْنَا وَآهَدْنَا لَنَهْدُ**

... وَآهَدْنَا  
... থেকে জানা যায় যে, আল্লাহর পক্ষ থেকেও হিদায়তের পথ তখনই উন্মুক্ত হয়, যখন কারও মধ্যে হিদায়তের অব্বেষণ থাকে। কিন্তু আল্লাহর নিয়ামত দান এ আইনের অধীন নয়। অনেক সময় অব্বেষণ ছাড়াই নিয়ামত দান করা হয়।

وَأَدْحَقُّ رَأْيًا بِلَهْمٍ شَرْطِ نَيْسِنْتِ  
بِدَكَّةِ شَرْطِ رَأْيًا بِلَهْمٍ رَأْدَا وَسْتِ

অর্থাৎ আল্লাহর দানের জন্য যোগ্যতা শর্ত নয়, যোগ্যতা ব্যতীতও তাঁর দান এসে পতিত হয়।

স্বয়ং আমাদের অস্তিত্ব ও তন্মধ্যস্থিত অসংখ্য নিয়ামত আমাদের চেষ্টার ফলশ্রুতি নয়। আমরা কোন সময় এরূপ দোয়াও করিনি যে, আমাদেরকে এমন সত্তা দান করা হোক যার চক্র, নাসিকা, কর্ণ ও যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিখুঁত হয়। এসব নিয়ামত চাওয়া ছাড়াই পাওয়া গেছে।

مَانِبُو دِيمِ وَثَقَا ضَا مَا نِهْوِدِ  
لَطَفِ تُوْنَا كَقَدَّةِ مَا مِي شَلْوِدِ

অর্থাৎ আমি হিলাম না এবং আমার তরফ থেকে কোন প্রার্থনাও ছিলনা, তোমার অনুগ্রহই আমার না বলা প্রার্থনা প্রবণ করেছে।

তবে নিয়ামত দানের যোগ্যতা ও ওয়াদা স্বকীয় চেষ্টা ব্যতীত অর্জিত হয় না এবং কোন জাতির পক্ষে চেষ্টা ও কর্ম ব্যতীত নিয়ামতদানের অপেক্ষায় থাকা আশ্বপ্রবন্ধনা বৈ কিছু নয়।

—هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آلَهُرِقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলাই তোমাদেরকে বিদ্যুৎ প্রদর্শন করেন। এটা মানুষের জন্য ভয়েরও কারণ হতে পারে। কারণ, এটা যে জায়গায় পতিত হয় সবকিছু জ্বালিয়ে ছাইভস্ম করে দেয়। আবার এটা আশাও সঞ্চার করে যে, বিদ্যুৎ চমকানোর পর রুষ্টি হবে, যা মানুষ ও জীবজন্তুর জীবনের অবলম্বন। এবং আল্লাহ তা'আলাই বড় বড় ভারী মেঘ-মালাকে মৌসুমী বায়ুতে রূপান্তরিত করে উত্থিত করেন এবং জলপূর্ণ মেঘমালাকে শূন্য কোথা থেকে কোথায় নিয়ে যান। এরপর স্বীয় ফয়সালা ও তকদীর অনুযায়ী যথা ইচ্ছা, তা বর্ষণ করেন।

—وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ

তা'আলার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতার তসবীহ পাঠ করে এবং ফেরেশতারাও তাঁর ভয়ে তসবীহ পাঠ করে। সাধারণের পরিভাষায় রাদ বলা হয় মেঘের গর্জনকে, যা মেঘমালার পারস্পরিক সংঘর্ষের ফলে সৃষ্টি হয়। এর তসবীহ পাঠ করার অর্থ ঐ তসবীহ, যে সম্পর্কে কোরআন পাকের অন্য এক আয়াতে উল্লিখিত রয়েছে যে, ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলে এমন কোন বস্তু নেই, যে আল্লাহর তসবীহ পাঠ করে না। কিন্তু সাধারণ মানুষ এই তসবীহ শুনতে সক্ষম হয় না।

কোন কোন হাদীসে আছে যে, রুষ্টি বর্ষণের কাজে নিযুক্ত ও আদিষ্ট ফেরেশতার নাম রাদ। এই অর্থে তসবীহ পাঠ করার মানে সুস্পষ্ট।

—وَيُرْسِلُ السَّمَوَاتِ نِظْمًا بِهَا مِنْ يَشَاءُ

এর বহুবচন। এর অর্থ বজ্র, যা মাটিতে পতিত হয়। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলাই এসব বিদ্যুৎ মর্ত্যে প্রেরণ করেন, যেগুলো দ্বারা যাকে ইচ্ছা জ্বালিয়ে দেন।

—وَهُمْ يَجَاوِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

মৌমের যেরযোগে কৌশল, শাস্তি, শক্তি-সামর্থ্য ইত্যাদি অর্থে প্রযুক্ত হয়, আয়াতের অর্থ এই যে, তারা আল্লাহ তা'আলার তওহীদের ব্যাপারে পারস্পরিক কলহ-বিবাদ ও তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত রয়েছে; অথচ আল্লাহ তা'আলা শক্তিশালী কৌশলকারী। তাঁর সামনে সবাই চাতুরী অচল।

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي

الْأَعْمَى وَالْبَصِيرَةَ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ  
 شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهُ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ  
 كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ  
 أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّبِيلُ زَبَدًا رَابِيًا ۝ وَمِمَّا يُوقِدُونَ  
 عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُ الْكَذَلِكَ يَضْرِبُ  
 اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۚ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۚ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ  
 النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ۚ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ۝

(১৬) জিজ্ঞেস করুন : নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের পালনকর্তা কে? বলে দিন : আল্লাহ্। বলুন : তবে কি : তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত এমন অভিভাবক স্থির করেছ, যারা নিজেদের ভাল-মন্দেও মালিক নয়? বলুন : অন্ধ ও চক্ষুমান কি সমান হয়? অথবা কোথাও কি অন্ধকার ও আলো সমান হয়? তবে কি তারা আল্লাহ্‌র জন্য এমন অংশীদার স্থির করেছে যে, তারা কিছু সৃষ্টি করেছে, যেমন সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ্? অতঃপর তাদের সৃষ্টি এরূপ বিদ্রাভি ঘটিয়েছে? বলুন : আল্লাহ্‌ই প্রত্যেক বস্তু স্রষ্টা এবং তিনি একক, পরাক্রমশালী। (১৭) তিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন। অতঃপর স্রোতধারা প্রবাহিত হতে থাকে নিজ নিজ পরিমাণ অনুযায়ী। অতঃপর স্রোতধারা স্ফীত ফেনারূপে উপরে নিয়ে আসে। এবং অলংকার অথবা তৈজসপত্রের জন্য যে বস্তুকে আগুনে উত্তপ্ত করে, তাতেও তেমনি ফেনারূপি থাকে। এমনিভাবে আল্লাহ্ সত্য ও অসত্যের দৃষ্টান্ত প্রদান করেন। অতএব, ফেনা তো শুকিয়ে খতম হয়ে যায় এবং যা মানুষের উপকারে আসে, তা জমিতে অবশিষ্ট থাকে। আল্লাহ্ এমনিভাবে দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করেন।

তরুসীয়ের সার-সংক্ষেপ

আপনি (তাদেরকে এইভাবে) বলুন : নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের পালনকর্তা (উদ্ভাবক ও স্থায়িত্বদাতা, অর্থাৎ, স্রষ্টা ও সংরক্ষক) কে? (যেহেতু এ প্রশ্নের জবাব নির্দিষ্ট, তাই জওয়াবও আপনি (-ই) বলে দিন : আল্লাহ্। (অতঃপর আপনি) বলুন তবুও কি (তওহীদের এসব প্রশ্ন শুনে) তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য সাহায্যকারী (অর্থাৎ উপাস্য) স্থির করে রেখেছ, যারা (চরম অক্ষমতাবশত) স্বয়ং নিজেদের লাভ-লোকসানেরও ক্ষমতা রাখেনা? (অতঃপর শিরক খণ্ডন ও তওহীদ সপ্রমাণ করার পর তওহীদপন্থী ও শিরক-পন্থী এবং



স্বয়ং তওহীদ ও শিরকের মধ্যে পার্থক্য ফুটিয়ে তোলার জন্য) আপনি (আরও) বলুন : অল্প ও চক্ষুচ্যমান কি সমান হতে পারে? (এ হচ্ছে শিরক ও তওহীদের দৃষ্টান্ত)। অথবা তারা আল্লাহর এমন অংশীদার সাব্যস্ত করেছে যে, ওরাও। (কোন বস্তু) সৃষ্টি করেছে, যেমন আল্লাহ (তাদের স্বীকারোক্তি অনুযায়ীও) সৃষ্টি করেন? অতঃপর (এ কারণে) তাদের কাছে (উভয়ের) সৃষ্টিকর্ম একরূপ মনে হয়েছে? (এবং এ থেকে তারা প্রমাণ করেছে যে, উভয়েই যখন একরূপ স্রষ্টা তখন উভয়েই একরূপ উপাস্যও হবে। এ সম্পর্কেও) আপনি (-ই) বলে দিন : আল্লাহ তা'আলাই প্রত্যেক বস্তুর স্রষ্টা এবং তিনিই (সত্তা ও পূর্ণতার গুণাবলীতে) একক (এবং সব সৃষ্টবস্তুর উপর) প্রবল। আল্লাহ তা'আলা আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন। অতঃপর (পানি দ্বারা) নাদা (ভর্তি হয়ে) প্রবাহিত হতে লাগল নিজ পরিমাণ অনুযায়ী (অর্থাৎ ছোট নাদায় অল্প পানি এবং বড় নাদায় বেশী পানি)। অতঃপর জলস্রোত (পানির) উপরে ডাসমান আবর্জনা বইয়ে আনল। (এক আবর্জনা হল এই)। এবং যে বস্তুকে অগ্নির মধ্যে (রেখে) অলঙ্কার অথবা অন্য তৈজসপত্র (পাত্র ইত্যাদি) তৈরীর উদ্দেশ্যে উত্তপ্ত করা হয়, তাতেও এমনি আবর্জনা (উপরে ডাসমান) রয়েছে। (অতএব এ দৃষ্টান্তদ্বয়ের মধ্যে দু'বস্তু আছে। একটি উপকারী বস্তু অর্থাৎ আসল পানি ও আসল মাল এবং অপরটি অকেজো বস্তু অর্থাৎ আবর্জনা ও ময়লা। মোট কথা) আল্লাহ তা'আলা সত্য (অর্থাৎ তওহীদ, ঈমান ইত্যাদি) ও মিথ্যার (অর্থাৎ কুফর, শিরক ইত্যাদির) এমনি ধরনের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন (যা পরবর্তী বিষয়বস্তু দ্বারা পূর্ণতা লাভ করবে)। অতএব (উল্লিখিত দৃষ্টান্তদ্বয়ের মধ্যে) যা আবর্জনা, তা তো ফেলে দেওয়া হয় এবং যা মানুষের উপকার করে, তা পৃথিবীতে (হিতকর অবস্থায়) অবশিষ্ট থাকে। (এবং সত্য ও মিথ্যার যেমন উদাহরণ বর্ণনা করা হয়েছে) আল্লাহ তা'আলা এমনিভাবে (প্রত্যেক জরুরী বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে) উদাহরণসমূহ বর্ণনা করেন।

### আনুশঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

উভয় দৃষ্টান্তের সারমর্ম এই যে, এসব দৃষ্টান্তে ময়লা ও আবর্জনা যেমন কিছু-করণের জন্য আসল বস্তুর উপরে দৃষ্টিগোচর হয়; কিন্তু পরিণামে তা আঁস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয় এবং আসল বস্তু অবশিষ্ট থাকে, তেমনি মিথ্যাকে যদিও কিছুদিন সত্যের উপরে প্রাধান্য বিস্তার করতে দেখা যায়; কিন্তু অবশেষে মিথ্যা বিলুপ্ত ও পমূ'দস্ত হয় এবং সত্য অবশিষ্ট ও প্রতিষ্ঠিত থাকে।---(জালালাইন)

لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَىٰ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ  
 لَهُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ ۗ أُولَٰئِكَ  
 لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ ۗ وَمَا لَهُمْ جَهَنَّمَ ۗ وَ يَبْسُ السَّيْهَادُ ۗ أَقْسَنَ

يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْلَىٰ ۗ إِنَّمَا  
 يَنْذَكُرُ ۙ أُولَئِكَ الْأَلْبَابُ ۙ الَّذِينَ يُؤْفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا  
 يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ ۙ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوْصَلَ  
 وَيَخْشُونَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ۙ وَالَّذِينَ صَبَرُوا  
 ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا  
 وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ۙ  
 جَنَّتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَ  
 ذُرِّيَّتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ۙ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ  
 بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ۙ

(১৮) যারা পালনকর্তার আদেশ পালন করে, তাদের জন্যে উত্তম প্রতিদান রয়েছে এবং যারা আদেশ পালন করে না, যদি তাদের কাছে জগতের সব কিছু থাকে এবং তার সাথে তার সমপরিমাণ আরও থাকে, তবে সবই নিজেদের মুক্তিপণস্বরূপ দিয়ে দিবে। তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর হিসাব। তাদের আবাস হবে জাহান্নাম। সেটা কতই না নিক্কলট অবস্থান! (১৯) যে ব্যক্তি জানে যে, যা কিছু পালনকর্তার পক্ষ থেকে আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তা সত্য, সে কি ঐ ব্যক্তির সমান, যে অন্ধ? তারাই বোঝে, যারা বোধশক্তিসম্পন্ন। (২০) ইহারা এমন লোক, যারা আলাহর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে এবং অস্বীকার ভুল করে না। (২১) এবং যারা বজায় রাখে ঐ সম্পর্ক, যা বজায় রাখতে আলাহ আদেশ দিয়েছেন এবং স্বীয় পালনকর্তাকে ডয় করে এবং কঠোর হিসাবের আশংকা রাখে। (২২) এবং যারা স্বীয় পালনকর্তার সমুষ্টিটির জন্যে সবার করে, নামায প্রতিষ্ঠা করে আর আমি তাদেরকে যা দিয়েছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে বায়্য করে এবং যারা মন্দ্রের হিপরাতে ভাল করে, তাদের জন্যে রয়েছে পরকালের গৃহ। (২৩) তা হচ্ছে বসবাসের বাগান। তাতে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের সৎকর্মশীল বাপ-দাদা, স্বামী স্ত্রী ও সন্তানেরা। ফেরেশতারা তাদের কাছে আসবে প্রত্যেক দরজা দিয়ে। (২৪) বলবে : তোমাদের সবার কারণে তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আর তোমাদের এ পরিণাম-গৃহ কতই না চমৎকার!

**তুফসীরের সার-সংক্ষেপ**

যারা স্বীয় পালনকর্তার আদেশ পালন করে (এবং তওহীদ ও আনুগত্যের পথ অবলম্বন করে,) তাদের জন্য উত্তম প্রতিদান (অর্থাৎ জান্নাত নির্ধারিত) আছে এবং যারা তাঁর আদেশ পালন করে না (এবং কুফর ও গোনাহে কাম্বেম থাকে) তাদের কাছে (কিয়ামতের দিন) যদি সারা জগতের বিষয়-সম্পদ (বিদ্যমান) থাকে, (বরঞ্চ) তার সাথে সে সবেব সমপরিমাণ আরও (অর্থসম্পদ) থাকে, তবে সবই মুক্তি'র জন্য দিয়ে ফেরাবে।

তাদের কঠোর শাস্তি হবে। (অন্য এক আয়াতে ﴿لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ 'মুশকিল হিসাব' বলা হয়েছে)। তাদের ঠিকানা (সদাসর্বদার জন্য) দোযখ। এটা নিকৃষ্ট অবস্থানস্থল। যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, যা কিছু আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, তা সবই সত্য, সে কি ঐ ব্যক্তি'র মত হতে পারে, যে (এ জান থেকে নিরেট) অন্ধ? (অর্থাৎ কাফির ও মু'মিন সমান নয়)। অতএব, বুদ্ধিমানরাই উপদেশ গ্রহণ করে (এবং) তারা (বুদ্ধিমানরা) এমন যে, আল্লাহ'র সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে এবং (এ) অঙ্গীকার ভঙ্গ কর না এবং তারা এমন যে, আল্লাহ্ যেসব সম্পর্ক বজায় রাখতে আদেশ দিয়েছেন, সেগুলো বজায় রাখে, স্বীয় পালনকর্তাকে ভয় করে এবং কঠোর শাস্তি'র আশংকা করে (যা বিশেষভাবে কাফিরদের জন্যই। তাই কুফর থেকে বেঁচে থাকে)। এবং তারা এমন যে, স্বীয় পালনকর্তার সম্বন্ধিত'র কামনায় (সত্য ধর্মে) অটল থাকে, নামায প্রতিষ্ঠা করে এবং আমি তাদেরকে যে রুখী দিয়েছি, তা থেকে গোপনেও এবং প্রকাশ্যভাবেও (যখন যেরূপ করা সমীচীন হয়) ব্যয় করে এবং (অপরে) দুর্বাবহান্নকে (যা তাদের সাথে করা হয়) সম্ভাবহার দ্বারা এড়িয়ে যায়। (অর্থাৎ কেউ তাদের সাথে অসম্ভাবহার করলে তারা কিছু মনে করে না; বরং তার সাথে সম্ভাবহার করে)। তাদের জন্য সে জগতে (অর্থাৎ পরকালে) উত্তম পরিণাম রয়েছে, (অর্থাৎ সদাসর্বদা বসবাসের উদ্যান,) যাতে তারাও প্রবেশ করবে এবং তাদের পিতামাতা স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি'র মধ্যে যারা (জান্নাতের) যোগ্য (অর্থাৎ মু'মিন) হবে, (যদিও পূর্বোক্তদের সমপর্যায়ভুক্ত না হয়) তারাও (জান্নাতে তাদের কল্যাণে তাদেরই প্রেণীতে) প্রবেশ করবে এবং ফেরেশতার তা'দের কাছে প্রত্যেক (দিকের) দরজা দিয়ে আগমন করবে। (তারা বলবেঃ) তোমরা (প্রত্যেক বিপদ আশংকা থেকে) শাস্তিতে থাকবে এ কারণে যে, (তোমরা সত্যধর্মে) অটল ছিলে। অতএব এ জগতে তোমা-দের পরিণাম খুবই ভাল।

**আনুশঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়**

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে উদাহরণের মাধ্যমে সত্য ও মিথ্যাকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে সত্যপন্থী ও মিথ্যাপন্থীদের লক্ষণাদি, গুণাবলী, ভাল ও মন্দ কাজকর্ম এবং প্রতিদান ও শাস্তি বর্ণিত হয়েছে।

প্রথম আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার বিধানাবলী পালন ও আনুগত্যকারীদের জন্য উত্তম প্রতিদান এবং অবাধ্যতাকারীদের জন্য কঠোর শাস্তি'র কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় আয়াতে উভয় প্রকার লোকদের উদাহরণ 'অজ্ঞ ও চক্ষুমান' দ্বারা দেওয়া হয়েছে এবং পরিশেষে বলা হয়েছে :

إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ --- অর্থাৎ বিষয়টি যদিও সুস্পষ্ট ; কিন্তু এটি

তারা ই বুঝতে পারে, যারা বুদ্ধিমান। পক্ষান্তরে অমনোযোগিতা ও গোনাহ্ হাদের বিবেককে অকর্মণ্য করে রেখেছে, তারা এতবড় তফাৎটুকুও বোঝে না।

তৃতীয় আয়াতে উভয় দলের বিশেষ কাজকর্ম ও লক্ষণের বর্ণনা শুরু হয়েছে। প্রথমে আলাহর বিধানাবলী পালনকারীদের গুণাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে :

الَّذِينَ يُؤْتُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ --- অর্থাৎ তারা আলাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ

করে। সৃষ্টির সূচনায় আলাহ তা'আলা বান্দাদের কাছ থেকে যেসব ওয়াদা অঙ্গীকার নিয়েছিলেন, এখানে সেগুলোই বুঝান হয়েছে। তন্মধ্যে সর্বপ্রথম ছিল পালনকর্তা সম্পর্কিত অঙ্গীকার। এটি সৃষ্টির সূচনাকালে সকল আত্মাকে সমবেত করে অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছিল।

বলা হয়েছিল : **الَسْتُ بِرَبِّكُمْ** --- অর্থাৎ আমি কি তোমাদের পালনকর্তা নই ?

উত্তরে সবাই সম্মত হয়ে বলেছিল : **بَلَىٰ** অর্থাৎ হ্যাঁ, আপনি অবশ্যই আমাদের পালনকর্তা।

এমনিভাবে যাবতীয় বিধি-বিধানের আনুগত্য, সমস্ত ফরয কর্ম পালন এবং অবৈধ বিষয়াদি থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে আলাহর পক্ষ থেকে উপদেশ এবং বান্দার পক্ষ থেকে স্বীকারোক্তি কোরআন পাকের বিভিন্ন আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে।

দ্বিতীয় গুণ হচ্ছে **وَلَا يَنْقُضُونَ الْعَيْثَانَ** --- অর্থাৎ তারা কোন অঙ্গীকার ভঙ্গ

করে না। ঐ অঙ্গীকারও এর অন্তর্ভুক্ত, যা আলাহ তা'আলা ও বান্দার মধ্যে রয়েছে এবং

এইমাত্র **يُؤْتُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ** বাক্যে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া ঐসব অঙ্গীকারও

এর অন্তর্ভুক্ত, যেগুলো উচ্চমতের লোকেরা আপন পয়গম্বরের সাথে সম্পাদন করে এবং ঐসব অঙ্গীকারও বোঝান হয়েছে, যেগুলো মানবজাতি একে অপরের সাথে করে।

আবু দাউদ আওফ ইবনে মালেকের রিওয়ায়েতে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাতে রসূলুল্লাহ (স) সাহাবানে-কিরামের কাছ থেকে ঐ বিষয়ে অঙ্গীকার ও বায়'আত নিয়েছেন যে, তাঁরা আলাহর সাথে কাউকে অংশীদার করবেন না, পাছেগানা নামায পাবন্দি সহকারে আদায় করবেন, নিজেদের মধ্যকার শাসক শ্রেণীর আনুগত্য করবেন এবং কোন মানুষের কাছে কোন কিছু মাচ্ছা করবেন না।

মারা এ বায়'আতে অংশগ্রহণ করেছিলেন, অঙ্গীকার পালনের ব্যাপারে তাঁদের নিষ্ঠার তুলনা ছিল না। অথারোহণের সময় তাঁদের হাত থেকে চাবুক পড়ে গেলেও তাঁরা কোন মানুষকে চাবুকটি উত্তিয়ে দিতে বলতেন না; বরং স্বয়ং নিচে নেমে তা উত্তিয়ে নিতেন।

এটা ছিল সাহাবায়ে-কিরামের মনে রসুলুল্লাহ্ (সা)-র ভালবাসা, মাহাভ্যা ও আনুগত্য প্রসূত প্রেরণার প্রভাব। নতুবা বলাই বাহুল্য যে, এ ধরনের যাত্ৰা নিষিদ্ধ করা উদ্দেশ্য ছিল না। উদাহরণত হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) একবার মসজিদে প্রবেশ করছিলেন। এমতাবস্থায় দেখলেন যে, রসুলুল্লাহ্ (সা) ডাষণ দিচ্ছেন। ঘটনাক্রমে তাঁর মসজিদে প্রবেশ করার সময় রসুলুল্লাহ্ (সা)-র মুখ থেকে 'বসে যাও' কথাটি বের হয়ে গেল। আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ জানতেন যে, এর অর্থ এটা নয় যে, কেউ সড়কে অথবা সভাস্থলের বাইরে থাকলেও সেখানেই বসে যাবে। কিন্তু আনুগত্যের প্রেরণা তাঁকে সামনে পা বাড়াতে দিল না। দরজার বাইরেই যেখানে এ বাক্যটি কানে এসেছিল, তিনি সেখানেই বসে গেলেন।

আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যশীল বান্দাদের তৃতীয় গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে :

وَالَّذِينَ يَصُلُّونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُؤْتَلَ

সম্পর্ক বজায় রাখতে আদেশ করেছেন, তারা সেগুলো বজায় রাখে। এ বাক্যটির প্রচলিত তফসীর এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা আত্মীয়তার যেসব সম্পর্ক বজায় রাখতে এবং তদনুযায়ী কাজ করতে আদেশ করেছেন, তারা সেসব সম্পর্ক বজায় রাখে। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন : এর অর্থ এই যে, তারা ঈমানের সাথে সৎকর্মকে অথবা রসুলুল্লাহ্ (সা)-র প্রতি বিশ্বাসের সাথে পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের প্রতি এবং তাঁদের গ্রন্থের প্রতি বিশ্বাসকে যুক্ত করে।

চতুর্থ গুণ এই : وَيَتَّقُونَ رَبَّهُمْ --- অর্থাৎ তারা তাদের পালনকর্তাকে ভয়

করে। এখানে خشية শব্দের পরিবর্তে خوف শব্দ ব্যবহার করার এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি তাদের ভয় হিংস্র জন্তু অথবা ইতর মানুষের প্রতি স্বাভাবিক ভয়ের মত নয়। বরং তা পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের এবং উস্তাদের প্রতি শিষ্যের অভ্যাসগত ভয়ের মত। কণ্টদানের আশংকা এ ভয়ের কারণ নয়; বরং মাহাভ্যা ও ভালবাসার কারণে বান্দা এরূপ আশংকা করে যে, আমাদের কোন কর্ম অথবা কথা যেন আল্লাহ্ তা'আলার কাছে অপছন্দনীয় না হয়ে যায়। এ কারণেই যেখানে প্রশংসা স্থলে আল্লাহ্‌র ভয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানেই خشية শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, কারণ, মাহাভ্যা ও ভালবাসার কারণ থেকে উদ্ভূত ভয়কে خشية বলা হয়। এ কারণেই পূর্ববর্তী বাক্যে হিসাব কিতাবের কঠোরতার ভয় বর্ণনা প্রসঙ্গে خشية এর পরিবর্তে خوف শব্দটি ব্যবহার করে বলা হয়েছে :

وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ --- অর্থাৎ তারা মন্দ হিসাবকে ভয় করে। 'মন্দ

হিসাব' বলে কঠোর ও পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব বোঝান হয়েছে। হযরত আমেশা (রা) বলেন : আল্লাহ্ তা'আলা যদি কৃপাবশত সংক্ষেপে ও মার্জনা সহকারে হিসাব গ্রহণ করেন, তবেই মানুষ মুক্তি পেতে পারে। নতুবা যার কাছ থেকেই পুরোপুরি ও কড়ায় গড়ায় হিসাব নেওয়া হবে, তার পক্ষে আযাব থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভবপর হবে না। কেননা, এমন ব্যক্তি কে আছে, যে জীবনে কখনো কোন গোনাহ্ বা ত্রুটি করেন নি? এ হচ্ছে সৎ ও আনুগত্যশীল বান্দাদের পঞ্চম গুণ।

ষষ্ঠ গুণ এই :

وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ --- অর্থাৎ যারা

আল্লাহ্র সমুদ্রি লাভ করার আশায় অকৃত্রিমভাবে ধৈর্যধারণ করে।

প্রচলিত কথায় কোন বিপদ ও কষ্টে ধৈর্যধারণ করাকেই সবরের অর্থ মনে করা হয় কিন্তু আরবী ভাষায় এর অর্থ আরও অনেক ব্যাপক। কারণ, আসল অর্থ হচ্ছে স্বভাব-বিরুদ্ধ বিষয়াদির কারণে অস্থির না হওয়া; বরং দৃঢ়তা সহকারে নিজের কাজে ব্যাপৃত থাকা।

এ কারণেই এর দুটি প্রবণ বর্ণনা করা হয়। এক. صَبْرٌ عَلَى الطَّامَةِ অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার বিধি-বিধান পালনে দৃঢ় থাকা এবং দুই. صَبْرٌ عَنِ الْمَعْصِيَةِ অর্থাৎ গোনাহ্ থেকে আত্মরক্ষার ব্যাপারে দৃঢ় থাকা।

সবরের সাথে ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ কথাটি যুক্ত হয়ে ব্যক্ত করেছে যে, সবর

সর্বাবস্থায় প্রেত্বেত্ব বিষয় নয়। কেননা, কোন না কোন সময় বেসবর ব্যক্তিরও দীর্ঘ দিন পরে হলেও সবর এসেই যায়। কাজেই যে সবর ইচ্ছাধীন নয়, তার বিশেষ কোন প্রেত্বেত্ব নেই। এরূপ অনিচ্ছাধীন কাজের আদেশ আল্লাহ্ তা'আলা দেন না। এ জনাই রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন :

الصبر عند المدمة الاولى অর্থাৎ আসল ও ধর্তব্য

সবর তাই যা বিপদের প্রাথমিক পর্যায়ে অবলম্বন করা হয় নতুবা পরবর্তীকালে তো কোন কোন সময় বাধ্যতামূলকভাবে মানুষের মধ্যে সবর এসেই যায়। সুতরাং স্বেচ্ছায় স্বভাব-বিরুদ্ধ বিষয়কে সহ্য করাই প্রশংসনীয় সবর; তা হোক কোন ফরয ও ওয়াজিব পালন করা কিংবা হারাম ও মকরুহ বিষয় থেকে আত্মরক্ষা করা।

এ কারণেই যদি কোন ব্যক্তি চুরির নিয়তে কোন গৃহে প্রবেশ করে, অতঃপর সুযোগ না পেয়ে সবর করে ফিরে আসে, তবে এ অনিচ্ছাধীন সবর কোন প্রশংসনীয় ও সওয়াবের কাজ নয়। সওয়াব তখনই হবে, যখন গোনাহ্ থেকে বেঁচে থাকা আল্লাহ্র ভয়ে ও তাঁর সমুদ্রি লাভ কারণে হয়।

সপ্তম গুণ হচ্ছে : **أَتَا صُوا الصَّلَاةَ**—‘নামায কায়ম করার’ অর্থ পূর্ণ আদব

ও শর্ত এবং বিনয় ও নম্রতা সহকারে নামায আদায় করা—শুধু নামায পড়া নয়। এ জন্যই কোরআনে নামাযের নির্দেশ সাধারণত **قَامَا صَلَاةً** শব্দ সহযোগে দেওয়া হয়েছে।

অষ্টম গুণ হচ্ছে : **وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَا هُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً** অর্থাৎ হারা আলাহ্

প্রদত্ত রিযিক থেকে কিছু আলাহ্‌র নামেও ব্যয় করে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আলাহ্ তা’আলা তোমাদের কাছে চান না ; বরং নিজেরই দেওয়া রিযিকের কিছু অংশ তাও মাত্র শতকরা আড়াই ভাগের মত সামান্যতম পরিমাণ তোমাদের কাছে চান। এটা দেওয়ার ব্যাপারে স্বভাবত তোমাদের ইতস্তত করা উচিত নয়।

অর্থ-সম্পদ আলাহ্‌র পথে ব্যয় করার সাথে **سِرًّا وَعَلَانِيَةً** শব্দ দু’টি যুক্ত

হওয়ান বুঝা যায় যে, সদকা-খয়রাত সর্বত্র গোপনে করাই সুন্নত নয়; বরং মাঝে মাঝে প্রকাশ্যে করাও দুরস্ত ও শুদ্ধ। এ জন্যই আলিমগণ বলেন যে, হাকাত ও ওয়াজিব সদকা প্রকাশ্যে দেওয়াই উত্তম এবং গোপনে দেওয়া সমীচীন নয়—যাতে অন্যরাও শিক্ষা ও উৎসাহ পায়। তবে নফল সদকা-খয়রাত গোপনে দেওয়াই উত্তম। যেসব হাদীসে গোপনে দেওয়ার প্রেরিত্ব বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোতে নফল সদকা সম্পর্কেই বলা হয়েছে।

নবম গুণ হচ্ছে : **يَذَرُونَ بِالذَّلَّةِ السَّيِّئَةِ** অর্থাৎ তারা মন্দকে ভাল

দ্বারা, শত্রু তাকে বন্ধু দ্বারা এবং অন্যায় ও জুলুমকে ক্ষমা ও মার্জনা দ্বারা প্রতিহত করে। মন্দের জওয়াবে মন্দ ব্যবহার করে না। কেউ কেউ এ বাক্যটির এরূপ অর্থ বর্ণনা করেন যে, পাপকে পুণ্য দ্বারা ব্যবহৃত করে। অর্থাৎ কোন সময় কোন গোনাহ্ হয়ে গেলে তারা অধিকতর মফ সহকারে অধিক পরিমাণে ইবাদত করে। ফলে গোনাহ্ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এক হাদীসে রসুলুল্লাহ্ (স.) হযরত মু’আয (রা)-কে বলেন : পাপের পর পুণ্য করে নাও, তাহলে তা পাপকে মিটিয়ে দিবে। অর্থ এই যে, যখন পাপের পর অনুতাপ হয়ে তওবা করবে এবং এর পশ্চাতে পুণ্য কাজ করবে, তখন এ পুণ্য কাজ বিগত গোনাহ্‌কে মিটিয়ে দিবে। অনুতাপ ও তওবা ব্যতীত পাপের পর কোন পুণ্য কাজ করে নেওয়া পাপমুক্তির জন্য যথেষ্ট নয়।

আলাহ্ তা’আলায় আনুগত্যশীলদের নয়টি গুণ বর্ণনা করার পর তাদের প্রতিদান

বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে **وَأُولَئِكَ هُم عِندِي الدَّارُ** শব্দের অর্থ এখানে

دار اخرت অর্থাৎ পরকাল। আয়াতের অর্থ হচ্ছে তাদের জন্যই রয়েছে পর-  
কালের সাফল্য। কেউ কেউ বলেন : এখানে دار বলে دار الدنيا অর্থাৎ ইহকাল  
বুঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই, সৎ লোকেরা যদি দুনিয়াতে কষ্টেরও সম্মুখীন হয় ;  
কিন্তু পরিণামে দুনিয়াতেও সাফল্য তাদেরই প্রাপ্য অংশ হয়ে থাকে।

অতঃপর عقبی الدار অর্থাৎ পরকালের সাফল্য বর্ণিত হয়েছে যে, তা হচ্ছে  
جنت عدن তারা এগুলোতে প্রবেশ করবে। عدن শব্দের অর্থ হচ্ছে অবস্থান  
ও স্থানিক। উদ্দেশ্য এই যে, এসব জালাত থেকে কখনও তাদেরকে বহিষ্কার করা হবে না ;  
বরং এগুলোতে তাদের অবস্থান চিরস্থায়ী হবে। কেউ কেউ বলেন : জালাতের মধ্যস্থলের  
নাম আদন। জালাতের স্থানসমূহের মধ্যে এটা উচ্চস্তরের।

এরপর তাদের জন্য আরও একটি পুরস্কার উল্লেখ করা হয়েছে। তা এই যে, আল্লাহ  
তা'আলার এ নিয়ামত শুধু তাদের ব্যক্তিসত্তা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে না ; বরং তাদের  
বাপদাদা, স্ত্রী ও সন্তানরাও এর অংশ পাবে। শর্ত এই যে, তাদের উপযুক্ত হতে হবে। এর  
ন্যূনতম স্তর হচ্ছে মুসলমান হওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, তাদের বাপদাদা ও স্ত্রীদের নিজস্ব  
আমল যদিও এ স্তরে পৌঁছানোর যোগ্য নয় ; কিন্তু আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের খাতিরে ও বরকতে  
তাদেরকেও এ উচ্চস্তরে পৌঁছিয়ে দেওয়া হবে।

এরপর তাদের আরও একটি পরকালীন সাফল্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, ফেরেশতারা  
তাদেরকে সালাম করতে করতে প্রত্যেক দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে এবং বলবে : সবরের  
কারণে তোমরা যাবতীয় দুখ-কষ্ট থেকে নিরাপত্তা লাভ করেছ। এটা পরকালের কতই  
না উত্তম পরিণাম !

وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ  
اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوَصَّلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ۗ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ  
وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ۗ اللَّهُ يُبْسِطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ  
وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ ۗ  
وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ ۗ قُلْ إِنَّ  
اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَرَادَ ۗ الَّذِينَ آمَنُوا  
وَتَطْمِئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا تَطْمِئِنُّ الْقُلُوبُ ۗ



الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحَسُنَ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِذَلِكَ ۝  
 أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِّتَتْلُوا عَلَيْهِمُ  
 الذِّكْرَ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ  
 إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٌ ۝

(২৫) এবং যারা আল্লাহর অঙ্গীকারকে দৃঢ় ও পাকাপোক্ত করার পর তা উন্ন করে, আল্লাহ্ যে সম্পর্ক বজায় রাখতে আদেশ করেছেন, তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে, ওরা ঐ সমস্ত লোক যাদের জন্য রয়েছে অভিসম্পাত এবং ওদের জন্য রয়েছে কষ্টিন আযাব। (২৬) আল্লাহ্ যার জন্যে ইচ্ছা রাখা প্রস্তুত করেন এবং সংকুচিত করেন। তারা পৃথিবী জীবনের প্রতি মুগ্ধ। পৃথিবী জীবন পরকালের সামনে অতি সামান্য সম্পদ বৈ নয়। (২৭) কাফিররা বলে : তাঁর প্রতি তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে কোন নিদর্শন কেন অবতীর্ণ হল না? বলে দিন, আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পথদ্রষ্ট করেন এবং যে মনোনিবেশ করে, তাকে নিজের দিকে পথপ্রদর্শন করেন। (২৮) যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অন্তর আল্লাহর যিকির দ্বারা শান্তি লাভ করে; জেনে রাখ, আল্লাহর যিকির দ্বারাই অন্তরসমূহ শান্তি পায়। (২৯) যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ এবং মনোরম প্রত্যাবর্তনস্থল। (৩০) এমনভাবে আমি আপনাকে একটি উম্মতের মধ্যে প্রেরণ করেছি। তাদের পূর্বে অনেক উম্মত অতিক্রান্ত হয়েছে। যাতে আপনি তাদেরকে ঐ নির্দেশ গুনিয়ে দেন, যা আমি আপনার কাছে প্রেরণ করেছি। তথাপি তারা দয়াময়কে অঙ্গীকার করে। বলুন : তিনিই আমার পালনকর্তা। তিনি ব্যতীত কারও উপাসনা নাই। আমি তাঁর উপরই ভরসা করেছি এবং তাঁর দিকেই আমার প্রত্যাবর্তন।

### তক্ষসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং যারা আল্লাহর অঙ্গীকারকে পাকাপোক্ত করার পর উন্ন করে, আল্লাহ্ যেসব সম্পর্ক বজায় রাখার আদেশ দিয়েছেন, সেগুলো ছিন্ন করে পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করে, এরূপ লোকদের প্রতি অভিসম্পাত হবে এবং তাদের জন্যেই জগতে মন্দ অবস্থা হবে। (অর্থাৎ বাহ্যিক ধর্মেদ্বর্ষ দেখে এরূপ মনে করা উচিত নয় যে, তারা আল্লাহর রহমত পাচ্ছে। কেননা, ধর্মেদ্বর্ষ তথা ঐশিকের অবস্থা এই যে) আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা অধিক ঐশিক দেন এবং (যার জন্য ইচ্ছা ঐশিক) সংকীর্ণ করে দেন। (রহমত ও গণবের মাপকাঠি এরূপ নয়।) এবং তারা (কাফিররা) পৃথিবী জীবন নিয়ে (এবং এর বিলাস-ব্যসন নিয়ে) হর্ষোৎফুল্ল হয়। (তাদের এরূপ হর্ষোৎফুল্ল হওয়া সম্পূর্ণ নিরর্থক ও ভুল। কেননা) পৃথিবী জীবন (ও এর

বিলাস-ব্যসন) পরকালের মোক্ষবিলাস একটি সামান্য সম্পদ বৈ কিছু নয়। কাফিররা (আপনার নব্বুতে দোষারোপ ও আপত্তি করার উদ্দেশ্যে) বলে : তাঁর (পয়গম্বরের) প্রতি কোন মু'জিয়া (আমরা যা চাই সেরূপ মু'জিয়াসমূহের মধ্য থেকে) তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে কেন অবতীর্ণ করা হল না? আপনি বলে দিন : বাস্তবিকই (তোমাদের এসব বাজে ফরমাইশ থেকে পরিত্কার বুঝা যায় যে) আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা, পথপ্রদর্শন করে দেন। (বোঝা যাওয়ার কারণ এই যে, কোরআনের মত সর্বশ্রেষ্ঠ মু'জিয়াসহ যথেষ্ট মু'জিয়া সম্বন্ধে ও ওরা অনর্থক বায়না ধরে। এতে বোঝা যায় যে, তাদের ভাগ্যেই পথপ্রদর্শিতা লিখিত রয়েছে।) এবং (হঠকারীদের হিদায়তের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ মু'জিয়া কোরআন যথেষ্ট হয়নি এবং তাদের ভাগ্যে পথপ্রদর্শিতা জুটেছে, তেমনি) যে ব্যক্তি আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করে (এবং সত্য পথ অন্বেষণ করে, পরবর্তী **الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ السَّلْج** আয়াতে যার

বাস্তবরূপ ব্যক্ত হয়েছে। তাকে নিজের দিকে পৌঁছার পথ প্রদর্শন করার জন্য) হিদায়ত করে দেন (এবং পথপ্রদর্শিতা থেকে বাঁচিয়ে রাখেন)। তারা ঐ সব লোক, যা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আল্লাহর যিকির দ্বারা (যার বড় অংশ হচ্ছে কোরআন) তাদের অন্তর প্রশান্তি লাভ করে (যার বড় অংশ হচ্ছে ঈমান। অর্থাৎ তারা কোরআনের অঙ্গীকারতাকে নব্বুত প্রমাণের জন্য যথেষ্ট মনে করে এবং আবোল-তাবোল ফরমাইশ করে না। এরপর আল্লাহর যিকির ও ইবাদতে এত আনন্দ যে, কাফিরদের মত পাখিব জীবনে তত আনন্দ হয় না। এবং ভালভাবে জেনে নাও যে, আল্লাহর যিকির (-এর এমনি বৈশিষ্ট্য যে, তা) দ্বারা অন্তর প্রশান্ত হয়ে যায়। (অর্থাৎ যে পর্যায়ের যিকির সেই পর্যায়ের প্রশান্তি লাভ হয়। সেমতে কোরআন দ্বারা ঈমান এবং সৎকর্ম দ্বারা ইবাদতের সাথে নিবিড় সম্পর্ক ও আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ অর্জিত হয়। মোটকথা, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, (যাদের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে) তাদের জন্য (দুনিয়াতে) সুখ-স্বাস্থ্য এবং (পরকালে) উত্তম পরিণতি রয়েছে। এ বিষয়টি অন্য আয়াতে **فَلَنَجْزِيَنَّهُمْ حَيٰوةً طَيِّبَةً**

**وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِحَسَبِ** বলে ব্যক্ত করা হয়েছে।) এমনিভাবে আমি আপনাকে

এমন এক উশ্মতের মধ্যে রসূলরূপে প্রেরণ করেছি যে, এর (অর্থাৎ এ উশ্মতের) পূর্বে আরও অনেক উশ্মত অতিক্রান্ত হয়েছে (এবং আপনাকে এদের প্রতি রসূলরূপে প্রেরণ করার কারণ হলো) যাতে আপনি তাদেরকে ঐ গ্রন্থ পাঠ করে শোনান, যা আমি আপনার কাছে ওহীর মাধ্যমে প্রেরণ করেছি এবং (এই বিরাট নিয়ামতের কদর করা এবং মু'জিয়া-রূপী এ গ্রন্থের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা তাদের উচিত ছিল; কিন্তু) তারা পরম দয়ালুদের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করে (এবং কোরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না।) আপনি বলে দিন : (তোমাদের বিশ্বাস স্থাপন না করার কারণে আমার কোন ক্ষতি নেই। কেননা তোমরা অধিকতরভাবে আমার বিরুদ্ধাচরণ করবে। এ জন্য আমি ভীত নই। কারণ) তিনিই আমার পালনকর্তা (ও রক্ষক।) তিনি ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই। (অতএব

নিশ্চয়ই তিনি পূর্ণ গুণসম্পন্ন হবেন এবং হিফাযতের জন্যে যথেষ্ট হবেন। তাই) আমি তাঁর উপরই ভরসা করেছি এবং তাঁর কাছেই আমাকে যেতে হবে। (মোট কথা এই যে, আমার হিফাযতের জন্যে তো আল্লাহ্ তা'আলাই যথেষ্ট। তোমরা আমার বিরুদ্ধাচরণ করে কিছুই করতে পারবে না। তবে এতে তোমাদেরই ক্ষতি হবে।)

### জানুয়ারিক জাতব্য বিষয়

রুকু'র শুরুতে সমগ্র মানবজাতিকে দু'শ্রেণীতে বিভক্ত করে বলা হয়েছিল যে, তাদের একদল আল্লাহ্ তা'আলার অনুগত ও একদল অবাধ্য। অতঃপর অনুগত বান্দাদের কতিপয় গুণ ও আলামত বর্ণিত হয়েছে এবং পরকালে তাদের জন্যে সর্বোত্তম প্রতিদানের কথা উল্লেখিত হয়েছে।

এখন আলোচ্য আয়াতসমূহে দ্বিতীয় প্রকার লোকদের আলামত ও গুণাবলী এবং তাদের শাস্তির কথা বর্ণিত হচ্ছে। এতে অবাধ্য বান্দাদের একটি স্রষ্টাব বর্ণনা করে বলা হয়েছে :

أَلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ

তা'আলার অঙ্গীকারকে পাকাপোক্ত করার পর ভঙ্গ করে। আল্লাহ্ তা'আলার অঙ্গীকারের মধ্যে সেই অঙ্গীকারও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা সৃষ্টির সূচনাকালে আল্লাহ্‌র পালনকর্তৃত্ব ও একত্ব সম্পর্কে সব আত্মার কাছ থেকে নেওয়া হয়েছিল। কাফির ও মুশরিকরা দুনিয়াতে এসে সেই অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে এবং আল্লাহ্‌র মোকাবিলায় শত শত পালনকর্তা ও উপাস্য তৈরী করেছে।

এছাড়া এসব অঙ্গীকারও এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যেগুলো পালন করা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' চুক্তির অধীনে মানুষের জন্য অপরিহার্য হয়ে যায়। কারণ, কালিমায়ে তাইয়্যেবা, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্' প্রকৃতপক্ষে একটি মহান চুক্তির শিরোনাম। এর অধীনে আল্লাহ্ ও রসূলের বর্ণিত বিধি-বিধান পালন এবং নিষিদ্ধ বিষয়াদি থেকে বিরত থাকার অঙ্গীকারও এসে যায়। তাই কোন মানুষ যখন আল্লাহ্ অথবা রসূলের কোন আদেশ অমান্য করে, তখন সে ঈমানের চুক্তিই লঙ্ঘন করে।

অবাধ্য বান্দাদের দ্বিতীয় স্রষ্টাব এরূপ বর্ণিত হয়েছে :

وَيَقْتُلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوَصَّلَ

যেগুলো বজায় রাখতে আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ্ ও রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাথে মানুষের যে সম্পর্ক, এখানে সেই সম্পর্কও বুঝানো হয়েছে। তাঁদের প্রদত্ত বিধি-বিধান অমান্য করাই হচ্ছে এ সম্পর্ক ছিন্ন করার অর্থ। এছাড়া আত্মীয়তার সম্পর্কও আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। কোরআন পাকের স্থানে স্থানে এসব সম্পর্ক বজায় রাখা ও এগুলোর হক আদায় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলার নাফরমান বান্দারা এসব হক ও সম্পর্কও ছিন্ন করে। উদাহরণত

পিতামাতা, ভাই-বোন, প্রতিবেশী ও অন্যান্য আত্মীয়ের যেসব অধিকার আল্লাহ তা'আলা ও তদীয় রসূল মানুষের উপর আরোপ করেছেন, তারা এগুলো আদায় করে না।

তৃতীয় স্বভাব এই: وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ—অর্থাৎ তারা পৃথিবীতে

ফাসাদ সৃষ্টি করে। এ তৃতীয় স্বভাবটি প্রকৃতপক্ষে প্রথমোক্ত দু'স্বভাবেরই ফলশ্রুতি। যারা আল্লাহ তা'আলা ও মানুষের অস্বীকারের পরওয়া করে না এবং কাল ও অধিকার ও সম্পর্কের প্রতি লক্ষ্য করে না, তাদের কর্মকাণ্ডে অপরাপর লোকদের ক্ষতি ও কল্লেটর কারণ হবে, তা বলাই বাহুল্য। ঝগড়া-বিবাদ ও মারামারি কাটাকাটির বাজার গরম হবে। এটাই পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ফাসাদ।

অবাধ্য বাস্দের এই তিনটি স্বভাব বর্ণনা করার পর তাদের শাস্তি উল্লেখ করে বলা হয়েছে :

أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْعَذَابُ وَلَهُمْ فِي الدَّارِ

আবাস রয়েছে। জা'নতের অর্থ আল্লাহর রহমত থেকে দূরে থাকা এবং বঞ্চিত হওয়া। বলা বাহুল্য, আল্লাহর রহমত থেকে দূরে থাকাই সর্বাপেক্ষা বড় আঘাব এবং সব বিপদের বড় বিপদ।

বিধান ও নির্দেশ : আলোচ্য আয়াতসমূহের মধ্যে মানবজীবনের বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কিত বিশেষ বিশেষ বিধান ও নির্দেশ পাওয়া যায়—কিছু স্পষ্টত এবং কিছু ইঙ্গিতে। উদাহরণত উল্লেখ :

(১) الَّذِينَ يُؤْفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ لَا يُنْفِقُونَ أَلَمْ يَتْلَقُوا

হয় যে, কণর ও সাথে কোন চুক্তি করা হলে তা পালন করা ফরয এবং লগঘন করা হারাম; চুক্তিটি আল্লাহ ও রসূলের সাথে হোক, যেমন ঈমানের চুক্তি; কিংবা সৃষ্টিজগতের মধ্যে কোন মুসলমান অথবা কাফিরের সাথে হোক—চুক্তি লগঘন করা সর্বাবস্থায় হারাম।

وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ

ইসলাম বৈরাগ্য গ্রহণ করত জাগতিক চাহিদা ও বিষয়াদি ত্যাগ করা শিক্ষা দেয় না; বরং সম্প্রদায়ের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা এবং তাদের প্রাপ্য অধিকার প্রদান করাকে ইসলামে অপরিহার্য সাব্যস্ত করা হয়েছে। পিতামাতার অধিকার, সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী ও ভাই-বোনদের অধিকার এবং অন্যান্য আত্মীয় ও প্রতিবেশীদের অধিকার পূরণ করা আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মানুষের জন্য অপরিহার্য করেছেন। এগুলোর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে নফল ইবাদত অথবা কোন ধর্মীয় কাজে আত্মনিয়োগ করাও জায়েয নয়। এমতাবস্থায় অন্য কাজে গেলে এগুলো ভুলে যাওয়া কিরূপে জায়েয হবে?

কোরআন পাকের অসংখ্য আয়াতে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা, আত্মীয়দেরকে দেখা-শোনা করা এবং তাদের অধিকার প্রদান করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

বুখারী ও মুসলিমে হযরত আনাস (রা)-এর রেওয়াজেতে রসূলুল্লাহ (সা)-র উক্তি বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে রিযিকের প্রশস্ততা ও কাজে-কর্মে বরকত কামনা করে, তার উচিত আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা। আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার অর্থ আত্মীয়দের দেখা-শোনা করা এবং সাখানুযায়ী তাদের সাহায্য-সহায়তা করা।

হযরত আবু আইউব আনসারী (রা) বলেন : জনৈক বেদুঈন রসূলুল্লাহ (সা)-র গৃহে উপস্থিত হয়ে প্রশ্ন করল : আমাকে বলুন, ঐ আমল কোনটি যা আমাকে জাহান্নামের নিকটবর্তী করবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে ঠেলে দিবে? রসূলুল্লাহ (সা) বললেন : আল্লাহ তা'আলার ইবাদত কর; তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার করো না, নামায কামে'ম কর, যাকাত দাও এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখ।--( বগতী )

সহীহ বুখারীতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা)-এর রেওয়াজেতে রসূলুল্লাহ (সা)-র উক্তি বর্ণিত আছে যে, আত্মীয়-স্বজনের অনুগ্রহের বিনিময়ে অনুগ্রহ করাকেই আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা বলে না; বরং কোন আত্মীয় যদি তোমার অধিকার প্রদানে হুঁটি করে, তোমার সাথে সম্পর্ক না রাখে; এরপরও শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তার সাথে সম্পর্ক রাখা এবং তার প্রতি অনুগ্রহ করাই হচ্ছে প্রকৃত আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা।

আত্মীয়দের অধিকার প্রদান করা এবং তাদের সম্পর্ক শেষ পর্যন্ত বজায় রাখার উদ্দেশ্যেই রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : নিজেদের বংশ-ভালিকা সংরক্ষিত রাখ। এর মাধ্যমেই আত্মীয়তা সংরক্ষিত থাকতে পারবে এবং তোমরা তাদের অধিকার প্রদান করতে পারবে। তিনি আরও বলেছেন : সম্পর্ক বজায় রাখার উপকারিতা এই যে, এতে পারস্পরিক ভাল-বাসা সৃষ্টি হয়, ধন-সম্পদ রক্ষি পায় এবং আয়ুতে বরকত হয়। --( তিরমিযী )

সহীহ মুসলিমের এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন : আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে এটা প্রধান যে, পিতার মৃত্যুর পর পিতার বন্ধুদের সাথে তেমনি সম্পর্ক বজায় রাখবে, যেমন তাঁর জীবদ্দশায় রাখা হত।

(৩) **وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ** --- কোরআন ও হাদীসে সবারের

অনেক ফযিলত বর্ণিত হয়েছে। উদাহরণত সবারকারী আল্লাহ তা'আলার সঙ্গ ও সাহায্য লাভ করে এবং অগণন সওয়াব ও পুরস্কার পায়। উপরোক্ত আয়াত থেকে জানা যায় যে, এসব ফযিলত তখনই লাভ হয় যখন আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে সবার এখ-তিয়ার করা হয়।

সবারের আসল অর্থ মনকে বশে রাখা এবং দৃঢ় থাকা। এর আবার শ্রেণীভেদ আছে। এক. কষ্ট ও বিগদে সবার অর্থাৎ অস্থির ও নিরাশ না হওয়া এবং আল্লাহর দিকে দৃষ্টি রেখে আশাবাদী হওয়া। দুই. ইবাদতে সবার অর্থাৎ আল্লাহর বিধানাবলী পালন করা

কঠিন মনে হলেও তাতে অটল থাকা। তিন. গোনাহ্ ও মন্দ কাজ থেকে সবার অর্থাৎ মন মন্দ কাজের দিকে ধাবিত হতে চাইলেও আল্লাহর ভয়ে সেদিকে ধাবিত না হওয়া।

(৪) وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً

আল্লাহর পথে গোপন ও প্রকাশ্যে উভয় প্রকারে ব্যয় করা দুরস্ত। তবে ওয়াজিব সদকা যেমন মাস্কাত, ফিতরা ইত্যাদি প্রকাশ্যে দেওয়া উত্তম—যাতে অন্য মুসলমানগণ তা দিতে উৎসাহিত হয়। পক্ষান্তরে নফল দান-খয়রাত গোপনে প্রদান করা উচিত, যাতে রিয়া ও নামযশের সন্দেহ থেকে মুক্ত থাকা যায়।

(৫) يَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ — প্রত্যেক মন্দকে প্রতিহত করা একটি

যুক্তিগত ও স্বভাবগত দাবী। এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, মন্দ দ্বারা মন্দকে প্রতিহত করা ইসলামের নীতি নয়। বরং ইসলামের শিক্ষা এই যে, মন্দকে ভাল দ্বারা প্রতিহত কর। কেউ তোমার উপর জুলুম করলে তুমি তার সাথে ন্যায্যনুগ আচরণ কর। যে তোমার সম্পর্কের হক প্রদান করেনি, তুমি তার হক প্রদান কর। কেউ রাগ করলে তুমি তার জওয়াব সহনশীলতার মাধ্যমে দাও। এর অনির্বায পরিণতি হবে এই যে, শত্রু ও মিত্রে পরিণত হবে এবং দুশ্টিও তোমার সামনে শিষ্ট হয়ে যাবে।

এ বাক্যের আরও একটি অর্থ এই যে, ইবাদত দ্বারা পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর। যদি কোন সময় কোন গোনাহ্ হয়ে যায়, তবে অনতিবিলম্বে তওবা কর এবং এরপর আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে মনোনিবেশ কর। এতে তোমার বিগত গোনাহ্ও মাফ হয়ে যাবে।

হযরত আবুযর গিফারীর রেওয়াজেতে রসুলুল্লাহ (স)-র উক্তি বর্ণিত আছে যে, তোমার দ্বারা যখন কোন মন্দ কাজ অথবা গোনাহ্ হয়ে যায়, তখন সাথে সাথে কোন সৎকাজ করে নাও। এতে গোনাহ্ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।—( আহমদ, মায়হারী ) শর্ত এই যে, বিগত গোনাহ্ থেকে তওবা করে সৎকাজ করতে হবে।

جَنَّتْ مَدِينٌ يَدْخُلُونَهَا وَمِنْ صَلَاحٍ مِنْ آبَائِهِمْ وَازْوَاٰجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ

—এর উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ নিজেরা তো জাম্মাতে স্থান পাবেই, তাদের খাতিরে তাদের পিতামাতা, স্ত্রী ও সন্তানরাও স্থান পাবে। শর্ত এই যে, তাদেরকে যোগ্য অর্থাৎ মু'মিন-মুসলমান হতে হবে—কাফির হলে চলবে না। তাদের সৎকর্ম আল্লাহর প্রিয় বান্দার সমান না হলেও আল্লাহ তা'আলা তার বরকতে তাদেরকেও জাম্মাতে তার স্থানে পৌঁছিয়ে দেবেন। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে :  
أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ — অর্থাৎ আমি সৎ

বান্দাদের বংশধর ও সন্তান-সন্ততিকেও তাদের সাথে মিলিত করে দেব।

এতে জানা যায় যে, বৃষুর্গদের সাথে বংশ আত্মীয়তা অথবা বন্ধুত্বের সম্পর্ক থাকা পরকালে ঈমানের শর্তসহ উপকারী হবে।

---থেকে জানা যায় **سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَحَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ** (৬)

যে, পরকালীন মুক্তি, উচ্চ মর্তবা ইত্যাদি সব দুনিয়াতে সবার করার ফলশ্রুতি। অর্থাৎ দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর বান্দাদের হক আদায় করতে হবে এবং আল্লাহর অবাধ্য থেকে বেঁচে থাকার জন্য মনকে বাধ্য করতে হবে।

**أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ** ---পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে

যেমন অনুগত বান্দাদের প্রতিদান উল্লেখ করে বলা হয়েছিল যে, তাদের স্থান হবে জান্নাতে, ফেরেশতারা তাদেরকে সালাম করে বলবে যে, এসব নিয়ামত তোমাদের সবার ও আনুগত্যের ফলশ্রুতি; তেমনিভাবে এ আয়াতে অবাধ্যদের অশুভ পরিণতি বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, তাদের উপর আল্লাহর লা'নত অর্থাৎ তারা আল্লাহর রহমত থেকে দূরে এবং তাদের জন্য জাহান্নামের আবাস অবধারিত। এতে বোঝা যায় যে, অস্বীকার ভঙ্গ করা এবং আশ্বী-স্বজনদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা অভিসম্পাত ও জাহান্নামের কারণ। **نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهُ**

وَلَوْ أَنَّ قُرَآناً سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ  
 كَلِمَ بِهِ الْمَوْتُ ۚ بَلْ لَلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا ۗ أَفَلَمْ يَأْتِ الْذِينَ آمَنُوا  
 أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهْدَى النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ  
 كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ  
 حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْبِعَادَ ۗ وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْ  
 بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمَلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتَهُمْ ۗ فَكَيْفَ كَانَ  
 عِقَابِ ۗ أَفَمَن هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ۗ وَجَعَلُوا لِلَّهِ  
 شُرَكَاءَ ۗ قُلْ سَوْهُمْ ۗ أَمْ تُشَبِّهُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ  
 أَمْ بظَاهِرٍ مِّن الْقَوْلِ ۗ بَلْ زَيْنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرَهُمْ وَصُدُّوا  
 عَنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۗ

(৩১) যদি কোন কোরআন এমন হত, যার সাহায্যে পাহাড় চলমান হয় অথবা ঘনীন খণ্ডিত হয় অথবা মৃতরা কথা বলে, তবে কি হত? বরং সব কাজ তো আল্লাহর হাতে। ঈমানদাররা কি এ ব্যাপারে নিশ্চিত নয় যে, যদি আল্লাহ্ চাইতেন, তবে সব মানুষকে সৎপথে পরিচালিত করতেন? কাফিররা তাদের কৃতকর্মের কারণে সবসময় আঘাত পেতে থাকবে অথবা তাদের গৃহের নিকটবর্তী স্থানে আঘাত নেমে আসবে, যে পর্যন্ত আল্লাহর ওয়াদা না আসে। নিশ্চয় আল্লাহ্ ওয়াদা খেলাপ করেন না। (৩২) আগনার পূর্ব কত রসুলের সাথে ঠাট্টা করা হয়েছে। অতঃপর আমি কাফিরদেরকে কিছু অবকাশ দিয়েছি, এরপর তাদেরকে পাকড়াও করেছি। অতএব কেমন ছিল আমার শক্তি! (৩৩) ওরা প্রত্যেকেই কি মাথার উপর স্ব স্ব কৃতকর্ম নিয়ে দণ্ডায়মান নয়? এবং তারা আল্লাহর জন্য অংশীদার সাব্যস্ত করে! বলুন; নাম বল অথবা খবর দাও পৃথিবীর এমন কিছু জিনিস সম্পর্কে যা তিনি জানেন না? অথবা অসার কথাবার্তা বলছে? বরং সুশোভিত করা হয়েছে কাফিরদের জন্য তাদের প্রভারণাকে এবং তাদেরকে সৎপথে থেকে বাধা দান করা হয়েছে। আল্লাহ্ যাকে পথদ্রষ্ট করেন তার কোন পথপ্রদর্শক নেই।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং (হে পয়গম্বর এবং হে মুসলমানগণ, কাফিরদের একগুঁয়েমির অবস্থা এই যে, কোরআন যে মু'জিযা তা চিন্তা-ভাবনার উপর নির্ভরশীল। বর্তমান এই অবস্থায় কোরআনের পরিবর্তে) যদি কোন কোরআন এমন হত, যার সাহায্যে পাহাড় (স্ব স্থান থেকে) হটিয়ে দেওয়া হত অথবা তার সাহায্যে ভূপৃষ্ঠে শূন্য অতিক্রম করা যেত অথবা তার সাহায্যে মৃতদের সাথে কাউকে আলাপ করিয়ে দেয়া যেত (অর্থাৎ মৃত জীবিত হয়ে যেত এবং কেউ তার সাথে আলাপ করে নিত। কাফিররা প্রায়ই এসব মু'জিযার ফরমায়েশ করত; কেউ সাধারণভাবেই এবং কেউ এভাবে যে, কোরআনকে বর্তমান অবস্থায় আমরা মু'জিযা বলে স্বীকার করি না। তবে যদি কোরআন দ্বারা এসব অলৌকিক ঘটনাবলী প্রকাশ পায়, তবেই আমরা একে মু'জিযা বলে মেনে নেব। উদ্দেশ্য এই যে, কোরআন দ্বারা এমন সব মু'জিযাও প্রকাশ পেত, যাতে উভয় প্রকার লোকদের ফরমায়েশ পূর্ণ হয়ে যেত অর্থাৎ যারা শুধু উল্লিখিত অলৌকিক ঘটনাবলী দাবী করত এবং যারা কোরআনের সাহায্যে এগুলোর প্রকাশ চাইত)। তবুও তারা বিশ্বাস স্থাপন করত না। (কেননা, এসব কারণ সত্যিকার ক্রিয়াশীল নয়) এবং সমগ্র ক্ষমতা আল্লাহ্ তা'আলারই। (তিনি মাকে তওফীক দেন, সে-ই ঈমান আনয়ন করে। তাঁর রীতি এই যে, তিনি জনবকারীকে তওফীক দেন এবং একগুঁয়েকে বঞ্চিত রাখেন। কোন কোন মুসলমান মনে মনে কামনা করত যে, এসব মু'জিযা প্রকাশিত হয়ে গেলে সম্ভবত তারা ঈমান আনয়ন করবে। অতঃপর এই প্রেক্ষিতে তাদেরকে জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে) বিশ্বাসীদের কি (এ কথা শুনে যে, এরা একগুঁয়ে, সূতরাং বিশ্বাস স্থাপন করবে না, সব ক্ষমতা তো আল্লাহ্ তা'আলারই এবং সব কারণ সত্যিকারভাবে ক্রিয়াশীল নয়---) এ বিষয়ে মনস্তপ্তি হয় না যে, আল্লাহ্ যদি চাইতেন, তবে (সারা বিশ্বের) সব মানুষকে হিদায়ত করে দিতেন? (কিন্তু কোন কোন



রহস্যের কারণে তিনি এরূপ চান না। অতএব সব মানুষ ঈমান আনবে না। এর বড় কারণ হঠকান্তিতা। এমতাবস্থায় হঠকান্তীদের ঈমানের চিন্তায় কেন পড়ে আছেন?) এবং (যখন ঠিক হয়ে গেল যে, এরা বিশ্বাস স্থাপন করবে না, তখন এরূপ ধারণা হতে পারে যে, তবে তাদের কেন শক্তি দেওয়া হয় না? এ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, মক্কার) কাফিররা তো সর্বদাই (প্রায়ই) এ অবস্থায় থাকে যে, তাদের (কু) কীর্তির কারণে তাদের উপর কোন না কোন দুবিপাক আসতে থাকে (কোথাও হত্যা; কোথাও বন্দীত্ব এবং কোথাও পরাজয় ও বিপর্যয়) অথবা কোন কোন দুবিপাক (তাদের উপর না আসলেও) তাদের জন-পদের নিকটবর্তী স্থানে নাথিল হতে থাকে (উদাহরণত কোন সম্প্রদায়ের উপর বিপদ আসল। এতে শংকিত হল যে, আমাদের উপরও বিপদ না এসে যায়)। এমনকি, (এমতাবস্থায়ই) আল্লাহ্‌র ওয়াদা এসে যাবে। (অর্থাৎ তারা পরকালীন আযাবের সম্মুখীন হয়ে যাবে, যা মৃত্যুর পর শুরু হয়ে যাবে। এবং) নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ ওয়াদার খেলাফ করেন না। (অতএব আশাব যে তাদের উপর পড়বে, তা নিশ্চিত, যদিও মাঝে মাঝে কিছু দেরী হতে পারে।) এবং (তারা আপনার সাথেই বিশেষভাবে মিথ্যারোপ ও ঠাট্টা-বিদ্ৰূপের আচরণ করে না, এমনিভাবে আযাবে বিলম্ব হওয়াও বিশেষভাবে তাদের বেলায় নয়; বরং পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণ ও তাঁদের কওমের বেলায় এরূপ হয়েছে। সেমতে) আপনার পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের সাথে (কাফিরদের পক্ষ থেকে) ঠাট্টা-বিদ্ৰূপ হয়েছে। অতঃপর আমি কাফিরদেরকে কিছু অবকাশ দিয়েছি। অতঃপর আমি তাদের পাকড়াও করেছি। অতএব (চিন্তার বিষয় যে) আমার আযাব কিরূপ ছিল! (অর্থাৎ খুবই কঠোর ছিল। যখন জানা গেল যে, আল্লাহ্‌ই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তখন তা জানা ও প্রমাণিত হওয়ার পরও) যে (আল্লাহ্‌) প্রত্যেক ব্যক্তির কাজকর্ম সম্পর্কে জ্ঞাত, সে এবং তাদের শরীকরা সমান হতে পারে কি? এবং (এতদসত্ত্বেও) তারা আল্লাহ্‌র জন্য অংশীদার স্থির করেছে। আপনি বলুন: তাদের (অর্থাৎ শরীকদের) নাম তো বল, (যাতে আমিও শুনি, তারা কে এবং কেমন?) তোমরা কি (তাদেরকে সত্যিকার শরীক মনে করে দাবী কর? তাহলে তো বোঝা যায় যে,) আল্লাহ্‌ তা'আলাকে এমন বিষয়ের খবর দিচ্ছ যে, (সারা) দুনিয়ায় তার (অস্তিত্বের) খবর আল্লাহ্‌ তা'আলাই জানা ছিল না। (কেননা আল্লাহ্‌ তা'আলা ঐ বস্তুকেই অস্তিত্বশীল জানেন, বাস্তবে যার অস্তিত্ব আছে এবং অনস্তিত্বশীলকে তিনি অস্তিত্বশীল জানেন না। কেননা, তাতে জ্ঞানের ভ্রান্তি অবশ্যস্বাভাবী হয়ে পড়ে; যদিও প্রকাশ উভয়টির সমান। ছোটকথা, তাদেরকে সত্যিকার শরীক বললে এ অসম্ভব বিষয়টি জরুরী হয়ে যায়। কাজেই তাদের শরীক হওয়াই অসম্ভব। অথবা (তাদেরকে সত্যিকার শরীক বল না; বরং) শুধু বাহ্যিক ভাষার দিক দিয়ে শরীক বল (বাস্তবে এর কোন প্রতীক নেই। তাহলে তারা যে শরীক নয়— একথা তোমরা নিজেরাই স্বীকার করছ। সুতরাং তারা যে শরীক নয়— একথা উভয় অবস্থা-তেই প্রমাণিত হয়ে গেল। প্রথম অবস্থায় মুক্তির মাধ্যমে এবং দ্বিতীয় অবস্থায় তোমাদের স্বীকৃতির মাধ্যমে। এ বস্তুবাটি যদিও উচ্চতম পর্যায়ে যথেষ্ট, কিন্তু তারা তা মানবে না)। বরং কাফিরদের কাছে তাদের বিভ্রান্তিকর কথাবার্তা (যার ভিত্তিতে তারা শিল্পকে লিপ্ত আছে) সুন্দর মনে হয় এবং (এ কারণেই) তারা (সৎ) পথ থেকে বঞ্চিত হয়ে গেছে এবং

( আসল কথা তাই, যা পূর্ববর্ণিত **بِئْسَ الْاٰمِرُ** বাক্য থেকে জানা গেছে।

অর্থাৎ) যাকে আল্লাহ তা'আলা পথভ্রষ্টতায় রাখেন, তাকে পথে আনার কেউ নেই। ( তবে তিনি তাকেই পথভ্রষ্ট রাখেন, যে সত্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠার পরও একান্ত নিমিত্ত করে )।

### আনুশঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

মক্কার মুশরিকদের সামনে ইসলামের সত্যতার প্রমাণাদি এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সত্য রসূল হওয়ার নিদর্শনাবলী তাঁর জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং বিস্ময়কর মু'জিযার মাধ্যমে দিবালোকের মত ফুটে উঠেছিল। তাদের সর্দার আবু জাহ্ল বলে দিয়েছিল যে, বনু হাশিমের সাথে আমাদের পারিবারিক প্রতিযোগিতা বিদ্যমান। আমরা তাদের এ শ্রেষ্ঠত্ব কিরাপে স্বীকার করতে পারি যে, আল্লাহ্ র রসূল তাদের মধ্য থেকে আগমন করেছেন? তাই তিনি যাই বলুন না কেন এবং যত নিদর্শনই প্রদর্শন করুন না কেন, আমরা কোন অবস্থাতেই তাকে বিশ্বাস করব না। এজন্যই সে বাজে ধরনের জিজ্ঞাসাবাদ ও অবাস্তর ফরমায়েশের মাধ্যমে সর্বত্র এ হঠকারিতা প্রকাশ করত। আলোচ্য আয়াতসমূহও আবু জাহ্ল ও তার সাঙ্গোপাঙ্গদের এক প্রশ্নের উত্তরে নাথিল হয়েছে।

তফসীর বগভীতে আছে, একদিন মক্কার মুশরিকরা পবিত্র কাবা প্রাঙ্গণে এক সভায় মিলিত হল। তাদের মধ্যে আবু জাহ্ল ও আবদুল্লাহ্ ইবনে উমাইয়্যার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তারা আবদুল্লাহ্ ইবনে উমাইয়্যাকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে প্রেরণ করল। সে বললঃ আপনি যদি চান যে, আমরা আপনাকে রসূল বলে স্বীকার করে নেই এবং আপনার অনুসরণ করি, তবে আমাদের কতগুলো দাবী আছে এগুলো কোরআনের মাধ্যমে পূরণ করে দিলে আমরা সবাই মুসলমান হয়ে যাব।

তাদের একটি দাবী ছিল এই যে, মক্কা শহরটি খুবই সংকীর্ণ। চতুর্দিক থেকে পাহাড়ে ঘেরা উচ্চভূমি, যাতে না চাষাবাদের সুযোগ আছে এবং না বাগবাগিচা ও অন্যান্য প্রয়োজন পূরণের অবকাশ আছে। আপনি মু'জিযার সাহায্যে পাহাড়গুলোকে দূরে সরিয়ে দিন—যাতে মক্কার জমিন প্রশস্ত হয়ে যায়। আপনিই তো বলেন যে, দাউদ (আ)-এর জন্য পাহাড়ও সাথে সাথে তসবীহ পাঠ করত। আপনার কথা অনুযায়ী আপনি তো আল্লাহ্ র কাছে দাউদের চাইতে খাটো নন।

দ্বিতীয় দাবী ছিল এই যে, আপনার কথা অনুযায়ী সুলায়মান (আ)-এর জন্য যেকোন বায়ুকে আজ্ঞাবহ করে পথের বিরাট বিরাট দূরত্বকে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছিল, আপনিও আমাদের জন্য তদ্রূপ করে দিন—যাতে সিল্লিমা ইয়ামানের সফর আমাদের জন্য সহজ হয়ে যায়।

তৃতীয় দাবী ছিল এই যে, ঈসা (আ) মৃতদেরকে জীবিত করতেন। আপনি তাঁর চাইতে কোন অংশে কম নন। আপনিও আমাদের জন্য আমাদের দাদা কুসাইকে জীবিত করে দিন—যাতে আমরা তাকে জিজ্ঞেসা করি যে, আপনার ধর্ম সত্য কি না। (মায়হারী, বগভী, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে মরদুওয়াইহ্ )

আলোচ্য আয়াতসমূহে এসব হঠকারিতাপূর্ণ দাবীর উত্তরে বলা হয়েছে :

وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كَلِمَةٌ بِهِ  
الْمَوْتَى بَلَّ اللَّهُ الْأَمْرَ جَمِيعًا -

এখানে **تَسِيرُ جِبَالٍ** বলে পাহাড়গুলোকে স্বস্থান থেকে হটানো, **قُطِعَتْ**

**كَلِمَةٍ** বলে সংক্ষিপ্ত সময়ে লম্বা দূরত্ব অতিক্রম করা এবং **الْمَوْتَى**

বলে মৃতদেরকে জীবিত করে কথা বলা বোঝানো হয়েছে। **لو حرف شرط** -এর

জওয়ার স্থানের ইঙ্গিতে উহা রয়েছে ; অর্থাৎ **لَمَّا آمَنُوا** যেমন কোরআনের অন্য

এক জায়গায় এমনি বিষয়বস্তু এবং তার এরূপ জওয়াবই উল্লেখ করা হয়েছে :

وَلَوْ أَنزَلْنَا نَزْلًا لَّيَوْمَ الْأَمَلِ تَكْفًا وَلَكُلَّمِ مَوْتَى وَحَشْرْنَا عَلَيْهِمْ  
كُلَّ شَيْءٍ قَهْلًا مَا كَانُوا لِيَوْمِئِذٍ مِّنْزُورًا

অর্থ এই যে, যদি কোরআনের সাহায্যে তাদের এসব দাবী পূরণ করে দেওয়া হয়, তবুও তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না। কেননা, তারা এসব দাবীর পূর্বে এমন এমন মু'জিযা প্রত্যক্ষ করেছে, যেগুলো তাদের প্রার্থিত মু'জিযার চাইতে অনেক উর্ধ্বে ছিল। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ইশারায় চন্দ্রের দ্বিখণ্ডিত হওয়া পাহাড়ের স্বস্থান থেকে সরে যাওয়া এবং বায়ুকে আক্রমণ করার চাইতে অনেক বেশী বিম্বয়কর। এমনিভাবে তাঁর হাতে নিষ্পন্ন কংকরের কথা বলা এবং তসবীহ পাঠ করা কোন মৃত ব্যক্তির জীবিত হয়ে কথা বলার চাইতে অধিক-তর বিরাট মু'জিযা। শবে মি'রাজে মসজিদে আকসা, অতঃপর সেখানে থেকে নভোমণ্ডলের সফর এবং সংক্ষিপ্ত সময়ে প্রত্যাবর্তন, বায়ুকে বশ করা সূন্নাহমানী তখতের আলৌকিকতার চাইতে অনেক মহান। কিন্তু জালিমরা এগুলো দেখার পরও বিশ্বাস স্থাপন করেনি। অতএব এসব দাবীর পেছনেও তাদের নিয়ত যে টালবাহানা করা—কিছু মেনে নেওয়া ও করা নয়, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। মুশরিকদের এ সব দাবীর লক্ষ্য এটাই ছিল যে, তাদের দাবী পূরণ না করা হলে তারা বলবে : (নাউমুল্লাহ্) আল্লাহ্ তা'আলাই এ সব কাজ করার শক্তি রাখেন না, অথবা রসূলের কথা আল্লাহ্‌র কাছে প্রবণযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য নয়। এতে বোঝা যায়

যে, তিনি আল্লাহ্‌র রসূল নন। তাই অতঃপর বলা হয়েছে :

بَلَّ اللَّهُ الْأَمْرَ جَمِيعًا

অর্থাৎ ক্ষমতা সবটুকু আল্লাহ্ তা'আলারই। উদ্দেশ্য এই যে, উল্লিখিত দাবীগুলো পূরণ না করার কারণ এই নয় যে, এগুলো আল্লাহর শক্তি বহির্ভূত; বরং বাস্তব সত্য এই যে, জগতের মঙ্গলামঙ্গল একমাত্র তিনিই জানেন। তিনি স্বীয় রহস্যের কারণে এ সব দাবী পূর্ণ করা উপযুক্ত মনে করেন নি। কারণ, দাবী উত্থাপনকারীদের হঠকারিতা ও বদনিয়ত তাঁর জানা আছে। তিনি জানেন যে, এসব দাবী পূরণ করা হলেও তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না।

أَفَلَمْ يَأْتِيَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهْدَىٰ النَّاسَ جَمِيعًا

ইমাম বগভী বর্ণনা করেন, সাহাবায়ে কিরাম মুশরিকদের এসব দাবী শুনে কামনা করতে থাকেন যে, মু'জিযা হিসেবে দাবীগুলো পূরণ করে দিলে ভালই হয়। মক্কার সবাই মুসলমান হয়ে যাবে এবং ইসলাম শক্তিশালী হবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। অর্থ এই যে, মুসলমানরা মুশরিকদের ছলচাতুরী ও হঠকারিতা দেখা ও জানা সত্ত্বেও কি এখন পর্যন্ত তাদের ঈমানের ব্যাপারে নিরাশ হয়নি যে, এমন কামনা করতে শুরু করেছে? অথচ তারা জানে যে, আল্লাহ্ তা'আলা ইচ্ছা করলে সব মানুষকে এমন হিদায়েত দিতে পারেন যে, মুসলমান হওয়া ছাড়া তাদের গত্যন্তর থাকবে না। কিন্তু সবাইকে ইসলাম ও ঈমানে বাধ্য করা আল্লাহর রহস্যের অনুকূলে নয়; আল্লাহর রহস্য এটাই যে, প্রত্যেকের নিজস্ব ক্ষমতা অটুট থাকুক এবং এ ক্ষমতাবলে ইসলাম গ্রহণ করুক অথবা কুফল অবলম্বন করুক।

وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ

—হযরত ইবনে আক্বাস (রা) বলেন **قَارِعَةٌ** শব্দের অর্থ আপদ-বিপদ। আয়াতের

অর্থ এই যে, মুশরিকদের দাবী-দাওয়া পূরণ করার কারণ এই যে, তাদের বদনিয়ত ও হঠকারিতা জানা ছিল যে, পূরণ করলেও বিশ্বাস স্থাপন করবে না। তারা আল্লাহর কাছে দুনিয়াতেও আপদ-বিপদে পতিত হওয়ার যোগ্য, যেমন মক্কাবাসীদের উপর কখনও দুর্ভিক্ষের কখনও ইসলামী জিহাদ তথা বদর, ওহদ ইত্যাদিতে হত্যা ও বন্দীত্বের বিপদ নামিল হয়েছে। কারণ উপরও বজ্র পতিত হয়েছে এবং কেউ অন্য কোন বাল্য-মুসীবতে আক্রান্ত হয়েছে।

أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ অর্থাৎ মাঝে মাঝে এমনও হবে যে, সরাসরি তাদের

উপর বিপদ আসবে না; বরং তাদের নিকটবর্তী জনপদের উপর বিপদ আসবে যাতে তারা শিক্ষা লাভ করে এবং নিজেদের কুপরিণামও দৃষ্টিগোচর হতে থাকে।

حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا تَخْلِفُ الْأَعْيَادُ — অর্থাৎ আপদ-

বিপদের এ ধারা অব্যাহতই থাকবে, যে পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলার ওয়াদা পূর্ণ না হয়ে যায়। কারণ, আল্লাহর ওয়াদা কোন সময় টলতে পারে না। ওয়াদা বলে এখানে মক্কা বিজয়

নুয্যানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, তাদের উপর বিভিন্ন প্রকার আপদ আসতে থাকবে। এমন কি, পরিশেষে মক্কা বিজিত হবে এবং তারা সবাই পরাজিত ও পর্যুদস্ত হয়ে যাবে।

আলোচ্য আয়াতে **أَوْ تَحُلَّ قُرَيْبًا مِّنَ دَارِهِمْ** বাক্য থেকে জানা যায়

যে, কোন সম্প্রদায় ও জনপদের আশেপাশে আযাব অথবা বিপদ নাযিল হলে তাতে আল্লাহ্ তা'আলার এ রহস্যও নিহিত থাকে যে, পার্শ্ববর্তী জনপদগুলোও হুঁশিয়ার হয়ে যায় এবং অন্যের দুরবস্থা দেখে তারাও নিজেদের ক্রিয়াকর্ম সংশোধন করে নেয়। ফলে অন্যের আযাব তাদের জন্য রহমত হয়ে যায়, নতুবা একদিন অন্যদের ন্যায় তারাও আযাবে পতিত হবে।

নিত্যদিনকার অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, আমাদের আশেপাশে প্রায়ই কোন না কোন সম্প্রদায় ও জনপদের উপর বিভিন্ন প্রকার আপদ-বিপদ আসছে। কোথাও বন্যার ধ্বংস-লীলা, কোথাও বাড় বন্ধা, কোথাও ভূমিকম্প এবং কোথাও যুদ্ধ-বিগ্রহ বা অন্য কোন বিপদ অহরহ আপতিত হচ্ছে। কোরআন পাকের উপরোক্ত বক্তব্য অনুযায়ী—এগুলো শুধু সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায় ও জনপদের জন্যই শাস্তি নয়; বরং পার্শ্ববর্তী এলাকাবাসীদের জন্যও হুঁশিয়ারি সংকেত হয়ে থাকে। অতীতে যদিও জ্ঞান-বিজ্ঞান এতটুকু উন্নত ছিল না, কিন্তু মানুষের অন্তরে আল্লাহ্র ভয় ছিল। কোথাও এ ধরনের দুর্ঘটনা দেখা দিলে স্থানীয় ও পার্শ্ববর্তী এলাকার সবাই ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে যেত, আল্লাহ্র দিকে মনোনিবেশ করত তওবা করত এবং ইস্তগফার ও দান-খয়রাতকে মুক্তির উপায় মনে করত। ফলে চাক্ষুষ দেখা যেত যে, তাদের বিপদ সহজেই দূর হয়ে গেছে। আজ আমরা এতই গাফিল হয়ে গেছি যে, বিপদের মূহূর্তেও আল্লাহ্ স্মরণে আসে না—বাকী সব কিছুই আমরা স্মরণ করি। দুনিয়ার তাবত অমুসলিমদের ন্যায় আমাদের দৃষ্টি কেবল বস্তুগত কারণাদির মধ্যেই নিবদ্ধ হয়ে থাকে। কারণাদির উদ্ভাবক আল্লাহ্র দিকে মনোযোগের তওফীক তখনও কম লোকেরই হয়। এরই ফলশ্রুতিতে বিশ্ব আজ একের পর এক উপর্যুপরি দুর্ঘটনার শিকার হতে থাকে।

**حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَةَ ۝**—অর্থাৎ কাফির ও

মুশরিকদের উপর দুনিয়াতেও বিভিন্ন প্রকার আযাব ও আপদ-বিপদের ধারা অব্যাহতই থাকবে, যে পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলার ওয়াদা পৌঁছে না যায়। কেননা, আল্লাহ্ কখনও ওয়াদার খেলাফ করেন না।

ওয়াদার অর্থ এখানে মক্কা বিজয়। আল্লাহ্ তা'আলা এই ওয়াদা রসুলুল্লাহ্ (সা)-র সাথে করে রেখেছিলেন। উদ্দেশ্য এই যে, পরিশেষে মক্কা বিজিত হয়ে কাফির ও মুশরিকরা পর্যুদস্ত হবেই; এর পূর্বেও অপরাধের কিছু কিছু সাজা তারা ভোগ করবে। ওয়াদার অর্থ এ মূলে কিয়ামতও হতে পারে। এ ওয়াদা সব পয়গম্বরের সাথে সব সময়ই করা আছে। ওয়াদাকৃত সেই কিয়ামতের দিন প্রত্যেক কাফির ও অপরাধী কৃতকর্মের পুরাপুরি শাস্তি ভোগ করবে।

বণিত ঘটনায় মুশরিকদের হঠকারিতাপূর্ণ প্রব্লেস কারণে রসূলুল্লাহ (স)-র দুঃখিত ও ব্যথিত হওয়ার আশংকা ছিল। তাই পরবর্তী আয়াতে তাঁকে সাম্বনা দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে।

وَلَقَدْ اسْتَوْزَيْتُمْ بِرَسُولٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَامَلَيْتُمْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ اخَذْتُمْ  
فَكَيْفًا كَانْ عِقَابَ -

আপনি যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন, তা শুধু আপনারই পরিস্থিতি নয়। আপনার পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণও এমনি ধরনের অবস্থার মুখোমুখি হয়েছেন। অপরাধী ও অবিশ্বাসীদেরকে তাদের অপরাধের কারণে তাৎক্ষণিকভাবে ধরা হয়নি। তারা পয়গম্বরগণের সাথে ঠাট্টাবিপ্লপ করতে করতে যখন চরম সীমান পৌঁছে যায়, তখন আল্লাহর আযাব তাদেরকে পরিস্বেষ্টন করে এবং এমনভাবে বেষ্টিন করে যে, কঠে দাঁড়াবার কারণে শক্তি থাকেনি।

أَفَمَنْ هُوَ قَاتِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ - আয়াতে মুশরিকদের মুর্থতা ও নির্বুদ্ধিতা

প্রকাশ করে বলা হয়েছে যে, এরা এতই বোকা যে, নিজীব ও চেতনাহীন প্রতিমাগুলোকে ঐ পবিত্র সত্তার সমতুল্য স্থির করে, যিনি প্রত্যেক ব্যক্তির রক্ষক ও তার ক্রিয়াকর্মের হিসাব গ্রহিতা। অতঃপর বলা হয়েছে : এর আসল কারণ এই যে, শয়তান তাদের মুর্থতাকেই তাদের দৃষ্টিতে সুশোভন করে রেখেছে। তারা একেই সাফল্যের চরম পরাকাষ্ঠা ও কৃতকার্যতা মনে করে।

لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ  
مِنْ وَّاقٍ ۝ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي دُعِيَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا  
الْأَنْهَارُ كُلُّهَا رَائِيٌّ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى  
الْكَافِرِينَ النَّارُ ۝ وَالَّذِينَ اتَّيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ  
وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُبْكَرُ بَعْضُهُمْ قُلُوبًا لِّأَنَّ أُمَّرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ  
وَلَا أُشْرِكُ بِهِ إِلَهًا أَدْعُوا وَالْإِيهَ مَا ب ۝ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ

حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ

مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاوِيٍّ وَلَا وَاقٍ ۝

(৩৪) দুনিয়ার জীবনেই এদের জন্য রয়েছে আযাব এবং অতি অবশ্য আখিরাতের জীবন কঠোরতম। আল্লাহর কবল থেকে তাদের কোন রক্ষাকারী নেই। (৩৫) পর-হিয়গারদের জন্য প্রতিশ্রুত জাযাতের অবস্থা এই যে, তার নিশ্চয় নির্বাণিসমূহ প্রবাহিত হয়। তার ফলসমূহ চিরস্থায়ী এবং ছায়াও। এটা তাদের প্রতিদান, যারা সাবধান হয়েছে এবং কাফিরদের প্রতিফল জঙ্গি। (৩৬) এবং যাদেরকে আমি গ্রহু দিয়েছি, তারা আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তৎক্ষণাৎ আনন্দিত হয় এবং কোন কোন দল এর কোন কোন বিষয় অস্বীকার করে। বলুন, আমাকে এরূপ আদেশই দেওয়া হয়েছে যে, আমি আল্লাহর ইবাদত করি। এবং তাঁর সাথে অংশীদার না করি। আমি তাঁর দিকেই দাওয়াত দেই এবং তাঁর কাছেই আমার প্রত্যাবর্তন। (৩৭) এমনভাবেই আমি এ কোরআনকে আরবী ভাষায় নির্দেশরূপে অবতারণ করেছি। যদি আপনি তাদের প্রহৃত্তির অনুসরণ করেন আপনার কাছে জান পৌঁছান পর, তবে আল্লাহর কবল থেকে আপনার না কোন সাহায্যকারী আছে এবং না কোন রক্ষাকারী।

### তক্ষসীরের সার-সংক্ষেপ

কাফিরদের জন্য পাখিব জীবনে (৩) শাস্তি রয়েছে (তা হচ্ছে হত্যা, বন্দীত্ব, অপমান অথবা রোগ-শোক ও বিপদাপদ)। এবং পরকালের শাস্তি এর চাইতে অনেক বেশী কঠোর (কেননা তা যেমন তাঁর, তেমনি চিরস্থায়ীও) এবং আল্লাহর (আযাব) থেকে তাদেরকে রক্ষাকারী কেউ হবে না (এবং) যে জাযাতের ওয়াদা পরহিয়গারদের সাথে (অর্থাৎ কুফর ও শিরক থেকে আত্মরক্ষাকারীদের সাথে) করা হয়েছে, তার অবস্থা এই যে, তার (দাজান-কোঠা ও রক্ষাদির) তলদেশ দিয়ে নির্বাণিসমূহ প্রবাহিত হবে এবং ফল ও ছায়া সদা-সর্বদা থাকবে। এটা তো পরহিয়গারদের পরিণাম এবং কাফিরদের পরিণাম হবে দোহখ। আর যাদেরকে আমি (প্রেশী) গ্রহু (অর্থাৎ তওরাত ও ইন্জীল) দিয়েছি (এবং তারা তা পুরোপুরি মেনে চলত) তারা এ গ্রহের কারণে আনন্দিত হয়েছে, যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে। (কেননা তারা তাদের গ্রহে এর খবর পায়। তারা আনন্দিত হয়ে একে মেনে নেয় এবং এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে; যেমন ইহুদীদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে সালাম ও তাঁর সন্নীরা এবং খৃস্টানদের মধ্যে নাজ্জাশী ও তাঁর প্রেরিত লোকগণ। অন্যান্য আয়াতেও তাদের কথা উল্লিখিত আছে)। এবং তাদের দলের মধ্যেই কেউ কেউ এমন যে, এর (অর্থাৎ এ গ্রহের) কোন কোন অংশ (যাতে তাদের গ্রহের বিরুদ্ধে বিধানাবলী আছে) অস্বীকার করে (এবং কুফরী করে)। আপনি (তাদেরকে) বলুন: (বিধানাবলী দু'প্রকার মৌলিক ও শাখাগত। তোমরা যদি মৌলিক বিধানাবলীতে বিরুদ্ধাচরণ কর, তবে সেগুলো

সব শরীয়তে অভিন্ন। সেমতে) আমি (তওহীদ সম্পর্কে) আদিষ্ট হয়েছি যে, আমি আল্লাহর ইবাদত করি এবং কাউকে তাঁর অংশীদার না করি (এবং নবুয়তের সম্পর্কে এই যে) আমি (মানুষকে) আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেই (অর্থাৎ নবুয়তের সারমর্ম এই যে, আমি আল্লাহর দিকে আহবানকারী) এবং (পরকাল সম্পর্কে আমার বিশ্বাস এই যে) তাঁর দিকেই আমাকে (দুনিয়া থেকে ফিরে) যেতে হবে। (অর্থাৎ এ তিনটি হচ্ছে মূলনীতি। এদের একটিও অস্বীকারোপযোগী নয়। তওহীদ সবার কাছে স্বীকৃত। অন্য আয়াতে

এ বিষয়বস্তুটিই **بَيَّنَّا الْإِسْلَامَ لَكَ فِي هَذِهِ آيَاتِنَا لَعَلَّكَ تَقْوَىٰ** ব্যক্ত

করা হয়েছে। নবুয়তের ব্যাপারে আমি নিজের জন্য অর্থকড়ি ও নামযশ চাই না, যদ্বরূন অস্বীকারের অবকাশ হবে---শুধু আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেই। পূর্বেই এরূপ ব্যক্তি আবির্ভূত হয়েছেন, যাদেরকে তোমরাও স্বীকার কর। এ বিষয়বস্তুটিই অন্যত্র

**مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ بِإِذْنِ اللَّهِ الْعَلِيمِ** আয়াতে বিধৃত হয়েছে। এমনি-

ভাবে পরকালের বিশ্বাস অভিন্ন, স্বীকৃত ও অনস্বীকার্য। পক্ষান্তরে যদি তোমরা শাখাগত বিধানে বিরোধী হও, তবে এর জওয়াব আল্লাহ তা'আলা দেন যে, আমি যেভাবে অন্যান্য পয়গম্বরকে বিশেষ বিশেষ ভাষায় বিধান দান করেছি) এমনিভাবে আমি এ (কোরআন) কে এভাবে নাখিল করেছি যে, এটা আরবী ভাষায় বিশেষ বিধান। (আরবী বলায় অন্যান্য পয়গম্বরের অন্যান্য ভাষার প্রতি ইঙ্গিত হয়েছে এবং ভাষার পার্থক্য দ্বারা উম্মতের পার্থক্যের প্রতি ইঙ্গিত হয়ে গেছে। অতএব জওয়াবের সারমর্ম এই যে, শাখাগত বিধানে পার্থক্য উম্মতের পার্থক্যের কারণ হয়েছে। কেননা, প্রতি যুগের উম্মতের উপযোগিতা ছিল বিভিন্নরূপ। সুতরাং শরীয়তসমূহের পার্থক্য বিরুদ্ধাচরণের কারণ হতে পারে না। স্বয়ং তোমাদের সর্বজনস্বীকৃত শরীয়তসমূহেও শাখাগত পার্থক্য হয়েছে। এমতাবস্থায় তোমাদের বিরুদ্ধাচরণ ও অস্বীকারের কি অবকাশ আছে? ) এবং [ হে মুহাম্মদ (সা) ] যদি আপনি (অসম্ভবকে ধরে নেওয়ার পর্যায়ে) তাদের মানসিক প্রবৃত্তি (অর্থাৎ রহিত বিধানাবলী অথবা পরিবর্তিত বিধানাবলী) অনুসরণ করেন আপনার কাছে (উদ্দিষ্ট বিধানাবলীর বিত্ত) জ্ঞান পৌঁছান পর, তবে, আল্লাহর কবর থেকে আপনার না কোন সাহায্যকারী হবে এবং না কোন উদ্ধারকারী হবে। (যখন পয়গম্বরকে এমন সম্বোধন করা হচ্ছে, তখন অন্য লোকেরা অস্বীকার করে। কথায় যাবে? এতে প্রহরীদের প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে। সুতরাং উত্তম অবস্থাতেই অস্বীকারকারীও বিরুদ্ধাচরণকারীদের জওয়াব হয়ে গেছে।)

**وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۖ وَمَا**

**كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِذْ بَأَذَنَ اللَّهُ إِلَّا لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٍ ۝**

**يَسْأَلُونَكَ مَا يَشَاءُ وَيُنشِئُ ۗ وَعِنْدَ أُمَّ الْكِتَابِ ۝ وَإِنْ**



مَا تُرِيدُكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ تَتَوَقَّيْتِكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَدُ  
 وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ۝ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ  
 أَطْرَافِهَا ۗ وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ ۗ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝  
 وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِئِنَّ الْمَكْرَ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ  
 كُلُّ نَفْسٍ ۗ وَسَيَعْلَمُ الْكُفْرَ لِمَنْ عُقِبَى الدَّارِ ۗ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا  
 لَسْتَ مُرْسَلًا ۗ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۗ وَمَنْ عِنْدَهُ  
 عِلْمُ الْكِتَابِ ۝

(৩৮) আপনার পূর্বে আমি অনেক রসূল প্রেরণ করেছি এবং তাঁদেরকে পত্নী ও সন্তান-সন্ততি দিয়েছি। কোন রসূলের এমন সাধা ছিল না যে আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া কোন নিদর্শন উপস্থিত করে। প্রত্যেকটি ওয়াদা লিখিত আছে। (৩৯) আল্লাহ্ যা ইচ্ছা, মিটিয়ে দেন এবং বহাল রাখেন এবং মূলগ্রন্থ তাঁর কাছেই রয়েছে। (৪০) আমি তাদের সাথে যে ওয়াদা করেছি, তার কোন একটি যদি আপনাকে দেখিয়ে দেই কিংবা আপনাকে উঠিয়ে নেই, তাতে কি—আপনার দায়িত্ব তো পৌঁছে দেওয়া এবং আমার দায়িত্ব হিসাব নেওয়া। (৪১) তারা কি দেখে না যে, আমি তাদের দেশকে চতুর্দিক থেকে সমানে সংকুচিত করে আসছি? আল্লাহ্ নির্দেশ দেন। তাঁর নির্দেশকে পশ্চাতে নিষ্ক্ষেপকারী কেউ নেই। তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণ করেন। (৪২) তাদের পূর্বে যারা ছিল, তারা চক্রান্ত করেছে। আর সকল চক্রান্ত তো আল্লাহর হাতেই আছে। তিনি জানেন প্রত্যেক ব্যক্তি যা কিছু করে। কাকিররা জেনে নেবে যে, পর জীবনের আবাসস্থল কাদের জন্য রয়েছে। (৪৩) কাকিররা বলে : আপনি প্রেরিত ব্যক্তি নন। বলে দিন, আমার ও তোমাদের মধ্যে প্রকৃষ্ট সাক্ষী হচ্ছেন আল্লাহ্ এবং ঐ ব্যক্তি, যার কাছে গ্রন্থের জ্ঞান আছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং (গ্রন্থধারীদের মধ্যে কেউ কেউ যে পয়গম্বরের প্রতি দোষারোপ করে তাঁর অনেক পত্নী রয়েছে, এর জওয়াব এই যে) আমি নিশ্চিতই আপনার পূর্বে অনেক রসূল প্রেরণ করেছি এবং তাদেরকে পত্নী ও সন্তান-সন্ততিও দিয়েছি (এটা পয়গম্বরের পরিপত্নী বিষয় হল কিরূপে ?

এমন বিষয়বস্তু অন্য একটি আয়াতেও এভাবে উল্লিখিত হয়েছে : **أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ**

( **مَلَىٰ عَاثِمُ اللَّهِ لَخِ** ) এবং ( শরীয়তসমূহের পার্থক্যের সন্দেহটি অন্যান্য সন্দেহের

চাইতে ছিল অধিক আলোচিত এবং পূর্বে খুব সংক্ষেপে এ সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছিল, তাই পরবর্তী আয়াতে একে পুনর্বারও বিস্তারিত উল্লেখ করা হচ্ছে যে, যে ব্যক্তি নবীর বিরুদ্ধে শরীয়তসমূহের পার্থক্যের প্রশ্ন তোলে, সে পরোক্ষভাবে নবীকে বিধানের মালিক মনে করে। অথচ কোন পয়গম্বরের ক্ষমতা নেই যে, একটি আয়াত ( অর্থাৎ একটি বিধান ) আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া ( নিজের পক্ষ থেকে ) উপস্থিত করতে পারে। ( বরং বিধানাবলী নির্ধারিত হওয়া আল্লাহর নির্দেশ ও ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল এবং আল্লাহর রহস্য ও উপযোগিতার দিক দিয়ে এরূপ রীতি আছে যে ) প্রত্যেক যুগের উপযোগী বিশেষ বিশেষ বিধান হয় ( এরপর অন্য যুগে কোন কোন ব্যাপারে অন্য বিধান আসে এবং পূর্ববর্তী বিধান মওকুফ হয়ে যায়। অবশ্য কোন কোন বিধান হবহ বহাল থাকে। সুতরাং ) আল্লাহ তা'আলা (-ই) যে বিধানকে ইচ্ছা মওকুফ করে দেন এবং যে বিধানকে ইচ্ছা বহাল রাখেন এবং মূল গ্রন্থ ( অর্থাৎ লওহে মাহফুম ) তাঁর কাছেই রয়েছে। ( সব মওকুফকারী, মওকুফ ও প্রচলিত বিধান তাতে লিপিবদ্ধ আছে। সেটি সর্বাঙ্গিক এবং যেন মূল ভাণ্ডার। অর্থাৎ যে স্থান থেকে এসব বিধান আসে, সে আল্লাহ তা'আলারই অধিকারভুক্ত। কাজেই সাবেক বিধানের অনুকূল কিংবা প্রতিকূল বিধান আনার ক্ষমতাও অবশ্যই কারও হতে পারে না। ) এবং ( তাঁরা যে এ কারণে নবুয়ত অস্বীকার করে যে, আপনি নবী হলে নবুয়ত অস্বীকার করার কারণে যে আযাবের ওয়াদা করা হয়, তা নাযিল হয় না কেন? সে সম্পর্কে শুনে নিন ) যে বিষয়ের ( অর্থাৎ আযাবের ) ওয়াদা আমি তাদের সাথে ( নবুয়ত অস্বীকার করার কারণে ) করেছি, যদি তার কিয়দংশ আমি আপনাকে দেখাই ( অর্থাৎ আপনার জীবদ্দশায় কোন আযাব তাদের উপর নাযিল হয়ে যায় ) কিংবা ( আযাব নাযিল হওয়ার আগে ) আমি আপনাকে ওফাত দান করি ( এবং পরে আযাব নাযিল হয়—দুনিয়াতে হোক কিংবা পরকালে, উভয় অবস্থাতেই আপনি চিন্তিত হবেন না। কেননা ) আপনার দায়িত্ব শুধু ( বিধানাবলী ) পৌঁছে দেওয়া এবং হিসাব নেওয়া আমার কাজ। আপনি কেন চিন্তিত হবেন যে, আযাব এসে গেলে সম্ভবত বিশ্বাস স্থাপন করত। আশ্চর্যের বিষয়, তারাও কুফরীর কারণে আযাব আসার কথা কিরাপে সোজাসুজি অস্বীকার করেছে। তারা কি ( আযাবের প্রথমাংশের মধ্য থেকে ) এ বিষয়টি দেখছে না যে, আমি ( ইসলামের বিজয়ের মাধ্যমে তাদের ) দেশকে চতুর্দিক থেকে সমানে হ্রাস করে আছি ( অর্থাৎ ইসলামী বিজয়ের অগ্রগতির কারণে তাদের শাসনাধীন এলাকা দিন দিনই কমে আসছে। এটাও তো এক প্রকার আযাব—যা আসল আযাবের প্রথমাংশ, যেমন অন্য আয়াতে আছে

وَلَنذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ

( **رُونَ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ** ) এবং আল্লাহ যা চান, আদেশ করেন। তাঁর আদেশকে রদ

করার কেউ নেই। ( সুতরাং ছোট কিংবা বড়, যে আযাবই হোক, তাকে তাদের শরীক কিংবা

অন্য কেউ শুনতে পারে না) এবং (যদি তারা কিছু সময়ও পায়, তাতে কি) তিনি খুব দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। (সময় আসার অপেক্ষা মাত্র। এরপর তৎক্ষণাৎ প্রতিশ্রুত সাজা শুরু হয়ে যাবে) এবং (এরা যে রসূল-পীড়ন কিংবা ইসলামকে হেয় প্রতিপন্ন করার কাজে নানা রকম কলাকৌশল অবলম্বন করেছে, এতে কিছু আসে যায় না। সেমতে তাদের) পূর্বে যারা (কাফির) ছিল, তারা (ও এসব উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য) বড় বড় চক্রান্ত করেছে। অতএব (কিছুই হয়নি। কেননা) আসল কলাকৌশল তো আল্লাহ্ তা'আলারই। (তাঁর সামনে কারও কলাকৌশল চলে না। তাই আল্লাহ্ তাদের কলাকৌশল ব্যর্থ করে দিয়েছেন।) এবং প্রত্যেক ব্যক্তি যা কিছু করে, তিনি সব জানেন। (এরপর সময়মত তাকে শাস্তি দেন) এবং (এমনিভাবে কাফিরদের কাজ-কর্মও তিনি সব জানেন। অতএব) কাফিররা সত্ত্বরই জানতে পারবে যে, এ জগতে সুপরিণাম কার ভাগে রয়েছে? (তাদের না মুসলমানদের? অর্থাৎ সত্ত্বরই তারা স্বীয় মন্দ পরিণাম ও কর্মের শাস্তি জানতে পারবে।) এবং কাফিররা (এসব শাস্তি বিস্মৃত হয়ে) বলেঃ (নাউযুবিল্লাহ) আপনি পয়গম্বর নন। আপনি বলে দিনঃ (তোমাদের অর্থহীন অস্বীকারে কি হয়) আমার ও তোমাদের মধ্যে (আমার নবুয়ত সম্পর্কে) আল্লাহ্ তা'আলা এবং ঐ ব্যক্তি, যার কাছে (ঐশী) গ্রন্থের জ্ঞান আছে (যাতে আমার নবুয়তের সত্যায়ন আছে) প্রকৃষ্ট সাক্ষী। (অর্থাৎ কিতাবী সম্প্রদায়ের ঐসব আলিম, যারা ন্যায়-পরায়ণ ছিলেন এবং নবুয়তের ভবিষ্যদ্বাণী দেখে বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। উদ্দেশ্য এই যে, আমার নবুয়তের দৃষ্টি প্রমাণ আছেঃ যুক্তিগত ও ইতিহাসগত। যুক্তিগত প্রমাণ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে নবুয়তের প্রমাণ হিসাবে মু'জিমা দান করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলার সাক্ষী হওয়ার অর্থ তাই। ইতিহাসগত প্রমাণ এই যে, পূর্ববর্তী ঐশী গ্রন্থসমূহে এর সংবাদ বিদ্যমান রয়েছে। বিশ্বাস না হলে ন্যায়পরায়ণ আলিমদের কাছে জিজ্ঞেস কর। তারা প্রকাশ করে দেবেন। অতএব, যুক্তিগত ও ইতিহাসগত প্রমাণাদি সত্ত্বেও নবুয়ত অস্বীকার করা দুর্ভাগ্য বৈ কিছু নয়। কোন বুদ্ধিমানের এ ব্যাপারে সন্দেহ হওয়া উচিত নয়।)

### আনুশঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

নবী-রসূল সম্পর্কে কাফির ও মুশরিকদের একটি সাধারণ ধারণা ছিল এই যে, তাদের মানুষ ছাড়া অন্য কোন সৃষ্টজীব যেমন ফেরেশতা হওয়া দরকার। ফলে সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব বিতর্কের ঊর্ধ্বে থাকবে। কোরআন পাক তাদের এ ভ্রান্ত ধারণার জওয়াব একাধিক আয়াতে দিয়ে বলেছে যে, তোমরা নবুয়ত-রিসালতের স্বরূপ ও রহসাই বোঝানি। ফলে এ ধরনের কল্পনায় মেতে উঠেছ। রসূলকে আল্লাহ্ তা'আলা একটি আদর্শ হিসাবে প্রেরণ করেন, যাতে উম্মতের সবাই তাঁর অনুসরণ করে এবং তাঁর মতই কাজকর্ম ও চরিত্র শিক্ষা করে। বলা বাহুল্য, মানুষ তার স্বজাতীয় মানুষেরই অনুসরণ করতে পারে। স্বজাতীয় নয়---এরূপ কোন অমানবের অনুসরণ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব-পর নয়। উদাহরণত ফেরেশতার ক্ষুধা নেই, পিপাসা নেই এবং মানসিক প্রবৃত্তির সাথেও তার কোন সম্পর্ক নেই। তার নিদ্রা আসে না এবং গৃহেরও প্রয়োজন নেই। এমতাবস্থায় মানুষকে তার অনুসরণের নির্দেশ দেওয়া হলে তা সাধ্যাতীত কাজের নির্দেশ হয়ে যেত। এখানেও মুশরিকদের পক্ষ থেকে এ আপত্তিই উত্থাপিত হল। বিশেষ করে রসূল্লাহ্

(সা)-র বহু বিবাহ থেকে তাদের এ সন্দেহ আরও বেড়ে গেল। এর জওয়াব প্রথম আয়াতের বাক্যগুলোতে দেওয়া হয়েছে যে, এক অথবা একাধিক বিবাহ করা এবং স্ত্রী-পুত্র পরিজন বিশিষ্ট হওয়াকে তোমরা কোন প্রমাণের ভিত্তিতে নব্বয়ত ও রিসালতের পরিপন্থী মনে করে নিচ্ছে? সৃষ্টির আদিকাল থেকেই আল্লাহ তা'আলার চিরন্তন রীতি এই যে, তিনি পয়গম্বরদেরকে পরিবার-পরিজন বিশিষ্ট করেছেন। অনেক পয়গম্বর অতিক্রান্ত হয়েছেন এবং তাদের মধ্যে অনেকের নব্বয়তের প্রবক্তা তোমরাও। তাদের সবাই একাধিক পত্নীর অধিকারী ছিলেন এবং তাদের সন্তানাদিও ছিল। অতএব একে নব্বয়ত, রিসালাত অথবা সাধুতা ও ওলী হওয়ার খেলাফ মনে করা মুর্থতা বৈ নয়।

সহীহ বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : আমি তো রোযাও রাখি এবং রোযা ছাড়াও থাকি ; ( অর্থাৎ আমি এমন নই যে, সব সময়ই রোযা রাখব )। তিনি আরও বলেন : আমি রাক্বিতে নিদ্রাও ঘাই এবং নামাযের জন্য দণ্ডায়মানও হই ; ( অর্থাৎ এমন নই যে, সারা রাত কেবল নামাযই পড়ব )। এবং মাংসও ভক্ষণ করি এবং নারীদেরকে বিবাহও করি। যে ব্যক্তি আমার এ সুন্নতকে আপত্তিকর মনে করে, সে মুসলমান নয়।

مَا كُنْ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بَازِنِ اللَّهِ — অর্থাৎ কোন রসূলের এ

ক্ষমতা নেই যে, সে আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া একটি আয়াতও নিজে আনতে পারে।

কাফির ও মুশরিকরা সদাসর্বদা যেসব দাবী পয়গম্বরদের সামনে করে এসেছে এবং রসূলুল্লাহ (সা)-র সামনেও সমসাময়িক মুশরিকরা যে সব দাবী করেছে, তন্মধ্যে দুটি দাবী ছিল অত্যন্ত ব্যাপক। এক, আল্লাহর কিতাবে আমাদের অভিপ্রায় অনুযায়ী বিধি-বিধান অবতীর্ণ হোক। যেমন সূরা ইউনুসে তাদের এ আবেদন উল্লিখিত আছে যে,

أَتَيْتُ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلَهُ — অর্থাৎ আপনি বর্তমান কোরআনের পরিবর্তে

সম্পূর্ণ ভিন্ন কোরআন আনুন, যাতে আমাদের প্রতিমাসমূহের উপাসনা নিষিদ্ধ করা না হয় অথবা আপনি নিজেই এর আনীত বিধি-বিধান পরিবর্তন করে দিন---আযাবের জায়গায় রহমত এবং হারামের জায়গায় হালাল করে দিন।

দুই, পয়গম্বরদের সুস্পষ্ট মু'জিযা দেখা সত্ত্বেও নতুন নতুন মু'জিযা দাবী করে বলা যে, অমুক ধরনের মু'জিযা দেখালে আমরা মুসলমান হয়ে যাব। কোরআন পাকের উপরোক্ত বাক্য آيَةٌ শব্দ দ্বারা উভয় অর্থই হতে পারে। কারণ কোরআনের পরিভাষায় কোরআনের আয়াতকেও আয়াত বলা হয় এবং মু'জিযাকেও। এ কারণেই 'এ আয়াত' শব্দের ব্যাখ্যায় কোন কোন তফসীরবিদ কোরআনী আয়াত অর্থ ধরে উদ্দেশ্যে এরূপ ব্যক্ত করেছেন যে, কোন পয়গম্বরের এরূপ ক্ষমতা নেই যে, নিজের পক্ষ থেকে কোন আয়াত তৈরী করে নেবেন। কেউ কেউ এ আয়াতের অর্থ মু'জিযা ধরে ব্যাখ্যা করেছেন যে, কোন রসূল ও নবীকে আল্লাহ তা'আলা এরূপ ক্ষমতা দেননি যে, যখন ইচ্ছা, যে ধরনের

ইচ্ছা মুজিহা প্রকাশ করেন। তফসীর রুহুল মা'আনীতে বলা হয়েছে, **عوم مجاز**  
এর ফায়দা অনুযায়ী এখানে উভয়বিধ অর্থ হতে পারে এবং উভয় তফসীর বিস্তৃত হতে পারে।

এ দিক দিয়ে আলোচ্য আয়াতের সার বিষয়বস্তু এই যে, আমার রসূলের কাছে কোরআনী আয়াত পরিবর্তন করার দাবী অন্যায ও ভ্রান্ত। আমি কোন রসূলকে এরূপ ক্ষমতা দেইনি। এমনিভাবে কোন বিশেষ ধরনের মুজিহা দাবী করাও নবুয়তের স্বরূপ সম্পর্কে অজ্ঞতার পরিচায়ক। কেননা, কোন নবী ও রসূলের এরূপ ক্ষমতা থাকে না যে, লোকদের খাহেশ অনুযায়ী মুজিহা প্রদর্শন করবেন।

**كُلُّ أَجَلٍ كِتَابٍ** এখানে **أَجَل** শব্দের অর্থ নির্দিষ্ট সময় ও মেয়াদ,

**كِتَابٍ** শব্দটি এখানে ধাতু। এর অর্থ লিখা। বাক্যের অর্থ এই যে, প্রত্যেক বস্তুই মেয়াদ ও পরিমাণ আল্লাহ তা'আলার কাছে লিখিত আছে। তিনি সৃষ্টির সূচনালগ্নে লিখে দিয়েছেন যে, অমুক ব্যক্তি অমুক সময়ে জন্মগ্রহণ করবে এবং এতদিন জীবিত থাকবে। কোথায় কোথায় যাবে, কি কি কাজ করবে এবং কখন ও কোথায় মরবে, তাও লিখিত আছে।

এমনিভাবে একথাও লিখিত আছে যে, অমুক যুগে অমুক পয়গম্বরের প্রতি কি ওহী এবং কি কি বিধি-বিধান অবতীর্ণ হবে। কেননা, প্রত্যেক যুগ ও প্রত্যেক জাতির উপযোগী বিধি-বিধান আসতে থাকাই মুক্তিঙ্গত ও ন্যায়ানুগ। আরও লিখিত আছে যে, অমুক পয়গম্বর দ্বারা অমুক সময়ে এই এই মুজিহা প্রকাশ পাবে।

তাই রসূলুল্লাহ (সা)-র কাছে এরূপ দাবী করা যে, অমুক ধরনের বিধি-বিধান পরিবর্তন করান অথবা অমুক ধরনের মুজিহা দেখান—এটি একটি হঠকারিতাপূর্ণ ও ভ্রান্ত দাবী, যা রিসালত ও নবুয়তের স্বরূপ সম্পর্কে অজ্ঞতার ওপর ভিত্তিশীল।

**إِنَّمَا كِتَابٌ يُمْتَوَىٰ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُنَبِّئُكَ وَفِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّمَنْ يَتَفَكَّرُ** এখানে **إِنَّمَا كِتَابٌ**

এর শাব্দিক অর্থ মূলগ্রন্থ। এতে লওহে মাহফুয বোঝানো হয়েছে, যাতে কোনরূপ পরিবর্তন-পরিবর্ধন হতে পারে না।

আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় অপার শক্তি ও অসীম রহস্য জ্ঞান দ্বারা যে বিষয়কে ইচ্ছা নিশ্চিত করে দেন এবং যে বিষয়কে ইচ্ছা বহাল ও বিদ্যমান রাখেন। এরপর যা কিছু হয়, তা আল্লাহর কাছে সংরক্ষিত থাকে। এর উপর কারও কোন ক্ষমতা চলে না এবং তাতে হ্রাসরুদ্ধিও হতে পারে না।

তফসীরবিদদের মধ্যে সায়ীদ ইবনে জারীর, কাতাদাহ প্রমুখ এ আয়াতটিকেও আহকাম ও বিধি-বিধানের নসখ্ তথা রহিতকরণ বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত সাব্যস্ত করেছেন। তাঁদের মতে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক যুগ ও প্রত্যেক জাতির জন্য বিভিন্ন পয়গম্বরের মাধ্যমে স্বীয় গ্রন্থ নাযিল করেন। এসব গ্রন্থে যেসব বিধি-বিধান ও কুরআয়েষ বর্ণিত হয়, সেগুলো চিরস্থায়ী ও সর্বকালে প্রযোজ্য থাকা জরুরী নয় ;

বরং জাতিসমূহের অবস্থা ও যুগের পরিবর্তনের সাথে মিল রেখে রহস্যজ্ঞানের মাধ্যমে তিনি যেসব বিধান মিটিয়ে দিতে চান, সেগুলো মিটিয়ে দেন এবং যেগুলো বাকী রাখতে চান সেগুলো বাকী রাখেন। এবং মূল গ্রন্থ সর্বাবস্থায় তাঁর কাছে সংরক্ষিত থাকে। তাতে পূর্বেই লিখিত আছে যে, অমুক জাতির জন্য নাযিলকৃত অমুক বিধানটি একটি বিশেষ মেয়াদের জন্য অথবা বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ধার্যকৃত হয়েছে। সেই মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেলে কিংবা অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে গেলে বিধানটিও পরিবর্তিত হয়ে যাবে। মূলগ্রন্থে এর মেয়াদ নির্ধারণের সাথে সাথে একথাও লিপিবদ্ধ আছে যে, এ বিধানটি পরিবর্তন করে তার স্থলে কোন বিধান আনয়ন করা হবে।

এ থেকে এ সন্দেহও দূরীভূত হয়ে গেল যে, আল্লাহর বিধান কোন সময়ই রহিত না হওয়া উচিত। কারণ, কোন বিধান জারি করার পর তা রহিত করে দিলে বোঝা যায় যে, বিধানদাতা পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত ছিলেন না। তাই পরিস্থিতি দেখার পর বিধানটি পরিবর্তন করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, আল্লাহর শান এর অনেক উর্ধ্বে। কোন বিষয় তাঁর জ্ঞানের বাইরে নেই। উপরোক্ত বস্তুরা থেকে জানা গেল যে, যে নির্দেশটি রহিত করা হয়, সে সম্পর্কে আল্লাহ পূর্ব থেকেই জানেন যে, এ বিধান মাত্র এতদিনের জন্য জারি করা হয়েছে; এরপর পরিবর্তন করা হবে। উদাহরণত রোগীর অবস্থা দেখে ডাক্তার অথবা হাকীম তখনকার অবস্থার উপযোগী কোন ওষুধ মনোনীত করেন এবং তিনি জানেন যে, এ ওষুধের এই ক্রিয়া হবে। এরপর এই ওষুধ পরিবর্তন করে অন্য ওষুধ দেওয়া হবে। মোটকথা, এই তফসীর অনুযায়ী আয়াতে 'মিটানো' ও 'বাকী রাখার' অর্থ বিধানাবলীকে রহিত করা ও অব্যাহত রাখা।

সুফীয়ান সওরী, ওয়াকী প্রমুখ তফসীরবিদ হযরত ইবনে আক্বাস (রা) থেকে এ আয়াতের ভিন্ন তফসীর বর্ণনা করেছেন। তাতে আয়াতের বিষয়বস্তুকে ভাগ্যালিপি সাথে সম্পর্কযুক্ত সাব্যস্ত করা হয়েছে। আয়াতের অর্থ এরাপ বর্ণনা করা হয়েছে যে, কোরআন ও হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী সৃষ্টজীবের ভাগ্য তথা প্রত্যেক ব্যক্তির বয়স, সারা জীবনের রিযিক, সুখ কিংবা বিপদ এবং এসব বিষয়ের পরিণাম আল্লাহ তা'আলা সূচনালগ্নে সৃষ্টির পূর্বেই লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। অতঃপর সন্তান জন্মগ্রহণের সময় ফেরেশতাদেরকেও লিখিয়ে দেওয়া হয় এবং প্রতি বছর শবে কদরে এ বছরের ব্যাপারাদির তালিকা ফেরেশতাদেরকে সোপর্দ করা হয়।

মোট কথা এই যে, প্রত্যেক সৃষ্টজীবের বয়স, রিযিক, গতিবিধি ইত্যাদি সব নির্ধারিত ও লিপিবদ্ধ। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এ ভাগ্যালিপি থেকে যতটুকু ইচ্ছা নিশ্চিহ্ন করে দেন এবং যতটুকু ইচ্ছা বহাল রাখেন।

—অর্থাৎ মিটানো  
وَعِنْدَ أَمِّ الْكِتَابِ

ও বহাল রাখার পর যে মূলগ্রন্থ অবশেষে কার্যকর হয়, তা আল্লাহর কাছে রয়েছে। এতে কোন পরিবর্তন হতে পারে না।

বিষয়টি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। অনেক সহীহ হাদীস থেকে জানা যায় যে, কোন কোন কর্মের দরুন মানুষের বয়স ও রিযিক বৃদ্ধি পায় এবং কোন কোন কর্মের দরুন হ্রাস পায়।

সহীহ বুখারীতে আছে, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা বয়স বৃদ্ধির কারণ হয়ে থাকে। মসনদ-আহমদের রেওয়াজেতে আছে, মানুষ মাঝে মাঝে এমন গোনাহ করে, যার কারণে তাকে রিযিক থেকে বঞ্চিত করে দেওয়া হয়। পিতামাতার সেবা-যত্ন ও আনুগত্যের কারণে বয়স বৃদ্ধি পায়। দোয়া ব্যতীত কোন বস্তু তরুণের খণ্ডন করতে পারে না।

এসব রেওয়াজেতে থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা কারও ভাগ্যলিপিতে যে বয়স, রিযিক ইত্যাদি লিখে দিয়েছেন, তা কোন কোন কর্মের দরুন কম অথবা বেশী হতে পারে এবং দোয়ার কারণেও তা পরিবর্তিত হতে পারে।

আলোচ্য আয়াতে এ বিষয়বস্তুটিই এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, ভাগ্যলিপিতে বয়স, রিযিক, বিপদ অথবা সুখ ইত্যাদিতে কোন কর্ম অথবা দোয়ার কারণে যে পরিবর্তন হয়, তা ঐ ভাগ্যলিপিতে হয়, যা ফেরেশতাদের হাতে অথবা জানে থাকে। এতে কোন সময় কোন নির্দেশ বিশেষ শর্তের সাথে সংযুক্ত থাকে। শর্তটি পাওয়া না গেলে নির্দেশটিও বাকী থাকে না। এ শর্তটি কোন সময় লিখিত আকারে ফেরেশতাদের জানে থাকে এবং কোন সময় অলিখিত আকারে শুধু আল্লাহ তা'আলার জানে থাকে। ফলে নির্দেশটি যখন পরিবর্তন করা হয়, তখন সবাই কিম্বায়ে হতবাক হয়ে যায়। এ ভাগ্যকে 'মুআজ্জাক' (মূলত) বলা হয়। আলোচ্য আয়াতের বর্ণনা অনুযায়ী এতে 'মিটানো' ও 'বাকী রাখা'র কাজ অব্যাহত থাকে। কিন্তু

আয়াতে শেষ বাক্য **وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ** ব্যক্ত করেছে যে, 'মুআজ্জাক ভাগ্য' ছাড়া একটি

'মুবরাম' (চূড়ান্ত) ভাগ্য আছে, যা মূল গ্রন্থে লিখিত অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার কাছে রয়েছে। তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জানার জন্যই। এতে ঐসব বিধান লিখিত হয়, যে-গুলো কর্ম ও দোয়ার শর্তের পর সর্বশেষ ফলাফল হয়ে থাকে। এ জন্যই এটা মিটানো ও বহাল রাখা এবং হ্রাস-বৃদ্ধি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

—(ইবনে কাসীর)

— **وَإِنْ مَا تُرِيدُكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفِّيكَ** এ আয়াতে

রসূলুল্লাহ (সা)-কে সাম্বননা দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা আপনার সাথে ওয়াদা করেছেন যে, ইসলাম চূড়ান্ত বিজয় লাভ করবে এবং কুফর ও কাফিররা অপমানিত ও লাঞ্চিত হবে। আল্লাহর এ ওয়াদা অবশ্যই পূর্ণ হবে। কিন্তু আপনি এরূপ চিন্তা করবেন না যে, এ বিজয় কবে হবে। সম্ভবত আপনার জীবদ্দশাতেই হবে এবং এটাও সম্ভব যে, আপনার ওফাতের পরে হবে। আপনার মানসিক প্রশান্তির জন্য তো এটাই মথেষ্ট যে, আপনি অহরহ দেখছেন, আমি কাফিরদের ভুখণ্ড চতুর্দিক থেকে সংকুচিত করে দিচ্ছি অর্থাৎ এসব দিক মুসলমানদের অধিকারভুক্ত হয়ে যাচ্ছে। ফলে তাদের অধিকৃত এলাকা হ্রাস পাচ্ছে। এভাবে একদিন এ বিজয় চূড়ান্ত রূপ লাভ করবে। নির্দেশ আল্লাহর হাতেই। তার নির্দেশ খণ্ডনকারী কেউ নেই। তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

## সূরা ইবরাহীম

মক্কায় অবতীর্ণ : ৫২ আয়াত : ৭ রুকু

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الَّذِي كَتَبَ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ  
رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۝ اللَّهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ  
وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ۝ الَّذِينَ  
يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْأٰخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ  
وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا ۖ أُولَٰئِكَ فِي ضَلٰلٍ بَعِيدٍ ۝

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু।

(১) আলিফ-লাম-রা ; এটি একটি গ্রন্থ, যা আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি—  
যাতে আপনি মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন—পরাক্রান্ত, প্রশংসার  
যোগ্য পালনকর্তার নির্দেশে তাঁরই পথের দিকে। (২) তিনি আল্লাহ ; যিনি নভোমণ্ডল ও  
ভূ-মণ্ডলের সব কিছুর মালিক। কাফিরদের জন্য বিপদ রয়েছে, কঠোর আযাব ; (৩)  
যারা পরকালের চাইতে পৃথিবী জীবনকে পছন্দ করে ; আল্লাহর পথে বাধা দান করে এবং  
তাতে বক্রতা অব্বেষণ করে, তারা পথ ভুলে দূরে পড়ে আছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আলিফ-লাম-রা ; (এর অর্থ তো আল্লাহ তা'আলাই জানেন) ; এটি (কোরআন)  
একটি গ্রন্থ, যা আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে আপনি (এর সাহায্যে) সব মানুষকে  
ভাদের পালনকর্তার নির্দেশে (প্রচার পর্যায়ে কৃফরের) অন্ধকার থেকে বের করে (ঈমান ও  
হিদায়তের) আলোর দিকে (অর্থাৎ) পরাক্রান্ত, প্রশংসিত সত্তার পথের দিকে আনয়ন করেন  
(আলোর দিকে আনার অর্থ হচ্ছে আলোর পথ বলে দেওয়া)। যিনি এমন আল্লাহ যে,



নভোমণ্ডলে যা আছে এবং ভূমণ্ডলে যা আছে, তিনি সেসবের মালিক এবং (যখন এ গ্রন্থ আল্লাহর পথ বলে দেয়, তখন) বড় পরিতাপ অর্থাৎ কঠোর শাস্তি কাফিরদের জন্য, যারা (এ পথ নিজেরা তো কবুল করেনই না; বরং) পাখিব জীবনকে পরকালের উপর অগ্রাধিকার দেয়, (ফলে ধর্মের অশ্বেষণ করে না) এবং (অন্যদেরকেও এ পথ অবলম্বন করতে দেয় না, বরং) আল্লাহর এ (উল্লিখিত) পথে বাধাদান করে এবং তাতে বক্রতা (অর্থাৎ নানাবিধ সন্দেহ) অশ্বেষণ করে (মস্কান্না অন্যদেরকে পথভ্রষ্ট করতে পারে)। তারা খুব দূর্বর্তী পথভ্রষ্টতায় পতিত আছে। (অর্থাৎ এ পথভ্রষ্টতা সত্য থেকে অনেক দূর্বর্তী)।

### আনুমানিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা ও তার বিষয়বস্তু : এটা কোরআন পাকের চতুর্দশতম সূরা—‘সূরা ইবরাহীম’। এটা মক্কায় হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে। কতিপয় আয়াত সম্পর্কে মতভেদ আছে যে, মক্কায় হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ, না মদীনায় অবতীর্ণ।

এ সূরার শুরুতে রিসালাত, নবুয়ত ও এসবের কিছু বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে হযরত ইবরাহীম (আ)—এর কাহিনী বর্ণনা হয়েছে এবং এর সাথে মিল রেখেই সূরার নাম ‘সূরা ইবরাহীম’ রাখা হয়েছে।

الرُّقْفَ كِتَابٌ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ  
إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ

الر—এগুলো খণ্ড অক্ষর। এগুলোর তাৎপর্য সম্পর্কে বারবার বলা হয়েছে। এ সম্পর্কে পূর্ববর্তী মনীষীদের অনুসৃত পছাই হচ্ছে সব চাইতে নির্মল ও স্বচ্ছ অর্থাৎ এরূপ বিশ্বাস রাখা যে, এ সবের যা অর্থ, তা সত্য। এগুলোর অর্থ কি, সে ব্যাপারে খোঁজাখুঁজি সমীচীন নয়।

خُورٌ هَذَا—বাকরূপের দিক দিয়ে একে সাব্যস্ত করে এরূপ অর্থ নেওয়াই অধিক স্পষ্ট যে, এটা ঐ গ্রন্থ, যা আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি। এতে অবতীর্ণ করার কাজটি আল্লাহর দিকে সম্পূর্ণ করা এবং সম্বোধন রসূলুল্লাহ (সা)—র দিকে করার মধ্যে দু’টি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এক. এ গ্রন্থটি অত্যন্ত মহান। কারণ একে স্বয়ং আল্লাহ তা‘আলা নাযিল করেছেন। দুই. রসূলুল্লাহ (সা) উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। কারণ তিনি এ গ্রন্থের প্রথম সম্বোধিত ব্যক্তি।

نَاسٍ لِّتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ

শব্দের অর্থ সাধারণ মানুষ। এতে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সকল যুগের মানুষই বোঝান হয়েছে। **ظلمات** শব্দটি **ظلمة** এর বহুবচন। এর অর্থ অন্ধকার। এখানে

**ظلمات** বলে কুফর শিরক ও মন্দকর্মের অন্ধকারসমূহ এবং **نور** বলে ঈমানের আলো বোঝান হয়েছে। এজন্যই **ظلمات** শব্দটির বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা কুফর ও শিরকের প্রকার অনেক। এমনিভাবে মন্দ কর্মের সংখ্যাও গণনার বাইরে। পক্ষান্তরে **نور** শব্দটি একবচনে আনা হয়েছে। কেননা, ঈমান ও সত্য এক। আয়াতের অর্থ এই যে, আমি এ গ্রন্থ এজন্য আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি এর সাহায্যে বিশ্বের মানুষকে কুফর, শিরক ও মন্দ কর্মের অন্ধকার থেকে মুক্তি দিয়ে তাদের পালনকর্তার আদেশক্রমে ঈমান ও সত্যের আলোর দিকে আনয়ন করেন। এখানে **رب** শব্দটি প্রয়োগ করার মধ্যে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, গ্রন্থ ও পয়গম্বরের সাহায্যে সর্ব স্তরের মানুষকে অন্ধকার থেকে মুক্তি দেওয়া—আল্লাহ তা'আলার এ অনুগ্রহের একমাত্র কারণ হচ্ছে ঐ কৃপা ও মেহেরবাণী, যা মানব জাতির স্রষ্টা ও প্রভু প্রতিপালকত্বের কারণে মানবজাতির প্রতি নিয়োজিত করে রেখেছেন। নতুবা আল্লাহ তা'আলার যিচ্ছায় না কারও কোন পাওনা আছে এবং না কারও জোর তাঁর উপর চলে।

**হিদায়ত শুধু আল্লাহর কাজ :** আলোচ্য আয়াতে অন্ধকার থেকে মুক্তি দিয়ে আলোর দিকে আনয়ন করাকে রসূলুল্লাহ (স)-র কাজ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। অথচ হিদায়ত দান করা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলারই কাজ; যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে :

—**إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ** অর্থাৎ

আপনি নিজ ক্ষমতাবলে কোন প্রিয়জনকে হিদায়ত দিতে পারেন না; বরং আল্লাহ তা'আলাই যাকে ইচ্ছা হিদায়ত দেন। এজন্যই আলোচ্য আয়াতে **بِإِذْنِ رَبِّهِمْ** কথাটি যুক্ত

করে এ সন্দেহ দূর করে দেওয়া হয়েছে। কেননা এতে আয়াতের অর্থ এই হয়েছে যে, কুফর ও শিরকের অন্ধকার থেকে বের করে ঈমান ও সৎকর্মের আলোর মধ্যে আনয়ন করার ক্ষমতা যদিও মূলত আপনার হাতে নেই, কিন্তু আল্লাহর আদেশ ও অনুমতিক্রমে আপনি তা করতে পারেন।

**বিধান ও নির্দেশ :** এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, মানবজাতিকে মন্দ কর্মের অন্ধকার থেকে বের করা এবং আলোর মধ্যে আনয়ন করার একমাত্র উপায় এবং মানব ও মানবতাকে ইহকালে ও পরকালে ধ্বংসের কবল থেকে মুক্তি দেওয়ার একমাত্র পথ হচ্ছে কোরআন পাক। মানুষ যতই এর নিকটবর্তী হবে, ততই তারা ইহকালেও সুখ-শান্তি নিরাপত্তা ও মনস্তান্ত্রি লাভ করবে এবং পরকালেও সাফল্য ও কামিয়াবি অর্জন করবে। পক্ষান্তরে তারা যতই এ থেকে দূরে সরে পড়বে, ততই উত্তর জাহানের দুঃখ ক্ষতি, আপদ-বিপদ ও অস্থিরতার গহ্বরে পতিত হবে।

আয়াতের ভাষায় এ-কথা ব্যক্ত করা হয়নি যে, রসুলুল্লাহ্ (স) কোরআনের সাহায্যে কিভাবে মানুষকে অজ্ঞান থেকে মুক্তি দিয়ে আলোর মধ্যে আনয়ন করবেন। কিন্তু এতটুকু অজানা নয় যে, কোন গ্রন্থের সাহায্যে কোন জাতিকে সংশোধন করার উপায় হচ্ছে গ্রন্থের শিক্ষা ও নির্দেশসমূহকে জাতির মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া এবং তাদেরকে এর অনুসারী করা।

কোরআন পাকের তিলাওয়াত একটি স্বতন্ত্র লক্ষ্য : কিন্তু কোরআন পাকের আরও একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এর তিলাওয়াত অর্থাৎ অর্থ হৃদয়ঙ্গম না করে শুধু শব্দাবলী পাঠ করাও মানুষের মনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে এবং তাদেরকে মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকতে সাহায্য করে। কমপক্ষে কুফর ও শিরকের যত মনোমুগ্ধকর জালই হোক, কোরআন তিলাওয়াতকারী অর্থ না বুঝলেও এ জালে আবদ্ধ হতে পারে না। হিন্দুদের শুদ্ধি সংগঠন আন্দোলনের সময় এটা প্রত্যক্ষ করা হয়েছে যে, তাদের জালে এমন কিছু সংখ্যক মুসলমানই মাত্র আবদ্ধ হয়েছিল, যারা কোরআন তিলাওয়াতেও অজ্ঞ ছিল। আজকাল খৃস্টান মিশনারীরা প্রত্যেকটি মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় নানা ধরনের প্রলোভন ও সেবা প্রদানের জাল নিয়ে ঘোরাফেরা করে। কিন্তু ওদের প্রভাব শুধুমাত্র এমন পরিবারের উপরই পড়ে যারা মুখতার কারণে অথবা নব্যশিক্ষার কুপ্রভাবে কোরআন তিলাওয়াত থেকেও গাফিল।

সম্ভবত এই তাত্ত্বিক প্রভাবের দিকে ইঙ্গিত করার জন্য কোরআন পাকে যেখানে রসুলুল্লাহ্ (স)-কে প্রেরণ করার উদ্দেশ্যাবলী বর্ণনা করা হয়েছে, সেখানে অর্থ শিক্ষাদানের পূর্বে তিলাওয়াতকে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে :

—يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

রসুলুল্লাহ্ (স)-কে তিনটি কাজের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। এক. কোরআন পাকের তিলাওয়াত। বলা বাহুল্য, তিলাওয়াত শব্দের সাথে সম্পৃক্ত। অর্থ বোঝা হয়---তিলাওয়াত করা হয় না। দুই. মানুষকে মন্দ কাজকর্ম থেকে পবিত্র করা। তিন. কোরআন পাক ও হিকমত অর্থাৎ সুন্নাহর শিক্ষা দান করা।

মোট কথা, কোরআন এমন একটি হিদায়তনামা, যার অর্থ বুঝে তদনুসারী কাজ করার মূল লক্ষ্য ছাড়াও মানব জীবনের সংশোধনে এর ক্রিয়াশীল হওয়াও সুস্পষ্ট ; এতদ-সঙ্গে এর শব্দাবলী তিলাওয়াত করাতেও অজ্ঞাতভাবে মানব মনের সংশোধনে প্রভাব বিস্তার করে।

এ আয়াতে আঞ্জাহর নির্দেশক্রমে অজ্ঞান থেকে আলোর দিকে বের করে আনার কাজকে রসুলুল্লাহ্ (স)-র সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে একথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, যদিও হিদায়ত সৃষ্টি করা প্রকৃতপক্ষে আঞ্জাহ তা'আলার কাজ। কিন্তু রসুলুল্লাহ্ (স)-র মধ্যস্থতা ব্যতিরেকে এটা অর্জন করা যায় না। কোরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যাও তাই গ্রহণযোগ্য, যা রসুলুল্লাহ্ (স) স্বীয় উক্তি ও কর্ম দ্বারা ব্যক্ত করেছেন। এর বিপরীত ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়।

إِلَىٰ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ- اللَّهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاءِ وَإِذَا وَمَا فِي الْأَرْضِ

—এ আয়াতের শুরুতে যে অন্ধকার ও আলোর উল্লেখ করা হয়েছিল, বলা বাহুল্য, তা ঐ অন্ধকার ও আলো নয়, যা সাধারণ দৃষ্টিতে দেখা যায়। তাই তা ফুটিয়ে তোলার জন্য এ বাক্যে বলা হয়েছে যে, ঐ আলো হচ্ছে আল্লাহর পথ। এই পথে যারা চলে, তারা অন্ধকারে চলাচলকারীর অনুরূপ পথপ্রান্ত হয় না, হেঁচট খায় না এবং গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে বিফল মনোরথ হয় না। আল্লাহর পথ বলে ঐ পথ বোঝান হয়েছে, যেপথে চলে মানুষ আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে এবং তাঁর সন্তুষ্টির মর্যাদা অর্জন করতে পারে।

এ স্থলে আল্লাহ শব্দটি পরে এবং তাঁর আগে তাঁর দু'টি গুণবাচক নাম **عَزِيزٌ** ও **حَمِيدٌ** উল্লেখ করা হয়েছে। **عَزِيزٌ** শব্দের অর্থ শক্তিশালী ও পরাক্রান্ত এবং **حَمِيدٌ** শব্দের অর্থ ঐ সত্তা, যিনি প্রশংসার যোগ্য। এ দু'টি গুণবাচক শব্দকে আসল নামের পূর্বে উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ পথ পথিককে যে সত্তার দিকে নিয়ে যায়, তিনি পরাক্রান্ত ও এবং প্রশংসার যোগ্যও। ফলে এ পথের পথিক কোথাও হেঁচট খাবে না এবং তার প্রচেষ্টা বিফলে যাবে না; বরং তাঁর গন্তব্যস্থলে পৌঁছা সুনিশ্চিত। শর্ত এই যে, এ পথ ছাড়তে পারবে না।

আল্লাহ তা'আলার এ দু'টি গুণ আগে উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে : **اللَّهُ الَّذِي لَهُ**

**مَا فِي السَّمَاءِ وَإِذَا وَمَا فِي الْأَرْضِ** —অর্থাৎ তিনি ঐ সত্তা, যিনি নভোমণ্ডল

ও ভূমণ্ডলের সব কিছুর স্রষ্টা ও মালিক। এতে কোন অংশীদার নেই।

**وَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن عَذَابِ شَدِيدٍ** —শব্দের অর্থ কঠোর শাস্তি ও বিপর্যয়।

অর্থ এই যে, যারা কোরআনরূপী নিয়ামত অস্বীকার করে এবং অন্ধকারেই থাকতে পছন্দ করে, তাদের জন্য রয়েছে ধ্বংস ও বরবাদী, ঐ কঠোর আঘাবের কারণে যা তাদের উপর আগতিত হবে।

সারসংক্ষেপ : আয়াতের সারসংক্ষেপ এই যে, সব মানুষকে অন্ধকার থেকে বের করে আল্লাহর পথের আলোতে আনার জন্য কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু যে হতভাগা কোরআনকেই অস্বীকার করে, সে নিজেই নিজেকে আঘাবে নিষ্ক্রেপ করে। কোরআন যে আল্লাহর কালাম, যারা এ বিষয়টিই স্বীকার করে না, তারা তো নিশ্চিতরূপেই উপরোক্ত সাবধান বাণীর লক্ষ্য; কিন্তু যারা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে অস্বীকার করে না, তবে কার্যক্ষেত্রে কোরআনকে ত্যাগ করে বসেছে —তিল্লাওয়াজাতের সাথেও কোন সম্পর্ক রাখে না এবং বোঝা ও তা মেনে চলার প্রতিও ক্রক্ষেপ করে না, তারা মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও সাবধান বাণীর আওতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নয়।

الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْعِوَةَ الَّذِينَ عَلَى الْأَخْصَرَةِ وَيَمْدُونَ مَنْ

سَبِيلِ اللَّهِ وَيَهْتَمُّونَهَا عَوْجًا أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ۝

এ আয়াতে কোরআনে অবিশ্বাসী কাফিরদের তিনটি অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। এক. তারা পার্থিব জীবনকে পরকালের তুলনায় অধিক পছন্দ করে এবং অগ্রাধিকার দেয়। এজন্যই পার্থিব লাভ বা আয়ামের খাতিরে পরকালের ক্ষতি স্বীকার করে নেয়। এতে তাদের রোগ নির্ণয়ের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তারা কেন কোরআনের সুস্পষ্ট মু'জিহা দেখা সত্ত্বেও একে অস্বীকার করে? কারণ এই যে, দুনিয়ার বর্তমান জীবনের ভালবাসা তাদেরকে পরকালের ব্যাপারে অন্ধ করে রেখেছে। তাই তারা অন্ধকারকেই পছন্দ করে এবং আলোর দিকে আসার কোন আগ্রহ রাখে না।

দ্বিতীয় অবস্থা এই যে, তারা নিজেরা তো অন্ধকারে থাকা পছন্দ করেই, তদুপরি সর্বনাশের কথা এই যে, নিজেদের শ্রান্তি ঢাকা দেওয়ার জন্য অন্যদেরকেও আলোর মহাসড়ক অর্থাৎ আঞ্জাহর পথে চলতে বাধা দান করে।

কোরআন বোঝার ব্যাপারে কোন কোন ভ্রান্তির প্রতি জল্পনা নির্দেশ : তৃতীয় অবস্থা

— **يَهْتَمُّونَهَا عَوْجًا** — বাক্যে বর্ণিত হয়েছে। এর অর্থ দ্বিবিধ হতে পারে। এক. তারা

শ্রীম মন্দ বাসনা ও মন্দ কর্মের কারণে এ চিন্তায় মগ্ন থাকে যে, আঞ্জাহর উজ্জ্বল ও সরল পথে কোন বক্রতা ও দোষ দৃষ্টিগোচর হলেই তারা আপত্তি ও ভৎসনা করার সুযোগ পাবে। ইবনে কাসীর এ অর্থই বর্ণনা করেছেন।

দুই. তারা এরূপ ষ্টোজাখু'জিতে লেগে থাকে যে, আঞ্জাহর পথে অর্থাৎ কোরআন ও হাদীসের কোন বিষয়বস্তু তাদের চিন্তাধারা ও মনোরত্তির অনুকূলে পাওয়া যায় কিনা, পাওয়া গেলে সেটাকে তারা নিজেদের সত্যতার প্রমাণ হিসাবে পেশ করতে পারবে, তফসীরে-কুর-তুবীতে এ অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে। আজকাল অসংখ্য পণ্ডিত ব্যক্তি এ ব্যাধিতে আক্রান্ত আছে। তারা মনে মনে একটি চিন্তাধারা কখনও শ্রান্তিবশত এবং কখনও বিজাতীয় প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে গড়ে নেয়। এরপর কোরআন ও হাদীসে এর সমর্থন তাল্লাশ করে। কোথাও কোন শব্দ এ চিন্তাধারার অনুকূলে দৃষ্টিগোচর হলেই একে নিজেদের পক্ষে কোরআনী প্রমাণ মনে করে। অথচ এ কর্মপন্থাটি নীতিগতভাবেই ভ্রান্ত। কেননা, মু'মিনের কাজ হল নিজস্ব চিন্তাধারা ও মনোরত্তি থেকে মুক্ত মন নিয়ে কোরআন ও হাদীসকে দেখা। এরপর এগুলো থেকে সুস্পষ্টভাবে যা প্রমাণিত হয়, সেটাকে নিজের মতবাদ সাব্যস্ত করা।

— **أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ** — উপরে যেসব কাফিরের তিনটি অবস্থা বর্ণিত হয়েছে,

এ বাক্যে তাদেরই অশুভ পরিণতি উল্লেখ করা হয়েছে। এর সারমর্ম এই যে, তারা পথ-ভ্রষ্টতায় এত দূর পৌঁছে গেছে যে, সেখান থেকে সৎ পথে ফিরে আসা তাদের পক্ষে কঠিন।

বিধান ও মাস'আলা : তফসীরে কুরতুবীতে বলা হয়েছে, এ আয়াতে যদিও কাফিরদের এ তিনটি অবস্থা পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং তাদেরই এ পরিণাম উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা পথভ্রষ্টতায় অনেক দূরে চলে গেছে, কিন্তু নীতির দিক দিয়ে যে মুসলমানের মধ্যে এ তিনটি অবস্থা বিদ্যমান থাকে, সেও এ সাবধান বাণীর যোগ্য। অবস্থাভ্রমের সারমর্ম এই :

(১) দুনিয়ার মহক্বতকে পরকালের উপর প্রবল রাখা এমনকি ধর্মপথে না আসা।

(২) অন্যদেরকেও নিজের সাথে শরীক রাখার জন্য আল্লাহর পথে চলতে না দেওয়া।

(৩) কোরআন ও হাদীসের অর্থ পরিবর্তন করে নিজস্ব চিন্তাধারার সাথে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করা।

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ  
اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

(৪) আমি সব পয়গম্বরকেই তাদের স্বজাতির ভাষাভাষী করেই প্রেরণ করেছি, যাতে তাদেরকে পরিষ্কার বোঝাতে পারে। অতঃপর আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা, পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথ প্রদর্শন করেন। তিনি পরাক্রান্ত, প্রজাময়।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং (এ গ্রন্থটি আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপারে কোন কোন কাফির সন্দেহ করে যে, আরবী ভাষায় কেন? এতে তো সন্তাবনা বোঝা যায় যে, স্বয়ং পয়গম্বর তা রচনা করে থাকবে। অন্যরব ভাষায় অবতীর্ণ হলে এরূপ সন্তাবনাই থাকত না এবং অন্যরব হওয়ার ক্ষেত্রে অন্যান্য ঐশী গ্রন্থের অনুরূপও হত। তাদের এ সন্দেহ নিরর্থক। দেননা) আমি সব (পূর্ববর্তী) পয়গম্বরকে (ও) তাদেরই সম্প্রদায়ের ভাষায় পয়গম্বর করে প্রেরণ করেছি যাতে (তাদের ভাষায়) তাদের কাছে (আল্লাহর বিধানসমূহ) বর্ণনা করে। (কারণ, আসল লক্ষ্য হচ্ছে সুস্পষ্ট বর্ণনা। সব গ্রন্থেরই এক ভাষায় হওয়া কোন লক্ষ্য নয়)। অতঃপর (বর্ণনা করার পর) যাকে ইচ্ছা, আল্লাহ্ পথভ্রষ্ট করেন (অর্থাৎ সে বিধানসমূহ কবুল করে না) এবং যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করেন (অর্থাৎ সে বিধানসমূহ কবুল করে নেয়)। এবং তিনিই (সব ক্ষিষ্ণুর উপর) পরাক্রমশালী (এবং) প্রজাময় (সূত্রাং পরাক্রমশালী হওয়ার কারণে সবাইকে পথপ্রদর্শন করতে পারতেন; কিন্তু প্রজাময় হওয়ার কারণে তা করেন নি)।

## আনুষ্ঠানিক ভাষ্য বিষয়

প্রথম আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার একটি নিয়ামত ও সুবিধার কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি যখনই কোন রসূল কোন জাতির কাছে প্রেরণ করেছেন, তখনই সেই জাতির ভাষাভাষী রসূল প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনি আল্লাহ্র বিধানসমূহ তাদেরই ভাষায় তাদেরই বোধগম্য আঙ্গিকে ব্যক্ত করে এবং তাদের পক্ষে তা বোঝা সহজ হয়। রসূলের ভাষা উম্মতের ভাষা থেকে ভিন্ন হলে বিধি-বিধান বোঝার ব্যাপারে উম্মতকে অনুবাদের ঝুঁকি গ্রহণ করতে হত। এরপরও বিধি-বিধানকে বিস্তারিত বোঝার ব্যাপারটিতে সন্দেহ থেকে যেত। তাই হিব্রু ভাষীদের কাছে কোন রসূল প্রেরণ করা হলে তাঁর ভাষাও হিব্রুই হত, পারস্যবাসীদের প্রতি প্রেরিত রসূলের ভাষা ফারসী এবং বার্বারদের প্রতি প্রেরিত রসূলের ভাষা বার্বারী হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। যাকে রসূলরূপে প্রেরণ করা হত, কোন সময় তিনি ঐ জাতিরই একজন হতেন এবং জাতির ভাষাই তাঁর মাতৃভাষা হত। আবার কোন সময় এমনও হয়েছে যে, রসূলের মাতৃভাষা ভিন্ন হলেও আল্লাহ্ তা'আলা এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছেন যে, তিনি ঐ জাতির ভাষা শিখে নিয়েছেন। উদাহরণত হযরত লুত (আ) জন্ম-গতভাবে ইরাকের অধিবাসী ছিলেন। ইরাকের ভাষা ছিল ফার্সী। কিন্তু সিরিয়ান হিজরত করে তিনি সেখানেই বিবাহ-শাদী করেন এবং তাদের ভাষা শিখে নেন। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে সিরিয়ান এক অংশের রসূল নিযুক্ত করেন।

আমাদের রসূল (সা) স্থানের দিক দিয়ে সারা বিশ্বের জন্য এবং কালের দিক দিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত সর্বকালের জন্য প্রেরিত হয়েছেন। জগতের কোন জাতি, কোন দেশের অধিবাসী এবং কোন ভাষাভাষী তাঁদের রিসালাত ও নব্বয়তের আওতাভিত্তিক নয় এবং কিয়ামত পর্যন্ত মত নতুন জাতি ও নতুন ভাষার উদ্ভব হবে, তারা সবাই রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সম্বোধিত উম্মতের অন্তর্ভুক্ত হবে। কোরআন পাকে বলা হয়েছে :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا — হে লোকসকল!

আমি আল্লাহ্র রসূল, তোমাদের সবার প্রতি। সহী বুখারী ও মুসলিমে হযরত জাবের (রা)-এর রেওয়াজেতে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) সব পয়গম্বরের মধ্যে নিজের পাঁচটি স্বাতন্ত্র্যমূলক বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে বলেন : আমার পূর্বে প্রত্যেক রসূল ও নবী বিশেষভাবে নিজের সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হতেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা আমাকেই সমগ্র মানব জাতির জন্য রসূল মনোনীত করে প্রেরণ করেছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদম (আ) থেকে জগতে মানব-বসতি শুরু করেছেন এবং তাঁকেই মানব জাতির সর্বপ্রথম নবী ও পয়গম্বরের মনোনীত করেন। এরপর পৃথিবীর জনসংখ্যা যতই বৃদ্ধি পেয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে বিভিন্ন পয়গম্বরের মাধ্যমে হিদায়ত ও পথ-প্রদর্শনের ব্যবস্থা ততই সম্প্রসারিত হয়েছে। প্রত্যেক যুগ ও প্রত্যেক জাতির অবস্থার উপযোগী বিধি-বিধান ও শরীয়ত অবতীর্ণ হয়েছে। শেষ পর্যন্ত মানব জগতের ক্রমবিকাশ যখন পূর্ণত্বের স্তরে উপনীত হয়েছে, তখন সাইয়েদুল

আওয়ালীন ওয়াল-আখেরীন ইমামুল-আছিয়া মুহাম্মদ মুক্তফা (সা)-কে সমগ্র বিশ্বের জন্য রসূলরূপে প্রেরণ করা হয়েছে। তাঁকে যে গ্রন্থ ও শরীয়ত দান করা হয়েছে, তাকে সমগ্র বিশ্ব এবং কিয়ামত পর্যন্ত সর্বকালের জন্য স্বয়ংসম্পূর্ণ করে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন :

---الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي

আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে দিয়েছি এবং তোমাদের জন্য নিয়ামত পূর্ণ করে দিয়েছি।

পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের শরীয়ত ও নিজ নিজ সময় এরং ভূখণ্ডের দিক দিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। সেগুলোকেও অসম্পূর্ণ বলা যায় না। কিন্তু মুহাম্মদী শরীয়তের সম্পূর্ণতা কোন কোন বিশেষ সময় ও বিশেষ ভূখণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এ সম্পূর্ণতা সর্বকালীন ও সার্বত্রিক। এ দিক দিয়ে দীনের স্বয়ংসম্পূর্ণতা এই শরীয়তেরই বৈশিষ্ট্য এবং এ কারণেই রসূলুল্লাহ (সা) পর্যন্ত নবুয়তের পরম্পরা শেষ করে দেওয়া হয়েছে।

কোরআন আরবী ভাষায় কেন? এখানে প্রশ্ন হয় যে, পূর্ববর্তী উম্মতদের প্রতি প্রেরিত রসূল তাদেরই ভাষাভাষী ছিলেন। ফলে তাদেরকে অনুবাদের শ্রম স্বীকার করতে হয়নি। শেষ পয়গম্বরের বেলায় এরূপ হল না কেন? রসূলুল্লাহ (সা)-কে শুধু আরবেই কেন আরবী ভাষা দিয়ে প্রেরণ করা হল এবং তাঁর গ্রন্থ কোরআনও আরবী ভাষায়ই কেন নাথিল হল? একটু চিন্তা-ভাবনা করলেই এর উত্তর পরিষ্কার হবে। বিশ্বের জাতিসমূহের মধ্যে শত শত ভাষা প্রচলিত রয়েছে। এমতাবস্থায় সবাইকে হিদায়ত করার দু'টি মাত্র উপায় সম্ভবপর ছিল। এক. প্রত্যেক জাতির ভাষায় পৃথক পৃথক কোরআন অবতীর্ণ হওয়া এবং রসূলুল্লাহ (সা)-র শিক্ষাও তদ্রূপ প্রত্যেক জাতির ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন হওয়া। আল্লাহর অপার শক্তির সামনে এরূপ ব্যবস্থাপনা মোটেই কঠিন ছিল না কিন্তু সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য এক রসূল, এক গ্রন্থ, এক শরীয়ত প্রেরণ করার মাধ্যমে তাদের মধ্যে হাজারো মতবিরোধ সত্ত্বেও ধর্মীয়, চারিত্রিক ও সামাজিক ঐক্য ও সংহতি স্থাপনের যে মহান লক্ষ্য অর্জন করা উদ্দেশ্য ছিল, এমতাবস্থায় তা অর্জিত হত না।

এছাড়া প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক দেশের কোরআন ও হাদীস ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় থাকলে কোরআন পরিবর্তনের অসংখ্য পথ খুলে যেত এবং কোরআন যে একটি সংরক্ষিত কালাম, যা বিজাতি এবং কোরআন অবিদ্বাসীরাও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে, এ অলৌকিক বৈশিষ্ট্য খতম হয়ে যেত। এছাড়া একই ধর্ম এবং একই গ্রন্থ সত্ত্বেও এর অনুসারীরা শতধা বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত এবং তাদের মধ্যে ঐক্যের কোন কেন্দ্রবিন্দুই অবশিষ্ট থাকত না। এক আরবী ভাষায় কোরআন নাথিল হওয়া সত্ত্বেও এর ব্যাখ্যা ও তফসীরে বৈধ সীমার মধ্যে কত মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে! অবৈধ পন্থায় যেসব মতবিরোধ হয়েছে, সেগুলোর তো ইয়ত্তাই নেই। এ থেকেই উপরোক্ত বক্তব্যের সত্যতা সম্যক অনুমান করা যায়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও যারা কোন না কোন স্তরে কোরআনের বিধি-বিধান পালন করে, তাদের মধ্যে জাতীয় ঐক্য ও স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব বিদ্যমান রয়েছে।



মোটকথা এই যে, রসূলে করীম (সা)-এর নব্বয়ত সমগ্র বিশ্বের জন্য ব্যাপক হওয়ার প্রেক্ষিতে প্রত্যেক জাতির ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন কোরআনের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্ববাসীর শিক্ষা ও হিদায়তের পন্থাকে কোন স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিও সঠিক ও নির্ভুল মনে করতে পারে না। তাই দ্বিতীয় পন্থাটিই অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তা এই যে, কোরআন একই ভাষায় অবতীর্ণ হবে এবং রসূলের ভাষাও কোরআনেরই ভাষা হবে। এরপর অন্যান্য দেশীয় ও আঞ্চলিক ভাষায় এর অনুবাদ প্রচার করা হবে। নায়েবে রসূল আলিমগণ প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক দেশে রসূলুল্লাহ (সা)-র নির্দেশাবলী তাঁদের ভাষায় বুঝাবেন এবং প্রচার করবেন। আল্লাহ তা'আলা এর জন্য বিশ্বের ভাষাসমূহের মধ্য থেকে আরবী ভাষাকে নির্বাচন করেছেন। এর অনেক কারণ রয়েছে।

**আরবী ভাষার কতিপয় বৈশিষ্ট্য :** প্রথমত আরবী ভাষা উর্ধ্ব জগতের সরকারী ভাষা। ফেরেশতাদের ভাষা আরবী, লওহে মাহফুযের ভাষা আরবী; যেমন আয়াত :

بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ فِي لُغَةٍ مَّعْرُوفَةٍ ۝ وَهُوَ يُعَلِّمُهُ الْوَحْيَ الْمُبِينَ ۝ وَكَانَ عَرَبِيًّا مُّعَرَّبًا ۝ وَقَدْ عَلَّمْنَاهُ الْإِسْلَامَ بَلَدًا ۝  
 —থেকে জানা যায়। জ্ঞানাত মানুষের

আসল দেশ। সেখানে তাকে ফিরে যেতে হবে। সেখানকার ভাষাও আরবী। তাবারান, মুস্তাদরাক, হাকিম ও শোয়াবুল ঈমান বায়হাকীতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের রেওয়াজেতে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন :

احبوا العرب لثلاث لاني عربي والقراي مرابي وكلام اهل الجنة مرابي  
 —এ রেওয়াজেতে হাকিম

বিশুদ্ধ বলেছেন। জামে সগীরেও বিশুদ্ধ হওয়ার আলামত বাস্তব করা হয়েছে। কোন কোন মুহাদ্দিস একে দুর্বল বলেছেন। হাদীস শাস্ত্রজ্ঞ ইবনে তাইমিয়া বলেন: এ হাদীসের বিষয়-বস্তুও প্রমাণিত—‘হাসান’-এর নিশ্চয় নয়।--- (ফয়যুল-কাদীর, শরহে জামে সগীর, ১ম খণ্ড ১৭৯ পৃঃ)

হাদীসের অর্থ এই যে, তোমরা তিনটি কারণে আরবকে ভালবাস : (১) আমি আরবীয়, (২) কোরআন আরবী ভাষায় এবং (৩) জান্নাতীদের ভাষা আরবী।

তফসীলে কুরতুবী প্রমুখ গ্রন্থে আরও বর্ণিত আছে যে, জান্নাতে হযরত আদম (আ)-এর ভাষা ছিল আরবী। পৃথিবীতে অবতরণ ও তওবা কবুল হওয়ার পর আরবী ভাষাই কিছু পরিবর্তিত হয়ে সুরইয়ানী ভাষায় রূপ পরিগ্রহ করে।

এ থেকে ঐ রেওয়াজেতেরও সমর্থন পাওয়া যায়, যা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা পয়গম্বরগণের প্রতি যত গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন, সবগুলোর আসল ভাষা ছিল আরবী। জিবরাইল (আ) সংশ্লিষ্ট পয়গম্বরের ভাষায় অনুবাদ করে তা পয়গম্বরগণের কাছে বর্ণনা করেছেন এবং তাঁরা নিজ নিজ জাতীয় ভাষায় তা উম্মতের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। এই রেওয়াজেতটি আল্লামা সূত্বী ইতকান গ্রন্থে এবং অধিকাংশ তফসীরবিদ আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন। এর সার বিষয়বস্তু এই যে, সব ঐশী গ্রন্থের আসল ভাষা আরবী। কিন্তু কোরআন ব্যতীত

অন্যান্য গ্রন্থ সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর দেশীয় ও জাতীয় ভাষায় অনুবাদ করে দেওয়া হয়েছে। তাই সেগুলোর অর্থসম্ভার তো আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ; কিন্তু ভাষা ও শব্দ পরিবর্তিত। এটা একমাত্র কোরআনেরই বৈশিষ্ট্য যে, এর অর্থসম্ভারের মত শব্দাবলীও আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত। সম্ভবত এ কারণেই কোরআন দাবী করেছে যে, সমগ্র বিশ্বের জিন্ম ও মানব একত্রিত হয়েও কোরআনের একটি ছোট সূরা—বরং আয়াতের অনুরূপ তুল্য রচনা করতে পারবে না। কেননা, এটা অর্থগত ও শব্দগত দিক দিয়ে আল্লাহর কালাম এবং আল্লাহর গুণ। কেউ এর অনুকরণ করতে সক্ষম নয়। অর্থগত দিক দিয়ে তো অন্যান্য ঐশীগ্রন্থ আল্লাহর কালাম; কিন্তু সেগুলোতে সম্ভবত আসল আরবী ভাষায় পরিবর্তে অনূদিত ভাষায় হওয়ার কারণে এই দাবী অন্য কোন ঐশীগ্রন্থ করেনি। নতুবা কোরআনের মত আল্লাহর কালাম হওয়ার সুবাদে প্রত্যেক গ্রন্থের অদ্বিতীয় ও অনুপম হওয়া নিশ্চিত ছিল।

আরবী ভাষায় নিজস্ব গুণাবলীও এ ভাষাকে বেছে নেওয়ার অন্যতম কারণ। এ ভাষায় একটি উদ্দেশ্যকে প্রকাশ করার জন্য অসংখ্য উপায় ও পথ বিদ্যমান রয়েছে।

আরও একটি কারণ এই যে, মুসলমানকে আল্লাহ তা'আলা প্রকৃতগতভাবেই আরবী ভাষায় সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন। ফলে প্রত্যেক ব্যক্তি অনায়াসে আরবী ভাষা মতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু শিখে নিতে পারে। একারণেই সাহাবায়ে-কিরাম যে দেশেই পৌঁছেছেন, অল্পদিনের মধ্যেই কোনরূপ জোর জবরদস্তি ব্যতিরেকেই সে দেশের ভাষা আরবী হয়ে গেছে। মিসর, সিরিয়া, ইরাক—এ সব দেশের কোনটিরই ভাষা আরবী ছিল না। কিন্তু আজ এগুলো আরবদেশ বলে কথিত হয়।

আরও একটি কারণ এই যে, আরবরা ইসলাম-পূর্বকালে যদিও জঘন্য সব মন্দ কর্মে লিপ্ত ছিল, কিন্তু এমতাবস্থায়ও এ জাতির কর্মক্ষমতা, নৈপুণ্য ও ভাবাবেগ ছিল অনন্যসাধারণ। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ পয়গম্বরকে তাদের মধ্য থেকে উদ্ভূত করেন, তাদের ভাষাকে কোরআনের জন্য পছন্দ করেন এবং রসূল (সা)-কে সর্বপ্রথম তাদের হিদায়ত ও শিক্ষার আদেশ দেন।

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ

আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম স্বীয় রসূলের চারপাশে তাদেরই এমন ব্যক্তিবর্গকে জমায়েত করেন, যারা রসূলুল্লাহ (সা)-র জন্য নিজেদের জানমাল, সন্তান-সন্ততি সবকিছু উৎসর্গ করে দেন এবং তাঁর শিক্ষাকে প্রাপের চেয়েও প্রিয় মনে করেন। এভাবে তাদের উপর তাঁর সংসর্গ ও শিক্ষার গভীর প্রভাব প্রতিফলিত হয় এবং তাদের দ্বারা এমন একটি আদর্শ সমাজ অস্তিত্ব লাভ করে, যার নজির ইতিপূর্বে আসমান ও জমিন প্রত্যক্ষ করেনি। রসূলুল্লাহ (সা) এই নজিরবিহীন দলটিকে কোরআনী শিক্ষা প্রচার ও প্রসারের জন্য নিযুক্ত করেন এবং বলেন :

بلغوا عني ولو آية

অর্থাৎ তোমরা আমার কাছ

থেকে শ্রুত প্রত্যেকটি কথা উশ্মতের কাছে পৌঁছিয়ে দাও। সাহাবায়ে কিরাম এই নির্দেশটি অলগুণনীয় বলে গ্রহণ করে নেন এবং বিশ্বের কোণায় কোণায় পৌঁছে গিয়ে কোরআনের শিক্ষাকে সর্বত্র ছড়িয়ে দেন। রসূলুল্লাহ (সা)-র ওফাতের পর পঁচিশ বৎসরও অতিক্রান্ত

হয়নি, কোরআনের আওয়ায প্রাচ্য-প্রতীচ্য নিবিশেষে তদানীন্তন পরিচিত পৃথিবীর সর্বত্র অনুন্নিত হতে থাকে।

অপরদিকে আল্লাহ তা'আলা তফদীরগত ও সৃষ্টিগতভাবে রসূলুল্লাহ (সা)-র দাওয়াত পর্যায়ে উশ্মত (দুনিয়ার সব মুশরিক এবং গ্রন্থধারী ইহদী ও খৃষ্টান যাদের অন্তর্ভুক্ত)-এর মধ্যে একটি বিশেষ নৈপুণ্য এবং শিক্ষা-দীক্ষা, গ্রন্থ রচনা ও প্রচারকার্যের এমন অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে দেন যে, এর নজির জগতের অতীত ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায় না। এর ফলশ্রুতিতে অনারব জাতিসমূহের মধ্যে শুধু কোরআন ও হাদীসের জ্ঞান অর্জনের অদম্য স্পৃহাই জাগ্রত হয়নি, বরং আরবী ভাষা শিক্ষা ও তার প্রসারের ক্ষেত্রে অনারবদের অবদান আরবদের চাইতেও কোন অংশে কম নয়।

বর্তমানে আরবী ভাষা, এর বাকপদ্ধতি এবং ব্যাকরণ ও অলংকার শাস্ত্রের যতগুলো গ্রন্থ পৃথিবীতে বিদ্যমান আছে, সেগুলোর অধিকাংশই অনারব লেখকদের রচিত। এটি এক বিস্ময়কর সত্য বটে। কোরআন ও হাদীসের সংকলন, তফসীর ও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রেও অনারবদের ভূমিকা আরবদের চাইতে কম নয়।

এভাবে রসূলুল্লাহ (সা)-র ভাষা এবং তাঁর গ্রন্থ আরবী হওয়া সত্ত্বেও সমগ্র বিশ্বকে তা বেষ্টিত করে নিয়েছে এবং দাওয়াত ও প্রচারের পর্যায়ে আরব ও অনারবের পার্থক্য বিলুপ্ত হয়ে গেছে। প্রত্যেক দেশ, জাতি এবং আরব-ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে এমন আলিম সৃষ্টি হয়েছে, যাঁরা কোরআন ও হাদীসের শিক্ষাকে নিজ নিজ জাতীয় ভাষায় অত্যন্ত সহজ-ভাবে পৌঁছে দিয়েছেন। ফলে প্রত্যেক জাতির ভাষায় পয়গম্বর প্রেরণের যে প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হতে পারতো, তা অজিত হয়ে গেছে।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে : আমি মানুষের সুবিধার জন্য পয়গম্বরগণকে তাদের ভাষায় প্রেরণ করেছি--যাতে পয়গম্বরগণ আমার বিধি-বিধান উত্তমরূপে বুঝিয়ে দেন। কিন্তু হিদায়ত ও পথদ্রষ্টতা এরপরও মানুষের সাধ্যাধীন নয়। আল্লাহ তা'আলাই স্বীয় শক্তিবলে যাকে ইচ্ছা পথদ্রষ্টতায় রাখেন এবং যাকে ইচ্ছা হিদায়ত দেন। তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজাবান।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ  
 وَذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِنَا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۝ وَإِذْ  
 قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِذْ كُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ  
 فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيَدْعُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ  
 نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ۝ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن

شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ۝ وَقَالَ  
 مُوسَىٰ إِنَّ تَكْفُرًا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ - جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ  
 لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ۝

(৫) আমি মুসাকে নিদর্শনাবলীসহ প্রেরণ করেছিলাম যে, স্বজাতিকে অঙ্ককার থেকে আলোকের দিকে আনয়ন এবং তাদেরকে আল্লাহর দিনসমূহ স্মরণ করান। নিশ্চয় এতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে। (৬) যখন মুসা স্বজাতিকে বললেন : তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর—যখন তিনি তোমাদেরকে ফেরাউনের সম্প্রদায়ের কবল থেকে মুক্তি দেন। তারা তোমাদেরকে অত্যন্ত নিকৃষ্ট ধরনের শাস্তি দিত, তোমাদের ছেলেরদেরকে হত্যা করত এবং তোমাদের মেয়েদেরকে জীবিত রাখত। এবং এতে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে বিরাট পরীক্ষা হয়েছিল। (৭) যখন তোমাদের পালনকর্তা মোষণা করলেন যে, যদি কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর, তবে তোমাদেরকে আরও দেব এবং যদি অকৃতজ্ঞ হও, তবে নিশ্চয়ই আমার শাস্তি হবে কঠোর। (৮) এবং মুসা বললেন : তোমরা এবং পৃথিবীস্থ সবাই যদি কুফরী কর, তথাপি আল্লাহ্ জমুখাপেক্ষী, শাস্তীয় গুণের আধার।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং আমি মুসা (আ)-কে স্বীয় নিদর্শনাবলী দিয়ে প্রেরণ করেছি যে, স্বজাতিকে (কুফরী ও গোনাহর) অঙ্ককার থেকে (বের করে ঈমান ও আনুগত্যের) আলোকের দিকে আনয়ন করুন এবং তাদেরকে আল্লাহর (নিয়ামত ও আযাবের) ব্যাপারাদি স্মরণ করান। নিশ্চয় এসব ব্যাপারের মধ্যে শিক্ষা রয়েছে প্রত্যেক সবারকারী, শোকরকারীর জন্য। (কেননা, নিয়ামত স্মরণ করে শোকর করবে এবং শাস্তি ও তার অবসান স্মরণ করে ভবিষ্যত বিপদাপদে সবার করবে।) এবং স্মরণ করুন, যখন (আমার উপরোক্ত আদেশ অনুযায়ী) মুসা (আ) (স্বজাতিকে) বললেন : তোমরা নিজেদের প্রতি আল্লাহর নিয়ামত স্মরণ কর, যখন তোমাদেরকে ফেরাউনের লোকদের কবল থেকে মুক্তি দেন—যারা তোমাদেরকে অমানুষিক কষ্ট দিত এবং তোমাদের ছেলেরদেরকে হত্যা করত এবং তোমাদের মেয়েদেরকে (অর্থাৎ কন্যাদেরকে, যারা বড় হয়ে বয়স্ক স্ত্রীলোকে পরিণত হয়ে যেত) ছেড়ে দিত (যাতে তাদেরকে শ্রমে নিমুক্ত করে। অতএব, এটাও হত্যার ন্যায় এক প্রকার শাস্তি ছিল।) এবং এতে (অর্থাৎ বিপদ ও মুক্তি উভয়ের মধ্যে) তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে একটি বিরাট পরীক্ষা আছে। [অর্থাৎ মুসিবতে বালা এবং মুক্তিতে নিয়ামত ছিল। বালা ও নিয়ামত উভয়টি বান্দার জন্য পরীক্ষা। সুতরাং একথা বলে মুসা (আ) নিয়ামত ও শাস্তি উভয়টিই স্মরণ করিয়েছেন।] এবং (মুসা আরও বললেন যে, হে আমার সম্প্রদায়) স্মরণ কর,

যখন তোমাদের পালনকর্তা (আমার মাধ্যমে) ঘোষণা করে দেন যে, যদি (আমার নিয়ামত-সমূহ শুনে) তোমরা কৃতজ্ঞ হও, তবে তোমাদেরকে (হয় দুনিয়াতেও, না হয় পরকালে তো অবশ্যই) অধিক নিয়ামত দেব এবং যদি তোমরা (এসব নিয়ামত শুনে) অকৃতজ্ঞ হও, তবে (মনে রেখ), আমার শাস্তি খুবই ভয়ঙ্কর। (অকৃতজ্ঞতা করলে এর সম্ভাবনা আছে।) এবং মুসা (আরও) বলেন : যদি তোমরা এবং সারা বিশ্বের সব মানুষ একত্রিত হয়েও অকৃতজ্ঞতা কর, তবে আল্লাহ্ তা'আলা (-র কোন ক্ষতি নেই। কেননা, তিনি) সম্পূর্ণ অমুখাপেক্ষী (এবং স্বীয় সত্তায়) প্রশংসার যোগ্য। (সেখানে অপরের দ্বারা পূর্ণতা অর্জনের সম্ভাবনাই নেই। তাই আল্লাহ্‌র ক্ষতি কল্পনাই করা যায় না। পক্ষান্তরে তোমরা তো

إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ বাক্যে নিজেদের ক্ষতির কথা শুনলে। তাই কৃতজ্ঞ হও—  
অকৃতজ্ঞ হয়ো না।)

### আনুশঙ্গিক জাতব্য বিষয়

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে : আমি মুসা (আ)-কে আয়াত দিয়ে প্রেরণ করেছি, যাতে সে স্বজাতিকে কুফর ও গোনাহর অঙ্গকার থেকে ঈমান ও আনুগত্যের আলোতে নিয়ে আসে।

آيَات — আয়াত শব্দের অর্থ তওরাতের আয়াতও হতে পারে ; কারণ, সেগুলো

নামিল করার উদ্দেশ্যই ছিল সত্যের আলো ছড়ানো। আয়াতের অন্য অর্থ মু'জিযাও হয়। এখানে এ অর্থও উদ্দিষ্ট হতে পারে। মুসা (আ)-কে আল্লাহ্ তা'আলা ন'টি মু'জিযা বিশেষভাবে দান করেছিলেন। তন্মধ্যে লাঠির সর্প হয়ে যাওয়া এবং হাত উজ্জ্বল হয়ে যাওয়ার কথা কোরআনের একাধিক জায়গায় উল্লিখিত আছে। এ অর্থে উদ্দেশ্য এই যে, মুসা (আ)-কে সুস্পষ্ট মু'জিযা দিয়ে পাঠানো হয়েছে, সেগুলো দেখার পর কোন ভ্রম ও সমঝদার ব্যক্তি স্বীকার ও অবাধ্যতায় কাসেম থাকতে পারে না।

একটি সূক্ষ্মতত্ত্ব এ আয়াতে 'কওম' শব্দ ব্যবহার করে নিজ কওমকে অঙ্গকার থেকে আলোতে আনার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়বস্তুটিই যখন আলোচ্য সূরার প্রথম আয়াতে রসুলুল্লাহ্ (সা)-কে সম্বোধন করে বর্ণনা করা হয়েছে, তখন সেখানে 'কওম' শব্দের পরিবর্তে نَاس (মানবমণ্ডলী) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। বলা হয়েছে :

لَتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ — এতে ইঙ্গিত আছে যে, মুসা

(আ) গুধু বনী ইসরাঈল ও মিসরীয় জাতির প্রতি নবীরূপে প্রেরিত হয়েছিলেন, অপরদিকে রসুলুল্লাহ্ (সা)-র নবুয়ত সমগ্র বিশ্বমানবের জন্য!

ওذَرْتَهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ — অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা মুসা

(আ)-কে নির্দেশ দেন যে, স্বজাতিকে 'আইয়্যামুল্লাহ্' সম্বরণ করান।

**আইয়্যামুন্নাহ :** **إيام** শব্দটি **يوم**-এর বহুবচন। এর অর্থ দিন, তা সুবিদিত। **إيام الله** শব্দটি দু'অর্থে ব্যবহৃত হয়। এক, যুদ্ধ অথবা বিপ্লবের বিশেষ দিন, যেমন বদর, ওহদ, আহযাব, হনায়ন ইত্যাদি যুদ্ধের ঘটনাবলী অথবা পূর্ববর্তী উম্মতের উপর আযাব নাযিল হওয়ার ঘটনাবলী। এসব ঘটনায় বিরাট বিরাট জাতির ভাগ্য ওলট পালট হয়ে গেছে এবং তারা পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় 'আইয়্যামুন্নাহ' স্মরণ করানোর উদ্দেশ্য হবে, এই সব জাতির কুফরের অন্তত পরিণতির ভয় প্রদর্শন করা এবং হ'শিয়ার করা।

আইয়্যামুন্নাহর অপর অর্থ আঞ্জাহ তা'আলার নিয়ামত ও অনুগ্রহও হয়। এগুলো স্মরণ করানোর লক্ষ্য হবে এই যে, ভাল মানুষকে যখন কোন অনুগ্রহদাতার অনুগ্রহ স্মরণ করানো হয়, তখন সে বিরোধিতা ও অবাধ্যতা করতে লজ্জাবোধ করে।

কোরআন পাকের সংশোধন পদ্ধতি সাধারণত এই যে, কোন কাজের নির্দেশ দিলে সাথে সাথে কাজটি করার কৌশলও বলে দেওয়া হয়। এখানে প্রথম বাক্যে মূসা (আ)-কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আঞ্জাহর আয়াত শুনিবে অথবা মু'জিযা প্রদর্শন করে স্বজাতিকে কুফরের অঙ্গকার থেকে বের করুন এবং ঈমানের আলোতে নিয়ে আসুন। এ বাক্যে এর কৌশল বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, অবাধ্যদেরকে দু'উপায়ে সৎপথে আনা যায়। এক, শাস্তির ভয় প্রদর্শন করা এবং দুই, নিয়ামত ও অনুগ্রহ স্মরণ করিয়ে আনুগত্যের দিকে আহ্বান করা।

করা। **ذَكَرَهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ** বাক্যে এ দু'টি উপায়ই উদ্দিষ্ট হতে পারে। অর্থাৎ

পূর্ববর্তী উম্মতের অবাধ্যদের অন্তত পরিণাম, তাদের আযাব, জিহাদে তাদের নিহত অথবা লান্ধিত হওয়ার কথা স্মরণ করান যাতে তারা শিক্ষা অর্জন করে আশ্রয়লাভ করে। এমনিভাবে এ জাতির উপর আঞ্জাহর যেসব নিয়ামত দিবান্নাহ বসিত হয় এবং যেসব বিশেষ নিয়ামত তাদেরকে দান করা হয়েছে, সেগুলো স্মরণ করিয়ে আঞ্জাহর আনুগত্য ও তওহীদের দিকে আহ্বান করুন; উদাহরণত তীহ উপত্যকায় তাদের মাথার উপর মেঘের ছায়া, আহাবের জন্য গাম্বা ও সালওয়ার অবতরণ, পানীয় জলের প্রয়োজনে পাথর থেকে ঝরনা প্রবাহিত হওয়া ইত্যাদি।

এর অর্থ নিদর্শন **إِن نِّى ذَلِك لآيَاتٍ لِّكُلِّ مَهَارٍ شَكُورٍ**—এখানে

ও প্রমাণাদি। **مِهَارٍ** শব্দটি **مِهَارٍ** থেকে **مِهَارٍ**-এর পদ। এর অর্থ অত্যন্ত সবর-

কারী। **شَكُورٍ** শব্দটি **شَكَرٍ** থেকে **مِهَارٍ**-এর পদ। এর অর্থ অধিক কৃতজ্ঞ।

বাক্যের অর্থ এই যে, অবিশ্বাসীদের শাস্তি ও আযাব সম্পর্কিত হোক অথবা আঞ্জাহর নিয়ামত ও অনুগ্রহ সম্পর্কিত হোক, উভয় অবস্থাতেই অতীত ঘটনাবলীতে আঞ্জাহর অপার শক্তি ও অসীম রহস্যের বিরাট নিদর্শন বিদ্যমান আছে ঐ ব্যক্তির জন্যে, যে অত্যন্ত সবরকারী এবং অধিক শোককারী।

উদ্দেশ্য এই যে, ঐ সকল সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী ও প্রমাণাদি যদিও প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির হিদায়তের জন্য; কিন্তু হতভাগ্য কাফিররা চিন্তাই করে না, তারা এগুলো থেকে কোন উপকারই লাভ করে না। উপকার তান্নাই লাভ করে, যারা সবর ও শোকের উভয় গুণে গুণাবিত অর্থাৎ মু'মিন। কেননা, বায়হাকী হযরত আনাস (রা)-এর রেওয়াজেতে রসূলুল্লাহ (সা)-র উক্তি বর্ণনা করেন যে, ঈমান দু'ভাগে বিভক্ত। এর অর্ধাংশ সৎ এবং অর্ধাংশ শোকের।—( মাযহারী )

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, সবর ঈমানের অর্ধেক। সহীহ মুসলিম ও মসনদে আহ্মদে হযরত সোহাবব (রা)-এর রেওয়াজেতে রসূলুল্লাহ (সা)-র উক্তি বর্ণিত আছে যে, মু'মিনের প্রত্যেক অবস্থাই সর্বোত্তম ও মহত্তম। এ বিষয়টি মু'মিন ছাড়া আর কারও ভাগ্যে জোটেনি। কারণ, মু'মিন কোন সুখ, নিয়ামত অথবা সম্প্রদান পেলে তজ্জন্য আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। এটা তার জন্য ইহকাল ও পরকালে মঙ্গল ও সৌভাগ্যের কারণ হয়ে যায়। ( ইহকালে তো আল্লাহর ওয়াদা অনুযায়ী নিয়ামত আসেও বেড়ে যায় এবং অব্যাহত থাকে, পরকালে সে এ কৃতজ্ঞতার বিরাট প্রতিদান পায়। ) পক্ষান্তরে মু'মিনের কষ্ট অথবা বিপদ হলে সে তজ্জন্য সবর করে। সবরের কারণে তার বিপদও তার জন্য নিয়ামত ও সুখ হয়ে যায়। ( ইহকালে এভাবে যে, সবরকারীরা আল্লাহ তা'আলার সঙ্গলাভে সমর্থ হয়। কোরআন বলে : **إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ** আল্লাহ

তা'আলা যার সঙ্গে থাকেন, পল্লিগামে তার মুছিবত আরামে রূপান্তরিত হয়ে যায়। পরকালে এভাবে যে, আল্লাহর কাছে সবরের বিরাট প্রতিদান অগণিত রয়েছে। কোরআন বলে :

**إِنَّمَا يُؤْتِي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ** ①

মোটকথা, মু'মিনের কোন অবস্থা মন্দ হয় না—সর্বোত্তম হয়ে থাকে। সে পতিত হয়েও উদ্ধৃত হয় এবং নষ্ট হয়েও গতিত হয়।

نَعْمَ شَوْخِي چل سکی باد مہاکی  
بگڑنے میں بھی زلف اسکی بناکی

ঈমান এমন একটি অনন্য সম্পদ যা বিপদ ও কষ্টকেও নিয়ামত ও সুখে রূপান্তরিত করে দেয়। হযরত আবদুল্লাহ (রা) বলেন : আমি রসূলুল্লাহ (সা)-র কাছে শুনেছি, আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আ)-কে বললেন, আমি আপনার পর এমন একটি উম্মত সৃষ্টি করব, যদি তাদের মনোবাচ্ছা পূর্ণ হয়, তবে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। পক্ষান্তরে যদি তাদের ইচ্ছা ও মর্জির বিরুদ্ধে কোন অপ্রিয় পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তবে তারা একে সওয়ালের উপায় মনে করে সবর করবে। এ বিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতা তাদের ব্যক্তিগত জ্ঞানবুদ্ধি ও সহায়ণের ফলশ্রুতি নয় বরং আমি তাদেরকে স্বীয় জ্ঞান ও সহনশীলতার একটি অংশ দান করব।—( মাযহারী )





বিপরীতে অকৃতজ্ঞদের জন্য তাকিদ সহকারে **لَا مَدَّ بِنُكْمٍ** (আমি অবশ্যই তোমাকে শাস্তি দেব)। বলেননি; বরং শুধু 'আমার শাস্তিও কঠোর' বলেছেন এতে ইঙ্গিত আছে যে, প্রত্যেক অকৃতজ্ঞ আযাবে পতিত হবে—এটা জরুরী নয়; বরং ক্রমারও সম্ভাবনা আছে।

—قَالَ مُوسَىٰ إِنَّ لَكَفْرًا أَتَمُّ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا نَأَىٰ اللَّهُ

لَغْنَىٰ ۖ هُوَ ۝ —অর্থাৎ মুসা (আ) স্বজাতিকে বললেন : যদি তোমরা এবং পৃথিবীতে

যারা বসবাস করে তারা সবাই আল্লাহ্ তা'আলার নিলামতসমূহের নাশোকরী করে, তবে সমরণ রেখ, এতে আল্লাহ্ তা'আলার কোন ক্ষতি নেই। তিনি সবার তারিফ, প্রশংসা, কৃতজ্ঞতা ও অকৃতজ্ঞতার উর্ধে। তিনি আপন সত্তার প্রশংসনীয় তোমরা তাঁর প্রশংসা না করলেও সব ফেরেশতা এবং সৃষ্টজগতের প্রতিটি অণু-পরমাণু তাঁর প্রশংসায় মুখর।

কৃতজ্ঞতার উপকার সবটুকু তোমাদের জন্যই। তাই আল্লাহ্ র পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতার জন্য যে তাকিদ করা হয়, তা নিজের জন্য নয়; বরং দম্ভাবশত তোমাদেরই উপকার করার জন্য।

الْمَرِيَاتِكُمْ تَبَوُّوا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمَ نُوحٍ وَعَادٍ وَ شُودُهُ  
وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ  
بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي آفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ  
بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ۝ قَالَتْ رُسُلُهُمْ  
إِنِّي اللَّهُ شَكَّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ  
ذُنُوبِكُمْ وَيُخَجِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ  
مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتُونَا  
بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ۝ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَ

لَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۗ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ  
 بِسُلْطٰنٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۗ وَعَلَىٰ اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۝ وَمَا لَنَا  
 اِلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَىٰ اللّٰهِ وَقَدْ هَدٰنَا سُبُلَنَا ۗ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا اٰذَيْتُمُوْنَ ۗ  
 وَعَلَىٰ اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ۝ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِلٰرُّسٰلٰهِمْ  
 لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ اَرْضِنَاۗ اَوْ لَتَعُوْدُنَّ فِيْ مٰلِئِنَاۗ فَاَوْحَىٰ اِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ  
 لَنُهْلِكَنَّ الظّٰلِمِيْنَ ۝ وَلَنُسَكِّنَنَّكُمْ اِلَآرِضَ مِّنْ بَعْدِهِمْ ۗ ذٰلِكَ  
 لِيُنْ خَآفَ مَقَامِىْ ۗ وَ خَآفَ وَعِيْدِىْ ۝ وَاَسْتَفْتٰهُوْا وَ خَآبَ كُلُّ  
 جَبّٰرٍ عَنِيْدِىْ ۝

(৯) তোমাদের কাছে কি তোমাদের পূর্ববর্তী কওমে-নূহ, আদ ও সামূদের এবং তাদের পরবর্তীদের খবর পৌঁছেনি? তাদের বিষয়ে আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ জানে না। তাদের কাছে তাদের পয়গম্বর প্রমাণাদি নিয়ে আগমন করেন। অতঃপর তারা নিজেদের হাত নিজেদের মুখে রেখে দিয়েছে এবং বলেছে : যা কিছু সহ তোমাদেরকে প্রেরণ করা হয়েছে, আমরা তা মানি না এবং যে পথের দিকে তোমরা আমাদেরকে দাওয়াত দাও, সে সম্পর্কে আমাদের মনে সন্দেহ আছে, যা আমাদেরকে উৎকর্ষায় ফেলে রেখেছে। (১০) তাদের পয়গম্বরগণ বলেছিলেন : আল্লাহ্ সম্পর্কে কি সন্দেহ আছে, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের প্রভা? তিনি তোমাদেরকে আহ্বান করেন যাতে তোমাদের কিছু গোনাহ ক্ষমা করেন এবং নিদিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত তোমাদের সম্বর দেন। তারা বলত : তোমরা তো আমাদের মতই মানুষ। তোমরা আমাদেরকে ঐ উপাস্য থেকে বিরত রাখতে চাও, যার ইবাদত আমাদের পিতৃপুরুষগণ করত। অতএব তোমরা কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ আনয়ন কর। (১১) তাদের পয়গম্বর তাদেরকে বলেন : আমরাও তোমাদের মত মানুষ, কিন্তু আল্লাহ্ বান্দাদের মধ্য থেকে যার উপর ইচ্ছা, অনুগ্রহ করেন। আল্লাহ্র নির্দেশ ব্যতীত তোমাদের কাছে প্রমাণ নিয়ে আসা আমাদের কাজ নয়; ইমানদারদের আল্লাহ্র উপর ভরসা করা চাই। (১২) আমাদের আল্লাহ্র উপর ভরসা না করার কি কারণ থাকতে পারে, অথচ তিনি আমাদেরকে পথ বলে দিয়েছেন। তোমরা আমাদেরকে যে পীড়ন করেছ, তজন্য আমরা সবর করব। ভরসাকারিগণের আল্লাহ্র উপরই ভরসা করা উচিত। (১৩) কাফিররা পয়গম্বরগণকে বলেছিল : আমরা তোমাদেরকে দেশ থেকে বের করে দেব অথবা তোমরা আমাদের ধর্ম

ফিরে আসবে। তখন তাদের কাছে তাদের পালনকর্তা ওহী প্রেরণ করলেন যে, আমি জালিম-দেরকে অবশ্যই ধ্বংস করে দেব। (১৪) তাদের পর তোমাদেরকে দেশে আবাদ করব। এটা ঐ ব্যক্তি পায়, যে আমার সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে এবং আমার আশাবের ওয়াদাকে ভয় করে। (১৫) পয়গম্বরগণ ফয়সালা চাইতে লাগলেন এবং প্রত্যেক অবাধ্য, হঠকারী ব্যর্থ কাম হল।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(হে মক্কার কাফিররা) তোমাদের কাছে কি এসব লোকের (ঘটনাবলীর) খবর (সংক্ষেপে হলেও) পৌঁছেনি, যারা তোমাদের পূর্বে ছিল? অর্থাৎ কওমে-নুহ, আদ, (কওমে হাদ), সামুদ, (কওমে সালেহ) এবং যারা তাদের পরে হয়েছে, যাদের (বিস্তারিত অবস্থা) আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না? (কারণ, তাদের তথ্যাদি ও বিবরণ লিপিবদ্ধ ও বর্ণিত হয়নি। তাদের ঘটনাবলী এইঃ) তাদের পয়গম্বর তাদের কাছে প্রমাণাদি নিয়ে আগমন করেন। অতঃপর তারা (কাফিররা) আপন হাত পয়গম্বরগণের মুখে দিয়েছিল (অর্থাৎ মেনে নেওয়া দূরের কথা, তারা চেষ্টা করত, যাতে পয়গম্বরগণ কথা পর্যন্ত বলতে না পারে)। এবং বললঃ যে নির্দেশ দিয়ে তোমাদেরকে (তোমাদের ধারণা অনুযায়ী) প্রেরণ করা হয়েছে (অর্থাৎ তওহীদ ও ঈমান), আমরা তা মানি না এবং যে বিষয়ের দিকে তোমরা আমাদেরকে দাওয়াত দাও (অর্থাৎ সেই তওহীদ ও ঈমান), আমরা সে বিষয়ে বিরূপিতা সম্পর্কে আছি, যা (আমাদেরকে) উৎকর্ষিত ফলে রেখেছে। (এর উদ্দেশ্য তওহীদ ও রিসালত উভয়টি অস্বীকার করা। তওহীদের অস্বীকার বর্ণনা সাপেক্ষ নয় এবং রিসালতের অস্বীকার تَدْعُونَا শব্দের মধ্যে নিহিত আছে। এর সারমর্ম এই যে, তোমরা নিজস্ব মতামতের ভিত্তিতে তওহীদের দাওয়াত দিচ্ছ। আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট ও প্রেরিত নও)। তাদের পয়গম্বর (এর উত্তরে) বললেনঃ (তোমরা) কি আল্লাহ সম্পর্কে (অর্থাৎ তাঁর তওহীদ সম্পর্কে) সন্দেহ (ও অস্বীকার) করছ, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টিকর্তা? (অর্থাৎ এগুলো সৃষ্টি করা স্বয়ং তাঁর অস্তিত্ব ও একত্বের প্রমাণ। এহেন প্রমাণের উপস্থিতিতে সন্দেহ করা আশ্চর্যের বিষয় বটে। তোমরা সে তওহীদের দাওয়াতকে পৃথকভাবে আমাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত করছ, এটাও নিতান্ত ভুল। যদিও তওহীদের বিষয়বস্তুটি ন্যায়ানুগ হওয়ার কারণে কেউ যদি নিজস্ব মতামতের ভিত্তিতে এর দাওয়াত দেয়, তবুও শোভনীয়। কিন্তু বিতর্কিত ক্ষেত্রে তো আমরা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে দাওয়াত দিচ্ছি। অতএব) তিনি (ই) তোমাদেরকে (তওহীদের দিকে) দাওয়াত দিচ্ছেন, যাতে (তা কবুল করার বরকতে) তোমাদের (অতীত) গোনাহসমূহ মাক্ক করে দেন এবং (তোমাদের বয়সের) নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত তোমাদেরকে (সুস্থভাবে) আয়াত দান করেন। (উদ্দেশ্য এই যে, তওহীদ স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে সত্য হওয়া ছাড়াও তোমাদের জন্য ইহকাল ও পরকালে উপকারীও। এই জওয়াবে উত্তর বিষয়ের জওয়াব হয়ে গেছে। اِنِّى اللّٰهُ شَكَّ এ তওহীদ সম্পর্কে





দোষখ (এর শাস্তি) রয়েছে। এবং তাকে (দোষখে) এমন পানি পান করতে দেওয়া হবে, যা পূজরত (এর অনুরূপ) হবে—যা (দারুণ পিপাসার কারণে) চোক গিলে গিলে পান করবে এবং (অত্যন্ত গরম ও বিহ্বাদ হওয়ার কারণে) গলার ভিতরে সহজে প্রবেশ করার উপায় থাকবে না এবং প্রতি দিক থেকে তার কাছে মৃত্যু আগমন করবে এবং সে কিছুতেই মরবে না; (এবং এমনভাবে কাতরভাবে থাকবে।) এবং (এ শাস্তি এক অবস্থা-তেই থাকবে না; বরং) তাকে আরও (অধিক) কঠোর আঘাবের সম্মুখীন (সব সময়) হতে হবে। (ফলে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই থাকতে পারে না। যেমন আল্লাহ বলেন :

(كُلَّمَا نَهَجَتْ جُلُودَهُمْ بَدَّ لَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا

مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ يَأْتِيهَا الرِّيحُ  
 فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَىٰ شَيْءٍ ۗ ذَٰلِكَ هُوَ  
 الصَّلْبُ الْبَعِيدُ ۗ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۗ  
 إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ۗ وَمَا ذَٰلِكَ عَلَىٰ  
 اللَّهِ بِعَزِيزٍ ۗ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا  
 إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا هَلْ أَنْتُمْ مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ ۗ  
 قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ ۗ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْرَعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا  
 لَنَا مِنْ مَّحِيصٍ ۗ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ  
 وَعَدَّكُمْ وَعَدَّ الْحَقُّ ۗ وَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ ۗ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ  
 مِنْ سُلْطٰنٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي ۗ فَلَا تَلُمُونِي وَلَا تُلْمُوا  
 أَنْفُسَكُمْ ۗ مَا أَنَا بِبَصِيرَةٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي ۗ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا  
 أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ ۗ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۗ

(১৮) যারা স্বীয় পালনকর্তার সজায় অবিশ্বাসী, তাদের অবস্থা এই যে, তাদের কর্মসমূহ হাইড্রেনের মত যার উপর দিয়ে প্রবল বাতাস বয়ে যায় ধুলিঝড়ের দিন। তাদের

উপার্জনের কোন অংশই তাদের করতলগত হবে না। এটাই দূরবর্তী পথপ্রলটতা ; (১৯) তুমি কি দেখনি যে, আল্লাহ্ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল যথাবিধি সৃষ্টি করেছেন ? যদি তিনি ইচ্ছা করেন, তবে তোমাদেরকে বিলুপ্তিতে নিয়ে যাবেন এবং নতুন সৃষ্টি আনয়ন করবেন। (২০) এটা আল্লাহর পক্ষে মোটেই কঠিন নয়। (২১) সবাই আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হবে এবং দুর্বলেরা বড়দেরকে বলবে : আমরা তো তোমাদের অনুসারী ছিলাম—অতএব তোমরা আল্লাহর আশাব থেকে আমাদেরকে কিছুমাত্র রক্ষা করবে কি ? তারা বলবে : যদি আল্লাহ আমাদেরকে সৎপথ দেখাতেন, তবে আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে সৎপথ দেখাতাম। এখন তো আমরা ধৈর্যচ্যুত হই কিংবা সবর করি—সবই আমাদের জন্য সমান—আমাদের রেহাই নেই। যখন সব কাজের ফলস্বালা হয়ে যাবে, তখন শয়তান বলবে নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদেরকে সত্য ওয়াদা দিয়েছিলেন এবং আমি তোমাদের সাথে ওয়াদা করেছি, অতঃপর তা ভঙ্গ করেছি। তোমাদের উপর তো আমার কোন ক্ষমতা ছিল না, কিন্তু এতটুকু যে, আমি তোমাদেরকে ডেকেছি, অতঃপর তোমরা আমার কথা মেনে নিয়েছ। অতএব তোমরা আমাকে ভৎসনা করোনা এবং নিজেদেরকেই ভৎসনা কর। আমি তোমাদের উদ্ধারে সাহায্যকারী নই এবং তোমরাও আমার উদ্ধারে সাহায্যকারী নও। ইতিপূর্বে তোমরা আমাকে যে আল্লাহর শরীক করেছিলে, আমি তা অস্বীকার করি। নিশ্চয় যারা জালিম তাদের জন, রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(যদি কাফিরদের ধারণা হয় যে, তাদের ক্রিয়াকর্ম তাদের জন্য উপকারী হবে, তবে এ সম্পর্কে সামগ্রিক নীতি শুনে নাও যে) যারা পালনকর্তার সাথে কুফরী করে, কর্মের দিক দিয়ে তাদের অবস্থা এই, (অর্থাৎ তাদের ক্রিয়াকর্মের দৃষ্টান্ত এমন) যেমন ছাই ভস্ম, (উড়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে খুবই হালকা) যাকে ধুলিঝড়ের দিন প্রবল ঝাতাস উড়িয়ে নিয়ে যায়। (এমতাবস্থায় ছাই ভস্মের চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট থাকবে না, এমনিভাবে) তারা যা কিছু কর্ম করে, তার কোন অংশ (অর্থাৎ প্রতিক্রিয়াও উপকারের দিক থেকে) তাদের অর্জিত হবেনা। (ছাইভস্মের মত বিফলে যাবে।) এটাও অনেক দূরবর্তী পথপ্রলটতা। (ধারণা তো এরূপ যে, আমাদের ক্রিয়াকর্ম সৎ ও উপকারী কিন্তু কার্যক্ষেত্রে প্রকাশ পায় অসৎ ও ক্ষতিকর—যেমন, মূর্তিপূজা অথবা অনুপকারী, যেমন : ক্রীতদাস মুক্ত করা আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা ইত্যাদি। যেহেতু তাদের কর্ম সত্য থেকে অনেক দূরে, তাই একে দূরবর্তী পথপ্রলটতা বা ঘোরতর বিভ্রান্তি বলা হয়েছে। সুতরাং এপথে মুক্তি পাওয়ার তো কোন সম্ভাবনা নেই। পক্ষান্তরে যদি তাদের ধারণা হয় যে, কিয়ামতের অস্তিত্বই অসম্ভব বলে আযাবের সম্ভাবনা নেই। তবে এর জওয়াব এই যে,) তুমি কি (হে সম্বোধিত ব্যক্তি) এ কথা জান না যে, আল্লাহ্ তা'আলা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলকে যথা-বিধি (অর্থাৎ উপকারিতা ও উপযোগিতার সমন্বয়ে) সৃষ্টি করেছেন (এবং এতে বোঝা যায় যে, তিনি সর্বশক্তিমান। সুতরাং) তিনি যদি চান, তোমাদের সবাইকে ধ্বংস করে দেবেন এবং অন্য নতুন সৃষ্টজীব আনয়ন করবেন এবং এটা আল্লাহর পক্ষে মোটেই কঠিন নয়।

(সুতরাং নতুন সৃষ্টজীব আনয়ন করা যখন সহজ, তখন তোমাদেরকে পুনর্বার সৃষ্টি করা কঠিন হবে কেন?) এবং (যদি এরূপ ধারণা হয় যে, তোমাদের বড়রা তোমাদেরকে বাঁচিয়ে নেবে, তবে এর স্বরূপ শুনে নাও যে, কিয়ামতের দিন) আল্লাহর সামনে সবাই উপস্থাপিত হবে। অতঃপর নিশ্চিন্তের লোক (অর্থাৎ জনসাধারণ তথা অনুসারীরা) উচ্চস্তরের লোকদেরকে (অর্থাৎ বিশিষ্ট ও অনুসৃতদেরকে তিরস্কার ও উৎসনার ছলে) বলবেঃ আমরা (পৃথিবীতে) তোমাদের অনুসারী ছিলাম, এমনকি ধর্মের যে পথ তোমরা আমাদেরকে বলেছিলে, আমরা সে পথেরই অনুগামী হয়েছিলাম। (আজ আমরা বিপদে আছি।) অতএব তোমরা কি আল্লাহর আযাবের কিছু অংশ থেকে আমাদেরকে বাঁচাতে পার? (অর্থাৎ সম্পূর্ণ বাঁচাতে না পারলেও কিয়ৎ পরিমাণে বাঁচাতে পার কি?) তারা (উত্তরে) বলবেঃ (আমরা তোমাদেরকে বাঁচাব কি, স্বয়ং নিজেরাই তো বাঁচতে পারি না। তবে) যদি আল্লাহ আমাদেরকে (কোন) পথ (আত্মরক্ষার্থে) বলতেন, তবে আমরা তোমাদেরকেও (সেই) পথ বলে দিতাম (এবং) এখন তো আমাদের সবার পক্ষে সমান—আমরা অস্থির হই

(যেমন তোমাদের অস্থিরতা **فهل انتم مغنون** থেকে প্রকাশ পাচ্ছে এবং

আমাদের অস্থিরতা **لوهدانا الله** থেকে বোঝাই যাচ্ছে।) অথবা আত্মসংবরণ করি। (উভয় অবস্থাতেই) আমাদের বাঁচার কোন উপায় নেই। (সুতরাং এই প্রমোদের থেকে জানা গেল যে, কুফরের পথের বড়রাও তাদের অনুসারীদের কোন কাজে আসবে না। মুক্তির এ সম্ভাব্য পথটিও শুভল হয়ে গেল। এবং যদি এরূপ ভরসা হয় যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য উপাস্যের উপকার করবে, তবে এর অবস্থা এই কাহিনী থেকে জানা যাবে যে,) যখন (কিয়ামতে) সব মোকদ্দমার ক্ষয়সালা সমাপ্ত হবে (অর্থাৎ ঈমানদাররা জান্নাতে এবং কাফিররা দোহখে প্রেরিত হবে তখন দোহখীরা সবাই সেখানে অবস্থানকারী শয়তানের কাছে গিয়ে তিরস্কার করবে যে, হতভাগা, তুমি তো ডুবলেই, আমাদেরকেও নিজের সাথে ডুবালে।) তখন শয়তান (উত্তরে) বলবেঃ (তোমরা আমাকে অন্যান্য তিরস্কার করছ। কেননা,) আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সাথে (যত ওয়াদা করেছিলেন, সব) সত্য ওয়াদা করেছিলেন (যে, কিয়ামত হবে, কুফরীর কারণে ধ্বংস অনিবার্য এবং ঈমানের দ্বারা মুক্তি পাওয়া যাবে) এবং আমিও তোমাদের সাথে ওয়াদা করেছিলাম (যে, কিয়ামত হবে না এবং তোমাদের কুফরীর পথও মুক্তির পথ) অতএব আমি সেসব ভুল ওয়াদা তোমাদের সাথে করেছিলাম। (এবং আল্লাহর ওয়াদা যে সত্য এবং আমার ওয়াদা যে মিথ্যা—এর ভুলি ভুলি অফাট্য প্রমাণ বিদ্যমান ছিল। এতদসত্ত্বেও তোমরা আমার ওয়াদাকে সত্য এবং আল্লাহর ওয়াদাকে মিথ্যা মনে করেছ। অতএব তোমরা নিজে নিজেই ডুবেছ। এবং যদি তোমরা বল যে, সত্য ওয়াদাকে মিথ্যা মনে করা এবং মিথ্যা ওয়াদাকে সত্য মনে করার কারণও তো আমিই ছিলাম, তবে কথা এই যে, বাস্তবিকই আমি কুমন্ত্রণাদানের পর্যায়ে কারণ ছিলাম, কিন্তু এটাও তো দেখবে যে, আমার কুমন্ত্রণা দানের পর তোমরা স্বেচ্ছাধীন ছিলে, না অক্রম ও অপারক? অতএব বলাই বাহুল্য যে,) তোমাদের উপর আমার এ ছাড়া অন্য কোন জোর ছিল না যে, আমি তোমাদেরকে (পত্নস্রষ্টার দিকে) ডেকেছিলাম, অতঃপর তোমরা (স্বেচ্ছায়) আমার কথা মেনে নিয়েছিলে। (যদি না মানতে, তবে আমি বলপূর্বক তোমাদেরকে



পথভ্রষ্ট করতে পারতাম না। যখন এটা প্রমাণিত) অতএব আমাকে (সম্পূর্ণ) ভৎসনা কর না (অর্থাৎ নিজেদেরকে সম্পূর্ণ দোষমুক্ত মনে করে আমাকে সামগ্রিক পর্যায়ে দোষী মনে করো না।) এবং (বেশী) ভৎসনা নিজেদেরকেই কর। (কারণ আযাবের আসল হোতা তোমরাই। আমার কাজ তো নিরুৎফল, যা দূরবর্তী এবং তোমাদের পথভ্রষ্টতাকে অপরিহার্য করে না। এ হচ্ছে ভৎসনার জওয়াব। পক্ষান্তরে তোমাদের কথার উদ্দেশ্য যদি সাহায্য প্রার্থনা হয়; তবে আমি অন্যের সাহায্য কিভাবে করতে পারি, যখন নিজেই বিপদগ্রস্ত এবং সাহায্য প্রত্যাশী হয়ে যাচ্ছি। কিন্তু আমি জানি যে, কেউ আমাকে সাহায্য করবে না। নতুবা আমিও তোমাদের কাছে নিজের জন্য সাহায্য প্রত্যাশা করতাম। কেননা, তোমাদের সাথেই আমার সম্পর্ক বেশী। সুতরাং এখন তো) না আমি তোমাদের উদ্ধারে সাহায্যকারী (হতে পারি) এবং না তোমরা আমার উদ্ধারে সাহায্যকারী (হতে পার। তবে আমি যদি তোমাদের শিরককে সত্য মনে করতাম, তবুও এ সম্পর্কের কারণে সাহায্য প্রার্থনার অবকাশ থাকত, কিন্তু) আমি স্বয়ং তোমাদের এ কর্মে অবিশ্বাসী (এবং একে মিথ্যা মনে করি) যে, তোমরা ইতিপূর্বে (দুনিয়াতে) আমাকে (আল্লাহর) শরীক সাব্যস্ত করত। (অর্থাৎ মূর্তি ইত্যাদির পূজার ব্যাপারে আমার এমন আনুগত্য করতে, যে আনুগত্য বিশেষভাবে আল্লাহর প্রাপ্য। সুতরাং মূর্তিদেরকে শরীক সাব্যস্ত করা এর অর্থ শয়তানকে শরীক সাব্যস্ত করা। অতএব আমাদের সাথে তোমাদের কোন সম্পর্ক নেই এবং তোমাদের সাহায্য প্রার্থনা করারও কোন অধিকার নেই।) নিশ্চয় জালিমদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি (নির্ধারিত) রয়েছে। (অতএব আযাবে পড়ে থাক। আমাকে ভৎসনা করে এবং আমার কাছে সাহায্য চেয়ে কোন উপকারের আশা করো না। তোমরা যে জুলুম করেছ, তা তোমরাই ভোগ কর। আমি যা করছি, তা আমি ভোগ করব। তাই এসব কথাবার্তার এখন আর কোন অর্থ হয় না। এ হচ্ছে ইবলীসের উত্তরের সারমর্ম। এতে আল্লাহ ছাড়া অন্য উপাস্যদের ভরসাও ছিন্ন হয়েছে। কেননা, ইবলীসই হচ্ছে অন্য উপাস্যদের উপাসনার আসল প্রতিষ্ঠাতা ও উদ্যোক্তা এবং প্রকৃতপক্ষে এ উপাসনা দ্বারা সে-ই অধিক সন্তুষ্ট হয়। এ কারণেই কিয়ামতের দিন দোষখীরা তার সাথেই কথাবার্তা বলবে এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্যকে কিছুই বলবে না। যখন সে পরিষ্কার জওয়াব দিয়ে দিল, তখন অন্যদের কাছ থেকে আর কি আশা করা যায়। সুতরাং কাফিরদের মুক্তির সব পথই রুদ্ধ হয়ে গেল। এ বিষয়বস্তুটিই আয়াতের উদ্দেশ্য ছিল।)

وَأَدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ  
خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحْيَاهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ۝

(২৩) এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎ কর্ম সম্পাদন করে তাদেরকে এমন উদ্যানে প্রবেশ করানো হবে, যার পাদদেশ দিয়ে নির্ঝরিত নদীসমূহ প্রবাহিত হবে। তারা তাতে পালনকর্তার নির্দেশে অনন্তকাল থাকবে। যেখানে তাদের সন্তোষ হবে সালাম।

## তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, তারা এমন উদ্যানে প্রবেশিত হবে, যার পাদদেশ দিয়ে নির্ঝরিত স্রোত প্রবাহিত হবে (এবং) তারা তাতে পাননকর্তার নির্দেশে অনন্তকাল থাকবে। সেখানে তাদেরকে (আসসালামু আলাইকুম বলে) সালাম করা হবে। (অর্থাৎ পরস্পরেও এবং ফেরেশতাদের পক্ষ থেকেও। যেমন আল্লাহ বলেন :

وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ  
أَعْيُنَهُمْ مِنْ كُلِّ مَسْجِدٍ وَالْمَلَائِكَةُ لَا يَرَوْنَ اللَّهَ إِلَّا جَاءَهُمْ  
আরও বলেন :

عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ مَسْجِدٍ وَالْمَلَائِكَةُ لَا يَرَوْنَ اللَّهَ إِلَّا جَاءَهُمْ

الْمَرْثَرُ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلْبَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ  
أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ۖ تُؤْتِي أَكْثَرَهَا كُلِّ حِينٍ بِأَذْنِ  
رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝

(২৪) তুমি কি লক্ষ্য কর না, আল্লাহ তা'আলা কেমন উপমা বর্ণনা করেছেন :

—পবিত্র বাক্য হলো পবিত্র রুক্কের মত। তার শিকড় মজবুত এবং শাখা আকাশে উন্নত।

(২৫) সে পাননকর্তার নির্দেশে অহরহ ফল দান করে। আল্লাহ মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন—যাতে তারা চিন্তাভাবনা করে।

## তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনার কি জানা নেই (অর্থাৎ এখন জানা হয়েছে) যে, আল্লাহ তা'আলা কেমন (উত্তম ও স্থানোপযোগী) উপমা বর্ণনা করেছেন কালেমায়ে তাইয়্যেবার! (অর্থাৎ কালেমাম্মে তওহীদ ও ঈমানের।) এটা একটা পবিত্র রুক্কসদৃশ (অর্থাৎ খেজুর রুক্কের মত) যার শিকড় দৃঢ়ভাবে (মাটির অভ্যন্তরে) প্রোথিত এবং এ শাখাসমূহ সুউচ্চে উন্নত। (এবং) সে (অর্থাৎ রুক্ক) আল্লাহর নির্দেশে প্রতি ঋতুতে (অর্থাৎ যখন তার ফলনের ঋতু আসে) ফল দান করে (অর্থাৎ যথেষ্ট ফলন হয়, কোন ঋতু মার যায় না। এমনভাবে ফলেমাম্মে তওহীদ অর্থাৎ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর একটি শিকড় আছে অর্থাৎ বিশ্বাস যা মু'মিনের অন্তরে শক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত আছে এবং এর কিছু ডালপালা রয়েছে অর্থাৎ সৎকর্মসমূহ। ঈমানের পর এগুলো ফলদায়ক হয়। এগুলোকে আকাশপানে আল্লাহর দরবারে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর এগুলোর ভিত্তিতে আল্লাহর চিরস্থায়ী সমষ্টিটির ফল অর্জিত হয়।) এবং আল্লাহ তা'আলা (এধরনের) দৃষ্টান্ত লোকদের (বজার) জন্য এ কারণে বর্ণনা করেন—যাতে তারা (এর উদ্দেশ্যকে) ভালোভাবে বুঝে নেয়। (কেননা, দৃষ্টান্ত দ্বারা উদ্দেশ্য চমৎকার ফুটে উঠে।)

وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ  
 الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ۖ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ  
 فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ ۗ وَيَفْعَلُ اللَّهُ  
 مَا يَشَاءُ ۗ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ  
 دَارَ الْبَوَارِ ۖ جَهَنَّمَ ۖ يَصَلُّونَهَا ۖ وَيُبْسُونَ الْقَرَارَ ۖ

(২৬) এবং নোংরা বাক্যের উদাহরণ হলো নোংরা রুক্ক। একে মাটির উপর থেকে উপড়ে নেওয়া হয়েছে। এর কোন স্থিতি নেই। (২৭) আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদেরকে মজবুত বাক্য দ্বারা মজবুত করেন। পাখিবজীবনে এবং পরকালে। এবং আল্লাহ্ জালিমদেরকে পথভ্রষ্ট করেন। আল্লাহ্ যা ইচ্ছা, তা করেন। (২৮) তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা আল্লাহ্‌র নিয়ামতকে কুফরে পরিণত করেছে এবং স্বজাতিকে সম্মুখীন করেছে ধ্বংসের আদয়ে (২৯) দোষখের? তারা তাতে প্রবেশ করবে সেটা কতই না মন্দ আবাস!

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং নোংরা কালেমার (অর্থাৎ কালেমায় কুফর ও শিরকের) দৃষ্টান্ত এমন, যেমন একটি খারাপ রুক্ক (অর্থাৎ হানযল রুক্ক), যাকে মাটির উপর থেকেই উৎপাটিত করে নেওয়া হয় (এবং তার (মাটিতে) কোন স্থায়িত্ব নেই। ('খারাপ' বলা হয়েছে এর গন্ধ, স্বাদ ও রং-এর দিক দিয়ে অথবা এর ফলের গন্ধ, স্বাদ ও রং-এর দিক দিয়ে। এ হচ্ছে ۞ পবিত্র বিশেষণের বিপরীত। উপর থেকে উৎপাটনের উদ্দেশ্য এই যে, এর শিকড় দূর পর্যন্ত যায় না, উপরে-উপরেই থাকে। এ হচ্ছে ۞ 'শিকড় গভীরে প্রোথিত'

এর বিপরীত এবং ۞ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ۖ বাক্যটি এর তাকিদ। এর শাখার

উর্ধে না যাওয়া এবং এর ফলের খাওয়ার বস্তু হিসাবে কাম্য না হওয়া বর্ণনাসাপেক্ষ নয়। কালেমায় কুফরের অবস্থা তদ্রূপই। যদিও কাফিরের অন্তরে এর শিকড় আছে; কিন্তু সত্যের সামনে এর ক্ষয়প্রাপ্তি ও পরাভূত হয়ে যাওয়া এ অবস্থারই সমতুল্য, যেন এর শিকড়ই নেই। আল্লাহ্ বলেন :

۞ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ۖ حَتَّىٰ يَكُونُ لَهَا حِصَّةٌ ۗ

বলে কুফরের এই ক্ষয়প্রাপ্তি ও পরাজয় ব্যক্ত করা উদ্দেশ্য। কাফিরের সংকর্ম

আল্লাহর কাছে কবুল হয় না। তাই এ বৃক্ষের যেন শাখাও ছড়ায় না। যেহেতু এ সৎকর্ম দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জিত হয় না, ফল যে হয় না—একথাও স্পষ্টত বোঝা যায়। যেহেতু কাফিরের মধ্যে কবুল ও সন্তুষ্টির মোটেই সম্ভাবনা নেই, তাই খারাপ বৃক্ষের শাখা ও ফলের উল্লেখ নিশ্চিতরূপেই পরিত্যক্ত হয়েছে। তবে কুফরের উল্লেখ এজন্য করা হয়েছে যে, এর অস্তিত্ব অনুভবও করা যায় এবং জিহাদ ইত্যাদির বিধি-বিধানের ধর্তব্যও। এ হচ্ছে উভয়ের দৃষ্টান্ত। অতঃপর প্রতিক্রিয়া বর্ণিত হচ্ছেঃ) আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে মজবুত কথা দ্বারা ( অর্থাৎ কালেমা তাইয়্যোবার বরকত দ্বারা ) পাখিব জীবনে ও পরকালে ( উভয় জায়গায় ধর্মে ও পরীক্ষায় ) মজবুত রাখেন এবং ( নোংরা কালেমার অশুভ প্রভাবে ) জালিমদেরকে ( অর্থাৎ কাফিরদেরকে উভয় জায়গায়—ধর্মে ও পরীক্ষায় ) পথভ্রষ্ট করে দেন এবং ( কাউকে মজবুত রাখা ও কাউকে পথভ্রষ্ট করে দেওয়ার মধ্যে অনেক রহস্য রয়েছে। ) আল্লাহ তা'আলা ( স্বীয় রহস্যের কারণে ) যা ইচ্ছা তা করেন। আপনি কি তাদেরকে দেখেন নি ( অর্থাৎ তাদের অবস্থা আশ্চর্যজনক ), যারা নিয়ামতের ( শোকের ) পরিবর্তে কুফরী করেছে? ( উদ্দেশ্য মক্কার কাফির সম্প্রদায়—দুরয়ে মন-সুর ) এবং যারা স্বজাতিকে ধ্বংসের গৃহ অর্থাৎ জাহান্নামে পৌঁছে দিয়েছে? ( অর্থাৎ তাদেরকেও কুফর শিক্ষা দিয়েছে। ফলে ) তারা তাতে ( অর্থাৎ জাহান্নামে ) প্রবেশ করবে। সেটা মন্দ বাসস্থান। ( এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, তাদের প্রবেশ করা স্থায়ী ও চিরকালীন হবে। )

### আনুমানিক ভাষ্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহের পূর্বে এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন যে, কাফিরদের ক্রিয়াকর্ম হচ্ছে ছাইভস্মের মত, যার উপর দিয়ে প্রবল বাতাস বয়ে যাওয়ার কারণে প্রতিটি কণা বাতাসে বিক্ষিপ্ত হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এরপর কেউ এগুলোকে একত্র করে কোন কাজ নিতে চাইলে তা অসম্ভব হয়ে যায়।

مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَابْرِهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي

يومِ عَامِفٍ উদ্দেশ্য এই যে, কাফিরদের ক্রিয়াকর্ম বাহ্যত সৎ হলেও তা

আল্লাহ তা'আলার কাছে গ্রহণীয় নয়। তাই সব অর্থহীন ও অকেজো।

এরপর উল্লিখিত আয়াতসমূহে প্রথমে মু'মিন ও তার ক্রিয়াকর্মের একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। অতঃপর কাফির ও মু'মিনদের ক্রিয়াকর্মের দৃষ্টান্ত বর্ণিত হয়েছে। প্রথম আয়াতে মু'মিন ও তার ক্রিয়াকর্মের উদাহরণে এমন একটি বৃক্ষের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যার কাণ্ড মজবুত ও সুউচ্চ এবং শিকড় মাটির গভীরে প্রোথিত। ভূগর্ভস্থ ঝরনা থেকে সেগুলো সিক্ত হয়। গভীর শিফড়ের কারণে বৃক্ষটি এত শক্ত যে দমকা বাতাসে ভুমিসাৎ হয়ে যায় না। ভূপৃষ্ঠ থেকে উর্ধ্ব থাকার কারণে এর ফল ময়লা ও আবর্জনা থেকে মুক্ত। এ বৃক্ষের দ্বিতীয় গুণ এই যে, এর শাখা উচ্চতায় আকাশপানে ধাবমান। তৃতীয় গুণ এই যে, এর ফল সব সময় সর্বাবস্থায় খাওয়া যায়।

এ বৃক্ষটি কি এবং কোথায়, এ সম্পর্কে তফসীলবিদগণের বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে। সর্বাধিক সত্যাপ্রণী উক্তি এই যে, এটি হচ্ছে খেজুর বৃক্ষ। এর সমর্থন অভিজ্ঞতা এবং চাক্ষুষ দেখা দ্বারাও হয় এবং বিভিন্ন হাদীস থেকেও পাওয়া যায়। খেজুর বৃক্ষের কাণ্ড মে উচ্চ ও মজবুত, তা প্রত্যক্ষ বিষয়—সবাই জানে। এর শিকড়সমূহের মাটির গভীর অভ্যন্তরে পৌঁছাও সুবিদিত। এর ফলও সব সময় সর্বাবস্থায় খাওয়া যায়। বৃক্ষে ফল দেখা দেওয়ার পর থেকে পরিপক্ব হওয়া পর্যন্ত সর্বাবস্থায় চাট্‌নী, আচার ইত্যাদি বিভিন্ন পছন্দ্য ও ফল খাওয়া যায়। ফল পেকে গেলে এর ভাঙারও সারা বছর অবশিষ্ট থাকে। সকাল-বিকাল, দিবা-রাত্রি, শীত-গ্রীষ্ম—মোটকথা সব সময় ও সব ঋতুতে এটি কাজে আসে। এ বৃক্ষের শাঁসও খাওয়া হয়, এ বৃক্ষ থেকে মিষ্ট রসও বের করা হয়। এর পাতা দ্বারা অনেক উপকারী বস্তাসামগ্রী চাটাই ইত্যাদি তৈরী করা হয়। এর আঁটি জন্ত-জানোয়ারের খাদ্য। অন্যান্য বৃক্ষের ফল এরূপ নয়। অন্যান্য বৃক্ষ বিশেষ ঋতুতে ফলবান হয় এবং ফল নিঃশেষ হয়ে যায়—সকল করে রাখা হয় না এবং সেগুলোর প্রত্যেকটি অংশ দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়।

তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে হাব্বান ও হাকিম হযরত আনাস (রা)—এর রেওয়ায়েতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : কোরআনে উল্লিখিত পবিত্র বৃক্ষ হচ্ছে খেজুর বৃক্ষ এবং অপবিত্র বৃক্ষ হচ্ছে হানযল (মাকাল) বৃক্ষ। —(মাহহারী)

মসনদ আহমদে মুজাহিদের রেওয়ায়েতে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা) বলেন : একদিন আমরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র খিদমতে উপস্থিত ছিলাম। জনৈক ব্যক্তি তাঁর কাছে খেজুর বৃক্ষের শাঁস নিয়ে এল। তখন তিনি সাহাবায়ে কিরামকে একটি প্রশ্ন করলেন : বৃক্ষসমূহের মধ্যে একটি বৃক্ষ হচ্ছে মরদে-মু'মিনের দৃষ্টান্ত। (বুখারীর রেওয়ায়েত মতে এস্থলে তিনি আরও বললেন যে, কোন ঋতুতেই এ বৃক্ষের পাতা ঝরে না।) বল, এ কোন বৃক্ষ? ইবনে ওমর বলেন : আমার মনে চাইল যে, বলে দিই—খেজুর বৃক্ষ। কিন্তু মজলিসে আবু বকর, ওমর ও অন্যান্য প্রধান প্রধান সাহাবী উপস্থিত ছিলেন। তাঁদেরকে নিশ্চুপ দেখে আমি বলার সাহস পেলাম না। এরপর স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : এ হচ্ছে খেজুর বৃক্ষ।

এ বৃক্ষ দ্বারা মু'মিনের দৃষ্টান্ত দেওয়ার কারণ এই যে, কালেমায়ে তাইয়্যেবার মধ্যে ঈমান হচ্ছে মজবুত ও অনড় শিকড় বিশিষ্ট, দুনিয়ার বিপদাপদ একে উল্লাতে পারে না। কামেল মু'মিন সাহাবী ও তাবয়ী; বরং প্রতি যুগের খাঁটি মুসলমানদের এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়, যারা ঈমানের মুকাবিলায় জানমান ও কোন কিছুর পরওয়া করেন নি। দ্বিতীয় কারণ তাঁদের পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা। তাঁরা দুনিয়ার নোংরামি থেকে সব সময় দূরে সরে থাকেন যেমন ডু-প্লেষ্ঠের ময়লা আবর্জনা উঁচু বৃক্ষকে স্পর্শ করতে পারে না। এ দু'টি গুণ হচ্ছে

أَمْثَلُهَا ثَابِتٌ —এর দৃষ্টান্ত। তৃতীয় কারণ এই যে, খেজুর বৃক্ষের শাখা যেমন

আকাশের দিকে উচ্চ দাবমান, মু'মিনের ঈমানের ফলাফলও অর্থাৎ সৎকর্মও তেমনি আকাশের দিকে উদ্ভিত হয়। কোরআন বলে :

—أَلَيْهَا يَمْعُدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ

পবিত্র বাক্যাবলী আলাহ্ তা'আলার দিকে উঠানো হয়। উদ্দেশ্য এই যে, মু'মিন আলাহ্ তা'আলার যেসব মিক্রি, তসবীহ্-তাহলীল, তিলাওয়াতে ফোরআন ইত্যাদি করে, সেগুলো সকাল বিকাল আলাহ্‌র দরবারে পৌছতে থাকে।

চতুর্থ কারণ এই যে, খেজুর রুক্কের ফল যেমন সব সময় সর্বাবস্থায় এবং সব ঋতুতে দিবারাত্র খাওয়া হয়, মু'মিনের সৎকর্মও তেমনি সব সময়, সর্বাবস্থায় এবং সব ঋতুতে অব্যাহত রয়েছে এবং খেজুর রুক্কের প্রত্যেকটি বস্তু যেমন উপকারী, তেমনি মু'মিনের প্রত্যেক কথা ও কাজ, ওঠা-বসা এবং এসবের প্রতিক্রিয়া সমগ্র বিশ্বের জন্য উপকারী ও ফলদায়ক। তবে শর্ত এই যে, কামিল মানুষ এবং আলাহ্ ও রসূলের শিক্ষার অনুমায়ী হতে হবে।

উপরোক্ত বক্তব্য থেকে জানা গেল যে, **اَكَلْتُ** বাক্যে **تَوْتِي** অর্থ

শব্দের অর্থ ফল ও খাদ্যোপযোগী বস্তু এবং **شَجَرٍ** শব্দের অর্থ প্রতি মুহূর্ত। অধিকাংশ তফসীরবিদ এ অর্থকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কারণ ও কারণও অন্য উক্তিও রয়েছে।

কাফিরদের দৃষ্টান্ত : এর বিপরীতে কাফিরদের দ্বিতীয় উদাহরণ বর্ণিত হয়েছে খারাপ রুক্ক দ্বারা। কালেমায়ে তাইয়োবার অর্থ যেমন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ অর্থাৎ ঈমান, তেমনি কালেমায়ে খবীসার অর্থ কুফরী বাক্য ও কুফরী কাজকর্ম। পূর্বাঙ্গীকৃত হাদীসে

**شَجَرٍ لَا خَبِيثَةٍ** -অর্থাৎ খারাপ রুক্কের উদ্দিষ্ট অর্থ হানযল রুক্ক সাব্যস্ত করা হয়েছে। কেউ কেউ রসূন ইত্যাদি বলেছেন।

কোরআনে এই খারাপ রুক্কের অবস্থা এরাপ বর্ণিত হয়েছে যে, এর শিকড় ভূগর্ভের অভ্যন্তরে বেশী যায় না। ফলে যখন কেউ ইচ্ছা করে, এ রুক্ককে সমূলে উৎপাটন করতে পারে। **أَجْتَنَّتْ مِنْ نَوْقِ الْأَرْضِ** বাক্যের অর্থ তাই। কেননা, এর আসল অর্থ

কোন বস্তুর অবয়বকে পুরোপুরি উৎপাটন করা।

কাফিরের কাজকর্মকে এ রুক্কের সাথে তুলনা করার কারণ তিনটি। এক, কাফিরের ধর্মবিশ্বাসের কোন শিকড় ও ভিত্তি নেই। অল্পক্ষণের মধ্যেই নড়বড়ে হয়ে যায়। দুই, দুনিয়ার আবর্জনা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। তিন, রুক্কের ফলফুল অর্থাৎ কাফিরের ক্রিয়াকর্ম আলাহ্‌র দরবারে ফলদায়ক নয়।

ঈমানের বিশেষ প্রতিক্রিয়া : এরপর মু'মিনের ঈমান ও কালেমায়ে তাইয়োবার একটি বিশেষ প্রতিক্রিয়া দ্বিতীয় আয়াতে বর্ণিত হয়েছে :

**يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقُرْآنِ إِنَّمَا يُتِي فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا**

**وَفِي الْآخِرَةِ** -অর্থাৎ মু'মিনের কালেমায়ে তাইয়োবা মজবুত ও অনড় রুক্কের মত একটি

প্রতিষ্ঠিত উক্তি। একে আল্লাহ্ তা'আলা চিরকাল কায়েম ও প্রতিষ্ঠিত রাখেন—দুনিয়াতেও এবং পরকালেও। শর্ত এই যে, এ কালেমা আন্তরিকতার সাথে বলতে হবে এবং লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ মর্ম পূর্ণরূপে বুঝতে হবে।

উদ্দেশ্য এই যে, এ কালেমায় বিশ্বাসী ব্যক্তিকে দুনিয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে শক্তি যোগানো হয়। ফলে সে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এ কালেমায় কায়েম থাকে, যদিও এর মুকাবিলায় অনেক বিপদাপদের সম্মুখীন হতে হয়। পরকালে এ কালেমাকে প্রতিষ্ঠিত রেখে তাকে সাহায্য করা হবে। সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমের এক হাদীসে আছে, আল্লাতে পরকাল বলে বরযখ অর্থাৎ 'কবর জগৎ' বোঝানো হয়েছে।

কবরের শান্তি ও শান্তি কোরআন ও হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত : রসুলুল্লাহ্ (সা) বলেন : কবরে মূ'মিনকে প্রশ্ন করার উয়ংকর মুহূর্তেও সে আল্লাহ্ সমর্থনের বলে এই কালেমার উপর কায়েম থাকবে এবং লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্ সাক্ষ্য দেবে। এরপর বলেন : আল্লাহ্ বাণী **يُحْيِي اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِقَوْلِ الثَّابِتِ**

**نِي الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ** এর উদ্দেশ্য তা-ই। এ হাদীসটি হযরত বারা ইবনে আমেব (রা) বর্ণনা করেছেন। এছাড়া আরও প্রায় চল্লিশজন সাহাবী থেকে একই বিষয়-বস্তুর হাদীস বর্ণিত আছে। ইবনে কাসীর স্বীয় তফসীর গ্রন্থে এগুলো উল্লেখ করেছেন। শায়খ আব্দুল্লাহুদীন সুন্নুতী স্বীয় কাব্যপুস্তিকা **التَّهْيِيْتُ عِنْدَ التَّهْيِيْتُ** এবং

**شرح الصدور** এ সত্তরটি হাদীসের বরাত উল্লেখ করে সেগুলোকে মুতাওয়াজ্জির বলেছেন। এসব সাহাবী সবাই আলোচ্য আয়াতে আখিরাতের অর্থ কবর এবং আয়াতটিকে কবরের আশাব ও সওয়াব সম্পর্কিত বলে সাব্যস্ত করেছেন।

মৃত্যু ও দাফনের পর কবরে পুনর্বীর জীবিত হয়ে কেরেশতাদের প্রয়ের উত্তর দেওয়া এবং এ পন্থিকায় সাক্ষ্য ও অকৃতকার্যতার ভিত্তিতে সওয়াব অথবা আশাব হওয়ার বিষয়টি কোরআন পাকের প্রায় দশটি আয়াতে ইঙ্গিতে এবং রসুলুল্লাহ্ (সা)-র সত্তরটি মুতাওয়াজ্জির হাদীসে সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত রয়েছে। ফলে এ ব্যাপারে মুসলমানদের সন্দেহ করার অবকাশ নেই। তবে সাধারণ লোকের পক্ষ থেকে সন্দেহ করা হয় যে, এই সওয়াব ও আশাব দৃষ্টিগোচর হয় না। এখানে এর বিস্তারিত উত্তর দানের অবকাশ নেই। সংক্ষেপে এতটুকু বুঝে নেওয়া যথেষ্ট যে, কোন বস্তু দৃষ্টিগোচর না হওয়া সেই বস্তুর অনস্তিত্বশীল হওয়ার প্রমাণ নয়। জীন ও কেরেশতারাও দৃষ্টিগোচর হয় না, কিন্তু তারা বিদ্যমান রয়েছে। বর্তমান যুগে রকেটের সাহায্যে যে মহাশূন্য জগৎ প্রত্যক্ষ করা হচ্ছে, ইতিপূর্বে তা কারও দৃষ্টিগোচর হত না; কিন্তু অস্তিত্ব ছিল। যুমন্ত ব্যক্তি স্বপ্নে কোন বিপদে পতিত হয়ে বিষম কষ্টে অস্থির হতে থাকে; কিন্তু নিকটে উপবিষ্ট ব্যক্তি মোটেই তা টের পায় না।

নীতির কথা এই যে, এক জগতের অবস্থাকে অন্য জগতের অবস্থার সাথে তুলনা করা

নিভান্তই ছিল। সৃষ্টিকর্তা যখন রসূলের মাধ্যমে পর জগতে পৌঁছার পর এ আযাব ও সওয়াবের সংবাদ দিয়েছেন, তখন এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা অপরিহার্য।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে : **وَيُؤَلِّمُ اللَّهُ الظَّالِمِينَ**---অর্থাৎ আল্লাহ

তা'আলা মু'মিনদেরকে তো প্রতিষ্ঠিত বাক্যের উপর কায়ম রাখেন, ফলে কবর থেকেই তাদের শাস্তির আয়োজন শুরু হয়ে যায়। পক্ষান্তরে জালিম অর্থাৎ অস্বীকারকারী কাকির ও মুশরিকরা এ নিয়ামত পায় না। তারা মুনকার-নকীরের প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারে না। ফলে এখান থেকেই তারা এক প্রকার আযাবে জড়িত হয়ে পড়ে।

**وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ**---অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যা চান তাই করেন। তাঁর

ইচ্ছাকে রুখে দাঁড়ায় এরূপ কোন শক্তি নেই। হযরত উবাই ইবনে কা'ব আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হযায়ফা ইবনে এয়মান প্রমুখ সাহাবী বলেন : মু'মিনের এরূপ বিশ্বাস রাখা অপরিহার্য যে, তার যা কিছু অর্জিত হয়েছে, তা আল্লাহর ইচ্ছায়ই অর্জিত হয়েছে। এটা অর্জিত না হওয়া অসম্ভব ছিল। এমনিভাবে যে বস্তু অর্জিত হয়নি, তা অর্জিত হওয়া সম্ভবপর ছিল না। তাঁরা আরও বলেন : যদি তুমি এরূপ বিশ্বাস না রাখ, তবে তোমার আবাস হবে জাহান্নাম।

**أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ  
الْبُورِ جَهَنَّمَ يَصَلُّونَهَا وَبُسَّ الْقُرَارِ**

অর্থাৎ আপনি কি তাদেরকে দেখেন না, যারা আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতের পরিবর্তে কুফর অবলম্বন করেছে এবং তাদের অনুসারী জাতিকে ধ্বংস ও বিপর্যয়ের অবস্থানে পৌঁছিয়ে দিয়েছে? তারা জাহান্নামে প্রজ্বলিত হবে। জাহান্নাম অত্যন্ত মন্দ আবাস।

এখানে 'আল্লাহর নিয়ামত' বলে সাধারণভাবে অনুভূত, প্রত্যক্ষ ও মানুষের বাহ্যিক উপকার সম্পর্কিত নিয়ামত বোঝান যেতে পারে; যেমন পানাহার ও পরিধানের দ্রব্য সামগ্রী, জমিজমা, বাসস্থান ইত্যাদি এবং মানুষের হিদায়তের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত বিশেষ নিয়ামতসমূহও; যেমন ঐশী গ্রন্থ এবং আল্লাহ তা'আলার শক্তি ও রহস্যের নিদর্শনাবলী। এসব নিদর্শন স্বীয় অস্তিত্বের প্রতি গ্রহিতে, ভূমণ্ডল ও তার রহস্যমণ্ডিত জগতে মানবজাতির হিদায়তের সামগ্রীরূপে বিদ্যমান রয়েছে।

এই উভয় প্রকার নিয়ামতের দাবী ছিল এই যে, মানুষ আল্লাহর মাহাখ্যা ও শক্তি-সামর্থ্য সম্যক উপলব্ধি করুক এবং তাঁর নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাঁর আনুগত্যে আত্মনিয়োগ করুক। হিংস্র কাফির ও মুশরিকরা নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার পরিবর্তে অকৃতজ্ঞতা, অবাধ্যতা ও নাফরমানী করেছে। এর ফলশ্রুতিতে তারা সমগ্র



মানব সমাজকেই ধ্বংস ও বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিয়েছে এবং নিজেরাও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে ।

**বিধান ও নির্দেশ :** আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে তওহীদ ও কলিমাত্তে তাইয়োবা জা-ইলাহা ইক্বালাহ্‌র মহাত্মা, প্রেচক, বরকত ও ফলাফল এবং একে অস্বীকারের অমঙ্গল ও মন্দ পরিণাম বর্ণিত হয়েছে । তওহীদ এমন অক্ষয় ধন যার বরকতে ইহকালে, পরকালে এবং কবরেও আল্লাহর সমর্থন অর্জিত হয় । একে অস্বীকার করা আল্লাহ্‌র নিয়ামতসমূহকে আঘাতে রূপান্তরিত করায়ই নামাস্তর ।

وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِّيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِن مَصِيبِكُمْ  
إِلَى النَّارِ ۝ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُبْفِقُوا  
مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ  
وَلَا خِلَالَ ۝ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ  
مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ  
فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ ۝ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ  
دَائِبِينَ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۝ وَأَتَتْكُم مِّن كُلِّ مَسَاكِنُوهُ  
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ۗ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ۝

(৩০) এবং তারা আল্লাহ্‌র জন্য সমকক্ষ স্থির করেছে, যাতে তারা তার পথ থেকে বিচ্যুত করে দেয় । বস্তু : মজা উপভোগ করে নাও । অতঃপর তোমাদেরকে জঞ্জির দিকেই ফিরে যেতে হবে । (৩১) আমার বান্দাদেরকে বলে দিন হারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তারা নামায কয়েম রাখুক এবং আমার দেওয়া ঋণিক থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে বায় করুক ঐদিন আসার আগে, যেদিন কোন বেচা-কেনা নাই এবং বন্ধুত্বও নাই । (৩২) তিনিই আল্লাহ্‌ যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃজন করেছেন এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে অতঃ পর তা হারা তোমাদের জন্য ফলের ঋণিক উৎপন্ন করেছেন এবং নৌকাকে তোমাদের জাহাজবহ করেছেন, যাতে তাঁর আদেশে সমুদ্রে চলাফেরা করে এবং নদ-নদীকে তোমাদের সেবার নিয়োজিত করেছেন । (৩৩) এবং তোমাদের সেবার নিয়োজিত করেছেন সূর্যকে এবং চন্দ্রকে সর্বদা এক নিয়মে এবং রাত্রি ও দিবাকে তোমাদের কাজে লাগিয়েছেন । (৩৪)

যে সকল বস্তু তোমারা চেয়েছ, তার প্রত্যেকটি থেকেই তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন। যদি আল্লাহর নিয়ামত গণনা কর, তবে গুণে শেষ করতে পারবে না। নিশ্চয় মানুষ অত্যন্ত অন্যাযকারী অকৃতজ্ঞ।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ :

এবং (উপরে বলা হয়েছে যে, তারা নিয়ামতের শোকর করার পরিবর্তে কুকুরী করেছে এবং নিজ জাতিকে জাহান্নামে পৌঁছিয়েছে। এই কুকুরীও পৌঁছানোর বিবরণ এই যে) তারা আল্লাহর অংশীদার সাব্যস্ত করেছে, যাতে (অন্যান্যকেও) তাঁর দীনের পথ থেকে বিচ্যুত করে দেয়। (সুতরাং অংশীদার সাব্যস্ত করা হচ্ছে কুকুর এবং অন্যান্যকে পথচ্যুত করা হচ্ছে জাহান্নামে পৌঁছানো)। আপনি (তাদের সবাইকে) বলে দিন : কিছুদিন মজা উপভোগ করে নাও। কেননা, পরিণামে তোমাদেরকে দোষে যেতে হবে। (মজা উপভোগের অর্থ কুকুরী অবস্থায় থাকা। কেননা প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের ধর্মমতের মধ্যে এক ধরনের তৃপ্তি অনুভব করে। অর্থাৎ আরও কিছু দিন কুকুরী করে নাও। এটা ভীতি প্রদর্শন। কেননা উদ্দেশ্য এই যে, যেহেতু তোমাদের জাহান্নামে যাওয়া অবশ্যস্বাভাবী, তাই তোমাদের কুকুরী থেকে বিরত হওয়া কঠিন। যাক, আরও কিছু দিন এভাবেই অতিবাহিত করে নাও। এরপর তো এ বিপদের সম্মুখীন হতেই হবে। এবং) আমান্ন যেসব ঈমানদার বান্দা আছে (তাদেরকে এ অকৃতজ্ঞতার শাস্তি সম্পর্কে হ'শিয়ান্ন করে তা থেকে মুক্ত রাখার জন্য) তাদেরকে বলে দিন : তারা (এভাবে নিয়ামতের শোকর আদায় করুক যে) নামায প্রতিষ্ঠিত করুক এবং আমি যা কিছু তাদেরকে দিয়েছি, তা থেকে (শরীয়তের নিয়ম অনুযায়ী) গোপনে ও প্রকাশ্যে (যখন ঘেরাপ সুযোগ হয়) ব্যয় করুক, এমন দিন আসার পূর্বে যেদিন ক্রয়-বিক্রয় হবে না এবং বন্ধুত্ব হবে না। (উদ্দেশ্য এই যে, শারীরিক ও আর্থিক ইবাদতে আত্মনিয়োগ করুক। এটাই নিয়ামতের শোকর)। তিনিই আল্লাহ, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন। অতঃপর এ পানি দ্বারা তোমাদের জন্য ফল জাতীয় রিযিক সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের উপকারার্থে নৌকা (ও জাহাজ) কে (স্বীয় শক্তির) অনুবর্তী করেছেন, যাতে আল্লাহর নির্দেশে (ও কুদরতে) সমুদ্রে চলাচল করে (এবং তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও ভ্রমণের উদ্দেশ্যে হাসিল হয়) এবং তোমাদের উপকারার্থে নদ-নদীকে (স্বীয় শক্তির) অনুবর্তী করেছেন (যাতে তা থেকে পানি পান কর; জল সেচন কর এবং নৌকা চালাও) এবং তোমাদের উপকারার্থে সূর্য ও চন্দ্রকে (স্বীয় শক্তির) অনুগামী করেছেন, যারা সদা-সর্বদা চলমানই থাকে, (যাতে তোমাদের আলো, উত্তাপ ইত্যাদির উপকার হয়) এবং তোমাদের উপকারার্থে রাত ও দিনকে (স্বীয় শক্তির) অনুগামী করেছেন (যাতে তোমাদের জীবিকা ও সুখ-স্বাস্থ্যবৃদ্ধির ব্যবস্থা হয়)। এবং যে যে বস্তু তোমারা চেয়েছ (এবং যা তোমাদের উপযোগী হয়েছে) তার প্রত্যেকটি তোমাদেরকে দিয়েছেন। ( শুধু উল্লিখিত বস্তু সমূহই কেন) আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত (তো এত অগণিত যে) যদি (এগুলোকে) গণনা কর, তবে গুণতিতেও শেষ করতে পারবে না। (কিন্তু) সত্য এই যে, মানুষ খুব অন্যাযকারী

অত্যন্ত অকৃতজ্ঞ। (তারা আল্লাহ্‌র নিয়ামতসমূহের কদর ও শোকর করে না, বরং উল্টা কুফর ও পাপকাজে লিপ্ত হয়; যেমন পূর্বে বলা হয়েছে।

(اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ بَدَلُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ كُفْرًا

**আনুষ্ঠানিক ভাষ্য বিষয়**

সূরা ইবরাহীমের শুরুতে রিসালত, নবয়ুত ও পরকাল সম্পর্কিত বিষয়বস্তু ছিল। এরপর তওহীদের ক্বায়ীত, কলেমায়ে কুফর ও শিরকের নিন্দা দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর এ ব্যাপারে মুশরিকদের নিন্দা করা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ্‌র নিয়ামতের শোকর করার পরিবর্তে অকৃতজ্ঞতা ও কুফরীর পথ বেছে নিয়েছে।

আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম আয়াতে কাফির ও মুশরিকদের নিন্দা এবং তাদের অশুভ পরিণাম উল্লেখ করা হয়েছে; দ্বিতীয় আয়াতে মু'মিনদের শ্রেষ্ঠত্ব এবং তাদের শোকর আদায় করার জন্য কতিপয় বিধানের তাক্বিদ করা হয়েছে। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম আয়াতে আল্লাহ্‌র মহান নিয়ামতসমূহ উল্লেখ করে সেগুলোকে আল্লাহ্‌র অবাধ্যতায় নিয়োজিত না করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

**শব্দার্থ ও টীকা :** **اٰنَادَا** শব্দটি **اٰنَادَا**-এর বহুবচন। এর অর্থ সমতুল্য, সমান। প্রতিমাসমূহকে **اٰنَادَا** বলার কারণ এই যে, মুশরিকরা স্বীয় কর্মে তাদেরকে আল্লাহ্‌র সমতুল্য সাব্যস্ত করে রেখেছিল। **تَمَتَّع** শব্দের অর্থ কোন বস্তু দ্বারা সাময়িক ভাবে কয়েকদিন উপকৃত হওয়া। আয়াতে মুশরিকদের ভ্রান্ত মতবাদের নিন্দা করে বলা হয়েছে যে, তারা প্রতিমাসমূহকে আল্লাহ্‌র সমতুল্য ও তাঁর অংশীদার সাব্যস্ত করেছে। রসূলুল্লাহ্ (স)-কে আদেশ দেওয়া হয়েছে : আপনি তাদেরকে বলে দিন যে, তোমরা দুনিয়ার রূপস্বায়ী নিয়ামত দ্বারা উপকৃত হতে থাক। তোমাদের শেষ পরিণতি জাহান্নামের অগ্নি।

দ্বিতীয় আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (স)-কে বলা হয়েছে : ( মরার কাফিররা তো আল্লাহ্‌র নিয়ামতকে কুফুরী দ্বারা পরিবর্তন করে নিয়েছে ) আপনি আমার ঈমানদার বান্দাদেরকে বলুন যে, তারা নামায কায়েম করুক এবং আমি যে রিমিক তাদেরকে দিয়েছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করুক। এ আয়াতে মু'মিন বান্দাদের জন্য বিরাট সূসংবাদ ও সম্মান রয়েছে। প্রথমে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে নিজেদের বান্দা বলেছেন, এরপর ঈমান-গুণে গুণান্বিত করেছেন, অতঃপর তাদেরকে চিরস্থায়ী সুখ ও সম্মানদানের পদ্ধতি বলে দিয়েছেন যে, তারা নামায কায়েম করুক। নামাযের সময়ে অলসতা এবং নামাযের সূষ্ঠ নিয়মাবলীতে ত্রুটি না করা চাই। এ ছাড়া আল্লাহ্ প্রদত্ত রিমিক থেকে কিছু তাঁর পথেও ব্যয় করুক। ব্যয় করার উভয় পদ্ধতি বৈধ রাখা হয়েছে---গোপনে অথবা প্রকাশ্যে। কোন কোন আলিম বলেন : ফরয যাকাত ফিতরা ইত্যাদি প্রকাশ্যে হওয়া উচিত ---যাতে অন্যান্যও উৎসাহিত হয়, আলম নফল সদকা-খরচাত গোপনে দান করা উচিত---

যাতে রিফা ও নাম-যশ অর্জনের মতো মনোভঙ্গি সৃষ্টির আশংকা না থাকে। ব্যাপারটি আসলে নিয়ামতের উপর নির্ভরশীল। যদি প্রকাশ্যে দান করার মধ্যে রিফা ও নাম যশের নিয়ত থাকে, তবে দানের ফযিলত খতম হয়ে যায়---ফরয হোক কিংবা নফল। পক্ষান্তরে যদি অপরকে উৎসাহিত করার নিয়ত থাকে, তবে ফরয ও নফল উভয়ক্ষেত্রে প্রকাশ্যে দান করা বৈধ।

من قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمَ لَا يَبِيعُ فِيهِ وَلَا خِالَالَ এখানে خلال শব্দটি

باب مفاعلة একে এর বহুবচন হতে পারে। এর অর্থ স্বার্থহীন বন্ধুত্ব। একে

এর ধাতুও বলা যায়; যেমন دافع و قتال ইত্যাদি। এমতাবস্থায় এর অর্থ দু'ব্যক্তি পরস্পর অকৃত্রিম বন্ধুত্ব করা। এ বাক্যটি উপরে বর্ণিত নামায় ও সদকার নির্দেশের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

উদ্দেশ্য এই যে, আজ আল্লাহ্ তা'আলা নামায় পড়ার এবং গাফিলতিবশত বিগত যমানীর না পড়া নামায়ের কামা করার শক্তি ও অবসর দিয়ে রেখেছেন। এমনিভাবে আজ টাকা-পয়সা ও অর্থসম্পদ তোমার করায়ত্ত রয়েছে। একে আল্লাহর পথে ব্যয় করে চিরস্থায়ী জীবনের সম্বল করে নিতে পার। কিন্তু এমন এক দিন আসবে, মখন এ দু'টি শক্তি ও সামর্থ্য তোমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হবে। তোমার দেহও নামায় পড়ার যোগ্য থাকবে না এবং তোমার মালিকানায় ও কোন টাকা-পয়সা থাকবে না, যম্ভারা কারও পাওনা পরিশোধ করতে পার। সেদিন কোন কেনাবেচাও হতে পারবে না যে, তুমি স্নায় দু'টি ও গোনাহের কাফফারার জন্য কোন কিছু কিনে নেবে। সেদিন পারস্পরিক বন্ধুত্ব এবং সম্পর্কও কোন কাজে আসবে না। কোন প্রিয়জন কারও পাপের বোঝা বহন করতে পারবে না এবং তার আযাব কোনরূপে হট্টাতে পারবে না।

'ঐ দিন' বলে বাহ্যত হাশর ও কিয়ামতের দিন বোঝানো হয়েছে। মৃত্যুর দিনও হতে পারে। কেননা, এসব প্রতিক্রিয়া মৃত্যুর সময় থেকেই প্রকাশ পায়। তখন কারও দেহে কাজ করার ক্ষমতা থাকে না এবং কারও মালিকানায় টাকা-পয়সাও থাকে না।

বিধান ও নির্দেশ : এ আয়াতে বলা হয়েছে : কিয়ামতের দিন কারও বন্ধুত্ব কারও কাজে আসবে না। এর উদ্দেশ্য এই যে, শুধু পার্থিব বন্ধুত্বই সেদিন কাজে আসবে না। কিন্তু যাদের পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও সম্পর্ক আল্লাহর সন্তুষ্টির ভিত্তিতে এবং তাঁর দাঁনের কাজের জন্য হয়, তাদের বন্ধুত্ব তখনও উপকারে আসবে। সেদিন আল্লাহ্ তা'আলার সৎ ও প্রিয় বান্দারা অপরের জন্য সুপারিশ করতে সক্ষম হবেন। বহু হাদীসে এ

বিষয়টি বর্ণিত রয়েছে। কোরআন পাকে বলা হয়েছে : لَا خِالَالَ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ

لِبَعْضِهِمْ صَدَقَاتٌ وَلَا الْمُتَّقِينَ

-অর্থাৎ দুনিয়াতে যারা পরস্পরে বন্ধু ছিল, সেদিন

পরস্পরে শত্রু হয়ে যাবে; তারা বন্ধুর ঘাড়ে পাপের বোঝা চাপিয়ে নিজেরা মুক্ত হয়ে যেতে চাইবে। কিন্তু যারা আল্লাহ্‌ভীরু, তাদের কথা ভিন্ন। আল্লাহ্‌ভীরুরা সেখানেও সুপারিশের মাধ্যমে একে অপরের সাহায্য করবেন।

তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার অনেকগুলো নিয়ামত স্মরণ করিয়ে মানুষকে ইবাদত ও অনুগত্যের দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে: আল্লাহ্ তা'আলার সন্তাই হল যিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন, যাদের ওপর মানুষের অস্তিত্বের সূচনা ও স্থায়িত্ব নির্ভরশীল। এরপর তিনি আকাশ থেকে পানি অবতারণ করেছেন, যার সাহায্যে হরেক রকমের ফল সৃষ্টি করেছেন, যাতে সেগুলো তোমাদের রিযিক হতে পারে। **ثمرات** শব্দটি **ثمر** এর বহুবচন। প্রত্যেক বস্তু থেকে অজিত ফলাফলকে **ثمر** বলা হয়। তাই মানুষের খাদ্যজাতীয় বস্তু, পরিধেয় বস্তু এবং বসবাসের গৃহ--সবই **ثمرات** শব্দের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, আয়াতে ব্যবহৃত **رزق** শব্দটিতে এসব প্রয়োজন শামিল রয়েছে। —( মাযহারী )

অতঃপর বলা হয়েছে: আল্লাহ্ তা'আলাই নৌকা ও জাহাজসমূহকে তোমাদের কাজে নিয়োজিত করেছেন। এক আল্লাহ্র নির্দেশে নদ-নদীতে চলাফেরা করে। আয়াতে ব্যবহৃত

**سفن** শব্দের অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা এসব জিনিষের ব্যবহার তোমাদের জন্য সহজ করে দিয়েছেন। কাঠ, লোহা-লস্কড়, নৌকা তৈরীর হাতিয়ার এবং এগুলোর বিশুদ্ধ ব্যবহারের জ্ঞান-বুদ্ধি--সবই আল্লাহ্ তা'আলার দান। কাজেই এসব বস্তুর আবিষ্কার গর্ব করা উচিত নয় যে, সে এগুলো আবিষ্কার অথবা নির্মাণ করেছে। কেননা, নৌকা ও জাহাজে যেসব বস্তু ব্যবহৃত হয়, সেগুলোর কোনটিই সে সৃষ্টি করেনি এবং করতে পারে না। আল্লাহ্র সৃজিত কাঠ, লোহা, তামা ও পিতলের মধ্যে কৌশল প্রয়োগ করে এই আবিষ্কারের মুকুট সে নিজের মাথায় পরিধান করেছে। নতুবা বাস্তব সত্য এই যে, স্বয়ং তার অস্তিত্ব, হাত-পা, মস্তিষ্ক এবং বুদ্ধি ও তার নিজের তৈরী নয়।

এরপর বলা হয়েছে: আমি তোমাদের জন্য সূর্য ও চন্দ্রকে অনুবর্তী করে দিয়েছি।

এরা উভয়ে সর্বদা একই গতিতে চলাচল করে। **دَابُّ دَابُّ** শব্দটি **دَابُّ** থেকে

উদ্ভূত। এর অর্থ অভ্যাস। অর্থ এই যে, সর্বদা ও সর্বাধ্বায় চলা এ দু'টি গ্রহের অভ্যাসে পরিণত করে দেওয়া হয়েছে। এর খেলাফ হয় না। অনুবর্তী করার অর্থ এরূপ নয় যে, তারা তোমাদের আদেশ ও ইঙ্গিতে চলবে। কেননা, সূর্য ও চন্দ্রকে মানুষের আজ্ঞাধীন করার অর্থে বাস্তবগত নির্দেশের অনুবর্তী করে দিলে তাদের মধ্যে পারস্পরিক মতবিরোধ দেখা দিত। কেউ বলত, আজ দু'ঘণ্টা পর সূর্যোদয় হোক। কারণ, রাতের কাজ বেশী। কেউ বলত, দু'ঘণ্টা আগে সূর্যোদয় হোক। কারণ, দিনের কাজ বেশী। তাই আল্লাহ্ তা'আলা আসমান ও আকাশসমূহকে মানুষের অনুবর্তী করেছেন ঠিকই; কিন্তু এরূপ অর্থে করেছেন যে, ওগুলো সর্বদা সর্বাধ্বায় আল্লাহ্ তা'আলার অপার রহস্যের অধীনে মানুষের কাজে নিয়োজিত আছে। এরূপ অর্থে নয় যে, তাদের উদয়, অস্ত ও গতি মানুষের ইচ্ছা ও মজীর অধীন।

এমনভাবে রাত ও দিনকে মানুষের অনুবর্তী করে দেওয়ার অর্থও এরূপ যে, এগুলোকে মানুষের সেবা ও সুখ বিধানের কাজে নিয়োজিত করা হয়েছে।

وَأَلَّا تَكُونَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ۗ وَأَلَّا تَكُونَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ۗ -- অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে ঐ

সমুদয় বস্তু দিয়েছেন, যা তোমরা চেয়েছ। আল্লাহ্‌র দান ও পুরস্কার কারও চাওয়ার ওপর নির্ভরশীল নয়। আমরা নিজেদের অস্তিত্বও তাঁর কাছে চাইনি। তিনি নিজ কৃপায় চাওয়া ব্যতীতই দিয়েছেন --

مَا نَهَوْدِيْمُ وَتَقَاٰ مَا نَهَوْدِيْمُ  
لَطْفًا لِّوَنَّا كَفٰلَةً مَا مِيْ سَلُوْد

—‘আমি হিলাম না এবং আমার তরফ থেকে কোন তাকিদও ছিল না। তোমার অনুগ্রহই আমার না বলা আকাংখা প্রবণ করেছে।’

আসমান, জমিন, চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদি সৃষ্টি করার জন্য প্রার্থনা কে করেছিল? এগুলো চাওয়া ছাড়াই আমাদের পালনকর্তা দান করেছেন। এ কারণেই কাযী বায়যাতী এ বাক্যের অর্থ এরূপ বর্ণনা করেছেন: আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে প্রত্যেক ঐ বস্তু দিয়েছেন, যা চাওয়ার যোগ্য, যদিও তোমরা চাওনি। কিন্তু বাহ্যিক অর্থ নেওয়া হলেও কোন অসুবিধা নেই। কারণ, মানুষ সাধারণত যা যা চায়, তার অধিকাংশ তাকে দিয়েই দেওয়া হয়। যেখানে বাহ্যদৃষ্টিতে তার প্রার্থনা পূর্ণ করা হয় না, সেখানে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্য অথবা সারা বিশ্বের জন্য কোন না কোন উপযোগিতা নিহিত থাকে যা সে জানে না। কিন্তু সর্বত্র আল্লাহ্ জানেন যে, তার প্রার্থনা পূর্ণ করা হলে স্বয়ং তার জন্য অথবা তার পরিবারের জন্য অথবা সমগ্র বিশ্বের জন্য বিপদের কারণ হয়ে মাবে। এমতাবস্থায় প্রার্থনা পূর্ণ না করাই বড় নিয়ামত। কিন্তু জানের ত্রুটির কারণে মানুষ তা জানে না, তাই দুঃখিত হয়।

وَإِن تَعَدَّرَا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصَوْهَا -- অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামত এত

অধিক যে, সব মানুষ একত্রিত হয়ে সেগুলো গণনা করতে চাইলে গণে শেষ করতে পারবে না। মানুষের নিজের অস্তিত্ব স্বয়ং একটি ক্ষুদ্র জগৎ। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, হস্ত, পদ, দেহের প্রতিটি গ্রন্থি এবং শিরা-উপশিরায় আল্লাহ্ তা'আলার অন্তহীন নিয়ামত নিহিত রয়েছে। শতশত সূক্ষ্ম, নাজুক ও অভিনব যন্ত্রপাতি সজ্জিত এই ভ্রাম্যমান কারখানাটি সর্বদাই কাজে মশগুল রয়েছে। এরপর রয়েছে নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ে অবস্থিত স্ফটবস্তু, সমুদ্র ও পাহাড়ে অবস্থিত স্ফটবস্তু। আধুনিক গবেষণা ও তাতে আজীবন নিয়োজিত হাজারো বিশেষজ্ঞও এগুলোর কুল-কিনারা করতে পারেনি। এছাড়া সাধারণভাবে ধনাঙ্কর আকারে যেগুলোকে নিয়ামত মনে করা হয়, নিয়ামত সেগুলোতেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং প্রত্যেক রোগ প্রত্যেক কষ্ট, প্রত্যেক বিপদ ও প্রত্যেক শোক ও দুঃখ থেকে নিরাপদ থাকাও এক একটা স্বতন্ত্র নিয়ামত। একজন মানুষ কত প্রকার রোগে ও কত প্রকার মানসিক ও দৈহিক কষ্টে পতিত

হতে পারে, তার গণনা কেউ করতে সক্ষম নয়। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার সম্পূর্ণ দান ও নিয়ামতের গণনা কারও দ্বারা সম্ভবপর নয়।

অসংখ্য নিয়ামতের বিনিময়ে অসংখ্য ইবাদত ও অসংখ্য শোকের জরুরী হওয়াই ছিল ইনসাফের দাবী। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা দুর্বলমতি মানুষের প্রতি অনেক অনুগ্রহ করেছেন। মানুষ যখন সত্যের খাতিরে স্বীকার করে নেয় যে, যথার্থ শোকের আদায় করার সাধ্য তার নেই, তখন আল্লাহ তা'আলা এ স্বীকারোক্তিকেই শোকের আদায়ের সুলাভিস্তিক করে নেন। আল্লাহ তা'আলা দাউদ (আ)-এর এ ধরনের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতেই বলেছিলেনঃ

إِن لَّانْ شَكَرْتُمْ يَٰٓأَدۡءِى ۙ

জনা যথেষ্ট।

আয়তের শেষে বলা হয়েছে : -অর্থাৎ মানুষ

খুবই জালিম এবং অত্যধিক অকৃতজ্ঞ। উদ্দেশ্য, কষ্ট ও বিপদে সবর করা, মুখ ও মনকে অভিযোগ থেকে পবিত্র রাখা, একজন রহস্যবিদের পক্ষ থেকে এসেছে কিম্বা বিপদকে নিয়ামতই মনে করা, পক্ষান্তরে সুখ ও শান্তিতে সর্বান্তঃকরণে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়াই ছিল ইনসাফের তাকিদ। কিন্তু সাধারণত মানুষের অভ্যাস এ থেকে ভিন্ন। সামান্য কষ্ট ও বিপদ দেখা দিলেই তারা অধৈর্য হয়ে পড়ে এবং কাতরকণ্ঠে তা ব্যক্ত করতে শুরু করে। পক্ষান্তরে সুখ ও শান্তি লাভ করলে তাতে মত্ত হয়ে আল্লাহকে ভুলে যায়। এ কারণেই

পূর্ববর্তী আয়াতে খাঁটি মু'মিনের গুণ

شَكَوْرٌ وَ صَٰهَرٌ

( অধিক সবরকারী,

অধিক শোকসবরকারী ) ব্যক্ত হয়েছে।

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ۗ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا ۗ مِّنَ النَّاسِ ۗ فَمَنْ تَبِعَنِ فَإِنَّهُ مِنِّي ۗ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ۗ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ۝ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ ۗ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي

السَّمَاءِ ۝ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ  
 إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ ۝ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۝  
 رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءَ ۝ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ  
 يَقُومُ الْحِسَابُ ۝

(৩৫) যখন ইবরাহীম বললেন : হে পালনকর্তা, এ শহরকে শান্তিঘর করে দিন এবং আমাকে ও আমার সন্তান-সন্তাতিকে মূর্তি পূজা থেকে দূরে রাখুন। (৩৬) হে পালনকর্তা, এরা অনেক মানুষকে বিপথগামী করেছে। অতএব যে আমার অনুসরণ করে, সে আমার এবং কেউ আমার অবাধ্যতা করলে নিশ্চয় আপনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৩৭) হে আমাদের পালনকর্তা, আমি নিজের এক সন্তানকে তোমার পবিত্র গৃহের সম্মুখে চাম্বাদহীন উপত্যকায় আবাদ করেছি; হে আমাদের পালনকর্তা, যাতে তারা নামায কায়েম রাখে। অতঃপর আপনি কিছু লোকের অন্তরকে তাদের প্রতি আকৃষ্ট করুন এবং তাদেরকে ফলাদি দ্বারা ক্ষমী দান করুন, সন্তবত তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। (৩৮) হে আমাদের পালনকর্তা, আপনিতো জানেন আমরা যা কিছু গোপনে করি এবং যা কিছু প্রকাশ্য করি। আল্লাহর কাছে পৃথিবীতে ও আকাশে কোন কিছুই গোপন নয়। (৩৯) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি আমাকে এই বার্বাকো ইসমাইল ও ইসহাক দান করেছেন। নিশ্চয় আমার পালনকর্তা দোয়া শ্রবণ করেন। (৪০) হে আমার পালনকর্তা, আমাকে নামায কায়েমকারী করুন এবং আমার সন্তানদের মধ্যে থেকেও। হে আমাদের পালনকর্তা, এবং কবুল করুন আমার দোয়া। (৪১) হে আমাদের পালনকর্তা, আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং সব মু'মিনকে ক্ষমা করুন, যেদিন হিসাব কায়েম হবে।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং (ঐ সময়টিও স্মরণযোগ্য) যখন ইবরাহীম (আ) (হযরত ইসমাইল ও হযরত হাজেরাকে আল্লাহর নির্দেশে মক্কার প্রান্তরে এনে রাখার সময় দোয়া করে) বললেন : হে আমার পালনকর্তা, এ শহর (মক্কা)-কে শান্তির জায়গা করে দিন (অর্থাৎ এর অধিবাসীরা শান্তিতে থাকুক। উদ্দেশ্য, একে হরম করে দিন) এবং আমাকে ও আমার বিশেষ সন্তানদেরকে মূর্তি উপাসনা থেকে (যা এখন মূর্খদের মধ্যে প্রচলিত আছে) দূরে রাখুন (যেমন এ যাবত দূরে রেখেছেন)। হে আমার পালনকর্তা, (আমি মূর্তিদের উপাসনা থেকে দূরে থাকার দোয়া এ জন্য করছি যে) এসব মূর্তি অনেক মানুষকে পথভ্রষ্ট করেছে। (অর্থাৎ তাদের পথভ্রষ্টতার কারণ হয়েছে। এজন্য ভীত হয়ে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি যেমনি সন্তানদেরকে দূরে রাখার দোয়া করি, তেমনি তাদেরকেও উপদেশ দান করতে



থাকবে।) অতঃপর (আমার উপদেশ দানের পর) যে আমার পথে চলবে, সে আমার (এবং তার জন্য মাগফিরাতের ওয়াদা আছেই) এবং যে (এ ব্যাপারে) আমার কথা মানবে না, (তাকে আপনি হিদায়ত করুন। কেননা) আপনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু। (হিদায়ত দিয়ে তাদের ক্ষমা ও দয়ার ব্যবস্থাও করতে পারেন। এ দোয়ার উদ্দেশ্য মু'মিনদের জন্য সুপারিশ এবং অমু'মিনদের জন্য হিদায়ত প্রার্থনা।) হে আমাদের পালনকর্তা, আমি নিজ সন্তানদেরকে (অর্থাৎ ইসমাইল ও তার মাধ্যমে তার ভাবী বংশধরকে) আপনার পবিত্র গৃহের (অর্থাৎ খানায় কা'বাক) নিকটে (যা পূর্ব থেকে নির্মিত ছিল এবং মানুষ সর্বদা যার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে আসছিল) একটি (অপরিসর) প্রান্তরে (যা কংকর-ময় হওয়ার কারণে) চাম্বাবাদযোগ্য (-ও) নয়, আবাদ করছি। হে আমাদের পালনকর্তা, (পবিত্র গৃহের নিকটে এজন্য আবাদ করছি) যাতে তারা নামাযের (বিশেষ) বন্দোবস্ত করে। (এবং যেহেতু এখন এটা একটা অপরিসর প্রান্তর) অতএব আপনি কিছু লোকের অন্তর এদিকে আকৃষ্ট করে দিন (যেন তারা এখানে এসে বসবাস করে এবং এটি ঘনবসতিপূর্ণ হয়ে যায়।) এবং (যেহেতু এখানে চাম্বাবাদ নেই; তাই) তাদেরকে (স্বীয় কুদরত বলে) ফল-মূল আহাৰ্য দান করুন---যাতে তারা (এসব নিয়ামতের) শোকর আদায় করে। হে আমাদের পালনকর্তা, (এসব দোয়া একমাত্র নিজের দাসছ ও অভাব প্রকাশের জন্য---আপনাকে অভাব সম্পর্কে জ্ঞাত করার জন্য নয়। কেননা) আপনি তো সবকিছু সম্পর্কে জ্ঞাত, যা আমরা গোপন রাখি এবং যা প্রকাশ করি এবং (আমাদের প্রকাশ্য ও গোপন বিষয়ই বলব কেন) আল্লাহ তা'আলার কাছে (তো) নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের কোন কিছুই অপ্রকাশ্য নয়। (আরও কিছু দোয়া পরে উল্লিখিত হবে। মাঝখানে কিছু সংখ্যক সাবেক নিয়ামতের কারণে প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন, যাতে কৃতজ্ঞতার বরকতে এসব দোয়া কবুল হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। তাই বলেছেনঃ) সব প্রশংসা (ও গুণ বর্ণনা) আল্লাহর জন্য (শোভা পায়) যিনি আমাকে রূক্ষ বয়সে ইসমাইল ও ইসহাক (দু'পুত্র) দান করেছেন। নিশ্চয়ই আমার পালনকর্তা দোয়া শ্রবণকারী।

(অর্থাৎ কবুলকারী। সেমতে সন্তান দান সম্পর্কিত আমার দোয়া رَبِّ هَبْ لِي مِن

الْمَالِ الْحَلَالِ

কবুল করেছেন। অতঃপর এই নিয়ামতের শোকর আদায় করে অবিশিষ্ট

দোয়া পেশ করেছেনঃ) হে আমার পালনকর্তা, (আপনার পবিত্র গৃহের কাছে আমি আমার সন্তানদেরকে আবাদ করেছি। উদ্দেশ্য, তারা নামায কয়েম করুক। আপনি আমার এ উদ্দেশ্য পূর্ণ করুন। তাদের জন্য নামাযের বন্দোবস্ত করুন যেমন আমার কাম্য, তেমনিভাবে নিজের জন্যও কাম্য। তাই নিজের ও তাদের উভয় পক্ষের জন্য দোয়া করছি। যেহেতু আমি ওহীর মাধ্যমে জানতে পেরেছি যে, তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক অবিশ্বাসীও হবে, তাই দোয়া সবার জন্য করতে পারি না। সুতরাং এসব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে দোয়া করছি যে) আমাকেও নামায কয়েমকারী রাখুন এবং আমার সন্তানদের মধ্যেও কিছু সংখ্যককে

(নামায কামেমকারী করুন)। হে আমাদের পালনকর্তা এবং আমার (এই) দোয়া কবুল করুন। হে আমাদের পালনকর্তা, ক্ষমা করুন আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং সব মু'মিনকে হিসাব কামেম হওয়ার দিন। ( অর্থাৎ কিয়ামতের দিন উল্লিখিত সবাইকে ক্ষমা করুন। )

### আনুশঙ্গিক ভাষা বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে তওহীদ-বিশ্বাসের যৌক্তিকতা, গুরুত্ব এবং শিরক সংক্রান্ত মূর্খতা ও নিন্দাবাদ বর্ণিত হয়েছে। তওহীদের ব্যাপারে পয়গম্বরগণের মধ্যে সবচাইতে অধিক সফল জিহাদ হযরত ইবরাহীম (আ) করেছিলেন। এ জনাই ইবরাহীম (আ)-এর দীনকে বিশেষভাবে 'দীনে-হানীফ' বলা হয়।

এরই প্রেক্ষাপটে আলোচ্য আয়াতসমূহে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কাহিনী বিবৃত হয়েছে। আরও একটি কারণ এই যে, পূর্ববর্তী

اَلَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ كُفْرًا

আয়াতে মক্কার এসব কাফিরের নিন্দা করা হয়েছে, যারা পিতৃপুরুষের অনুসরণে ঈমানকে কুফরে এবং তওহীদকে শিরকে রূপান্তরিত করেছিল। —আলোচ্য আয়াতসমূহে তাদেরকে তাদের ঔর্ধ্বতন পিতৃপুরুষ ইবরাহীম (আ)-এর আকীদা ও আমল সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে, যাতে পিতৃ অনুসরণে অভ্যস্ত কাফিররা এদিকে লক্ষ্য করে কুফর থেকে বিরত হয়।

—( বাহুরে মুহীত )

বলা বাহুল্য, শুধু ইতিহাস বর্ণনা করার লক্ষ্যেই কোরআন পাকে পয়গম্বরগণের কাহিনী ও অবস্থা বর্ণনা করা হয়নি, বরং এসব কাহিনীতে মানব জীবনের প্রতিটি বিভাগ সম্পর্কে যেসব মৌলিক দিকনির্দেশ থাকে, সেগুলোকে ভাস্কর রাখার জন্য এসব ঘটনা বারবার কোরআন পাকে উল্লেখ করা হয়েছে।

এখানে প্রথম আয়াতে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দু'টি দোয়া উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রথম দোয়া : رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْوَلَدَ اِمْرًا

এ (মক্কা) নগরীকে শান্তির আয়ত্ব করে দাও। সূরা বাক্বারায়ও এ দোয়া উল্লেখ করা হয়েছে।

সেখানে **بَلَدًا** ব্যতীত **الْفَاوِ** লাম শব্দটি **بَلَدًا** বলা হয়েছে। এর অর্থ অনিদিষ্ট নগরী। কারণ এই যে, এ দোয়াটি যখন করা হয়েছিল তখন মক্কা নগরীর পত্তন হয়নি। তাই ব্যাপক অর্থবোধক ভাষায় দোয়া করেছিলেন যে, এ জায়গাকে একটি শান্তির নগরীতে পরিণত করে দিন।

এরপর মক্কা যখন জনবসতি স্থাপিত হয়ে যায়, তখন এ আয়াতে বর্ণিত দোয়াটি করেন। এ ক্ষেত্রে মক্কাকে নিদিষ্ট করে দোয়া করেন যে, একে শান্তির আবাসস্থল করে দিন। দ্বিতীয় দোয়া এই যে, আমাকে ও আমার সন্তান-সন্ততিকে মৃতিপূজা থেকে বাঁচিয়ে রাখুন।

পয়গম্বরূপ নিষ্পাপ। তাঁরা শিরক, মূর্তিপূজা এমনকি কোন গোনাহও করতে পারেন না। কিন্তু এখানে হযরত ইবরাহীম (আ) দোয়া করতে গিয়ে নিজেকেও অন্তর্ভুক্ত করেন। এর কারণ এই যে, স্বভাবজাত ভীতির প্রভাবে পয়গম্বরূপ সর্বদা শংকা অনুভব করতেন। অথবা আসল উদ্দেশ্য ছিল সন্তান-সন্ততিকে মূর্তিপূজা থেকে বাঁচানোর দোয়া করা। সন্তানদেরকে এর গুরুত্ব বুঝাবার জন্য নিজেকেও দোয়ায় শামিল করে নিয়েছেন।

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় দোস্তের দোয়া কবুল করেছেন। ফলে তাঁর সন্তানরা শিরক ও মূর্তিপূজা থেকে নিরাপদ থাকে। প্রায় উঠতে পারে যে, মক্কাবাসীরা তো সাধা-স্বগভাবে হযরত ইবরাহীম (আ)-এরই বংশধর। পরবর্তীতে তো তাদের মধ্যে মূর্তিপূজা বিদ্যমান ছিল। বাহর-মুহীত গ্রন্থে সুফিয়ান ইবনে ওয়ালিদার বরাতে দিয়ে ইসমাইল (আ)-এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, ইসমাইল (আ)-এর সন্তানদের মধ্যে কেউ প্রকৃতপক্ষে মূর্তিপূজা করেন নি। বরং যে সময় জুরহাম গোত্রের লোকেরা মক্কা অধিকার করে এর সন্তান-দেরকে হরম থেকে বের করে দেয়, তখন তারা হরমের প্রতি অগাধ ভালবাসা ও সম্মানের কারণে এখানকার কিছু পাথর সাথে করে নিয়ে যায়। তারা এগুলোকে হরম ও বায়তুল্লাহর স্মারক হিসাবে সামনে রেখে ইবাদত করত এবং এগুলোর প্রদক্ষিণ ( তাওয়াফ ) করত। এতে আল্লাহ ব্যতীত অন্য উপাস্যের কোনরূপ ধারণা ছিল না। বরং বায়তুল্লাহর দিকে মুখ করে নামায পড়া এবং বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করা যেমন আল্লাহ তা'আলারই ইবাদত, তেমনি তারা এই পাথরের দিকে মুখ করা এবং এগুলো তাওয়াফ করাকে আল্লাহর ইবাদতের পরিপন্থী মনে করত না। এরপর এ কর্মপন্থাই মূর্তিপূজার কারণ হয়ে যায়।

দ্বিতীয় আয়াতে এই দোয়ার কারণ বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, মূর্তিপূজা থেকে আমাদের অব্যাহতি কামনার কারণ এই যে, এ মূর্তি অনেক মানুষকে পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত করেছে। ইবরাহীম (আ) স্বীয় পিতা ও জাতির অভিজ্ঞতা থেকে একথা বলেছিলেন। মূর্তিপূজা তাদেরকে সর্বপ্রকার মঙ্গল ও কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করে দিয়েছিল।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে :

نَمِّنْ تَعْبَنِي فَاثَةً مِّنِي وَمَنْ مَّصَانِي فَأَنْتَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ — অর্থাৎ তাদের

মধ্যে যে ব্যক্তি আমার অনুসারী হবে অর্থাৎ ঈমান ও সৎকর্ম সম্পাদনকারী হবে, সে তো আমারই। উদ্দেশ্য, তার প্রতি যে দয়া ও রূপা করা হবে, তা বলাই বাহুল্য। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অবাধ্যতা করে তার জন্য আপনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু। এখানে অবাধ্যতার অর্থ যদি কর্মগত অবাধ্যতা অর্থাৎ মন্দ কর্ম নেওয়া হয়, তবে আয়াতের অর্থ স্পষ্ট যে, আপনার রূপায় তারও ক্ষমা আশা করা যায়। এবং যদি অবাধ্যতার অর্থ কুফরী ও অস্বীকৃতি নেওয়া হয়, তবে কাফির ও মুশরিকদের ক্ষমা না হওয়া নিশ্চিত ছিল এবং ওদের জন্য সুপারিশ না করার নির্দেশ ইবরাহীম (আ)-কে পূর্বেই দেওয়া হয়েছিল। এমতাবস্থায় তাদের ক্ষমার আশা ব্যক্ত করা সঠিক হতে পারে না। তাই বাহরে মুহীত গ্রন্থে বলা হয়েছে : এখানে হযরত ইবরাহীম (আ) আদৌ দোয়া অথবা সুপারিশের ভাষা প্রয়োগ করেন নি। একথা

বলেন নি যে, আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিন। তবে তিনি পয়গম্বরসুলভ দয়া প্রকাশ করেছেন। প্রত্যেক পয়গম্বরের আন্তরিক বাসনা এটাই ছিল যে, কোন কাফিরও যেন আঘাবে পতিত না হয়। “আপনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু”—একথা বলে তিনি এই স্বভাবসুলভ বাসনা প্রকাশ করে দিয়েছেন মাত্র। একথা বলেন নি যে, এদের সাথে ক্ষমা ও দয়ালু ব্যবহার করুন। হযরত ঈসা (আ)-ও খ্রীষ্ট উন্মত্তের কাফিরদের সম্পর্কে এরূপ বলেছিলেন :

وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ—অর্থাৎ আপনি যদি

ওদেরকে ক্ষমা করেন, তবে আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান, সবই করতে পারেন। আপনার কাজে কেউ বাধাদানকারী নেই।

আল্লাহ্ তা'আলার এ দু'জন মনোনীত পয়গম্বরের কাফিরদের ব্যাপারে সুপারিশ করেন নি। কারণ এটা ছিল আদব ও শিষ্টাচারের পরিপন্থী। কিন্তু একথাও বলেন নি যে, কাফিরদের উপর আঘাব নাশিল করুন। বরং আদবের সাথে বিশেষ ভংগিতে তাদের ক্ষমার স্বভাবজাত বাসনা প্রকাশ করেছেন মাত্র।

**বিধান ও নির্দেশ :** দোয়া প্রত্যেকেই করে কিন্তু দোয়ার সঠিক চণ্ড সবার জানা থাকে না। পয়গম্বরের দোয়া শিক্ষাপ্রদ হয়ে থাকে। দোয়ায় কি জিনিস চাওয়া বিশেষ পয়গম্বরের দোয়া থেকে তা অনুমান করা যায়। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর আলোচ্য দোয়ায় দু'টি অংশ রয়েছে। এক. মক্কা শহরকে জয় ও আশংকামুক্ত শান্তির আবাসস্থান করা। দুই, খ্রীষ্ট সন্তান-সন্ততিকে মৃত্যুপূজা থেকে চিরতরে মুক্তি দান করানো।

চিন্তা করলে দেখা যায়, এ দু'টি বিষয়ই হচ্ছে মানুষের সাবিক কল্যাণের মৌলিক ধারা। কেননা মানুষ যদি বসবাসের জায়গায় ভয়, আশংকা ও শত্রুর আক্রমণ থেকে দুর্ভাবনামুক্ত হতে না পারে, তবে জাগতিক ও বৈষয়িক এবং ধর্মীয় ও আত্মিক কোন দিক দিয়েই তার জীবন সুখী হতে পারেন না। জগতের যাবতীয় কর্ম ও সুখ যে শান্তি ও মানসিক স্থিরতার উপর নির্ভরশীল, একথা বলাই বাহুল্য। যে ব্যক্তি শত্রুর হামলা ও বিভিন্ন প্রকার বিপদাশংকায় পরিবেষ্টিত থাকে, তার কাছে জগতের বৃহত্তম নিয়ামত, পানাহার ও নিদ্রা-জাগরণের সর্বোত্তম সুযোগ-সুবিধা, উৎকৃষ্ট শ্রেণীর দালান-কোঠা ও বাংলো এবং অর্থ সম্পদের প্রাচুর্য—সবই তিক্ত বিষাদ মনে হতে থাকে।

ধর্মীয় দিক দিয়েও প্রত্যেক ইবাদত ও আল্লাহ্র নির্দেশ পালন করা তখনই সম্ভবপর, যখন মানসিক স্থিরতা ও প্রশান্তির পরিবেশ বিরাজমান থাকে।

তাই হযরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রথম দোয়ায় মানসিক কল্যাণের, অর্থনৈতিক, সামাজিক, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সব প্রয়োজন বোঝান হয়েছে। এই একটি মাত্র বাক্য দ্বারা তিনি সন্তান-সন্ততির জন্য দুনিয়ার সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রার্থনা করেছেন।

এ দোয়া থেকে আরও জানা পেল যে, সন্তানদের প্রতি সহানুভূতি এবং তাদের

অর্থনৈতিক সুখস্বাস্থ্যের সাধ্যানুযায়ী ব্যবস্থা করাও পিতার অন্যতম কর্তব্য। এর চেষ্টা যুদ্ধ তথা দুনিয়ার ভাঙ্গবাসা বর্জনের পরিপন্থী নয়।

দ্বিতীয় দোয়ায়ও অনেক ব্যাপকতা আছে। কেননা, যে পাপের ক্ষমা নেই তা হচ্ছে শিরক ও মূর্তিপূজা। তিনি এ পাপ থেকে মুক্ত থাকার দোয়া করেছেন। এর পর কোন পাপ হয়ে গেলে তার ক্ষতিপূরণ অন্যান্য আমল দ্বারাও হতে পারে এবং কারও সুপারিশ দ্বারাও মাক্ফ হয়ে যেতে পারে। যদি মূর্তিপূজা শব্দটিকে সূফী বুয়ুর্গদের ভাষ্য অনুযায়ী ব্যাপকতর অর্থে ধরা হয়, তবে যে বস্তু মানুষকে আল্লাহ থেকে গাফিল করে দেয়, তাই তার জন্য মূর্তি বিশেষ এবং এর প্রতি আন্তরিক আকর্ষণে পরাভূত হয়ে আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যতা লিপ্ত হওয়া তার জন্য পূজা সমতুল্য। অতএব মূর্তিপূজা থেকে মুক্ত রাখার দোয়ার মধ্যে সর্বপ্রকার পাপ থেকে হিফায়ত করার বিষয়বস্তু এসে গেছে। কোন কোন সূফী বুয়ুর্গ এ অর্থেই নিজের মনকে সম্বোধন করে গোনাহ ও গাফিলতির প্রতি ভৎসনা করেছেন :

سورة كشت از سجد و راه بتان پیشا نیم  
چند بر خود تهمت دین مسلمانى نیم

সাধক রামী বলেন : پر خیال شہوتے دورہ ہتے ست :

তৃতীয় আয়াতে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর আরও একটি বিজুলভ দোয়া বর্ণিত

হয়েছে : رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ الْأَيْدِ

পরিবার-পরিজনকে পাহাড়ের এমন এক পাদদেশে আবাদ করেছি, যেখানে চাষাবাদের সম্ভাবনা নেই (এবং বাহ্যত জীবনধারণের কোন উপকরণ নেই)। পাহাড়ের এ পাদদেশটি আপনার সম্মানিত গৃহের নিকটে অবস্থিত। এখানে আবাদ করার উদ্দেশ্যে, যাতে তারা নামায কায়েম করে। এজন্য আপনি কিছু লোকের অন্তর তাদের দিকে আকৃষ্ট করে দিন, যাতে তাদের সম্প্রীতি ও বসতি স্থাপনের ব্যবস্থা হয়। তাদেরকে ফল দান করুন, যাতে তারা কৃতজ্ঞ হয়।

ইবরাহীম (আ)-এর এ দোয়ার একটি পটভূমি আছে। তা এই যে, নূহ (আ)-এর আমলে মহা প্রাবনে কা'বা গৃহের প্রাচীর সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁর এ পবিত্র ঘর পুনর্নির্মাণের ইচ্ছা করেন, তখন ইবরাহীম (আ)-কে এ কাজের জন্য মনোনীত করেন, এবং তাকে স্ত্রী হাজেরা ও পুত্র ইসমাইলকে সাথে নিয়ে সিরিয়া থেকে হিজরত করে এই গুফ ও অনূর্বর ভূমিতে বসতি স্থাপন করার আদেশ দেন।

সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে, ইসমাইল (আ) তখন দুগ্ধগোষ্য শিশু ছিলেন। ইবরাহীম (আ) আদেশ অনুযায়ী তাঁকে ও তাঁর জননী হাজেরাকে বর্তমান কা'বাগৃহ ও যমযম কূপের অদূরে রেখে দিলেন। তখন এ স্থানটি পাহাড় বেষ্টিত জনশূন্য প্রান্তর ছিল। দুগ্ধ-দুগ্ধান্ত পর্যন্ত পানি ও জনবসতির কোন চিহ্ন ছিল না। ইবরাহীম (আ) তাঁদের জন্য একটি পাত্রে কিছু খাদ্য এবং মশকে পানি রেখে দিলেন।

এরপর ইবরাহীম (আ) সিরিয়া প্রত্যাবর্তনের আদেশ পান। যে জায়গায় আদেশটি লাভ করেন, সেখান থেকেই আদেশ পালন করতে রওনা হয়ে যান। স্ত্রী ও দুঃখপোষ্য সন্তানকে জনমানবহীন প্রান্তরে ছেড়ে যাওয়ার ফলে তাঁর মধ্যে শ্বে মানসিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল তা তাঁর মুখ থেকে উচ্চারিত পরবর্তী দোয়ার মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু আল্লাহর আদেশ পালনে তিনি এতটুকু বিলম্ব করাও সমীচীন মনে করেন নি যে, হাজেরাকে সংবাদ দেবেন এবং কিছু সান্ধনার বাক্য বলে যাবেন।

ফলে হযরত হাজেরা যখন তাঁকে যেতে দেখলেন, তখন বারবার ভেবে বললেন, আপনি আমাদেরকে কোথায় ছেড়ে যাচ্ছেন? এখানে না আছে কোন মানুষ এবং না আছে জীবনধারণের কোন উপকরণ। কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আ) পেছনে ফিরে দেখলেন না। সন্তবত তিনি আল্লাহ্ তা'আলারই আদেশ পেয়েছেন। তাই পুনরায় ভেবে জিজ্ঞেস করলেন : আল্লাহ্ কি আপনাকে এখান থেকে চলে যাওয়ার আদেশ দিয়েছেন? তখন ইবরাহীম (আ)

পেছনে তাকিয়ে উত্তর দিলেন : হ্যাঁ। হযরত হাজেরা একথা শুনে বললেন : **إِنِّي لَأُفِيْعِنَا**  
অর্থাৎ তবে আর কোন চিন্তা নেই। যে মালিক আপনাকে এখান থেকে চলে যাওয়ার আদেশ দিয়েছেন, তিনি আমাদেরকেও বিনশ্চ হতে দেবেন না।

হযরত ইবরাহীম (আ) সামনে অগ্রসর হতে লাগলেন। যখন একটি পাহাড়ের পশ্চাতে পৌঁছলেন এবং হাজেরা ও ইসমাইল দু'টি থেকে অপসৃত হয়ে গেলেন, তখন বার-তুরাহর দিকে মুখ করে আয়াতে বর্ণিত দোয়াটি করলেন।

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর এই দোয়া থেকে অনেক দিক নির্দেশ ও মাস'আলা জানা যায়। নিম্নে এগুলো বর্ণনা করা হচ্ছে।

দোয়ায় ইবরাহীমীর রহস্যাবলী : (১) ইবরাহীম (আ) একদিকে আল্লাহর দোস্ত হিসেবে তাঁর যা করণীয় ছিল, তা করেছেন। যখন ও যে স্থানে তিনি সিরিয়ায় ফিরে যাওয়ার আদেশ পান, সেই মুহূর্তে সেই স্থান থেকে গুরু জনমানবহীন প্রান্তরে স্ত্রী-পুত্রকে রেখে চলে যাওয়ার ব্যাপারে এবং আল্লাহর আদেশ পালনে তিনি বিন্দুমাত্রও দ্বিধাবোধ করেননি। এ আদেশ পালনে তিনি এতটুকু বিলম্বও সহ্য করেননি যে, স্ত্রীর কাছে গিয়ে আল্লাহর আদেশের কথা বলবেন এবং তাঁকে দু'কথা বলে সান্ধনা দেবেন। বরং আদেশ পাওয়ার সাথে সাথে তিনি সেখান থেকেই সিরিয়াভিমুখে রওনানা হয়ে যান।

অপরদিকে পরিবার-পরিজন ও তাদের মহত্বের হক এভাবে পরিশোধ করেছেন যে, পাহাড়ের পশ্চাতে তাদের দু'টি থেকে উধাও হয়েই আল্লাহর দরবারে তাদের হিফাযত ও সুখে-শান্তিতে বাস করার জন্য দোয়া করেছেন। কারণ তাঁর স্থির বিশ্বাস ছিল যে, নির্দেশ পালনের সাথে সাথে যে দোয়া করা হবে, তা দয়াময়ের দরবারে অবশ্যই কবুল হবে, হয়েছেও তাই। এই সহায়হীনা ও অবলা মহিলা এবং তাঁর শিশুপুত্র শুধু নিজেরাই পুনর্বাসিত হন নি; বরং তাঁদের উছিনার একটি শহর স্থাপিত হয়ে গেছে এবং শুধু তাঁরাই জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র পাননি, তাঁদের বরকতে আজ পর্যন্ত মক্কাবাসীদের উপর সর্বপ্রকার নিয়ামতের দ্বার অব্যাহত রয়েছে।

এ হচ্ছে পয়গম্বরসুলভ দৃঢ়তা ও সুব্যবস্থা। এখানে এক দিকে লক্ষ্য দেওয়ার সময় অন্যদিক উপেক্ষিত হতো না। পয়গম্বরগণ সাধারণ সুফী-বুয়ুর্গদের মত ভাবাবেগে হান্নিয়ে যেতেন না। এ শিক্ষার মাধ্যমেই মানুষ যথার্থ পূর্ণতা লাভ করতে পারে।

(২) হযরত ইবরাহীম (আ) যখন আন্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ পান যে, দুগ্ধপোষ্য শিশু ও তাঁর জননীকে গুচ্ছ প্রান্তরে ছেড়ে আপনি সিরিয়া চলে যান, তখন তাঁর মনে এতটুকু বিশ্বাস জন্মেছিল যে, আন্লাহ তাঁদেরকে বিনশট করবেন না। তাঁদের জন্য পানি অবশ্যই সরবরাহ করা হবে। তাই দোয়ার **بِوَادِ غَيْرِ ذِي مَاءٍ** (জনহীন প্রান্তরে) বলেন নি :

**غَيْرِ ذِي زُرْعٍ** (চাষাবাদহীন) বলে আবেদন করেছেন যে, তাঁদেরকে ফলমূল দান করুন, যদিও তা অন্য জায়গা থেকে আনা হয়। এ কারণেই মক্কা মুকাররমায় আজ পর্যন্ত চাষাবাদের তেমন ব্যবস্থা না থাকলেও সারা বিশ্বের ফলমূল এত অধিক পরিমাণে সেখানে পৌঁছে থাকে যে, অন্যান্য অনেক শহরেই সেগুলো পাওয়া দুস্কর।---( বাহরে-মুহীত )

(৩) **عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ** থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, বায়তুল্লাহ শরীফের

ভিত্তি হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পূর্বে স্থাপিত হয়েছিল। ইমাম কুরতুবী সূরা বাক্বারার তফসীলে বিভিন্ন রেওয়াজেতার সাহায্যে প্রমাণ করেছেন যে, সর্বপ্রথম হযরত আদম (আ) বায়তুল্লাহ নির্মাণ করেন। তাঁকে যখন পৃথিবীতে নামানো হয়, তখন মূজিয়া হিসেবে সরস্বতীপাহাড় থেকে এখানে পৌঁছানো হয় এবং জিবরাযীল বায়তুল্লাহর জায়গা চিহ্নিতও করে দেন। আদম (আ) স্বয়ং এবং তাঁর সন্তানরা এর চতুষ্পার্শ্ব প্রদক্ষিণ করতেন। শেষ পর্যন্ত নূহের মহাপ্লাবনের সময় বায়তুল্লাহ উঠিয়ে নেওয়া হয়; কিন্তু তার ভিত্তি সেখানেই থেকে যায়। হযরত ইবরাহীম (আ)-কে এই ভিত্তির উপরই বায়তুল্লাহ পুননির্মাণের আদেশ দেওয়া হয়। হযরত জিবরাযীল প্রাচীন ভিত্তি দেখিয়ে দেন। ইবরাহীম (আ) নিমিত এই প্রাচীন মূর্ততা-মুগে বিধ্বস্ত হয়ে গেলে কুরায়শরা তা নতুনভাবে নির্মাণ করে। এ নির্মাণ-কাজে আবু তালিবের সাথে রসূলুল্লাহ (স)ও নবুয়তের পূর্বে অংশগ্রহণ করেন।

এতে বায়তুল্লাহর বিশেষণ **مُحَرَّم** উল্লেখ করা হয়েছে। এর অর্থ সম্মানিতও হতে পারে এবং সুরক্ষিতও। বায়তুল্লাহ শরীফের মধ্যে উভয় বিশেষণ বিদ্যমান আছে। এটি যেমন চিরকাল সম্মানিত, তেমনি চিরকাল শত্রু কবল থেকে সুরক্ষিত।

(৪) **لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ**—হযরত ইবরাহীম (আ) দোয়ার প্রান্তরে পুত্র ও

তার জননীর অসহায়তা ও দুর্দশা উল্লেখ করার পর সর্বপ্রথম তাঁদেরকে নামায ক্বামেয়মকারী করার দোয়া করেন। কেননা, নামায দ্বারা ইহকাল ও পন্নকালের যাবতীয় মজল সাধিত হয়। এ থেকে বোঝা গেল যে, পিতা যদি সন্তানকে নামাযের অনুবর্তী করে দেয় তবে এটাই

সন্তানদের পক্ষে পিতার সর্বস্বৎ সহানুভূতি ও হিতাকাঙ্ক্ষা হবে। ইবরাহীম (আ) যদিও সেখানে মাত্র একজন মহিলা ও ছেলেকে ছেড়ে ছিলেন; কিন্তু দোয়ায় বহুবচন ব্যবহার করেছেন। এতে বোঝা যায় যে, ইবরাহীম (আ) জানতেন যে, এখানে শহর হবে এবং ছেলের বংশ বৃদ্ধি পাবে। তাই দোয়ায় সবাইকে শামিল রেখেছেন।

(৫) **فَرَادَ أَنْتَدَا فَرَادَ** শব্দটি **مِنَ النَّاسِ** এর বহুবচন। এর অর্থ

অন্তর। এখানে **أَنْتَدَا** শব্দটি **نَكَرَةً** এবং তার সাথে **مِنَ** অব্যয় ব্যবহার করা হয়েছে, যা **تَقْلِيلٌ وَ تَبَعِيضٌ** এর অর্থে আসে। তাই অর্থ এই যে, কিছু সংখ্যক লোকের অন্তর তাদের দিকে আকৃষ্ট করে দিন। তফসীরবিদ মুজাহিদ বলেন : যদি এ দোয়ায় 'কিছু সংখ্যক' অর্থবোধক অব্যয় ব্যবহার করা না হত ; **أَنْتَدَا النَّاسِ**

বলা হত, তবে সারা বিশ্বের মুসলিম, অমুসলিম, ইহুদী, খৃস্টান এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সব মানুষ মক্কায় ভিড় করত, যা তাদের জন্য কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়াত। এ তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে ইবরাহীম (আ) দোয়ায় বলেছেন : কিছু সংখ্যক লোকের অন্তর তাদের দিকে আকৃষ্ট করে দিন।

(৬) **ثَمْرًا** শব্দটি **ثَمَرَاتٍ** - **وَأَرْزُقْتَهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ** এর বহুবচন।

এর অর্থ ফল, যা স্বভাবত খাওয়া হয়। এদিক দিয়ে দোয়ার সারমর্ম এই যে, তাদেরকে খাওয়ার জন্য সর্বপ্রকার ফল দান করুন।

**ثَمْرًا** শব্দটি কোন সময় ফলশ্রুতি ও উৎপাদনের অর্থেও ব্যবহৃত হয়, যা খাওয়ার ফলের চেয়ে অনেক ব্যাপক। প্রত্যেক উপকারী বস্তুর ফলাফলকে তার **ثَمْرًا** বলা যায়। মেশিন ও শিল্প কারখানার **ثَمْرًا** বলতে তার উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীকে বোঝায়। চাকুরী ও মজুরির ফলশ্রুতিতে যে পারিশ্রমিক ও বেতন পাওয়া যায়, তা চাকুরীর **ثَمْرًا** কোরআন পাকের এক আয়াতে এ দোয়ায় **ثَمَرَاتٍ كُلِّ شَيْءٍ** বলা হয়েছে। এতে

**شَجَرٍ** শব্দ ব্যবহার না করে **شَيْءٍ** (বস্তু) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত হতে পারে যে, ইবরাহীম (আ) তাদের জন্য শুধু খাওয়ার ফলের দোয়াই করেন নি; বরং প্রত্যেক বস্তুর অজিত ফলাফলেরও দোয়া করেছেন! সম্ভবত এ দোয়ার প্রভাবেই মক্কা মুকাররমা কোন কৃষিপ্রধান অথবা শিল্পপ্রধান এলাকা না হওয়া সত্ত্বেও সারা বিশ্বের দ্রব্যসামগ্রী এখানে প্রচুর পরিমাণে আমদানী হয়, যা বোধ হয় জগতের অন্য কোন বৃহত্তম শহরেও পাওয়া যায় না।

(৭) হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁর সন্তানদের জন্য এরূপ দোয়া করেন নি যে, মক্কার ভূমিকে চাষাবাদযোগ্য করে দিন। এরূপ করলে মক্কার উপত্যকাকে শস্য-শ্যামলা করে



দেওয়া মোটেই কঠিন ছিল না। কিন্তু তিনি সন্তানদের জন্য কৃষিরূপে পছন্দ করেন নি। তাই কিছু লোকের অন্তর তাদের প্রতি আকৃষ্ট করে দেওয়ার জন্য দোয়া করেছেন যাতে তারা পূর্ব-পশ্চিম ও পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে এখানে আগমন করে এবং তাদের এ সমাবেশ সমগ্র বিশ্বের জন্য হিদায়েত ও মক্কাবাসীদের জন্য সুখ-স্বাস্থ্যদায়ক উপায় হয়। আল্লাহ তা'আলা এই দোয়া কবুল করেছেন। ফলে মক্কার অধিবাসীরা আজ পর্যন্ত চাম্বাবাদ ও কৃষিকাজের মুখাপেক্ষী না হয়েও জীবনধারণের প্রয়োজনীয় সব আসবাবপত্রের অধিকারী হয়ে সুখী ও স্বাস্থ্যময় জীবন যাপন করছে।

(৮) **لَعَلَّكُمْ يَشْكُرُونَ** — এতে ইঙ্গিত করেছেন যে, সন্তানদের জন্য আর্থিক

সুখ-স্বাস্থ্যদায়ক দোয়া এ কারণে করা হয়েছে, যাতে তারা কৃতজ্ঞ হয়ে কৃতজ্ঞতার সওয়াবও অর্জন করে। এভাবে নামায়ের অনুবর্তিতা দ্বারা দোয়া শুরু করে কৃতজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে শেষ করা হয়েছে। মাঝখানে আর্থিক সুখ-শান্তির প্রসঙ্গ অনা হয়েছে। এতে শিক্ষা রয়েছে যে, মুসলমানের এরূপই হওয়া উচিত। তার ক্রিয়াকর্ম, ধ্যানধারণা ও চিন্তাধারার ওপর পরকালের কল্যাণ চিন্তা প্রবল থাকা দরকার এবং সংসারের কাজ ততটুকুই করা উচিত, স্বতটুকু নেহায়েত প্রয়োজন।

رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نَعْلَمُ ط وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলার সর্বব্যাপী জ্ঞানের প্রসঙ্গ টেনে দোয়া সমাপ্ত করা হয়েছে। কাকুতি-মিনতি ও বিলাপ প্রকাশার্থে **رَبَّنَا** শব্দটি বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থ এই যে, আপনি আমাদের অন্তরগত অবস্থা ও বাহ্যিক আবেদন-নিবেদন সবকিছু সম্পর্কে ওয়াকিফহাল।

‘অন্তরগত অবস্থা’ বলে ঐ দুঃখ, মনোবেদনা ও চিন্তা-ভাবনা বোঝানো হয়েছে, যা একজন দুঃখপোষা শিশু ও তার জননীকে উন্মুক্ত প্রান্তরে নিঃসঙ্গল, ফরিয়াদরত অবস্থায় ছেড়ে আসা এবং তাদের বিচ্ছেদের কারণে স্বাভাবিকভাবে দেখা দিচ্ছিল। ‘বাহ্যিক আবেদন-নিবেদন’ বলে ইবরাহীম (আ)-এর দোয়া এবং হাজেরার ঐসব বাক্য বোঝানো হয়েছে, যেগুলো আল্লাহর আদেশ শোনার পর তিনি বলেছিলেন অর্থাৎ আল্লাহ বখন নির্দেশ দিয়েছেন, তখন তিনি আমাদের জন্য মথেষ্ট। তিনি আমাদেরকে বিনশ্রুত করবেন না। আয়াতের শেষে আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানের বিস্তৃতি আরও বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, আমাদের বাহ্যিক ও অন্তরগত অবস্থাই কেন বলি, সমস্ত ভূমণ্ডল ও নভো-মণ্ডলে কোন বস্তুই তাঁর অজ্ঞাত নয়।

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ط

এ আয়াতের বিষয়বস্তুও পূর্ববর্তী দোয়ার পরিশিষ্ট।

কেননা, দোয়ার অন্যতম শিষ্টাচার হচ্ছে দোয়ার সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও গুণ বর্ণনা করা। ইবরাহীম (আ) এ স্থলে বিশেষভাবে আল্লাহ তা'আলার একটি নিয়ামতের শোকর আদায় করেছেন। নিয়ামতটি এই যে, ঘোর বার্ষিকোর বয়সে আল্লাহ তা'আলা তাঁর দোয়া কবুল করে তাঁকে সুসন্তান হযরত ইসমাইল ও ইসহাক (আ)-কে দান করেছেন।

এ প্রশংসা বর্ণনায় এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, নিঃসঙ্গ ও নিঃসহায় অবস্থায় জনশূন্য প্রান্তরে পরিত্যক্ত শিশুটি আপনারই দান। আপনিই তার হেফাজত করুন।

অবশেষে **إِن رَّبِّي لَسَمِيعُ الدَّعَاءِ** বলে প্রশংসা-বর্ণনা সমাপ্ত করা হয়েছে অর্থাৎ

নিশ্চয় আমার পালনকর্তা দোয়া শ্রবণকারী অর্থাৎ কবুলকারী।

প্রশংসা বর্ণনার পর আবার দোয়ার মশগুল হয়ে যান : **رَبِّ اجْعَلْنِي مَقِيمٌ**

—**الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبِلْ دَعَاءِ** এতে নিজের জন্য ও সন্তানদের

জন্য নামায কয়েম রাখার দোয়া করেন। অতঃপর কাকুতি-মিনতি সহকারে আবেদন করেন যে, হে আমার পালনকর্তা, আমার দোয়া কবুল করুন।

সবশেষে একটি ব্যাপক অর্থবোধক দোয়া করলেন : **رَبِّ اغْفِرْ لِي**

—**وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ** অর্থাৎ হে আমার পালনকর্তা!

আমাকে, আমার পিতামাতাকে এবং সব মু'মিনকে ক্ষমা করুন ঐদিন, যেদিন হাশরের ময়দানে সারা জীবনের কাজকর্মের হিসাব নেওয়া হবে।

এতে তিনি মাতাপিতার জন্যও মাগফিরাতের দোয়া করেছেন। অথচ পিতা অর্থাৎ আযর যে কাফির ছিল, তা কোরআন পাকেই উল্লিখিত আছে। সম্ভবত এ দোয়াটি তখন করেছেন, যখন ইবরাহীম (আ)-কে কাফিরদের জন্য দোয়া করতে নিষেধ করা হয়নি। অন্য এক আয়াতেও অনুরূপ উল্লেখ আছে :

وَاعْفِرْ لِي يَا اَبِي اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

বিধান ও নির্দেশ : আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে দোয়ার যথাবিহিত পদ্ধতি জানা গেল যে, ব্যস্তব্যস্ত কাকুতি-মিনতি ও ক্লন্দন সহকারে দোয়া করা চাই এবং সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও গুণ বর্ণনা করা চাই। এভাবে প্রবল আশা করা যায় যে, দোয়া কবুল হবে।

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخَّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ۝ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِينَ رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ۝ وَأَفْدَتْهُمْ لَهُمْ آفْوَةٌ ۝ وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَا تَبِيتُهُمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرِنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ يَنْجِبِ دَعْوَتَكَ وَتَتَّبِعِ الرَّسُولَ ۝ أَوْلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلِ مَا لَكُم مِّنْ زَوَالٍ ۝ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسْكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُم كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْآمَثَالَ ۝ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ ۝ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ۝ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِيفًا وَعْدًا ۝ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ۝ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ۝ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ۝ سَرَابِيلُهُمْ مِّنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ ۝ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ ۝ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝ هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذِرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ وَلِيَذْكَرَ

أُولُوا الْأَلْبَابِ ۝

(৪২) জালিমরা যা করে, সে সম্পর্কে আল্লাহকে কখনও বেখবর মনে করো না। তাদেরকে তো ৩ দিন পর্যন্ত অবকাশ দিয়ে রেখেছেন, যেদিন চক্ষুসমূহ বিক্ষারিত হবে।

(৪৩) তারা মস্তক উপরে তুলে ভীতি-বিহবল চিত্তে দৌড়াতে থাকবে। তাদের দিকে তাদের দৃষ্টি ফিরে আসবে না এবং তাদের অন্তর উড়ে যাবে। (৪৪) মানুষকে ঐ দিনের ভয় প্রদর্শন করুন, যেদিন তাদের কাছে আযাব আসবে। তখন জালিমরা বলবে : হে আমাদের পালন-কর্তা, আমাদেরকে সামান্য মেয়াদ পর্যন্ত সময় দিন, যাতে আমরা আপনার আহ্বানে সাড়া দিতে এবং পয়গম্বরগণের অনুসরণ করতে পারি। তোমরা কি ইতিপূর্বে কসম খেতে না যে, তোমাদেরকে দুনিয়া থেকে স্বেতে হবে না? (৪৫) তোমরা তাদের বাসভূমিতেই বসবাস করতে, যারা নিজেদের উপর জুলুম করেছে এবং তোমাদের জানা হয়ে গিয়েছিল যে, আমি তাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছি এবং আমি তোমাদেরকে ওদের সব কাহিনীই বর্ণনা করেছি। (৪৬) তারা নিজেদের মধ্যে ভীষণ চক্রান্ত করে নিচ্ছে এবং আল্লাহর সামনে রুকিত আছে তাদের কু-চক্রান্ত। তাদের কুটকৌশল পাহাড় উলিয়ে দেওয়ার মত হবে না। (৪৭) অতএব আল্লাহর প্রতি ধারণা করোনা যে, তিনি রসূলগণের সাথে রূত ওয়াদা ভঙ্গ করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী। (৪৮) যেদিন পরিবর্তিত করা হবে এ পৃথিবীকে অন্য পৃথিবীতে এবং পরিবর্তিত করা হবে আকাশসমূহকে এবং লোকেরা পরাক্রমশালী এক আল্লাহর সামনে পেশ হবে। (৪৯) তুমি ঐদিন পাপীদেরকে পরস্পরে শৃংখলাবদ্ধ দেখবে। (৫০) তাদের জায়া হবে দাহ্য আলকাতরার এবং তাদের মুখমণ্ডলকে অগ্নিতে ঢেকে নিবে। (৫১) যাতে আল্লাহ প্রত্যেককে তার রূতকর্মের প্রতিদান দেন। নিশ্চয় আল্লাহ নূতন হিসাব গ্রহণকারী। (৫২) এটা মানুষের একটি সংবাদনামা এবং যাতে এতদ্বারা ভীত হয় এবং যাতে জেনে নেয় যে, উপাস্য তিনিই---একক; এবং যাতে বুদ্ধিমানরা চিন্তা-ভাবনা করে।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং (হে সম্বোধিত ব্যক্তি) জালিমরা (অর্থাৎ কাফিররা) যা কিছু করছে, সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলাকে (দ্রুত আযাব না দেওয়ার কারণে) বেখবর মনে করো না। কেননা, তাদেরকে শুধু ঐদিন পর্যন্ত সময় দিয়ে রেখেছেন, যেদিন তাদের নেত্রসমূহ (বিস্ময় ও ভয়ের আতিশয্যে) বিস্ফারিত হয়ে যাবে (এবং তারা হিসাবের ময়দানের দিকে তুলব অনুযায়ী) উর্ধ্বস্থানে দৌড়াতে থাকবে (এবং) তাদের দৃষ্টি তাদের দিকে ফিরে আসবে না (অর্থাৎ অনিমেষ নেত্রে সামনে তাকিয়ে থাকবে) এবং তাদের অন্তরসমূহ (ভীষণ আতংকে) অত্যন্ত ব্যাকুল হবে এবং (সেদিন এসে গেলে কাউকে সময় দেওয়া হবে না। অতএব) আপনি তাদেরকে ঐদিনের (আগমনের) ভয় প্রদর্শন করুন, যেদিন তাদের উপর আযাব এসে যাবে। অতঃপর জালিমরা বলবে : হে আমাদের পালনকর্তা, সামান্য মেয়াদ পর্যন্ত আমাদেরকে (আরও) সময় দিন (এবং দুনিয়াতে পুনরায় প্রেরণ করুন) আমরা (এই সময়ের মধ্যে) আপনার সব কথা মেনে নেব এবং পয়গম্বরগণের অনুসরণ করব। (উত্তরে বলা হবে : আমি কি দুনিয়াতে তোমাদেরকে দীর্ঘমেয়াদী সময় দেইনি এবং) তোমরা কি (এ দীর্ঘ সময়ের কারণেই) ইতিপূর্বে (দুনিয়াতে) কসম খাওনি যে, তোমাদেরকে (দুনিয়া থেকে) কোথাও যেতে হবে না? (অর্থাৎ তোমরা কিয়ামতে অবিস্থাসী ছিলে এবং

এজন্য কসম খেতে; যেমন আল্লাহ্ বলেন : **وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ**

**لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مِنْ يَمِينٍ**

অর্থ ( অবিশ্বাস থেকে বিরত হওয়ার বাবতীয়

কারণ উপস্থিত ছিল। সেমতে তোমরা ঐ (পূর্ববর্তী) লোকদের বাসস্থানে বাস করতে, হারা ( কুফর ও কিয়ামত অস্বীকার করে ) নিজেদের ক্ষতি করেছিল এবং তোমরা ( সংবাদ পরস্পরের মাধ্যমে ) একথাও জানতে যে, আমি তাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছিলাম। ( অর্থাৎ কুফরী ও অস্বীকারের কারণে তাদেরকে শাস্তি দিয়েছিলাম। এ থেকে তোমরা জানতে পারতে যে, অস্বীকার করা গম্বের কারণ। সুতরাং স্বীকার করে নেওয়া অপরিহার্য। তাদের বাসস্থানে বাস করা সর্বদা তাদের এসব অবস্থা সম্বরণ করানোর কারণ হতে পারত। সুতরাং অস্বীকারের অবকাশ মোটেই ছিল না। ) এবং এসব ঘটনা শোনা ছাড়াও সেগুলো ( শিক্ষার জন্য যথেষ্ট ছিল ) আমি (ও) তোমাদের জন্য দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি। ( অর্থাৎ ঐশী গ্রন্থসমূহে আমিও এসব ঘটনাকে দৃষ্টান্তস্বরূপ বর্ণনা করেছি যে, যদি তোমরা এরূপ কর তবে তোমরাও গম্বের পতিত ও শাস্তির যোগ্য হয়ে যাবে। অতএব প্রথমে সংবাদ পরস্পরের মাধ্যমে ঘটনাবলী শোনা, অতঃপর আমার বর্ণনা, অতঃপর দৃষ্টান্ত, অতঃপর হুঁশিয়ার করা—এত সব কারণের উপস্থিতিতে তোমরা কিরূপে কিয়ামত অস্বীকার করলে? ) এবং ( আমি পূর্ববর্তী যেসব লোককে কুফরী ও অস্বীকারের কারণে শাস্তি দিয়েছি, ) তারা ( সত্যধর্ম বিলোপ করার কাজে ) নিজেদের সাধ্যানুযায়ী বড় বড় কূটকৌশল অবলম্বন করেছিল এবং তাদের ( এসব ) কূটকৌশল আল্লাহ্র সম্মুখে ছিল। ( তাঁর জানের পরিধির বাইরে ছিল না—থাকতে পারত না। ) এবং বাস্তবিকই তাদের কূটকৌশল এমন ছিল যে, তুম্বারা পাহাড়ও ( স্বস্থান থেকে ) হটে যায়। ( কিন্তু এতদসত্ত্বেও সত্যের জয় হয়েছে এবং তাদের সব কূটকৌশল ব্যর্থ হয়েছে। তারা নিপাত হয়েছে। এ থেকেও জানা গেল যে, পয়গম্বর যা বলেন তাই সত্য এবং তা অস্বীকার করা আযাব ও গম্বের কারণ। যখন কিয়ামতে তাদের পর্হুঁদস্ত হওয়া জানা গেল, ) অতএব ( হে সম্বোধিত ব্যক্তি ) আল্লাহ্ তা'আলাকে পয়গম্বরগণের সাথে ওয়াদা ভঙ্গকারী মনে করো না। ( সেমতে কিয়ামতের দিন অবিশ্বাসীদেরকে শাস্তি দেওয়ার যে ওয়াদা ছিল তা পূর্ণ হবে; যেমন উপরে বলা হয়েছে ) নিশ্চয় আল্লাহ্ অত্যন্ত পরাক্রমশালী, ( এবং ) প্রতিশোধ গ্রহণকারী। ( প্রতিশোধ গ্রহণে তাঁকে কেউ বিরত করতে পারে না। সুতরাং শক্তিও অপার, এরপর ইচ্ছার সম্পর্ক উপরে জানা গেল। এমতাবস্থায় ওয়াদা ভঙ্গ করার আশংকা কোথায়? এ প্রতিশোধ ঐ দিন নেবেন, ) যেদিন পৃথিবী পরিবর্তিত হবে এই পৃথিবী ছাড়া এবং আকাশও ( পরিবর্তিত হয়ে অন্য আকাশ হবে এসব আকাশ ছাড়া। কেননা, প্রথমবার শিঙ্গা ফুঁকার কারণে সব ডুমুণ্ড ও নভোমণ্ডল ভেঙ্গেচুরে খান খান হয়ে যাবে। এরপর পুনর্বার নতুনভাবে ডুমুণ্ড ও নভোমণ্ডল সৃজিত হবে ) এবং সবাই এক ( ও ) পরাক্রমশীল আল্লাহ্র সামনে পেশ হবে। ( অর্থাৎ কিয়ামতের দিন। এই দিন প্রতিশোধ নেওয়া হবে। ) এবং ( ঐদিন হে সম্বোধিত ব্যক্তি, ) তুমি অপরাধীদেরকে

(অর্থাৎ কাফিরদেরকে) শৃঙ্খলাবদ্ধ দেখবে (এবং) তাদের জানা কাতেরানের হবে। (অর্থাৎ সারা দেহ কাতেরান জড়ানো থাকবে, যাতে পুত্ৰ আণ্ডন লাগে। 'কাতেরান' এক প্রকার বৃক্ষ নিসৃত তৈল; মতান্তরে আলকাতরা বা গন্ধক।) এবং আণ্ডন তাদের মুখমণ্ডলকে (ও) আবৃত করবে; (এসব এজন্য হবে) যাতে আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক (অপরাধী) ব্যক্তিকে তার কৃতকর্মের শাস্তি দেন। (এরূপ অপরাধী অগণিত হবে, কিন্তু) নিশ্চয় আল্লাহ (-র জন্য তাদের হিসাব-কিতাব নেওয়া মোটেই কঠিন নয়; কেননা তিনি) পুত্ৰ হিসাব গ্রহণকারী। (সবার বিচার আরম্ভ করে তৎক্ষণাৎ শেষ করে দেবেন।) এটা (কোরআন) মানুষের জন্য বিধি-বিধানের সংবাদনামা (যাতে প্রচারক অর্থাৎ রসূলকে স্বীকার করে) এবং যাতে এর সাহায্যে (শাস্তির) ভয় প্রদর্শন করা হয় এবং যাতে বিশ্বাস করে যে, তিনিই এক উপাস্য এবং যাতে বুদ্ধিমানরা উপদেশ গ্রহণ করে।

### আনুমানিক তাত্বে বিষয়

সূরা ইবরাহীমে পয়গম্বর ও তাঁদের সম্প্রদায়ের কিছু কিছু অবস্থার বিবরণ, আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধাচরণকারীদের অশুভ পরিণাম এবং সবশেষে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর আলোচনা ছিল। তিনি বায়তুল্লাহ পুনর্নির্মাণ করেন, তাঁর সন্তানদের জন্য আল্লাহ তা'আলা মক্কা মুকাররমায় জনবসতি স্থাপন করেন এবং এর অধিবাসীদের সর্বপ্রকার সুখ, শান্তি ও অসাধারণ অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা দান করেন। তাঁরই সন্তান-সন্ততি বনী-ইসরাইল পবিত্র কোরআন ও রসূলুল্লাহ (সা)-র সর্ব প্রথম সম্বোধিত সম্প্রদায়।

সূরা ইবরাহীমের আলোচ্য এ সর্বশেষ রুকুতে সার-সংক্ষেপ হিসেবে মক্কাবাসীদেরকেই পূর্ববর্তী সম্প্রদায়সমূহের ইতিবৃত্ত থেকে শিক্ষা গ্রহণের আদেশ দেওয়া হয়েছে এবং এখনও চৈতন্যোদয় না হওয়ার অবস্থায় কিয়ামতের ড়য়াবহ শাস্তির ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে।

প্রথম আয়াতে রসূলুল্লাহ (সা) ও প্রত্যেক উৎপীড়িত ব্যক্তিকে সাহায্য দেওয়া হয়েছে এবং জালিমকে কঠোর আহাবের সতর্কবাণী শোনানো হয়েছে। বলা হয়েছে : আল্লাহ তা'আলা অবকাশ দিয়েছেন দেখে জালিম ও অপরাধীদের নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত নয় এবং এরূপ মনে করা উচিত নয় যে, তাদের অপরাধ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা জাহত নয়; বরং তারা যা কিছু করছে, সব আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে আছে। কিন্তু তিনি দয়া ও রহস্যের তাগিদে অবকাশ দিচ্ছেন।

لَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا — অর্থাৎ কোন অবস্থাতেই তোমরা আল্লাহকে গাফিল

মনে করো না। এখানে বাহ্যত প্রত্যেক ঐ ব্যক্তিকে সম্বোধন করা হয়েছে, যাকে তার গাফলতি এবং শয়তান এ ধোঁকায় ফেলে রেখেছে। পক্ষান্তরে যদি রসূলুল্লাহ (সা)-কে সম্বোধন করা হয়, তবে এর উদ্দেশ্য উম্মতের গাফিলদেরকে শোনানো এবং হুঁশিয়ার করা। কারণ রসূলুল্লাহ (সা)-র পক্ষ থেকে এরূপ সন্তাবনাই নেই যে, তিনি আল্লাহ তা'আলাকে পরিস্থিতি সম্পর্কে বেখবর অথবা গাফিল মনে করতে পারেন।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, জালিমদের উপর তাৎক্ষণিক আযাব না আসা তাদের জন্য তেমন শুভ নয়। কারণ, এর পরিণতি এই যে, তারা হঠাৎ কিয়ামত ও পরকালের আযাবে ধৃত হয়ে যাবে। অতঃপর সূরায় শেষ পর্যন্ত পরকালের আযাবের বিবরণ এবং ভয়াবহ দৃশ্যাবলী উল্লেখ করা হয়েছে।

لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ --- অর্থাৎ সেদিন চক্ষুসমূহ বিস্ফারিত হয়ে

থাকবে। مَهْطَعِينَ مَقْنَعِي رُؤُوسِهِمْ --- অর্থাৎ ভয় ও বিস্ময়ের কারণে মস্তক

উপরে তুলে প্রাণপণ দৌড়াতে থাকবে। لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ --- অর্থাৎ অপলক

নেত্র চোখে থাকবে وَأَنْفُتَهُمْ هَوَاءٌ --- তাদের অন্তর শূন্য ও ব্যাকুল হবে।

এসব অবস্থা বর্ণনা করার পর রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলা হয়েছে যে, আপনি আপনার জাতিকে ঐ দিনের শাস্তির ভয় প্রদর্শন করুন, যেদিন জালিম ও অপরাধীরা অপারক হয়ে বলবে : হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে আরও কিছু সময় দিন। অর্থাৎ দুনিয়াতে কয়েক দিনের জন্য পার্টিয়ে দিন, যাতে আমরা আপনার দাওয়াত কবুল করতে পারি এবং আপনার প্রেরিত পয়গম্বরগণের অনুসরণ করে এ আযাব থেকে মুক্তি পেতে পারি। আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তাদের আবেদনের জওয়াবে বলা হবে : এখন তোমরা একথা বলছ কেন? তোমরা কি ইতিপূর্বে কসম খেয়ে বলনি যে, তোমাদের ধন-সম্পদ ও শান-শওকতের পতন হবে না এবং তোমরা সর্বদাই দুনিয়াতে এমনিভাবে বিলাস-ব্যসনে মত্ত থাকবে? তোমরা পুনর্জীবন ও পরজগত অস্বীকার করেছিলে।

وَسَكُنْتُمْ فِي سَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ  
كَيْفَ نَعَلْنَا بِهِمْ وَصَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ ۝

এতে বাহাত আরবের মুশরিকদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, যাদেরকে ভয় প্রদর্শন করার জন্য রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে وَأَنْذِرِ النَّاسَ বলে আদেশ দেওয়া হয়। এতে

তাদেরকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, অতীত জাতিসমূহের অবস্থা ও উত্থান-পতন তোমাদের জন্য সর্বোত্তম উপদেশদাতা। আশ্চর্যের বিষয়, তোমরা এগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর না। অথচ তোমরা এসব ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতির আবাসস্থলেই বসবাস ও চলাফেরা কর। কিছু





অতঃপর আবার কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থা ও ঘটনাবলী বর্ণনা করা হয়েছে ।  
বলা হয়েছে :

يَوْمَ تَهْتَدُ الْأَرْضُ لَهَا الْأَرْضُ وَالسَّمَاوَاتُ وَبُزْزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ

—অর্থাৎ কিয়ামতের দিনে বর্তমান পৃথিবী পাল্টে দেওয়া হবে এবং আকাশও ।

সবাই এক ও পরাক্রমশালী আল্লাহর সামনে হাজির হবে।

পৃথিবী ও আকাশ পাল্টে দেওয়ার এরূপ অর্থও হতে পারে যে, তাদের আকার ও আকৃতি পাল্টে দেওয়া হবে; যেমন কোরআন পাকের অন্যান্য আয়াত ও হাদীসে আছে যে, সমগ্র ভূপৃষ্ঠকে একটি সমতল ভূমিতে পরিণত করে দেওয়া হবে। এতে কোন গৃহের ও রুকের আড়াল থাকবে না এবং পাহাড়, টিলা, গর্ত গভীরতা কিছুই থাকবে না। এ অবস্থার বর্ণনা প্রসঙ্গে কোরআনে বলা হয়েছে :

—اَلَّتْرَىٰ فِيهَا سِوَا وَلَا اَمْتًا

গৃহ ও পাহাড়ের কারণে বর্তমানে রাস্তা ও সড়ক বাঁক ঘুরে ঘুরে চলেছে। কোথাও উচ্চতা এবং কোথাও গভীরতা দেখা যায়। কিয়ামতের দিন এগুলো থাকবে না; বরং সব পরিষ্কার ময়দান হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় অর্থ এরূপও হতে পারে যে, সম্পূর্ণত এই পৃথিবীর পরিবর্তে অন্য পৃথিবী এবং এই আকাশের পরিবর্তে অন্য আকাশ সৃষ্টি করা হবে। এ সম্পর্কে বর্ণিত কিছুসংখ্যক হাদীস দ্বারা গুণগত পরিবর্তনের কথা এবং কিছুসংখ্যক হাদীস দ্বারা সত্তাগত পরিবর্তনের কথা জানা যায়।

আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে ইমাম বায়হাকী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা)-এর রেওয়াজেতে রসূলুল্লাহ (সা)-র উক্তি বর্ণনা করেন যে, হাশরের পৃথিবী হবে সম্পূর্ণ এক নতুন পৃথিবী। তার রং হবে রৌপ্যের মত সাদা। এর উপর কোন গোনাহ বা অন্যায শূনের দাগ থাকবে না। মসনদে-আহমদে ও তফসীরে ইবনে জরীরে উল্লিখিত হাদীসে এই বিষয়বস্তুটিই হযরত আনাসের রেওয়াজেতে বর্ণিত আছে। --- (মাহহারী)

বুখারী ও মুসলিমের হাদীসে হযরত সহল ইবনে সা'দের রেওয়াজেতে রসূলুল্লাহ (সা)-বলেন : কিয়ামতের দিন ময়দার রুটির মত পরিষ্কার ও সাদা পৃথিবীর বৃকে মানব-জাতিকে পুনরুদ্ধিত করা হবে। এতে কোন বস্তুর চিহ্ন (গৃহ, উদ্যান, রুক্ষ, পাহাড়, টিলা ইত্যাদি) থাকবে না। বায়হাকী এই আয়াতের তফসীরে এ তথ্যটি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন।

হাকেম নির্ভরযোগ্য সনদসহ হযরত জাবেরের রেওয়াজেতে রসূলুল্লাহ (সা)-র উক্তি বর্ণনা করেন যে, চামড়ার কুঞ্জন দূর করার জন্য চামড়াকে যেভাবে টান দেওয়া হয়, কিয়ামতের দিন পৃথিবীকে সেইভাবে টান দেওয়া হবে। ফলে পৃথিবীর গর্ত, পাহাড় সব সমান হয়ে একটি সটান সমতল ভূমি হয়ে যাবে। তখন সব আদম সন্তান এই পৃথিবীতে জমায়েত

হবে। ভীড় এত হবে যে, একজনের অংশে তাঁর দাঁড়ানোর জায়গাটুকুই পড়বে। এরপর সর্বপ্রথম আমাকে ডাকা হবে। আমি পালনকর্তার সামনে সিজদায় নত হব। অতঃপর আমাকে সুপারিশের অনুমতি প্রদান করা হবে। আমি সবার জন্য সুপারিশ করব যেন তাদের হিসাব-কিতাব শ্রুত নিষ্পন্ন হয়।

শেষোক্ত রেওয়াজেত থেকে বাহ্যত জানা যায় যে, পৃথিবীর শুধু গুণগত পরিবর্তন হবে এবং গর্ত, পাহাড়, দালাল-কোঠা, রক্ষ ইত্যাদি থাকবে না, কিন্তু সত্তা অবশিষ্ট থাকবে। পক্ষান্তরে প্রথমোক্ত রেওয়াজেতসমূহ থেকে জানা গিয়েছিল যে, হাশরের পৃথিবী বর্তমান স্থলে অন্য কোন পৃথিবী হবে। আয়াতে এই সত্তার পরিবর্তনই বোঝানো হয়েছে।

বল্মানুল-কোরআন গ্রন্থে মাওলানা আশরাফ আলী খানভী (রহ) বলেন : এতদুভয়ের মধ্যে কোনরূপ পরস্পরবিরোধিতা নাই। এটা সম্ভব যে, প্রথমে শিঙ্গা ফুঁকার পর পৃথিবীর শুধু গুণগত পরিবর্তন হবে এবং হিসাব-কিতাবের জন্য মানুষকে অন্য পৃথিবীতে স্থানান্তরিত করা হবে।

তফসীর মাহহারীতে মসনদ আবদ ইবনে হমায়দ থেকে হযরত ইকরামার উক্তি বর্ণিত আছে, যশদ্বারা উপরোক্ত বক্তব্য সমাধিত হয়। উক্তিটি এই : এ পৃথিবী কুঁচকে যাবে এবং এর পাশ্বে অন্য একটি পৃথিবীতে মানবমণ্ডলীকে হিসাব-কিতাবের জন্য দাঁড় করানো হবে।

মুসলিম শরীফে হযরত সওবানের রেওয়াজেতে বর্ণিত আছে যে, রসুলুল্লাহ (সা)-র নিকট এক ইহুদী এসে প্রশ্ন করল : যেদিন পৃথিবী পরিবর্তন করা হবে, সেদিন মানুষ কোথায় থাকবে? তিনি বললেন : পুলাসিরাতের নিকটে একটি অন্ধকারে থাকবে।

এ থেকেও জানা যায় যে, বর্তমান পৃথিবী থেকে পুলাসিরাতের মাধ্যমে মানুষকে অন্যদিকে স্থানান্তর করা হবে। ইবনে জারীর স্বীয় তফসীর গ্রন্থে এমর্মে একাধিক সাহাবীও তাবয়ীরা উক্তি বর্ণনা করেছেন যে, তখন বর্তমান পৃথিবী ও তার নদ-নদী অগ্নিতে পরিণত হবে। বিশ্বের বর্তমান এলাকাটি যেন তখন জাহান্নামের এলাকা হয়ে যাবে। বাস্তব অবস্থা আল্লাহ তা'আলাই জানেন। এ ছাড়া বান্দার উপায় নাই যে,

زبان تازه کردن باقرارتو  
نیکنیختن علت ازقارتو

শেষ আয়াতে বলা হয়েছে যে, অপরাধীদেরকে একটি শিকলে বেঁধে দেওয়া হবে। অর্থাৎ প্রত্যেক অপরাধের অপরাধীদেরকে পৃথক পৃথকভাবে একত্র করে এক সাথে বেঁধে দেওয়া হবে এবং তাদের পরিধেয় পোশাক হবে আলকাতুরার। এটি একটি শ্রুত অগ্নিগ্রাহী পদার্থ।

সর্বশেষ আয়াতে বলা হয়েছে : কিয়ামতের এসব অবস্থা বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে হুঁশিয়ার করা, যাতে তারা এখনও বুঝে নেয় যে, উপাসনার যোগ্য সত্তা হচ্ছে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সত্তা এবং যাতে সামান্য বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিও শিরক থেকে বিরত হয়।

# سورة حجر

## সূরা হিজর

মকায় অবতীর্ণ ॥ আয়াত : ১৯ ॥ রুকু : ৬

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرُّسُلَ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرَّانٍ مُّبِينٍ ۝ رَبِّمَا يُوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا

لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ۝ ذَرَهُمْ يَا كُفُّوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِمُ الْأَمَلُ

فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۝ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قُرْيَةٍ إِلَّا وَ لَهَا كِتَابٌ

مَعْلُومٌ ۝ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَالَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ۝

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

- (১) আলিফ-লাম-রা ; এগুলো কিতাব ও সুস্পষ্ট কোরআনের আয়াত । (২) কোন সময় কাফিররা আকাঙ্ক্ষা করবে যে, কি চমৎকার হত, যদি তারা মুসলমান হত । (৩) আপনি ছেড়ে দিন তাদেরকে, খেয়ে নিক এবং ভোগ করে নিক এবং আশায় ব্যাপ্ত থাকুক । অতি স্বল্প তারা জেনে নেবে । (৪) আমি কোন জনপদ ধ্বংস করিনি ; কিন্তু তার নির্দিষ্ট সময় লিখিত ছিল । (৫) কোন সম্প্রদায় তার নির্দিষ্ট সময়ের অগ্রে যায় না এবং পশ্চাতে থাকে না ।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আলিফ-লাম-রা (-এর অর্থ আল্লাহ তা'আলাই জানেন ।) এগুলো পরিপূর্ণ গ্রন্থ ও সুস্পষ্ট কোরআনের আয়াত ( অর্থাৎ এর দুই-ই গুণ রয়েছে---পরিপূর্ণ গ্রন্থ হওয়াও এবং সুস্পষ্ট কোরআন হওয়াও । এ বাক্য দ্বারা কোরআন যে সত্য কলাম, তা প্রকাশ করার পর তাদের আক্ষেপ ও আশাব বণিত হয়েছে, যারা কোরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না অথবা এর নির্দেশাবলী পালন করে না । বলা হয়েছে رَبِّمَا يُوَدُّ ۝ অর্থাৎ কিয়ামতের ময়দানে যখন নানা রকম আশাবে পতিত হবে, তখন ) কাফিররা বারবার

আকাঙ্ক্ষা করবে যে, কি চমৎকার হত, যদি তারা ( দুনিয়াতে ) মুসলমান হত ! ( বারবার এজন্য যে, যখনই কোন মতুন বিপদ দেখবে, তখনই মুসলমান না হওয়ার আক্ষেপ মতুন হতে থাকবে। ) আপনি ( দুনিয়াতে তাদের কুফরীর কারণে দুঃখ করবেন না এবং ) তাদেরকে তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দিন—তারা খুব শ্বেয়ে নিক, ভোগ করে নিক এবং কল্পিত আশা তাদেরকে গাফিল করে রাখুক। তারা অতি সত্বর ( মৃত্যুর সাথে সাথেই ) প্রকৃত সত্য জেনে নিবে। ( দুনিয়াতে তারা যে কুফর ও কুকর্মের তাৎক্ষণিক শাস্তি পায় না, এর কারণ এই যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের শাস্তির সময় নির্ধারিত করে রেখেছেন। সে সময় এখনও আসেনি। ) এবং আমি যতগুলো জনপদ ( কুফরীর কারণে ) ধ্বংস করেছি, তাদের সবার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় লিখিত থাকত এবং ( আমার নীতি এই যে, ) কোন উম্মত তার নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে ধ্বংস হয়নি এবং পেছনে থাকেনি। ( বরং নির্দিষ্ট সময় ধ্বংস হয়েছে। এমনভাবে তাদের সময় যখন এসে যাবে, তাদেরকেও শাস্তি দেওয়া হবে। )

### আনুযায়িক জাতব্য বিষয়

ذَرَّهُمْ يَا كَلْبُا — থেকে জানা গেছে যে, পানাহারকে লক্ষ্য ও আসল বৃত্তি সাব্যস্ত করে

নেওয়া এবং সাংসারিক বিলাস-বাসনের উপকরণ সংগ্রহে মৃত্যুকে ভুলে গিয়ে দীর্ঘ পরিকল্পনা প্রণয়নে মেতে থাকা কাফিরদের দ্বারাই হতে পারে, যারা পরকাল ও তার হিসাব-কিতাবে এবং পুরস্কার ও শাস্তিতে বিশ্বাস করে না। মু'মিনও পানাহার করে, জীবন-চার প্রয়োজনা-নুমায়ী ব্যবস্থা করে এবং ভবিষ্যৎ কাজ-কারবারের পরিকল্পনাও তৈরী করে; কিন্তু মৃত্যু ও পরকালকে ভুলে এ কাজ করে না। তাই প্রত্যেক কাজে হালাল ও হারামের চিন্তা করে এবং অনর্থক পরিকল্পনা প্রণয়নকে বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করে না। রসূলুল্লাহ (স) বলেন : চারটি বস্তু দুর্ভাগ্যের লক্ষণ : চক্ষু থেকে অশ্রু প্রবাহিত না হওয়া ( অর্থাৎ গোনাহর কারণে অন্তঃকৃত হয়ে ক্রন্দন না করা ), কঠোর প্রাণ হওয়া, দীর্ঘ আশা পোষণ করা এবং সংসারের প্রতি আসক্ত হওয়া।—( কুরতুবী )

দীর্ঘ আশা পোষণ করার অর্থ হচ্ছে দুনিয়ার মহকরত ও লোভে মগ্ন এবং মৃত্যু ও পরকাল থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে দীর্ঘ পরিকল্পনায় মত্ত হওয়া। --(কুরতুবী) ধর্মীয় উদ্দেশ্যের জন্য অথবা দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ স্বার্থের জন্য যেসব পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়, সেগুলো এর অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা, এগুলোও পরকাল চিন্তারই একটি অংশ।

রসূলুল্লাহ (স) বলেন : এ উম্মতের প্রথম স্তম্ভের মুক্তি পূর্ণ ঈমান ও সংসার নিলিপ্ততার কারণে হবে এবং সর্বশেষ স্তরের লোক কর্পণ্য ও দীর্ঘ আকাঙ্ক্ষা পোষণের কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

হযরত আব্দুল্লাহদা থেকে বর্ণিত আছে, তিনি একবার দামেশকের জামে মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে বললেন : দামেশকবাসীগণ ! তোমরা কি একজন সহানুভূতিশীল হিতা-কাঙ্ক্ষী ভাইয়ের কথা শুনেবে ? শুনে নাও, তোমাদের পূর্বে অনেক বিশিষ্ট লোক অতিক্রান্ত হয়েছে। তারা প্রচুর ধন-সম্পদ একত্র করেছিল। সুউচ্চ দালান-কোঠা নির্মাণ করেছিল

এবং সুদূরপ্রসারী পল্লিকল্পনা তৈরী করেছিল। আজ তারা সবাই নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে। তাদের গৃহগুলোই তাদের কবর হয়েছে এবং তাদের দীর্ঘ আশা ধোঁকা ও প্রতারণায় পর্যবসিত হয়েছে। আদি জাতি তোমাদের নিকটেই ছিল। তারা ধন, জ্ঞান, অস্ত্রশস্ত্র ও অস্বাদি দ্বারা দেশকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছিল। আজ এমন কেউ আছে কি, যে তাদের উত্তরাধিকার আমার কাছে থেকে দু'দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করতে সম্মত হয় ?

হযরত হাসান বসরী (র) বলেন : যে ব্যক্তি জীবদ্দশায় দীর্ঘ আকাঙ্ক্ষার জাল তৈরী করে, তার আমল অবশ্যই খারাপ হয়ে যায়।---( কুরতুবী )

وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ۝ لَوْ مَا  
تَأْتِينَا بِالْمَلَكَةِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝ مَا نُنزِلُ الْمَلَكَةَ  
إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنظَرِينَ ۝

(৬) তারা বলল : হে ঐ ব্যক্তি, যার প্রতি কোরআন নাখিল হয়েছে, আপনি তো একজন উন্মাদ। (৭) যদি আপনি সত্যবাদী হন, তবে আমাদের কাছে ফেরেশতাদেরকে আনেন না কেন ? (৮) আমি ফেরেশতাদেরকে একমাত্র ফয়সালার জন্যই নাখিল করি। তখন তাদেরকে অবকাশ দেওয়া হবে না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

حَقٌّ هـ — إِلَّا بِالْحَقِّ ( ) বলে আযাবের ফয়সালার বুঝানো হয়েছে। কোন কোন

তফসীরবিদের মতে কোরআন অথবা রিসালাত বুঝানো হয়েছে। বয়ানুল কোরআনে প্রথম অর্থাৎ অপ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। এ অর্থটি হযরত হাসান বসরী থেকে বর্ণিত আছে। আযাতের তফসীর এই :

এবং (মস্কার) কাফিররা (রসুলুল্লাহ্ [সা]-কে) বলল : হে ঐ ব্যক্তি, যার উপর (তার দাবী অনুযায়ী) কোরআন নাখিল করা হয়েছে, আপনি (নাউযুবিল্লাহ) একজন উন্মাদ (এবং নবুয়তের মিথ্যা দাবী করেন। নতুবা) যদি আপনি (এ দাবীতে) সত্যবাদী হন, তবে আমাদের কাছে ফেরেশতাদেরকে আনেন না কেন ? (যারা আমাদের সামনে আপনার সত্যতার সাক্ষ্য দেবে। যেমন আল্লাহ্ বলেন,

لَوْ لَا أَنزَلْنَا إِلَيْهِ مَلَكًا

فَيُكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا — আল্লাহ্ তা'আলা উত্তর দেন : ) আমি ফেরেশতাদেরকে

(যেভাবে তারা চায়,) একমাত্র ফয়সালার জন্যই নামিল করি এবং (যদি এমন হত) তখন তাদেরকে সম্মত দেওয়া হত না। বরং যখন তাদের আগমনের পরও বিশ্বাস স্থাপন করত না, যেমন তাদের অবস্থাদৃষ্টে এটা নিশ্চিত, তখন তাৎক্ষণিকভাবে তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া হত; যেমন সূরা আন'আমের প্রথম রুক্কুর শেষ আয়াতগুলোতে এর কারণ বর্ণিত হয়েছে।

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۝

(৯) আমি স্বয়ং এ উপদেশ গ্রন্থ অবতারণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি কোরআন অবতারণ করেছি এবং (এটা প্রমাণহীন দাবী নয়; বরং এর অলৌকিকত্ব এর প্রমাণ। কোরআনের একটি অলৌকিকত্বের বর্ণনা অন্যান্য সূরায় দেওয়া হয়েছে যে, কোন মানুষ এর একটি সূরার অনুরূপ রচনা করতে পারে না। দ্বিতীয় অলৌকিকত্ব এই যে, (আমি এর (কোরআনের) সংরক্ষক (ও পরিদর্শক। এতে কেউ বেশ-কম করতে পারে না, যেমন অন্যান্য গ্রন্থে করা হয়েছে। এটা এমন একটি সুস্পষ্ট মু'জিযা যা সাধারণ ও বিশেষ নিবিশেষে সবাই বুঝতে পারে। মু'জিযা এই যে, কোরআনের বিস্তৃতা, ভাষাভঙ্গার ও সর্বব্যাপকতার মুকাবিলা কেউ করতে পারে না। এ মু'জিযাটি একমাত্র জানী ও বিদ্বানরাই বুঝতে পারে। কিন্তু কমবেশী না হওয়ার ব্যাপারটিকে তো একজন অশিক্ষিত মুর্খও দেখতে পারে।)

### আনুশঙ্গিক ভাণ্ডব্য বিষয়

মামুনের দরবারের একটি ঘটনা : ইমাম কুরতুবী এ স্থলে মুত্তাসিল সনদ দ্বারা খলীফা মামুনের রশীদের দরবারের একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। মামুনের দরবারে মাঝে মাঝে শিক্ষা সম্প্রদায় নিয়ে তর্ক-বিতর্ক ও আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হত! এতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার পণ্ডিত ব্যক্তিগণের জন্য অংশগ্রহণের অনুমতি ছিল। এমনি এক আলোচনা সভায় জনৈক ইহুদী পণ্ডিত আগমন করল। সে আকার-আকৃতি, পোশাক ইত্যাদির দিক দিয়েও একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি মনে হচ্ছিল। তদুপরি তার আলোচনাও ছিল অত্যন্ত প্রাজ্ঞ, অলংকারপূর্ণ এবং বিজ্ঞসুলভ। সভাশেষে মামুন তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন : আপনি কি ইহুদী? সে স্বীকার করল। মামুন পরীক্ষার্থে তাকে বললেন : আপনি যদি মুসলমান হয়ে যান, তবে আপনার সাথে চমৎকার ব্যবহার করব।

সে উত্তরে বলল : আমি গৈতুক ধর্ম বিসর্জন দিতে পারি না। কথাবার্তা এখানেই শেষ হয়ে গেল। লোকটি চলে গেল। কিন্তু এক বছর পর সে মুসলমান হয়ে আবার দরবারে আগমন করল এবং আলোচনা সভায় ইসলামী ফেঁকা সম্পর্কে সারগর্ভ বক্তৃতা ও যুক্তিপূর্ণ তথ্যাদি উপস্থাপন করল। সভাশেষে মামুন তাকে ডেকে বললেন : আপনি

কি ঐ ব্যক্তিই, যে বিগত বছর এসেছিল? সে বলল : হ্যাঁ, আমি ঐ ব্যক্তিই। মামুন জিজ্ঞেস করলেন : তখন তো আপনি ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকৃত ছিলেন। এরপর এখন মুসলমান হওয়ার কি কারণ ঘটল?

সে বলল : এখান থেকে ফিরে যাওয়ার পর আমি বর্তমান কালের বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে গবেষণা করার ইচ্ছা করি। আমি একজন হস্তলেখাবিশারদ। স্বহস্তে প্রহ্লাদি লিখে উঁচু দামে বিক্রয় করি। আমি পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তওরাতের তিনটি কপি লিপিবদ্ধ করলাম। এগুলোতে অনেক জায়গায় নিজের পক্ষ থেকে বেশকম করে লিখলাম। কপিগুলো নিয়ে আমি ইহুদীদের উপাসনালয়ে উপস্থিত হলাম। ইহুদীরা অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে কপিগুলো কিনে নিল। অতঃপর এমনিভাবে ইজিলের তিন কপি কম-বেশ করে লিখে খৃস্টানদের উপাসনালয়ে নিয়ে গেলাম। সেখানেও খৃস্টানরা খুব খাতির-স্বচ্ছ করে কপিগুলো আমার কাছ থেকে কিনে নিল। এরপর কোরআনের বেলায় আমি তাই করলাম। এরও তিনটি কপি সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করলাম। এবং নিজের পক্ষ থেকে কম-বেশ করে দিলাম। এগুলো নিয়ে যখন বিক্রয়ার্থে বের হলাম, তখন যেই দেখল, সেই প্রথমে আমার লেখা কপিটি নিভুল কিনা, যাচাই করে দেখল। অতঃপর বেশকম দেখে কপিগুলো ফেরত দিয়ে দিল।

এ ঘটনা দেখে আমি এ শিক্ষাই গ্রহণ করলাম যে, গ্রন্থটি হবহ সংরক্ষিত আছে এবং আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই এর সংরক্ষণ করছেন। এরপর আমি মুসলমান হয়ে গেলাম। এ ঘটনার বর্ণনাকারী কাযী ইয়াহ'ইয়া ইবনে আকতাম বলেন : ঘটনাক্রমে সে বছরই আমার হৃৎকৃত্ত পালন করার সৌভাগ্য হয়। সেখানে প্রখ্যাত আলিম সুফিয়ান ইবনে ওয়ায়নার সাথে সাক্ষাৎ হলে ঘটনাটি তাঁর কাছে ব্যক্ত করলাম। তিনি বললেন : নিঃসন্দেহে এরূপ হওয়াই বিধেয়। কারণ, কোরআন পাকে এ সত্যের সমর্থন বিদ্যমান রয়েছে। ইয়াহ'ইয়া ইবনে আকতাম জিজ্ঞেস করলেন : কোরআনের কোন আয়াতে আছে : সুফিয়ান বললেন : কোরআনে পাক যেখানে তওরাত ও ইজিলের আলোচনা করেছে, সেখানে বলেছে :

بِمَا اسْتَحْفَظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ

গ্রন্থ তওরাত ও ইজিলের হিফাযতের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এ কারণেই যখন ইহুদী ও খৃস্টানরা হিফাযতের কর্তব্য পালন করেননি, তখন এ গ্রন্থদ্বয় বিকৃত ও পরিবর্তিত হয়ে বিনষ্ট হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে কোরআন পাক সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

لَا يَأْتِيهِمْ لُغْوٌ وَلَا حَسْرَةٌ لَكَا فَظُونَ

করার কারণে শত্রুরা হাজারো চেষ্টা সত্ত্বেও এর একটি নুজা এবং ঘের ও জবরে পার্থক্য আনতে পারেনি। রিসালতের আমলের পর আজ চৌদ্দ'শ বছর অতীত হয়ে গেছে। ধর্মীয় ও ইসলামী ব্যাপারাদিতে মুসলমানদের ভুলটি ও অমনোযোগিতা সত্ত্বেও কোরআন পাক





যে ব্যক্তি রসুলের হাদীসকে ঢালাওভাবে অরক্ষিত বলে, প্রকৃতপক্ষে সে কোরআনকেই অরক্ষিত বলে : আজকাল কিছুসংখ্যক লোক সাধারণ মানুষের মধ্যে এধরনের একটা বিদ্রাঙ্গি সৃষ্টি করতে সচেষ্ট যে, নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাদিতে বিদ্যমান হাদীসের বিরূত ভাণ্ডার গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা এগুলো রসুলুল্লাহ (সা)-র সময়কালের অনেক পরে সংগৃহীত ও সংকলিত হয়েছে।

প্রথমত তাদের এরূপ বলাও শুদ্ধ নয়। কেননা হাদীসের সংরক্ষণ ও সংকলন রসুলুল্লাহ (সা)-র আমলদারীতেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীকালে তা পূর্ণতা লাভ করেছে মাত্র। এছাড়া হাদীস প্রকৃতপক্ষে কোরআনের তফসীর ও স্বার্থ মর্ম। এর সংরক্ষণ আল্লাহ তা'আলা নিজ দায়িত্বে গ্রহণ করেছেন। এমতাবস্থায় এটা কেমন করে সম্ভব যে, কোরআনের শুধু শব্দাবলী সংরক্ষিত থাকবে আর অর্থসম্ভার ( অর্থাৎ হাদীস ) বিনষ্ট হয়ে যাবে ?

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شَيْعِ الْأَوَّلِينَ ۝ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ  
رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يُسْتَهْزِءُونَ ۝ كَذَلِكَ نَسُكُفِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ۝  
لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ ۝ وَلَوْ قَتَلْنَا عَلَيْهِمْ أَبَاءَ  
مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ۝ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكَّرَتْ  
أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ ۝

(১০) আমি আপনার পূর্বে পূর্ববর্তী সম্প্রদায়ের মধ্যে রসুল প্রেরণ করেছি। (১১) ওদের কাছে এমন কোন রসুল আসেন নি, যাদের সাথে ওরা ঠাট্টাবিদ্ৰূপ করতে থাকেনি। (১২) এমনিভাবে আমি এ ধরনের আচরণ পাপীদের অন্তরে বদ্ধমূল করে দেই। (১৩) ওরা এর প্রতি বিশ্বাস করবে না। পূর্ববর্তীদের এমন রীতি চলে আসছে। (১৪) যদি আমি ওদের সামনে আকাশের কোন দরজাও খুলে দেই আর তাতে ওরা দিনভর আরোহণও করতে থাকে (১৫) তবুও ওরা একথাই বলবে যে, আমাদের দৃষ্টিবিভ্রাট ঘটানো হয়েছে না—বরং আমরা জাদুগ্রস্ত হয়ে পড়েছি।

শব্দার্থ : شَيْعِ শব্দটি شَيْعَة--এর বহুবচন। এর অর্থ কারও অনুসারী ও

সাহায্যকারী। বিশেষ বিশ্বাস ও মতবাদে ঐকমত্য পোষণকারী সম্প্রদায়কেও شَيْعَة বলা হয়। উদ্দেশ্য এই যে, আমি প্রত্যেক সম্প্রদায় ও জনগোষ্ঠীর মধ্যেই রসুল প্রেরণ করেছি।

এখানে إِلَى অব্যয়ের পরিবর্তে فِي شَيْعِ الْأَوَّلِينَ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে,

প্রত্যেক সম্প্রদায়ের রসূল তাদের মধ্য থেকেই প্রেরণ করা হয়েছে, যাতে তাঁর ওপর আস্থা রাখা লোকদের পক্ষে সহজ হয় এবং রসূল ও তাদের স্বভাব ও মেজাজ সম্পর্কে ওয়াকিফ-হাল হয়ে তাদের সংশোধনের যথোপযুক্ত কর্মসূচী প্রণয়ন করতে পারেন।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং (হে মুহাম্মদ, আপনি তাদের মিথ্যারোপের কারণে দুঃখিত হবেন না। কেননা পয়গম্বরগণের সাথে এরূপ আচরণ চিরকাল থেকেই হয়ে আসছে। সেমতে) আমি আপনার পূর্বেও পয়গম্বরগণকে পূর্ববর্তী লোকদের অনেক জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রেরণ করেছিলাম এবং ওদের অবস্থা ছিল এই যে) ওদের কাছে এরূপ কোন রসূল আগমন করেন নি যাঁর সাথে ওরা ঠাট্টাবিদ্রূপ করেনি। (এটা মিথ্যারোপের জঘন্যতম রূপ। সুতরাং তাদের অন্তরে যেমন ঠাট্টাবিদ্রূপ সৃষ্টি হয়েছিল) এমনিভাবে আমি এ ঠাট্টাবিদ্রূপের প্রেরণা এই অপরাধীদের (অর্থাৎ মক্কার কাফিরদের) অন্তরেও সৃষ্টি করে দিয়েছি, (যদরূন) ওরা কোরআনে বিশ্বাস স্থাপন করে না আর এ রীতি (নতুন নয়) পূর্ববর্তীদের থেকেই চলে আসছে (যে, তারা পয়গম্বরগণের প্রতি মিথ্যারোপ করে এসেছে। অতএব আপনি দুঃখিত হবেন না।) এবং (ওদের হঠকারিতা এরূপ যে, আকাশ থেকে ফেরেশতাদের আগমন তো দূরের কথা, এ থেকে আরও এক ধাপ এগিয়ে) যদি (স্বয়ং ওদেরকে আকাশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, এভাবে যে) আমি ওদের জন্য আকাশের কোন দরজা খুলে দেই; অতঃপর ওরা দিনভর (যখন তন্দ্রা ইত্যাদির সম্ভাবনা থাকে না) তা দিয়ে (অর্থাৎ দরজা দিয়ে) আকাশে আরোহণ করে, তবুও বলবে যে, আমাদের দৃষ্টিবিভ্রম ঘটানো হয়েছে। (ফলে আমরা নিজেদেরকে আকাশে আরোহণরত দেখতে পাচ্ছি; কিন্তু বাস্তবে আরোহণ করছি না। পরন্তু দৃষ্টিবিভ্রম ঘটানোর ব্যাপারে শুধু এ ঘটনার কথাই বলি কেন) বরং আমাদেরকে তো পুরোপুরি জাদু করা হয়েছে। (যদি এর চাইতেও বড় কোন মু'জিযা আমাদেরকে দেখানো হয়, তাও বাস্তবে মু'জিযা হবে না।)

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَرَبَّيْنَاهَا لِلنَّاظِرِينَ ﴿١٥﴾

(১৫) নিশ্চয় আমি আকাশে স্নানিচক্র সৃষ্টি করেছি এবং তাকে দর্শকদের জন্য সুশোভিত করে দিয়েছি।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে অবিশ্বাসীদের হঠকারিতা ও বিদ্রোহের উল্লেখ ছিল। আলোচ্য আয়াত ও পরবর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব, তওহীদ, জান, শক্তির সুস্পষ্ট প্রমাণাদি, নভো-মণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এতদুভয়ের মধ্যে অবস্থিত সৃষ্ট-বস্তু চাক্ষুষ অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। এগুলো সম্পর্কে সামান্য চিন্তা করলে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির পক্ষেই অস্বীকার করার উপায় থাকে না। বলা হয়েছে : ) নিশ্চয় আকাশে বড় বস্তু

নক্ষত্র সৃষ্টি করেছি এবং দর্শকদের জন্য আকাশকে (নক্ষত্রপুঞ্জের দ্বারা) সুশোভিত করে দিয়েছি।

### আনুমানিক জাতন্য বিষয়

جُودُ শব্দটি جُودُ এর বহুবচন। এটি রহৎ প্রাসাদ, দুর্গ ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। মুজাহিদ, কাতাদাহ্, আবু সালেহ্ প্রমুখ তফসীরবিদ এখানে جُودُ এর তফসীরে 'রহৎ নক্ষত্র' উল্লেখ করেছেন। আয়াতে বলা হয়েছে যে, আমি আকাশে রহৎ নক্ষত্র সৃষ্টি করেছি। এখানে 'আকাশ' বলে আকাশের শূন্য পরিমণ্ডলকে বোঝানো হয়েছে, যাকে সাম্প্রতিক কালের পরিভাষায় মহাশূন্য বলা হয়। আকাশগোল্ড এবং আকাশের অনেক নিচে অবস্থিত শূন্য পরিমণ্ডল—এই উভয় অর্থে ٥١٥٥ শব্দের প্রয়োগ সুবিদিত। কোরআন পাকে শেষোক্ত অর্থেও স্থানে স্থানে ٥١٥٥ শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে। গ্রহ ও নক্ষত্রসমূহ যে আকাশের অভ্যন্তরে নয়; বরং শূন্য পরিমণ্ডলে অবস্থিত এর চূড়ান্ত আলোচনা কোরআন পাকের আয়াতের আলোকে এবং প্রাচীন ও আধুনিক সৌরবিজ্ঞানের আলোকে ইনশাআল্লাহ্ সূরা ফোরকানের আয়াতِ فِي السَّمَاءِ

وَرُجَا انم এর তফসীরে করা হবে।

وَحَفِظْنَاهُمْ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ۝١٥٧ إِلَّا مَنْ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ  
شَهَابٌ مُبِينٌ ۝١٥٨

- (১৭) আমি আকাশকে প্রত্যেক বিভাঙিত শয়তান থেকে নিরাপদ করে দিয়েছি।  
(১৮) কিন্তু যে চুরি করে শুনে পালায় তার পশ্চাদ্ধাবন করে উজ্জ্বল উল্কাপিণ্ড।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি আকাশকে (নক্ষত্রপুঞ্জের সাহায্যে) প্রত্যেক বিভাঙিত শয়তান থেকে নিরাপদ করে দিয়েছি ( অর্থাৎ ওরা আকাশ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না) কিন্তু যে কেউ (ফেরেশতাদের) কোন কথা চুরি করে শুনে পালায়, তার পশ্চাদ্ধাবন করে একটি জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড। (এবং এর প্রভাবে চৌর্যরুত্তিতে লিপ্ত উল্লিখিত শয়তান ধ্বংস প্রাপ্ত হয় কিংবা দিশেহারা হয়ে যায়)।

### আনুষ্ণিক ভাৱবা বিষয়

উল্কাপিণ্ড : আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে প্রথমত প্রমাণিত হয় যে, শয়তানরা আকাশ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। আদম সৃষ্টির সময় ইবলীসের আকাশে অবস্থান এবং আদম ও হাওয়াকে প্রলুপ্ত করা ইত্যাদি আদমের পৃথিবীতে অবতরণের পূর্বকাল ঘটনা। তখন পর্যন্ত জিন ও শয়তানদের আকাশে প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ ছিল না। আদমের ও ইবলীসের বহিষ্কারের পর এই প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ হয়ে যায়। সূরা জিনের আয়াতে বলা হয়েছে :

أَنَا لَنَا نَقَعْدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلْسَّمْعِ نَمِنُ يَسْتَمِعِ الْإِنِّ يَجِدُ لَهَا شَهَا بَارِئًا

এ থেকে জানা যায় যে, রসূলুল্লাহ (সা)-র আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত শয়তানরা আকাশের সংবাদাদি ফেরেশতাদের পারস্পরিক কথাবার্তা থেকে শুনে নিত। এতদ্বারা এটা জরুরী হয় না যে, শয়তানরা আকাশে প্রবেশ করে সংবাদাদি শুনত।

বাক্য থেকেও বোঝা যায় যে, এরা চোরের মত শূন্য পরিমণ্ডলে মেঘের আড়ালে বসে সংবাদ শুনে নিত। এ বাক্য থেকে আরও জানা যায় যে, রসূলুল্লাহ (সা)-র আবির্ভাবের পূর্বেও জিন ও শয়তানদের প্রবেশাধিকার আকাশে নিষিদ্ধই ছিল, কিন্তু শূন্য পর্যন্ত পৌঁছে তারা কিছু কিছু সংবাদ শুনে নিত। রসূলুল্লাহ (সা)-র আবির্ভাবের পর ওহীর হিফা-যতের উদ্দেশ্যে আরও অতিরিক্ত ব্যবস্থা গৃহীত হয় এবং উল্কাপিণ্ডের মাধ্যমে শয়তান-দেরকে এ চুরি থেকে নিরস্ত রাখা হয়।

এখানে প্রশ্ন হয় যে, আকাশের অভ্যন্তরে ফেরেশতাদের কথাবার্তা আকাশের বাইরে থেকে শয়তানরা কিভাবে শুনতে পারত? উত্তর এই যে, এটা অসম্ভব নয়। খুব সম্ভব আকাশগাত্র শব্দ শ্রবণের অসম্ভব প্রতিবন্ধক নয়। এছাড়া এটাও নয় যে ফেরেশতাগণ কোন সময় আকাশ থেকে নিচে অবতরণ করে পরস্পর কথাবার্তা বলত এবং শয়তানরা তা শুনে পাজাত। বুখারীতে হযরত আয়েশা (রা)-র এক হাদীস থেকে এ কথাই সমর্থন পাওয়া যায় যে, মাঝে মাঝে ফেরেশতারা আকাশের নিচে মেঘমালার স্তর পর্যন্ত অবতরণ করত এবং আকাশের সংবাদাদি পরস্পর আলোচনা করত। শয়তানরা শূন্যে আত্মগোপন করে এসব সংবাদ শুনত। পরে উল্কাপাতের মাধ্যমে তা বন্ধ করে দেওয়া হয়। সূরা জিনের

أَنَا لَنَا نَقَعْدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلْسَّمْعِ

আয়াতের তফসীরে ইনশাআল্লাহ এর পূর্ণ

বিবরণ আসবে।

আলোচ্য আয়াতসমূহের দ্বিতীয় বিষয়বস্তু হচ্ছে উল্কাপিণ্ড। কোরআন পাকের বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, ওহীর হিফাযতের উদ্দেশ্যে শয়তানদেরকে মারার জন্য উল্কা-পিণ্ডের সৃষ্টি হয়। এর সাহায্যে শয়তানদেরকে বিভাঙিত করে দেওয়া হয়, যাতে তারা ফেরেশতাদের কথাবার্তা শুনে না পারে।

এখানে প্রসঙ্গ হয় যে, শূন্য পরিমণ্ডলে উল্কার অস্তিত্ব নতুন বিষয় নয়। রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আবির্ভাবের পূর্বেও তারকা খসে পড়ার ঘটনা প্রত্যক্ষ করা হত এবং পরেও এ ধারা অব্যাহত রয়েছে। এমতাবস্থায় একথা কেমন করে বলা যায় যে, রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নব্বয়তের বৈশিষ্ট্য হিসাবে শয়তানদেরকে বিভাঙিত করার উদ্দেশ্যেই উল্কার সৃষ্টি? এতে যে প্রকারান্তরে দার্শনিকদের ধারণাই সম্মিলিত হয়। তাঁরা বলেন : সূর্যের খরতাপে যেসব বাষ্প মাটি থেকে উদ্ভিত হয়, তন্মধ্যে কিছু আগ্নেয় পদার্থও বিদ্যমান থাকে। ওপরে পৌঁছার পর এগুলোতে সূর্যের তাপ অথবা অন্য কোন কারণে অতিরিক্ত উত্তাপ পতিত হলে এগুলো প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে এবং দর্শকরা মনে করে যে, কোন তারকাই বুঝি খসে পড়েছে। এটা আসলে তারকা নয়—উল্কা। সাধারণের পরিভাষায় একে ‘তারকা খসে যাওয়া’ বলেই ব্যক্ত করা হয়। আরবী ভাষায়ও এর জন্য **نظف من كوكب** ( তারকা খসে যাওয়া ) শব্দ ব্যবহার করা হয়।

উত্তর এই যে, উভয় বক্তব্যের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। মাটি থেকে উদ্ভিত বাষ্প জ্বলিত হওয়া এবং কোন তারকা কিংবা গ্রহ থেকে জ্বলন্ত অঙ্গার পতিত হওয়া উভয়টিই সম্ভবপর। এমনটা সম্ভবপর যে, সাধারণ রীতি অনুযায়ী এরূপ ঘটনা পূর্ব থেকেই অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আবির্ভাবের পূর্বে এসব জ্বলন্ত অঙ্গার দ্বারা বিশেষ কোন কাজ নেওয়া হতো না। তাঁর আবির্ভাবের পর যেসব শয়তান চুরি-চামারি করে ফেরেশতাদের কথাবার্তা শুনে যায় ওদেরকে বিভাঙিত করার কাজে এসব জ্বলন্ত অঙ্গার ব্যবহার করা হয়।

আল্লামা আলুসী (র) তাঁর রুহুল মা‘আনী গ্রন্থে এ ব্যাখ্যাই করেছেন। তিনি বর্ণনা করেন, হাদীসবিদ মুহরীকে কেউ জিজ্ঞেস করল : রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আবির্ভাবের পূর্বেও কি তারকা খসত? তিনি বললেন : হ্যাঁ। অতঃপর প্রশ্নকারী সূরা জিনের উল্লিখিত আয়াতটি এ তথ্যের বিপক্ষে পেশ করলে তিনি বললেন : উল্কা আগেও ছিল, কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আবির্ভাবের পর যখন শয়তানদের ওপর কঠোরতা আরোপ করা হল, তখন থেকে উল্কা ওদেরকে বিভাঙনের কাজে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

সহীহ মুসলিমে আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের রেওয়াজেতে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবীদের এক সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন। ইতিমধ্যে আকাশে তারকা খসে পড়ল। তিনি সাহাবীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন : জাহেলিয়াহ্ যুগে অর্থাৎ ইসলাম পূর্বকালে তোমরা তারকা খসে যাওয়াকে কি মনে করত? তাঁরা বললেন : আমরা মনে করতাম যে, বিশ্বে কোন ধরনের অঘটন ঘটবে অথবা কোন মহান ব্যক্তি মৃত্যুবরণ কিংবা জগৎগ্রহণ করবেন। তিনি বললেন : এটা অর্থহীন ধারণা। কারণ জন্মমৃত্যুর সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। এসব জ্বলন্ত অঙ্গার শয়তানদেরকে বিভাঙনের জন্য নিষ্ক্ষেপ করা হয়।

মোটকথা, উল্কা সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের বক্তব্যও কোরআনের পরিপন্থী নয়। পক্ষান্তরে এটাও অসম্ভব নয় যে, এসব জ্বলন্ত অঙ্গার সরাসরি কোন তারকা থেকে খসে নিষ্ক্ষেপিত হয়। উভয় অবস্থাতে কোরআনের উদ্দেশ্য প্রমাণিত ও সুস্পষ্ট।

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ ۝۱۹ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرِزْقِينَ ۝۲۰ وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنزِلُ إِلَّا بِقَدْرِ مَعْلُومٍ ۝۲۱ وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ۝۲۲ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ ۝۲۳ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ ۝۲۴ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ بِحَشْرِهِمْ لَأَنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۝۲۵

(১৯) আমি ভূ-পৃষ্ঠকে বিস্তৃত করেছি এবং তার ওপর পর্বতমালা স্থাপন করেছি এবং তাতে প্রত্যেক বস্তু সুপরিমিতভাবে উৎপন্ন করেছি। (২০) আমি তোমাদের জন্য তাতে জীবিকার উপকরণ সৃষ্টি করেছি এবং তাদের জন্যও যাদের অন্নদাতা তোমরা নও। (২১) আমার কাছে প্রত্যেক বস্তুর ডাঙার রয়েছে। আমি নির্দিষ্ট পরিমাণেই তা অবতারণ করি। (২২) আমি হৃষ্টিগর্ভ বায়ু পরিচালনা করি অতঃপর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করি, এরপর তোমাদেরকে তা পান করাই। বস্তুত তোমাদের কাছে এর ডাঙার নেই। (২৩) আমিই জীবনদান করি, মৃত্যুদান করি এবং আমিই চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী। (২৪) আমি জেনে রেখেছি তোমাদের অগ্রগামীদেরকে এবং আমি জেনে রেখেছি পশ্চাৎগামীদেরকে। (২৫) আপনার পালনকর্তাই তাদেরকে একত্র করে আনবেন। নিশ্চয় প্রজাবান, জানময়।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং আমি ভূ-পৃষ্ঠকে বিস্তৃত করেছি এবং তাতে (ভূ-পৃষ্ঠে) ভারী ভারী পাহাড় স্থাপন করে দিয়েছি এবং তাতে সর্বপ্রকার (প্রয়োজনীয় ফল-ফসল) একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন করেছি। এবং আমি তোমাদের জন্য তাতে (ভূ-পৃষ্ঠে) জীবিকার উপকরণ সৃষ্টি করেছি, (জীবনধারণের প্রয়োজনীয় সব উপকরণই এর অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ যেগুলো পানাহার, পরিধান ও বসবাসের সাথে সম্পর্ক রাখে। জীবিকার এসব উপকরণ ও জীবনধারণে প্রয়োজনীয় বস্তুসামগ্রী শুধু তোমাদেরকেই দেইনি; বরং) তাদেরকেও দিয়েছি, যাদেরকে তোমরা ক্বমী দাও না (অর্থাৎ এসব সৃষ্টজীব, যারা বাহ্যতও তোমাদের হাত

থেকে পানাহার ও জীবনধারণের উপকরণ পায় না। 'বাহ্যত' বলার কারণ এই যে, ছাগল-ভেড়া, গরু-মহিষ, ঘোড়া-গাধা ইত্যাদি গৃহপালিত পশু যদিও প্রকৃতপক্ষে রুহী ও জীবিকার জরুরী উপকরণ আল্লাহর পক্ষ থেকেই পায়, কিন্তু বাহ্যত তাদের পানাহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা মানুষের হাতে রয়েছে। এগুলো ছাড়া বিশ্বের যাবতীয় স্থলজ ও জলজ জীব-জন্তু এবং পশু-পক্ষী ও হিংস্র জানোয়ার এমন যে, এদের জীবিকার কোন মানুষের কর্ম-ইচ্ছার কোন দখল নেই। এগুলো এত অসংখ্য ও অগণিত যে, মানুষ সবগুলোকে চেনেও না এবং গণনাও করতে পারে না।) আর (জীবনধারণের প্রয়োজনীয় যত বস্তু রয়েছে) আমার কাছে সবগুলোর বিরাট ভাণ্ডার (পরিপূর্ণ) রয়েছে এবং আমি (স্বীয় বিশেষ রহস্য অনুযায়ী সেগুলোকে) একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে অবতারণ করতে থাকি। আমি বাতাস প্রেরণ করি, যা মেঘমালাকে জলপূর্ণ করে দেয়। অতঃপর আমিই আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করি। অতঃপর তা তোমাদেরকে পান করতে দেই। তোমরা তা সঞ্চিত করে রাখতে পারতে না (যে, পল্লবতী রুষ্টি পর্যন্ত ব্যবহার করবে) এবং আমিই জীবিত করি এবং মৃত্যুদান করি এবং (সবার মৃত্যুর পর) আমিই অবশিষ্ট থাকব। আমিই জানি তোমাদের অগ্রগামীদেরকে এবং আমিই জানি তোমাদের পাশ্চাত্যগামীদেরকে। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তাই তাদের সবাইকে (কিয়ামতে) একত্র করবেন। (একথা বলার কারণ এই যে, ওপরে তওহীদ প্রমাণিত হয়েছে। এতে তওহীদ অবিশ্বাসীদের শাস্তির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।) নিশ্চয় তিনি প্রজ্ঞাবান (প্রত্যেককে তার উপযুক্ত প্রতিদান দেবেন), সুবিজ্ঞ। (কে কি করে, তিনি পুরোপুরি জানেন।)

### অনুশঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আল্লাহর রহস্য, জীবিকার প্রয়োজনাদিতে সম্বন্ধর ও সামঞ্জস্যতা : مِنْ كُلِّ شَيْءٍ

مُزَوَّنٌ

-এর এক অর্থ অনুবাদে নেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ রহস্যের তাকিদ অনুযায়ী

প্রত্যেক উৎপন্ন বস্তুর একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদন করেছেন। এরকম হলে জীবন-ধারণ কঠিন হয়ে যেত এবং বেশী হলেও নানা অসুবিধা দেখা দিত। মানবিক প্রয়োজনের তুলনায় গম, চাউল ইত্যাদি এবং উৎকৃষ্টতর ফলমূল যদি এত বেশী উৎপন্ন হয়, যা মানুষ ও জন্তুদের খাওয়ার পরও অনেক উদ্বৃত্ত হয়, তবে তা পচা ছাড়া উপায় কি? এগুলো রাখাও কঠিন হবে এবং ফেলে দেওয়ারও জায়গা থাকবে না।

এ থেকে জানা গেল যে, যেসব শস্য ও ফলমূলের উপর মানুষের জীবন নির্ভর-শীল সেগুলোকে এত অধিক পরিমাণে উৎপন্ন করার শক্তিও আল্লাহ তা'আলার ছিল যে, প্রত্যেকেই সর্বত্র সেগুলো বিনামূল্যে পেয়ে যেত এবং অবাধে ব্যবহার করার পরও বিরাট উদ্বৃত্ত ভাণ্ডার পড়ে থাকত। কিন্তু এটা মানুষের জন্য একটা বিপদ হয়ে যেত। তাই একটি বিশেষ পরিমাণে এগুলো নাশিল করা হয়েছে, যাতে তার মান ও মূল্য বজায় থাকে এবং অনাবশ্যক উদ্বৃত্ত না হয়।

مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ - এর এক অর্থ এরূপও হতে পারে যে, সব উৎপন্ন বস্তুকে

আল্লাহ্ তা'আলা একটি বিশেষ সমন্বয় ও সামঞ্জস্যের মধ্যে উৎপন্ন করেছেন। ফলে তাতে সৌন্দর্য ও চিত্তাকর্ষণ সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন বৃক্ষের কাণ্ড, শাখা, পাতা, ফুল ও ফলকে বিভিন্ন আকার, বিভিন্ন রঙ ও স্বাদ দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে, যার সমন্বয় ও সুন্দর দৃশ্য মানুষ উপভোগ করে বটে; কিন্তু এগুলোর বিস্তারিত রহস্য হাদয়ঙ্গম করা তাদের সাধ্যাতীত ব্যাপার।

সব সৃষ্টজীবকে পানি সরবরাহ করার অভিনব ব্যবস্থা : وَأَرْسَلْنَا الرِّيَّاحَ

مَا أَنْتُمْ لَهَا بِنَازِلِينَ থেকে পর্যন্ত আল্লাহর কুদরতের ঐ বিজ্ঞানভিত্তিক

ব্যবস্থার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে, যার সাহায্যে ভূ-পৃষ্ঠে বসবাসকারী প্রত্যেক মানুষ, জীব-জন্তু, পশুপক্ষী ও হিংস্র জন্তুর জন্য প্রয়োজনমাত্মক পানি সরবরাহের নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে। এর ফলে প্রত্যেক ব্যক্তি সর্বত্র, সর্বাবস্থায় প্রয়োজন অনুযায়ী পান, গোসল ধৌতকরণ এবং ক্ষেত ও উদ্যান সেচের জন্য বিনামূল্যে পানি পেয়ে যায়। কূপ খনন ও পাইপ সংযোজনে কারণে কিছু ব্যয় হলে তা সুবিধা অর্জনের মূল্য বৈ নয়। এক ফোঁটা পানির মূল্য পরিশোধ করার ক্ষমতা কারণে নেই এবং কারণে কাছে তা দাবীও করা হয় না।

আলোচ্য আয়াতে প্রথমে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর কুদরত কিভাবে সমুদ্রের পানিকে ভূ-পৃষ্ঠের সর্বত্র পৌঁছানোর অভিনব ব্যবস্থা সম্পন্ন করেছে। তিনি সমুদ্রে বাষ্প সৃষ্টি করেছেন। বাষ্প থেকে বৃষ্টির উপকরণ (মৌসুমী বায়ু) সৃষ্টি হয়েছে এবং উপরে বায়ু প্রবাহিত করে একে পাহাড়সম মেঘমালায় পানিভর্তি জাহাজে পরিণত করেছেন। অতঃপর এসব পানিভর্তি উড়োজাহাজকে পৃথিবীর সর্বত্র যেখানে দরকার পৌঁছে দিয়েছেন। এরপর আল্লাহর পক্ষ থেকে সেখানে যতটুকু পানি দেওয়ার আদেশ হয়েছে, এই স্বয়ংক্রিয় উড়ন্ত মেঘমালা সেখানে সে পরিমাণে পানি বর্ষণ করেছে।

এভাবে সমুদ্রের পানি পৃথিবীর অনাচে-কানাচে বসবাসকারী মানুষ ও জীবজন্তু মনে বসেই পেয়ে যায়। এ ব্যবস্থায় পানির স্বাদ ও অন্যান্য গুণাগুণের মধ্যে অভিনব পরিবর্তন সৃষ্টি করা হয়। কেননা, সমুদ্রের পানিকে আল্লাহ্ তা'আলা এমন লবণাক্ত করেছেন যে, তা থেকে হাজার হাজার টন লবণ উৎপন্ন হয়। এর রহস্য এই যে, পৃথিবীর বিরাট জলভাগে কোটি কোটি প্রকার জীব-জন্তু বাস করে। এরা পানিতেই মরে এবং পানিতেই পচে, গলে। এছাড়া সমগ্র স্থলভাগের ময়লা ও আবর্জনাযুক্ত পানি অবশেষে সমুদ্রের পানিতেই গিয়ে মিশে। এমতাবস্থায় সমুদ্রের পানি মিঠা হলে তা একদিনেই পচে যেত—এর উৎকট দুর্গন্ধে স্থলভাগে বসবাসকারীদের স্বাস্থ্য ও জীবনরক্ষাই দুফুর হতে যেত। তাই আল্লাহ্ তা'আলা এই পানিকে এমন এসিডযুক্ত লোনা করে দিয়েছেন যে,



সারা বিশ্বের আবির্জনা এখানে পৌঁছে উদ্ভব ও নিশ্চিত হয়ে যায়। মোট কথা, বর্ণিত রহস্যের ভিত্তিতে সমুদ্রের পানিকে লোনা বরং ক্ষারযুক্ত করা হয়েছে, যা পানও করা যায় না এবং পান করলেও পিপাসা নিবৃত্ত হয় না। আল্লাহর ব্যবস্থায় মেষমালার আকারে পানির যেসব উড়োজাহাজ তৈরী হয়, এগুলো শুধু সামুদ্রিক পানির ভাঙারই নয়, বরং মৌসুমী বায়ু উদ্ভিত হওয়ার সময় থেকে নিম্নে ভূ-পৃষ্ঠে বর্ষিত হওয়ার সময় পর্যন্ত এগুলোতে বাহ্যিক যন্ত্রপাতি ছাড়াই এমন বৈশ্বিক পরিবর্তন আসে যে, লবণাক্ততা দূরীভূত হয়ে তা মিঠাপানিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। সূরা মুরসালাতে এ দিকে ইঙ্গিত আছে।

فَرَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا—এখানে فرَات শব্দের অর্থ এমন মিঠা পানি, যশ্ধারা পিপাসা নিবৃত্ত হয়। অর্থ এই যে, আমি মেষমালার প্রাকৃতিক যন্ত্রপাতি অতিক্রম করিয়ে সমুদ্রের লোনা ও ক্ষারযুক্ত পানিকে তোমাদের পান করার জন্য মিঠা করে দিয়েছি।

সূরা ওয়াক্‌আয় বলা হয়েছে :

أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ۚ أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ ۚ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ جَاءَ جَاءً فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ۝

পানিকে দেখ, যা তোমরা পান কর। একে তোমরা মেষমালা থেকে বর্ষণ করেছে, না আমি বর্ষণকারী? আমি ইচ্ছা করলে একে লোনা করে দিতে পারি। তথাপি তোমরা অনুগ্রহ স্বীকার কর না কেন?

এ পর্যন্ত আমরা আল্লাহর কৃদরতের সীমা দেখলাম যে, সমুদ্রের পানিকে মিঠা পানিতে পরিণত করে সমগ্র ভূপৃষ্ঠে মেষমালার সাহায্যে কি চমৎকারভাবে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন! ফলে প্রত্যেক ভূ-খণ্ডের শুধু মানুষই নয়, অগণিত জীব-জন্তুও ঘরে বসে পানি পেয়েছে এবং সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এমনকি অলংঘনীয় প্রাকৃতিক কারণে অবধারিতভাবেই তাদের কাছে পানি পৌঁছে গেছে।

কিন্তু মানুষ ও জীব-জন্তুর সমস্যার সমাধান এতটুকুতেই হয়ে যায় না। কারণ পানি তাদের এমন একটি প্রয়োজন, যার চাহিদা প্রত্যহ ও প্রতিনিয়ত। তাই তাদের প্রাত্যহিক প্রয়োজন মিটানোর একটি সম্ভাব্য পদ্ধতি ছিল এই যে, সর্বত্র প্রত্যেক মাসে প্রত্যেক দিনে বৃষ্টিপাত হত। এমতাবস্থায় তাদের পানির প্রয়োজন তো মিটে যেত কিন্তু জীবিকা নির্বাহের অপর্যাপ্ত প্রয়োজনাধিতে যে কি পরিমাণ ছুটি দেখা দিত, তা অনুমান করা অভিজ্ঞজনের পক্ষে কঠিন নয়। বছরের প্রত্যেক দিন বৃষ্টিপাতের ফলে স্বাস্থ্যের অপরিণীয় ক্ষতি হত এবং কাজ-করাবার ও চলা-ফেরায় অচলাবস্থার সৃষ্টি হত।

দ্বিতীয় পদ্ধতি ছিল এই যে, বছরের বিশেষ বিশেষ মাসে এ পরিমাণ বৃষ্টিপাত হত যে, পানি তার অবশিষ্ট মাসগুলোর জন্য যথেষ্ট হয়ে যেত। কিন্তু এর জন্য প্রয়োজন

হত প্রত্যেকের জন্য একটি কোটা নিদিষ্ট করে দেওয়া এবং তার অংশের পানির হিফা-যত তার দায়িত্বে সমর্পণ করা।

চিত্তা করুন, এরূপ করা হলে প্রত্যেকেই এতগুলো চৌবাচ্চা অথবা পাত্র কোথা থেকে যোগাড় করত, যে গুলোর মধ্যে তিন অথবা ছয় মাসের প্রয়োজনীয় পানি জমা করে রাখা যায়। যদি কোনরূপ বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে এগুলো সংগ্রহ করেও নেওয়া হতো, তবুও দেখা যেত যে, কয়েকদিন অতিবাহিত হলেই এই পানি দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে পান করার উপযুক্ত থাকত না। তাই আল্লাহর কুদরত পানিকে ধরে রাখার এবং প্রয়োজনের মুহূর্তে সর্বত্র সুলভ করার অপূর্ণ একটি অভিনব ব্যবস্থা সম্পন্ন করেছে। তা এই যে, আকাশ থেকে যে পানি বর্ষণ করা হয়, তার কিছু অংশ তো তাৎক্ষণিকভাবেই গাছপালা, ক্ষেত-খামার মানুষ ও জীব-জন্তুকে সিক্ত করার কাজে লেগে যায়, কিছু পানি উন্মুক্ত পুকুর, বিল-ঝিল ও নিম্নভূমিতে সংরক্ষিত হয়ে যায় এবং অতঃপর একটি বৃহৎ অংশকে বরফের স্তূপে পরিণত করে পাহাড়-পর্বতের শৃঙ্গে সঞ্চিত রাখা হয়। সেখানে ধূলাবালি আবর্জনা ইত্যাদি কিছুই পৌঁছতে পারে না। যদি তা পানির মত তরল অবস্থায় থাকত তবে বাতাসের সাহায্যে কিছু ধূলাবালি অথবা অন্য কোন দূষিত বস্তু সেখানে পৌঁছে যাওয়ার আশংকা থাকত। তাতে পশু-পক্ষীদের পতিত হওয়া ও মরে যাওয়ার আশংকা থাকত। ফলে পানি দূষিত হয়ে যেত। কিন্তু প্রকৃতি এ পানিকে জমাট বরফে পরিণত করে পাহাড়ের শৃঙ্গ উত্তীর্ণে দিয়েছে, সেখান থেকে অল্প পরিমাণে চুইয়ে-চুইয়ে পাহাড়ের শিরা-উপশিরায় প্রবেশ করে এবং ঝরনার আকারে সর্বত্র পৌঁছে যায়। সেখানে ঝরনা নেই সেখানে মৃত্তিকার স্তরে মানুষের ধমনীর ন্যায় সর্বত্র প্রবাহিত হয় এবং কূপ খনন করলে পানি বের হয়ে আসে।

মোট কথা এই যে, আল্লাহ তা'আলার এই পানি সর্ববরাহ ব্যবস্থার মধ্যে হাজারো নিয়ামত লুক্কায়িত রয়েছে। প্রথমত পানি সৃষ্টি করাই একটি বড় নিয়ামত। অতঃপর মেঘমালার সাহায্যে একে ভূ-পৃষ্ঠের সর্বত্র পৌঁছানো দ্বিতীয় নিয়ামত। এরপর একে মানুষের পানের উপযোগী করা তৃতীয় নিয়ামত। এরপর মানুষকে তা পান করার সুযোগ দেওয়া চতুর্থ নিয়ামত। অতঃপর এ পানিকে প্রয়োজনানুযায়ী সংরক্ষিত রাখার অটল ব্যবস্থা পঞ্চম নিয়ামত। এরপর তা থেকে মানুষকে পান ও সিক্ত হওয়ার সুযোগ দান করা ষষ্ঠ নিয়ামত। কেননা পানি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও এমন আপদবিপদ দেখা দিতে পারে যদ্বরূপে মানুষ পানি পান করতে সক্ষম না হয়। কোরআন পাকের

فَاَسْقِيْنَا كُوهًا وَمَا اَنْتُمْ لَهَا بِخٰۤرِيْنَ ۝ آয়াতে এসব নিয়ামতের প্রতিই

ইঙ্গিত করা হয়েছে। فَتٰۤيَا رٰى اللّٰهُ اِحْسٰنَ الْخٰلِقِيْنَ

সংকাজে এগিয়ে যাওয়া ও পিছিয়ে থাকার মধ্যে মর্তবীর পার্থক্য :

وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنْكُمْ ۙ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَاٰخِرِيْنَ ۙ —এখানে

সাহাবী ও তাবেরী তফসীরবিদদের পক্ষ থেকে <sup>وَأَسْمَاءُ</sup> <sup>بِنْتُ</sup> <sup>مَسْتَقْدَمِينَ</sup> (অগ্রগামী দল) ও

<sup>مَسْتَأْخِرِينَ</sup> (পশ্চাৎগামী দল)-এর তফসীর সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত রয়েছে।

কাতাদাহ ও ইব্রাহিম বনেন : যারা এ পর্যন্ত জন্মগ্রহণ করেনি তারা পশ্চাৎগামী। হযরত ইবনে আব্বাস ও যাহ্‌হাক বনেন : যারা মরে গেছে, তারা অগ্রগামী এবং যারা জীবিত আছে, তারা পশ্চাৎগামী। মুজাহিদ বনেন : পূর্ববর্তী উম্মতের লোকেরা অগ্রগামী এবং উম্মতে মুহাম্মদী পশ্চাৎগামী। হাসান ও কাতাদাহ বনেন : ইবাদতকারী ও সৎকর্মশীলরা অগ্রগামী, গোনাহ্‌গাররা পশ্চাৎগামী। হাসান বসরী, সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব, কুরতুবী, শাবী প্রমুখ তফসীরবিদদের মতে যারা নামাযের কাতারে অথবা জিহাদের সার্বিতে এবং অন্যান্য সৎকাজে এগিয়ে থাকে, তারা অগ্রগামী এবং যারা এসব কাজে পেছনে থাকে এবং দেরী করে, তারা পশ্চাৎগামী। বলা বাহুল্য, এসব উক্তির মধ্যে মৌলিক কোন বিরোধ নেই। সবগুলোর সমন্বয় সাধন করা সম্ভবপর। কেননা আল্লাহ তা'আলার সর্বব্যাপী জ্ঞান উল্লিখিত সর্বপ্রকার অগ্রগামী ও পশ্চাৎগামীতে পরিব্যাপ্ত।

কুরতুবী স্বীয় তফসীর গ্রন্থে বনেন : এ আয়াত থেকে নামাযের প্রথম কাতারে এবং আউয়াল ওয়াত্তে নামায পড়ার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। রসুলুল্লাহ (স) বনেন : যদি লোকেরা জানত যে, আমান দেওয়া ও নামাযের প্রথম কাতারে দাঁড়ানোর ফযীলত কতটুকু, তবে সবাই প্রথম কাতারে দাঁড়াতে সচেষ্ট হত এবং প্রথম কাতারে সবার স্থান সংকুলান না হলে মটারী যোগে স্থান নির্ধারণ করতে হত।

কুরতুবী এতদসঙ্গে হযরত কা'বের উক্তিও বর্ণনা করেছেন যে, এ উম্মতের মধ্যে এমন মহাপুরুষও আছে, যারা সিজদায় গেলে পেছনের সবার গোনাহ্‌ মাফ হয়ে যায়। এ জন্যই হযরত কা'ব পেছনের কাতারে থাকা পছন্দ করতেন যে, সম্ভবত প্রথম কাতারসমূহে আল্লাহর কোন এমন নেক বান্দা থাকতে পারে, যার বরকতে আমার মাগফিরাত হয়ে যেতে পারে।

বাহ্যত প্রথম কাতারেই ফযীলত নিহিত, যেমন কোরআন ও হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়েছে, কিন্তু যে ব্যক্তি কোন কারণে প্রথম কাতারে স্থান না পায়, সেও এদিক দিয়ে এক প্রকার শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করবে যে, প্রথম কাতারের কোন নেক বান্দার বরকতে তারও মাগফিরাত হয়ে যেতে পারে। উল্লিখিত আয়াতে যেমন নামাযের প্রথম কাতারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়েছে, তেমনি জিহাদের প্রথম কাতারের শ্রেষ্ঠত্বও প্রমাণিত হয়েছে।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَبَآءٍ مَّسْنُونٍ ٥٥ وَالْجَبَانَ  
خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ تَارِ السَّمُومِ ٥٦ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ

إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ۝ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ  
 وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ۝ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ  
 أَجْمَعُونَ ۖ إِلَّا إِبْلِيسَ ۖ أَبَىٰ أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ۖ قَالَ يَا بَلِيسُ  
 مَا لَكَ إِلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ۖ قَالَ لَمْ أَكُنْ لِيَ سَجْدًا لِشَيْءٍ  
 خَلَقْتَهُ مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ۖ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ  
 رَجِيمٌ ۖ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ ۖ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي  
 إِلَىٰ يَوْمٍ يُبْعَثُونَ ۖ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ۖ إِلَىٰ يَوْمِ  
 الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ۖ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ  
 وَلَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۖ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ۖ قَالَ  
 هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ۖ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنٌ  
 إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ۖ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ۖ  
 لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ۖ

(২৬) আমি মানবকে পচা কর্দম থেকে তৈরী বিগুচ্চ ঠনঠনে মাটি দ্বারা সৃষ্টি  
 করেছি। (২৭) এবং জিনকে এর আগে লু-এর আঙনের দ্বারা সৃষ্টিত করেছি। (২৮)  
 আর আগনার পালনকর্তা যখন ফেরেশতাদেরকে বললেন : আমি পচা কর্দম থেকে তৈরী  
 বিগুচ্চ ঠনঠনে মাটি দ্বারা সৃষ্ট একটি মানব জাতির পত্তন করব। (২৯) অতঃপর যখন  
 তাকে ঠিকঠাক করে নেব এবং তাতে আমার রূহ থেকে কুক দেব, তখন তোমরা তার  
 সামনে সিজদায় পড়ে ঘেয়ো। (৩০) তখন ফেরেশতারা সবাই মিলে সিজদা করল। (৩১)  
 কিন্তু ইবলীস—সে সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে স্বীকৃত হল না। (৩২) আল্লাহ  
 বললেন : হে ইবলীস, তোমার কি হলো যে তুমি সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হলে না?  
 (৩৩) বলল : আমি এমন নই যে, একজন মানুষকে সিজদা করব, যাকে আপনি  
 পচা কর্দম থেকে তৈরী ঠনঠনে বিগুচ্চ মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। (৩৪) আল্লাহ  
 বললেন : তবে তুমি এখান থেকে বের হয়ে যাও। তুমি বিভাজিত (৩৫) এবং তোমার

প্রতি ন্যায় বিচারের দিন পর্যন্ত অভিসম্পাত। (৬৬) সে বলল : হে আমার পালনকর্তা, আপনি আমাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিন। (৬৭) আল্লাহ্ বললেন : তোমাকে অবকাশ দেওয়া হল, (৬৮) সেই অবধারিত সময় উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত ; (৬৯) সে বলল : হে আমার পালনকর্তা, আপনি যেমন আমাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, আমিও তাদের সবাইকে পৃথিবীতে নানা সৌন্দর্যে আকৃষ্ট করব এবং তাদের সবাইকে পথভ্রষ্ট করে দেব। (৭০) আপনার মনোনীত বান্দাদের ব্যতীত। (৭১) আল্লাহ্ বললেন : এটা আমি পর্যন্ত সোজা পথ। (৭২) যারা আমার বান্দা, তাদের ওপর তোমার কোন ক্ষমতা নেই; কিন্তু পথভ্রষ্টদের মধ্য থেকে যারা তোমার পথে চলে। (৭৩) তাদের সবার নির্ধারিত স্থান হচ্ছে জাহান্নাম। (৭৪) এর সাতটি দরজা আছে। প্রত্যেক দরজার জন্য এক-একটি পৃথক দল আছে।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং আমি মানবকে (অর্থাৎ মানবজাতির আদি পিতা আদমকে) পচা কর্দম থেকে তৈরী বিশুদ্ধ ঠনঠনে মৃত্তিকা দ্বারা সৃষ্টি করেছি। (অর্থাৎ প্রথমে কর্দমকে খুব গাঁজ করেছি ফলে তা থেকে গন্ধ আসতে থাকে। অতঃপর তা শুষ্ক হয়েছে। শুষ্ক হওয়ার কারণে তা থেকে ধন ধন শব্দ হতে থাকে; যেমন মৃৎপাত্রকে আসুল দ্বারা টোকা দিলে শব্দ হয়। অতঃপর এই বিশুদ্ধ কর্দম দ্বারা আদমের পুতুল তৈরী করেছি। এটা অত্যন্ত ক্ষমতার পরিচায়ক।) এবং জিনকে (অর্থাৎ জিন জাতির আদি পিতাকে) এর আগে (অর্থাৎ আদমের আগে) অগ্নি দ্বারা—(অত্যধিক সূক্ষ্ম হওয়ার কারণে সেটা ছিল তপ্ত বাতাস—) সৃষ্টি করেছিলাম। (উদ্দেশ্য এই যে, এ অগ্নিতে ধোঁয়ার মিশ্রণ ছিল না। তাই সেটা বাতাসের মত দৃষ্টিগোচর হত। কেননা, গাঢ় অংশের মিশ্রণের ফলে অগ্নি দৃষ্টিগোচর

হয়। অন্য এক আয়াতে এভাবে বলা হয়েছে : 
$$\text{وَخَلَقَ الْجَانَّ مِّن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ}$$

সে সময়টি স্মরণযোগ্য, যখন আপনার পালনকর্তা ফেরেশতাদের বললেন : আমি এক মানবকে (অর্থাৎ তার পুতুলকে) পচা কর্দম থেকে তৈরী বিশুদ্ধ ঠনঠনে মৃত্তিকা দ্বারা সৃষ্টি করব। অতএব যখন আমি একে (অর্থাৎ এর দেহাবয়বকে) সম্পূর্ণ বানিয়ে নেই এবং তাতে নিজের (পক্ষ থেকে) প্রাণ ঢেলে দেই, তখন তোমরা সবাই তার সামনে সিজদা কর পড়ে যাবে। অতঃপর (যখন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বানিয়ে নিলেন, তখন) সব ফেরেশতাই (আদমকে) সিজদা করল, ইবলীস ব্যতীত। সে সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে স্বীকৃত হল না (অর্থাৎ সিজদা করল না)। আল্লাহ্ বললেন : হে ইবলীস, তোমার কি ব্যাপার যে, তুমি সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হলে না? সে বলল : আমি একরূপ নই যে মানবকে সিজদা করব, যাকে আপনি পচা কর্দম থেকে তৈরী বিশুদ্ধক ঠনঠনে মৃত্তিকা দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। (অর্থাৎ সে অধম ও নিকৃষ্ট উপকরণ দ্বারা তৈরী। আর আমি জ্যোতির্ময় উপকরণ অগ্নি দ্বারা সৃষ্টিত হয়েছি। অতএব জ্যোতির্ময় হয়ে অঙ্গকারময়কে কিরাপে সিজদা করি।) আল্লাহ্ বললেন : (আচ্ছা, তা'হলে আসমান



কিন্তু মুসলিম সম্প্রদায়ের অধিকাংশ আলিমের মতে রাহ্ একটি সূক্ষ্ম দেহবিশিষ্ট বস্তু। ﴿رُوحٌ﴾ শব্দের অর্থ ফু'ক্ মারা অথবা সঞ্চার করা। উপরোক্ত উক্তি অনুযায়ী রাহ্ যদি দেহবিশিষ্ট কোন বস্তু হয়ে থাকে, তবে সেটা ফু'কে দেওয়ার অনুকূল। তাই যদি রাহ্কে সূক্ষ্ম পদার্থ মেনে নেওয়া হয়, তবে রাহ্ ফু'কার অর্থ হবে দেহের সাথে তার সম্পর্ক স্থাপন করা।—(বয়ানুল-কোরআন)

রাহ্ ও নফস সম্পর্কে কাযী সানাউল্লাহ্ (রহ)–র তথ্যানুসন্ধান : এখানে দীর্ঘ আলোচনা ছেড়ে একটি বিশেষ তথ্যের উপর আলোচনা সমাপ্ত করা হচ্ছে। এটি কাযী সানাউল্লাহ্ পানিপথী তফসীরে মযহারীতে লিপিবদ্ধ করেছেন।

কাযী সাহেব বলেন : রাহ্ দুই প্রকার : স্বর্গজাত ও মর্ত্যজাত। স্বর্গজাত রাহ্ আল্লাহ্ তা'আলার একটি একক সৃষ্টি। এর স্বরূপ দুর্ভেদ্য। অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মনীষিগণ এর আসল স্থান আরশের উপরে দেখতে পান। কেননা, এটা আরশের চাইতেও সূক্ষ্ম। স্বর্গজাত রাহ্ অন্তর্দৃষ্টিতে উপর-নিচে পাঁচটি স্তরে অনুভব করা হয়। পাঁচটি স্তর এই : কল্ব, রাহ্, সির, খফী, আখফা—এগুলো আদেশ-জগতের সূক্ষ্ম তত্ত্ব। এ আদেশ জগতের প্রতি কোরআনে  $قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي$  বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

মর্ত্যজাত রাহ্ হচ্ছে ঐ সূক্ষ্ম বাষ্প, যা মানবদেহের চার উপাদান অগ্নি, পানি, মৃত্তিকা ও বায়ু থেকে উৎপন্ন হয়। এই মর্ত্যজাত রাহ্কেই নফস বলা হয়।

আল্লাহ্ তা'আলা মর্ত্যজাত রাহ্কে যাকে নফস বলা হয় উপরোক্ত স্বর্গজাত রাহের আয়নায় পরিণত করে দিয়েছেন। আয়নাকে সূর্যের বিপরীতে রাখলে যেমন অনেক দূরে অবস্থিত থাকা সত্ত্বেও তাতে সূর্যের ছবি প্রতিফলিত হয়, সূর্য কিরণে আয়নাও উজ্জ্বল হয় এবং তাতে সূর্যের উত্তাপও এসে যায়, যা কাপড়কে জ্বালিয়ে দিতে পারে; তেমনি-ভাবে স্বর্গজাত রাহের ছবি মর্ত্যজাত রাহের আয়নায় প্রতিফলিত হয়; যদিও তা মৌলিকত্বের কারণে অনেক উর্ধ্ব ও দূরত্বে অবস্থিত থাকে। প্রতিফলিত হয়ে স্বর্গজাত রাহের গুণাগুণ ও প্রতিক্রিয়া মর্ত্যজাত রাহের মাধ্যে স্থানান্তরিত করে দেয়। নফসে সৃষ্ট এসব প্রতিক্রিয়াকেই আংশিক আত্মা বলা হয়।

মর্ত্যজাত রাহ তথা নফস স্বর্গজাত রাহ থেকে প্রাপ্ত গুণাগুণ ও প্রতিক্রিয়াসহ সর্বপ্রথম মানবদেহের হৃৎপিণ্ডের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়। এ সম্পর্কেরই নাম হায়াত ও জীবন। মর্ত্যজাত রাহের সম্পর্কের ফলে সর্বপ্রথম মানুষর হৃৎপিণ্ডে জীবন ও ঐ সব বোধশক্তি সৃষ্টি হয়, যেগুলোকে নফস স্বর্গজাত রাহ থেকে লাভ করে। মর্ত্যজাত রাহ সমগ্র দেহে বিস্তৃত সূক্ষ্ম শিরা-উপশিরায় সংক্রমিত হয়। এভাবে সে মানবদেহের প্রতিটি অংশে ছড়িয়ে পড়ে।

মানবদেহের মর্ত্যজাত রাহের সংক্রমিত হওয়াকেই  $نَفْحُ رُوحٍ$  তথা আত্মা ফু'কা বা আত্মা সঞ্চারিত করা বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। কেননা, এ সংক্রমণ কোন বস্তুতে ফু'ক করার সাথে খুবই সামঞ্জস্যশীল।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা রূহকে নিজের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে

مِنْ

رُوحِي

বলেছেন, যাতে সমগ্র সৃষ্টজীবের মধ্যে মানবাত্মার শ্রেষ্ঠত্ব ফুটে উঠে। কারণ মানবাত্মা উপকরণ ব্যতীত একমাত্র আল্লাহর আদেশই সৃষ্ট হয়েছে। এছাড়া তার মধ্যে আল্লাহর নূর করার এমন যোগ্যতা রয়েছে, যা মানুষ ছাড়া অন্য কোন জীবের আত্মার মধ্যে নেই।

মানব সৃষ্টির মধ্যে মৃত্তিকাই প্রধান উপকরণ। এ জন্যই কোরআন পাকে মানব-সৃষ্টিকে মৃত্তিকার সাথে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানব সৃষ্টির উপকরণ দশটি জিনিসের মধ্যে পরিব্যাপ্ত। তন্মধ্যে পাঁচটি সৃষ্টিজগতের এবং পাঁচটি আদেশ জগতের। সৃষ্টিজগতের চার উপাদান আশুন, পানি, মাটি, বাতাস এবং পঞ্চম হচ্ছে এ চার থেকে সৃষ্ট সূক্ষ্ম বাষ্প যাকে মর্ত্যজাত রূহ বা নফস বলা হয়। আদেশজগতের পাঁচটি উপকরণ উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ কল্প, রূহ, সির, খফী ও আখ্কা।

এ পরিব্যাপ্তির কারণে মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের যোগ্য সাব্যস্ত হয়েছে এবং মা'রিকতের নূর, ইশক ও মহব্বতের জ্বালা বহনের যোগ্যপাত্র বিবেচিত হয়েছে। এর ফলশ্রুতি হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার আকৃতিমুক্ত সঙ্গ লাভ। রসুলুল্লাহ (সা) বলেন :  
 الرُّوحُ مِنَ احِبِّ اَللّٰهِ اَلَّذِيْ يُّرِيْهِ لِقَابُ رَسُوْلِهِ  
 অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষ তার সঙ্গ লাভ করবে, যাকে সে মহব্বত করে।

আল্লাহর দ্যুতির গ্রহণ ক্ষমতা এবং আল্লাহর সঙ্গ লাভের কারণেই আল্লাহর রহস্য দাবী করেছে যে, মানুষকে ফেরেশতাগণ সিজদা করুক। আল্লাহ বলেন :  
 قُلُوْا

لَا سَآءِدِيْنَ

(তারা সবাই তার প্রতি সিজদায় অবনত হলো)

ফেরেশতাগণ সিজদা করতে আদিষ্ট হয়েছিল, ইবলীসকে প্রসঙ্গত অন্তর্ভুক্ত ধরা হয়েছে : সূরা আ'রাকে ইবলীসকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে :  
 مَا مَنَعَكَ اَنْ لَا تَسْجُدَ

اِذْ اَمْرُكَ

—এ থেকে বোঝা যায় যে, ফেরেশতাদের সাথে ইবলীসকেও সিজদার আদেশ দেওয়া হয়েছিল। এ সূরার আয়াত থেকে বাহ্যত বোঝা যায় যে, ফেরেশতাদেরকে বিশেষভাবে সিজদা করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল। এর অর্থ এরূপ হতে পারে যে, সিজদার আদেশ মূলত ফেরেশতাদেরকে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু ইবলীসও যেহেতু ফেরেশতাদের



মধ্যে বিদ্যমান ছিল, তাই প্রসঙ্গত সে-ও আদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কেননা আদমের সম্মানার্থে যখন আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি ফেরেশতাদেরকে আদেশ দেওয়া হয়েছে, তখন অন্যান্য সৃষ্টি যে প্রসঙ্গত এ আদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তা বলাই বাহুল্য। এ কারণেই ইবলীস উত্তরে একথা বলেনি যে, আমাকে যখন সিজদা করার আদেশ দেওয়াই হয়নি, তখন পালন না করার অপরাধও আমার প্রতি আরোপিত হয় না। কোরআন পাকে <sup>وَأَن يَسْجُدَ</sup> **أَبَىٰ** (সে সিজদা করতে অস্বীকৃত হল) বলায় পরিবর্তে

<sup>وَأَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ</sup> **أَبَىٰ** (সে সিজদাকারীদের সাথে शामिल হতে অস্বীকৃত হল)

বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, মূল সিজদাকারী তো ফেরেশতারাই ছিল, কিন্তু ইবলীস যেহেতু তাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল, তাই হুক্তিগতভাবে তারও সিজদাকারী ফেরেশতাদের সাথে शामिल হওয়া অপরিহার্য ছিল। शामिल না হওয়ার কারণে তার প্রতি ক্রোধ বশিত হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলার বিশেষ বাস্পাদল শয়তানের প্রভাবাধীন না হওয়ার অর্থ :

<sup>أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ</sup> **أَبَىٰ**—থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার

মনোনীত বাস্পাদের উপর শয়তানী কারসাজির প্রভাব পড়ে না। কিন্তু বর্ণিত আদম কাহিনীতে একথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, আদম ও হাওয়ার উপর শয়তানের চক্রান্ত সফল হয়েছে। এমনিভাবে সাহাবায়ে-কিরাম সম্পর্কে কোরআন বলে : <sup>وَأَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ</sup> **أَبَىٰ**

<sup>وَأَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ</sup> **أَبَىٰ**—(আলে-এমরান)। এ থেকে জানা যায় যে, সাহাবায়ে-

কিরামের উপরও শয়তানের খোঁকা এক্ষেত্রে কার্যকর হয়েছে।

তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহর বিশেষ বাস্পাদের উপর শয়তানের আধিপত্য না হওয়ার অর্থ এই যে, তাদের মন-মস্তিষ্ক ও জ্ঞান-বুদ্ধির উপর শয়তানের এমন আধিপত্য হয় না যে, তাঁরা নিজ ব্রাহ্মি কোন সময় বুঝতেই পারেন না। ফলে তওবা করার শক্তি হয় না কিংবা কোন ক্ষমার অযোগ্য গোনাহ করে ফেলেন।

উল্লিখিত ঘটনাবলী এ তথ্যের পরিপন্থী নয়। কারণ, আদম ও হাওয়া তওবা করেছিলেন এবং তা কবুলও হয়েছিল। সাহাবায়ে-কিরামও তওবা করেছিলেন এবং শয়তানের চক্রান্তে যে গুনাহ করেছিলেন, তা মাফ করা হয়েছিল।

জাহান্নামের সাত দরজা : <sup>لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ</sup> **لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ**—ইমাম আহমদ, ইবনে জরীর,

তাবারী ও বায়হাকী হযরত আলীর রেওয়াজেতে লিখেন যে, উপর নিচের স্তরের দিক দিয়ে জাহান্নামের দরজা সাতটি। কেউ কেউ এগুলোকে সাধারণ দরজার মত সাব্যস্ত করেছেন। প্রত্যেক দরজা বিশেষ প্রকারের অপরাধীদের জন্য নির্দিষ্ট থাকবে।—(কুর-তুবী)।

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۖ آدْخُلُوْهَا بِسَلَامٍ ۖ اٰمِنِيْنَ ۝ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُوْرِهِمْ مِّنْ غَلٍ ۖ اِخْوَانًا عَلٰٓى سُرُرٍ مُّتَقَبِلِيْنَ ۝ لَا يَسْهُمُ فِيْهَا نَضَبٌ وَّمَا لَهُمْ مِنْهَا مُمْخَرَجِيْنَ ۝ بَتِيْۤ اٰبَادِيْۤ اِنِّيْ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۝ وَاَنَّ عَذَابِيْ هُوَ الْعَذَابُ الْاَلِيْمُ ۝

(৪৫) নিশ্চয় আল্লাহ্‌ভীরুরা বাগান ও নিৰ্ঝরিণীসমূহে থাকবে। (৪৬) বলা হবে : এগুলোতে নিরাপত্তা ও শান্তি সহকারে প্রবেশ কর। (৪৭) তাদের অন্তরে যে ক্রোধ ছিল, আমি তা দূর করে দেব। তারা ভাই ভাইয়ের মতো সামনা-সামনি আসনে বসবে। (৪৮) সেখানে তাদের মোটেই কণ্ট হবে না এবং তারা সেখান থেকে বহিষ্কৃত হবে না। (৪৯) আপনি আমার বান্দাদেরকে জানিয়ে দিন যে, আমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু। (৫০) এবং ইহাও যে, আমার শাস্তিই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিশ্চয় আল্লাহ্‌ভীরুরা (অর্থাৎ ঈমানদাররা) উদ্যান ও নিৰ্ঝরিণীবহুল স্থানসমূহে (বসবাস করতে) থাকবে। (যদি গোনাহ না থাকে অথবা ক্ষমা করে দেওয়া হয়, তবে প্রথম থেকেই এবং গোনাহ থাকলে শাস্তি ভোগের পর থেকে) তাদেরকে বলা হবে : ) তোমরা এগুলোতে (অর্থাৎ উদ্যান ও নিৰ্ঝরিণীবহুল স্থানসমূহে) নিরাপত্তা ও শান্তি সহকারে প্রবেশ কর। (অর্থাৎ বর্তমানেও প্রত্যেক অপ্রীতিকর ব্যাপার থেকে নিরাপত্তা আছে এবং ভবিষ্যতেও কোন অনিশ্চয়ের আশংকা নেই) এবং (দুনিয়াতে স্বভাবগত তাগিদে) তাদের অন্তরে যে ঈর্ষা-দ্বेष ছিল আমি তা (তাদের অন্তর থেকে) জাহান্নামে প্রবেশের পূর্বেই দূর করে দেব। তারা ভাই-ভাইয়ের মতো (ভালবাসা ও সম্প্রীতির সাথে) থাকবে, সিংহাসনে সামনা-সামনি বসবে। সেখানে তাদের মোটেই কণ্ট হবে না এবং তারা সেখান থেকে বহিষ্কৃত হবে না। (হে মুহাম্মদ) আপনি আমার বান্দাদেরকে জানিয়ে দিন যে, আমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু। এবং (আরও) এই যে, আমার শাস্তি (-ও) যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি (যাতে একথা জেনে তাদের মনে ঈমান ও আল্লাহ্‌ভীতির প্রতি উৎসাহ এবং কফর ও গোনাহর প্রতি ভয় জন্মে)।

## আনুশঙ্গিক জাতব্য বিষয়

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আক্বাস (রা) বলেন : জালাতীরা যখন জালাতে প্রবেশ করবে, তখন সর্বপ্রথম তাদের পানির দু'টি নির্ঝালিণী পেশ করা হবে। প্রথম নির্ঝালিণী থেকে পানি পান করতেই তাদের অন্তর থেকে ঐসব পারস্পরিক শত্রুতা বিধৌত হয়ে যাবে যা কোন সময় দুনিয়াতে জন্মেছিল এবং স্বভাবগতভাবে তার প্রতিক্রিয়া শেষ পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। অতঃপর সবার অন্তরে পারস্পরিক ভালবাসা ও সম্প্রীতি সৃষ্টি হয়ে যাবে। কেননা, পারস্পরিক শত্রুতাও এক প্রকার কষ্ট এবং জালাত প্রত্যেক কষ্ট থেকেই পবিত্র।

সহীহ্ হাদীসে বলা হয়েছে যে, যার অন্তরে কোন মুসলমানের প্রতি বিদ্মু পন্নি-  
মানও ঈর্ষা ও শত্রুতা থাকবে, সে জালাতে প্রবেশ করবে না। এর অর্থ ঐ হিংসা ও  
শত্রুতা, যা জাগতিক স্বার্থের অধীনে এবং নিজ ইচ্ছা ও ক্রমতাবলে হয় এবং এর কারণে  
সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি প্রতিপক্ষকে ঘামেল ও ক্ষতিগ্রস্ত করার চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকে। মানব-  
সুলভ স্বাভাবিক মন কষাকষি অনেকটা অনিচ্ছাকৃত ব্যাপার; এটা এ সাবধান বাণীর  
অন্তর্ভুক্ত নয়! এমনভাবে ঐ শত্রুতাও এর অন্তর্ভুক্ত নয়, যা কোন শরীয়ত সম্মত  
কারণের উপর ভিত্তিশীল। জালাতে এ ধরনের হিংসা ও শত্রুতার কথাই বলা হয়েছে  
যে, জালাতীদের মন থেকে সর্ব প্রকার হিংসা ও শত্রুতা দূর করে দেওয়া হবে।

এ সম্পর্কেই হযরত আলী (রা) বলেন : আমি আশা করি, আমি তালহা ও মুবা-  
য়ের ঐ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হব, যাদের মনোমালিন্য জালাতে প্রবেশ করার সময় দূর  
করে দেওয়া হবে। এতে ঐ মতবিরোধ ও বিবাদের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে, যা হযরত  
আলী এবং তালহা ও মুবায়েরের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল।

لا يوسم نبيها نصب وما هم منها بمشركين ۞ —এ জালাত থেকে জালাতের

দুটি বৈশিষ্ট্য জানা গেল। এক. সেখানে কেউ কোন ক্লাস্তি ও দুর্বলতা অনুভব করবে না।  
দুনিয়ার অবস্থা এর বিপরীত; এখানে কষ্ট ও পরিশ্রমের কাজ করলে তো ক্লাস্তি হয়ই;  
বিশেষ আশ্রাম এমনকি চিন্তাবিনোদনেও মানুষ কোন না কোন সময় ক্লাস্ত হয়ে পড়ে এবং  
দুর্বলতা অনুভব করে, তা যতই সুখকর কাজ ও বৃত্তি হোক না কেন।

দ্বিতীয়ত জানা গেল যে, জালাতের আশ্রাম, সুখ ও নিয়ামত কেউ পেলে তা চিরস্থায়ী  
হবে। এগুলো কোন সময় হ্রাস পাবে না এবং এগুলো থেকে কাউকে বহিষ্কৃতও করা হবে  
না। সূরা সাদ-এ বলা হয়েছে : ان هذا ليرزقنا مالها من نفاق

এ হচ্ছে আমাদের ঝিষিক, যা কোন সময় শেষ হবে না। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে :

وما هم منها بمشركين ۞ —অর্থাৎ তাদেরকে কোন সময় এসব নিয়ামত ও সুখ

থেকে বহিষ্কার করা হবে না। দুনিয়ার ব্যাপারাদি এর বিপরীত। এখানে যদি কেউ

কাউকে কোন বিরাট নিয়ামত বা সুখ দিয়েও দেয় তবুও সদাসর্বদা এ আশংকা রেগেই থাকে যে, দাতা কোন সমস্র নারাজ হয়ে যদি তাকে বের করে দেয়।

একটি তৃতীয় সম্ভাবনা ছিল এই যে, জামাতের নিয়ামত শেষ হবে না এবং জামাতীকে সেখান থেকে বেরও করা হবে না, কিন্তু সেখানে থাকতে থাকতে সে নিজেই যদি অতিষ্ঠ হয়ে যায় এবং বাইরে চলে যেতে চায়! কোরআন পাক এ সম্ভাবনাকেও একটি বাক্যে নাচক করে দিয়েছে :

لَا يَبْتَغُونَ عَنْهَا حَوْلًا --- অর্থাৎ তারাও সেখান থেকে

কিছু আসার বাসনা কোন সময়ই পোষণ করবে না।

وَيَبْتَغُهُمْ عَنْ ضَيْفٍ إِبْرَاهِيمَ ۖ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا ۗ قَالَ  
 إِنَّا مِنْكُمْ وَجَلُونَ ۖ قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ۖ قَالَ  
 ابَشِّرْهُمُوْنِي عَلَىٰ أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فِيمَ تَبَشِّرُونَ ۖ قَالُوا ابَشِّرْنَا  
 بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ ۖ قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا  
 الضَّالُّونَ ۖ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ۖ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا  
 إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ۖ إِلَّا آلَ لُوطٍ ۗ إِنَّا لَنَجُوهُمْ أَجْمَعِينَ ۖ إِلَّا  
 امرأته قدّرت ۗ إِنهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ ۖ فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ ۖ  
 قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنْكَرُونَ ۖ قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ  
 يَسْتُرُونَ ۖ وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ۖ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ  
 بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوك  
 حَيْثُ تُوْمَرُونَ ۖ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَٰلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ  
 مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ ۖ وَجَاءَ أَهْلَ الْمَدْيَنَةِ يُسْتَبْشِرُونَ ۖ  
 قَالَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُون ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَخْزُون ۖ  
 قَالُوا أَوْلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَلَمِينَ ۖ قَالَ هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ

فُولِينَ ۝ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ۝ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ  
 مُشْرِقِينَ ۝ فَجَعَلْنَاهَا سَافِلًا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ  
 سَبْجِيلٍ ۝ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ ۝ وَإِنَّهَا لَلسَّبِيلُ  
 مُقِيمٌ ۝ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝

(৫১) আপনি তাদেরকে ইবরাহীমের মেহমানদের অবস্থা শুনিয়া দিন। (৫২) যখন তারা তাঁর গৃহে আগমন করল এবং বলল : সালাম। তিনি বললেন : আমরা তোমাদের ব্যাপারে ভীত। (৫৩) তারা বলল : ডগ্ন করবেন না। আমরা আপনাকে একজন জ্ঞান-বান ছেলেসন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছি। (৫৪) তিনি বললেন : তোমরা কি আমাকে এমতাবস্থায় সুসংবাদ দিচ্ছ, যখন আমি বার্বক্যে পৌঁছে গেছি? এখন কিসের সুসংবাদ দিচ্ছ? (৫৫) তারা বলল : আমরা আপনাকে সত্য সুসংবাদ দিচ্ছি! অতএব আপনি নিরাশ হবেন না। (৫৬) তিনি বললেন : পালনকর্তার রহমত থেকে পথভ্রষ্টরা ছাড়া কে নিরাশ হয়? (৫৭) তিনি বললেন, অতঃপর তোমাদের প্রধান উদ্দেশ্য কি হে আল্লাহর প্রেরিতগণ? (৫৮) তারা বলল : আমরা একটি অপরাধী সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হয়েছি। (৫৯) কিন্তু লুতের পরিবার-পরিজন। আমরা অবশ্যই তাদের সবাইকে বাঁচিয়ে নেব। (৬০) তবে তার স্ত্রী। আমরা স্থির করেছি যে, সে থেকে যাওয়ারদের দলভুক্ত হবে। (৬১) অতঃপর যখন প্রেরিতরা লুতের গৃহে পৌঁছল। (৬২) তিনি বললেন : তোমরা তো অপরিচিত লোক। (৬৩) তারা বলল : না, বরং আমরা আপনার কাছে ঐ বস্তু নিয়ে এসেছি, যে সম্পর্কে তারা বিবাদ করত। (৬৪) এবং আমরা আপনার কাছে সত্য বিষয় নিয়ে এসেছি এবং আমরা সত্যবাদী। (৬৫) অতএব আপনি শেষ রাত্রে পরিবারের সকলকে নিয়ে চলে যান এবং আপনি তাদের পশ্চাদনুসরণ করবেন এবং আপনাদের মধ্যে কেউ যেন পিছন ফিরে না দেখে। আপনারা যেখানে আদেশ প্রাপ্ত হচ্ছেন সেখানে যান। (৬৬) আমি লুতকে এ বিষয় পরিজ্ঞাত করে দেই যে, সকাল হলেই তাদেরকে সমূলে বিনাশ করে দেওয়া হবে। (৬৭) শহরবাসীরা আনন্দ-উল্লাস করতে করতে পৌঁছল। (৬৮) লুত বললেন : তারা আমার মেহমান। অতএব আমাকে লাঞ্চিত করো না। (৬৯) তোমরা আল্লাহকে ডগ্ন কর এবং আমার ইশ্বত নষ্ট করো না। (৭০) তারা বলল : আমরা কি আপনাকে জগ-দ্বাসীর সমর্থন করতে নিষেধ করিনি। (৭১) তিনি বললেন : যদি তোমরা একান্ত কিছু করতেই চাও, তবে আমার কন্যারা উপস্থিত আছে। (৭২) আপনার প্রাণের কসম, তারা আপন নেশায় প্রমত্ত ছিল। (৭৩) অতঃপর সূর্যোদয়ের সময় তাদেরকে প্রচণ্ড একটি শব্দ এসে পাকড়াও করল। (৭৪) অতঃপর আমি জনপদটিকে উল্টে দিলাম এবং তাদের উপর কংকরের প্রস্তর বর্ষণ করলাম। (৭৫) নিশ্চয় এতে চিন্তাশীলদের জন্য

নিদর্শনাবলী রয়েছে। (৭৬) জনপদটি সোজা পথে অবস্থিত রয়েছে। (৭৭) নিশ্চয় এতে ঈমানদারদের জন্য নিদর্শন আছে।

### তফসীলের সার-সংক্ষেপ

এবং (হে মুহাম্মদ) আপনি তাদেরকে ইবরাহীম (আ)-এর মেহমানদের (কাহিনীর)-ও সংবাদ দিন। (ঘটনাটি তখন ঘটেছিল) যখন তারা [মেহমানরা---যারা বাস্তবে ফেরেশতা ছিল এবং মানবাকৃতিতে আসার কারণে হয়রত ইবরাহীম তাদেরকে মেহমান মনে করেন। তাঁর অর্থাৎ ইবরাহীম (আ)-এর] কাছে আগমন করল। অতঃপর (এসে) তারা আসসালামু আলাইকুম বলল। [ইবরাহীম (আ) তাদেরকে মেহমান মনে করে তৎক্ষণাত আহ্বায় প্রস্তুত করে আনলেন। কিন্তু যেহেতু তারা ছিল ফেরেশতা, তাই তারা আহ্বায় করল না। তখন] ইবরাহীম (আ) মনে মনে ভয় পেলেন যে, তারা আহ্বায় করে না কেন? তারা মানবাকৃতিতে ফেরেশতা ছিল বলে তিনি তাদেরকে মানবই মনে করলেন এবং আহ্বায় না করায় সন্দেহ করলেন যে তারা শত্রু না হয়ে এবং) বলতে লাগলেন : আমরা আপনাদের ব্যাপারে ভীত। তারা বলল : আপনি ভয় করবেন না। কেননা, আমরা ফেরেশতা। আঞ্জাহুর পক্ষ থেকে একটি সুসংবাদ নিয়ে আগমন করেছি এবং আপনাকে একটি পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছি। সে অত্যন্ত জানী হবে। [অর্থাৎ নবী হবে। কেননা, মানব জাতির মধ্যে পয়গম্বরগণই সর্বাধিক জ্ঞানপ্রাপ্ত হন। 'পুত্র সন্তান' বলে হয়রত ইসহাক (আ) কে বোঝানো হয়েছে। অন্যান্য আয়াতে হয়রত ইসহাকের সাথে ইম্রাকুবের সুসংবাদও বর্ণিত রয়েছে।] ইবরাহীম (আ) বলতে লাগলেন : আপনারা কি এমতাবস্থায় (পুত্রের) সুসংবাদ দিচ্ছেন, যখন আমি বার্বকো পৌছে গেছি? অতএব (এমতাবস্থায় আমাকে) কিসের সুসংবাদ দিচ্ছেন? (উদ্দেশ্য এই যে, ব্যাপারটি স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে বিস্ময়কর। এ অর্থ নয় যে, কুদরতের বাইরে।) তারা (ফেরেশতাগণ) বলল : আমরা আপনাকে বাস্তব বিষয়ের সুসংবাদ দিচ্ছি (অর্থাৎ সন্তানের জন্মগ্রহণ নিশ্চিতই হবে)। অতএব আপনি নিরাশ হবেন না। (অর্থাৎ নিজের বার্বকোর প্রতি দৃষ্টি দেবেন না। কারণ, প্রচলিত কার্য-কারণের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে নৈরাশ্যের চিহ্ন প্রবল হতে থাকে।) ইবরাহীম (আ) বললেন : পালনকর্তার রহমত থেকে কে নিরাশ হয় পথভ্রষ্ট লোকদের ছাড়া? (অর্থাৎ আমি নবী হয়ে পথভ্রষ্টদের বিশেষণে কিরূপে বিশেষিত হতে পারি? ব্যাপারটি যে বিচিত্র, আমার এ বক্তব্যের শুধু তাই উদ্দেশ্য। আঞ্জাহুর ওয়াদা সত্য এবং আমি এ বিষয়ে আশাতীত বিশ্বাসী। এরপর নবুয়তের অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা তিনি জানতে পারলেন যে, ফেরেশতাদের আগমনের উদ্দেশ্য আরও কোন গুরুতর ব্যাপার হবে। তাই) বলতে লাগলেন : (যখন ইঙ্গিত দ্বারা আমি জানতে পেরেছি যে, আপনাদের আগমনের আরও উদ্দেশ্য রয়েছে, তখন বলুন) এখন আপনাদের সামনে কি গুরুদায়িত্ব আছে হে ফেরেশতাগণ! ফেরেশতাগণ বলল : আমরা একটি অপরাধী সম্প্রদায়ের প্রতি (তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য) প্রেরিত হয়েছি (অর্থাৎ জুতের সম্প্রদায়) কিন্তু জুত (আ)-এর পরিবার-পরিজন ছাড়া। আমরা তাদের সবাইকে (আযাব থেকে) বাঁচিয়ে রাখব

( অর্থাৎ তাদেরকে আত্মরক্ষার পদ্ধতি বলে দেব যে, অপরাধীদের কাছ থেকে পৃথক হয়ে যাও ) তার ( অর্থাৎ লূতের ) স্ত্রীকে ছাড়া। তার সম্পর্কে আমরা নির্ধারিত করে রেখেছি যে, সে অবশ্যই অপরাধী সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকে যাবে ( এবং তাদের সাথে আমায়ে পতিত হবে )। অতঃপর যখন ফেরেশতারা লূত (আ)-এর পরিবারের কাছে আগমন করল, ( তখন যেহেতু তারা মানবাকৃতিতে ছিল, তাই লূত ) বলতে লাগলেন : ( মনে হয় ) আপনারা অপরিচিত লোক ( দেখুন, শহরবাসীরা আপনাদের সাথে কি ব্যবহার করে! কারণ, তারা অপরিচিতদেরকে উভ্যক্ত করে থাকে। ) তারা বলল : না ( আমরা মানুষ নই ) ; বরং আমরা ( ফেরেশতা ) আপনার কাছে ঐ বস্তু ( অর্থাৎ ঐ আযাব ) নিয়ে এসেছি, যে সম্পর্কে তারা সন্দেহ করত আর আমরা আপনার কাছে অকাটা বিষয় ( অর্থাৎ আযাব ) নিয়ে এসেছি এবং আমরা ( এ সংবাদ প্রদানে ) সম্পূর্ণ সত্যবাদী। অতএব আপনি রাত্রির কোন অংশে পরিবারের সকলকে নিয়ে ( এখান থেকে ) চলে যান এবং আপনি সবার পেছনে চলুন ( যাতে কেউ থেকে না যায় অথবা ফিরে না যায় এবং আপনার ভয়ে কেউ পিছন ফিরে না তাকায়। কারণ পিছন ফিরে তাকানো নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ) এবং আপনাদের মধ্যে থেকেও কেউ যেন পিছন ফিরে না তাকায় ( অর্থাৎ সবাই শ্রুত প্রস্থান করবে ) এবং যেখানে যাওয়ার আদেশ প্রাপ্ত হন, সেখানে যাবেন। ( তফসীর দুররে-মনসুরে সুন্দীর বরাত দিয়ে বর্ণিত রয়েছে যে, তাদেরকে সিরিয়ার দিকে হিজ্রত করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল। আমি ( এই ফেরেশতাদের মাধ্যমে ) লূত (আ) এর কাছে নির্দেশ পাঠাই যে, ভোর হওয়া মাত্রই তাদের সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করে দেওয়া হবে ( অর্থাৎ তারা সম্পূর্ণ নাস্তানাবুদ হয়ে যাবে। ফেরেশতাদের এই কথাবার্তা ঐ ঘটনার পরে হয়েছে, যা পরে বর্ণিত হচ্ছে। কিন্তু অগ্রে উল্লেখ করার কারণ এই যে, ঘটনা বর্ণনা করার উদ্দেশ্য যাতে পূর্বেই গুরুত্ব সহকারে জানা হয়ে যায়। ঘটনা বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হল অশাখ্যদের আযাব ও অনুগতদের মুক্তি ও সাফল্য ফুটিয়ে তোলা। পরবর্তী ঘটনা এই ) এবং শহরবাসীরা ( লূতের গৃহে সুদর্শন কয়েকজন কিশোরের আগমনের সংবাদ শুনে ) আনন্দ উল্লাস করতে করতে ( মন্দ নিয়ত ও কু-ইচ্ছা সহকারে লূতের গৃহে ) পৌঁছল। লূত [ ( আ ) এখন পর্যন্ত তাদেরকে মানব সন্তান ও মেহমানই মনে করছিলেন। তিনি শহরবাসীদের কু-মতলব টের পেয়ে ] বললেন : তারা আমার মেহমান। ( তাদেরকে উভ্যক্ত করে ) আমাকে ( সাধারণের মধ্যে ) জাঙ্জিত করো না। ( কেননা, মেহমানকে অপমান করলে মেজবানের অপমান হয়। যদি এই বিদেশীদের প্রতি তোমাদের করুণা নাও হয়, তবে কমপক্ষে আমার কথা চিন্তা কর। আমি তোমাদের এ জনপদেরই অধিবাসী। এছাড়া তোমরা যে মতলব নিয়ে এসেছো, তা আল্লাহর ক্রোধ ও গম্বের কারণ। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমাকে ( মেহমানদের দৃষ্টিতে ) হেয় করো না। ( কারণ মেহমানরা মনে করবে যে, নিজের জনপদের লোকদের মধ্যেও তার কোন মানমর্যাদা নেই। ) তারা বলতে লাগল : ( এ অপমান আমাদের পক্ষ থেকে নয়। আপনি নিজেই তা উপার্জন করেছেন যে, তাদেরকে মেহমান করেছেন। ) আমরা কি আপনাকে সারা দুনিয়ার মানুষকে মেহমান করা থেকে ( বার বার ) নিষেধ করিনি ? ( আপনি তাদেরকে মেহমান না করলে এ অপমানের মুখ দেখতে হতো না। ) লূত (আ) বললেন : ( আচ্ছা বল তো ) এই ন্যাকারজনক কাণ্ড করার কি প্রয়োজন, যে কারণে আমার

পক্ষে কাউকে মেহমান করারও অনুমতি দেওয়া হয় না? স্বভাবগত কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য আমার এই (বউ) কন্যারা (যারা তোমাদের গৃহে আছে) বিদ্যমান রয়েছে। যদি তোমরা আমার কথা মান্য কর, (তবে উদ্বোধিত পছায় নিজ নিজ স্ত্রীর সাথে মতলব পূর্ণ কর। কিন্তু চোর না শোনে ধর্মের কাছিনী।) আপনার প্রাণের কসম তারা আপন নেশায় প্রমত্ত ছিল। অতএব সূর্যোদয় হতে হতে ভীষণ শব্দ তাদেরকে চেপে ধরল।

(এ হচ্ছে **مشرقيين** এর তরজমা। এর আগে **مبشرين** শব্দ বলা হয়েছে, যার অর্থ 'ভোর হতে হতে'। উভয় অর্থের সমন্বয় এভাবে সম্ভবপর যে, ভোর থেকে শুরু হয়ে সূর্যোদয় পর্যন্ত শেষ হয়েছে।) অতঃপর (এই ভীষণ শব্দের পর) আমি এই জনপদে (যমীন উল্টিয়ে তার) উপরিভাগকে নিচে (এবং নিচের ভাগকে উপরে) করে দিলাম এবং তাদের উপর কংকর প্রস্তর বর্ষণ করতে শুরু করলাম। এ ঘটনায় চক্ষুমানদের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে। (যেমন প্রথমত মন্দ কাজের পরিণাম অবশেষে মন্দ হয়। কিছু দিনের অবকাশ পেলে তাতে ধোঁকা খাওয়া উচিত নয়। দ্বিতীয়ত, চিরস্থায়ী ও অক্ষয় সুখ এবং ইশ্ব্যত একমাত্র আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ও তাঁর আনুগত্যের উপর নির্ভরশীল। তৃতীয়ত, আল্লাহর কুদরতকে মানুষের শক্তি-সামর্থ্যের নিরিখে বিচার করে ধোঁকায় পড়া উচিত নয়। সব কিছুই আল্লাহর কুদরতের অধীন। তিনি বাহ্যিক কারণের বিপরীতেও যা ইচ্ছা করতে পারেন।)

### আনুমানিক ক্রান্তব্য বিষয়

রসূলুল্লাহ (সা)-র বিশেষ সম্মান :

— **لَعْمَرَى**

রাহুল মা'আনীতে

অধিক সংখ্যক তফসীরবিদের উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে যে,

**لَعْمَرَى**-এর মধ্যে

রসূলুল্লাহ (সা) কে সম্বোধন করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর আয়ুর কসম খেয়েছেন। বায়হাকী দালামোলুন্নবুওয়াত গ্রন্থে এবং আবু নয়ীম ও ইবনে মরদুওয়াইহ্ প্রমুখ তফসীরবিদ হযরত ইবনে আক্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তা'আলা সমগ্র সৃষ্টজগতের মধ্যে কাউকে মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)-র চাইতে অধিক সম্মান ও মর্যাদা দান করেন নি। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা কোন পয়গম্বর অথবা ক্ষেত্রের তার আয়ুর কসম খাননি। এবং আগ্রোচ্য আয়াতে রসূলুল্লাহ (সা)-র আয়ুর কসম খেয়েছেন। এটা রসূলুল্লাহ (সা)-র প্রতি চূড়ান্ত সম্মান প্রদর্শন ছাড়া আর কিছু নয়।

আল্লাহ্ বাতীত অন্যের কসম খাওয়া : আল্লাহর নাম ও গুণাবলী ছাড়া অন্য কোন কিছুই কসম খাওয়া কোন মানুষের জন্য বৈধ নয়। কেননা, কসম এমন জনের খাওয়া হয়, যাকে সর্বাধিক বড় মনে করা হয়। বলা বাহুল্য, সর্বাধিক বড় একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই হতে পারেন।

রসূলুল্লাহ (সা) বলেন : পিতামাতা ও দেবদেবীর নামে কসম খেয়ো না এবং আল্লাহ্ ছাড়া কোন কিছুই কসম খেয়ো না। আল্লাহর কসমও তখনই খেতে পার যখন তুমি নিজ বক্তব্যে সত্যবাদী হও।---(আবু দাউদ, নাসায়ী)



বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে, একবার রসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত ওমর (রা)-কে পিতার কসম খেতে দেখে বললেন : খবরদার, আল্লাহ্ তা'আলা পিতার কসম খেতে নিষেধ করেছেন। কারও কসম করতে হলে আল্লাহ্‌র নামে কসম করবে। নতুবা চূপ থাকবে।

—( কুরতুবী-মায়োদা )

কিন্তু এ বিধান সাধারণ সৃষ্টজীবের জন্য। আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং সৃষ্টজীবের মধ্য থেকে বিভিন্ন বস্তুর কসম খেয়েছেন। এটা তাঁর বৈশিষ্ট্য। এর উদ্দেশ্য কোন বিশেষ দিক দিয়ে ঐ বস্তুর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহোপকারী হওয়া বর্ণনা করা। যে কারণে সাধারণ মানুষকে আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের কসম খেতে নিষেধ করা হয়েছে, তা এক্ষেত্রে বিদ্যমান নেই। কেননা আল্লাহ্ তা'আলার কালামে এরূপ কোন সন্তাবনা নেই যে, তিনি নিজের কোন সৃষ্ট বস্তুকে সর্বাধিক বড় ও শ্রেষ্ঠ মনে করবেন। কারণ, মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র সত্তার জন্য নির্দিষ্ট।

যেসব বস্তির উপর আযাব এসেছে, সেগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত :

ان في ذلك لآياتٍ للمتوسمين وانها ليهيولون منهم

তা'আলা সেসব জনপদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। আরব থেকে সিরিয়া যাওয়ার পথে এসব জনপদ অবস্থিত। এতদসঙ্গে আরও বলেছেন যে, এগুলোতে চক্ষুমান ব্যক্তিদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার অপার শক্তির বিরাট নিদর্শনাবলী রয়েছে।

অন্য এক আয়াতে এসব জনপদ সম্পর্কে আরও বলেছেন যে, لَمْ تَسْكُنْ مِنْ بَعْدِ

هَمْ اَلَا قَلِيلاً ---অর্থাৎ এসব জনপদ আল্লাহ্‌র আযাবের ফলে জনশূন্য হওয়ার

পর পুনর্বাস আবাদ হয়নি। তবে কয়েকটি জনপদ এর ব্যতিক্রম। এ সমষ্টি থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা এ সব জনপদ ও তাদের ঘর-বাড়ীকে ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য শিক্ষার উপকরণ করেছেন।

এ কারণেই রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন এসব স্থান অতিক্রম করেছেন, তখন আল্লাহ্‌র ভয়ে তাঁর মস্তক নত হয়ে গেছে এবং তিনি সওয়ারীর উটকে শ্রুত হাঁকিয়ে সেসব স্থান পান্ন হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। তাঁর এ কর্মের ফলে একটি সুন্নত প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। তা এই যে, যেসব স্থানে আল্লাহ্ তা'আলার আযাব এসেছে, সেগুলোকে তামাশার ক্ষেত্রে পরিণত করা খুবই পামাণ হাদয়েত কাজ। বরং এগুলো থেকে শিক্ষা লাভ করার পছা এই যে, সেখানে পৌঁছে আল্লাহ্ তা'আলার অপার শক্তির কথা ধ্যান করতে হবে এবং অন্তরে তাঁর আযাবের ভীতি সঞ্চার করতে হবে।

কোরআন পাকের বক্তব্য অনুমারী মৃত (আ)-এর ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদসমূহ আজও আরব থেকে সিরিয়াগামী রাস্তার পাশে জর্দানের এলাকায় সমুদ্রের উপরিতাগ থেকে যথেষ্ট

নিচের দিকে একটি বিরাট মরুভূমির আকারে বিদ্যমান রয়েছে। এর একটি বিরাট পরিধিতে বিশেষ এক প্রকার পানি নদীর আকার ধারণ করে আছে। এ পানিতে কোন মাছ, ব্যাঙ, ইত্যাদি জন্তু জীবিত থাকতে পারে না। এ জন্যই একে 'মৃত সাগর' ও 'মৃত সাগর' নামে অভিহিত করা হয়। অনুসন্ধানের পর জানা গেছে যে, এতে পানির অংশ খুব কম এবং তৈল জাতীয় উপাদান অধিক পরিমাণে বিদ্যমান। তাই এতে কোন সামুদ্রিক জন্তু জীবিত থাকতে পারে না।

আজকাল প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের পক্ষ থেকে এখানে কিছুসংখ্যক আবাসিক দালানকোঠা ও হোটেল নির্মাণ করা হয়েছে। পরকাল থেকে উদাসীন বস্তুবাদী মানুষ একে পর্যটন ক্ষেত্রে পরিণত করে রেখেছে। তারা নিছক তামাশা হিসেবে এ সব এলাকা দেখার জন্য গমন করে। এহেন উদাসীনতার প্রতিকারার্থে কোরআন পাক অবশেষে বলেছে : **انْفِي**

**ذٰلِكَ لَايَةَ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ** — অর্থাৎ এসব ঘটনা ও ঘটনাস্থল প্রকৃতপক্ষে অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন

মু'মিনদের জন্য শিক্ষাদায়ক। একমাত্র ঈমানদাররাই এ শিক্ষা দ্বারা উপকৃত হয় এবং অন্যরা এসব স্থানকে নিছক তামাশার দৃষ্টিতে দেখে চলে যায়।

وَاِنْ كَانَ اَصْحَبُ الْاٰيٰتِ لَظٰلِمِيْنَ ۝ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَانْتَهٰمًا  
 لِّبٰمٰمِهِمْ ۝ وَلَقَدْ كَذَّبَ اَصْحٰبُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِيْنَ ۝  
 وَاتَيْنَهُمْ اٰيٰتِنَا فَاكٰنُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ۝ وَكَانُوْا يَنْحِتُوْنَ  
 مِّنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا اٰمِنِيْنَ ۝ فَاَخَذْنٰهُمُ الصِّيْحَةَ مُصْبِحِيْنَ ۝ فَمَا  
 اَعْنٰ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝ وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ  
 وَمَا بَيْنَهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ ۝ وَاِنَّ السَّاعَةَ لٰتِيَةٌ ۝ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ  
 الْجَمِيْلَ ۝ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيْمُ ۝

(৭৮) নিশ্চয় গহীন বনের অধিবাসীরা পাপী ছিল। (৭৯) অতঃপর আমি তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিয়েছি। উক্তর বস্তি প্রকাশ্য রাস্তার উপর অবস্থিত। (৮০) নিশ্চয় হিজরের বাসিন্দারা পন্থগমনের প্রতি মিথ্যারোপ করেছে। (৮১) আমি তাদেরকে নিজের নিদর্শনাবলী দিয়েছি। অতঃপর তারা এগুলো থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

(৮২) তারা পাহাড়ে নিশ্চিত মর খোদাই করত। (৮৩) অতঃপর এক প্রত্যুষে তাদের উপর একটা শব্দ এসে আঘাত করল। (৮৪) তখন কোন উপকারে আসল না যা তারা উপার্জন করেছিল। (৮৫) আমি নভোমণ্ডল, জুমণ্ডল এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী যা আছে তা তাৎপর্যহীন সৃষ্টি করিনি। কিয়ামত অবশ্যই আসবে। অতঃপর পরম ঔদাসীন্যের সাথে ওদের ক্রিয়াকর্ম উপেক্ষা করলাম। (৮৬) নিশ্চয় আপনার পালনকর্তাই স্রষ্টা, সর্বজ্ঞ।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যনের অধিবাসী ও হিজ্‌রের অধিবাসীদের কাহিনী : এবং যনের অধিবাসীরা [ অর্থাৎ শোয়াইব (আ)-এর উম্মতও ] বড় যালিম ছিল। অতঃপর আমি তাদের কাছ থেকে (ও) প্রতিশোধ নিয়েছি (এবং তাদেরকে আযাব দ্বারা ধ্বংস করেছি)। উভয় (সম্প্রদায়ের) জনপদ প্রকাশ্য সড়কের উপর (অবস্থিত) রয়েছে। (সিরিয়া যাওয়ার পড়ে তা দৃষ্টিগোচর হয়।) এবং হিজ্‌রের অধিবাসীরা (ও) পয়গম্বরগণকে মিথ্যা বলেছে। [ কারণ, সালেহ্ (আ)-কে তারা মিথ্যা বলেছে আর যেহেতু সব পয়গম্বরের ধর্ম এক, কাজেই তারা যেন সব পয়গম্বরকেই মিথ্যা বলে। ] আমি তাদেরকে নিজের পক্ষ থেকে নিদর্শনাবলী দিয়েছি [ যেগুলো দ্বারা আল্লাহ্‌র একত্ব এবং সালেহ্ (আ)-এর নবুয়ত প্রমাণিত হত। উদাহরণত তওহীদের প্রমাণাদি এবং সালেহ্ (আ)-এর মু'যিজাত তথা উক্‌তী। ] অতঃপর তারা এগুলো (অর্থাৎ নিদর্শনাবলী) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তারা পর্বত খোদাই করে তাতে গৃহ নির্মাণ করত, যাতে (এগুলোতে বিপদাপদ থেকে) শান্তিতে বসবাস করতে পারে। অতঃপর তাদেরকে প্রত্যুষে (প্রত্যুষের শুরুতে কিংবা সূর্যোদয়ের পর) বিকট শব্দ এসে পাকড়াও করল। অতঃপর তাদের (পার্শ্ব) নৈপুণ্য তাদের কোন কাজে লাগল না (মজবুত গৃহের মধ্যেই আযাব দ্বারা ধ্বংস হলে এবং তাদের গৃহ এ বিপদ থেকে তাদেরকে বাঁচাতে পারল না। তাদের বরং এরূপ বিপদ আসবে বলে কল্পনাই ছিল না। থাকলেও বা কি করতে পারত।)

### আনুমানিক জ্ঞাতব্য বিষয়

﴿٨٥﴾ — শব্দের অর্থ বন ও ঘন জঙ্গল। কেউ কেউ বলেন : মাদইয়ানের সন্নিকটে একটি বন ছিল। এজন্য মাদইয়ানবাসীদেরই উপাধি হচ্ছে ﴿٨٥﴾। কেউ কেউ বলেন : আসহাবে-আইকা ও আসহাবে-মাদইয়ান দুটি পৃথক পৃথক সম্প্রদায়। এক সম্প্রদায় ধ্বংস হওয়ার পর শোয়াইব (আ) অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরিত হন।

তফসীর রূহুল মা'আনীতে ইবনে আসাকেরের বরাত দিয়ে নিম্নোক্ত মরফু হাদীসটি বর্ণনা করা হয়েছে :

ان مدین و امصا ب لا یکتا من ان بعث الله نعا لى الیهما

شعبها و الله اعلم

'হিজ্র' হিজায ও সিরিয়ার মধ্যস্থলে অবস্থিত একটি উপত্যকাকে বলা হয়। এখানে সামুদ গোত্রের বসতি ছিল।

সূরার শুরুতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি মক্কার কাফিরদের তীব্র শত্রুতা ও বিরোধিতা বর্ণিত হয়েছিল। এর সাথে সংক্ষেপে তাঁর সাম্বন্ধনার বিষয়বস্তুও উল্লেখ করা হয়েছিল। এখন সূরার উপসংহারে উপরোক্ত শত্রুতা ও বিরোধিতা সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাম্বন্ধনার বিস্তারিত বিষয়বস্তু উল্লেখ করা হচ্ছে। বলা হয়েছে :

### অবশিষ্ট তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং [ হে মুহাম্মদ (সা) আপনি তাদের শত্রু তার কারণে দুঃখিত হবেন না। কেননা এক দিন এর মীমাংসা হবে। সেদিন হচ্ছে কিয়ামতের দিন, যার আগমন সম্পর্কে আমি আপনাকে বলছি যে, ] আমি নাভোমণ্ডল এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী বস্তু-সমূহকে উপকারিতা ছাড়াই সৃষ্টি করিনি, (বরং এই উপকারার্থে সৃষ্টি করেছি যে, এগুলোকে দেখে মানুষ বিশ্ব স্রষ্টার অস্তিত্ব, একত্ব ও মহত্ব সপ্রমাণ করবে এবং তাঁর বিধি-বিধান পালন করবে। পক্ষান্তরে এ প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও যারা এরূপ করবে না, তারা শাস্তিপ্ৰাপ্ত হবে।) এবং (দুনিয়াতে সম্পূর্ণ শাস্তি হয় না। কাজেই অন্য কোথাও হওয়া উচিত। এর জন্য কিয়ামত নির্দিষ্ট রয়েছে। সুতরাং ) অবশ্যই কিয়ামত আগমন করবে। (সেখানে সবাইকে ভোগানো হবে। অতএব আপনি মোটেই দুঃখিত হবেন না ; বরং ) উত্তম পন্থায় ( তাদের অনাচার ) মার্জনা করুন। ( মার্জনায় উদ্দেশ্য এই যে, এ চিন্তায় পড়বেন না এবং এ ব্যাপারে ভাববেন না। উত্তম পন্থা এই যে, অভিযোগও করবেন না। কেননা ) নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা (যেহেতু ) মহান স্রষ্টা, (এ থেকে প্রমাণিত হয় যে ) তিনি অত্যন্ত জানী ( ও । সবার অবস্থা তিনি জানেন—আপনার সবরের এবং তাদের অনাচার উভয়টিই । আর ওদের নিকট থেকে পূর্ণ প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন। )

وَلَقَدْ آتَيْنَكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ۝ لَا تَمُدَّنَّ

عَيْنِيكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَاهُ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَخَفَضْ

جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ ۝ كَمَا

أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ ۝ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ۝ قَوْمَكَ

لَسَأَلْتَهُمْ أَجْمَعِينَ ۝ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ فَاصْدَعْ بِمَا

تُؤْمَرُ وَاعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ۝ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ۝

الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿٧٩﴾ وَلَقَدْ نَعَلَّمَ  
 آتَاكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿٨٠﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ  
 السَّاجِدِينَ ﴿٨١﴾ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴿٨٢﴾

(৮৭) আমি আপনাকে সাতটি বার বার পঠিতব্য আয়াত এবং মহান কোরআন দিয়েছি। (৮৮) আপনি চক্ষু তুলে ঐ বস্তুর প্রতি দেখবেন না, যা আমি তাদের মধ্যে কয়েক প্রকার লোককে ভোগ করার জন্য দিয়েছি, তাদের জন্য চিহ্নিত হবেন না আর ঈমানদারদের জন্য স্বীয় বাহু নত করুন। (৮৯) আর বলুন : আমি প্রকাশ্য জ্ঞান প্রদর্শক। (৯০) যেমন আমি নামিল করেছি যারা বিভিন্ন মতে বিভক্ত তাদের উপর। (৯১) যারা কোরআনকে খণ্ড খণ্ড করেছে। (৯২) অতএব আপনার পালনকর্তার কসম, আমি অবশ্যই ওদের সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করব (৯৩) ওদের কাজকর্ম সম্পর্কে। (৯৪) অতএব আপনি প্রকাশ্যে শুনিতে দিন যা আপনাকে আদেশ করা হয় এবং মুশরিকদের পরওয়া করবেন না। (৯৫) বিদ্রূপকারীদের জন্য আমি আপনার পক্ষ থেকে যথেষ্ট। (৯৬) যারা আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্য সাব্যস্ত করে। অতএব অতিসঙ্কর তারা জেনে নেবে। (৯৭) আমি জানি যে, আপনি তাদের কথাবার্তা হতোদায় হয়ে পড়েন। (৯৮) অতএব আপনি পালনকর্তার সৌন্দর্য স্বরণ করুন এবং সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান। (৯৯) এবং পালনকর্তার ইবাদত করুন, যে পর্যন্ত আপনার কাছে নিশ্চিত কথা না আসে।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং (আপনি তাদের ব্যবহার দেখবেন না। কারণ, তা দুঃখের কারণ হয়। আমার ব্যবহার আপনার সাথে দেখুন যে, আমার পক্ষ থেকে আপনার প্রতি কিরূপ কৃপা ও অনুকম্পা হয়েছে। সেমতে) আমি আপনাকে (একটি বিরাট নিয়ামত অর্থাৎ) সাতটি আয়াত দিয়েছি, যা (নামায়ে) বার বার আবৃত্তি করা হয় এবং (তা মহান বিষয়বস্তু সম্বলিত হওয়ার কারণে এ দেওয়ার একরূপ বলা যেতে পারে যে, মহান কোরআন দিয়েছি। (এখানে সূরা ফাতিহা বোঝানো হয়েছে। একটি মহান সূরা হওয়ার কারণে এর নাম উম্মুল কোরআনও অর্থাৎ কোরআনের মূল। সুতরাং এই নিয়ামত ও নিয়ামতদাতার প্রতি দৃষ্টি রাখুন, যাতে আপনার অন্তর প্রফুল্ল ও প্রশান্ত হয়। তাদের শত্রুতা ও বিরোধিতার প্রতি জুক্ষেপ করবেন না এবং) আপনি চক্ষু তুলেও ঐ বস্তুর প্রতি দেখবেন না (না আফসোসের দৃষ্টিতে এবং না অসন্তুষ্টির দৃষ্টিতে) যা আমি বিভিন্ন প্রকার কাফিরদেরকে (যেমন ইহুদী, খৃস্টান, অগ্নিপূজারী ও মুশরিকদেরকে) ভোগ করার জন্য দিয়ে রেখেছি (এবং অতিশয় তাদের হাত ছাড়া হয়ে যাবে) এবং তাদের (কুফুরী অবস্থার) কারণে (মোটাই) চিন্তা করবেন না। (অসন্তুষ্টির

দৃষ্টিতে দেখার অর্থ এই যে, তারা আলাহ্‌র দৃশ্যময় বিধায় 'বুগ্ম ফিল্লাহ' বশত রাগান্বিত হওয়া যে, এরূপ নিয়ামত তাদের কাছে না থাকলে ভাল হত। এর জওয়াবের প্রতি <sup>مَعْدَا</sup> **لَا تَحْزَن** বাক্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এটা কোন বিরাট ধনসম্পদ নয় যে, তাদের কাছে না থাকলে ভাল হত। এটা তো ধ্বংসশীল সম্পদ, অতি শূন্য হাত ছাড়া হয়ে যাবে। আফসোসের দৃষ্টিতে দেখার অর্থ এই যে, আফসোস, এসব বস্তু তাদের জীমানের পথে বাধা হয়ে রয়েছে। এগুলো না থাকলে সম্ভবত তারা বিশ্বাস স্থাপন করত। **لَا تَحْزَن** এ এর উত্তর

রয়েছে। এর ব্যাখ্যা এই যে, শত্রুতা এদের স্বভাবধর্ম। এদের কাছ থেকে কোন আশাই করা যায় না। আশার বিপরীত হলে চিন্তা করা হয়। যখন আশাই নেই, তখন চিন্তা অনর্থক। আপনার পক্ষ থেকে জোড়-লাজসার দৃষ্টিতে দেখার তো সম্ভাবনা নেই। মোটকথা, আপনি কোন দিক দিয়েই এ কাফিরদের চিন্তা-ভাবনায় পড়বেন না) এবং মুসলমানদের সাথে সদয় ব্যবহার করুন। (অর্থাৎ কল্যাণ চিন্তা ও দয়ার জন্য মুসলমানরা যথেষ্ট। এতে তাদের উপকারও রয়েছে) এবং (কাফিরদের জন্য কল্যাণ চিন্তা করে যেহেতু কোন ফল পাওয়া যাবে না, তাই তাদের প্রতি ক্রোধও করবেন না। তবে প্রচার কাজ আপনার মহান দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালন করতে থাকুন এবং এতটুকু বলে দিন : আমি (তোমাদের আলাহ্‌-হর আমাবের) সুস্পষ্ট জীতিপ্রদর্শক। (এবং আমি আলাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকে একথা তোমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিচ্ছি যে, আমার পয়গম্বর যে আমাবের ভয় দেখান, আমি কোন সময়ে তোমাদের উপর তা অবশ্যই নাযিল করব) যেমন আমি (এই আমাব) তাদের ওপর (বিভিন্ন সময়ে) নাযিল করেছি, যারা (আলাহ্‌র বিশ্বি-বিধান কে) ভাগ-বাটোয়ারা করে রেখেছিল অর্থাৎ ঐশীপ্রস্থের বিভিন্ন অংশ স্থির করেছিল (তন্মধ্যে যে অংশ মজিমাফিক হত তা মেনে নিত এবং সে অংশ মজির খিলাফ হত, তা অব্যাকার করত। এখানে পূর্ববর্তী ইহুদী ও খৃস্টানদেরকে বোঝানো হয়েছে। পয়গম্বরগণের বিরোধিতার কারণে তাদের উপর বিভিন্ন আমাব অবতরণ — যেমন আকৃতি পরিবর্তন করে বানর ও শূকরে পরিণত করা, জেল, হত্যা ইত্যাদি সুবিদিত ছিল। উদ্দেশ্য এই যে, আমাব নাযিল হওয়া অসম্ভব নয়। পূর্বেও নাযিল হয়েছে। তোমাদের উপরেও নাযিল হয়ে গেলে তাতে আশ্চর্যের কি আছে— দুনিয়াতে হোক কিংবা পরকালে। উপরোক্ত বক্তব্য থেকে জানা গেল যে, পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের বিরোধিতার কারণে যেমন আমাবের হোগ্য হয়েছিল, তেমনি বর্তমান লোকেরাও আমাবের হোগ্য হয়ে গেছে।) অতএব [হে মুহাম্মদ(স)] আপনার পালনকর্তার (অর্থাৎ আমার নিজের) কসম, আমি সবাই (পূর্ববর্তী ও পরবর্তী)—কে তাদের কাজকর্ম সম্পর্কে (কিয়ামতের দিন) অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করব (অতঃপর প্রত্যেককে তার উপযুক্ত শাস্তি দেব।) মোটকথা, আপনাকে যে বিশ্বাসের (অর্থাৎ যে বিশ্বাস পৌঁছানোর) আদেশ দেওয়া হয়েছে, তা পরিষ্কার করে শুনিতে দিন এবং (যদি তারা না মানে, তবে) মুশরিকদের (এ অবশ্যিতার মোটেই) পরওয়া করবেন না (অর্থাৎ দুঃখ করবেন না, যেমন পূর্বে বলা হয়েছে

**لَا تَحْزَن**

এবং স্বাভাবিকভাবে জীত হবেন না, শত্রুরা সংখ্যায় অনেক।

কেননা) এরা যারা (আপনার ও আল্লাহ্‌র দূশমন; অতএব আপনার সাথে) বিদ্রুপ করে (এবং) আল্লাহ্‌ তা'আলার সাথে অন্য উপাস্য শরীক করে, তাদের (অনিষ্ট ও পীড়ন) থেকে আপনার জন্য (অর্থাৎ আপনাকে নিরাপদ রাখার জন্য এবং তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য) আমিই যথেষ্ট। অতএব তারা অতিসহ্বর জানতে পারবে (যে, বিদ্রুপ ও শিরকের কি পরিণাম হয়। মোটকথা, আমি যখন যথেষ্ট তখন ডগ্ন কিসের?) এবং নিশ্চয় আমি জানি যে, তারা যেসব (কুফুরী ও বিদ্রুপের) কথাবার্তা বলে, তাতে আপনার মন ছোট হয়ে যায়। (এটা স্বাভাবিক) অতএব (এর প্রতিকার এই যে, ) আপনি পালনকর্তার তসবীহ্ ও প্রশংসা পাঠ করতে থাকুন, নামায আদায়কারীদের মধ্যে থাকুন এবং আপন পালনকর্তার ইবাদতে লেগে থাকুন, যে পর্যন্ত (এ অবস্থার মধ্যেই) আপনার মৃত্যু না এসে যায়। (অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত শিরক ও ইবাদতে মশগুল থাকুন। কেননা আল্লাহ্‌র মিকর ও ইবাদতে পরকালের সওয়াব তো পাওয়াই যায়, এর ফলে দুনিয়ার কষ্ট, চিন্তা এবং বিপদাপদও লাঘব হয়ে যায়।)

### আনুশঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

সূরা ফাতিহা সমগ্র কোরআনের মূল অংশ ও সারমর্ম : আলোচ্য আয়াতসমূহে সূরা ফাতিহাকে 'মহান কোরআন' বলার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সূরা ফাতিহা এক দিক দিয়ে সমগ্র কোরআন। কেননা, ইসলামের সব মূলনীতি এতে ব্যক্ত হয়েছে।

হাশরে কি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ হবে? : উল্লিখিত আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা নিজ পবিত্র সন্তান কসম খেয়ে বলেছেন যে, সকল পূর্ববর্তী ও পরবর্তী লোককে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

সাহাবায়ে কিরাম রসুলুল্লাহ (স)-কে প্রশ্ন করলেন যে, এই জিজ্ঞাসাবাদ কি বিষয় সম্পর্কে হবে? তিনি বললেন : লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌র উক্তি সম্পর্কে। তফসীর কুরতুবীতে এই রেওয়াজে বর্ণনা করে বলা হয়েছে : আমাদের মতে এর অর্থ অঙ্গীকারকে কার্য-ক্ষেত্রে পূর্ণ করা, যার শিরোনাম হচ্ছে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌।' শুধু মৌখিক উচ্চারণ উদ্দেশ্য নয়। কেননা মৌখিক স্বীকারোক্তি তো মুনাক্করও করত। হযরত হাসান বসরী (রহ) বলেন, ঈমান কোন বিশেষ বেশভূষা ও আকার-আকৃতি ধারণ করা দ্বারা এবং ধর্ম শুধু কামনা দ্বারা গঠিত হয় না। বরং ঐ বিশ্বাসকে ঈমান বলা হয়, যা অন্তরের অন্তঃস্থলে আসন লাভ করে এবং কর্ম তার সত্যায়ন করে; যেমন স্বায়েদ ইবনে আরকাম বর্ণিত এক হাদীসে রসুলুল্লাহ (স) বলেন, যে ব্যক্তি আন্তরিকতা সহকারে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌' উচ্চারণ করবে, সে অবশ্যই জান্নাতে যাবে। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করলেন : ইয়া রসুলুল্লাহ্‌ এ বাক্যে আন্তরিকতার অর্থ কি? তিনি বললেন : যখন এ বাক্য মানুষকে আল্লাহ্‌র হারাম ও অবৈধ কর্ম থেকে বিরত রাখবে, তখন তা আন্তরিকতা সহকারে হবে।—(কুরতুবী)

আম্মাত নাম্বিল হওয়ার পূর্বে রসূলুল্লাহ (সা) ও সাহাবায়ে কিরাম গোপনে গোপনে ইবাদত ও তিলাওয়াত করতেন এবং প্রচারকর্মও সংগোপনে একজন দুইজনের মধ্যে চালু ছিল। কেননা খোলাখুলি প্রচারকার্যে কাফিরদের পক্ষ থেকে উৎপীড়নের আশংকা ছিল। এ আম্মাতে আল্লাহ তা'আলা ঠাট্টা-বিদ্রুপকারী ও উৎপীড়নকারী কাফিরদের উৎপীড়ন থেকে নিরাপদ রাখার দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করেছেন। তাই তখন থেকে নিশ্চিত প্রকাশ্যভাবে তিলাওয়াত, ইবাদত ও প্রচারকার্য শুরু হয়।

لَا كُفْيُنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ — বাক্যে ঈদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের

নেতা ছিল পাঁচ ব্যক্তি : আস ইবনে ওয়াল্লের, আসওয়াদ ইবনে মুত্তালিব, আসওয়াদ ইবনে আবদে এয়াত্তস, ওলীদ ইবনে মুগীরা এবং হারিস ইবনে তালাতিনা। এই পাঁচজনই অলৌকিকভাবে একই সময়ে হযরত জিবরাঈলের হস্তক্ষেপে মৃত্যুবরণ করে। এ ঘটনা থেকে প্রচার ও দাওয়াতের ক্ষেত্রে এই নীতি জানা গেল যে, যেক্ষেত্রে প্রকাশ্যভাবে সত্যকথা বললে কোন উপকার আশা করা যায়না, পরন্তু বক্তার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকা থাকে, সেখানে গোপনে সত্য প্রচার করাও দুরন্ত ও বৈধ। তবে যখন প্রকাশ্যভাবে বলার শক্তি অর্জিত হয়, তখন প্রকাশ্যভাবেই বলা উচিত।

শহুর উৎপীড়নের কারণে মন ছোট হওয়ার প্রতিকার :

وَلَقَدْ نَعَلَم

আম্মাত থেকে জানা গেল যে, কেউ যদি শহুর অন্যায় আচরণে মনে কষ্ট পায় এবং হত্বোদ্যম হয়ে পড়ে, তবে এর আত্মিক প্রতিকার হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার তসবীহ ও ইবাদতে মশগুল হয়ে যাওয়া। আল্লাহ স্বয়ং তার কষ্ট দূর করে দেবেন।



# সূরা নাহল

মক্কান অবতীর্ণ, ১২৮ আয়াত, ১৬ রুকু

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ۗ سُبْحٰنَهُ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُونَ ①  
يُنزِلُ الْمَلٰٓئِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ  
أَنْ أَنْذِرُوا ۗ وَأِنَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ ②

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১) আল্লাহর নির্দেশ এসে গেছে। অতএব এর জন্য তাড়াহুড়া করো না। ওরা যেসব শরীক সাব্যস্ত করছে সেসব থেকে তিনি পবিত্র ও বহু উর্ধে। (২) তিনি স্বীয় নির্দেশে বান্দাদের মধ্যে যার কাছে ইচ্ছা, নির্দেশসহ ফেরেশতাদেরকে এই মর্মে নাযিল করেন যে, হ' শিয়ার করে দাও, আমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। অতএব আমাকে ভয় কর।

## তফসীরের সার-সংক্ষেপ

[এ সূরার নাম সূরা নাহল। এরূপ নামকরণের হেতু এই যে, এ সূরার প্রকৃতির আশ্চর্যজনক কারিগরি বর্ণনা প্রসঙ্গে নাহল অর্থাৎ মধু-মক্ষিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এর অপর নাম সূরা নিজামও।—(কুরতুবী) نَهْمٌ (নিজাম) শব্দটি

নিজামতের বহুবচন। কারণ এ সূরার বিশেষভাবে আল্লাহ তা'আলার মহান নিয়ামত-সমূহ বর্ণিত হয়েছে। ]

আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ (অর্থাৎ কাফিরদের শাস্তির সময় নিকটে) এসে গেছে। অতএব তোমরা একে (অবিস্বাসের ভঙ্গিতে) দ্রুত কামনা করো না। (বরং তওহীদ অবলম্বন কর এবং আল্লাহর স্বরূপ শোন যে) তিনি লোকদের শিরক থেকে পবিত্র ও উর্ধে। তিনি ফেরেশতাদেরকে (অর্থাৎ ফেরেশতাদের জাত তথা জিবরাঈলকে) ওহী অর্থাৎ নির্দেশ দিয়ে বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা, (অর্থাৎ পরগণার প্রতি) নাযিল করেন

(এবং নির্দেশ এই) যে, লোকদেরকে হুঁশিয়ার করে দাও যে, আমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। অতএব আমাকেই ভয় কর। (অর্থাৎ আমার সাথে কাউকে অংশীদার করো না, করলে শাস্তি হবে।)

### আনুমানিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ সূরাকে বিশেষ কোন ভূমিকা ছাড়াই কঠোর শাস্তির সতর্কবাণী ও উদ্ভাবন শিরোনামে শুরু করা হয়েছে। এর কারণ ছিল মুশরিকদের এই উক্তি যে, মুহাম্মদ (সা) আমাদেরকে কিয়ামত ও আমাদের ভয় দেখায় এবং বলে যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে জম্মী করা এবং বিরোধীদেরকে শাস্তি দেওয়ার ওয়াদা করেছেন। আমাদের তো এরূপ কিছু ঘটবে বলে মনে হয় না। এর উত্তরে বলা হয়েছে : আল্লাহর নির্দেশ এসে গেছে। তোমরা তাড়াহুড়া করো না।

'আল্লাহর নির্দেশ' বলে এখানে এ ওয়াদা বোঝানো হয়েছে, যা আল্লাহ তা'আলা রসূল (সা)-এর সাথে করেছেন যে, তাঁর শত্রুদেরকে পরাভূত করা হবে এবং মুসলমানরা বিজয়, সাহায্য ও সম্মান-প্রতিপত্তি লাভ করবে। এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ভীতিপ্রদ স্বরে বলেছেন যে, আল্লাহর নির্দেশ এসে গেছে অর্থাৎ আসার পথেই রয়েছে, যা তোমরা অতিসত্বর দেখে নেবে।

কেউ কেউ বলেন যে, এখানে 'আল্লাহর নির্দেশ' বলে কিয়ামত বোঝানো হয়েছে। এর এসে যাওয়ার অর্থও এই যে, আসা অতি নিকটবর্তী। সমগ্র জগতের বয়সের দিক দিয়ে দেখলে কিয়ামতের নিকটবর্তী হওয়া কিংবা এসে পৌঁছাও দূরবর্তী বিষয় নয়।

—( বাহরে মুহীত )

পরবর্তী বাক্যে বলা হয়েছে : আল্লাহ তা'আলা শিরক থেকে পবিত্র। এর উদ্দেশ্য এই যে, তারাসে আল্লাহর ওয়াদাকে ভ্রান্ত সাব্যস্ত করছে, এটা কুফুরী ও শিরক। আল্লাহ তা'আলা এ থেকে পবিত্র।—( বাহরে-মুহীত )

একটি কঠোর সতর্কবাণীর মাধ্যমে তওহীদের দাওয়াত দেওয়া এই আয়াতের সারমর্ম। বিভিন্ন আয়াতে ইতিহাসগত দলীল দ্বারা তওহীদ প্রমাণিত হয়েছে যে, আদম (আ) থেকে শুরু করে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) পর্যন্ত দুনিয়ার বিভিন্ন ভূখণ্ডে এবং বিভিন্ন সময়ে যে রসূলই আগমন করেছেন। তিনি জনসমক্ষে তওহীদের বিশ্বাসই পেশ করেছেন। অথচ বাহ্যিক উপাস্যাদির মাধ্যমে এক জনের অবস্থা ও শিক্ষা অন্য জনের মোটেই জানা ছিল না। চিন্তা করুন কমপক্ষে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার মহাপুরুষ, যারা বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন দেশে এবং বিভিন্ন ভূখণ্ডে জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁরা সবাই যখন একই বিশ্বাসের প্রবক্তা, তখন স্বভাবতই মানুষ একথা বুঝতে বাধ্য হয় যে, বিশ্বাসটি ভ্রান্ত হতে পারেনা। বিশ্বাস স্থাপনের জন্য এককভাবে এ সৃষ্টিটিও স্বত্বাধীন।

আয়াতে ﴿ ۝ ۱ ﴾ শব্দ বলে হযরত ইবনে আব্বাসের মতে ওহী এবং অন্যান্য তফসীরবিদের মতে হিদায়েত বোঝানো হয়েছে।—( বাহর ) এ আয়াতে তওহীদের

ইতিহাসগত প্রমাণ পেশ করার পর পরবর্তী আয়াতসমূহে তওহীদের বিশ্বাসকে যুক্তি-  
গতভাবে আত্মা তা'আলার বিভিন্ন নিয়ামত বর্ণনা করে প্রমাণ করা হচ্ছে।

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ تَعْلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝ خَلَقَ  
الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ ۖ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ۝ وَالْأَنْعَامَ  
خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۝ وَلَكُمْ فِيهَا  
جِبَالٌ حِجِينَ تَرْيَحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ۝ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ  
يَكْدِلُمْ تَكَوُّنًا ۖ إِلَيْهِ إِلَّا يَشِيقُ ۖ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَوْفٌ رَحِيمٌ ۖ  
وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ۚ وَيَخْلُقُ مَا  
لَا تَعْلَمُونَ ۝

(৩) যিনি স্বথাবিধি আকাশরাজি ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন। তারা যাকে  
শরীক করে তিনি তার বহু উর্ধ্বে (৪) তিনি মানবকে এক ফোঁটা বীর্ষ থেকে সৃষ্টি  
করেছেন। এতদসত্ত্বেও সে প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী হয়ে গেছে। (৫) চতুস্পদ জন্তুকে  
তিনি সৃষ্টি করেছেন। এতে তোমাদের জন্য শীত বস্ত্রের উপকরণ আছে, আর অনেক  
উপকার হয়েছে এবং কিছু সংখ্যককে তোমরা আহায়ে পরিণত করে থাক। (৬) এদের  
দ্বারা তোমাদের সম্মান হয়, যখন বিকালে চারণ ভূমি থেকে নিয়ে আস এবং সকালে  
চারণ ভূমিতে নিয়ে যাও। (৭) এরা তোমাদের বোঝা এমন শহর পর্যন্ত বহন করে  
নিয়ে যায়, যেখানে তোমরা প্রাণান্তকর পরিশ্রম ব্যতীত পৌঁছতে পারতে না। নিশ্চয়  
তোমাদের প্রভু অভ্যন্ত দয়ালু পরম দয়ালু। (৮) তোমাদের আরোহণের জন্য এবং  
শোভার জন্য তিনি ঘোড়া, শব্দর ও গাধা সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি এমন জিনিস  
সৃষ্টি করেন, যা তোমরা জান না।

শব্দার্থ : <sup>SA</sup> خَصِيمٌ শব্দটি <sup>SA</sup> خَصِيمَةٌ থেকে উদ্ভূত। অর্থ বাগড়াটে। الْعَام

শব্দটি <sup>SA</sup> نَفِيمٌ এর বহুবচন। এর অর্থ উট, ছাগল, গরু, ইত্যাদি চতুস্পদ জন্তু—  
(মুকরাদাত-রাগিব)

و. এর অর্থ উত্তাপ ও উত্তাপ লাভ করার বস্তু। অর্থাৎ পশম, যশদ্বারা গরম

বস্তু তৈরী করা হয়। **سَرَّاحٌ** শব্দটি **سَرَّاحُونَ** থেকে **سَرَّاحٌ** শব্দটি থেকে উদ্ভূত। চতুস্পদ জন্তুর সকাল বেলায় চারণ ক্ষেত্রে গমনকে **سَرَّاحٌ** এবং বিকাল বেলায় গৃহে প্রত্যাবর্তনকে **رَوَّاحٌ** বলা হয়। **مَنْ لَّا نَفْسَ** এর অর্থ প্রাপ্যস্তকর পরিশ্রম।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(আল্লাহ তা'আলা) নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলকে রহস্য সহকারে সৃষ্টি করেছেন। তিনি ওদের শিরক থেকে পবিত্র। তিনি মানুষকে বীর্য থেকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর সে প্রকাশ্যভাবে (আল্লাহর সত্তা ও শুণাবলী সম্পর্কে) তর্ক করতে লাগল। (অর্থাৎ কিছু মানুষ এমনও হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আমার পক্ষ থেকে নিয়ামত আর মানুষের পক্ষ থেকে অকৃতজ্ঞতা।) এবং তিনিই চতুস্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন। এগুলোতে তোমাদের শীতেরও উপকরণ আছে। (জন্তুদের পশম ও চামড়া দ্বারা মানুষের পশ্মিধের পোশাক এবং কাপড় তৈরী হয়।) এবং আরও অনেক উপকারিতা আছে (দুধ দোহন, সওয়ারী করা, বোঝা পরিবহন ইত্যাদি।) এবং এগুলোর মধ্য থেকে (যেগুলো খাওয়ার যোগ্য, সেগুলোকে) ভক্ষণও কর। এগুলো তোমাদের শোভাও, যখন বিকাল বেলায় (চারণ ভূমি থেকে গৃহে) আনি এবং যখন সকাল বেলায় (গৃহ থেকে চারণ ভূমিতে) ছেড়ে দাও। এগুলো তোমাদের বোঝাও (বহন করে,) এমন শহরে নিয়ে যায়, যেখানে তোমরা প্রাপ্যস্তকর পরিশ্রম বাতীত পৌঁছতে পার না। নিশ্চয় তোমাদের পালনকর্তা অত্যন্ত স্নেহশীল, দয়ালু (তোমাদের সুখের জন্য তিনি কত কিছু সৃষ্টি করেছেন)। ঘোড়া, খচ্চর ও গাধাও সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা এগুলোয় সওয়ার হও এবং শোভার জন্যও। তিনি এমন এমন বস্তু (তোমাদের যানবাহন ইত্যাদির জন্য) সৃষ্টি করেন, যেগুলো তোমাদের জানাও নেই।

### আনুশঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিশ্বয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে সৃষ্ট জগতের মহান নিদর্শনাবলী দ্বারা তওহীদ সপ্রমাণ করা হয়েছে। সর্বপ্রথম সৃষ্টবস্তু নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর মানব সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে, যার সেবায় আল্লাহ তা'আলা সৃষ্ট জগতকে নিয়োজিত করেছেন। মানবের সৃচনা যে একফোঁটা নিকৃষ্ট বীর্য থেকে হয়েছে, একথা বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে : **فَاَنزَلْنَاهُ مَاءً غَافِقًا فَاَخْرَجْنَا مِنْهُ خَلْقًا مُّسْتَكْبِرًا** — অর্থাৎ এই দুর্বল মানবকে যখন বর্ষা ও বাকশক্তি দান করা হল, তখন সে আল্লাহর সত্তা ও শুণাবলী সম্পর্কেই বিতর্ক উত্থাপন করতে লাগল।

এরপর ঐসব বস্তু সৃষ্টি করার কথা বলা হয়েছে, যেগুলো মানুষের উপকারার্থেই বিশেষভাবে সৃজিত হয়েছে। কোরআন সর্বপ্রথম আরববাসীকেই সম্বোধন করেছিল। আরবদের জীবিকার প্রধান অবলম্বন ছিল উট, গরু, ছাগল ইত্যাদি গৃহপালিত চতুস্পদ জন্তু। তাই প্রথমে এসবের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে : **وَالْاَنْعَامَ خَلَقْنَا**



وَ الْخَيْلَ وَ الْبُهَالَ وَ لَ وَ لِحِمَمٍ لَتَرَكِبُوهَا وَ زِينَةً

—অর্থাৎ আমি ঘোড়া,

খচ্চর ও গাধা সৃষ্টি করেছি, যাতে তোমরা এগুলোতে সওয়ার হও—বোঝা বহনের কথাও প্রসঙ্গত এর মধ্যে এসে গেছে এবং তোমাদের শোভা ও সৌন্দর্যের উপকরণ হওয়াও এগুলোকে সৃষ্টি করার অন্যতম কারণ। এখানে 'শোভা' বলে ঐ শান-শওকত বোঝানো হয়েছে, যা সর্বসাধারণের মধ্যে মালিকদের জন্য বর্তমান থাকে।

কোরআনে রেল, মোটর ও বিমানের উল্লেখ : সওয়ারীর তিনটি জন্তু ঘোড়া, খচ্চর ও গাধার কথা বিশেষভাবে বর্ণনা করার পর পরিশেষে অন্যান্য যানবাহন সম্পর্কে ভবিষ্যত

পদবাচ্য ব্যবহার করে বলা হয়েছে : وَ يَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ — অর্থাৎ আল্লাহ

তা'আলা ঐসব বস্তু সৃষ্টি করবেন, যেগুলো তোমরা জান না। এখানে ঐ সব নবাবিষ্কৃত যানবাহন ও গাড়ী বোঝানো হয়েছে, যেগুলোর অস্তিত্ব প্রাচীনকালে ছিল না। যেমন রেল, মটর, বিমান ইত্যাদি; যেগুলো এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে, এ ছাড়া ভবিষ্যতে যেসব যানবাহন আবিষ্কৃত হবে, সেগুলোও এর অন্তর্ভুক্ত। কেননা, প্রকৃতপক্ষে এগুলো সর্বশক্তিমান স্রষ্টার কাজ। এতে প্রাচীন ও আধুনিক বিজ্ঞানের কাজ এতটুকুই যে, বিজ্ঞানীরা প্রকৃতি প্রদত্ত জ্ঞানবুদ্ধির সাহায্যে প্রকৃতির সৃজিত ধাতব পদার্থসমূহে জোড়াতালি দিয়ে বিভিন্ন কলকল্লা তৈরী করেছে। অতঃপর তাতে প্রকৃতিপ্রদত্ত বায়ু, পানি, অগ্নি ইত্যাদি থেকে বৈদ্যুতিক প্রবাহ সৃষ্টি করেছে, কিংবা প্রকৃতি প্রদত্ত খনি থেকে পেট্রোল বের করে এসব যানবাহনে ব্যবহার করেছে। প্রাচীন ও আধুনিক বিজ্ঞান একজোটে হয়েও কোন জোহা, পিতল সৃষ্টি করতে পারে না এবং এলুমিনিয়াম জাতীয় কোন হালকা ধাতু তৈরী করতে পারে না। এমনিভাবে বায়ু ও পানি সৃষ্টি করাও তার সাধ্যাতীত। প্রকৃতির সৃজিত শক্তিসমূহের ব্যবহার শিক্ষা করাই তার একমাত্র কাজ। জগতের যাবতীয় আবিষ্কার এ ব্যবহারেরই বিস্তারিত বিবরণ। তাই সামান্য চিন্তা করলেই একথা স্বীকার করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না যে, যাবতীয় নতুন আবিষ্কার পরম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলারই সৃষ্টি।

এখানে বিশেষভাবে প্রাধান্যযোগ্য বিষয় এই যে, পূর্বোল্লিখিত সব বস্তুর সৃষ্টির ক্ষেত্রে অতীত পদবাচ্য ব্যবহার করে خَلَقَ বলা হয়েছে এবং প্রসিদ্ধ যানবাহন উল্লেখ করার পর ভবিষ্যত পদবাচ্য ব্যবহার করে يَخْلُقُ বলা হয়েছে। এ পরিবর্তন থেকে ফুটে উঠেছে যে, এ শব্দটি ঐসব যানবাহন সম্পর্কিত যেগুলো এখন পর্যন্ত অস্তিত্ব লাভ করেনি এবং আল্লাহ তা'আলা জানেন যে, ভবিষ্যতে কি কি যানবাহন সৃষ্টি করতে হবে। এ সংক্ষিপ্ত বাক্যে তিনি সেগুলো উল্লেখ করে দিয়েছেন।

ভবিষ্যতে যেসব যানবাহন আবিষ্কৃত হবে আল্লাহ তা'আলা আল্লাতে সেগুলোর নামও উল্লেখ করতে পারতেন। কিন্তু তখনকার দিনে যদি রেল, মটর, বিমান ইত্যাদি শব্দ উল্লেখও করতেন, তবে তাতে সন্মোখিতদের মস্তিষ্কের পক্ষে হতবুদ্ধিতা ছাড়া কোন লাভ

হত না। কেননা তখন এমন জিনিসের কল্পনা করাও মানুষের জন্য সহজ ছিল না। উপরোক্ত যানবাহন বোঝানোর জন্য এসব শব্দ তখন কোথাও ব্যবহৃত হত না। ফলে এগুলোর কোন অর্থই বোঝা যেত না।

আমার শ্রদ্ধের পিতা হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াসীন সাহেবের মুখে শুনেছি হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব সাহেব নানুতুজী (র) বলতেন : কোরআন পাকে রেলের উল্লেখ রয়েছে। তিনি এর প্রমাণ হিসাবে আলোচ্য আয়াতটি পেশ করতেন। তখন পর্যন্ত মোটর গাড়ীর ব্যাপক প্রচলন ছিল না এবং বিমান আবিষ্কৃতই হয়নি। তাই তিনি শুধু রেলের কথাই বলতেন।

মাঙ্গ'আলা : কোরআন পাক প্রথমে **انعام** অর্থাৎ উট, গরু-ছাগল ইত্যাদির কথা উল্লেখ করেছে এবং এদের উপকারিতাসমূহের মধ্যে মাংস ভক্ষণকেও একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকারিতা সাব্যস্ত করেছে। এরপর পৃথকভাবে বলেছে : **وَالْخَيْلَ وَالْإِبْهَالَ**

**وَالْحَمِيرَ**---এসব উপকারিতাসমূহের মধ্যে সওয়ার হওয়া এবং এসবের দ্বারা শোভা অর্জনের

কথা তো উল্লেখ হয়েছে ; কিন্তু গোশত ভক্ষণের কথা বলা হয়নি। এতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ঘোড়া, খচ্চর ও গাধার গোশত হালাল নয়। খচ্চর ও গাধার গোশত যে হারাম, এ বিষয়ে জমহুর ফিকাহবিদগণ একমত। একটি স্বতন্ত্র হাদীসে এগুলোর অবৈধতা পরিষ্কার ভাষায় বর্ণিত হয়েছে ; কিন্তু ঘোড়ার ব্যাপারে দু'টি পরস্পর বিরোধী হাদীস বর্ণিত আছে। একটি দ্বারা হালাল ও অপরটি দ্বারা হারাম হওয়া বোঝা যায়। একারণেই এ ব্যাপারে ফিকাহবিদগণের উক্তি বিভিন্ন রূপ হয়ে গেছে। কারও মতে হালাল এবং কারও মতে হারাম। ইমাম আযম আবু হানীফা (র) এই পরস্পরবিরোধী প্রমাণের কারণে ঘোড়ার মাংসকে গাধা ও খচ্চরের মাংসের অনুরূপ হারাম বলেন নি কিন্তু মাকরুহ বলেছেন।

---(আহ্ কামুল কোরআন—জাসসাস)

মাঙ্গ'আলা : এ আয়াত থেকে সৌন্দর্য ও শোভার বৈধতা জানা যায় যদিও গর্ব ও অহংকার করা হারাম। পার্থক্য এই যে, শোভা ও সৌন্দর্যের সারমর্ম হচ্ছে মনের খুশী অথবা আত্মাহুঁর নিয়ামত প্রকাশ করা। এতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মনে মনে নিজেকে নিয়ামতের যোগ্য হকদার মনে করে না এবং অপরকেও নিকৃষ্ট জ্ঞান করে না ; বরং তাঁর দৃষ্টিতে একথাই থাকে যে, এটা আত্মাহুঁর নিয়ামত। পক্ষান্তরে গর্ব ও অহংকারের মধ্যে নিজেকে নিয়ামতের যোগ্য হকদার গণ্য করা হয় এবং অপরকে নিকৃষ্ট জ্ঞান করা---এটা হারাম।

---(বয়ানুল কোরআন)

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ  
أَجْمَعِينَ

(৯) সরল পথ আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছে এবং পথগুলোর মধ্যে কিছু বক্র পথও রয়েছে। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের সবাইকে সৎ পথে পরিচালিত করতে পারতেন।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং (পূর্বাণর প্রমাণাদি দ্বারা ধর্মের যে) সরল পথ প্রমাণিত হয়, তা বিশেষ করে আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছে এবং কিছু (যেগুলো ধর্মের বিপরীত) বক্র পথও আছে (যে, এগুলো দিয়ে আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভবপর নয়। অতএব কেউ কেউ সরল পথে চলে এবং কেউ কেউ বক্র পথে।) এবং যদি আল্লাহ্ চাইতেন, তবে তোমাদের সবাইকে (মন্বিলে) মকসুদে পর্যন্ত পৌঁছে দিতেন। (কিন্তু তিনি তাকেই পৌঁছান, যে সরল পথ অশ্বেষণ করে

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنَّا فَسَبَّوهُم سَبًّا مِّنَّا

নিয়ে চিন্তাভাবনা করা এবং সত্য অশ্বেষণ করা তোমাদের কর্তব্য, যাতে তোমরা মন্বিলে মকসুদ পর্যন্ত পৌঁছতে পার।)

### আনুশঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলার মহান অবদানসমূহ উল্লেখ করে তও-হীদের প্রমাণাদি সন্নিবেশিত করা হয়েছে। পরবর্তী আয়াতসমূহেও এসব নিয়ামত বর্ণিত হয়েছে। মাঝখানে এ আয়াতটি 'মধ্যবর্তী বাক্য' হিসাবে এনে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা পূর্ব ওস্বাদার কারণে মানুষের জন্য সরল পথ প্রতিষ্ঠাত করার দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করেছেন। এ পথ সোজা আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছবে। এ কারণেই আল্লাহ্‌র অবদানসমূহ পেশ করে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও তওহীদের প্রমাণাদি সন্নিবেশিত করা হচ্ছে।

কিন্তু এর বিপরীতে কিছুসংখ্যক লোক অন্যান্য বক্র পথও অবলম্বন করে রেখেছে। তারা এসব সুস্পষ্ট আয়াত ও প্রমাণ দ্বারা উপকার লাভ করেনা; বরং পথভ্রষ্টতার আবার্তে ঘোরাক্ষেরা করে।

এরপর বলা হয়েছে: যদি আল্লাহ্ চাইতেন তবে সবাইকে সরল পথে চলতে বাধ্য করতে পারতেন; কিন্তু রহস্য ও যৌক্তিকতার তাগিদ ছিল এই যে, জোরজবরদস্তি না করে উভয় প্রকার পথই সামনে উন্মুক্ত করে দেওয়া, অতঃপর যে যে পথে চলতে চায় চলুক। সরল পথ আল্লাহ্ ও জ্ঞানাত পর্যন্ত পৌঁছাবে এবং বক্র পথ জাহান্নামে নিয়ে যাবে। এখন মানুষকে তিনি ক্ষমতা দিয়ে দিয়েছেন যে, স্বেচ্ছায় যে পথ ইচ্ছা, সে তা বেছে নিতে পারে।

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجْرٌ فِيهِ  
تِسْمُونَ ۝ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَ



الْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٥٠﴾  
 وَسَخَّرْنَا لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ  
 بِأَمْرِ رَبِّكَ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٥١﴾ وَمَا ذَرَأْنَا لَكُمْ  
 فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانَهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ﴿٥٢﴾  
 وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِنَاكُلُوا مِنْهُ لِحُبِّ الْطَبِيبِ وَأَنْتُمْ تَخْرِجُونَ  
 مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِدَ فِيهِ وَلِتُنَبِّئُوا  
 مَنْ فُضِّلَ بِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٥٣﴾ وَالْقُرْآنُ فِي الْأَرْضِ يَرَوُاسِي أَنْ تُبَدَّ  
 بِكُمْ وَالنَّهْرُ أَوْ سَبِيلًا لَعَلَّكُمْ تُهْتَدُونَ ﴿٥٤﴾ وَعَلَّمْتِمْ هُوَ بِالنَّجْمِ هُمْ  
 يَهْتَدُونَ ﴿٥٥﴾

(১০) তিনি তোমাদের জন্য আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন। এই পানি থেকে তোমরা পান কর এবং এ থেকেই উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়, যাতে তোমরা পশু চারণ কর। (১১) এ পানি দ্বারা তোমাদের জন্য উৎপাদন করেন ফসল, ঘনত্ব, খেজুর আজুর ও সর্বপ্রকার ফল। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীলদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। (১২) তিনিই তোমাদের কাজে নিয়োজিত করেছেন রাত্রি, দিন, সূর্য এবং চন্দ্রকে। তারকাসমূহ তাঁরই বিধানে কর্মে নিয়োজিত রয়েছে। নিশ্চয়ই এতে বোধশক্তি সম্পন্নদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে। (১৩) তোমাদের জন্য পৃথিবীতে যে সব রঙ-বেরঙের বস্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন, সেগুলোতে নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য যারা চিন্তাভাবনা করে। (১৪) তিনিই কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন সমুদ্রকে, যাতে তা থেকে তোমরা তাজা মাংস খেতে পার এবং তা থেকে বের করতে পার পরিধেয় অলংকার। তুমি তাতে জলযানসমূহকে পানি চিরে চলতে দেখবে এবং যাতে তোমরা আল্লাহর রূপা অন্বেষণ কর এবং যাতে তার অনুগ্রহ স্বীকার কর। (১৫) এবং তিনি পৃথিবীর উপর বোঝা রেখেছেন যে, কখনো যেন তা তোমাদেরকে নিয়ে হেলে-দুলে না পড়ে এবং নদী ও পথ তৈরী করেছেন, যাতে তোমরা পথ প্রদর্শিত হও। (১৬) এবং তিনি পথনির্দেশক বহু চিহ্ন সৃষ্টি করেছেন, এবং তারকা দ্বারাও মানুষ পথের নির্দেশ পায়।

## তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তিনি (আল্লাহ্) এমন, যিনি তোমাদের (উপকারের) জন্য আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, যা থেকে তোমরা পান কর এবং মন্দারী বৃক্ষ (উৎপন্ন) হয়, যার মধ্যে তোমরা (গৃহপালিত জন্তুদেরকে) চরাও (এবং) এই পনি দ্বারা তোমাদের (উপকারের) জন্য ফসল যত্ন, খেজুর, আঙ্গুর ও প্রত্যেক ফল (মাটি থেকে) উৎপাদন করেন। নিশ্চয় এতে (অর্থাৎ উল্লিখিত বিষয়ের মধ্যে) চিন্তাশীলদের জন্য (তওহীদের) প্রমাণ (বিদ্যমান) আছে এবং তিনি (আল্লাহ্) তোমাদের (উপকারের) জন্য রাত্রি, দিবস, সূর্য ও চন্দ্রকে (স্বীয় কুদরতের) অনুবর্তী করেছেন এবং (এমনিভাবে অন্যান্য) তারকারাজি (ও) তাঁর নির্দেশে (কুদরতের) অনুবর্তী। নিশ্চয় এতে (অর্থাৎ উল্লিখিত বিষয়েও) বুদ্ধিমানদের জন্য (তওহীদের) কতিপয় প্রমাণ (বিদ্যমান) রয়েছে এবং (এমনিভাবে) ঐসব বস্তুকেও (কুদরতের) অনুবর্তী করেছেন, যেগুলোকে তোমাদের (উপকারার্থে) বিভিন্ন প্রকারে (অর্থাৎ জাতে, শ্রেণীতে ও রকমে) সৃষ্টি করেছেন (সব জন্তু, উদ্ভিদ, জড়পদার্থ একক ও মিশ্রিত বস্তু এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে)। নিশ্চয় এতে (অর্থাৎ উল্লিখিত বিষয়েও) সমবাদারদের জন্য (তওহীদের) প্রমাণ (বিদ্যমান) রয়েছে। এবং তিনি (আল্লাহ্) এমন যে, তিনি সমুদ্রকে (-ও কুদরতের) অনুবর্তী করেছেন, যাতে এ থেকে তাজা তাজা গোশত (অর্থাৎ মাছ শিকার করে) খাও এবং (যাতে) এ থেকে (মোতির) অলংকার বের কর, যা তোমরা (নারী-পুরুষ সবাই) পরিধান কর এবং (হে সম্মোখিত ব্যক্তি, সমুদ্রের আরও একটি উপকার এই যে) তুমি নৌকাসমূহকে (ছোট কিংবা বড় জাহাজ হোক) এতে (অর্থাৎ সমুদ্রে) পানি চিরে চলে যেতে দেখ এবং (এ ছাড়া সমুদ্রকে এজন্য কুদরতের অনুবর্তী করেছেন) যাতে তোমরা (এতে পণ্যদ্রব্য নিয়ে সফর কর এবং এর মাধ্যমে) আল্লাহর দেওয়া রুহী অন্বেষণ কর এবং যাতে (এসব উপকার দেখে তাঁর) কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। তিনি পৃথিবীতে পাহাড় স্থাপন করেছেন, যাতে তা (অর্থাৎ পৃথিবী) তোমাদেরকে নিয়ে আন্দোলিত (ও টলটলায়মান) না হয় এবং তিনি (ছোটছোট) নদী ও পথ তৈরী করেছেন, যাতে (এসব পথের সাহায্যে) মন্থিলে মকসুদ পর্যন্ত পৌঁছতে পার এবং (পথের পরিচয়ের জন্য) বহু চিহ্ন রেখেছেন (যেমন পাহাড়, বৃক্ষ, দালান-কোঠা ইত্যাদি। এগুলো দ্বারা রাস্তা চেনা যায়। নতুবা ভূপৃষ্ঠ যদি একইরূপ সমতল হত তবে পথ চিনা কিছুতেই সম্ভবপর হত না।) এবং তারকারাজি দ্বারাও মানুষ রাস্তার পরিচয় লাভ করে। (এটা বর্ণনাসাপেক্ষ ও অজানা নয়)।

## আনুশঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

شَجْرٌ—مِنْهُ شَجْرٌ نَبِيَّةٌ تُسْمَعُونَ শব্দটি প্রায়ই বৃক্ষের অর্থে ব্যবহৃত হয়, যা

কাণ্ডের উপর দণ্ডায়মান থাকে। কোন কোন সময় এমন প্রত্যেক বস্তুকেও شَجْرٌ বলা হয় যা ভূপৃষ্ঠে উৎপন্ন হয়। ঘাস, লতা-পাতা ইত্যাদিও এর অন্তর্ভুক্ত থাকে। আলোচ্য আয়াতে এ অর্থই বোঝানো হয়েছে। কেননা, এরপরেই জন্তুদের চরার কথা বলা হয়েছে।

ঘাসের সাথেই এর বেশীর ভাগ সম্পর্ক

اسامة تسيمون

থেকে উদ্ভূত।

এর অর্থ জন্তকে চারণক্লেত্র চরার জন্য ছেড়ে দেওয়া।

ان في ذلك لاية لقوم يتفكرون ---এসব আয়াতে আল্লাহ তা'আলার

নিয়ামত এবং অভিনব রহস্য সহকারে জগৎ সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। যারা এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করে, তারা এমন সাক্ষ্য-প্রমাণ পায়, যার ফলে আল্লাহ তা'আলার তওহীদ যেন মূর্ত হয়ে চোখের সামনে ফুটে ওঠে। এ কারণেই নিয়ামতগুলো উল্লেখ করার বার বার এ বিষয়ের প্রতি হুঁশিয়ার করা হয়েছে। এ আয়াতের শেষে বলা হয়েছে যে, এতে চিন্তা-শীলদের জন্য প্রমাণ রয়েছে। কেননা, ফসল ও রক্ষ এবং এ সবের ফল ও ফুলের যে সম্পর্ক আল্লাহ তা'আলার কারিগরি ও রহস্যের সাথে রয়েছে তা কিছুটা চিন্তা-ভাবনার দাবী রাখে বৈ কি। মানুষের চিন্তা করা দরকার যে, শস্যকণা কিংবা আঁটি মাটির নিচে ফেলে রাখলে এবং পানি দিলে আপনা-আপনি বিরাট মহীরাহে পরিণত হতে পারে না এবং তা থেকে রঙ-বেরঙের ফুল উৎপন্ন হতে পারে না। যা হয়, তাতে কোন কৃষক ভূস্বামীর কর্মের দখল নেই। বরং সবই সর্বশক্তিমানের কারিগরি ও রহস্য। এরপর বলা হয়েছে যে, দিবারাত্র ও তারকারাজি আল্লাহ তা'আলার নির্দেশের অনুগত হয়ে চলে। শেষে বলা হয়েছে :

ان في ذلك لايات لقوم يعقلون ---অর্থাৎ এগুলোর মধ্যে বুদ্ধিমানদের

জন্য বহু প্রমাণ রয়েছে। এতে ইঙ্গিত আছে যে, এসব বস্তু যে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশের অনুবর্তী, তা বুঝতে তেমন চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন হয় না। যার সামান্যও বুদ্ধি আছে, সে বুঝে নিতে পারবে। কেননা, উদ্ভিদ ও রক্ষ উৎপাদনের মধ্যে তো কিছু না কিছু মানবীয় কর্মের দখল ছিল, এখানে তাও নেই।

এরপর মাটির অন্যান্য উৎপন্ন ফসলের কথা উল্লেখ করে অবশেষে বলা হয়েছে :

ان في ذلك لاية لقوم يذكرون ---অর্থাৎ এতে তাদের জন্য প্রমাণ

রয়েছে, যারা উপদেশ গ্রহণ করে। উদ্দেশ্য এই যে, এ ক্লেত্রও গভীর চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন নেই। কেননা, এটা সম্পূর্ণ জাক্জাল্যমান সত্য। কিন্তু মনোযোগ সহকারে এদিকে দেখা এবং উপদেশ গ্রহণ করা শর্ত। নতুবা কোন নির্বোধ ও নিশ্চিন্ত ব্যক্তি যদি এ দিকে লক্ষ্যই না করে, তবে তার কি উপকার হতে পারে?

سطر لكم الليل والنهار ---রাত্রি ও দিবসকে অনুবর্তী করার অর্থ এই

যে, এগুলোকে মানুষের কাজে নিয়োজিত করার জন্য স্বীয় কুদরতের অনুবর্তী করে দিয়েছেন।

রাশি মানুষকে আরামের সুযোগ-সুবিধা সরবরাহ করে এবং দিবস তার কাজকর্মের পথ প্রশস্ত করে। এগুলোকে অনুবর্তী করার অর্থ এরাপ নয় যে, রাশি ও দিবস মানুষের নির্দেশ মেনে চলবে।

هُوَ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ قِسْمًا زَكَاةً وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ قِسْمًا زَكَاةً ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ---নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃষ্ট বস্তু এবং

এগুলোতে মানুষের উপকার বর্ণনা করার পর এখন সমুদ্রগর্ভে মানুষের উপকারের জন্য কি কি নিহিত আছে, সেগুলো বর্ণনা করা হচ্ছে, সমুদ্রে মানুষের খাদ্যের চমৎকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখান থেকে মানুষ মাছের টাটকা গোশত লাভ করে।

لَقَدْ كَلَّمْنَا قَوْمًا لَّمْ يَكْفُرُوا بِاللَّهِ قَدْرًا ۖ وَأَنذَرْنَاهُمْ يَوْمَهُمْ وَأَنذَرْنَاهُمْ فَكَانُوا كَاذِبِينَ ---এ বাক্যে মাছকে টাটকা গোশত বলে

আখ্যায়িত করার ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, অন্যান্য জীবের ন্যায় মাছকে যবেহ করা শর্ত নয়। এ যেন আপনা-আপনি তৈরী গোশত।

وَتَسْتَخْرِجُوهَا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ قِسْمًا زَكَاةً ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ---এটা সমুদ্রের দ্বিতীয় উপকার।

ডুবুরীরা সমুদ্রে ডুব দিয়ে মূল্যবান অলংকার সামগ্রী বের করে আনে। **حَالِيَةً** এর শাব্দিক অর্থ শোভা, সৌন্দর্য। এখানে ঐ রত্নরাজি ও মণিমুক্তা বোঝানো হয়েছে, যা সমুদ্র-গর্ভ থেকে নির্গত হয় এবং মহিলারা এর দ্বারা অলংকার তৈরী করে গলায় অথবা অন্যান্য পন্থায় ব্যবহার করে। এ অলংকার মহিলারা পরিধান করে থাকে; কিন্তু কোরআন পুংলিঙ্গ শব্দ ব্যবহার করে **تَلْبَسُونَهَا** বলেছে। এতে ইঙ্গিত আছে যে, মহিলাদের অলংকার

পরিধান করা প্রকৃতপক্ষে পুরুষদের দেখার স্বার্থে। মহিলার সাজসজ্জা করাটা প্রকৃত-পক্ষে পুরুষের অধিকার। সে স্ত্রীকে সাজসজ্জার পোশাক ও অলংকার পরিধান করতে বাধ্যও করতে পারে। এছাড়া পুরুষরাও আংটি ইত্যাদিতে মণিমুক্তা ব্যবহার করতে পারে।

وَتَرَى الْفُلَ مَوْجًا كَخِرَافَةٍ تَلْبَهَاتٍ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ---এটা সমুদ্রের তৃতীয়

উপকার। **سَخَّرَ** এর বহুবচন **سَخَّرَ** শব্দের অর্থ নৌকা। **مَوْجًا** এর বহুবচন **مَوْجًا** এর অর্থ পানি ভেদ করা। অর্থাৎ ঐসব নৌকা ও সামুদ্রিক জাহাজ, যেগুলো পানির চেউ ভেদ করে পথ অতিক্রম করে।

আম্মাতের উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা সমুদ্রকে দূর-দূরান্তের দেশে সফর করার রাস্তা করেছেন এবং দূর-দূরান্তে সমুদ্রপথেই সফর করা ও পণ্যদ্রব্য আমদানী রফতানী করা সহজ করে দিয়েছেন। একে জীবিকা উপার্জনের একটি উত্তম উপায় সাব্যস্ত করেছেন। কেননা, সমুদ্রপথে ব্যবসা-বাণিজ্য করা সর্বাধিক লাভজনক।

رَأْسِيَّةٌ رَوَّاسِيٌّ—وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَّاسِيٌّ أَنْ تَهُدَّ رِجْمًا

এর বহুবচন। এর অর্থ ভারী পাহাড়। **رَوَّاسِيٌّ** শব্দটি **رَمَدٌ** থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ আন্দোলিত হওয়া এবং অস্থিরভাবে টলমল করা।

আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা অনেক রহস্যের অধীনে ভূ-মণ্ডলকে নিবিড় ও ভারসাম্যবিহীন উপাদান দ্বারা সৃষ্টি করেন নি। তাই এটা কোন দিক দিয়ে ভারী এবং কোন দিক দিয়ে হালকা হয়েছে। অন্যথায় এর অবশ্যস্বাভাবী পরিণতি ছিল, ভূ-পৃষ্ঠের অস্থিরভাবে আন্দোলিত হওয়া। সাধারণ বিজ্ঞানীদের ন্যায় পৃথিবীকে স্থিতিশীল স্বীকার করা হোক কিংবা কিছুসংখ্যক প্রাচীন ও আধুনিক বিজ্ঞানীর মত একে চক্রাকারে ঘূর্ণায়মান মনে করা হোক—উভয় অবস্থাতেই এটা জরুরী ছিল। এই অস্থিরতাজনিত নড়াচড়া বন্ধ করা এবং পৃথিবীর উৎপাদনকে ভারসাম্য পূর্ণ করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীতে পাহাড়ের ওজন স্থাপন করেন—যাতে পৃথিবী অস্থিরভাবে নড়াচড়া করতে না পারে। এখন পৃথিবী অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহের মত চক্রাকারে ঘূর্ণায়মান কি না, এ সম্পর্কে কোনরকম আন পাকে ইতিবাচক বা নেতিবাচক কোন কিছুই নেই। প্রাচীন দার্শনিকদের মধ্যে ক্রিসাগোসের অভিমত ছিল এই যে, পৃথিবী চক্রাকারে ঘূর্ণায়মান। আধুনিক বিজ্ঞানীরা সবাই এ ব্যাপারে একমত। নতুন গবেষণা ও অভিজ্ঞতা এ মতবাদকে আরও ভাঙ্গর করে তুলছে। পাহাড়ের সাহায্যে যে অস্থিরতাজনিত নড়াচড়া বন্ধ করা হয়েছে, তা পৃথিবীর জন্য অন্যান্য গ্রহের ন্যায় যে গতি প্রমাণ করা হয়, তার জন্য আরও অধিক সহায়ক হবে।

وَعَلَّمَ مَاتٍ ط وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ———ওপরে বাণিজ্যিক সফরের কথা

বলা হয়েছে। তাই এসব সুযোগ-সুবিধা উল্লেখ করাও এখানে সমীচীন মনে হয়েছে, যেগুলো আল্লাহ্ তা'আলা পথিকদের পথ অতিক্রম ও মনযিলে মকসুদে পৌঁছানোর জন্য

ভূ-মণ্ডলে ও নভোমণ্ডলে সৃষ্টি করেছেন। তাই বলা হয়েছে : **وَعَلَّمَ مَاتٍ** অর্থাৎ আমি

পৃথিবীতে রাস্তা চেনার জন্য পাহাড়, নদী, বৃক্ষ, দাঙ্গান-কোঠা ইত্যাদির সাহায্যে অনেক চিহ্ন স্থাপন করেছি। বলা বাহুল্য, ভূপৃষ্ঠ যদি একটি চিহ্নবিহীন পরিমণ্ডল হত তবে মানুষ কোন গন্তব্যস্থানে পৌঁছানোর জন্য পথিমধ্যে কতই না ঘুরপাক খেত।

وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ———অর্থাৎ পথিক যেমন ভূ-পৃষ্ঠের চিহ্নের দ্বারা

রাস্তা চেনে, তেমনি তারকারাজির সাহায্যেও দিক নির্ণয়ের মাধ্যমে রাস্তা চিনে নেয়। এ বক্তব্যে এদিকে ইঙ্গিত বোঝা যায় যে, তারকারাজি সৃষ্টি করার আসল উদ্দেশ্য অন্য কিছু হলেও রাস্তার পরিচয় লাভ করা এগুলোর অন্যতম উপকরিতা।

أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٥٠﴾ وَإِنْ تَعُدُّوا

نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُصَوِّهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا  
 تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ۝ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا  
 يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ۝ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ، وَمَا  
 يَشْعُرُونَ ۝ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ۝ إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ، قَالِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ  
 بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ۝ لَا جَرَمَ أَنَّ  
 اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۝ إِنَّهُ لَا

يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ۝

(১৭) যিনি হৃষ্টি করেন, তিনি কি সে লোকের সমতুল্য যে হৃষ্টি করতে পারে না? তোমরা কি চিন্তা করবে না? (১৮) যদি আল্লাহর নিয়ামত গণনা কর, শেষ করতে পারবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্রমাশীল, সমালু। (১৯) আল্লাহ্ জানেন যা তোমরা গোপন কর এবং যা তোমরা প্রকাশ কর। (২০) এবং যারা আল্লাহকে ছেড়ে অন্যদের ডাকে, ওরা তো কোন বস্তুই হৃষ্টি করে না; বরং ওরা নিজেরাই হৃষ্টিত। (২১) তারা মৃত—প্রাণহীন এবং কবে পুনরুজ্জীবিত হবে, জানে না। (২২) তোমাদের ইলাহ একক ইলাহ। জনতার যারা পরজীবনে বিশ্বাস করে না, তাদের অন্তর সত্যবিশুদ্ধ এবং তারা অহংকার প্রদর্শন করেছে। (২৩) নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তাদের গোপন ও প্রকাশ্য আবতীয় বিষয়ে অবগত। নিশ্চিতই তিনি অহংকারীদের পছন্দ করেন না।

তকসীয়ের সার-সংক্ষেপ

(যখন প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা উপরোক্ত বস্তুসমূহের হৃষ্টিकर्তা এবং তিনি একক তখন) যিনি হৃষ্টি করেন (অর্থাৎ আল্লাহ্) তিনি কি তার সমতুল্য হয়ে যাবেন, যে হৃষ্টি করতে পারে না? (যে তোমরা উত্তরকে উপাস্য মনে করতে থাকবে। এতে করে আল্লাহ্ তা'আলাকে অপমান করা হয়। কেননা, এভাবে তাঁকে মুক্তি-বিগ্রহের সমতুল্য করে দেওয়া হয়।) অতঃপর তোমরা কি (এতটুকুও) বোঝ না? (আল্লাহ্ তা'আলা উপরে তওহীদের প্রমাণাদি বর্ণনা প্রসঙ্গে যেসব নিয়ামতের উল্লেখ করেছেন, তাতেই নিয়ামত শেষ নয়; বরং তা এত অজস্র যে) যদি তুমি আল্লাহর নিয়ামত গণনা কর, তবে (কখনও) গণনা করতে পারবে না। (কিন্তু মুশরিকরা শোকার ও কদর করেন না। এটা এমন গুরুতর অপরাধ ছিল যে, ক্ষমা করলেও ক্ষমা হতো না এবং এ অবস্থা বিদ্যমান

থাকলে পরবর্তীকালে এসব নিয়ামত দেওয়া যেত না। কিন্তু) বাস্তবিকই আল্লাহ্ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (কেউ শিরক থেকে তওবা করলে তিনি ক্ষমা করে দেন এবং না করলেও জীবদ্দশায় সব নিয়ামত বন্ধ হয়ে যায় না।) এবং (হ্যাঁ, নিয়ামত চালু থাকার কারণে কারও এরূপ বোঝা উচিত নয় যে, কখনও শাস্তি হবে না; বরং পরকালে শাস্তি ভোগ করতে হবে। কেননা) আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য—সব অবস্থাই জানেন। (সুতরাং তদনুযায়ী শাস্তি দেবেন। এ হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলা যে স্রষ্টা ও নিয়ামত দাতা—এ বিষয়ের বর্ণনা।) এবং তারা আল্লাহকে ছেড়ে যাদের ইবাদত করে, তারা কোন বস্তু সৃষ্টি করতে পারে না এবং তারা স্বয়ং সৃজিত (উপরে সামগ্রিক নীতি বর্ণিত হয়েছে যে, যে স্রষ্টা নয় এবং যে স্রষ্টা এ দু'সত্তা সমান হতে পারে না। অতএব এরা কিরূপে ইবাদত পাওয়ার যোগ্য হতে পারে? এবং) তারা (মিথ্যা উপাস্যরা) মৃত, [নিষ্পাণ—যেমন মূর্তি চিরকাল তা প্রাণহীন থাকে, না হয় বর্তমানে যারা মরে গেছে তাদের মতন, না হয় যারা ভবিষ্যতে মৃত হবে যেমন জিন ও ঈসা (আ) প্রমুখ তাদের মতন—তারা] জীবিত নয়! (অতএব স্রষ্টা হবে কিরূপে?) এবং তাদের (অর্থাৎ মিথ্যা উপাস্যদের এতটুকুও) খবর নেই যে, (কিয়ামতে) মৃতরা কখন উদ্বৃত্ত হবে (কেউ কেউ তো জানই রাখে না এবং কেউ কেউ নিদ্রিষ্ট করে জানেও না। অথচ উপাস্যের সর্ব-ব্যাপী জ্ঞান থাকা আবশ্যিক; বিশেষত কিয়ামতের। কেননা, এতে ইবাদত করা না করার প্রতিদান হবে। অতএব উপাস্যের জন্য এর জ্ঞান থাকা খুবই যুক্তিমুক্ত। সুতরাং জানে আল্লাহর সমতুল্য কিরূপে হবে? এ বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হল যে) তোমাদের সত্য উপাস্য একই উপাস্য। অতএব (এ সত্য উদ্ঘাটনের পরও) যারা পরকালে বিশ্বাস স্থাপন করে না। (এবং এ কারণেই তারা ভীত হয়ে তওহীদ কবুল করে না; জানা গেল যে,) তাদের অন্তর (—ই এমন অযোগ্য যে, যুক্তিমুক্ত কথা) অস্বীকার করেছে—এবং (জানা গেল যে) তারা সত্য গ্রহণে অহংকার করছে। এতে সন্দেহের অবকাশ নেই যে, সত্য কথা আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সবার গোপন ও প্রকাশ্য অবস্থা জানেন (এবং এটাও) নিশ্চিত যে, তিনি অহংকারী-দেরকে পছন্দ করেন না। (সুতরাং তাদের অহংকার যখন জানা আছে, তখন তাদেরকেও অপছন্দ করবেন এবং শাস্তি দেবেন।)

### জানুশরিক জাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ামত এবং জগত সৃষ্টির কথা বিস্তারিত উল্লেখ করার পর এসব নিয়ামত বিস্তারিত বর্ণনা করার কারণ অর্থাৎ তওহীদের ব্যাপারে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, তিনি বাতীত কেউ ইবাদতের যোগ্য নন। তাই আলোচ্য আয়াতসমূহে বলা হয়েছে : যখন প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, আল্লাহ্ তা'আলাই এককভাবে নৈভো-মগল ও ভূ-মগল সৃষ্টি করেছেন, পাহাড় ও সমুদ্র সৃষ্টি করেছেন, উদ্ভিদ ও জীবজন্তু সৃষ্টি করেছেন এবং রক্ষণতা ও এর ফল-ফুল সৃষ্টি করেছেন, তখন এ পবিত্র সত্তা, যিনি এশুকোম্ব স্রষ্টা তিনি কি মূর্তি-বিগ্রহের সমতুল্য হয়ে যাবেন, যারা কোন কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না? অতএব তোমরা কি এতটুকুও বোঝ না?

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝  
 لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ وَمَنْ أَوْزَرَ إِلَّا الَّذِينَ  
 يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ الْأَسَاءَ مَا يَزُرُونَ ۝ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ  
 قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ  
 مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَنْتَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۝ ثُمَّ يَوْمَ  
 الْقِيَامَةِ يُخْزِبُهُمْ وَيَقُولُ آيُنَ شُرَكَائِي الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقِقُونَ  
 فِيهِمْ ۖ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ  
 عَلَى الْكَافِرِينَ ۝ الَّذِينَ تَتَوَقَّعُهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ ۖ  
 قَالُوا السَّلَامَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ ۖ بَلَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ  
 بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَلِيدِينَ فِيهَا ۖ  
 فَلَيْسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ ۝

(২৪) যখন তাদেরকে বলা হয় : তোমাদের পালনকর্তা কি নাখিল করেছেন ?  
 তারা বলে : পূর্ববর্তীদের কিসসা-কাহিনী। (২৫) ফলে কিয়ামতের দিন ওরা পূর্ণমাত্রায়  
 বহন করবে ওদের পাপভার এবং পাপভার তাদেরও, যাদেরকে তারা তাদের অজ্ঞাত  
 হেতু বিপথগামী করে। শুনে নাও, খুবই নিরুণ্ট বোঝা যা তারা বহন করে। (২৬)  
 নিশ্চয় চক্রান্ত করেছে তাদের পূর্ববর্তীরা, অতঃপর আল্লাহ তাদের চক্রান্তের ইয়ারতের  
 ভিত্তিমূলে আঘাত করেছিলেন। এরপর উপর থেকে তাদের মাথায় ছাদ ধসে পড়ে  
 গেছে এবং তাদের উপর আঘাত এসেছে যেখান থেকে তাদের ধারণাও ছিল না। (২৭)  
 অতঃপর কিয়ামতের দিন তিনি তাদেরকে লাস্থিত করবেন এবং বলবেন : আমার অংশী-  
 দাররা কোথায়, যাদের ব্যাপারে তোমরা খুব হঠকারিতা করতে ? যারা জ্ঞানপ্রাপ্ত  
 হয়েছিল, তারা বলবে : নিশ্চয়ই আজকের দিনে লাস্থনা ও দুর্গতি কাকিরদের জন্য,  
 (২৮) ফেরেশতারা তাদের জ্ঞান এমতাবস্থায় কবজ করে যে, তারা নিজেদের উপর জুলুম  
 করেছে। তখন তারা আনুগত্য প্রকাশ করবে যে, আমরা তো কোন মন্দ কাজ করতাম  
 না। হ্যাঁ, নিশ্চয় আল্লাহ সর্বিশেষ অবগত আছেন, যা তোমরা করতে। (২৯) অতএব



আহাম্মাদের দরজাসমূহে প্রবেশ কর, এতেই অনন্তকাল বাস কর। আর অহংকারীদের আবাসস্থল কতই নিকৃষ্ট!

তকসীরের সার-সংক্ষেপ

যখন তাদেরকে বলা হয় ( অর্থাৎ কোন অজ্ঞ ব্যক্তি জানার জন্য কিংবা ওয়াকিফ-হাল ব্যক্তি পরীক্ষা করার জন্য তাদেরকে জিজ্ঞেস করে : ) তোমাদের পালনকর্তা কি নাযিল করেছেন ? [ অর্থাৎ রসূলুল্লাহ ( সা ) কোরআন সম্পর্কে যা বলেন সেটা আলাহ্ কর্তৃক অবতীর্ণ—এ কথা কি সত্য ? ] তখন তারা বলে : ( আরে সেটা পালনকর্তা কর্তৃক অবতীর্ণ কোথায়, সেটা তো ) ভিত্তিহীন কল্পকাহিনী, যা পূর্ববর্তীদের কাছ থেকে ( বর্ণিত হয়ে ) চলে আসছে। ( অর্থাৎ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা পূর্ব থেকে তওহীদ, নব্বয়ত ও পরকালের দাবী করে আসছে। তাদের কাছ থেকেই সে-ও বর্ণনা করতে শুরু করেছে। এটা আলাহ্ প্রদত্ত বাণী নয়। ) এর ফল ( অর্থাৎ এরূপ বলার ফল ) হবে এই যে, তাদেরকে কিয়ামতের দিন নিজেদের গোনাহর পূর্ণ বোঝা এবং যাদেরকে তারা তাদের অজ্ঞতাবশত বিপথগামী করছে, তাদের গোনাহেরও কিছু বোঝা বহন করতে হবে। ( ‘পূর্ববর্তীদের কল্পকাহিনী’ বলাই বিপথগামী করার অর্থ। কেননা, এতে অন্যদের বিশ্বাস নষ্ট হয়। যে ব্যক্তি কাউকে বিপথগামী করেন—বিপথগামিতার কারণ হওয়ার দরুন সেও সমানভাবে গোনাহগার হবে। গোনাহর এই কারণজনিত অংশকে ‘কিছু পাপভার’ বলা হয়েছে। নিজের গোনাহ পুরোপুরি বহন করার বিষয়টি বর্ণনাসাপেক্ষ নয়। ) খুব মনে রাখ, যে বোঝা তারা বহন করছে, তা মন্দ বোঝা। ( অন্যদেরকে এ ধরনের কথা বলে বিপথগামী করার যে কৌশল তারা বের করেছে, তা সত্যের মুকাবিলায় কার্যকরী হবে না, বরং এর অভিশাপ ও শাস্তি তাদের ঘাড়ের চাপবে। সেমতে ) যারা তাদের পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে, তারা ( পয়গম্বরগণের মুকাবিলা ও বিরোধিতার ) বড় বড় চক্রান্ত করেছে। অতঃপর আলাহ্ তা’আলা তাদের ( চক্রান্তের ) তৈরী গৃহ সমূলে ভূমিসাৎ করে দিয়েছেন। অতঃপর ( তারা এমনভাবে ব্যর্থ হয়েছে যেন ) উপর থেকে তাদের মাথায় ( ঐ গৃহের ) ছাদ ধসে পড়েছে ( অর্থাৎ ছাদ ধসে পড়ার কারণে যেমন সবাই চাপা পড়ে যায়, এমনভাবে তারা সম্পূর্ণ ব্যর্থ মানোরথ হয়েছে। ) এবং ( ব্যর্থতা ছাড়াও ) তাদের উপর আলাহ্‌র আযাব এমনভাবে এসেছে যে, তাদের ধারণাও ছিল না। ( কেননা, তারা চক্রান্তে সফল হওয়ার আশায় ছিল। আশাতীতভাবে তাদের উপর ব্যর্থতা ছাড়াও আযাব এমনভাবে এসে গেছে যে, তাদের মস্তিষ্কে অনেক দূর পর্যন্তও এ ধারণা ছিল না। পূর্ববর্তী কাকিরদের উপর আযাব আসা সুবিদিত। এ হচ্ছে তাদের দুনিয়ার অবস্থা! ) অতঃপর কিয়ামতের দিন ( তাদের অবস্থা হবে এই যে, ) আলাহ্ তা’আলা তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন এবং ( একটি লাঞ্ছনা হবে এই যে, তাদেরকে ) বলবেন : ( তোমরা যে ) আমার অংশীদার, ( ঠাওনে রেখেছিলে ) যাদের সম্পর্কে তোমরা ( পয়গম্বর ও মু’মিনদের সাথে ) জগড়া-বিবাদ করত, ( তারা এখন ) কোথায় ? ( এ অবস্থা দেখে সত্যের ) জ্ঞান প্রাপ্তরা বলবে : আজ পূর্ণ লাঞ্ছনা ও আযাব কাকিরদের উপর বর্তাবে, যাদের প্রাণ ফেরেশতারা

কুফরী অবস্থায় কবজ করেছিল। ( অর্থাৎ শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত কাফির ছিল। কাফিরদের লান্দুনা খোলাখুলি ও সর্বসমক্ষে হবে, একথা বোঝানোর জন্য সম্ভবত জানীদের উক্তি মাঝখানে বর্ণনা করা হয়েছে।) অতঃপর কাফিররা ( শরীকদের জওয়াবে ) সজির প্রস্তাব রাখবে এবং বলবে যে, শিরক নিকৃষ্টতর মন্দ কাজ এবং আল্লাহ তা'আলার বিরুদ্ধাচরণ। আমাদের কি সাধ্য যে, তা করি! আমরা তো কোন খারাপ কাজ ( যাতে আল্লাহর সামান্যও বিরুদ্ধাচরণ হয় ) করতাম না। (একি সজির বিষয়বস্তু বলার কারণ এই যে, শিরক যা একটি নিশ্চিত বিরুদ্ধাচরণ, দুনিয়াতে তারা খুব জোরেশোরে এর স্বীকারোক্তি করত। যেমন, **لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا** শিরকের স্বীকারোক্তি মানেই বিরুদ্ধা-

চরণের স্বীকারোক্তি, বিশেষত পয়গম্বরগণের সাথে তারা প্রকাশ্য বিরোধিতার দাবীদার ছিল। কিয়ামতে এই শিরক অস্বীকার করে বিরোধিতা অস্বীকার করবে। তাই একে সক্তি বলা হয়েছে। তাদের এই অস্বীকার এমন, যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে : **وَاللَّهُ**

**رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ**

আল্লাহ তা'আলা তাদের এ উক্তি খণ্ডন করে বলবেন : ) ইয়া

( বাস্তবিকই তোমরা বিরুদ্ধাচরণের কাজ করেছ ) নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের কাজকর্ম সম্পর্কে সুবিজ্ঞ। অতএব জাহান্নামের দরজায় ( অর্থাৎ দরজা দিয়ে জাহান্নামে ) প্রবেশ কর ( এবং ) তাতে চিরকাল বাস কর। অতএব ( সত্য থেকে ) অহংকার ( বিরোধিতা ও মুকাবিলা )-কারীদের আবাস কতই না মন্দ ! ( এ হচ্ছে পরকালীন আযাবের বর্ণনা। অতএব আয়াতসমূহের সারমর্ম এই যে, তোমরা পূর্ববর্তী কাফিরদের ক্ষতি, ইহকাল ও পরকালের আযাবের অবস্থা শুনেছ। এমনিভাবে সত্যধর্মের মুকাবিলায় তোমরা যে চক্রান্ত করছ এবং মানুষকে বিপথগামী করছ, তোমাদের পরিণাম তাই হবে। )

### জানুয়ারিক জাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতরাজি এবং বিশ্ব সৃষ্টিতে তাঁর একক হওয়ার কথা বর্ণনা করে মুশরিকদের নিজেদের বিপথগামিতা বর্ণিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে অপরকে বিপথগামী করা ও তার শাস্তির বর্ণনা রয়েছে। এর পূর্বে কোরআন সম্পর্কে একটি প্রশ্ন রয়েছে। এ প্রশ্নটি এখানে মুশরিকদেরকে করা হয়েছে এবং তাদেরই মুখতাসুলজ উত্তর এখানে উল্লেখ করে তজ্জনা শাস্তির সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। পাঁচ আয়াত পরে এ প্রশ্নটিই ঈমানদার পরহিসগারদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে এবং তাদের উত্তর ও তজ্জনা পুরস্কারের ওয়াদা বর্ণিত হয়েছে।

কোরআন পাক এ কথা প্রকাশ করেনি যে, প্রশ্নকারী কে ছিল। তাই এ সম্পর্কে তফসীরবিদদের উক্তি বিভিন্ন রূপ। কেউ কাফিরদেরকে প্রশ্নকারী ঠাণ্ডিয়েছেন এবং কেউ মু'মিনদেরকে। কেউ এক প্রশ্ন মুশরিকদের এবং অপর প্রশ্ন মু'মিনদের সাব্যস্ত

করেছেন। কিন্তু কোরআন পাক একে অস্পষ্ট রেখে ইঙ্গিত করেছে যে, এ আলোচনায় যাওয়ার প্রয়োজনই বা কি? জওয়াব ও তার ফলাফল দেখা দরকার। কোরআন স্বয়ং তা বর্ণনা করে দিয়েছে।

মুশরিকদের পক্ষ থেকে জওয়াবের সারমর্ম এই যে, তারা একথাই স্বীকার করেনি যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন কালাম অবতীর্ণ হয়েছে। বরং তারা কোরআনকে পূর্ব-বর্তী লোকদের কল্পকাহিনী সাব্যস্ত করেছে। কোরআন পাক এজন্য তাদেরকে শাস্তির সতর্কবাণী শুনিয়েছে যে, জালিমরা কোরআনকে কিংসা-কাহিনী সাব্যস্ত করে অপরকেও বিপথগামী করে। তাদেরকে এর ফলাফল ভোগ করতে হবে। অর্থাৎ কিয়ামতের দিন তাদের গোনাহর শাস্তি তো তাদের ওপর পড়বেই, অধিকন্তু যাদেরকে তারা বিপথগামী করেছে, তাদের কিছু শাস্তিও তাদের উপর বর্তাবে। এরপর বলা হয়েছে : গোনাহর যে বোঝা তারা আপন পিঠে বহন করেছে, তা অত্যন্ত মন্দ বোঝা।

وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلْ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرٌ الَّذِينَ أَحْسَنُوا  
 فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۗ وَلَكِنَّ الْأَخْرَجَ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ  
 الْمُتَّقِينَ ۝ جِئْتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ  
 لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ ۗ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ ۝ الَّذِينَ  
 تَتَوَقَّعُهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ۖ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ  
 بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ  
 أَوْيَاتِي أَمْرٍ رَبِّكَ ۗ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ وَمَا  
 ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۝ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ  
 مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۝

(৩০) পরহিসগারদেরকে বলা হয় : তোমাদের পালনকর্তা কি নাযিল করেছেন ? তারা বলে : মহাকল্যাণ। যারা এ জগতে সংকাজ করে, তাদের জন্য কল্যাণ রয়েছে এবং পরকালের গৃহ আরও উত্তম। পরহিসগারদের গৃহ কি চমৎকার? (৩১) সর্বদা বসবাসের উদ্যান, তারা যাতে প্রবেশ করবে! এর পাদদেশ দিয়ে প্রোতস্থিনী প্রবাহিত হয়। তাদের জন্য তাতে তা'ই রয়েছে, যা তারা চায়। এমনিভাবে প্রতিদান দেবেন আল্লাহ পরহিসগারদেরকে, (৩২) ফেরেশতা যাদের জান কবজ করেন তাদের পবিত্র

থাকা অবস্থায়। ফেরেশতারা বলে : তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। তোমারা যা করতে, তার প্রতিদানে জালাতে প্রবেশ কর। (৩৩) কাফিররা কি এখন অপেক্ষা করেছে যে, তাদের কাছে ফেরেশতারা আসবে কিংবা আপনার পালনকর্তার নির্দেশ পৌঁছবে? তাদের পূর্ববর্তীরা এমনই করেছিল। আল্লাহ্ তাদের প্রতি অবিচার করেন নি; কিন্তু তারা স্বয়ং নিজেদের প্রতি জুলুম করেছিল। (৩৪) সুতরাং তাদের মন্দ কাজের শাস্তি তাদেরই মাথায় আপতিত হয়েছে এবং তারা যে তাঁট্টা-বিদ্রূপ করত, তাই উল্টে তাদের ওপর পড়েছে।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যারা শিরক থেকে বেঁচে থাকে, তাদেরকে (যখন কোরআন সম্পর্কে) বলা হয় : তোমাদের পালনকর্তা কি বস্তু নাখিল করেছেন? তারা বলে : খুবই উত্তম (ও বরকতের বস্তু) নাখিল করেছেন। যারা সৎকাজ করেছে (উপলোভ উক্তি ও যাবতীয় সৎকর্ম এর অন্তর্ভুক্ত) তাদের জন্য (এ দুনিয়াতেও) মঙ্গল রয়েছে (এ মঙ্গল হচ্ছে সওয়াবের ওয়াদা ও সুসংবাদ) এবং পরজগৎ তো (সেখানে এ ওয়াদা বাস্তবায়নের কারণে) অধিক উত্তম (ও আনন্দদায়ক)। নিশ্চয়ই সেটা শিরক থেকে আত্মরক্ষাকারীদের উত্তম গৃহ। (সে গৃহ হলো) চিরকাল বসবাসের উদ্যান, যেখানে তারা প্রবেশ করবে। এসব উদ্যানের (রুক ও দালান-কোঠার) পাদদেশে নির্ঝরিত স্রোত প্রবাহিত হবে। তাদের মনে যা চাইবে, সেখানে তারা তা পাবে। (যাদের উক্তি এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, তাদেরই বা কি বৈশিষ্ট্য বরং) এ ধরনের প্রতিদান আল্লাহ্ তা'আলা সব শিরক থেকে আত্মরক্ষাকারীকে দেবেন, যাদের রূহ ফেরেশতারা এমতাবস্থায় কবজ করেন যে, তারা (শিরক থেকে) পবিত্র (ও স্বচ্ছ) উদ্দেশ্য এই যে, তারা মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তওহীদের উপর কায়ম থাকে এবং তারা (ফেরেশতারা) বলতে থাকে : আসসালামু আলাইকুম। তোমরা (রাহ কবজের পর) জালাতে চলে যেনো নিজেদের কৃতকর্মের কারণে। তারা (যে কুফর, হঠকারিতা ও মূর্খতাকে আঁকড়ে রয়েছে এবং সত্যের প্রমাণাদি দিবালোকের মত ফুটে ওঠা সত্ত্বেও বিশ্বাস স্থাপন করছে না, মনে হয় যে, তারা শুধু) এ বিষয়ের অপেক্ষা করেছে যে, তাদের কাছে (মৃত্যুর) ফেরেশতা এসে যাক কিংবা আপনার পালনকর্তার নির্দেশ (অর্থাৎ কিয়ামত) এসে যাক। (অর্থাৎ তারা কি মৃত্যুর সময় কিংবা কিয়ামতের দিন বিশ্বাস স্থাপন করবে? যখন ঈমান কবুল হবে না, যদিও সত্য প্রকাশিত হওয়ার কারণে তখন সব কাফির তওবা করবে। তারা যেমন কুফরকে আঁকড়ে রয়েছে) তেমনি তাদের পূর্বে যারা ছিল, তারাও করেছিল (কুফরকে আঁকড়ে ধরেছিল) এবং (আঁকড়ে ধরার কারণে শান্তি পেয়েছিল। অতএব) আল্লাহ্ তাদের প্রতি অবিচার করেন নি; কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি অবিচার করেছিল। (অর্থাৎ জেনে গুনে শাস্তির কাজ করত।) অবশেষে তাদের কৃতকর্মের শাস্তি তারা পেয়েছে এবং যে আযাবের (খবর পাওয়ার) প্রতি তারা হাসি-ঠাট্টা করত, তাদেরকেই তাই (অর্থাৎ আযাব) এসে ঘিরে ফেলেছে। (তাই তোমাদের অবস্থাও তন্নু পই হবে।)

وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ  
 وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ  
 قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ۝ وَلَقَدْ بَعَثْنَا  
 فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۖ فَمِنْهُمْ  
 مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ۖ فَسِيرُوا فِي  
 الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِبِينَ ۝ إِنْ تَحْرُصْ  
 عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ تَصْرِيحٍ ۝  
 وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ  
 وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ لَيَبْيِّنَنَّ لَهُمْ  
 الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَذِبِينَ ۝  
 إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝

(৩৫) মুশরিকরা বলল : যদি আল্লাহ চাইতেন, তবে আমরা তাঁকে ছাড়া কারও  
 ইবাদত করতাম না এবং আমাদের পিতৃ পুরুষেরাও করত না এবং তাঁর নির্দেশ ছাড়া কোন  
 বস্তুই আমরা হারাম করতাম না। তাদের পূর্ববর্তীরা এমনই করেছিল। রসূলের দায়িত্ব  
 তো শুধুমাত্র সুস্পষ্ট বাণী পৌঁছিয়ে দেওয়া। (৩৬) আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্য  
 রসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগুত থেকে  
 নিরাপদ থাক। অতঃপর তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যককে আল্লাহ হিদায়ত করেছেন  
 এবং কিছু সংখ্যকের জন্য বিপথগামিতা অবধারিত হয়ে গেল। সুতরাং তোমরা পৃথি-  
 বীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ মিথ্যারোপকারীদের কিরূপ পরিণতি হয়েছে। (৩৭) আপনি  
 তাদেরকে সুপথে আনতে আগ্রহী হলেও আল্লাহ স্বাক্ষর বিপথগামী করেন তিনি তাকে  
 পথ দেখান না এবং তাদের কোন সাহায্যকারীও নেই। (৩৮) তারা আল্লাহর নামে  
 কর্তার শপথ করে যে, যার হস্ত হস্ত আল্লাহ তাকে পুনরুজ্জীবিত করবেন না। অবশ্যই  
 এর পাকাপোক্ত ওয়াদা হয়ে গেছে। কিন্তু, অধিকাংশ লোক জানে না। (৩৯) তিনি  
 পুনরুজ্জীবিত করবেনই, যাতে যে বিষয়ে তাদের মধ্যে মতানৈক্য ছিল তা প্রকাশ করা  
 যায় এবং যাতে কান্দিরেরা জেনে নেয় যে, তারা মিথ্যাবাদী ছিল। (৪০) আমি যখন কোন

কিছু করার ইচ্ছা করি; তখন তাকে কেবল এতটুকুই বলি যে, হয়ে যাও। সুতরাং তা হয়ে যায়।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

মুশরিকরা বলে : যদি আল্লাহ তা'আলা (সন্তুষ্টি হিসাবে) চাইতেন (যে, আমরা অন্যের ইবাদত না করি, যা আমাদের তরিকার মূলনীতি এবং কোন কোন বস্তু হারাম না করি, যা আমাদের তরিকার শাখাগত নীতি। উদ্দেশ্য এই যে, যদি আল্লাহ তা'আলা আমাদের বর্তমান মূলনীতি ও শাখাগত নীতি অপছন্দ করতেন) তবে আল্লাহ ছাড়া কোন কিছুই ইবাদত আমরাও করতাম না, আমাদের বাগদাদারাও করত না এবং তাঁর (আদেশ) ছাড়া আমরা কোন বস্তুকে হারাম বলতে পারতাম না। [এতে বোঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদের তরিকা পছন্দ করেন। নতুবা আমাদেরকে কেন এরূপ করতে দিতেন? হে মুহাম্মদ (সা) আপনি দুঃখিত হবেন না। কেননা, এই অনর্থক তর্ক নতুন ব্যাপার নয়; বরং] যেসব (কাফির) তাদের পূর্বে ছিল, তারাও এরূপ কাণ্ড করেছিল (অর্থাৎ পয়গম্বরদের সাথে অনর্থক তর্ক করেছিল!) অতএব পয়গম্বরদের (তাতে কি ক্ষতি হয়েছে এবং যে পথের দিকে তাঁরা ডাকেন তারই বা কি অনিশ্চয় হয়েছে। তাদের) দায়িত্ব শুধু (বিধি-বিধান) পরিষ্কারভাবে পৌঁছিয়ে দেওয়া। ('পরিষ্কারভাবে' এর অর্থ এই যে, দাবী স্পষ্ট এবং প্রমাণ বিসৃষ্ট হতে হবে। এমনিভাবে আপনার দায়িত্বেও এ কাজ ছিল, যা আপনি করছেন। যদি হঠকান্নিতাবশত দাবী ও প্রমাণের ব্যাপারে চিন্তাভাবনা না করে, তবে আপনার কি দোষ!) এবং (তাদের ব্যবহার আপনার সাথে অর্থাৎ তর্ক করা যেমন কোন নতুন ব্যাপার নয়, তেমনি আপনার ব্যবহার তাদের সাথে অর্থাৎ তওহীদ ও সত্য ধর্মের দিকে আহ্বান করা কোন নতুন ব্যাপার নয়। বরং এ শিক্ষাও প্রাচীনকাল থেকে অব্যাহত রয়েছে। সেমতে) আমি প্রত্যেক উম্মতে (পূর্ববর্তী উম্মতদের মধ্যে) কোন না কোন পয়গম্বর (এ শিক্ষা দেওয়ার জন্য) প্রেরণ করেছি যে, তোমরা (বিশেষভাবে) আল্লাহর ইবাদত কর এবং শয়তান (এর পথ) থেকে (অর্থাৎ শিরক ও কুফর থেকে) বেঁচে থাক। (এতে কোন কোন বস্তুকে হারাম করাও এসে গেছে, যা মুশরিকরা নিজেদের মতে করত। কেননা, এটা শিরক ও কুফরের শাখা ছিল।) অতএব তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যককে আল্লাহ পথ প্রদর্শন করেছেন (কারূণ্য তাঁরা সত্যকে কবুল করেছেন) এবং কিছু সংখ্যকের জন্য বিপথগামিতা অবধারিত হয়ে গেছে।

(উদ্দেশ্য এই যে, কাফির ও পয়গম্বরগণের মধ্যে এ ব্যবহার এমনিভাবে চলে আসছে এবং পথ প্রদর্শন ও পথভ্রষ্টকরণ সম্পর্কিত আল্লাহর ব্যবহারও চিরকাল থেকে এমনি অব্যাহত রয়েছে। কাফিরদের তর্কবিতর্কও প্রাচীন, পয়গম্বরগণের শিক্ষাও প্রাচীন এবং সবার সংপথ না পাওয়াও প্রাচীন। অতএব আপনি দুঃখিত হবেন কেন? এ পর্যন্ত সাঙ্গুনা দেওয়া হয়েছে। এতে সর্বশেষ আলোচ্য বিষয়ে তাদের সন্দেহের জওয়াবও সংক্ষেপে হয়ে গেছে। অর্থাৎ এরূপ কথাবার্তা বলা পথভ্রষ্টতা। পরবর্তী আয়াতে এর সমর্থন ও জওয়াবের ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ পয়গম্বরগণের সাথে তর্ক করা যে পথভ্রষ্টতা,

তা যদি তোমাদের জানা না থাকে তবে) তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর, অতঃপর (ধ্বংসাবশেষের সাহায্যে) দেখ যে, (পয়গম্বরগণের প্রতি) মিথ্যারোপকারীদের কেমন (শোচনীয়) পরিণাম হয়েছে। (অতএব এ তারা যদি বিপথগামী না হত, তবে আযাবে কেন পতিত হল? এগুলোকে আকস্মিক ঘটনা বলা যায় না। কারণ, এগুলো অভ্যাসের বিপরীতে হয়েছে, পয়গম্বরগণের ভবিষ্যদ্বাণী, পরে হয়েছে এবং ইমানদাররা এগুলো থেকে মুক্ত রয়েছে। এরপরও এটা যে আযাব, এতে সন্দেহ থাকতে পারে কি? উশ্মতের কোন একজন বিপথগামী হলেও রসুলুল্লাহ্ (সা) ভীষণ মর্মাহত হতেন, তাই এরপর আবার তাঁকে সম্বোধন করা হয়েছে যে, যেমন পূর্ববর্তী কিছু সংখ্যক লোকের জন্য বিপথগামিতা অবধারিত হয়ে গিয়েছিল, এমনিভাবে তারাও। অতএব) তাদের সংপথে আনার বাসনা যদি আপনার থাকে, তবে (কোন লাভ নেই; কারণ) আল্লাহ্ হিদায়ত করেন না, যাকে (তার হঠকারিতার কারণে) বিপথগামী করেন। (তবে সে হঠকারিতা ত্যাগ করলে হিদায়ত করে দেন। কিন্তু তারা হঠকারিতা ত্যাগ করবে না। ফলে তাদের হিদায়তও হবে না।) এবং (বিপথগামিতা ও আযাব সম্পর্কে যদি তাদের এরূপ ধারণা থাকে যে, তাদের উপাস্যরা এ অবস্থায়ও আযাব থেকে বাঁচিয়ে নেবে, তবে তারা বোঝে নিক যে, আল্লাহ্‌র মুকাবিলায়) তাদের কোন সাহায্যকারী নেই। (এ পর্যন্ত তাদের প্রথম সন্দেহের জওয়াব দেওয়া হয়েছে। অতঃপর দ্বিতীয় সন্দেহ সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে।) তারা খুব জোরেশোরে আল্লাহ্‌র কসম খায় যে, যে ব্যক্তি মরে যায়, আল্লাহ্‌ তাকে পুনর্বীর জীবিত করবেন না (এবং কিয়ামত আসবে না। অতঃপর জওয়াব দেওয়া হচ্ছে) কেন জীবিত করবেন না? (অর্থাৎ অবশ্যই জীবিত করবেন!) এ ওয়াদাকে আল্লাহ্‌ তা'আলা নিজ দায়িত্বে অপরিহার্য করে রেখেছেন; কিন্তু অধিকাংশ লোক (বিশুদ্ধ প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও এতে) বিশ্বাস স্থাপন করে না। (পুনর্বীর জীবিত করার কারণ) যাতে (ধর্ম সম্পর্কে) যে ব্যাপারে তারা (দুনিয়াতে) মতবিরোধ করত (এবং পয়গম্বরদের ফয়সালা শুনে পথে আসত না) তাদের সামনে তা (অর্থাৎ তার স্বরূপ চাক্কুস) প্রকাশ করে দেন এবং যাতে (এ স্বরূপ প্রকাশের সময়) কাফিররা (পুরোপুরি) জেনে নেয় যে, তারা মিথ্যাবাদী ছিল। (এবং পয়গম্বর ও মু'মিনরা সত্যবাদী ছিল। অতএব কিয়ামতের আগমন অবশ্যজ্ঞাবী এবং আযাব দ্বারা ফয়সালা হওয়া জরুরী এ হচ্ছে

عَلَّمَ اللَّهُ لِقَوْمِهِ الْكَلِمَاتِ الْغَايِبَاتِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ۝

এ হচ্চে **اللَّهُ** বাক্যের জওয়াব। তারা যে কিয়ামতকে অস্বীকার করত,

এর কারণ ছিল এই যে, তাদের ধারণায় মৃত্যুর পর জীবিত হওয়া কারও সাধ্যে ছিল না। তাই পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বীয় অপার শক্তি প্রমাণ করে এ সন্দেহের জওয়াব দিচ্ছেন যে, আমার শক্তি এত বিরাট যে, আমি যে বস্তু (সৃষ্টি করতে) চাই; (তাতে আমার কোনরূপ পরিভ্রম ও কল্‌ট স্বীকার করতে হয় না।) তাকে আমার পক্ষ থেকে শুধু এতটুকুই বলা (যথেষ্ট) হয় যে, তুমি (সৃষ্টি) হয়ে যাও, বাস তা (মওজুদ) হয়ে যায়। (সুতরাং এমন অপার শক্তির সামনে প্রাণহীন বস্তুর মধ্যে পুনর্বীর প্রাণ সঞ্চার করা মোটেই কঠিন নয়, যেমন প্রথমবার তাতে প্রাণ সঞ্চার করেছেন। এখন উভয় সন্দেহের পূর্ণ

জওয়াব হয়ে গেছে। **وَاللَّهُ الْعَلِيمُ** )

## আনুশঙ্গিক জাতব্য বিষয়

কাফিরদের প্রথম সন্দেহ ছিল এই যে, আল্লাহ তা'আলা আমাদের কুফর, শিরক ও অবৈধ কাজকর্ম পছন্দ না করলে তিনি সজোরে আমাদেরকে বিরত রাখেন না কেন?

এ সন্দেহ যে অসার, তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। তাই এর জওয়াব দেওয়ার পরিবর্তে শুধু রসুলুল্লাহ (সা)-কে সাক্ষ্যনা দেওয়া হয়েছে যে, এহেন অনর্থক ও বাজে প্রশ্ন শুনে আপনি দুঃখিত হবেন না। সন্দেহটি যে অসার, তার কারণ এই যে, আল্লাহ তা'আলা যে মূল ভিত্তির উপর এ দৃশ্যজগতের ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তাতে মানুষকে সম্পূর্ণ ক্ষমতাহীন রাখা হয়নি। তাকে এক প্রকার ক্ষমতা দান করা হয়েছে। এ ক্ষমতাকে সে আল্লাহর আনুগত্যে প্রয়োগ করলে পুরস্কার এবং নাকরমানীতে প্রয়োগ করলে আযাবের অধিকারী হয়। কিয়ামত এবং হাশর ও নশরের খাবতীয় হাঙ্গামা এরই ফলশ্রুতি। যদি আল্লাহ তা'আলা সবাইকে আনুগত্যে বাধ্য করতে চাইতেন, তবে আনুগত্যের বাইরে যাও-য়ার সাধ্য কার ছিল? কিন্তু রহস্যের তাগিদে এরূপ বাধ্য করা সঠিক ছিল না। ফলে মানুষকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এখন কাফিরদের একথা বলা যে, আমাদের ধর্মমত আল্লাহর কাছে পছন্দ না হলে আমাদের বাধ্য করেন না কেন—একটি বোকামি ও হঠকারিতাপ্রসূত প্রশ্ন বৈ নয়।

উপমহাদেশেও আল্লাহর কোন রসুল আগমন করেছেন কি? : لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ

وَأَنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ —এবং আরও একটি আয়াত

থেকে বাহ্যত একথাই জানা যায় যে, উপমহাদেশীয় এলাকাসমূহেও আল্লাহ তা'আলার পয়গম্বর অবশ্যই আগমন করে থাকবেন। তিনি হয় এখানকারই অধিবাসী হবেন, না হয় অন্য কোন দেশের হবেন এবং তাঁর প্রতিনিধি ও প্রচারক এখানে এসে থাকবেন।

অপর পক্ষে لَتَنْذِرُ قَوْمًا مِمَّا آتَاكُم مِّنْ ذُرِّيَّتِهِمْ —আয়াত থেকে বোঝা যায়, রসুলুল্লাহ (সা) যে উম্মতের কাছে প্রেরিত হয়েছেন, তাদের কাছে তাঁর পূর্বে কোন রসুল আগমন করেন নি। এর উত্তর এরূপ হতে পারে যে, এখানে বাহ্যত আরব সম্প্রদায়কে বোঝানো হয়েছে, যাদেরকে রসুলুল্লাহ (সা)-র নব্বুয়ত দ্বারা সর্বপ্রথম সম্বোধন করা হয়েছে। তাদের মধ্যে হযরত ইসমাইল (আ)-এর পদ কোন পয়গম্বরের আগমন হয়নি। এজন্যই

কোরআন পাকে তাদেরকে وَأَنْتُمْ كَانُوا كَافِرِينَ নামে অভিহিত করা হয়েছে। এতে অপরিহার্য

হয়ে পড়ে না যে, অবশিষ্ট বিশ্বেও রসুলুল্লাহ (সা)-র পূর্বে কোন পয়গম্বর আসেন নি।



وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا النَّبِيَّ سَتَجِدُنَا فِي الدُّنْيَا  
 حَسَنَةً ۖ وَلَا جَزَاءَ الْآخِرَةِ أَكْبَرَ مَكُوكَانُوا يَعْلَمُونَ ۝ الَّذِينَ صَبَرُوا  
 وَعَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝

(৪১) যারা নির্ধাতিত হওনার পর আলাহর জন্য গৃহ ত্যাগ করেছে, আমি অবশ্যই তাদেরকে দুনিয়াতে উত্তম আবাস দেব এবং পরকালের পুরস্কার তো সর্বাধিক; হায়! যদি তারা জানত। (৪২) যার দুঃগদ রয়েছে এবং তাদের পালনকর্তার উপর ভরসা করেছেন।

তক্ষসীরের সার-সংক্ষেপ

যারা আলাহর জন্য স্বদেশ (মক্কা) ত্যাগ করেছে (এবং আবিসিনিয়ার চলে গেছে) তাদের উপর (কাফিরদের পক্ষ থেকে) নির্ধাতন হওয়ার পর (কারণ এমন অপারক অবস্থায় দেশ ত্যাগ করা খুবই মনোকষ্টের কারণ হয়) আমি অবশ্যই তাদেরকে দুনিয়াতে উত্তম আবাস দেব। (অর্থাৎ তাদেরকে মদীনাতে পৌঁছিয়ে খুব শক্তি ও সুখ দেব। সেমতে কিছুদিন পরেই আলাহ তা'আলা তাদেরকে মদীনাতে পৌঁছিয়ে দেন এবং একেই আসল দেশ করে দেন। তাই একে আবাস বলা হয়েছে। তারা সেখানে সর্ব প্রকার উন্নতি লাভ করেন। তাই একে **حَسَنَةً** তথা উত্তম বলা হয়েছে। আবিসিনিয়ার তাদের অবস্থান ছিল সাময়িক। তাই একে আবাস বলা হয়নি) এবং পরকালের পুরস্কার (এর চাইতে) অনেক গুণে বড় (কারণ, যেমন উত্তম তেমনি চিরস্থায়ী)। আফসোস! যদি (পরকালের এই প্রতিদান) তারা (অর্থাৎ অস্ত্র কাফিররা) জানত! (এবং তা অর্জন করার আশ্রয়ে মুসলমান হয়ে যেত!) তারা (অর্থাৎ হিজরতকারীরা এসব গুণাদার যোগ্য অধিকারী এজন্য যে, তারা) এমন, যারা (অপ্রিয় ঘটনাবলীতে) সবার করে। (সেমতে দেশ ত্যাগ করা যদিও তাদের কাছে অপ্রিয়, কিন্তু এছাড়া ধর্মপালন করা সম্ভবপর ছিল না। তাই ধর্মের খাতিরে তারা দেশ ছেড়েছে এবং সবার করেছে।) এবং (তারা সর্বাধিক) পালনকর্তার উপর ভরসা রাখে। (দেশ ত্যাগ করার সময় চিন্তা করে না যে, খাওয়া-দাওয়া করবে কোথেকে?)

জানুয়ারিক জাতব্য বিষয়

শব্দার্থ ও ব্যাখ্যা : **وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ**—এটি **حَسَنَةً** থেকে উদ্ভূত। এর আভি-

ধানিক অর্থ দেশ ত্যাগ করা। আলাহর জন্য দেশ ত্যাগ করা ইসলামে একটু বড়

ইবাদত। রসুল্লাহ (সা) বলেন : **الهِجْرَةُ تَهْدِي تَهْدِي تَهْلِكُ** --- অর্থাৎ হিজরতের পূর্বে মানুষ যেসব গোনাহ করে, হিজরত সেগুলোকে খতম করে দেয়।

হিজরত কোন কোন অবস্থায় ফরয, ওয়াজিব এবং কোন কোন অবস্থায় মোস্তাহাব ও উত্তম হয়ে থাকে। এর বিস্তারিত বিধান সূরা নিসার ৯৭ নম্বর আয়াত

**لَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللَّهِ وَاَسْعَدَتْهَا جُرُؤًا فِيهَا** --- এর অধীনে বর্ণিত হয়েছে। এখানে

শুধু মুহাজিরদের সাথে আলাহ তা'আলার কৃত ওয়াদাসমূহ বর্ণিত হবে।

হিজরত দুনিয়াতেও সম্বল জীবিকার কারণ হয় কি? : আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে কতিপয় শর্তাধীনে মুহাজিরদের সাথে দুটি বিরাট ওয়াদা করা হয়েছে, প্রথম দুনিয়াতেই উত্তম ঠিকানা দেওয়ার এবং দ্বিতীয় পরকালে বেহিসাব সওয়াবেক। 'দুনিয়াতে উত্তম ঠিকানা' এটি একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। বসবাসের জন্য গৃহ এবং সং প্রতিবেশী পাওয়া, উত্তম রিযিক পাওয়া, শত্রুদের বিরুদ্ধে বিজয় ও সাফল্য পাওয়া, সাধারণের মুখে মুহাজিরদের প্রশংসা ও সুখ্যাতি থাকা এবং পুরুষানুক্রমে পারিবারিক ইশ্বত ও গৌরব পাওয়া---সবই এর অন্তর্ভুক্ত।---(কুরতুবী)

আয়াতের শানে নুহুল মূলত ঐ প্রথম হিজরত, যা সাহাবয়ে কিরাম আবিসিনিয়া অভিযুখে করেন। এরূপ সত্তাবনাও রয়েছে যে, আবিসিনিয়ার হিজরত এবং পরবর্তীকালের মদীনায় হিজরত উভয়টি এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তাই কেউ কেউ বলেন যে, এ ওয়াদা বিশেষ করে ঐ সাহাবয়ে কিরামের জন্য, যাঁরা আবিসিনিয়ায় কিংবা মদীনায় হিজরত করেছিলেন। আলাহ তা'আলার এ ওয়াদা দুনিয়াতে পূর্ণ হয়ে গেছে। সবাই তা প্রত্যক্ষ করেছে। আলাহ তা'আলা মদীনাকে তাঁদের জন্য কি চমৎকার ঠিকানা করেছিলেন! উৎপাদনকারী প্রতিবেশীদের স্বলে তাঁরা সহানুভূতিশীল, মহানুভব প্রতিবেশী পেয়েছিলেন। তাঁরা শত্রুদের বিপক্ষে বিজয় ও সাফল্যলাভ করেছিলেন। হিজরতের পর অল্প কিছু দিন অতিবাহিত হতেই তাঁদের সামনে রিযিকের দ্বার উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। যাঁরা ছিলেন ফকীর মিসকীন, তাঁরা হয়ে যান বিত্তশালী, ধনী। দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ বিজিত হয়। তাঁদের চরিত্র মাদুর্খ ও সৎকর্মের কীর্তি আবহমানকাল পর্যন্ত শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সবার মুখে উচ্চারিত হয়। তাঁদেরকে এবং তাঁদের বংশধরকে আলাহ তা'আলা অসামান্য ইশ্বত ও গৌরব দান করেন। এগুলো হচ্ছে পার্থিব বিষয়। পরকালের ওয়াদা পূর্ণ হওয়াও অবশ্যস্বাভাবী। কিন্তু তফসীরে বাহরে মুহীতে আবু হাইয়ান বলেন :

**وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي الْهَجْرَةِ جُرُؤًا فِيهَا**

আয়াতটি বিশ্বের সমস্ত মুহাজিরের ক্ষেত্রে

ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য, যে কোন অঞ্চল ও যুগের মুহাজির হোক না কেন। তাই প্রথম যুগের হিজরতকারী মুহাজির এবং কিরামত পর্যন্ত আরও যত মুহাজির হবে, সবাই এর অন্তর্ভুক্ত।

সাধারণ তফসীর বিধির তাগিদও তাই। আয়াতের শানে নুহুল বিশেষ ঘটনা ও বিশেষ শ্রেণীর লোক হলেও শব্দের ব্যাপকতা ধর্তব্য হয়ে থাকে। তাই সারা বিশ্বের এবং সর্বকালের মুহাজির আলোচ্য ওয়াদার অন্তর্ভুক্ত। উত্তর ওয়াদা সব মুহাজিরের ক্ষেত্রে পূর্ণ হওয়া একটি নিশ্চিত ও অনিবার্য ব্যাপার।

এমনি ধরনের এক ওয়াদা মুহাজিরদের জন্য সূরা নিসার নিম্নোক্ত আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে :

وَمَنْ جَرَفِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مَرَاغِمًا كَثِيرًا وَسَعَةً

এতে বিশেষ করে বাসস্থানের প্রশস্ততা এবং জীবিকার সম্বলভার ওয়াদা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কোরআন পাক এসব ওয়াদার সাথে মুহাজিরদের কিছু ওণাবলী এবং হিজরতের কিছু শর্তাবলীও বর্ণনা করেছে। তাই এসব ওয়াদার যোগ্য অধিকারী এসব মুহাজিরই হতে পারে, যারা এসব ওণের বাহক এবং যারা প্রাথিত শর্তসমূহ পূর্ণ করে।

তন্মধ্যে সর্বপ্রথম শর্ত হচ্ছে **فِي اللَّهِ**—অর্থাৎ হিজরত করার জন্য একমাত্র

আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন হতে হবে। এতে পাখিব কাজ-কান্নবানের মুনাফা, চাকরি এবং প্রবৃত্তিগত উপকারিতা উদ্দেশ্য হতে পারবে না। দ্বিতীয় শর্ত মুহাজিরদের নির্ধারিত

হওয়া, যেমন বলা হয়েছে : **مِنْ بَعْدِ مَا ظَاهَرُوا**—তৃতীয় ওণ প্রাথমিক কষ্ট ও

বিপদাপদে সবার করা ও দৃঢ়পদ থাকা; যেমন বলা হয়েছে : **الَّذِينَ صَبَرُوا**

চতুর্থ ওণ যাবতীয় বস্তুনিষ্ঠ কল্যাণ-কৌশল অবলম্বন করা সত্ত্বেও ভরসা শুধু আল্লাহর ওপর রাখা; অর্থাৎ কান্নবনোবাক্যে এরূপ বিশ্বাস রাখা যে, বিজয় ও সাফল্য একমাত্র তাঁরই হাতে; যেমন বলা হয়েছে : **وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ**

এ থেকে জানা গেল যে, প্রাথমিক বিপদাপদ ও কষ্ট তো প্রত্যেক কাজে হয়েই থাকে। এগুলো অতিক্রম করার পরও যদি কোন মুহাজির উত্তম ঠিকানা ও উত্তম অবস্থা না পায়, তবে কোরআনের ওয়াদায় সন্দেহ করার পরিসরে নিজেস্ব নিয়ত, আন্তরিকতা ও কর্মের উৎকর্ষ যাচাই করা দরকার। এগুলোর ভিত্তিতেই এ ওয়াদা করা হয়েছে। যাচাই করার পর সে জানতে পারবে যে, দোষ তার নিজেই। কোথাও হয়তো নিয়তে ঠুটি রয়েছে, কোথাও হয়তো সবার, দৃঢ়তা ও ভরসার অভাব আছে।

দেশত্যাগ ও হিজরতের বিভিন্ন প্রকার বিধি-বিধান : ইমাম কুরতুবী এখানে হিজরত ও দেশ ত্যাগের প্রকার ও বিধি-বিধান সম্পর্কে একটি উপকারী প্রবন্ধ রচনা করেছেন। পাঠকবর্গের উপকারার্থে নিম্নে তা উদ্ধৃত করা হল :

কুরতুবী ইবনে আব্বাসীর বরাতে দিয়ে লিখেন : দেশত্যাগ করা এবং দেশ ভ্রমণ

করা কোন সময় কোন বস্তু থেকে পলায়ন ও আত্মরক্ষার্থে হয় এবং কোন সময় কোন বস্তুর অপ্বেষণের জন্য হয়। প্রথম প্রকারকে হিজরত বলে। হিজরত হয় প্রকার :

প্রথম. দারুল কুফর থেকে দারুল ইসলামে যাওয়া। এ প্রকার সফর রসূলুল্লাহ (সা)-র আমলেও ফরম্ব ছিল এবং কিয়ামত পর্যন্ত শক্তি-সামর্থ্যের শর্তসহ ফরম্ব, যদি দারুল কুফরে জান, মাল ও আবরুর নিরাপত্তা না থাকে কিংবা ধর্মীয় কর্তব্য পালন সম্ভব না হয়। এরপরও যদি কেউ দারুল কুফরে অবস্থান করে, তবে সে গোনাহগার হবে।

দ্বিতীয়. বিদ'আতের স্থান থেকে চলে যাওয়া। ইবনে কাসেম বলেন : আমি ইমাম মালেকের মুখে শুনেছি, এমন জায়গায় কোন মুসলমানের বসবাস করা হালাল নয়, যেখানে পূর্ববর্তী মনীষীদেরকে গালিগালাজ করা হয়। এই উক্তি উদ্ধৃত করে ইবনে আরাবি লিখেন : এটা সম্পূর্ণ নির্ভুল। কেননা, যদি তুমি কোন গহিত কাজ বন্ধ করতে না পার, তবে নিজে সেখান থেকে দূরে সরে যাও। এটা তোমার জন্য জরুরী, যেমন আত্মা তা'আলা বলেন :

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ

তৃতীয় যেখানে হারামের প্রাধান্য, সেখান থেকে চলে যাওয়া। কেননা হালাল অপ্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরম্ব।

চতুর্থ. দৈহিক নির্মাতন থেকে আত্মরক্ষার্থে সফর করা। এরূপ সফর জায়েয ; বরং আত্মা তা'আলার পক্ষ থেকে রহমত। যেখানে শত্রুদের পক্ষ থেকে দৈহিক নির্মাতনের আশংকা থাকে, সেস্থান ত্যাগ করা উচিত ; যাতে আশংকা মুক্ত হওয়া যায়। সর্বপ্রথম হযরত ইবরাহীম (আ) এই প্রকার সফর করেন। তিনি কওমের নির্মাতন থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য ইরাক থেকে সিরিয়ার উদ্দেশে রওয়ানা হন এবং বলেন :

إِنِّي رَأَيْتُ

তারপর হযরত মুসা (আ) এমনি এক সফর মিসর থেকে

فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ ; যেমন কোরআন বলে :

পঞ্চম. দূষিত আবহাওয়া ও রোগের আশংকা থেকে আত্মরক্ষার্থে সফর করা। ইসলামী শরীয়ত এরও অনুমতি দেয়; যেমন রসূলুল্লাহ (সা) কয়েকজন রাখালকে মদীনার বাইরে বনভূমিতে অবস্থান করার আদেশ দেন। কেননা, শহরের আবহাওয়া তাদের অনুকূলে ছিল না। এমনিভাবে হযরত ওমর ফারুক (রা) আবু ওবায়দাকে রাজধানী জর্দান থেকে স্থানান্তরিত করে কোন মালভূমিতে নিয়ে যাওয়ার আদেশ দেন, যেখানে আবহাওয়া দূষিত নয়।

কিন্তু এটা তখন, যখন কোন স্থানে প্লেগ অথবা মহামারী ছড়িয়ে না থাকে। যেখানে কোন মহামারী ছড়িয়ে পড়ে, সেখানে নির্দেশ এই যে, পূর্ব থেকে যারা সেখানে

বিদ্যমান রয়েছে, তারা সেখান থেকে পলায়ন করবে না এবং যারা সেই এলাকার বাইরে রয়েছে তারা এলাকার ভিতরে যাবে না। সিরিয়ান সফরে হযরত ওমর (রা) এরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলেন। তিনি সিরিয়া সীমান্তে পৌঁছান পর জানতে পারেন যে, সিরিয়ান প্রেগের ব্যাপক প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। এমতাবস্থায় তিনি সিরিয়ান প্রবেশ করবেন কিনা এ ব্যাপারে ইতস্তত করতে থাকেন। সাহাবায়ে কিরামের সাথে অবিরাম পরামর্শের পর হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ তাঁকে একটি হাদীস শোনান। হাদীসে রসুলুল্লাহ্ (সা) বলেন :

إذا وقع با رض وانتم بها فلا تظروا جوا منها و إذا وقع بارض ولستم بها فلا تهاطوا عليها -

যখন কোন ভূখণ্ডে প্রেগ ছড়িয়ে পড়ে এবং তোমরা সেখানে বিদ্যমান থাক, তবে সেখান থেকে বের হয়ো না এবং যেখানে তোমরা পূর্ব থেকে বিদ্যমান না থাক, প্রেগ ছড়িয়ে পড়ার সংবাদ শুনে সেখানে প্রবেশ করো না।---(তিরমিযী)

খলীফা ওমর (রা) তখন হাদীসের নির্দেশ পালন করে সমগ্র কাক্কেলাকে প্রত্যাবর্তনের আদেশ দেন।

কোন কোন আলিম বলেন : হাদীসের এই নির্দেশের একটি বিশেষ রহস্য এই যে, যারা মহামারীর এলাকায় পূর্ব থেকে অবস্থান করছে, তাদের মধ্যে মহামারীর জীবাণু থাকার সম্ভাবনা প্রবল। তারা যদি সেখান থেকে পলায়ন করে, তবে যে ব্যক্তির মধ্যে এই জীবাণু অনুপ্রবেশ করেছে, সে তো মরবেই এবং যেখানে সে যাবে, সেখানকার লোকও তার দ্বারা প্রভাবিত হবে। তাই ইহা হাদীসের বিজ্ঞানোচিত ফয়সালা।

যষ্ঠ ধনসম্পদ হিকায়তের জন্য সফর করা। কোন স্থানে চোর-ডাকাতের উপদ্রব দেখলে সেস্থান ত্যাগ করার অনুমতি ইসলামে রয়েছে। কেননা, মুসলমানের ধনসম্পদও তার জ্ঞানের ন্যায় সম্মানার্থ। এই ছয় প্রকার তো ছিল ঐ দেশ ত্যাগের যা কোন বস্তু থেকে পলায়ন ও আত্মরক্ষার্থে হয় আর শেষোক্ত প্রকার অর্থাৎ কোন বস্তুর অবেমণে যে সফর করা হয়, তা নয় ভাগে বিভক্ত।

(৬) শিকার সফর অর্থাৎ আন্নাহর সৃষ্টজগত, অপার শক্তি ও বিগত জাতি-সমূহের অবস্থা সরেযমীনে পর্যবেক্ষণ করে শিকার গ্রহণের উদ্দেশ্যে বিশ্ব-পর্যটন করা। কোরআন পাক এরূপ সফরে উৎসাহিত করে বলেছে :

أَلَمْ يَسْهَرُوا فِي الْأَرْضِ فَهُمْ يَنْظُرُونَ كَيْفَ كَانَ مَا قَدَّمَا لِلَّذِينَ مِنْ

قَدِّمَهُمْ---হযরত মূলকারনাইনের সফরও কোন কোন আলিমের মতে এ ধরনের সফর ছিল। কেউ কেউ বলেন : তাঁর সফর পৃথিবীতে আন্নাহর আইন প্রয়োগ করার উদ্দেশ্যে ছিল।

(২) হজ্জের সফর। কতিপয় শর্তসহ এ সফর যে ইসলামী ফরয, তা সুবিদিত।  
 (৩) জিহাদের সফর। এটাও যে ফরয, ওয়াজিব অথবা মোস্তাহাব, তা সব মুসলমানের জানা রয়েছে।

(৪) জীবিকার অন্বেষণে সফর। স্বদেশে জীবিকার প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সংগৃহীত না হলে অন্যত্র সফর করে জীবিকা অন্বেষণ করা অপারূহার্য।

(৫) বাণিজ্যিক সফর অর্থাৎ প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধনসম্পদ অর্জন করার জন্য সফর করা। শরীকতে এটাও জায়েয। আত্মাহ্বলেন :

أَبْلَغًا ۖ فَضْلًا ۖ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا ذُلًّا مِّنْ رَّبِّكُمْ

(কৃপা অন্বেষণ) বলে বাণিজ্য বোঝানো হয়েছে। আত্মাহ্ব তা'আলা হজ্জের সফরেও বাণিজ্যের অনুমতি দান করেছেন। অতএব বাণিজ্যের জন্য সফর করা আরও উত্তম-রূপে বৈধ হবে।

(৬) জ্ঞান অর্জনের জন্য সফর। ধর্ম পালনের জন্য মতটুকু জরুরী, ততটুকু জ্ঞান অর্জনের জন্য সফর করা ফরযে আইন এবং এর বেশির জন্য ফরযে কেফায়ী।

(৭) কোন স্থানকে পবিত্র মনে করে সেদিকে সফর করা। তিনটি মসজিদ ব্যতীত এরূপ সফর বৈধ নয় : মসজিদে হারাম (মক্কা), মসজিদে নববী (মদীনা) এবং মসজিদে আকসা (বায়তুল মোকাদ্দাস)। এ হচ্ছে কুরতুবী ও ইবনে আরাবীর অভিমত। অন্যান্য জামি'য়ের মতে সাধারণ পবিত্র স্থানসমূহের দিকে সফর করাও জায়েয। —(মোঃ শফী)

(৮) ইসলামী সীমান্ত সংরক্ষণের জন্য সফর। একে 'রিবাত' বলা হয়। বহু হাদীসে রিবাতের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত রয়েছে।

(৯) স্বজন ও বন্ধুদের সাথে সাক্ষাতের জন্য সফর। হাদীসে একেও পুণ্যকাজ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। সহীহ মুসলিমের হাদীসে আশ্বীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সাক্ষাতের জন্য সফর করে, তাঁর জন্য ফেরেশতাদের দোয়া করার কথা উল্লিখিত রয়েছে। এটা তখন, যখন কোন বৈষয়িক স্বার্থের জন্য নয়; বরং আত্মাহ্ব তা'আলার সম্বলিত অর্জনের উদ্দেশ্যে তাদের সাথে সাক্ষাত করা হয়।

وَاللَّهُ أَعْلَمُ

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَسَأَلُوا أَهْلَ

الدِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۖ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ

الدِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۝

(৪৩) আপনাদের পূর্বেও আমি প্রত্যাদেশসহ মানবকেই তাদের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম। অতএব জানীদেরকে জিজ্ঞেস কর, যদি তোমাদের জানা না থাকে; (৪৪) প্রেরণ করেছিলাম তাদেরকে নির্দেশাবলী ও অবতীর্ণ প্রহসহ এবং আপনাদের কাছে আমি স্মরণিকা অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি লোকদের সামনে ঐ সব বিষয় বিস্তৃত করেন, যেগুলো তাদের প্রতি নাখিল করা হয়েছে, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে।

### তক্ষসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং (অবিরাসীরা আপনাদের নিসালত ও নবুয়ত এ কারণে স্বীকার করে না যে, আপনি মানব। তাদের মতে রসূল মানব না হওয়া উচিত। এটা তাদের মূর্খতা-প্রসূত ধারণা। কেননা) আমি আপনাদের পূর্বেও শুধু মানবকেই রসূল করে মু'জিয়া ও প্রহাদি দিয়ে প্রেরণ করেছি। আমি তাদের কাছে নির্দেশ প্রেরণ করতাম। অতএব (হে মক্কার অধিবাসীরা) যদি তোমাদের জানা না থাকে, তবে যারা জানে, তাদের কাছে জিজ্ঞেস করে দেখ (অর্থাৎ এমন লোকদেরকে জিজ্ঞেস কর, যারা পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণের অবস্থা জানে এবং তোমাদের ধারণা মতেও তারা মুসলমানদের পক্ষপাতিত্ব না করে। এমনভাবে আপনাকেও রসূল করে) আপনাদের প্রতিও এ কোরআন নাখিল করেছি, যাতে (আপনাদের মাধ্যমে) যে হিদায়ত মানুষের কাছে প্রেরণ করা হয়েছে আপনি সেগুলো স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেন এবং যাতে তারা তাতে চিন্তা-ভাবনা করে।

### আনুমানিক জাতব্য বিষয়

রাহুল মা'আনীতে বলা হয়েছে, এ আয়াত নাখিল হওয়ার পর মক্কার মুশরিকরা মদীনার ইহুদীদের কাছে তথ্যানুসন্ধানের জন্য দূত প্রেরণ করল। তারা জানতে চাইল যে, বাস্তবিকই পূর্বেও সব পয়গম্বর মানব জাতির মধ্য থেকে প্রেরিত হয়েছেন কি না।

أَهْلُ الذِّكْرِ — শব্দটি প্রহুধারী সম্প্রদায় ও মুসলমান সবাইকে বোঝায়;

কিন্তু একথা সুস্পষ্ট যে, মুশরিকরা অমুসলমানদের বর্ণনা দ্বারাই তুল্ট হতে পারত। কারণ তারা স্বয়ং রসূলুহ্বাহ্ (সা)-র বর্ণনায় সন্তুষ্ট ছিল না। এমতাবস্থায় মুসলমানদের বর্ণনা তারা কিরূপে মানতে পারত। ذَكَرَ — أَهْلُ الذِّكْرِ শব্দটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। তন্মধ্যে এক অর্থ জান। এ অর্থের সাথে সম্পর্ক রেখে কোরআন পাকে তওরাতকে ذَكَرَ বলা হয়েছে :

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ এবং কোরআনকেও ذَكَرَ শব্দ

দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে, যেমন এর পরের আয়াতে বলে  
 ۞ **أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ** বলে  
 কোরআন বোঝানো হয়েছে। অতএব **أَهْلَ الذِّكْرِ**—এর শাসনিক অর্থ দাঁড়াল বিধান,  
 জানবান। এখানে স্পষ্টতই বিধান বলে গ্রহণকারী ইহুদী ও খৃষ্টান পণ্ডিতদেরকে  
 বোঝানো হয়েছে। ইবনে আব্বাস, হাসান, সুদী প্রমুখ তাই বলেছেন। কেউ কেউ  
 এখানেও **ذِكْرٍ**—এর অর্থ কোরআন ধরে **أَهْلَ الذِّكْرِ**—এর তফসীরে 'কোরআনধারী'  
 বলেছেন। এ ব্যাপারে বাস্তব ও মায়হারীর বক্তব্য অধিক স্পষ্ট। তাঁরা বলেন :

المُرَادُ بِأَهْلِ الذِّكْرِ عُلَمَاءُ أَهْلِهَا وَالْأَمَمُ السَّائِفَةُ كَأَنَّمَا كَانَ  
 فَالذِّكْرُ بِمَعْنَى الْحَفِظِ كَأَنَّهُ قِيلَ اسْمُهُ لِمَا وَالْمُطَّلَعِينَ عَلَى أَهْلِهَا وَالْأَمَمُ  
 يَعْلَمُونَ بِذَلِكَ -

এ ভাষ্য অনুযায়ী গ্রহণকারী ও কোরআনধারী সবাই **أَهْلَ الذِّكْرِ**—এর অন্তর্ভুক্ত।

**زُبُرٍ**—এর অর্থ সুবিদিত। এখানে মু'জিয়া বোঝানো হয়েছে।

শব্দটি আসলে **زُبُرَةٌ**—এর বহুবচন। এর অর্থ লোহার বড় খণ্ড; যেমন এক জায়গায়

বলা হয়েছে, **أَتُونِي زُبُرًا لِحَدِيدٍ**—খণ্ডসমূহকে সংযোজন করার সাথে সম্পর্ক

রোধে লেখাকে **زُبُرٍ** বলা হয় এবং লিখিত গ্রন্থকে **زُبُورٌ** বলা হয়। এখানে

**زُبُرٍ** বলে তওরাত, ইঞ্জীল, যবুর ও কোরআনসহ ঐশীগ্রন্থসমূহ বোঝানো হয়েছে।

মুজতাহিদ ইমামদের অনুসরণ করা অন্যদের উপর ওয়াজিব : আলোচ্য আয়াতের

**فَصَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ**—বাক্যটি যদিও বিশেষ বিষয়বস্তু

সম্পর্কে বলা হয়েছে, কিন্তু ভাষা ব্যাপক হওয়ার কারণে এ জাতীর সব ব্যাপারকে শামিল  
 করে। তাই কোরআনী বর্ণনাভঙ্গির দিক দিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ সুস্তিগত ও ইতিহাসগত  
 বিধি যে, যারা বিধি-বিধানের জান রাখেনা, তারা যারা জানে, তাদের কাছে জিজ্ঞেস  
 করে নেবে এবং তাদের কথামত কাজ করা জানহীনদের উপর কর্তব্য হবে। একেই  
 তফসীর (অনুসরণ) বলা হয়। এটা কোরআনের স্পষ্ট নির্দেশ এবং সুস্তিগতভাবেও এ  
 পথ ছাড়া আমল অর্থাৎ কর্মকে ব্যাপক করার আর কোন উপায় নেই। সাহাবীগণের  
 সুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত কোনরূপ মতানৈক্য ছাড়াই এ বিধি পালিত হয়ে  
 আসছে। যারা তফসীর অস্বীকার করে, তারাও এ তফসীর অস্বীকার করে না যে, যারা  
 আলিম নয়, তারা আলিমদের কাছ থেকে কতোটা নিয়ে কাজ করবে। বলা বাহুল্য, আলিমরা



যদি অজ্ঞ জনসাধারণকে কোরআন ও হাদীসের প্রমাণাদি বলেও দেন, তবে তারা এগুলোকে আলিমদের উপর আস্থার ভিত্তিতেই গ্রহণ করবে। কারণ, তাদের মধ্যে প্রমাণাদিকে বোঝা ও পরখ করার যোগ্যতা কোথায়? জানীদের উপর আস্থা রেখে কোন নির্দেশকে শরীয়তের নির্দেশ মনে করে পালন করার নামই তো তকলীদ। এ তকলীদ যে বৈধ বরং জরুরী, তাতে কোনরূপ মতবিরোধের অবকাশ নেই। তবে যেসব আলিম কোরআন, হাদীস ও ইজমার ক্ষেত্রসমূহ বোঝার যোগ্যতা রাখে, তারা কারও তকলীদ না করে এমন বিধি-বিধানে সন্নাসরি কোরআন ও হাদীস অনুযায়ী কাজ করতে পারে, যেগুলো কোরআন ও হাদীসে পরিষ্কারভাবে উল্লিখিত রয়েছে এবং যেগুলোতে সাহাবী ও তাবয়ী আলিমদের মধ্যে কোন মতবিরোধ নেই। কিন্তু যেসব বিধান পরিষ্কারভাবে কোরআন ও হাদীসে উল্লিখিত নেই অথবা যেগুলোতে কোরআনী আয়াত ও হাদীসের মধ্যে বাহাত পরস্পর বিরোধিতা দৃষ্টিগোচর হয় অথবা যেগুলোতে সাহাবী ও তাবয়ীগণের মধ্যে আয়াত কিংবা হাদীসের অর্থ নির্ধারণে মতভেদ রয়েছে, সেসব বিধি-বিধান ইজতিহাদী বিষয়-রূপে গণ্য হয় এবং পরিভাষায় এগুলোকে 'মুজতাহাদ ফিহ মাস'আলা' বলে। নিজে মুজতাহিদ নয়, এমন প্রত্যেক আলিমের পক্ষেও এ জাতীয় মাস'আলায় কোন একজন মুজতাহিদ ইমামের তকলীদ করা জরুরী। ব্যক্তিগত অভিমতের ভিত্তিতে এক আয়াত কিংবা হাদীসকে অগ্রগণ্য মনে করে অবলম্বন করা এবং অন্য আয়াত কিংবা হাদীসকে অগ্রগণ্য সাব্যস্ত করে ছেড়ে দেওয়া তার পক্ষে বৈধ নয়।

এমনিভাবে কোরআন ও সূরতে যেসব বিধানের পরিষ্কার উল্লেখ নেই, সেগুলো কোরআন ও সূরাহ বর্ণিত মূলনীতি অনুসরণ করে বের করা এবং সেগুলোর শরীয়ত-সম্মত নির্দেশ নির্ধারণ করাও এমন মুজতাহিদদের কাজ, যারা আরবী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি রাখেন; কোরআন ও সূরাহ সম্পর্কিত যাবতীয় শাস্ত্রে দক্ষতা রাখেন এবং আঞ্জাহু'লীতি ও পরহিযগারীতে উচ্চ মর্তব্য অধিষ্ঠিত রয়েছেন। যেমন ইমাম আযম আবু হানীফা, শাফেয়ী, মালিক, আহমদ ইবনে হাম্বল, আওয়ানী, ফকীহ আবুল্লাইস প্রমুখ। আঞ্জাহু তা'আলা তাদেরকে নবুয়ত যুগের নৈকট্য এবং সাহাবী ও তাবয়ী-গণের সংসর্গের বরকতে শরীয়তের মূলনীতি ও উদ্দেশ্য বোঝার বিশেষ রুচি এবং বর্ণিত বিধানের ওপর অবর্ণিত বিধানকে অনুমান করে শরীয়তসম্মত নির্দেশ বের করার অসাধারণ দক্ষতা দান করেছিলেন। এ জাতীয় ইজতিহাদী মাস'আলায় সাধারণ আলিমদের পক্ষেও কোন না কোন একজন মুজতাহিদ ইমামের তকলীদ করা অপরিহার্য। মুজতাহিদ ইমামদের মতের বিরুদ্ধে কোন নতুন মত অবলম্বন করা ভুল।

এ কারণেই মুসলিম সম্প্রদায়ের আলিম, মুহাদ্দিস ও ফিকাহবিদগণ, ইমাম গাম্বালী, রায়ী, তিরমিযী, তাহাজী, মুযানী, ইবনে হসাম, ইবনে কুদামা এবং এই শ্রেণীর আরও লক্ষ লক্ষ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলিম আরবী ভাষা ও শরীয়ত সম্পর্কে গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও ইজতিহাদী মাস'আলাসমূহে সর্বদা মুজতাহিদ ইমামদের তকলীদ করে গেছেন। তাঁরা সব ইমামের বিপরীতে নিজমতে কোন ফতোয়া দেওয়াকে বৈধ মনে করেন নি।

তবে উল্লিখিত মনীষীমুন্স জ্ঞান ও আল্লাহুত্বীতিতে অনন্যসাধারণ মর্তবার অধিকারী ছিলেন। ফলে তাঁরা মুজতাহিদ ইমামগণের উক্তি ও মতামতসমূহকে কোরআন ও সুন্নতের আলোকে যাচাই-বাছাই করতেন। অতঃপর তাঁরা যে ইমামের উক্তিকে কোরআন ও সুন্নতের অধিক নিকটবর্তী দেখতেন, সেই ইমামের উক্তি গ্রহণ করতেন। কিন্তু ইমামগণের মত ও পথের বাইরে, তাঁদের সবার বিরুদ্ধে কোন মত আবিষ্কার করাকে তাঁরা কখনও বৈধ মনে করতেন না। তকলীদের আসল স্বরূপ এতটুকুই।

এরপর দিন দিন জ্ঞানের মাপকাঠি সংকুচিত হতে থাকে এবং তাকওয়া ও আল্লাহুত্বীতির পরিবর্তে মানবিক স্বার্থপরতা প্রাধান্য বিস্তার করতে থাকে। এমন পরিস্থিতিতে যদি কোন মাস'আলায় যে-কোন ইমামের উক্তি গ্রহণ করার এবং অন্য মাস'আলায় অন্য ইমামের উক্তি গ্রহণ করার স্বাধীনতা দেওয়া হয়, তবে এর অবশ্যস্বাভাবী পরিণতিতে মানুষ শরীয়ত অনুসরণের নামে প্রবৃত্তির অনুসারী হয়ে যাবে। যে ইমামের উক্তিগত সে নিজ প্রবৃত্তির স্বার্থ পূর্ণ হতে দেখবে সেই ইমামের উক্তিকেই গ্রহণ করবে। বলা বাহুল্য; এরূপ করার মধ্যে ধর্ম ও শরীয়তের অনুসরণ হবে কম এবং স্বার্থ ও প্রবৃত্তির অনুসরণ হবে বেশী। অথচ দীন ও শরীয়তের অনুসরণ না করে স্বার্থ ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করা উম্মতের ইজমা দ্বারা হারাম। আল্লামা শাতেবী 'মুয়াফাকাত' গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সাধারণ তকলীদের বিরোধিতা সত্ত্বেও ইবনে তাইমিয়া এ ধরনের অনুসরণকে স্বীয় কতোয়া গ্রন্থে ইজমা দ্বারা হারাম বলেছেন। এ কারণে পরবর্তী ফিকাহবিদগণ এটা জরুরী মনে করেছেন যে, আমলকারীদের ওপর কোন একজন ইমামেরই তকলীদ করা বাধ্যতামূলক করে দেওয়া উচিত। এখান থেকেই ব্যক্তিভিত্তিক তকলীদের সূচনা হয়। এটা প্রকৃতপক্ষে একটি শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা। এর উদ্দেশ্য দীনী ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা কায়েম রাখা এবং মানুষকে দীনের আড়ালে প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে বাঁচিয়ে রাখা। হযরত উসমান গনী (রা)-র একটি কীর্তি হব্ব এর দৃষ্টান্ত। তিনি সাহাবায়ে কিরামের ইজমা তথা সর্বসম্মতিক্রমে কোরআনের সাতটি কির'আতের মধ্য থেকে মাত্র একটিকে বহাল রেখেছেন। অথচ কোরআন সাত কির'আতেই রসুলুল্লাহ (সা)-র বাসনা অনুযায়ী জিবরাঈলের মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়েছিল। কিন্তু বহির্বিশ্বে প্রচারিত হওয়ার পর সাত কির'আতে কোরআন পাঠ করার ফলে তাতে পরিবর্তনের আশংকা দেখা দেয়। তখন সাহাবীগণের সর্বসম্মতিক্রমে একই কির'আতে কোরআন লেখা ও পড়া বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হয়। খলীফা হযরত উসমান (রা) সেই এক কির'আতে কোরআনের অনেক কপি লিখিয়ে বিভিন্ন দেশে প্রেরণ করেন এবং আজ পর্যন্তও সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায় তা অনুসরণ করে যাচ্ছেন। এর অর্থ এরূপ নয় যে, অন্য কির'আত সঠিক ছিল না। বরং দীনের শৃঙ্খলা বিধান এবং কোরআনের হিফায়তের কারণে একটি মাত্র কির'আত অবলম্বন করা হয়েছে। এমনিভাবে সকল মুজতাহিদ ইমামই সত্য। তাদের মধ্যে কোন একজনকে তকলীদের জন্য নির্দিষ্ট করার অর্থ কখনও এরূপ নয় যে, যে ব্যক্তি যে ইমামের তকলীদ করেছে তাকে ছাড়া অন্য ইমাম তার কাছে তকলীদের যোগ্য নয়। বরং যে ইমামের মধ্যে নিজের মতাদর্শ ও সুবিধা দেখতে পায় তারই তকলীদ করে এবং অন্য ইমামদেরকেও এমনিভাবে সম্মানিত মনে করে।

উদাহরণত রোগী হাকীম ও ডাক্তারদের মধ্য থেকে কোন একজনকেই চিকিৎসার জন্য নির্দিষ্ট করাকে জরুরী মনে করে। কারণ, সে যদি নিজ মতে এক সময় এক ডাক্তারের কাছে জিজ্ঞেস করে ওষুধ পান করে এবং অন্য সময় অন্য ডাক্তারের কাছে জিজ্ঞেস করে ওষুধ পান করে, তবে এটা তার ধ্বংসের কারণ হয়। অতএব সে যখন একজন ডাক্তারকে চিকিৎসার জন্য মনোনীত করে, তখন এর অর্থ কখনও এরূপ হয় না যে, অন্য ডাক্তার পারদর্শী নয় কিংবা চিকিৎসা করার যোগ্যতা রাখে না।

মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলীর যে বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তার স্বরূপ এর চাইতে বেশী কিছু ছিল না। একে দলাদলির রুও দেওয়া এবং পারস্পরিক কলহ ও মতানৈক্য সৃষ্টিতে মেতে ওঠা দীনের কাজ নয় এবং অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন আলিমগণ কোন সময় একে সুনজরে দেখেন নি। কোন কোন আলিমের আলোচনা পারস্পরিক বিতর্কের রূপ ধারণ করে, যা পরে তিরস্কার ও ভৎসনার সীমা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এরপর মূর্খতাসুলভ লড়াই ও কলহ-বিবাদ সৃষ্টি হয়েছে, যা আজকাল সাধারণত ধর্মপরায়ণতা ও মামহাবপ্রীতির চিহ্ন হয়ে গেছে। অতএব আল্লাহ তা'আলার কাছেই আমাদের অভিযোগ।

و لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ তকলীদ ও ইজতিহাদ সম্পর্কে এখানে যা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, তা এ বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত সার। সাধারণ মুসলমানদের বোঝার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। পণ্ডিতসুলভ বিস্তারিত আলোচনা উসুলে ফিকাহের কিতাবাদিতে বিশেষ করে আল্লামা শাতেবীকৃত 'কিতাবুল মুয়াফাকাহাত' ৪র্থ খণ্ড, ইজতিহাদ অধ্যায়ে, আল্লামা সাইফুদ্দীন আমেদীকৃত 'আহকামুল আহকাম' ৩য় খণ্ড, শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভীকৃত 'হজ্জাতুল্লাহিল বালেগা' ও 'ইকদুল জীদ' এবং মাওলানা আশরাফ আলী খানভীকৃত 'আল ইসতিসাদ ওয়াল ইজতিহাদ' গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

কোরআন বোঝার জন্য হাদীস জরুরী; হাদীস অস্বীকার কোরআন অস্বীকারের নামান্তর; ذَكَرْنَا لَكَ الْآيَاتِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ

এর অর্থ সর্বসম্মতভাবে কোরআন পাক। আয়াতে রসুলুল্লাহ (সা)-কে আদেশ করা হয়েছে যে, আপনি লোকদের কাছে কোরআনের আয়াত বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করে দিন। এতে সুস্পষ্ট-রূপে প্রমাণিত হয় যে, কোরআন পাকের তত্ত্ব, তথ্য ও বিধানাবলী নির্ভুলভাবে বোঝা রসুলুল্লাহ (সা)-র বর্ণনার উপর নির্ভরশীল। যদি প্রত্যেক ব্যক্তি শুধু আরবী ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞান-লাভ করেই কোরআনের বিধানাবলী আল্লাহর অভিপ্রেত পন্থায় বোঝাতে সক্ষম হত, তবে রসুলুল্লাহ (সা)-কে বর্ণনা ও ব্যাখ্যার দায়িত্ব অর্পণ করার কোন অর্থ থাকত না।

আল্লামা শাতেবী 'মুয়াফাকাহাত' গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে প্রমাণ করেছেন যে, হাদীস আগাগোড়া কোরআনের ব্যাখ্যা। কেননা, কোরআন রসুলুল্লাহ (সা) সম্পর্কে বলেছে,

أَنْتَ لَعَلَى خُلُقٍ مَّطْوَمٍ ---হযরত আমেশা সিদ্দীকা (রা) এই মহান চরিত্রের

ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন : **كَانَ خَلْقَهُ الْقُرْآنَ** এর সারমর্ম এই যে, রসূলুল্লাহ (সা) থেকে যে কোন উক্তি ও কার্য বর্ণিত রয়েছে, তা সব কোরআনেরই বস্তুব্যা। কোনকোনটি বাহ্যত কোন আয়াতের তফসীর ও ব্যাখ্যা, যা সাধারণ আলিমরা জানেন এবং কোন কোনটি বাহ্যত কোরআনে নেই, কিন্তু রসূলুল্লাহ (সা)-র অন্তরে তা ওহী হিসাবে প্রক্ষিপ্ত করা হয়। এটাও একদিক দিয়ে কোরআনই। কেননা, কোরআনের বর্ণনা অনুযায়ী রসূলুল্লাহ (সা)-র কোন কথাই মনগড়া নয়; বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী হিসাবে প্রক্ষিপ্ত।

**وَمَا يَنْظُرُونَ إِلَّا وَجْهَ يَوْمَئِذٍ يَوْمَئِذٍ**

এতে জানা গেল যে, রসূলুল্লাহ (সা)-র ইবাদত, লেনদেন, চরিত্র ও অভ্যাস সবই আল্লাহ তা'আলার ওহী ও কোরআনী নির্দেশের অনুসৃতি। তিনি যেখানেই নিজ ইজতিহাদ দ্বারা কোন কাজ করেছেন, সেখানে ওহী কিংবা নিষেধ না করার মাধ্যমে সত্যায়ন ও সমর্থন করা হয়েছে। ফলে তাও ওহীরই অনুসৃতি।

মোটকথা এই যে, আলোচ্য আয়াতে কোরআনের ব্যাখ্যা ও বর্ণনাকে রসূলুল্লাহ (সা)-র নব্বয়তের লক্ষ্য সাব্যস্ত করেছে; যেমন সূরা জুম'আ ও অন্যান্য সূরার কতিপয় আয়াতে গ্রন্থ শিক্ষাদান বলে এ উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয়েছে।

অপরদিকে সাহাবী ও তাবয়ী থেকে শুরু করে পরবর্তী যুগের হাদীসবিদ পর্যন্ত প্রতিভাধর মনীষীবৃন্দ প্রাণের চাইতেও অধিক হিফযত করে হাদীসের একটি বিশাল ভাণ্ডার আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। তাঁরা এর পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সারাজীবন ব্যয় করে হাদীস বর্ণনার কিছু স্তর নির্ধারণ করেছেন। তাঁরা যেসব হাদীসকে সনদের দিক দিয়ে শরীয়তের বিধানাবলীর ভিত্তি হওয়ার যোগ্য পান নি, সেগুলোকে পৃথক করে এমন হাদীসসমূহ গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন যেগুলো সারা জীবনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণার পর বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য প্রমাণিত হয়েছে।

যদি আজ কেউ হাদীসের এই ভাণ্ডারকে কোন ছলছুঁতায় অনির্ভরযোগ্য আখ্যায়িত করে, তবে এর পরিষ্কার অর্থ এই যে, রসূলুল্লাহ (সা) কোরআনী নির্দেশ অমান্য করে কোরআনের বিষয়বস্তু বর্ণনা করেন নি; কিংবা তিনি বর্ণনা করেছিলেন, কিন্তু তা অব্যাহত ও সংরক্ষিত থাকেনি। উভয় অবস্থাতেই অর্থগতভাবে কোরআন সংরক্ষিত রইল না। অথচ এর সংরক্ষণের দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা একথা বলে গ্রহণ করে-  
**وَأَنَّا لَهُ لَنَحَّاتُونَ** অতএব উপরোক্ত দাবী কোরআনের এ আয়াতের

পরিপন্থী হবে। এতে প্রমাণিত হল যে, যে ব্যক্তি হাদীস অস্বীকার করে, সে প্রকৃতপক্ষে কোরআনই অস্বীকার করে। **نَعُوذُ بِاللَّهِ**

**أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ**

أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۖ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي  
تَقْلِبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ۖ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ

لَرءُوفٌ رَحِيمٌ ۝

(৪৫) যারা কুচক্র করে, তারা কি এ বিষয়ে ভয় করে না যে, আল্লাহ্ তাদেরকে ভূগর্ভে বিলীন করে দিবেন কিংবা তাদের কাছে এমন জায়গা থেকে আঘাব আসবে, যা তাদের ধারণাশীল? (৪৬) কিংবা চলাফেরার মধ্যেই তাদেরকে পাকড়াও করবে, তারা তো তা বার্থ করতে পারবে না। (৪৭) কিংবা ভীতি প্রদর্শনের পর তাদেরকে পাকড়াও করবেন? তোমাদের পালনকর্তা তো অত্যন্ত নম্র, দয়ালু।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যারা (সত্য ধর্মকে পম্বুদস্ত করার জন্য) জঘন্য চক্রান্ত করে (কোথাও অমূলক সন্দেহ ও আপত্তি উত্থাপন করে এবং সত্যকে অস্বীকার করে; এটা নিজেদের বিপথ-গামিতা এবং কোথাও অপর লোকদেরকে বাধা দান করে; এটা অপরকে বিপথগামী করা।) তারা কি (কুফরের এসব কর্মকাণ্ড করে) এ বিষয় থেকে নিশ্চিত্তে (বসে) রয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে (কুফরের শাস্তিতে) ভূগর্ভে বিলীন করে দেবেন কিংবা এমন জায়গা থেকে তাদের ওপর আঘাব আসবে যে, তারা কল্পনাও করতে পারবে না (যেমন বদর যুদ্ধে নিরস্ত্র মুসলমানদের হাতে তারা মার খেয়েছে। অথচ তারা ঘৃণাক্ষরেও কল্পনা করতে পারত না যে, এরা জয়ী হয়ে যাবে।) কিংবা তাদেরকে চলাফেরার মধ্যে (কোন বিপদ দ্বারা) পাকড়াও করবে (যেমন অকস্মাৎ কোন রোগ আক্রমণ করে বসে) অতএব (এগুলোর মধ্যে যদি কোনটি সংঘটিত হয়ে যায়, তবে) তারা আল্লাহ্কে পরাভূত (-ও) করতে পারবে না কিংবা তাদেরকে ক্রমহ্রাস করত পাকড়াও করে ফেলবে (যেমন দুর্ভিক্ষ ও মহামারী শুরু হয়ে আস্তে আস্তে বিলুপ্ত হয়ে যাবে অর্থাৎ তাদের নিশ্চিত্ত না হওয়া উচিত। আল্লাহ্ সবই করতে পারেন, কিন্তু তিনি অবকাশ দিয়ে রেখেছেন; ) অতএব (এর কারণ এই যে) তোমাদের পালনকর্তা অত্যন্ত স্নেহশীল, পরম দয়ালু। ( তাই সময় দিয়েছেন যে, এখনও তোমাদের সুমতি ফিরে আসুক এবং তোমরা সাফল্য ও মুক্তির পথ অবলম্বন কর। )

#### আনুশঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে

ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزَوْنَ

---বলে কাফিরদেরকে

পরকালের শাস্তির ভয় প্রদর্শন করা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে তাদেরকে ভয়

প্রদর্শনার্থে বলা হয়েছে যে, পরকালের শাস্তির পূর্বে দুনিয়াতেও আল্লাহর আযাব তোমাদেরকে পাকড়াও করতে পারে। তোমরা যে মাটির ওপর বসে আছ, তার অভ্যন্তরেই তোমাদেরকে বিলীন করে দেওয়া যেতে পারে; কিংবা কোন ধারণাতীত জাঙ্গা থেকে তোমরা আঘাবে পতিত হতে পার; যেমন বদর যুদ্ধে এক হাজার অস্ত্রসজ্জিত বীরযোদ্ধা কয়েকজন নিরস্ত্র মুসলমানের হাতে এমন মার খেয়েছে, যার কল্পনাও তারা করতে পারত না। কিংবা এটাও হতে পারে যে, চলাফেরার মধ্যেই তোমরা কোন আঘাবে গ্রেফতার হয়ে যাও; যেমন কোন দুর্ভাগ্য প্রাণঘাতী ব্যাধির প্রাদুর্ভাব দেখা দিতে পারে অথবা উচ্চস্থান থেকে পতিত হয়ে অথবা শক্ত জিনিসের সাথে টক্কর লেগে মৃত্যুমুখে পতিত হতে পার কিংবা এরূপ শাস্তিও হতে পারে যে, অকস্মাৎ আঘাব না এসে টাকা-পয়সা, স্বাস্থ্য এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ সামগ্রী আন্তে আন্তে হ্রাস পেতে থাকবে এবং এভাবে হ্রাস পেতে পেতে গোটা সম্পদায়ই একদিন বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

আয়াতে ব্যবহৃত **تَخَوَّفَ** শব্দটি **خوف**---ভয় করা থেকে উদ্ভূত। এ অর্থের

দিক দিয়ে কেউ কেউ তফসীর করেছেন যে, একদলকে আঘাবে ফেলে অপর দলকে ভয় প্রদর্শন করা হবে। এভাবে দ্বিতীয় দলকে আঘাবে গ্রেফতার করে তৃতীয় দলকে ভীত-সন্ত্রস্ত করা হবে। এমনিভাবে ভয় প্রদর্শন করতে করতে সবাই নিশ্চিন্ত হয়ে যাবে।

কিন্তু তফসীরবিদ হযরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ প্রমুখ এখানে **تَخَوَّفَ** এর অর্থ নিয়েছেন **تَنَقَّصَ** অর্থাৎ হ্রাস পাওয়া। এদিক দিয়েই ক্রমহ্রাসপ্রাপ্ত তরজমা করা হয়েছে।

হযরত সায়ীদ ইবনে মুসাইয়্যাব বলেন : হযরত উমর ফারুক (রা)-ও **تَخَوَّفَ** শব্দের অর্থ বুঝতে সক্ষম হন নি। ফলে তিনি প্রকাশ্য মিছরে সাহাবীগণকে জিজ্ঞেস করেন : আপনারা **تَخَوَّفَ** শব্দের কি অর্থ বুঝেছেন? সবাই নিশ্চুপ, কিন্তু হযায়ল গোত্রের জনৈক ব্যক্তি বলল : আমীরুল মু'মিনীন, এটি আমাদের গোত্রের বিশেষ ভাষা। আমাদের ভাষায় এর অর্থ **تَنَقَّصَ** অর্থাৎ আন্তে আন্তে হ্রাসপ্রাপ্ত হওয়া। খলীফা জিজ্ঞেস করলেন : আরব কাব্যে এই শব্দটি এ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে কি? জবাবে বলা হল : হ্যাঁ। অতঃপর তিনি স্বগোত্রের কবি আবু কবীর হযায়লীর একটি কবিতা পেশ করলেন। তাতে **تَخَوَّفَ** শব্দটি আন্তে আন্তে হ্রাস করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছিল। তখন খলীফা বললেন : তোমরা অঙ্ককার মুগের কাব্য সম্পর্কে জানার্জন কর। কারণ, তা ঝাঝা কোরআনের তফসীর ও তোমাদের কথাবার্তার অর্থের ফয়সলা হয়।

কোরআন বোঝার জন্য যেনতেন আরবী জানা যথেষ্ট নয় : এ থেকে প্রথমত জানা গেল যে, আরবী ভাষা বলা ও লেখার মামুলী যোগ্যতা কোরআন বোঝার জন্য যথেষ্ট নয়; বরং এতে এতটুকু দক্ষতা অর্জন করা জরুরী, যশ্কারা প্রাচীন মুগের আরবদের কবিতাও পুরোপুরি বোঝা যায়। কেননা, কোরআন তাদেরই ভাষায় এবং তাদেরই

বাকপদ্ধতিতে অবতীর্ণ হয়েছে। কাজেই ঐ স্তরের আরবী সাহিত্য শিক্ষা করা মুসলমানদের জন্যে অপরিহার্য।

আরবী সাহিত্য শিক্ষার জন্য অঙ্ককার যুগের কবিদের কাব্য পাঠ করা জায়েয; যদিও তাতে জম্মীল কথাবার্তা আছে: এ থেকে আরও জানা গেল যে, কোরআন বোঝার জন্য অঙ্ককার যুগের আরবী সাহিত্য পাঠ করা জায়েয এবং সেই যুগের শব্দার্থ ও পড়ানো জায়েয; যদিও একথা সুপরিজাত যে, তাদের কবিতায় জাহিলিয়াসুলভ আচরণবিধি এবং ইসলাম বিরোধী ক্রিয়াকর্ম বর্ণিত হবে। কিন্তু কোরআন বোঝার প্রয়োজনে এগুলো পড়া ও পড়ানো বৈধ করা হয়েছে।

দুনিয়ার আয়াবও এক প্রকার রহমত: আলোচ্য আয়াতসমূহে দুনিয়ার বিভিন্ন আয়াব বর্ণনা করার পর সবশেষে বলা হয়েছে **ان ربكم لرؤف رحيم** এতে প্রথমে **رب** শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষকে হ'শিয়ার করার জন্য দুনিয়ার আয়াব হচ্ছে প্রতিপালকত্বের তাকিদ। এরপর তাকিদের **لام** সহকারে আল্লাহর দয়ালু হওয়া ব্যক্ত করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দুনিয়ার হ'শিয়ারি প্রকৃতপক্ষে স্নেহ ও দয়ার কারণেই হয়ে থাকে, যাতে পাকিস্তান মানুষ হ'শিয়ার হয়ে স্বীয় কর্মকাণ্ড সংশোধন করে নেয়।

**اُولَئِكَ يَرْوٰۤاۤلِی مَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَیْءٍ ۙ یَتَفَتٰۤیۡوُۡا ظِلٰلَهُۥ عَنِ الِیَمِیۡنِ**

**وَالشَّمٰۤیْلِ سُبْحٰۤاۤا تَلٰهُ وَهُمۡ دٰخِرُوۡنَ ۙ ۝۱۰ وَاللّٰهُ یَسْجُدُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ**

**وَمَا فِی الْاَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَّالْمَلٰٓئِکَةِ وَهُمۡ لَا یَسْتَكْبِرُوۡنَ ۙ ۝۱۱ یَخَافُوۡنَ رَبَّهُمۡ**

**مِّنۡ قُوۡمِهِمْ وَّیَفْعَلُوۡنَ مَا یُؤْمَرُوۡنَ ۙ ۝۱۲ وَقَالَ اللّٰهُ لَا تَتَّخِذُوۡا الِالٰهَیۡنِ**

**اِثْنِیۡنَ ۙ اِنۡتَا هُوَ الٰهُ وَّوَاحِدٌ ۙ فَاِیَّٰی فَاَرْهَبُوۡنَ ۙ ۝۱۳ وَلَهُۥ مَا فِی السَّمٰوٰتِ**

**وَالْاَرْضِ وَلَهُۥ الدِّیۡنُ وَاَصْبَابُ ۙ اَفَغَیۡرَ اللّٰهِ تَتَّقُوۡنَ ۙ ۝۱۴ وَبَآئِکُمْ مِّنۡ رُّعْمَةٍ**

**فِیۡنَ اللّٰهِ ثُمَّ اِذَا مَسَّکُمُ الضَّرۡفُۡۤاۤلِیۡهِ تَجُرُّوۡنَ ۙ ۝۱۵ ثُمَّ اِذَا کُشِفَ**

**الضَّرۡعَۡنَکُمۡ اِذَا فَرِیۡقٌ مِّنۡکُمْ بِرِیۡبِهِمۡ یُشۡرِکُوۡنَ ۙ ۝۱۶ لَیَکْفُرُوۡا بِمَا**

**اٰتٰیۡنٰهُمۡ ۙ فَتَسْتَعُوۡۤاۤتِۡ فُسُوۡۤفَ تَعْلَمُوۡنَ ۙ ۝۱۷ وَیَجْعَلُوۡنَ لِمَا لَا یَعْلَمُوۡنَ**

**نَصِیۡبًا ۙ مَّا رَسَدُوۡۤاۤتِهِمْ ۙ تَاللّٰهِ لَکُنۡتُمْ تَفٰتُرُوۡنَ ۙ ۝۱۸ وَیَجْعَلُوۡنَ**

## لِلَّهِ الْبَدَنُ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ﴿٥٠﴾

(৪৮) তারা কি আল্লাহর সৃজিত বস্তু দেখে না, যার ছায়া আল্লাহর প্রতি বিনীতভাবে সিজদাখনত থেকে ডান ও বাম দিকে ঝুঁকে পড়ে। (৪৯) আল্লাহকে সিজদা করে যা কিছু নভোমণ্ডলে আছে এবং যা কিছু ভূমণ্ডলে আছে এবং ফিরিশতাগণ; তারা অহংকার করে না। (৫০) তারা তাদের ওপর পরাক্রমশালী তাদের পালনকর্তাকে ভয় করে এবং তারা যা আদেশ পায়, তা করে। (৫১) আল্লাহ বললেনঃ তোমরা দুই উপাস্য গ্রহণ করো না—উপাস্য তো মাত্র একজনই। অতএব আমাকেই ভয় কর। (৫২) যা কিছু নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে আছে তা তাঁরই এবং তাঁরই ইবাদত করা শাস্ত কর্তব্য। তোমরা কি আল্লাহ ব্যতীত কাউকে ভয় করবে? (৫৩) তোমাদের কাছে যে সমস্ত নিয়ামত আছে, তা আল্লাহরই পক্ষ থেকে। অতঃপর তোমরা যখন দুঃখ-কষ্টে পতিত হও তখন তাঁরই নিকট কান্নাকাটি কর। (৫৪) এরপর যখন আল্লাহ তোমাদের কষ্ট দূরীভূত করে দেন, তখনই তোমাদের একদল স্বীয় পালনকর্তার সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করতে থাকে, (৫৫) যাতে ঐ নিয়ামত অস্বীকার করে, যা আমি তাদেরকে দিয়েছি। অতএব মজা ভোগ করে নাও—সব্বরই তোমরা জানতে পারবে। (৫৬) তারা আমার দেওয়া জীবনোপকরণ থেকে তাদের জন্য একটি অংশ নির্ধারিত করে, যাদের কোন খবরই তারা রাখে না। আল্লাহর কসম, তোমরা যে অপবাদ আরোপ করছ, সে সম্পর্কে অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হবে। (৫৭) তারা আল্লাহর জন্য কন্যা সন্তান নির্ধারণ করে—তিনি পবিত্র মহিমাম্বিত এবং নিজেদের জন্য ওরা তাই স্থির করে যা ওরা চায়।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তারা কি আল্লাহর সৃষ্ট বস্তুসমূহ দেখেনি, (এবং দেখে তওহীদে বিশ্বাস স্থাপন করেনি) মাদের ছায়া কখনও একদিকে, কখনও অন্যদিকে এমনভাবে ঝুঁকে পড়ে যে, তারা আল্লাহর (আদেশের সম্পূর্ণ) অধীন? (অর্থাৎ ছায়ার কারণসমূহ, যেমন সূর্যের উজ্জ্বল্য ও ছায়াবিশিষ্ট দেহের ঘনত্ব এবং ছায়ার গতির কারণ অর্থাৎ সূর্যের গতি, এরপর ছায়ার বৈশিষ্ট্যসমূহ, এগুলো সব আল্লাহর আজ্ঞাধীন) এবং (ছায়াবিশিষ্ট) সেসব বস্তুও (আল্লাহর সামনে) অক্ষম (ও তাঁরই আজ্ঞাবহ)। এবং (উল্লিখিত বস্তুসমূহের গতিবিধি তাদের ইচ্ছাধীন নয়। **طال** শব্দের দিকে) **سُنَاد** এর **سُنَاد** থেকে তা বোঝা যায়। কেননা ইচ্ছাগত গতিশীল বস্তুর মধ্যে ছায়ার গতি স্বয়ং সে বস্তুর গতি থেকে সৃষ্টি হয়। এসব বস্তু যেমন আল্লাহর আজ্ঞাধীন, তেমনি) আল্লাহ তা'আলারই আজ্ঞাধীন (ইচ্ছায়) চলমান যত বস্তু আকাশসমূহে (যেমন, ফেরেশতা) এবং পৃথিবীতে (যেমন, জীবজন্তু) বিদ্যমান রয়েছে এবং (বিশেষভাবে) ফেরেশতারা। বস্তুত তারা (ফেরেশতারা) উচ্চ স্থান ও উচ্চ মর্তব্য (অধিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর



আনুগত্যের ব্যাপারে) অহংকার করে না (এবং একারণেই বিশেষভাবে তাদের উল্লেখ করা হয়েছে, যদিও তারা **مَا فِي السَّمَاوَاتِ**—এর অন্তর্ভুক্ত ছিল।) তারা স্বীয়

পালনকর্তাকে ভয় করে, যিনি সর্বোপরি এবং তাদেরকে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) যে আদেশ দেওয়া হয় তারা তা পালন করে। আল্লাহ তা'আলা (সবাইকে পরাগম্বরণগণের মাধ্যমে) বলেছেন, দুই (অথবা অধিক) উপাস্য সাব্যস্ত করো না। অতএব একজনই উপাস্য। (কাজেই) তোমরা বিশেষভাবে আমাকেই ভয় কর (কারণ, আমিই যখন বিশেষভাবে উপাস্য, তখন এর যেসব অত্যাবশ্যকীয় শর্ত রয়েছে—যেমন, অপার শক্তির অধিকারী হওয়া ইত্যাদি সেগুলোও আমারই বৈশিষ্ট্য হবে। সুতরাং প্রতিশোধ ইত্যাদির ভয় আমার প্রতিই করা উচিত। শিরক প্রতিগোষ্পহার উদ্দেশ্য ঘটায়। সুতরাং শিরক থেকে বঁচে থাকা উচিত।) এবং তাঁরই (মালিকানায়) রয়েছে যাবতীয় বস্তুনিচয়, যা নভো-মণ্ডল ও ভূমণ্ডলে রয়েছে এবং অবশ্যস্বাবীরূপে আনুগত্য তাঁরই প্রাপ্য (অর্থাৎ তিনিই যোগ্য যে, সবাই তাঁর আনুগত্য করবে। যখন একথা প্রমাণিত) অতঃপর তবুও কি আল্লাহ্ ব্যতীত অপরকে ভয় করছ? (এবং অপরকে ভয় করে তার পূজা করছ?) এবং (ভয়ের যোগ্য যেমন আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ নেই, তেমনি নিয়ামতদাতা ও আশার যোগ্য আল্লাহ্ ছাড়া কেউ নেই। সেমতে) তোমাদের কাছে যা কিছু (এবং যে কোন প্রকার) নিয়ামত রয়েছে, তা সবই আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে। অতঃপর তোমরা যখন (সামান্য) কষ্ট পাত, তখন (তা দূরীভূত হওয়ার জন্য) তাঁর (অর্থাৎ আল্লাহর) কণ্ঠেই ফরিয়াদ কর (তখন কোন বিগ্রহ-প্রতিমার কথা মনে থাকে না)। (সে সময় তোমাদের কর্মজনিত স্বীকারোক্তির দ্বারাও জানা যায় যে, তওহীদই সত্য। কিন্তু) এরপর যখন (আল্লাহ্) তোমাদের উপর থেকে কষ্টকে অপসারিত করেন, তখন তোমাদের এক (বড়) দল পালনকর্তার সাথে (পূর্ববৎ) শিরক করতে থাকে। (এর সান্ন্যাস এই যে) আমার দেওয়া নিয়ামতের (অর্থাৎ কষ্ট অপসারণের) নাশোকরী করে। (এটা সুজিগতভাবেও মন্দ।) যাক, ক্লণিক মজা লুটে নাও (দেখ) অতিসত্বর (মৃত্যুর পরই) তোমরা জানতে পারবে। ('একদল' বলার কারণ এই যে, কিছুসংখ্যক লোক এ অবস্থা স্মরণে রেখে তাওহীদ ও ঈমানের ওপর কায়ম হয়ে যায় যেমন, বলা হয়েছে :

**فَلَمَّا نَبَا نَحْنُ إِلَىٰ آلِهِمْ فَمَنَّهُمْ مَّقْتَدٌ** এবং (তারা যেসব শিরক করে,

তন্মধ্যে একটি এই যে) তারা আমার দেওয়া বস্তুসমূহের মধ্যে তাদের (অর্থাৎ উপাস্যদের) অংশ স্থির করে, যাদের (উপাস্য হওয়া) সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞান (এবং প্রমাণ ও সন্দ) নেই। এর বিস্তারিত বিবরণ ৮ম পারার তৃতীয় রুকুতে **وَجَعَلُوا اللَّهَ**

আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহর কসম, তোমাদের এসব মিথ্যা অপবাদ সম্পর্কে (কিয়ামতের দিন) অবশ্যই জিজ্ঞাসা করা হবে। (তাদের অপর একটি শিরক এই যে)

তারা আল্লাহ্‌র জন্য কন্যা সাব্যস্ত করে। (সোবহানালাহ, কেমন বাজে কথা)। এবং (উপলোভ) নিজেদের পছন্দসই (অর্থাৎ পুত্র পছন্দ করে)।

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾  
 يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَبِهِ ۗ أَيَسْكَبُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ  
 فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٥٩﴾ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ  
 بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السُّوءِ ۗ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ  
 الْحَكِيمُ ﴿٦٠﴾

(৫৮) যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয়, তখন তার মুখ কাল হয়ে যায় এবং অসহ্য মনস্তাপে ক্রিষ্ট হতে থাকে। (৫৯) তাকে শোনানো সুসংবাদের দুঃখে সে লোকদের কাছ থেকে মুখ লুকিয়ে থাকে। সে ভাবে, অপমান সহ্য করে তাকে থাকতে দেবে, না তাকে মাটির নিচে পুঁতে ফেলবে। শুনে রাখ, তাদের ফয়সালা খুবই নিরুচ্চ। (৬০) যারা পরকালে বিশ্বাস করে না তাদের উদাহরণ নিরুচ্চ এবং আল্লাহ্‌র উদাহরণই মহান, তিনি পরক্রমশালী, প্রভাময়।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের অর্থাৎ কন্যা জন্মের সুসংবাদ দেওয়া হয়, (যা তারা আল্লাহ্‌র জন্য সাব্যস্ত করে) তখন (এতই অসন্তুষ্ট হয় যে,) সারা দিন তার মুখ বিবর্ণ হয়ে থাকে এবং সে মনে মনে জ্বলতে থাকে এবং যে বিষয়ের সংবাদ দেওয়া হয়েছে (অর্থাৎ কন্যা জন্মগ্রহণ) তার লজ্জায় মানুষের কাছ থেকে মুখ লুকিয়ে ফেরে (এবং মনে মনে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয় যে) তাকে (নবজাতকে) অপমান সহ্য করে রেখে দেবে, না (জীবিত অবস্থায় অথবা মেরে) মাটিতে পুঁতে ফেলবে। মনে রেখো, তাদের এ ফয়সালা খুবই মন্দ। (প্রথমত আল্লাহ্‌র জন্য সন্তান সাব্যস্ত করা—এটা কতই না মন্দ! এরপর সন্তানও কোনটি? যাকে তারা নিজেদের জন্য এতটুকু লজ্জা ও অপমানের বিষয় বলে মনে করে।) যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তাদের অভ্যাস মন্দ (দুনিয়াতেও—কারণ, তারা এ ধরনের মূর্খতায় লিপ্ত রয়েছে এবং পরকালেও—কারণ, এজন্য তাদেরকে শাস্তি ও অপমানে পতিত হতে হবে।) এবং আল্লাহ্‌র জন্য সর্বোচ্চ গুণাবলী প্রমাণিত রয়েছে (মুশরিকরা যা বলে তা নয়) এবং তিনি পরক্রমশালী (যদি তাদেরকে দুনিয়াতে শিরকের শাস্তি দিতে চান, তবে তার পক্ষে মোটেই তা কঠিন নয়, কিন্তু

সাথে সাথেই) প্রভাময় (-ও বটে। তাঁর অপরিমেয় প্রভাহেতু তিনি মৃত্যুর পর পরমন্ত শান্তি পিছিয়ে দিয়েছেন)।

### জানুশরিক জাতিব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে কাফিরদের দুটি বদ অভ্যাসের নিন্দা করা হয়েছে। প্রথম, তারা নিজেদের ঘরে কন্যা সন্তানের জন্মগ্রহণকে এত খারাপ মনে করে যে, লজ্জার মানুষের সামনে দেখা পরমন্ত দেয় না এবং চিন্তা করতে থাকে যে, কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণের কারণে তার যে বেইশ্ব্যতি হয়েছে, তা মেনে নিয়ে সবর করবে, না একে জীবিত কবরস্থ করে এ থেকে নিষ্কৃতি লাভ করবে। উপরন্তু মূর্খতা এই যে, যে সন্তানকে তারা নিজেদের জন্য পছন্দ করে না, তাকেই আলাহ্‌র সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে বলে যে, ফেরেশতারা হল আলাহ্‌ তা'আলার কন্যা।

দ্বিতীয় আয়াতের শেষে বলা হয়েছে : **أَلَسَاءَ مَا يَدْعُونَ** তফসীরে বাহুরে-মুহীতে ইবনে আতিয়্যার বরাতে দিয়ে এ বাক্যের মর্ম উপরোক্ত দু'টি বদ অভ্যাসকে সাব্যস্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রথমত তাদের এ ফয়সালাটিই মন্দ যে, কন্যা সন্তান শান্তি ও বেইশ্ব্যতির কারণ। দ্বিতীয়ত যে বস্তুকে তারা নিজেদের জন্য বেইশ্ব্যতি মনে করে, তাকে আলাহ্‌র সাথে সম্বন্ধযুক্ত করে।

তৃতীয় আয়াতের শেষে **وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ** বাক্যেও এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণকে বিপদ ও অপমান মনে করা এবং মুখ লুকিয়ে ফেরা আলাহ্‌র রহস্যের মুকাবিলা করার নামান্তর। কেননা, নর ও নারীর সৃষ্টি আলাহ্‌র একটি সাক্ষাত প্রত্যাপূর্ণ বিধি।—(রাহুল বয়ান)

মাস'আলা : আলোচ্য আয়াত থেকে সম্পূর্ণ ইঙ্গিত পাওয়া গেল যে, কন্যা সন্তানের জন্মগ্রহণকে বিপদ ও অপমান মনে করা বৈধ নয়। এটা কাফিরদের কাজ। তফসীর রাহুল বয়ানে উল্লিখিত রয়েছে যে, কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে মুসলমানদের আনন্দ প্রকাশ করা উচিত, যাতে অন্ধকার যুগের কুপ্রথা খণ্ডন হয়ে যায়। এক হাদীসে বলা হয়েছে, ঐ মহিলা পূণ্যময়ী, যার প্রথম গর্ভের সন্তান কন্যা হয়। কোরআন পাকের

**يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذَّكَوْرَ**—আয়াতে কন্যার কথা

অগ্রে উল্লেখ করার ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, প্রথম গর্ভ থেকে কন্যা জন্মগ্রহণ করা উত্তম।

অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে, কন্যা সন্তানদের সাথে যে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে, অতঃপর সে যদি তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করে, তাহলে তার ও জাহান্নামের মধ্যে সেই সন্তানের প্রাচীর হয়ে দাঁড়াবে।—(রাহুল বয়ান)

মোটকথা, কন্যা সন্তানকে খারাপ মনে করা জাহিলিয়াত যুগের কুপ্রথা। এ থেকে মুসলমানদের বেঁচে থাকা উচিত এবং এর বিপরীতে আল্লাহর ওয়াদায় মুসলমানদের আনন্দিত ও সন্তুষ্ট থাকা কর্তব্য।

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ  
 وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ  
 لَا يَسْتَخِرُونَ سَاعَةً ۚ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ۝ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ  
 مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكُذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ  
 لَا جرمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُّفْرَطُونَ ۝ تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا  
 إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْيَابَهُمْ فَهُمْ  
 وَليَهُمُ اليَوْمَ وَلَهُمُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ  
 الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ ۖ وَهُدًى وَرَحْمَةً  
 لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝ وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ  
 بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ۝

(৬১) যদি আল্লাহ লোকদেরকে তাদের অন্যায় কাজের কারণে পাকড়াও করতেন, তবে জু-পৃষ্ঠে চলমান কোন কিছুকেই ছাড়তেন না। কিন্তু তিনি প্রতিশ্রুত সময় পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দেন। অতঃপর নির্ধারিত সময়ে যখন তাদের যত্ন এসে যাবে, তখন এক মুহূর্তও বিলম্বিত কিংবা ত্বরান্বিত করতে পারবে না। (৬২) যা নিজেদের মন চায় না তাই তারা আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করে এবং তাদের জিহ্বা মিথ্যা বর্ণনা করে যে, তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ। স্বতঃসিদ্ধ কথা যে, তাদের জন্য রয়েছে আগুন এবং তাদেরকেই সর্বাপ্রাে নিষ্কপ করা হবে। (৬৩) আল্লাহর কসম, আমি আপনাদের পূর্বে বিভিন্ন সম্প্রদায়ে রসূল প্রেরণ করেছি, অতঃপর শয়তান তাদেরকে কর্মসমূহে পোক্তনীয় করে দেখিয়েছে। আজ সে-ই তাদের অভিভাবক এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (৬৪) আমি আপনাদের প্রতি এ জন্যই গ্রহণ নাহিল করেছি, যাতে আপনি সরল পথ প্রদর্শনের জন্য তাদেরকে পরিষ্কার বর্ণনা করে দেন, যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করছে

এবং ইমানদারকে ক্ষমা করার জন্য। (৬৫) আল্লাহ্ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, তুম্বারীয়া যমীনকে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেছেন। নিশ্চয় এতে তাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে, যারা শ্রবণ করে।

### তক্ষসীরের সার-সংক্ষেপ

যদি আল্লাহ্ তা'আলা (অন্যায়কারী) লোকদেরকে তাদের অন্যায় কর্মের (শিরক ও কুফরের) কারণে (তাৎক্ষণিকভাবে দুনিয়াতে পুরোপুরি) পানকড়াও করতেন, তবে ভূ-পৃষ্ঠের উপর (চেতনাশীল ও) চলমান কাউকে ছাড়তেন না (বরং সবাইকে ধ্বংস করে দিতেন) কিন্তু (তিনি তাৎক্ষণিকভাবে পানকড়াও করেন না বরং) একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত অবকাশ দিচ্ছেন (যাতে কেউ তওবা করতে চাইলে তা করতে পারে)। অতঃপর যখন তাদের (ঐ) নির্দিষ্ট সময় (নিকটে) এসে যাবে, তখন এক মুহূর্তও (তা থেকে) পিছু সরতে পারবে না এবং এগিয়ে আসতেও পারবে না (বরং তৎক্ষণাৎ শাস্তি হয়ে যাবে।) তারা আল্লাহ্‌র জন্য সেসব বিষয় সাব্যস্ত করে যেগুলো স্বপ্ন (নিজেদের জন্য) অগচ্ছন্দ করে—(যেমন, পূর্বে বর্ণিত হয়েছে **وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْوَلَدَاتِ**) এবং মুখে

মিথ্যা দাবী করতে থাকে যে, তাদের (অর্থাৎ আমাদের) জন্য যদি কিয়ামত হবে বলে ধরে নেওয়া হয়, তাহলে তাতে সর্বপ্রকার মঙ্গল (নিহিত) রয়েছে। (আল্লাহ্ বলেন, মঙ্গল আসবে কোথেকে? বরং) অনিবার্য কথা এই যে, কিয়ামতের দিন। তাদের জন্য রয়েছে দোযখ এবং নিশ্চয়ই তারা (দোযখে) সর্বপ্রথম নিক্ষিপ্ত হবে। হে মুহাম্মদ (সা)। আপনি তাদের কুফর ও মূর্খতার কারণে দুঃখিত হবেন না। কেননা, আল্লাহ্‌র কসম, আপনার (মুগের) পূর্ববর্তী সপ্তদায়সমূহের কাছেও আমি রসূল প্রেরণ করেছিলাম, (যেমন আপনাকে তাদের কাছে পাঠিয়েছি) অতঃপর (এরা যেমন নিজেদের কুফরী কর্মসমূহকে গচ্ছন্দ করে এগুলোকে আঁকড়ে রয়েছে, তেমনি) শয়তানও তাদেরকে তাদের (কুফরী) কাজকর্ম শোভনীয় করে দেখিয়েছে। সূতরাং সে-ই (শয়তানই) আজ তাদের সহচর (যেমন দুনিয়াতে সহচর ছিল এবং তাদেরকে বিপথগামী করত। এ হচ্ছে তাদের দুনিয়ার ক্ষতি) এবং (কিয়ামতে) তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (মোট কথা এই পূর্ববর্তীরাও পূর্ববর্তীদের মত কুফর করছে এবং তাদের মতই এদেরও শাস্তি হবে। আপনি কেন চিন্তা করবেন?) আমি আপনার প্রতি এ গ্রন্থ (কোরআন) এজন্য নাযিল করিনি যে, সবাইকে সৎপথে আনা আপনার দায়িত্ব হবে; যাতে কেউ কেউ সৎপথে না আসলে আপনি দুঃখিত হবেন; বরং) শুধু এজন্য নাযিল করেছি, যাতে যে (ধর্মীয়) বিষয়ে তারা মতবিরোধ করছে (যেমন, তওহীদ, পরকাল ও হালাল-হারামের বিষয়) তা আপনি (সাধারণ) লোকদের কাছে প্রকাশ করে দেন। (কোরআনের এ উপকারটি ব্যাপক।) এবং বিশ্বাসীদের (বিশেষ) হিদায়ত ও রহমতের জন্য (নাযিল করেছেন। অতএব আল্লাহ্‌র ক্ষমলে এসব বিষয় অর্জিত হয়েছে।) আল্লাহ্ তা'আলা আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন। অতঃপর তুম্বারীয়া যমীনকে মৃত হওয়ান্ন

পর জীবিত করেছেন (অর্থাৎ শুরু হয়ে তার উৎপাদন শক্তি দুর্বল হওয়ার পর তাকে সতেজ করেছেন।) এতে (উল্লিখিত বিষয়ে) তাদের জন্য (তওহীদ ও নিয়ামতদাতা হওয়ার) বড় প্রমাণ রয়েছে, যারা (মনোযোগ দিয়ে এসব কথাবার্তা) শ্রবণ করে।

وَأَنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۗ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِمْ مِنْ  
بَيْنِ قَرْنٍ وَ دَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّرْبِ ۖ

(৬৬) তোমাদের জন্য চতুর্দশ জন্তুদের মধ্যে চিন্তা করার অবকাশ রয়েছে। আমি তোমাদেরকে পান করাই তাদের উদরস্থিত বহুসমূহের মধ্য থেকে গোবর ও রক্ত নিঃসৃত দুগ্ধ বা পানকারীদের জন্য উপাদেয়।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং (এছাড়া) চতুর্দশ জন্তুদের মধ্যেও তোমাদের চিন্তা-ভাবনা করা দরকার। (দেখ) তাদের পেটে যে গোবর ও রক্ত (অর্থাৎ রক্তের উপকরণ) রয়েছে, তার মাঝখান দিয়ে (দুগ্ধের উপকরণ, যা রক্তেরই এক অংশ—হৃৎয়ের পর পৃথক করে স্তনের প্রকৃতি অনুযায়ী বড় পরিবর্তন করে, তাকে) পরিষ্কার ও সহজে গলাধঃকরণযোগ্য দুধ (করে) আমি তোমাদেরকে পান করতে দেই।

### জানুয়ারি জাতীয় বিষয়

بَطُونُهُمْ শব্দের সর্বনামটি أَنْعَامُ কে বোঝায়। أَنْعَامُ বহুবচন, স্ত্রীলিঙ্গ হওয়ার কারণে بَطُونُهُمْ বলা ব্যাকরণসম্মত ছিল। যেমন, সূরা মু'মিনুনে এভাবেই نُسْقِيكُمْ

مِمَّا فِي بُطُونِهَا বলা হয়েছে।

কুরতুবী এর কারণ বর্ণনা করে বলেন : সূরা মু'মিনুনে বহুবচনের অর্থের দিকে লক্ষ্য করে সর্বনাম স্ত্রীলিঙ্গ ব্যবহার করা হয়েছে এবং সূরা নাহলে বহুবচনের রেয়াত করে সর্বনাম পুংলিঙ্গ ব্যবহার করা হয়েছে। আরবদের বাচন পদ্ধতিতে এর ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত রয়েছে। তারা বহুবচন শব্দের জন্য একবচন সর্বনাম ব্যবহার করে।

গোবর ও রক্তের মাঝখান দিয়ে পরিষ্কার দুধ বের করা সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন : জন্তুর উচ্চিত্ত হাস তার পাকস্থলীতে একত্রিত হয়ে পাকস্থলী তা সিদ্ধ করে। পাকস্থলীর এই ক্রিয়ার ফলে খাদ্যের বিষ্ঠা নিচে বসে যায় এবং দুধ

উপরে থেকে যায়। দুধের উপরে থাকে রক্ত। এরপর যুক্ত এই তিন প্রকার বস্তুকে পৃথকভাবে তাদের স্থানে ভাগ করে দেয়, রক্ত পৃথক করে রূগের মধ্যে ঢালায় এবং দুধ পৃথক করে জন্তুর স্তনে পৌঁছে দেয়। এখন পাকস্থলীতে শুধু বিষ্ঠা থেকে যায়, যা গোবর হয়ে বের হয়ে আসে।

মাস'আলা : এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, সূন্যাদু ও উপাদেয় খাদ্য ব্যবহার করা দীনদারীর পরিপন্থী নয়। তবে শর্ত এই যে, হালাল পথে উপার্জন করতে হবে এবং অপব্যয় যাতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। হযরত হাসান বসরী (র.) তাই বলেছেন।---(কুরতুবী)

রসূলুলাহ্ (সা) বলেছেন : তোমরা আহারের সময় এরূপ দোয়া করবে---  
 اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ ---অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আমাদেরকে

এতে বরকত দিন এবং ভবিষ্যতে আরও উত্তম খাদ্য দিন। তিনি আরও বলেছেন : দুধ পান করার সময় এরূপ দোয়া করবে---  
 اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَارْزُقْنَا مِنْهُ ---অর্থাৎ

হে আল্লাহ্! আমাদেরকে এতে বরকত দিন এবং আরও বেশি দান করুন। এর চাইতে উত্তম খাদ্য চাওয়া হয়নি। কারণ, মানুষের খাদ্য তালিকায় দুধের চাইতে উত্তম কোন খাদ্য নেই। তাই আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক মানুষ ও জন্তুর প্রথম খাদ্য করেছেন দুধ, যা মায়ের স্তন থেকে সে লাভ করে।---(কুরতুবী)

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝

(৬৭) এবং খেজুর রস ও আঙ্গুর ফল থেকে তোমরা মদ্য ও উত্তম খাদ্য তৈরী করে থাক, এতে অবশ্যই বোধশক্তিসম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং (এছাড়া) খেজুর ও আঙ্গুরের (ব্যাপারে চিন্তা করা উচিত যে, এসব) ফল-সমূহ থেকে তোমরা নেশাকর প্রবাদি ও উত্তম খাদ্যসামগ্রী (যেমন শুকনো খুর্মা, কিশমিশ শরবত ও সিকা ইত্যাদি) তৈরী করে থাক। নিঃসন্দেহে এতে (-ও তওহীদ এবং তাঁর মহান ও উদার হওয়া সম্পর্কে) সে সব লোকদের জন্য বড় দলীল রয়েছে, যারা (সুস্থ) বোধশক্তিসম্পন্ন।

### আনুশঙ্গিক জাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তা'আলার সেসব নিয়ামতের উল্লেখ ছিল, যা মানুষের খাদ্য প্রবাদির প্রস্তুতিতে আশ্চর্যজনক ও বিস্ময়কর আল্লাহ্‌র নৈপুণ্য ও কুদরতের প্রকাশক।

এ প্রসঙ্গে প্রথমে দুধের কথা উল্লিখিত হয়েছে, আল্লাহর কুদরত যা চতুর্দশ জীব-জন্তুর উদরস্থিত রক্ত ও আর্জনা জজালের মলিনতা থেকে পৃথক করে মানুষের জন্য স্বচ্ছ-পরিষ্কার খাদ্যের আকারে প্রদান করেছে, মার প্রস্তুতিতে মানুষের অতিরিক্ত নৈপুণ্যের প্রয়োজন হয় না। এজন্যই পূর্ববর্তী আয়াতে **نَسْتَيْكُم** শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যে, আমরা দুধ পান করিয়েছি।

এরপরে ইরশাদ করেছেন, খেজুর ও আঙ্গুরের ফলসমূহের মধ্য থেকেও মানুষ তার খাদ্য ও লাভজনক সামগ্রী তৈরী করে। এই বাক্যের দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, খেজুর ও আঙ্গুরের ফলসমূহ থেকে নিজেদের খাদ্যোপকরণ ও লাভজনক দ্রব্যসামগ্রীর প্রস্তুতিতে মানবীয় নৈপুণ্যেরও কিছুটা অবদান রয়েছে। আর এই নৈপুণ্যের ফলেই দু'ধরনের দ্রব্যসামগ্রী তৈরী করা সম্ভব হয়েছে। এর একটি হলো—মাদক দ্রব্য, যাকে মদ্য ও শরাব বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। দ্বিতীয়টি হলো—উত্তম জীবনোপকরণ অর্থাৎ উত্তম রিযিক। যেমন, খেজুর ও আঙ্গুরকে তাজা খাবার হিসেবে ব্যবহার করা যায় অথবা শুকিয়ে তাকে মজুতও করে নেওয়া যায়। সুতরাং মর্মার্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর অপার শক্তিবলে খেজুর ও আঙ্গুর ফল মানুষকে দান করেছেন এবং তন্দ্বারা খাদ্য ইত্যাদি প্রস্তুত করার ক্ষমতাও দিয়েছেন। এখন এটা তাদের নিজের অভিরুচি যে, কি প্রস্তুত করবে—মাদকদ্রব্য তৈরী করে বুদ্ধি-বিবেক নষ্ট করবে, না খাদ্য তৈরী করে শক্তি অর্জন করবে ?

এ তফসীর অনুযায়ী আলোচ্য আয়াত থেকে মাদকদ্রব্য অর্থাৎ মদ হালাল হওয়ার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কেননা, এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে সর্বশক্তিমানের দান এবং সেগুলো ব্যবহার করার বিভিন্ন প্রক্রিয়া বর্ণনা করা। এগুলো সর্বাবস্থায় আল্লাহর নিয়ামত ; যেমন মাবতীয় খাদ্যসামগ্রী এবং উপাদেয় বস্তুসমূহ। অনেক মানুষ এগুলোকে অবৈধ পছন্দও ব্যবহার করে। কিন্তু দ্রাস্ত ব্যবহারের ফলে আসল নিয়ামতের পর্যায় থেকে তা বিয়োজিত হয়ে যায় না। তবে এখানে কোন ব্যবহারটি হালাল ও কোন্টি হারাম, তা বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই। এতদসত্ত্বেও এখানে **سکر**-এর বিপরীত **رِزْقِ حَسَنِ** আনার কারণে জানা গেছে যে, **سکر** ভাল রিযিক নয়। অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে **سکر**--এর অর্থ মাদকদ্রব্য, যা নেশা সৃষ্টি করে। --(ক্লাহল মা'আনী, কুরতুবী, জাসসাস)

(কোন কোন আলিমের মতে এর অর্থ সিকাঁ ও এমন নবীম, যা নেশা সৃষ্টি করে না। কিন্তু এখানে এ মতবিরোধ উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই।)

আলোচ্য আয়াতটি সর্বসম্মতিক্রমে মন্সার অবতীর্ণ। মদের নিষেধাজ্ঞা এর পরে মদীনায় অবতীর্ণ হয়েছে। আয়াতটি নাযিল হওয়ার সময় মদ হালাল ছিল এবং মুসলমানরা সাধারণভাবে তা পান করত। কিন্তু তখনও এ আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মদ্যপান



ভাল নয়। পরবর্তীকালে স্পষ্টত শরীফকে কঠোরভাবে হারাম করার জন্য কোরআনে বিধি-বিধান অবতীর্ণ হয়।—( জাসাস, কুরতুবী—সংক্ষেপিত )

وَأَوْطِ رَبِّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا  
وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ۝ ثُمَّ كَلِي مِنْ كُلِّ الشَّجَرِ  
فَأَسْكِنِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً يَخْرُجُ مِنْ بَطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ  
أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝

(৬৮) আপনার পালনকর্তা মধুমক্ষিকাকে আদেশ দিলেন : পর্বতগারে, বৃক্ষ এবং উঁচু চালে গৃহ তৈরী কর, (৬৯) এরপর সর্বপ্রকার ফল থেকে উচ্চপন কর এবং আপন আপন পালনকর্তার উন্মুক্ত পথসমূহে চলমান হও। তার পেট থেকে বিভিন্ন রঙের পানীয় নির্গত হয়। তাতে মানুষের জন্য রয়েছে রোগের প্রতিকার। নিশ্চয় এতে চিন্তা-শীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং (এ বিষটিও প্রণিধানযোগ্য যে, ) আপনার পালনকর্তা মৌমাছির মনে একথা চেলে দিলেন যে, তুমি পাহাড়সমূহে গৃহ ( অর্থাৎ মধুচক্র ) তৈরী করে নাও এবং বৃক্ষ-সমূহে ( -ও ) এবং লোকেরা যে, দালানকোঠা নির্মাণ করে, তাতে ( -ও চাক বানিয়ে নাও । সেমতে মৌমাছি এসব স্থানেই মধুচক্র তৈরী করে । ) অতঃপর সর্বপ্রকার ( বিভিন্ন ) ফল থেকে ( যা তোমার পছন্দসই হয় ) চুষে খাও । এরপর ( চুষে চাকের দিকে ফিরে আসার জন্য ) স্বীয় পালনকর্তার পথসমূহে চল, যা ( তোমার জন্য চলার ও মনে রাখার দিক দিয়ে ) সহজ । ( সেমতে মৌমাছি অনেক অনেক দূর থেকে রাস্তা না ভুলে চাকে ফিরে আসে । রাস চুষে যখন চাকের দিকে ফিরে আসে, তখন ) তার পেট থেকে এক-প্রকার পানীয় ( অর্থাৎ মধু ) নির্গত হয় যার রঙ বিভিন্ন । তাতে মানুষের ( অনেক রোগের ) জন্য প্রতিষেধক রয়েছে । এতে ( -ও ) তাদের জন্য ( তওহীদ ও নিয়ামত দালা হওয়ান ) বড় প্রমাণ আছে যারা চিন্তা করে ।

#### আনুষ্ঠানিক আতব্য বিষয়

وَحَىٰ—وَحَىٰ শব্দটি পান্নিভাসিক অর্থে নয়, আভিধানিক অর্থে

ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ কাউকে কোন বিশেষ কথা গোপনে এমনভাবে বুঝিয়ে দেওয়া যে, অন্য ব্যক্তি তা বুঝতে না পারে ।

النحل

জ্ঞান, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও সুকৌশলের দিক দিয়ে মৌমাছি সমস্ত জন্তুর মধ্যে বিশেষ শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। তাই আল্লাহ তা'আলা তাকে সম্বোধনও স্বতন্ত্র ভঙ্গিতে করেছেন। অন্য জন্তুদের ব্যাপারে সামগ্রিক নীতি হিসাবে

أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ

ثُمَّ هَدَىٰ

বলেছেন, কিন্তু এই ছোট প্রাণীটির ক্ষেত্রে বিশেষভাবে

أَوْهَىٰ وَبَيَّنَّا

বলেছেন। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এটি অন্য জন্তুদের তুলনায় জ্ঞানবুদ্ধি, চেতনা ও বোধশক্তিতে একটি বিশেষ মর্যাদার অধিকারী।

মৌমাছিদের বোধশক্তি ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি তাদের শাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে সুন্দররূপে অনুমান করা যায়। এই দুর্বল প্রাণীর জীবন ব্যবস্থা মানুষের রাজনীতি ও শাসননীতির সাথে চমৎকার খাপ খায়। সমগ্র আইন-শৃঙ্খলা একটি বড় মৌমাছির হাতে থাকে এবং সে-ই হয় মৌমাছিকুলের শাসক। তার চমৎকার সংগঠন ও কর্মবশ্টনের ফলে গোটা ব্যবস্থা বিশুদ্ধ সুশৃঙ্খলরূপে পরিচালিত হয়ে থাকে। তার অভাবনীয় ব্যবস্থা ও অলঙ্ঘনীয় আইন ও বিধিমালা দেখে মানব-বুদ্ধি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যায়। স্বয়ং এই 'রাণী মৌমাছি' তিন সপ্তাহ সময়ের মধ্যে ছয় হাজার থেকে বার হাজার পর্যন্ত ডিম দেয়। দৈনিক গড়ন ও অঙ্গসৌষ্ঠবের দিক দিয়ে সে অন্য মৌমাছিদের চাইতে তিন ধরনের হয়ে থাকে। সে কর্মবশ্টন পদ্ধতি অনুসারে প্রজাদেরকে বিভিন্ন দায়িত্বে নিযুক্ত করে। তাদের কেউ দার রক্ষকের কর্তব্য পালন করে এবং অজ্ঞাত ও বাইরের জনকে ভেতরে প্রবেশ করতে দেয় না। কেউ কেউ ডিমের হিফায়ত করে। কেউ কেউ অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুদের মালন-পালনে নিয়োজিত। কেউ স্থাপত্য ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ক কর্ম সমাধা করে। তাদের নিমিত্ত অধিকাংশ চাকে বিশ হাজার পর্যন্ত ঘর থাকে। কেউ কেউ মোম সংগ্রহ করে স্থপতিদের কাছে পৌঁছাতে থাকে। তারা মোম দ্বারা নিজেদের পুহ নির্মাণ করে। তারা বিভিন্ন উদ্ভিদের উপর জমে থাকা সাদা ধরনের গুঁড়া থেকে মোম সংগ্রহ করে। আখের গায়ে এই সাদা গুঁড়া প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। কোন কোন মৌমাছি বিভিন্ন প্রকার ফুল ও ফলের উপর বসে রস চুষে। এই রস তাদের পেটে পৌঁছে মধুতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। মধু মৌমাছি ও তাদের সন্তানদের খাদ্য এবং এটি আমাদের সবার জন্য সুস্বাদু খাদ্যনির্ঘাস এবং নিরাময়ের ব্যবস্থাপন। মৌমাছিদের এই বিভিন্ন দল অত্যন্ত তৎপরতা সহকারে নিজ নিজ কর্তব্য পালন এবং সম্রাজ্যের প্রত্যেকটি আদেশ মনেপ্রাণে শিরোধার্য করে নেয়। যদি কোন মৌমাছি আবর্জনার স্তূপে বসে যায়, তবে চাকের দারোয়ান তাকে ভেতরে প্রবেশ করতে বাধা দান করে এবং সম্রাজ্যের আদেশে তাকে হত্যা করা হয়। তাদের এই সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা ও কর্মকুশলতা দেখে মানুষ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়।—(আল জাওয়াহের)

أَوْحَىٰ رَبُّكَ—

হলে যেসব নির্দেশ বোঝানো হয়েছে, তন্মধ্যে এটা হচ্ছে প্রথম নির্দেশ। এতে নির্মাণের কথা বলা হয়েছে। এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, বসবাসের জন্য প্রত্যেক জন্তু অবশ্যই গৃহ নির্মাণ করে কিন্তু মৌমাছিদেরকে এমন ওরুহ সহকারে নির্মাণের আদেশ দানের বৈশিষ্ট্য কি? এছাড়া এখানে শব্দ **لِيُؤْتِيَنَّ** ব্যবহার করা হয়েছে, যা সাধারণত মানুষের বাসগৃহের অর্থে আসে। এতে প্রথমত ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মৌমাছিদেরকে মধু তৈরী করতে হবে। এর জন্য প্রথম থেকেই তারা একটি সুরক্ষিত গৃহ নির্মাণ করে নিক। দ্বিতীয়ত ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তারা যে গৃহ নির্মাণ করবে, তা সাধারণ জন্তু-জানোয়ারের গৃহের মত হবে না, বরং তার গঠন ও নির্মাণ হবে অনন্যসাধারণ। সেমতে তাদের গৃহ সাধারণ জন্তু-জানোয়ারের গৃহ থেকে ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে, যা দেখে মানব-বুদ্ধি বিস্ময়াভিভূত হয়ে যায়। তাদের গৃহ ছন্ন কোণাকৃতির হয়ে থাকে। কেল ও কুলার দিয়ে পরিমাপ করলেও তাতে চুল বরাবরও পার্থক্য ধরা পড়ে না। কোণাকৃতি ছাড়া অন্য কোন আকৃতি যেমন চতুর্ভুজ ও পঞ্চভুজ ইত্যাদি আকৃতি অবলম্বন না করার কারণ এই যে, এগুলোর কোন কোন বাহু একেজো থেকে যায়।

আল্লাহ তা'আলা মৌমাছিদেরকে মধু গৃহ নির্মাণেরই নির্দেশ দেননি, বরং গৃহের অবস্থানস্থলও নির্দেশ করেছেন যে, তা কোন উচ্চস্থানে হওয়া উচিত। কারণ, উ'চুস্থানে মধু টাটকা ও স্বচ্ছ বাতাস পায় এবং দূষিত বায়ু থেকে মুক্ত থাকে। এছাড়া ভাঙনের আশংকা থেকেও নিরাপদ থাকে। বলা হয়েছে :

مِنَ الْجِبَالِ رَمَى الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ

বৃক্ষে এবং সুউচ্চ দালানকোঠায় নির্মিত হওয়া উচিত, যাতে সুরক্ষিত পদ্ধতিতে মধু তৈরী হতে পারে।

ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ—এটা দ্বিতীয় নির্দেশ। এতে বলা হয়েছে যে,

নিজেদের পছন্দমত ফল ও ফুল থেকে রস চুষে নাও। **مِنَ كُلِّ الثَّمَرَاتِ** দ্বারা

বাহ্যত সারা বিশ্বের ফল-ফুল বোঝানো হয়নি, বরং যেসব ফল ও ফুল পর্যন্ত তারা অনায়াসে পৌছাতে পারে, সেগুলোকেই বোঝানো হয়েছে। সাবার রাণীর ঘটনায়ও **كُلِّ**

শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে **وَأَوْثِقْتَنِي مِن كُلِّ شَيْءٍ**—বলা বাহুল্য, সেখানেও সারা

বিশ্বের বস্তুসামগ্রী বোঝানো হয়নি, বন্দকান রাণীর কাছে উড়োজাহাজ, রেল, মোটর ইত্যাদি থাকাও অসম্ভব হয়ে পড়ে। বরং তখনকার সব ব্লকমার্লি জিনিসপত্র বোঝানো হয়েছে।

এখানেও **مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ** বলে তাই বোঝানো হয়েছে। মৌমাছির এমনি সব সূক্ষ্ম ও মূল্যবান নির্মাস আহরণ করে যে, বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে মেশিনের সাহায্যেও এরূপ নির্মাস বের করা সম্ভবপর নয়।

**فَاَسْأَلُكَ سَهْلَ رَبِّكَ ذُلًّا**—এটা মৌমাছিকে প্রদত্ত তৃতীয় নির্দেশ। অর্থাৎ

স্বীয় পালনকর্তার প্রস্তুতকৃত পথে চলমান হও। মৌমাছির যখন রস চুষে নেওয়ার জন্য গৃহ থেকে দূর-দূরান্তের কোথাও চলে যায়, তখন বাহ্যত তার গৃহে ফিরে আসা সুকঠিন হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য পথ সহজ করে দিয়েছেন। সেমতে কয়েক মাইল দূরে গিয়েও কোনরূপ জ্বল না করে নিজ গৃহে ফিরে আসে। আল্লাহ্ তা'আলা শূন্যে তার জন্য পথ করে দিয়েছেন। কেননা, ভূপৃষ্ঠের আঁকাবাঁকা পথে বিপথগামী হওয়ার আশংকা থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা শূন্যকে এই নগণ্য মাছির জন্য অনুভবী করে দিয়েছেন, যাতে সে বিনা বাধায়, অনায়াসে গৃহে আসা-যাওয়া করতে পারে।

এরপর ওহীর মাধ্যমে প্রদত্ত এই নির্দেশের যথাযথ ফলশ্রুতি বর্ণনা করা হয়েছে :

**يَخْرُجُ مِنْ بَطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فَيَهِيَ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ**—অর্থাৎ

তার পেট থেকে বিভিন্ন রঙের পানীয় বের হয়। এতে মানুষের জন্য রোগের প্রতিষেধক রয়েছে। খাদ্য ও ঋতুর বিভিন্নতার কারণে মধুর রঙ বিভিন্ন হয়ে থাকে। এ কারণেই কোন বিশেষ অঞ্চলে কোন বিশেষ ফল-ফুলের প্রাচুর্য থাকলে সেই এলাকার মধুতে তার প্রভাব ও স্বাদ অবশ্যই পরিলক্ষিত হয়। মধু সাধারণত তরল আকারে থাকে, তাই একে পানীয় বলা হয়েছে। এ বাক্যেও আল্লাহ্ একত্ব ও অপার শক্তির অকাট্য প্রমাণ বিদ্যমান। একটি ছোট্ট প্রাণীর পেট থেকে কেমন উপাদেয় ও সুস্বাদু পানীয় বের হয়! অথচ প্রাণীটি স্বয়ং বিষাক্ত। বিষের মধ্যে এই বিষ-প্রতিষেধক বাস্তবিকই আল্লাহ্ তা'আলার অপার শক্তির অভাবনীয় নিদর্শন। এরপর সর্বশক্তিমানের আশ্চর্যজনক কান্নিগরি দেখুন, অন্যান্য দুধের জন্তুর দুধ ঋতু ও খাদ্যের পরিবর্তনে লাল ও হলদে হয় না, কিন্তু মৌমাছির মধু বিভিন্ন রঙের হয়ে থাকে।

**فَيَهِيَ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ**—মধু যেমন বলাকারক খাদ্য এবং রসনার জন্য আনন্দ ও

তৃপ্তিদায়ক, তেমনি-রোগ-বাধির জন্যও ফলদায়ক ব্যবস্থাপন। কেন হবে না, প্রচীর ভ্রাম্যমাণ মেশিন সর্বপ্রকার ফল-ফুল থেকে বলাকারক রস ও পবিত্র নির্মাস বের করে সুরক্ষিত গৃহে সঞ্চিত রাখে। যদি গাছ-গাছড়ার মধ্যে আরোগ্যলাভের উপাদান নিহিত থাকে, তবে এসব নির্মাসের মধ্যে কেন থাকবে না? কক্ষজনিত রোগে সন্নাসরি এবং অন্যান্য রোগে অন্যান্য উপাদানের সাথে মিশ্রিত হয়ে মধু ব্যবহৃত হয়। চিকিৎসকরা মাজুন তৈরী করতে গিয়ে বিশেষভাবে একে অন্তর্ভুক্ত করেন। এর আশ্রয় একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, নিজেও

নষ্ট হয় না এবং অন্যান্য বস্তুকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত নষ্ট হতে দেয় না। এ কারণেই হাজারো বছর ধরে চিকিৎসকরা একে একোহল (Alcohol)-এর স্থলে ব্যবহার করে আসছেন। মধু বিরেচক এবং পেট থেকে দূষিত পদার্থ অপসারক। রসুলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে কোন এক সাহাবী তাঁর ডাইয়ের অসুখের বিবরণ দিলে তিনি তাকে মধু পান করানোর পরামর্শ দেন। দ্বিতীয় দিনও এসে আবার সাহাবী বললেন : অসুখ পূর্ববৎ বহাল রয়েছে। তিনি আবারও একই পরামর্শ দিলেন। তৃতীয় দিনও যখন সংবাদ এল যে, অসুখে কোন পার্থক্য হয়নি, তখন তিনি বললেন : **صدق الله وكذب بطن**

খুক!—অর্থাৎ আল্লাহর উক্তি নিঃসন্দেহে সত্য, তোমার ডাইয়ের পেট মিথ্যাবাদী। উদ্দেশ্য এই যে, ওষুধের দোষ নেই। রোগীর বিশেষ মেয়াজের কারণে ওষুধ দ্রুত কাজ করেনি। এরপর রোগীকে আবার মধু পান করানো হয় এবং সে সুস্থ হয়ে উঠে।

আলোচ্য আয়াতে **تَعْظُمُ** শব্দটি **شَفَاءٌ**

প্রত্যেক রোগের ওষুধ, তা বুঝা যায় না। কিন্তু **تَعْظُمُ** বা **تَلْوِين** শব্দের **شَفَاءٌ** এর অর্থ দিচ্ছে, তা থেকে অবশ্যই বোঝা যায় যে, মধুর নিরাময়শক্তি বিরাট ও স্বতন্ত্র ধরনের। কিছুসংখ্যক আল্লাহ্‌ওয়ালার বৃহৎ এমনও রয়েছে, যারা মধু সর্বরোগের প্রতিষেধক হওয়ার ব্যাপারে নিঃসন্দেহ। তাঁরা মহান পালনকর্তার উক্তির বাহ্যিক অর্থেই এমন প্রবল ও অটল বিশ্বাস রাখেন যে, তাঁরা ফোঁড়া ও চোখের চিকিৎসাও মধুর মাধ্যমে করেন এবং দেহের অন্যান্য রোগেরও। হযরত ইবনে ওমর (রা) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তাঁর শরীরে ফোঁড়া বের হলেও তিনি তাতে মধুর প্রলেপ দিয়ে চিকিৎসা করতেন। এর কারণ জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বলেন : আল্লাহ্ তা'আলা কোরআনে কি মধু সম্পর্কে বলেননি যে, **نَهِيَ شَفَاءً لِّلنَّاسِ** (কুরতুবী)।

বান্দার সাথে আল্লাহ্ তরুণ ব্যবহারই করেন, যেরূপ বান্দা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখে। হাদীসে কুদসীতে বলা হয়েছে : **أنا عبد ظن عهدي بي** অর্থাৎ আল্লাহ্ বলেন : বান্দা আমার প্রতি যে ধারণা পোষণ করে, আমি তার কাছেই থাকি (অর্থাৎ ধারণার অনুরূপ করে দেই)।

**أَنْ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةٌ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**—আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অপার

শক্তির উল্লিখিত দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করার পর মানুষকে পুনরায় চিন্তা-ভাবনার আহ্বান জানিয়েছেন যে, তোমরা শক্তির এসব দৃষ্টান্ত নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে দেখ, আল্লাহ্ মৃত যমীনকে পানি বর্ষণের মাধ্যমে জীবিত করে দেন। তিনি ময়লা ও অপবিত্র বস্তুর মাঝখান দিয়ে তোমাদের জন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সুপেয় দুধের নালি প্রবাহিত করেন। তিনি আগ্রর ও খেজুর বৃক্ষে মিষ্ট ফল সৃষ্টি করেন, যতদূর তোমরা সুস্বাদু শরবত ও মোরক্বা তৈরী কর। তিনি একটি ছোট্ট বিষাক্ত প্রাণীর মাধ্যমে তোমাদের জন্য মুখ-

রোচক খাদ্য ও নিরাময়ের চমৎকার উপাদান সরবরাহ করেন। এরপরও কি তোমরা দেব-দেবীরই আরাধনা করবে? এরপরও কি তোমাদের ইবাদত ও আনুগত্য স্রষ্টা ও মালিকের পরিবর্তে পাথর ও কাঠের নিষ্প্রাণ মূর্তিদের জন্য নিবেদিত হবে? ভালোভাবে বুঝে নাও, এ বিষয়টিও কি তোমাদের বোধগম্য হতে পারে যে, এগুলো সব কোন অন্ধ, বধির, চেতনাহীন বস্তুর লীলাখেলা হবে? শিল্প-কারিগরির এই অসংখ্য উজ্জ্বল নিদর্শন, জ্ঞান ও কৌশলের এই বিস্ময়কর কীর্তি এবং বুদ্ধি-বিবেকের এই চমৎকার ফয়সালা উচ্চঃস্বরে ঘোষণা করছে, আমাদের একজন স্রষ্টা—অদ্বিতীয় ও প্রজাময় স্রষ্টা। তিনিই ইবাদত ও আনুগত্যের যোগ্য। তিনিই বিপদ বিদূরনকারী এবং শোকর ও হামদ তাঁর জন্যই শোভনীয়।

কতিপয় বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয় : (১) আয়াত থেকে জানা গেল যে, বুদ্ধি-বিবেক

ও চেতনা মানুষ ব্যতীত অন্যান্য প্রাণীর মধ্যেও আছে। **وَأَنَّ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَسْمَعُ**  
 ৪ **بِحُكْمٍ** তবে বুদ্ধির স্তর বিভিন্নরূপ। মানুষের বুদ্ধি সবচাইতে পূর্ণ। এ কারণেই

সে শরীয়তের বিধি-বিধান পালন করার আদেশপ্রাপ্ত হয়েছে। উদ্বাদনার কারণে যদি মানুষের বুদ্ধিবিভ্রম ঘটে, তবে অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় মানুষও বিধি-বিধান পালনের দায় থেকে অব্যাহতি লাভ করে।

(২) মৌমাছির আরও একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, তার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে হাদীসে

বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সা) বলেন : **الذباب كاهل في النار يجعلها عذابا**  
**لا هل الا لا للهل**—অর্থাৎ অন্যান্য ইতর প্রাণীর ন্যায় মাছিদের সব প্রকারও

জাহান্নামে যাবে এবং জাহান্নামীদের আযাবের হাতিয়ার করা হবে, কিন্তু মৌমাছি জাহান্নামে যাবে না।—(কুরতুবী) অন্য এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সা) মৌমাছিকে মারতে নিষেধ করেছেন।—(আবু দাউদ)

(৩) চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মধ্যে এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে যে, মধু মৌমাছির বিষ্ঠা, না মুঁথের লালা। দার্শনিক এরিস্টটল কাঁচের একটি উৎকৃষ্ট পাত্রে চাক তৈরী করে তাতে মৌমাছিদেরকে বদ্ধ করে দিয়েছিলেন। এভাবে তিনি তাদের কর্মপদ্ধতি নিরীক্ষণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মৌমাছির সর্বপ্রথম পাণ্ডের অভ্যন্তরভাগে মোম ও কাদার একটি মোটা প্রলেপ বসিয়ে দেয় এবং অভ্যন্তরভাগ পূর্ণরূপে আবৃত না হওয়া পর্যন্ত কাজই শুরু করেনি।

হযরত আলী (রা) দুনিয়ার নিকৃষ্টতার উদাহরণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন :

**اشرف لها س بنى ادم نية لعاب دود و اشرف شرا به رجوع نمل**

অর্থাৎ মানুষের সর্বোত্তম বস্ত্র রেশম হচ্ছে একটি ছোট্ট কীটের থুথু এবং সর্বোৎকৃষ্ট ও সুস্বাদু পানীয় হচ্ছে মৌমাছির বিষ্ঠা।

(৪) فَبِهِ شَفَاءٌ لِّلنَّاسِ আয়াতের মর্ম অনুযায়ী আরও জানা গেল যে,

ওষুধের মাধ্যমে রোগের চিকিৎসা করা বৈধ। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা একে নিয়ামত হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

وَنَزَّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةٌ

হাদীসে ওষুধ ব্যবহার ও চিকিৎসার প্রতি উৎসাহ দান করা হয়েছে।

কেউ কেউ রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে প্রশ্ন করেন : আমরা কি ওষুধ ব্যবহার করব? তিনি বললেন : হ্যাঁ, রোগের চিকিৎসা করবে। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা যত শ্লোগ সৃষ্টি করেছেন, তার ওষুধও সৃষ্টি করেছেন। তবে একটি রোগের চিকিৎসা নেই। সাহাবীরা প্রশ্ন করলেন : সেটি কোন রোগ? তিনি বললেন : বার্ধক্য।—( আবু দাউদ, কুরতুবী )

এক রেওয়াজেতে হযরত খুযায়মা (রা) বলেন : একবার আমি রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞেস করলাম : আমরা ঝাড়-ফুক করি কিংবা ওষুধ দ্বারা চিকিৎসা করি। এ ধরনের আখরক্কা ও হিফামতের ব্যবস্থা আল্লাহ্র তকদীরকে পাশ্চাতে দিতে পারে কি? তিনি বললেন : এগুলোও তো তকদীরেরই প্রকারভেদ।

মোটকথা, চিকিৎসা করা ও ওষুধ ব্যবহার করা যে বৈধ এ বিষয়ে সকল আলিমই একমত এবং এ সম্পর্কে বহু হাদীস ও রেওয়াজেতে বর্ণিত রয়েছে। হযরত ইবনে ওমরের পরিবারে কাউকে বিচ্ছু দংশন করলে তাকে তিরহইয়াক (বিষনাশক ওষুধ) পান করানো হত এবং ঝাড়-ফুক দ্বারা তার চিকিৎসা করা হত। তিনি একবার কাঁপুনির রোগীকে দাগ লাগিয়ে তার চিকিৎসা করেন। ---( কুরতুবী )

কোন কোন সূফী বুয়ূর্গ সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তাঁরা চিকিৎসা পছন্দ করতেন না। সাহাবীগণের মধ্যেও কারও কারও কার্যক্রম থেকে তা প্রকাশ পায়। যেমন হযরত ইবনে মসউদ (রা) অসুস্থ হয়ে পড়লে হযরত উসমান (রা) তাঁকে দেখতে যান এবং জিজ্ঞেস করেন : আপনার অসুখটাকি? তিনি উত্তর দিলেন : আমি নিজ গোমাহের কারণে চিন্তিত। হযরত উসমান (রা) বললেন : তাহলে কি চান? উত্তর হল : আমি পালনকর্তার রহমত প্রার্থনা করি। হযরত উসমান (রা) বললেন : আপনি পছন্দ করলে চিকিৎসক ডেকে আনি। তিনি উত্তর দিলেন : চিকিৎসকই তো আমাকে শয্যাশায়ী করেছেন। (এখানে রূপক অর্থে চিকিৎসক বলে আল্লাহ্ তা'আলাকে বোঝানো হয়েছে)।

কিন্তু এ ধরনের ঘটনা প্রমাণ নয় যে, তাঁরা চিকিৎসাকে মকরাহ্ মনে করতেন। সম্ভবত এটা তখন তাঁদের রুচিবিরুদ্ধ ছিল। তাই তাঁরা একে পছন্দ করেন নি। এটা প্রবল আল্লাহ্‌ভীতি ও আল্লাহ্‌প্রেমে মত্ত থাকার ফলে বান্দার একটা সাময়িক অবস্থা মাত্র। কাজেই একে চিকিৎসা অবৈধ অথবা মকরাহ্ হওয়ার প্রমাণ হিসাবে দাঁড় করানো যায়

না। হযরত উসমান (রা) কর্তৃক চিকিৎসক ডেকে আনার অনুরোধ স্বয়ং চিকিৎসা  
বেধ হওয়ার প্রমাণ। বরং কোন কোন অবস্থায় চিকিৎসা ওয়াজিবও হয়ে যায়।

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَقَّكُمْ ۗ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرِدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمُرِ  
لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ۝

(৭০) আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এরপর তোমাদের মৃত্যুদান করেন।  
তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ পৌঁছে যায় জরাগ্রস্ত অকর্মণ্য বয়সে, ফলে যা কিছু তারা  
জানত সে সম্পর্কে তারা সজ্ঞান থাকবে না। নিশ্চয় আল্লাহ সুবিজ্ঞ সর্বশক্তিমান।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং (নিজ অবস্থাও প্রণিধানযোগ্য যে) আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে (প্রথম)  
সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর (বয়স শেষ হয়ে গেলে) তোমাদের জান কবজ করেন  
(তন্মধ্যে কেউ কেউ তো পূর্ণ জ্ঞান ও পূর্ণ চৈতন্যসহ সে অবস্থায় কার্যকর হাত-পা নিয়ে  
বিদায় হয়ে যায়) এবং তোমাদের কেউ অকর্মণ্য বয়স পর্যন্ত পৌঁছে যায় (তার মধ্যে  
শারীরিক ও জ্ঞানগত শক্তি বলতে কিছুই থাকে না) এর ফলে যে কোন বিষয় সম্পর্কে  
সজ্ঞান হওয়ার পর অজ্ঞান হয়ে যায় (যেমন, কোন কোন রক্তকে দেখা যায় যে, কোন কথা  
বলা হলে কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা তা ভুলে যায় এবং সে সম্পর্কে পুনরায় জিজ্ঞেস করতে  
থাকে।) নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত জানী, অত্যন্ত শক্তিমান (জ্ঞান দ্বারা প্রত্যেকটি  
উপযোগিতা জেনে মেন এবং শক্তিবলে তদ্রূপই করে দেন। তাই জীবন ও মরণের অবস্থা  
বিভিন্নরূপ করে দিয়েছেন। এটাও তওহীদের একটি প্রমাণ।)

### মানুষের জ্ঞান-বিশয়

ইতিপূর্বে আল্লাহ তা'আলা পানি, উদ্ভিদ, জন্তু ও মৌমাছির বিভিন্ন অবস্থা বর্ণনা করে  
খ্রীষ অপার শক্তি এবং সৃষ্ট জীবের প্রতি তাঁর নিয়ামতরাজির কথা মানুষকে অবহিত  
করেছেন। এখন আলোচ্য আয়াতে মানুষকে নিজের অভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্ক চিন্তা-ভাবনা  
করার দাওয়াত দেওয়া হচ্ছে যে, মানুষ কিছুই ছিল না। আল্লাহ তা'আলা তাকে অস্তিত্বের  
সম্পদ দ্বারা ভূষিত করেছেন। এরপর যখন ইচ্ছা করেন মৃত্যু প্রেরণ করে এ নিয়ামত  
খতম করে দেন। কোন কোন লোককে মৃত্যুর পূর্বেই বার্ষিকের এমন স্তরে পৌঁছে দেন  
যে, তাদের জ্ঞানবুদ্ধি বিলুপ্ত হয়ে যায়, হাত-পা হীনবল ও নিঃসাড় হয়ে পড়ে এবং তারা  
কোন বিষয় বুঝতে পারে না, কিংবা বুঝেও মরণ রাস্তাতে পারে না। বিষয়জোড়া এই  
পরিবর্তন থেকে বোঝা যায় যে, যিনি স্রষ্টা ও প্রভু, তাঁর ডাঙারই যাবতীয় জ্ঞান ও শক্তি  
সংরক্ষিত।



من يرد من يرد من يرد — এখানে শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে,

পূর্বেও মানুষের উপর দিয়ে এক প্রকার দুর্বলতা ও শক্তিহীনতার যুগ অতিক্রান্ত হয়েছে। সেটা ছিল তার প্রাথমিক শৈশবের যুগ। তখন সে কোনরূপ জ্ঞানবুদ্ধির অধিকারী ছিল না। তার হস্তপদ ছিল দুর্বল ও অক্ষম। সে ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারণ করতে এবং উঠাবসা করতে অপরের মুখাপেক্ষী ছিল। এরপর আল্লাহ তা'আলা তাকে মৌবন দান করেছেন এটা ছিল তার উন্নতির যুগ। এরপর ক্রমান্বয়ে তাকে বার্বকোর স্তরে পৌঁছে দেন। এ স্তরে তাকে দুর্বলতা, শক্তিহীনতা ও ক্ষয়ের ঐ সীমান প্রত্যাভিত্তি করা হয়, যা শৈশবে ছিল।

أرذل العمر বলে বার্বকোর সে বয়স বোঝানো হয়েছে, যাতে মানুষের দৈহিক ও মানসিক শক্তি নিস্তেজ হয়ে পড়ে। রসূলুল্লাহ (সা) এ বয়স থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে বলতেন :

اللهم انى اعوذ بك من سوء العرونى رواية من ان اردالى...

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি মন্দ বয়স থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি। এক স্নেহোন্মত্তে আছে, অকর্মণ্য বয়সে ফিরিয়ে দেওয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি।

أرذل العمر — এর নির্দিষ্ট কোন সংজ্ঞা নেই। তবে উল্লিখিত সংজ্ঞাটি অগ্রগণ্য

মানে হয়। কোরআনও এর প্রতি **لَكَيْلًا يَعْلَمُ بَعْدَ عَلْمٍ شَيْئًا** বলে ইঙ্গিত করেছে।

অর্থাৎ যে বয়সে হৃশ-জ্ঞান অবশিষ্ট না থাকে। ফলে সে সব জ্ঞান বিষয়ও ভুলে যায়।

أرذل العمر — এর সংজ্ঞা সম্পর্কে আরও অনেক উক্তি বর্ণিত রয়েছে। কেউ

৮০ বছর বয়সকে এবং কেউ ৯০ বছর বয়সকে **أرذل العمر** বলেছেন। হযরত আলী (রা) থেকে ৭৫ বছর বয়সের কথা বর্ণিত আছে।—(মায়হারী)

لَكَيْلًا يَعْلَمُ بَعْدَ عَلْمٍ شَيْئًا — বার্বকোর সর্বশেষ স্তরে পৌঁছার পর মানুষের

মধ্যে দৈহিক ও মানসিক শক্তি অবশিষ্ট থাকে না। ফলে সে এক বিষয়ে জ্ঞাত হওয়ার পর পুনরায় অজ্ঞ হয়ে যায়। সে আদ্যোপান্ত স্মৃতিভ্রমে পতিত হয়ে প্রায় সদ্যপ্রসূত শিশুর মত হয়ে যায়, আর কোন কিছুই খবর থাকে না। হযরত ইকরামা (রা) বলেন : যে ব্যক্তি নিয়মিত কোরআন তিলাওয়াত করে সে এরূপ অবস্থায় পতিত হবে না।

إِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِمْ قَدِيرٌ — নিশ্চয় আল্লাহ মহাজ্ঞানী, মহাশক্তিশালী। তিনি জ্ঞান

দ্বারা প্রত্যেকের বয়স জানেন এবং শক্তি দ্বারা যা চান, করেন। তিনি ইচ্ছা করলে

শক্তিশালী যুবকের ওপর অকর্মণ্য বয়সের লক্ষণাদি চাপিয়ে দেন এবং ইচ্ছা করলে এক শ' বছরের বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিকেও শক্ত সমর্থ যুবক করলে রাখেন। এসবই না-শরীক সত্তার ক্ষমতামূলক।

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۗ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا  
بِرِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۗ  
أَفَبِعِزَّةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ۝

(৭১) আল্লাহ তা'আলা জীবনোপকরণে তোমাদের একজনকে অন্যজনের চাইতে প্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। অতএব যাদেরকে প্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে, তারা তাদের অধীনস্থ দাস-দাসীদেরকে স্বীয় জীবিকা থেকে এমন কিছু দেয় না, যাতে তারা এ বিষয়ে তাদের সমান হয়ে যাবে। তবে কি তারা আল্লাহর নিয়ামত অস্বীকার করে?

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং (তওহীদ প্রমাণের সাথে শিরকের দোষ এক প্রকার পারস্পরিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে শোন,) আল্লাহ তা'আলা তোমাদের একজনকে অন্যজনের চাইতে জীবিকায় (অর্থাৎ জীবিকার ক্ষেত্রে) প্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন (উদাহরণত একজনকে ধনী এবং অনেকের উপর কর্তৃত্ব দান করেছেন, তার হাতে তার অধীনস্থ লোকেরা রিযিক প্রাপ্ত হয়। আবার অন্যজনকে তার মুখাপেক্ষী করেছেন। সে কর্তাব্যক্তির হাত দিয়েই রিযিক পায়। পক্ষান্তরে কাউকে এমন ধনী করেন নি যে, অধীনস্থ বা অসহায়দের দিতে পারে এবং অসহায় অধীনস্থও করেন নি যে, সে কোন কর্তৃত্বকারীর হাত থেকে পাবে) অতএব যাদেরকে (জীবিকার বিশেষ) প্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে (যে, তাদের কাছে ধন ও অধীনস্থ লোক সবই আছে) তারা স্বীয় অংশের ধন অধীনদেরকে এভাবে কখনও দেয় না যে, তারা (ধনবান ও নির্থন) সবাই এতে সমান হয়ে যায়। (কেননা, যদি কোন দাসকে দাসত্ব বজায় রেখে ধন দেয়, তবে সে দাস ধনের মালিকই হবে না বরং দাতাই পূর্ববৎ মালিক থাকবে। পক্ষান্তরে মুক্ত করার পর সমতা সম্ভবপর, কিন্তু সে তখন দাস থাকবে না। সুতরাং বোঝা গেল যে, সমতা ও দাসত্ব সম্ভবপর নয়। এমনিভাবে প্রতিমা বিগ্রহ ইত্যাদি যখন মুশরিকদের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী আল্লাহ তা'আলার মালিকানাধীন দাস, তখন দাস হওয়া সত্ত্বেও উপাস্যতায় আল্লাহর সমতুল্য কেমন করে হয়ে যাবে? এতে শিরকের চরম দোষ বর্ণিত হয়েছে যে, যখন তোমাদের দাস রিযিকে তোমাদের অংশীদার হতে পারে না, তখন আল্লাহ তা'আলার দাস উপাস্যতায় তার অংশীদার কিরূপে হতে পারবে?) এরপর (অর্থাৎ এসব বিষয়বস্তু শোনার পরও) কি (তারা আল্লাহর শিরক করে, বন্দরন যুক্তিপূর্ণভাবে জরুরী হয়ে পড়ে যে, তারা) আল্লাহর নিয়ামত (অর্থাৎ আল্লাহ নিয়ামত দিয়েছেন বলেই) অস্বীকার করে?

জানুয়ারিক জ্ঞান বিষয়

ইতিপূর্বেকার আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় জ্ঞান ও শক্তির বিশেষ বিশেষ প্রতীক এবং মানুষকে প্রদত্ত নিয়ামতসমূহ উল্লেখ করে তওহীদের প্রকৃতিগত প্রমাণাদি বর্ণনা করেছেন। এসব প্রমাণ দেখে সামান্য জানবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিও কোন সৃষ্ট বস্তুকে আল্লাহ তা'আলার সাথে তাঁর জ্ঞান ও শক্তি ইত্যাদি গুণাবলীতে অংশীদার মেনে নিতে পারে না। আলোচ্য আয়াতে তওহীদের এ বিষয়বস্তুকেই একটি পারস্পরিক আদান-প্রদানের দৃষ্টান্ত দ্বারা স্পষ্ট করে তোলা হয়েছে। দৃষ্টান্তটি এই যে, আল্লাহ তা'আলা বিশেষ তাৎপর্যবশতই মানুষের উপকারার্থে জীবিকার ক্ষেত্রে সব মানুষকে সমান করেন নি, বরং একজনকে অপরজনের চাইতে প্রেষ্ঠত্ব দিয়ে বিভিন্ন স্তর সৃষ্টি করেছেন। কাউকে এমন ধনাঢ্য করেছেন যে, সে বিভিন্ন সাজ-সরঞ্জাম, চাকর-নওকর ও দাসদাসীর অধিকারী। নিজেও ইচ্ছামত ব্যয় করে এবং গোলাম ও চাকর-নওকরও তার হাত থেকে রিযিক পায়। অপল্পপক্ষে আল্লাহ তা'আলা কাউকে গোলাম ও খাদেম করেছেন। সে অন্যের জন্য ব্যয় করা দূরের কথা, নিজের ব্যয়ও অন্যের হাত থেকে পায়। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলা কাউকে মধ্যবিত্ত করেছেন। সে অপরের জন্য ব্যয় করার মত ধনীও নয় এবং নিজ প্রয়োজনের ব্যাপারে অপরের মুখাপেক্ষী হওয়ার মত নিঃস্বও নয়।

এই প্রাকৃতিক বস্তুনের ফলশ্রুতি সবার চোখের সামনে। যাকে প্রেষ্ঠত্ব দান করে ধনাঢ্য করা হয়েছে, সে কখনও এটা পছন্দ করে না যে, নিজের ধন-সম্পত্তি গোলাম ও খাদেমের মধ্যে বিলি বন্টন করে দেবে, যার ফলে তারাও ধনসম্পত্তিতে তার সমান হয়ে যাবে।

এ দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা দরকার যে, মুশরিকদের স্বীকারোক্তি মতেই যখন প্রতিমা ও অন্যান্য উপাস্য সৃষ্টজীব আল্লাহ তা'আলার সৃজিত ও মালিকানাধীন, তখন তারা এটা কিরূপে পছন্দ করে যে, এসব সৃষ্ট ও মালিকানাধীন বস্তু স্রষ্টা ও মালিকের সন্মান হয়ে যাবে? তারা কি এসব নিদর্শন দেখে এবং বিষয়বস্তু শুনেও আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক ও সমতুল্য সাব্যস্ত করে? এরূপ করার অনিবার্য পরিণতি এই যে, তারা আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতরাজি অস্বীকার করে। কেননা, তারা যদি স্বীকার করত যে, এসব নিয়ামত একমাত্র আল্লাহ তা'আলার দান, স্বকল্পিত প্রতিমা অথবা কোন মানুষ ও জিনের কোন হাত নেই, তবে এগুলোকে আল্লাহ তা'আলার সমতুল্য কিরূপে সাব্যস্ত করত?

এ বিষয়বস্তুই সূরা রামের নিম্নোক্ত আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে :

صَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَلْ لَّكُمْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ فِيهِمَا رِزْقَانَا كَمَا نَأْتِيكُمْ فِيهِ سَوَاءٌ

তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকেই একটি উদাহরণ দিচ্ছেন, যারা তোমাদের মালিকানাধীন গোলাম, তারা কি আমার দেওয়া রিযিকে তোমাদের অংশীদার যে, তোমরা তাতে তাদের সমান হয়ে যাও ?

এ আয়াতের সারকথাও তাই যে, তোমরা স্বীয় মালিকানাধীন গোলাম ও খাদেম-দেরকে নিজেদের সমতুল্য করা পছন্দ কর না। এমতাবস্থায় আল্লাহ্ তা'আলার জন্য কিরূপে পছন্দ কর যে, তাঁর সৃষ্টিত ও মালিকানাধীন বস্তুসমূহ তাঁর সমান হয়ে যাবে।

জীবিকার শ্রেণী-বিভেদ মানুষের জন্য রহমতস্বরূপ : আলোচ্য আয়াতে সুস্পষ্টভাবে এ কথা বলা হয়েছে যে, দারিদ্র্য, ধনাঢ্যতা এবং জীবিকায় মানুষের বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হওয়া যেমন, কারো দরিদ্র হওয়া কিংবা ধনী ও মধ্যবিত্ত হওয়া কোন আকস্মিক ঘটনা নয়; বরং এটা আল্লাহর অপার রহস্য ও মানবিক উপকারিতার তাগিদ এবং মানব জাতির জন্য রহমতস্বরূপ। যদি এরূপ না হয় এবং ধন-দৌলতে সব মানুষ সমান হয়ে যায়, তবে বিশ্ব-ব্যবস্থায় হুঁটি ও অনর্থ দেখা দেবে। তাই মেদিন থেকে পৃথিবীতে জনবসতি স্থাপিত হয়েছে, সেদিন থেকে কোন যুগে ও কোন সময়ে সব মানুষ ধন-সম্পদের দিক দিয়ে সমান হয়নি এবং হতে পারে না। যদি কোথাও জোর জবরদস্তি মূলকভাবে এরূপ সাম্য প্রতিষ্ঠিত করা হয়, তবে কিছু দিনের মধ্যে মানবিক কাজ-কারবারে হুঁটি ও অনর্থ দৃষ্টিগোচর হবে। আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র মানবজাতিকে বুদ্ধি, মেধা, বল, শক্তি ও কর্মদক্ষতায় বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন এবং তাদের মধ্যে উচ্চ, নীচ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী বিদ্যমান রয়েছে। কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি একথা অস্বীকার করতে পারে না। এরই অপরিহার্য পরিণতি হিসাবে ধনসম্পদেও বিভিন্ন শ্রেণী থাকার বাঞ্ছনীয়, যাতে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ প্রতিভা ও যোগ্যতার যথোপযুক্ত প্রতিদান পেতে পারে। যদি প্রতিভাবান যোগ্য ব্যক্তিকে অযোগ্যের সমান করে দেওয়া হয়, তবে যোগ্য ব্যক্তির মনোবল ভেঙ্গে যাবে। যদি জীবিকায় তাকে অযোগ্যদের সমপর্যায়েই থাকতে হয়, তবে কিসে তাকে অধাবসায়, গবেষণা ও কর্মে উদ্বুদ্ধ করবে? এর অনিবার্য পরিণতিতে কর্মদক্ষতায় বক্ষ্যাহ্ব নেমে আসবে।

সম্পদ পূঞ্জীভূত করার বিরুদ্ধে কোরআনের নিধান : তবে সৃষ্টিকর্তা যেখানে বুদ্ধিগত ও দেহগত শক্তিতে একজনকে অপরজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং এর অধীনে দ্বিগিক ও ধনসম্পদে তারতম্য করেছেন, যেখানে এই অটল অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, সম্পদের ভাগ্য এবং জীবিকা উপার্জনের কেন্দ্রসমূহ যেন কতিপয় ব্যক্তি অথবা বিশেষ শ্রেণীর অধিকারভুক্ত না হয়ে পড়ে, ফলে অন্যান্য যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তির কাজ করার ক্ষেত্রেই অবশিষ্ট না থাকে। অথচ সুযোগ পেলে তারা দৈহিক শক্তি ও জ্ঞান-বুদ্ধি খাটিয়ে অর্থনৈতিক উন্নতি অর্জন করতে পারে। কোরআন পাক সূরা হাশরে বলে :

كَيْلَا يَكُونَ دَوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

আইন এজন্য তৈরী করেছি, যাতে ধনসম্পদ পুঞ্জিগতিদের হাতে পূঞ্জীভূত না হয়ে পড়ে।

আজকাল বিশ্বের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যে হাহাকারপূর্ণ অবস্থা বিরাজমান, তা এই আল্লাহর আইন উপেক্ষা করারই ফলশ্রুতি। একদিকে রয়েছে পুঞ্জিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। এতে সুদ ও জুয়ার সাথে ধনসম্পদের কেন্দ্রসমূহের উপর কতিপয় ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠী একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে অবশিষ্ট জনগণকে তাদের অর্থনৈতিক দাসত্ব স্বীকারে বাধ্য করে। তাদের জন্য নিজেদের অভাব মেটানোর জন্য দাসত্ব ও মজুরী

ছাড়া অন্য কোন পথ খোলা থাকে না। তারা যোগ্যতা সত্ত্বেও শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে পা রাখতে পারে না।

পুঁজিপতিদের এই অত্যাচার ও উৎপীড়নের প্রতিক্রিয়া হিসাবে একটি পরস্পর বিরোধী সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কম্যুনিজম বা সোশ্যালিজম নামে আত্মপ্রকাশ করেছে। এ শ্লোগান হচ্ছে ধনী ও দরিদ্রের পার্থক্য মেটানো এবং সর্বস্তরে সাম্য প্রতিষ্ঠা করা। পুঁজিবাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ জনগণ এ শ্লোগানের পেছনে ধাবিত হয়েছে। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই তারা উপলব্ধি করেছে যে, এ শ্লোগানটি নিছক একটি প্রতারণা। অর্থনৈতিক সাম্যের স্বপ্ন কোনদিনই বাস্তবায়িত হয়নি। দরিদ্র নিজ দারিদ্র্য, অনাহার ও উপবাস সত্ত্বেও একটি মানবিক সম্মানের অধিকারী ছিল, অর্থাৎ সে নিজ ইচ্ছার মালিক ছিল। কম্যুনিজমে এ মানবিক সম্মানও হাতছাড়া হয়ে গেল। এ ব্যবস্থায় মেশিনের কলকব্জার চাইতে অধিক মানুষের কোন মূল্য নেই। এতে কোন সম্পত্তির মালিকানা কল্পনাও করা যায় না। একজন শ্রমিকের অবস্থা এই যে, সে কোন কিছুই মালিক নয়। তার সন্তান ও স্ত্রীও তার নিজের নয়; বরং সবই রাষ্ট্ররূপী মেশিনের কল-কব্জা। মেশিন চালু হওয়ার সাথে সাথে এদের কাজে লেগে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। কল্পিত রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছাড়া তার না আছে কোন বিবেক আর না আছে কোন বাকস্বাধীনতা। রাষ্ট্রমন্ত্রের জোর-জুলুম ও অসহনীয় পরিশ্রমে কাতর হয়ে উঠে আহঃ করাও প্রাণদণ্ডযোগ্য বিদ্রোহ বলে পরিগণিত হয়। আল্লাহ তা'আলা ও ধর্মের বিরোধিতা এবং খাঁটি জড়বাদী ব্যবস্থা সমাজতন্ত্রের মৌলিক ভিত্তিস্তম্ভ।

কোন সমাজতন্ত্রী এসব সত্য অস্বীকার করতে পারবে না। সমাজতন্ত্রের কর্ণ-ধারদের গ্রহণযোগ্যতা এবং আমলনামা এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। তাদের এসব বরাত একত্রিত করার জন্য একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন হবে।

কোরআন গাফ উৎপীড়নমূলক পুঁজিবাদ এবং নির্বোধসুলভ সমাজতন্ত্রের মাঝামাঝি, স্বল্পতা ও বহলতা বিবজিত একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রদান করেছে। এতে ঋষিক ও অর্থ-সম্পদের প্রাকৃতিক পার্থক্য সত্ত্বেও কোন ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠী সাধারণ জনগণকে গোলামে পরিণত করতে পারে না এবং কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ ও দুর্ভিক্ষে নিরুপেক্ষ করতে পারে না। সুদ ও জুরাকে হারাম সাব্যস্ত করে অবৈধ পুঁজি সঞ্চয়ের ভিত্তি জুমিস্যাৎ করে দেওয়া হয়েছে। অতঃপর প্রত্যেক মুসলমানের ধনসম্পদে দরিদ্রদের প্রাণা নির্ধারিত করে তাদেরকে তাতে অংশীদার করা হয়েছে। এটা দরিদ্রদের প্রতি দয়া নয়, বরং কর্তব্য সম্পা-

দন মাত্র। আয়াতটি  
 فِي أَسْوَائِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلنَّاسِ ذَلِ وَالْمَكْرُومِ

এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়। মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তির ধনসম্পত্তি পরিবারের লোকজনের মাঝে বন্টন করে সম্পদ পূজীভূত হওয়ার মূলাৎপাটন করা হয়েছে। প্রাকৃতিক নদ-নদী, সমুদ্র, পাহাড় ও বন-জঙ্গলের নিজে নিজে গজিয়ে ওঠা সম্পদকে সমগ্র জাতির স্বৌধ সম্পত্তি সাব্যস্ত করা হয়েছে। এগুলোতে কোন ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠীর মালিকসুলভ অধিকার প্রতিষ্ঠা করা

বৈধ নয়। কিন্তু পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় এসব বস্তুর উপর পুঁজিপতিদের মালিকানা স্বীকার করা হয়।

জ্ঞানগত ও কর্মগত যোগ্যতার বিভিন্নতা একটি স্বাভাবিক ব্যাপার এবং জীবিকা উপার্জন এসব যোগ্যতার উপর নির্ভরশীল। তাই ধনসম্পদের মালিকানার বিভিন্নতাও স্বাভাবিক তাৎপর্যের তাকাদা। সামান্যতম জ্ঞানবুদ্ধির অধিকারী ব্যক্তিও একথা স্বীকার করতে পারে না। সামান্য ধ্বংসকারীরাও কয়েক পা এগুতে না এগুতেই সামান্য দাবী পরিত্যাগ করতে এবং জীবিকায় তারতম্য ও পারস্পরিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করতে বাধ্য হয়েছে।

তদানীন্তন রুশ প্রধানমন্ত্রী ১৯৬০ সনের ৫ই মে তারিখে সুপ্রীম সোভিয়েটের সামনে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেছিল :

“আমরা মজুরির পার্থক্য বিলুপ্ত করার আন্দোলনের যোগ্য বিরোধী। আমরা মজুরির ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠা করার এবং সবার মজুরি এক পর্যায়ে আনার প্রকাশ্যে বিরোধিতা করি। এটা লেনিনের শিক্ষা। তার শিক্ষা ছিল এই যে, সমাজে সমাজবাদী বৈষয়িক কারাগারের প্রতি পুরোপুরি লক্ষ্য রাখা হবে।”—(সোভিয়েট ---ওয়ার্ল্ড, ৩৪৬ পৃঃ)

অর্থনৈতিক সাম্যের বাস্তবায়ন যে অসাম্যের মাধ্যমে হয়েছিল, তা প্রথম থেকেই সবার চোখে ধরা পড়েছিল। কিন্তু দেখতে দেখতে এ অসাম্য এবং ধনী ও দরিদ্রের ব্যবধান সমাজতান্ত্রিক দেশ রাশিয়াতে সাধারণ পুঁজিবাদী দেশের চাইতেও অধিক প্রকট হয়ে পড়ে।

লিউন শিভো লিখেন :

“এমন কোন উন্নয়নশীল পুঁজিবাদী দেশ থাকলে থাকতেও পারে, যেখানে রাশিয়ার ন্যায় মজুরিতে বিরাট ব্যবধান রয়েছে।”

উল্লিখিত কয়েকটি বাস্তব উদাহরণ অবিশ্বাসীদের মুখে **وَاللَّهُ نَفَّلَ بَعْضَكُمْ**

**عَلَىٰ بَعْضِ فِي الرِّزْقِ** আয়াতের সত্যায়ন তাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও করিয়ে দিয়েছে।

**وَاللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَرِيدُ** —আলোচ্য আয়াতের অধীনে এখানে এতটুকু বলাই উদ্দেশ্য

ছিল যে, ধনসম্পদে তারতম্য হওয়া একটি স্বাভাবিক, প্রাকৃতিক এবং মানবিক উপকারিতার সাথে সঙ্গতিশীল ব্যাপার। অতঃপর সম্পদ বণ্টনে ইসলামী মূলনীতি এবং

পুঁজিবাদ ও সমাজবাদের সাথে তার পার্থক্য ইনশাআল্লাহ সুরা মুখরুফের **نَحْنُ قَوْمًا**

**بِهِمْ مَعِيشَتُهُمْ** আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত হবে।

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ  
 بَيْنَ وَحَفْدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ  
 وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ۝ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا  
 لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ۝  
 فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝  
 ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا أَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ  
 مِنَّْا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ  
 الْحَمْدُ لِلَّهِ ۗ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ  
 أَحَدُهُمَا أَبْكَمٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ ۗ  
 أَيَّمَا يُوَجِّهُهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ  
 بِالْعَدْلِ ۗ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝

(৭২) আল্লাহ্ তোমাদের জন্য তোমাদেরই শ্রেণী থেকে জোড়া পক্ষী দান করেছেন এবং  
 তোমাদের যুগল থেকে তোমাদেরকে পুত্র ও পৌত্রাদি দিয়েছেন এবং তোমাদেরকে উত্তম  
 জীবনোপকরণ দান করেছেন। অতএব তারা কি মিথ্যা বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং  
 আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করে? (৭৩) তারা আল্লাহ্ ব্যতীত এমন বস্তুই ইবাদত করে,  
 যে তাদের জন্যে ভ্রমশূল ও নভোমণ্ডল থেকে সামান্য রুখী দেওয়ারও অধিকার রাখে না এবং  
 শক্তিও রাখে না। (৭৪) অতএব আল্লাহর কোন সদৃশ সাব্যস্ত করে না, নিশ্চয় আল্লাহ জানেন  
 এবং তোমরা জান না। (৭৫) আল্লাহ্ একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন, অপরের মালিকানাধীন  
 গোলামের, যে কোন কিছুই ওপর শক্তি রাখে না এবং এমন একজন যাকে আমি নিজের পক্ষ  
 থেকে চমৎকার রুখী দিয়েছি। অতএব সে তা থেকে ব্যয় করে গোপনে ও প্রকাশ্যে। উদ্ভয়ে কি  
 সমান হয়? সব প্রশংসা আল্লাহর কিন্তু অনেক মানুষ জানে না। (৭৬) আল্লাহ্ আরেকটি  
 দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন, দু'ব্যক্তির একজন বোবা কোন কাজ করতে পারে না। সে মালি-  
 কের ওপর বোবা। যে দিকে তাকে পাঠায়, কোন সঠিক কাজ করে আসে না। সে কি  
 সমান হবে ঐ ব্যক্তির, যে ন্যায়বিচারের আদেশ করে এবং সরল পথে কামেয়ম রয়েছে?

## তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং (কুদরতের প্রমাণাদি ও বিভিন্ন প্রকার নিয়ামতের মধ্য থেকে একটি বড় নিয়ামত ও আল্লাহর কুদরতের প্রমাণ হচ্ছে স্বয়ং তোমাদের ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব যে, ) আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরই মধ্য থেকে ( অর্থাৎ তোমাদের জাতি ও শ্রেণী থেকে ) তোমাদের জন্য স্ত্রী তৈরী করেছেন এবং ( অর্থাৎ পর ) স্ত্রীদের থেকে তোমাদের পুত্র ও পৌত্র পয়সা করেছেন ( কারণ, এটা হচ্ছে তোমাদের শ্রেণীগত স্থায়িত্ব ) এবং তোমাদেরকে ভাল ভাল বস্তু খেতে ( ও পান করতে ) দিয়েছেন। ( এটা ব্যক্তিগত স্থায়িত্ব। যেহেতু স্থায়িত্ব অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল, তাই এতে অস্তিত্বের প্রতিও ইঙ্গিত হয়ে গেছে। ) তারা কি ( এসব প্রমাণ ও নিয়ামত সম্পর্কে শুনে ) তবুও অমূলক বিষয়ের প্রতি ( অর্থাৎ প্রতিমা ইত্যাদির প্রতি, যাদের উপাস্য হওয়ার কোন প্রমাণ নেই, বরং না হওয়ারই প্রমাণ রয়েছে --- ) ঈমান রাখবে এবং আল্লাহর নিয়ামতের না-শোকরী (তথা অবমূল্যায়ন) করতে থাকবে? এবং ( এই না-শোকরীর অর্থ এই যে, ) আল্লাহকে ছেড়ে এমন বস্তুসমূহের ইবাদত করতে থাকবে, যারা তাদেরকে না আসমান থেকে রুমী পৌঁছানোর ক্ষমতা রাখে, আর না যমিন থেকে। ( অর্থাৎ না তারা রুটি বর্ষণের ক্ষমতা রাখে এবং না মাটি থেকে কিছু পয়সা করান ) এবং তারা ( ক্ষমতা লাভেরও ) শক্তি রাখে না। ( এই না বোধক বাক্য যারা বিষয়-বস্তু আরও জোরদার হয়ে গেছে। কেননা, মাঝে মাঝে দেখা যায়, এক ব্যক্তি কার্যত ক্ষমতামূলক নয়, কিন্তু চেপ্টাচরিত্র করে শেষ পর্যন্ত ক্ষমতা অর্জন করে নেয়। এজন্য এ বিষয়টিও 'না' করে দেওয়া হয়েছে। ) অতএব ( যখন শিরকের অসারতা প্রমাণিত হয়ে গেল, তখন ) তোমরা আল্লাহর কোন সূদূশ তৈরী করো না ( যে, আল্লাহ হচ্ছেন জাগতিক রাজা-বাদশাহদের মত। প্রত্যেকেই তাঁর কাছে আবেদন-নিবেদন করতে পারে না। এজন্য তাঁর প্রতিনিধি রয়েছে। জনগণ তাদের কাছে আবেদন-নিবেদন করবে। এরপর তারা বাদশাহর কাছে আবেদন-নিবেদন পেশ করবে। এরূপ তফসীরে কবীরে বলা হয়েছে

وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا وَهُوَ لَا يَشْفَعُ عَلَيْنَا مَعَ اللَّهِ

আল্লাহ তা'আলা (খুব জানেন যে, এসব দৃষ্টান্ত অনর্থক) এবং তোমরা (অবিবেচনার কারণে) জান না। ( তাই মুখে যা আসে, তাই বলে ফেল এবং ) আল্লাহ তা'আলা ( শিরকের অসারতা প্রকাশ করার জন্য ) একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন, ( মনে কর ) এক হচ্ছে গোলাম ( কারও ) মালিকানাধীন ( অর্থকরী ও ব্যবহারীদের মধ্য থেকে ) কোন বস্তুর ( মালিকের অনুমতি ব্যতীত ) ক্ষমতা রাখে না এবং ( দ্বিতীয় ) এক ব্যক্তি, যাকে আমি নিজের পক্ষ থেকে চের রুমী দিয়েছি। সে তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ( মেভাবে চায়, যেখানে চায় ) ব্যয় করে ( তাকে বাধাদানকারী কেউ নেই )। এ ধরনের ব্যক্তির কি পরম্পর সমান হতে পারে? যখন কৃত্রিম মালিক ও কৃত্রিম গোলাম সমান হতে পারে না, তখন সত্যিকার মালিক ও সত্যিকার গোলাম কেমন করে সমান হতে পারে? ( ইবাদত পাওয়ার যোগ্যতা সমান হওয়ার উপর নির্ভরশীল। তা নেই। ) সব প্রশংসা আল্লাহর জন্যই উপযুক্ত। ( কেননা, পূর্ণাঙ্গ সত্তা ও গুণাবলীর অধিকারী তিনিই। তাই উপাস্যও তিনিই হতে পারেন, কিন্তু মুশরিকরা এরপরও অন্যের ইবাদত ত্যাগ করে না। ) বরং তাদের অধিকাংশ ( অবিবেচনার কারণে



তা) জানেই না। (না জানার কারণ যেহেতু স্বয়ং তাদের অবিবেচনা, তাই তাদের ক্রমা হবে না।) আল্লাহ তা'আলা (এর ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে) আরও একটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন, (মনে কর—) দু'ব্যক্তি রয়েছে। তাদের একজন তো (গোলাম হওয়া ছাড়া) বোবা, (ও কালা। আর কালা, অন্ধ ও নির্বোধ হওয়ার কারণে) কোন কাজ করতে পারে না, এবং (এ কারণে) সে মালিকের গলগ্রহ। (কারণ, মালিকই তার সব কাজ করে এবং) সে (অর্থাৎ মালিক) তাকে যেখানে পাঠায়, কোন সঠিক কাজ করে আসে না। (অতএব) এ ব্যক্তি এবং সে ব্যক্তি কি পরস্পর সমান হতে পারে, যে ভাল কথা শিক্ষা দেয় (যমদ্বারা তার বাক, বুদ্ধি ও জ্ঞানবান হওয়া বোঝা যায়) এবং নিজেও (প্রত্যেক কাজে) সুযম পথে (ধাবমান) থাকে, (যমদ্বারা সুশৃঙ্খল কর্মশক্তি জানা যায়। সত্তা ও গুণাবলীতে অভিন্নতা সত্ত্বেও যখন মানুষে মানুষে এমন পার্থক্য তখন মানুষ ও মল্লটায় মধ্যে কতটুকু পার্থক্য হতে পারে? পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে لا يفتلر বাক্যের তরুজমান 'মালিকের অনুমতি ব্যতীত' কথাটি মুক্ত করায় ফিকাহ সংক্রান্ত প্রশ্নের সমাধান হয়ে গেছে। আর কেউ যেন এরূপ ধারণায় লিপ্ত না হয় যে, সম্ভবত আল্লাহ ব্যতীত অন্য উপাস্যকেও অনুমতি দেওয়া হয়েছে। জওয়ান এই যে, প্রতিপালকত্বের জন্য কাউকে অনুমতি দেওয়া হয়নি এবং তা সম্ভবও নয়।)

### আনুষঙ্গিক জাতব্য বিষয়

جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا—আয়াতে একটি প্রধান নিয়ামত

বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরই স্বজাতি থেকে তোমাদের স্ত্রী নির্ধারণ করেছেন, যাতে পরস্পর ভালবাসাও পূর্ণরূপে হয় এবং মানব জাতির আভিজাত্য এবং মাহাত্ম্যও অব্যাহত থাকে।

وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا بِنِيَّتِكُمْ وَحُفْوًا—অর্থাৎ তোমাদের স্ত্রীদের

থেকে তোমাদের পুত্র ও পৌত্র পয়দা করেছেন।

এখানে প্রাধান্যযোগ্য এই যে, সন্তান-সন্ততি পিতামাতা উভয়ের সহযোগে জন্মগ্রহণ করে। আলোচ্য আয়াতে তা শুধু জননী থেকে পয়দা করার কথা বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সন্তান প্রসব ও সন্তান প্রজননে পিতার তুলনায় মাতার দখল বেশি। পিতা থেকে শুধু নিষ্পন্ন একটি বীর্যবিন্দু নির্গত হয়। এ বিন্দুর উপর দিয়ে বিভিন্ন অবস্থা অতিক্রান্ত হয়ে মানবাকৃতিতে পরিণত হওয়া, তাতে প্রাণ সঞ্চার হওয়া, সর্বশক্তি-মানের এসব সৃষ্টিজনিত ক্রিয়াকর্মের স্থান মাতার উদরেই। এ জন্যই হাদীসে মাতার হককে পিতার হক থেকে অগ্রা রাখা হয়েছে।

এ বাক্য পুত্রদের সাথে পৌত্রদের কথা উল্লেখ করার মধ্যে এদিকেও ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, এ দম্পতি সৃষ্টিটর আসল লক্ষ্য হচ্ছে মানব বংশের স্থায়িত্ব, যাতে সন্তান ও সন্তানের সন্তান হয়ে মানব জাতির স্থায়িত্বের ব্যবস্থা হয়।

অতঃপর **وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ**—বলে মানুষের ব্যক্তিগত স্বামিত্বের

ব্যবহার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। জন্মের পর মানুষের ব্যক্তিগত স্বামিত্বের জন্য খাদ্যের প্রয়োজন রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাও সরবরাহ করছেন। আয়াতে ব্যবহৃত শব্দের আসল অর্থ সাহায্যকারী, সেবক। সন্তানদের জন্যে এ শব্দটি ব্যবহার করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, পিতামাতার সেবক হওয়া সন্তানের কর্তব্য। —(কুরতুবী)

**فَلَا تَصْرَبُوا لِلَّهِ آلَ مَثَلٍ**—বাক্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

এ সত্যের প্রতি তান্বিল্য প্রদর্শনই কার্ফিরসুলভ সন্দেহ ও প্রয়ের জন্ম দেয়। সত্যটি এই যে, সাধারণভাবে মানুষ আল্লাহ তা'আলাকে মানবজাতির অনুরূপ মনে করে তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব, যেমন রাজা-বাদশাহকে আল্লাহর সদৃশরূপে পেশ করে। অতঃপর এই ভ্রান্ত দৃষ্টান্তের উপর ভিত্তি করে আল্লাহর কুদরতের ব্যবস্থাকেও রাজা-বাদশাহদের ব্যবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে বলতে থাকে যে, কোন রাষ্ট্রে একা বাদশাহ যেমন সমগ্র দেশের আইন-শৃংখলা পরিচালনা করতে পারেন না, অধীনস্থ মন্ত্রী ও কর্মকর্তাদেরকে ক্ষমতা অর্পণ করে তাদের সাহায্যে শাসনকার্য পরিচালনা করতে হয়, তেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলার অধীনে আরও কিছুসংখ্যক উপাস্যও থাকা প্রয়োজন, যারা আল্লাহর কাজে তাঁকে সাহায্য করবে। মূর্তি পূজারী ও মূশরিকদের মধ্যে প্রচলিত ধারণা তাই। আলোচ্য বাক্যটি তাদের সন্দেহের মূল কেটে দিয়ে বলেছে যে, আল্লাহ তা'আলার জন্যে সৃষ্টজীবের দৃষ্টান্ত পেশ করা একান্তই নিবৃদ্ধিত। তিনি দৃষ্টান্ত, উদাহরণ এবং আমাদের ধারণা-কল্পনার অনেক উর্ধ্বে।

শেষের দু'আয়াতে মানুষের দু'টি দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। প্রথম আয়াতে প্রভু ও গোলাম অর্থাৎ মালিক ও মালিকানাধিনের দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা হয়েছে যে, তারা উভয়েই যখন একই জাতি ও একই শ্রেণীভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও সমান হতে পারে না, তখন কোন সৃষ্টজীবকে আল্লাহর সমান কিরূপে সাব্যস্ত কর ?

দ্বিতীয় উদাহরণে একদিকে এমন লোক রয়েছে, যে লোকদেরকে ন্যায়, সুবিচার ও ভাল কথা শিক্ষা দেয়। এটা তার জ্ঞানশক্তির পরাকাষ্ঠা। সে নিজেও সুমম ও সরল পথে চলে। এটা তার কর্মশক্তির পরাকাষ্ঠা। এহেন কর্মগত ও জ্ঞানগত পরাকাষ্ঠার অধিকারী ব্যক্তির বিপরীতে এমন একজন লোক রয়েছে, যে নিজের কাজ করতে সক্ষম নয় এবং অন্যের কাজও তিকমত করতে পারে না। এই উভয় প্রকার মানুষ একই জাতি, একই শ্রেণী এবং একই সমাজভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও পরস্পর সমান হতে পারে না। অতএব সৃষ্ট জগতের স্রষ্টা ও প্রভু যিনি সর্বজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান, তাঁর সাথে কোন সৃষ্টবস্তু কিরূপে সমান হতে পারে।

وَ لِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۗ وَ مَا اَمْرُ السَّاعَةِ اِلَّا كَلِمَةٍ  
 الْبَصْرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝ وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ  
 مِنْ بُطُوْنِ اُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْئًا ۙ وَ جَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَ  
 الْاَبْصَارَ وَ الْاَفْئِدَةَ ۗ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝ اَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ  
 مُسَخَّرٰتٍ فِىْ جَوْ السَّمٰءِ ۗ مَا يُبْسِكُهِنَّ اِلَّا اللّٰهُ ۗ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ  
 لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۝ وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوْتِكُمْ سَكَنًا وَ جَعَلَ  
 لَكُمْ مِنْ جُلُوْدِ الْاَنْعَامِ بُيُوْتًا تَسْتَخِفُوْنَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَ يَوْمَ  
 اِقَامَتِكُمْ ۙ وَ مِنْ اَصْوٰفِهَا وَاَوْبَارِهَا وَاَشْعَارِهَا اَثَاثًا وَ مَتَاعًا  
 اِلَىٰ حَيٰتٍ ۝ وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلْمًا وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ  
 الْجِبَالِ اَكْنَانًا وَ جَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيْلَ تَقِيْكُمْ الْحَرَّ وَ سَرَابِيْلَ  
 تَقِيْكُمْ بَاسِكُمْ ۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْلِمُوْنَ ۝  
 فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّنَا عَلَيْكُمْ الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ۝ يَعْرِفُوْنَ نِعْمَتَ اللّٰهِ  
 ثُمَّ يَنْكُرُوْنَهَا وَاَكْثَرُهُمُ الْكٰفِرُوْنَ ۝

(৭৭) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের গোপন রহস্য আল্লাহর কাছেই রয়েছে। কিয়ামতের ব্যাপারটি তো এমন, যেমন চোখের পলক অথবা তার চাইতেও নিকটবর্তী। নিশ্চয় আল্লাহ্ সব কিছুর ওপর শক্তিমান। (৭৮) আল্লাহ্ তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের গর্ভ থেকে বের করেছেন। তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদেরকে কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর দিয়েছেন, যাতে তোমরা অনুগ্রহ স্বীকার কর। (৭৯) তারা কি উদ্ভূত পাখীকে দেখে না? এগুলো আকাশের অন্তরীক্ষে আজাদীন রয়েছে। আল্লাহ্ ছাড়া কেউ এগুলোকে আগলে রাখে না। নিশ্চয় এতে বিশ্বাসীদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে। (৮০) আল্লাহ্ করে দিয়েছেন তোমাদের গৃহকে অবস্থানের জায়গা এবং চতুর্পদ জন্তুর চামড়া দ্বারা করেছেন তোমার জন্য তাঁবুর ব্যবস্থা। তোমরা এগুলোকে সফরকালে ও অবস্থানকালে হালকা পাও। ভেড়ার পশম, উটের বাবরি চুল ও ছাগলের লোম দ্বারা কত আসবাবগণ ও

ব্যবহারের সামগ্রী তৈরী করেছেন এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। (৮১) আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে সৃজিত বস্তু দ্বারা ছায়া করে দিয়েছেন এবং পাহাড়সমূহে তোমাদের জন্যে আশ্রয়-গোপনের জায়গা করেছেন এবং তোমাদের জন্যে পোশাক তৈরী করে দিয়েছেন, যা তোমাদেরকে গ্রীষ্ম এবং বিপদের সময় রক্ষা করে। এমনভাবে তিনি তোমাদের প্রতি স্বীয় অনুগ্রহের পূর্ণতা দান করেন, যাতে তোমরা আত্মসমর্পণ কর। (৮২) অতঃপর যদি তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে, তবে আপনাদের কাজ সুস্পষ্টভাবে পৌঁছে দেওয়া মাত্র। (৮৩) তারা আল্লাহ্র অনুগ্রহ চিনে, এরপর অস্বীকার করে এবং তাদের অধিকাংশই অকৃতজ্ঞ।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের যাবতীয় গোপন রহস্য (যা কেউ জানে না; জানার দিক দিয়ে) আল্লাহ্ তা'আলারই বৈশিষ্ট্য (অতএব জানগুণে তিনি পরিপূর্ণ) এবং (শক্তিতে এমন পরিপূর্ণ যে, এসব গোপন রহস্যের মধ্যে যে একটা বিরাট কাজ রয়েছে অর্থাৎ) কিয়ামতের কাজ (তা) এমন (ত্বরিত গতির সম্পন্ন) হবে, যেমন চোখের পলক, বরং তার চাইতেও দ্রুত। (কিয়ামতের কাজের অর্থ মৃতদের মধ্যে প্রাণ সঞ্চারিত হওয়া। এটা যে চোখের পলকের চাইতেও দ্রুত হবে, তা বর্ণনাসাপেক্ষ নয়। কেননা, চোখের পলক একটি গতি। গতি কালের অধীন। কিন্তু প্রাণ সঞ্চারিত হওয়া মূহূর্তের ব্যাপার। মূহূর্ত কালের চাইতে দ্রুত। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কারণ) নিশ্চয় আল্লাহ্ সবকিছুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। (ক্ষমতা প্রমাণ করার জন্য বিশেষভাবে কিয়ামত উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত এই যে, কিয়ামত বিশেষ শ্রেণীর গোপন রহস্যেরও অন্যতম। তাই এটি জান ও ক্ষমতার উভয়ের প্রমাণ—সংঘটিত হওয়ার পূর্বে জানের এবং সংঘটিত হওয়ার পর ক্ষমতার প্রমাণ।) এবং (কুদরত ও বিভিন্ন নিয়ামতের প্রমাণাদির মধ্যে একটি এই যে,) আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের গর্ভ থেকে এমতাবস্থায় বের করেছেন যে, তোমরা কিছুই জানতে না (দার্শনিকদের পরিভাষায় এই স্তরের নাম 'আকলে হাইউলানী' তথা জড় জ্ঞান) এবং তিনি তোমাদেরকে কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর দিয়েছেন, যাতে তোমরা শোকার কর। (কুদরত সপ্রমাণ করার জন্যে) তারা কি পক্ষীসমূহকে দেখে না যে, আসমানের (নিচে) অন্তরীক্ষে (কুদরতের) আভাধীন হয়ে আছে, (অর্থাৎ) তাদেরকে (সেখানে) কেউ আগলে রাখে না, আল্লাহ্ ছাড়া। (নতুবা তাদের দেহের ঘনত্ব এবং বাতাসের বায়বীয়তার কারণে নিচে পড়ে যাওয়াই সম্ভব ছিল। তাই উল্লিখিত বিষয়ে) ঈমানদারদের জন্য (আল্লাহ্র কুদরতে) কতিপয় প্রমাণ (বিদ্যমান) রয়েছে। (কতিপয় প্রমাণ বলার কারণ এই যে, পাখীদেরকে বিশেষ আকারে সৃষ্টি করা, যাতে উড়তে পারে, একটি প্রমাণ। অতঃপর শূন্যমার্গকে উড়ার উপযোগী ও সম্ভবপর করে সৃষ্টি করা দ্বিতীয় প্রমাণ এবং কার্মত উড়া সংঘটিত হওয়া তৃতীয় প্রমাণ। উড়ার মধ্যে যেসব কারণের দখল রয়েছে, সেগুলো আল্লাহ্ তা'আলারই সৃজিত। এরপর এসব কারণের ভিত্তিতে উড়া বিদ্যমান হয়ে যাওয়াও আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা। নতুবা প্রায়ই কারণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও ঘটনা অস্তিত্বলাভ করে না। তাই

مَا يَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ বলা হয়েছে। বিভিন্ন নিয়ামত ও কুদরতের প্রমাণাদির মধ্যে একটি এই যে) আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য ( গৃহে অবস্থান কালে) তোমাদের গৃহে বস-বাসের জায়গা করেছেন এবং (সফর অবস্থায়) তোমাদের জন্য জন্তুদের চামড়ার ঘর ( অর্থাৎ তাঁবু তৈরী করেছেন, সেগুলোকে তোমরা সফর কালে এবং গৃহে অবস্থান কালে) হালকা পাও। ( তাই একে বহন করা এবং স্থাপন করা সহজ মনে হয় )। এবং তাদের ( জন্তুদের ) পশম, তাদের লোম এবং তাদের কেশ ( তোমাদের ) গৃহের আসবাবপত্র এবং কাজের জিনিস এক সময়ের জন্য তৈরী করেছেন ( 'এক সময়ের জন্য' বলার কারণ এই যে, এসব আসবাবপত্র সূতার কাপড়ের তুলনায় অধিক টেকসই হয়। বিভিন্ন নিয়ামত ও কুদরতের প্রমাণাদির মধ্যে একটি এই যে) আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য সৃজিত বস্ত্র ছাড়া করে দিয়েছেন (যেমন বৃক্ষ, ঘর-দরজা ইত্যাদি) এবং তোমাদের জন্য পাহাড়সমূহে আশ্রয়স্থল করেছেন ( অর্থাৎ গুহা ইত্যাদি, যেগুলোতে শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষায়, ইত্যর প্রাণী—মানুষ ও জন্তু শত্রু থেকে নিরাপদে থাকতে পারে।) এবং তোমাদের জন্য এমন জামা তৈরী করেছেন, যা গ্রীষ্ম থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করে এবং এমন জামা (-ও) তৈরী করেছেন, যা তোমাদেরকে পারস্পরিক যুদ্ধ থেকে ( অর্থাৎ যুদ্ধে জখম লাগা থেকে) রক্ষা করে। ( এখানে জৌহর্য বোঝানো হয়েছে। 'আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের প্রতি এ ধরনের নিয়ামতসমূহ পূর্ণ করেন, যাতে তোমরা ( এসব নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা-স্বরূপ ) অনুগত থাক। ( উল্লিখিত নিয়ামতসমূহের মধ্যে কিছুসংখ্যক মানব নিমিত্তও রয়েছে। কিন্তু সেগুলোর মূল উপকরণ এবং নির্মাণ-কৌশল আল্লাহ্ তা'আলারই সৃজিত। তাই প্রকৃত নিয়ামতদাতা তিনিই। অতঃপর এসব নিয়ামতের পরও) যদি তারা ঈমান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, ( তবে আপনি দুঃখিত হবেন না—এতে আপনার কোন ক্ষতি নেই। কেননা) আপনার দায়িত্ব শুধু সুস্পষ্টভাবে পৌঁছে দেওয়া। তাদের মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার কারণ এটা নয় যে, তারা এসব নিয়ামত চেনে না; (বরং তারা) আল্লাহ্‌র নিয়ামত চেনে, কিন্তু চেনার পর (ব্যবহারে) তা অস্বীকার করে (অর্থাৎ নিয়ামতদাতার সাথে মেলন ব্যবহার করা উচিত ছিল, অর্থাৎ ইবাদত ও আনুগত্য--তা অন্যের সাথে করে) এবং তাদের অধিকাংশ এমনি অকৃতজ্ঞ।

আনুশঙ্গিক জাতীয় বিষয়

لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا

এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, জ্ঞান লাভ মানুষের ব্যক্তিগত নৈপুণ্য নয়। জন্মের সময় তার কোন জ্ঞান ও নৈপুণ্য থাকে না। অতঃপর মানবিক প্রয়োজন অনুযায়ী তাকে কিছু কিছু জ্ঞান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সরাসরি শিক্ষা দেওয়া হয়। এসব জ্ঞান শিক্ষায় পিতামাতা ও গুণ্ডাদের কোন ভূমিকা নেই। সর্বপ্রথম তাকে কান্না শিক্ষা দেওয়া হয়। তার এ গুণটিই তখন তার যাবতীয় অস্তাব মেটার। ক্ষুধা বা তৃষ্ণা পেলে সে কান্না জুড়ে দেয়, শীত-উত্তাপ লাগলে কান্না জুড়ে দেয়। অনুরূপ অন্য যে কোন কণ্ট অনুভব করলেই

কান্না জুড়ে দেয়। সর্বশক্তিমান তার অভাব মোটানোর জন্য পিতামাতার অন্তরে বিশেষ স্নেহ-মমতা সৃষ্টি করে দেন। শিশুর আওয়াজ শুনতেই তাঁরা তার কণ্ঠ বুঝতে ও তা দূর করতে সচেষ্ট হয়ে যায়। যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে শিশুকে এ কান্না শিক্ষা দেওয়া না হত, তবে কে তাকে শিক্ষা দিত যে, কোন অসুবিধা দেখা দিলেই এভাবে শব্দ করতে হবে? এর সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলা তাকে ইলহামের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন যে, মায়ের স্তন থেকে খাদ্যলাভ করার জন্য মাড়ি ও ঠোঁটকে কাজে লাগাতে হবে। এ শিক্ষা স্বভাবত ও সরাসরি না হলে কোন ওস্তাদের সাধ্য ছিল এ সদ্যজাত শিশুকে মুখ চালনা ও স্তন চোষা শিক্ষা দেওয়া। এমনিভাবে তার প্রয়োজন যতই বাড়তে থাকে, সর্বশক্তিমান তাকে পিতামাতার মধ্যস্থতা ছাড়াই আপনা-আপনি শিক্ষাদান করেন। কিছুদিন পর তার মধ্যে এমন নৈপুণ্য সৃষ্টি হতে থাকে যে, পিতামাতা ও নিকটস্থ অন্যান্য লোকের কথাবার্তা শুনে কিংবা কোন কোন বস্তু দেখে কিছু শিখতে থাকে। অতঃপর শ্রুত শব্দ ও দেখা বিষয় নিয়ে চিন্তা করার ও বোঝার নৈপুণ্য সৃষ্টি হয়।

তাই আয়াতে **وَجَعَلْ لَكُمْ السَّمْعَ** -এর পরে বলা হয়েছে: **لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا**

**وَأَلَّا يَمَارُوا** — অর্থাৎ জন্মের শুরুতে যদিও কোন কিছুই জান মানুষের

মধ্যে ছিল না, কিন্তু সর্বশক্তিমান তার অস্তিত্বের মধ্যে জ্ঞান অর্জনের অভিনব উপকরণ স্থাপন করে দিয়েছেন। এসব উপকরণের মধ্যে সর্বপ্রথম **سَمْع** অর্থাৎ শ্রবণ-শক্তির উল্লেখ করা হয়েছে। একে অগ্রে আনার কারণ সম্ভবত এই যে, মানুষের সর্বপ্রথম জ্ঞান এবং সর্বাধিক জ্ঞান কানের পথেই আগমন করে। সূচনাভাগে চক্ষু বন্ধ থাকে; কিন্তু কান শ্রবণ করে। এরপরও চিন্তা করলে দেখা যায় যে, মানুষ সারা জীবনে যত জ্ঞান অর্জন করে, তন্মধ্যে কানে শ্রুত জ্ঞান সর্বাধিক। চোখে দেখা জ্ঞান তুলনামূলকভাবে কম।

এতদুভয়ের পর এসব জ্ঞানের পালা আসে, যেগুলো মানুষ শোনা ও দেখা বিষয়সমূহ নিয়ে চিন্তাভাবনা করে অর্জন করে। কোরআনের উক্তি অনুযায়ী একাজ মানুষের অন্তরের।

তাই তৃতীয় পর্যায়ে **أَفَلَا** বলা হয়েছে। এটা **فَرَادٌ** -এর বহুবচন। অর্থ অন্তর।

দার্শনিকরা সাধারণভাবে মানুষের মস্তিষ্ককে জ্ঞানবুদ্ধি ও বোধশক্তির কেন্দ্র সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু কোরআনের বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, কোন কিছু বোঝার ব্যাপারে যদিও মস্তিষ্কের প্রভাব রয়েছে, কিন্তু জ্ঞানবুদ্ধির আসল কেন্দ্র হচ্ছে অন্তর।

এ স্থলে আল্লাহ তা'আলা শ্রবণশক্তি, দর্শনশক্তি ও বোধশক্তির উল্লেখ করেছেন; বাকশক্তি ও জিহ্বার কথা উল্লেখ করেন নি। কেননা, জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে বাকশক্তির প্রভাব নেই; বাকশক্তি বরং জ্ঞান প্রকাশের উপায়। এছাড়া ইমাম কুরতুবী বলেন: শ্রবণশক্তির মাঝে বাকশক্তির উল্লেখও প্রসঙ্গত হয়ে গেছে। কেননা, অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয়, যে ব্যক্তি কানে শোনে, সে মুখে কথাও বলে। বোবা কথা বলতে অক্ষম, সে কানের দিক থেকেও বঞ্চিত। সম্ভবত তার কথা না বলার কারণই হচ্ছে কানে কোন শব্দ না শোনা। শব্দ শুনলে হয়তো সে তা অনুসরণ করে বলাও শিখত।

بُيُوتٌ مِّمَّا جَعَلَ لَكُمْ مِنْهُ مَنَازِلَ وَمِنْهُ لَكُمْ مَسَاجِدٌ وَأَلْجَاءُ مَخْرُجِينَ—এখানে শব্দটি

বুইত শব্দটি বলা হয়। ইমাম কুরতুবী স্বীয় ফরাসীতে বলেন :

كل ما على فاطك فهو سقف و سماه و كل ما اقلك فهو ارض و كل ما جتري من جها تك الا ربع فهو جد از فاذا انتظمت و اتصلت فهو بيوت -

অর্থাৎ “যে বস্তু তোমার মাথার উপরে রয়েছে এবং তোমাকে ছায়া দান করে, তা ছাদ ও আকাশ বলে কথিত হয়। যে বস্তু তোমার অস্তিত্বকে বহন করেছে তা ভূমীন এবং যে বস্তু চতুর্দিক থেকে তোমাকে আবৃত করে রাখে, তা প্রাচীর। এগুলো সব কাছাকাছি একত্রিত হয়ে গেলে তাই **بُيُوتٌ** তথা গৃহে পরিণত হয়।”

গৃহ নির্মাণের আসল লক্ষ্য অন্তর ও দেহের শান্তি : আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা মানবগৃহকে শান্তির জায়গা বলে অভিহিত করে গৃহ নির্মাণের দর্শন ও রহস্য ফুটিয়ে তুলেছেন। অর্থাৎ এর আসল লক্ষ্য হচ্ছে দেহ ও অন্তরের শান্তি। মানুষ অভ্যাসগতভাবে গৃহের বাইরে পরিশ্রমলব্ধ উপার্জন ও কাজকর্ম করে। তখন পরিশ্রান্ত হয়ে গৃহে পৌঁছে বিশ্রাম ও শান্তি অর্জন করাই গৃহের আসল উদ্দেশ্য। যদিও মাঝে মাঝে মানুষ গৃহেও কাজকর্ম মশগুল থাকে, কিন্তু এটা সাধারণত খুব কমই হয়।

এ ছাড়া আসল শান্তি হচ্ছে মন ও মস্তিষ্কের শান্তি। এটা মানুষ গৃহের মধ্যেই পায়। এ থেকে আরও জানা গেল যে, গৃহের প্রধান গুণ হচ্ছে তাতে শান্তি পাওয়া। বর্তমান বিশ্বের গৃহনির্মাণ কাজ চরম উন্নতির পথে রয়েছে। এতে বাহ্যিক সাজ-সজ্জার জন্য বেহিসাব খরচও করা হয়, কিন্তু দেহ ও মনের শান্তি পাওয়া যায়। এরূপ গৃহের সংখ্যা খুবই কম। কোন কোন ক্ষেত্রে বরং কৃত্রিম লৌকিকতাই আরাম ও শান্তির মূলে কুঠারামাত হানে। এটা না হলে গৃহে যাদের সাথে ওঠাবসা করতে হয়, তারা শান্তি বরবাদ করে দেয়। এহেন সুরমা অট্টালিকার চাইতে এমন কুড়োঘরও উত্তম, যার বাসিন্দারা দেহ ও মনের শান্তি পায়।

কোরআন পাক প্রত্যেক বস্তুর প্রাণ ও মূল বর্ণনা করে। শান্তিকে মানব গৃহের প্রকৃত লক্ষ্য এবং সর্বপ্রধান উদ্দেশ্য সাব্যস্ত করা হয়েছে। এমনিভাবে কোরআন দাম্পত্য জীবনের প্রকৃত লক্ষ্যও শান্তি সাব্যস্ত করে বলেছে : **تَسْكُنُوا إِلَيْهَا**— অর্থাৎ

“তোমরা যেন তার নিকট গিয়ে শান্তি লাভ করতে পার।” যে দাম্পত্য জীবন থেকে এ লক্ষ্য অর্জিত হয় না, তা প্রকৃত উপকারিতা থেকে বঞ্চিত। সাম্প্রতিক বিশ্বে এসব বিষয়ে আনুষ্ঠানিকতা ও অনানুষ্ঠানিক লৌকিকতা এবং বাহ্যিক সাজ-সজ্জার অন্ত নেই এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা এসব বিষয়ে বাহ্যিক সাজ-সজ্জার যাবতীয় উপকরণ উপস্থিত করে দিয়েছে, কিন্তু দেহ ও মনের শান্তি সম্পূর্ণরূপে হিনিয়ে নিয়েছে।

থেকে প্রমাণিত  
 مِنْ أَمْوَالِهَا وَأَوْبَارِهَا وَبِهِ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ

হল যে, জীব-জন্তুর চামড়া, লোম ও পশম ব্যবহার করা মানুষের জন্য হালাল। এতে জন্তুটি যবেহকৃত হওয়া অথবা মৃত হওয়ারও কোন শর্ত নেই। এমনভাবে যে জন্তুর পশম বা চামড়া আহরণ করা হবে, সেটির গোশত হালাল কি হারাম সেটা বিচার করারও কোন শর্ত নেই। সব রকম জন্তুর চামড়াই লবণ দিয়ে শুকানোর পর ব্যবহার করা হালাল। লোম ও পশমের উপর জন্তুর মৃত্যুর কোন প্রভাবই পড়ে না। তাই সেটি যথারীতি শুকিয়ে ব্যবহারোপ-সোগী করে নিলেই তা পাক হয়ে যায় এবং সেটি ব্যবহার করা হালাল ও জায়েয হয়ে যায়। ইমাম আব্বাস আবু হানিফা (র)-র মতাব তাই। তবে শূকরের চামড়া ও যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও লোম-পশম অপবিত্র ও ব্যবহারের অযোগ্য।

سَوَاءٌ يَهْلُ تَقِيكُمْ الْحَرَامَ—এখানে গ্রীষ্মের উত্তাপ থেকে রক্ষা করাকে মানুষের

জামার উদ্দেশ্য বলা হয়েছে। অথচ জামা মানুষকে শীত ও গ্রীষ্ম উভয় ঋতুর প্রভাব থেকেই রক্ষা করে। ইমাম কুরতুবী ও অন্যান্য তফসীরবিদের এ প্রশ্নের জওয়াবে বলেন যে, কোরআন পাক আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। সর্বপ্রথম এতে আরবদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। তাই এতে আরবদের অভ্যাস ও প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে বক্তব্য রাখা হয়েছে। আরব গ্রীষ্ম প্রধান দেশ। সেখানে বরফ জমা ও শীতের কল্পনা করা কঠিন। তাই শুধু গ্রীষ্ম থেকে রক্ষা করার কথা বলা হয়েছে। হযরত থানভী (র) বয়ানুল কোরআনে

বলেন : কোরআন পাক এ সূরার শুরুতে لَكُمْ فِيهَا رِفَاءٌ বলে পোশাকের

সাহায্যে শীত থেকে আত্মরক্ষা ও উত্তাপ হাসিল করার কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছিল। তাই এখানে শুধু উত্তাপ প্রতিহত করার কথা বলা হয়েছে।

وَيَوْمَ نُبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا  
 وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ۝ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفِّفُ  
 عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ۝ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شَرَكَاءَهُمْ  
 قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَائُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ  
 فَأَلْقُوا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ ۝ وَالْقَوْلَ لَإِلَهِ إِلَّا اللَّهُ يَوْمَئِذٍ  
 السَّلَامَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۝ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا



عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا  
 يُفْسِدُونَ ۝ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ  
 أَنفُسِهِمْ وَجُنُنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَيْنَا هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ  
 تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ۝

(৮৪) যেদিন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে একজন বর্ণনাকারী দাঁড় করাব, তখন কাফিরদেরকে অনুমতি দেওয়া হবে না এবং তাদের কাছ থেকে তওবাও গ্রহণ করা হবে না। (৮৫) যখন জালিমরা আযাব প্রত্যক্ষ করবে, তখন তাদের থেকে তা লম্বু করা হবে না এবং তাদেরকে কোন অবকাশ দেওয়া হবে না। (৮৬) মুশরিকরা যখন ঐ সব বস্তুকে দেখবে, যেসবকে তারা আল্লাহর সাথে শরীক সাব্যস্ত করেছিল, তখন বলবে : হে আমাদের পালনকর্তা, এরাই তারা যারা আমাদের শিরক-এর উপাদান, তোমাকে ছেড়ে আমরা যাদেরকে ডাকতাম। তখন ওরা তাদেরকে বলবে : তোমরা মিথ্যাবাদী। (৮৭) সেদিন তারা আল্লাহর সামনে আত্মসমর্পণ করবে এবং তারা যে মিথ্যা অপবাদ দিত তা বিস্মৃত হবে। (৮৮) যারা কাফির হয়েছে এবং আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করেছে, আমি তাদেরকে আযাবের পর আযাব বাড়িয়ে দেব। কারণ তারা অশান্তি সৃষ্টি করত। (৮৯) সেদিন প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে আমি একজন বর্ণনাকারী দাঁড় করাব তাদের বিপক্ষে তাদের মধ্য থেকেই এবং তাদের বিষয়ে আপনাকে সাক্ষীরূপে আনয়ন করব। আমি আপনার প্রতি প্রহু নাযিল করেছি যেটি এমন যে, তা প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বর্ণনা, হিদায়ত, রহমত এবং আত্মসমর্পণকারীদের জন্য সুসংবাদ।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং (সে দিনটি সম্মরণযোগ্য) যেদিন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে এক-একজন সাক্ষী (যে সে উম্মতের পয়গম্বর হবেন) দাঁড় করাব (সে তাদের মন্দ কর্মের সাক্ষ্য দেবে) অতঃপর কাফিরদেরকে (ওযর-আপত্তি করার) অনুমতি দেওয়া হবে না কিংবা তাদেরকে আল্লাহকে স্বামী করারও নির্দেশ দেওয়া হবে না। (অর্থাৎ তাদেরকে বলা হবে না যে, তোমরা তওবা অথবা কোন কর্মের মাধ্যমে আল্লাহকে সম্বলিত করে নাও। এর কারণ সুস্পষ্ট--পরকাল হচ্ছে প্রতিদান জগত, কর্মজগত নয়।) যখন জালিমরা (অর্থাৎ কাফিররা) আযাব প্রত্যক্ষ করবে (অর্থাৎ তাতে পতিত হবে), আযাব তখন তাদের শিথিল করা হবে না এবং তারা (তাতে) অবকাশপ্রাপ্ত হবে না (যেমন, কিছুদিন পরে জারি করা)। যখন মুশরিকরা তাদের অবলম্বনকৃত শরীকদের (আল্লাহ ব্যতীত তারা যাদের ইবাদত করত) দেখবে, তখন (অপ-রাধ স্বীকার করার উদ্দেশ্যে) বলবে : হে আমাদের পালন কর্তা, আমাদের অবলম্বনকৃত শরীক এরাই--আপনাকে ছেড়ে আমরা যাদের ইবাদত করতাম। অতঃপর তারা (শরীকরা

ভয় করবে যে, কোথাও না তাদের বিপদ এসে যায়, তাই) তাদের ( প্রতি কথা ফিরিয়ে) বলবে যে, তোমরা মিথ্যাবাদী। ( তাদের আসল উদ্দেশ্য এই, তোমাদের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। এভাবে তারা নিজেদের হিফামত করতে চাইবে। তাদের এই উদ্দেশ্য সত্য হোক; যেমন আল্লাহর প্রিয়জন ফেরেশতা ও পয়গম্বরগণ একথা বললে, তা সত্য হবে

كَقَوْلَةِ تَعَالَىٰ—بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ

শয়তানরা বললে মিথ্যা হবে, কিংবা সত্য না মিথ্যা বস্তুরা তা জানেই না; যেমন মূর্তি, মূক ইত্যাদি শরীক যদি একথা বলে) এবং মুশরিক ও কাফিররা সেদিন আল্লাহর সামনে আনুগত্যের কথাবার্তা বলতে থাকবে এবং দুনিয়াতে যেসব মিথ্যা অপবাদ রটনা করত (তখন) তা সব ভুলে যাবে (এবং তাদের মধ্যে) যারা (নিজেরাও) কুফুরী করত এবং (অপরকেও) আল্লাহর পথ (অর্থাৎ দীন) থেকে ফিরিয়ে রাখত, তাদের জন্য আমি এক শাস্তির উপর (যা কুফুরীর বিনিময়ে হবে) অন্য শাস্তি তাদের অন্যায়ের কারণে (অর্থাৎ আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখার কারণে) বাড়িয়ে দেব। আর (সে দিনটিও স্মরণীয় ও ভয় করার যোগ্য) যেদিন আমি প্রত্যেক উম্মতের এক একজন সাক্ষী তাদের মধ্য থেকে তাদের বিরুদ্ধে দাঁড় করাব। (এখানে উম্মতের নবীকে বোঝানো হয়েছে। 'তাদেরই মধ্য থেকে'—এটা বংশ ভিত্তিক এবং দেশ ভিত্তিক উভয় প্রকারেই হতে পারে।) এবং তাদের বিরুদ্ধে আপনাকে সাক্ষী করে আনব। [সাক্ষীর এ সংবাদ থেকে রসূলুল্লাহ (সা)-র নবুয়তের সংবাদ বোঝা যায়। এ নবুয়তের প্রমাণ এই যে,] আমি আপনার প্রতি কোরআন নাখিল করেছি, যা (বিস্ময়জনক প্রমাণের যে ভিত্তি অলৌকিকত্ব, সে অলৌকিক হওয়া ছাড়া এসব গুণের আধার যে, ) সব (দীনি) বিষয় (প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে সর্বসাধারণের জন্য) বর্ণনাকারী এবং (বিশেষভাবে) মুসলমানদের জন্য প্রকৃষ্ট হিদায়ত, অফুরন্ত রহমত এবং (ঈমানের কারণে) সুসংবাদদাতা।

### আনুশঙ্গিক জাতব্য বিষয়

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَبْيِهَا نَا لِكُلِّ شَيْءٍ—এতে কোরআনকে প্রত্যেক

বস্তুর বর্ণনাকারী বলা হয়েছে। 'প্রত্যেক বস্তু' বলে প্রধানত দীনের যাবতীয় বিষয় বোঝানো হয়েছে। কেননা, ওহী ও নবুয়তের লক্ষ্য এগুলোর সাথেই সম্পৃক্ত। তাই মানুষের আয়াসসাধ্য অন্যান্য বিজ্ঞান ও উদ্ভূত দৈনন্দিন সমস্যাদির তৈরী সমাধান কোরআন পাকে অনুসন্ধান করা ভুল। প্রসঙ্গত এসব সমস্যাদির সমাধানের ব্যাপারে যেসব ইঙ্গিত রয়েছে, মানবীয় মেধার সংযোগে সেসব থেকেই সমাধান খুঁজে বের করা সম্ভব। এখন প্রশ্ন থাকে যে, কোরআন পাকে অনেক দীনি খুঁটিনাটি বিষয়ও সন্ধানিত

বর্ণিত হয়নি। এমতাবস্থায় কোরআনকে

تَبْيِهَا نَا لِكُلِّ شَيْءٍ—বলা যথার্থ

হবে কিরূপ ?

এর উত্তর এই যে, কোরআন পাকে সব বিষয়েরই মূলনীতি বিদ্যমান রয়েছে। সেসব মূলনীতির আলোকেই রসূলুল্লাহ্ (সা)-র হাদীস মাস'আলা বর্ণনা করে। কিছু কিছু বিবরণ ইজমা ও কিয়াসের আওতায় ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস থেকে যেসব মাস'আলা নির্গত হয়েছে, সেগুলোও পরোক্ষভাবে কোরআনেরই বর্ণিত মাস'আলা।

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ  
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٠﴾

(৯০) আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার আদেশ দেন এবং তিনি মজাহীনিতা, অসমস্ত কাজ এবং অবাধ্যতা করতে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন—যাতে তোমরা স্মরণ রাখ।

### তকসীরের সার-সংক্ষেপ

নিশ্চয় আল্লাহ্ জা'আলা (কোরআনে) ভারসাম্য, অনুগ্রহ এবং নিকটাত্মীয়দেরকে দান-খয়রাত করার আদেশ দেন এবং প্রকাশ্য বা যে কোন মন্দ কাজ এবং (কারও প্রতি) অত্যাচার (ও নিপীড়ন) করতে নিষেধ করেন। (উল্লিখিত আদিষ্ট ও নিষিদ্ধ কাজসমূহের মধ্যে ধারভীয়া সংকর্ম ও কুকর্ম এসে গেছে। বিষয়বস্তুর এ ব্যাপকতার কারণে কোরআন যে প্রত্যেক বস্তুর বর্ণনাকারী তা বলার অপেক্ষা রাখে না এবং) আল্লাহ্ তোমাদেরকে (উল্লিখিত বিষয়বস্তুর) এজন্য উপদেশ দেন, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর (এবং সে মত কাজ কর। কেননা, 'হিদায়তকারী', 'রহমত'ও সুসংবাদদাতা হওয়া এরই উপর নির্ভরশীল)।

### আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতটি কোরআন পাকের একটি ব্যাপক অর্থবোধক আয়াত। এর কয়েকটি শব্দের মধ্যেই ইসলামী শিক্ষার ধারভীয়া বিষয় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ কারণেই পূর্ববর্তী বুয়ুর্গগণের আমর থেকে আজ পর্যন্ত জুম'আ ও দুই ঈদের খুতবায় শেষ দিকে এ আয়াতটি পাঠ করা হয়। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন : সূরা

নাহলের <sup>أَنَّ</sup> <sup>اللَّهَ</sup> <sup>يَأْمُرُ</sup> <sup>بِالْعَدْلِ</sup> <sup>وَالْإِحْسَانِ</sup> <sup>وَإِيتَائِي</sup> <sup>ذِي</sup> <sup>الْقُرْبَىٰ</sup> <sup>وَيَنْهَىٰ</sup> <sup>عَنِ</sup> <sup>الْفَحْشَاءِ</sup> <sup>وَالْمُنْكَرِ</sup> <sup>وَالْبَغْيِ</sup> <sup>يَعِظُكُمْ</sup> <sup>لَعَلَّكُمْ</sup> <sup>تَذَكَّرُونَ</sup> আয়াতটি হচ্ছে কোরআন পাকের ব্যাপকতর অর্থ-

বোধক আয়াত।—( ইবনে কাসীর )

হযরত আকসাম ইবনে সায়ফী (রা) এ আয়াতের কারণেই মুসলমান হয়েছিলেন। ইমাম ইবনে কাসীর হাফিযে হাদীস আবু ইয়ালার গ্রন্থ মারেকাতুস্ সাহাবা থেকে সনদসহ এ ঘটনা বর্ণনা করেন যে, আকসাম ইবনে সায়ফী স্বীয় গোত্রের সর্দার ছিলেন। রসূলুল্লাহ্

(সা)-এর নব্বুত দাবী ও ইসলাম প্রচারের সংবাদ পেয়ে তিনি রসুলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে আগমন করার ইচ্ছা করলেন। কিন্তু গোত্রের লোকেরা বলল : আপনি সবার প্রধান। আপনার স্বয়ং যাওয়া সমীচীন নয়। আকসাম বললেন : তবে গোত্র থেকে দু'ব্যক্তিকে মনোনীত কর। তারা সেখানে যাবে এবং অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে আমাকে জানাবে। মনোনীত দু'ব্যক্তি রসুলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে উপস্থিত হয়ে আরম্ভ করল : আমরা আকসাম ইবনে সায়ফীর পক্ষ থেকে দু'টি বিষয় জানতে এসেছি। আকসামের প্রথম দু'টি এই :

مِنْ أَنْتَ وَمَا أَنْتَ      আপনি কে এবং কি ?

রসুলুল্লাহ্ (সা) বললেন : প্রথম প্রশ্নের উত্তর এই যে, আমি আবদুল্লাহ্‌র পুত্র মুহাম্মদ। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর এই যে, আমি আল্লাহ্‌র বান্দা ও তাঁর রসুল। এরপর

তিনি সূরা নাহলের এ আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন : **إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ**

وَالْإِحْسَانِ --- উভয় দূত অনুরোধ করল : এ বাক্যগুলো আমাদেরকে আবার

শোনানো হোক। রসুলুল্লাহ্ (সা) আয়াতটি একাধিকবার তিলাওয়াত করেন। ফলে শেষ পর্যন্ত আয়াতটি তাদের মুখস্থ হয়ে যায়।

দূতবয় আকসাম ইবনে সায়ফীর কাছে ফিরে এসে উল্লিখিত আয়াত শুনিয়ে দিল। আয়াতটি শুনেই আকসাম বলল : এতে বোঝা যায় যে, তিনি উত্তম চরিত্রের আদেশ দেন এবং মন্দ ও অপকৃষ্ট চরিত্র অবলম্বন করতে নিষেধ করেন। তোমরা সবাই তাঁর ধর্মের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও, যাতে তোমরা অন্যদের অগ্রে থাক এবং পেছনে অনুসারী হয়ে না থাক।---  
(ইবনে কাসীর)

এমনিভাবে হযরত উসমান ইবনে মযউন (রা) বললেন : শুরুতে আমি লোকমুখে শুনে খোঁকের মাথায় ইসলাম গ্রহণ করেছিলাম, আমার অন্তরে ইসলাম বন্ধমূল ছিল না। একদিন আমি রসুলুল্লাহ্ (সা)-র খিদমতে উপস্থিত ছিলাম, হঠাৎ তাঁর উপর ওহী অবতরণের লক্ষণ প্রকাশ পেল। কতিপয় বিচিত্র অবস্থার পর তিনি বললেন : আল্লাহ্‌র দূত এসেছিল এবং এই আয়াত আমার প্রতি নাযিল হয়েছে। হযরত উসমান ইবনে মযউন বললেন : এই ঘটনা দেখে এবং আয়াত শুনে আমার অন্তরে ঈমান বন্ধমূল ও অটল হয়ে গেল এবং রসুলুল্লাহ্ (সা)-র মহব্বত আমার মনে আসন পেতে বসল। ইবনে কাসীর এ ঘটনা বর্ণনা করে এর সনদকে হাসান ও নির্ভুল বলেছেন।

রসুলুল্লাহ্ (সা) এ আয়াত ওলীদ ইবনে মুগীরা'র সামনে তিলাওয়াত করলে সে-ও প্রভাবান্বিত হয় এবং কুরআনশদের সামনে ভাষণ দেয় যে :

وَاللّٰهُ اَنْ لَّا يَدْرٰى وَاَنْ مَلِيْةٌ لِّطَلَا وَاَنْ اَصْلَةٌ لِّمُورِقٍ وَاَعْلَاةٌ لِّمَثْمَرٍ  
وَمَا هُوَ بِقَوْلٍ بَشَرٍ

আল্লাহর কসম, এতে একটি বিশেষ মাধুর্য রয়েছে। এর মধ্যে একটি বিশেষ রঙনক ও উজ্জ্বল্য রয়েছে। এর মূল থেকে শাখা ও পাতা গজাবে এবং শাখা ফলন্ত হবে। এটা কখনও কোন মানুষের বাক্য হতে পারে না।

তিনটি বিষয়ের আদেশ ও তিনটি বিষয়ের নিষেধাজ্ঞা : আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তিনটি বিষয়ের আদেশ দিয়েছেন : সুবিচার, অনুগ্রহ ও আত্মীয়দের প্রতি অনুগ্রহ। পক্ষান্তরে তিন প্রকার কাজ করতে নিষেধ করেছেন : নির্লজ্জ কাজ, প্রত্যেক মন্দ কাজ এবং জুলুম ও উৎপীড়ন। আয়াতে ব্যবহৃত ছয়টি শব্দের পারিভাষিক অর্থ ও সংজ্ঞার ব্যাখ্যা নিম্নরূপ :

عدل — শব্দের আসল ও আভিধানিক অর্থ সমান করা। এর সাথে সম্বন্ধ রেখেই বিচারকদের জনগণের বিরোধ সংক্রান্ত মোকদ্দমায় সুবিচারমূলক ফয়সলা করাকে **عدل** বলা হয়। **أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ** আয়াতে এ অর্থই বিধৃত হয়েছে। এ অর্থের

দিক দিয়েই স্বল্পতা ও বাহুল্যের মাঝামাঝি সমতাকেও **عدل** বলা হয়। কোন কোন তফসীরবিদ এ অর্থের সাথে সম্বন্ধ রেখেই আলোচ্য আয়াতে বাইরে ও ভিতরে সমান হওয়া দ্বারা **عدل** শব্দের তফসীর করেছেন। অর্থাৎ **عدل** এমন উক্তি অথবা কর্ম, যা মানুষের বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে প্রকাশ পায় এবং অন্তরেও তদ্রূপ বিশ্বাস থাকে। বাস্তব সত্য এই যে, এখানে **عدل** শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং এতে উপরোক্ত সব অর্থই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তফসীরবিদদের কাছ থেকে বর্ণিত এসব অর্থের মধ্যে কোন পরস্পর বিরোধিতা নেই।

ইবনে আব্বাসী বলেন : 'আদল' শব্দের আসল অর্থ সমান করা। এরপর বিভিন্ন সম্পর্কের কারণে এর অর্থ বিভিন্ন হয়ে যায়। উদাহরণত প্রথম আদল হচ্ছে মানুষ ও আল্লাহর মধ্যে আদল করা। এর অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলার হককে নিজের ভোগ-বিলাসের উপর এবং তাঁর সম্বলিতিকে নিজের কামনা-বাসনার উপর অগ্রাধিকার দেওয়া, আল্লাহর বিধানাবলী পালন করা এবং নিষিদ্ধ ও হারাম বিষয়াদি থেকে বেঁচে থাকা।

দ্বিতীয় আদল হচ্ছে মানুষের নিজের সাথে আদল করা। তা এই যে, দৈহিক ও আত্মিক ধ্বংসের কারণাদি থেকে নিজেকে বাঁচানো, নিজের এমন কামনা পূর্ণ না করা যা পল্লিগামে ক্ষতিকর হয় এবং সবার ও অল্পে তুলিটি অবলম্বন করা, নিজের উপর অহেতুক বেশি বোঝা না চাপানো।

তৃতীয় আদল হচ্ছে নিজের এবং সমগ্র সৃষ্টজীবের সাথে শুভেচ্ছা ও সহানুভূতিমূলক ব্যবহার করা, ছোটবড় ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতকতা না করা, সবার জন্য নিজের মনের কাছে সুবিচার দাবী করা এবং কোন মানুষকে কথা অথবা কার্য দ্বারা প্রকাশ্যে অথবা অপ্রকাশ্যে কোনরূপ কষ্ট না দেওয়া।

এমনিভাবে বিচারে রায় দেওয়ার সময় পক্ষপাতিত্ব না করে সত্যের অনুকূলে রায় দেওয়া এক প্রকার আদল এবং প্রত্যেক কাজে স্বল্পতা ও বাহুল্যের পথ বর্জন করে মধ্যবর্তিতা

অবলম্বন করাও এক প্রকার আদল। আবু আবদুল্লাহ্ রায়ী এ অর্থ গ্রহণ করেই বলেছেন যে, আদল শব্দের মধ্যে বিশ্বাসের সমতা, কার্যের সমতা, চরিত্রের সমতা—সবই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।—( বাহরে মুহীত )

ইমাম কুরতুবী আদলের অর্থ প্রসঙ্গে উপরোক্ত বিবরণ উল্লেখ করে বলেছেন যে, এ বিবরণ খুবই চমৎকার। এ থেকে আরও জানা গেল যে, আয়াতের আদল শব্দটিই যাবতীয় উত্তম কর্ম ও চরিত্র অনুসরণ এবং মন্দ কর্ম ও চরিত্র থেকে বেঁচে থাকার অর্থে পরিব্যাপ্ত রয়েছে।

**الْإِحْسَانُ**—এর আসল আভিধানিক অর্থ সুন্দর করা। তা দু'প্রকার। এক কর্ম, চরিত্র, ও অভ্যাসকে সুন্দর ও ভাল করা। দুই. কোন ব্যক্তির সাথে ভাল ব্যবহার ও উত্তম আচরণ করা। দ্বিতীয় অর্থের জন্য আরবী ভাষায় احسان শব্দের সাথে **أَحْسَنُ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ** অব্যয় ব্যবহৃত হয়; যেমন এক আয়াতে বলা হয়েছে।

ইমাম কুরতুবী বলেন : আলোচ্য আয়াতে এ শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই উপরোক্ত উভয় প্রকার অর্থই এতে शामिल রয়েছে। প্রথম প্রকার ইহ্সান অর্থাৎ কোন কাজকে সুন্দর করা—এটাও ব্যাপক; অর্থাৎ ইবাদত, কর্ম, চরিত্র, পারম্পরিক লেনদেন ইত্যাদিকে সুন্দর করা।

প্রসিদ্ধ 'হাদীসে-জিবরায়েলে' স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সা) ইহ্সানের যে অর্থ বর্ণনা করেছেন, তা হচ্ছে ইবাদতের ইহ্সান। এর সারমর্ম এই যে, আল্লাহর ইবাদত এভাবে করা দরকার, যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছ। যদি আল্লাহর উপস্থিতির এমন স্তর অর্জন করতে না পার, তবে এতটুকু বিশ্বাস তো প্রত্যেক ইবাদতকারীরই থাকার উচিত যে, আল্লাহ তা'আলা তার কাজ দেখছেন। কেননা, আল্লাহর জ্ঞান ও দৃষ্টির বাইরে কোন কিছু থাকতে পারে না—এটা ইসলামী বিশ্বাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।

মোটকথা, আলোচ্য আয়াতে দ্বিতীয় নির্দেশ ইহ্সান সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। হাদীসের ব্যাখ্যা অনুযায়ী এতে ইবাদতের ইহ্সান এবং যাবতীয় কর্ম, চরিত্র ও অভ্যাসের ইহ্সান অর্থাৎ এগুলোকে প্রাথিত উপায়ে বিস্তৃত ও সর্বাঙ্গ সুন্দর করা বোঝানো হয়েছে। এছাড়া মুসলমান, কাফির মানুষ ও জন্তু নিবিশেষে সকলের সাথে উত্তম ব্যবহার করার বিষয়টিও এ আদেশের অন্তর্ভুক্ত।

ইমাম কুরতুবী বলেন : যে ব্যক্তির গৃহে তার বিড়াল খোরাক ও অন্যান্য দরকারী বস্তু না পায় এবং যার পিঞ্জরায় আবদ্ধ পাখীর পুরোপুরি দেখাশোনা করা না হয়, সে যত ইবাদতই করুক, ইহ্সানকারী গণ্য হবে না।

আয়াতে প্রথম আদল ও পরে ইহ্সানের আদেশ প্রদান করা হয়েছে। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন : আদল হচ্ছে অন্যের অধিকার পুরোপুরি দেওয়া এবং নিজের

অধিকার পুরোপুরি নেওয়া—কমও নয়, বেশিও নয়। তোমাকে কেউ কণ্ট দিলে তুমি তাকে ততটুকুই কণ্ট দাও; মতটুকু সে দিয়েছে। পক্ষান্তরে ইহসান হচ্ছে অপরকে তার প্রাপ্য অধিকারের চাইতে বেশি দেওয়া এবং নিজের অধিকার নেয়ার ব্যাপারে কড়াকড়ি না করা এবং কিছু কম হলেও কবুল করে নেওয়া। এমনিভাবে কেউ তোমাকে হাতে কিংবা মুখে কণ্ট দিলে তুমি তার কাছ থেকে সমান প্রতিশোধ নেওয়ার পরিবর্তে ক্ষমা করে দাও। বরং সৎ কাজের মাধ্যমে মন্দকাজের প্রতিদান দাও। এমনিভাবে আদমের আদেশ হল করম ও ওয়াজিবের স্তরে এবং ইহসানের আদেশ হল করমের স্তরে।

أَيُّهَا زِي الْقُرْبَىٰ —এ হচ্ছে তৃতীয় আদেশ। শব্দের অর্থ কোন

কিছু দেওয়া এবং قُرْبَىٰ শব্দের অর্থ আত্মীয়তা। زِي الْقُرْبَىٰ শব্দের অর্থ আত্মীয়-

স্বজন। অতএব أَيُّهَا زِي الْقُرْبَىٰ —এর অর্থ হল আত্মীয়-স্বজনকে কিছু দেওয়া।

কি বস্তু দেওয়া, এখানে তা উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু অন্য এক আয়াতে তা উল্লেখ করে

বলা হয়েছে : وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ —অর্থাৎ আত্মীয়কে তার প্রাপ্য দান কর।

বাহ্যত আনোচ আয়াতেও তাই বোঝানো হয়েছে; অর্থাৎ আত্মীয়কে তার প্রাপ্য দিতে হবে। অর্থ দিয়ে আর্থিক সেবা করা, দৈহিক সেবা করা, অসুস্থ হলে দেখাশোনা করা, মৌখিক সাপ্তনা ও সহানুভূতি প্রকাশ করা ইত্যাদি সবই উপরোক্ত প্রাপ্যের অন্তর্ভুক্ত। ইহসান শব্দের মধ্যে আত্মীয়ের প্রাপ্য দেওয়ার কথাও অন্তর্ভুক্ত ছিল; কিন্তু অধিক গুরুত্ব বোঝানোর জন্য একে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ তিনটি ছিল ইতিবাচক নির্দেশ; অতঃপর তিনটি নিষেধাত্মক বর্ণিত হচ্ছে।

وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ —অর্থাৎ আল্লাহ অসীলতা, অসৎ

কর্ম ও সীমালংঘন করতে নিষেধ করেছেন। প্রকাশ্য মন্দকর্ম অথবা কথাকে অসীলতা বলা হয়, যাকে প্রত্যেকেই মন্দ মনে করে। 'মুনকার' তথা অসৎ কর্ম এমন কথা অথবা কাজ যা হারাম ও অবৈধ হওয়ার ব্যাপারে শরীয়ত বিশেষজ্ঞগণ একমত। তাই ইজতেহাদী মতবিরোধের কারণে কোন পক্ষকে 'মুনকার' বলা যায় না। প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্য, কর্মগত ও চরিত্রগত যাবতীয় গোনাহ মুনকারের অন্তর্ভুক্ত। بَغْيٍ শব্দের আসল অর্থ সীমালংঘন করা। এখানে জুলুম ও উপদ্রব বোঝানো হয়েছে। মুনকার শব্দের যে অর্থ বর্ণিত হয়েছে, তাতে فَحْشَاءٍ ও بَغْيٍ-ও অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু চূড়ান্ত

মন্দ হওয়ার কারণে فَحْشَاءٍ-কে পৃথক এবং অগ্রে উল্লেখ করা হয়েছে। بَغْيٍ-কে পৃথক উল্লেখ করার কারণ এই যে, এর প্রভাব অপরপর লোক পর্যন্ত সংক্রমিত হয়।

মাঝে মাঝে এই সীমানাঘন পারস্পরিক যুদ্ধ পর্যন্ত অথবা আরও অধিক সারা বিশ্বেও অশান্তি সৃষ্টির পর্যায়ে পৌঁছে যায়।

রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : জুলুম বাতীত এমন কোন গোনাহ্ নেই, যার বিনিময় ও শাস্তি দ্রুত দেওয়া হবে। এতে বোঝা যায় যে, জুলুমের কারণে পরকালীন কঠোর শাস্তি তো হবেই; এর আগে দুনিয়াতেও আলাহ্ তা'আলা জালিমকে শাস্তি দেন; যদিও সে বুঝতে পারে না যে, এটা অমুক জুলুমের শাস্তি। আলাহ্ তা'আলা মজলুমের সাহায্য করার অস্বীকার করেছেন।

আলোচ্য আয়াত যে ছয়টি ইতিবাচক ও নেতিবাচক নির্দেশ দান করেছে, চিন্তা করলে দেখা যায় যে, এগুলো মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের সাফল্যের অমোক্ষ প্রতিকার।

رَزَقْنَا اللَّهُ تَعَالَىٰ أَتَاهَا ۞

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّكُمْ لَفِي ذَلِيلٍ مُّبِينٍ ۚ وَإِذَا عَاهَدْتُمْ ۙ وَإِذَا عَاهَدْتُمْ ۙ وَإِذَا عَاهَدْتُمْ ۙ وَإِذَا عَاهَدْتُمْ ۙ وَإِذَا عَاهَدْتُمْ ۙ وَإِذَا عَاهَدْتُمْ ۙ

وَقَدْ جَعَلْتُمْ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ۝ وَلَا

تَكُونُوا كَالَّذِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا ۚ تَتَّخِذُونَ

أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبُءٌ مِنْ أُمَّةٍ ۗ

إِنَّمَا يَبَايَعُكُمْ اللَّهُ بِهِ ۗ وَيَكِيدَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ

فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۝ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِنْ

يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۗ وَلَنَسْأَلَنَّ عَنْ أَمْرِكُمْ لَنَعْلَمَ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا

أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا

وَتَذُوقُوا الشُّوْءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَلَكُمْ عَذَابٌ

عَظِيمٌ ۝ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۗ إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ

خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ

اللَّهِ بَاقٍ ۗ وَلَنَجْزِيَنَ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا

يَعْمَلُونَ ۝



(৯১) আল্লাহর নামে অঙ্গীকার করার পর সে অঙ্গীকার পূর্ণ কর এবং পাকাপাকি কসম করার পর তা ভঙ্গ করো না, অথচ তোমরা আল্লাহকে জামিন করেছ। তোমরা যা কর আল্লাহ তা জানেন। (৯২) তোমরা ঐ মহিলার মত হয়ো না, যে পরিত্রায়ের পর পাকান সূতা খণ্ড খণ্ড করে ছিঁড়ে ফেলে, তোমরা নিজেদের কসমসমূহকে পারস্পরিক প্রবঞ্চনার বাহানারূপে গ্রহণ কর এজন্যে যে, অন্য দল অপেক্ষা একদল অধিক ক্রমতাবান হয়ে যায়। এতদ্বারা তো আল্লাহ শুধু তোমাদের পরখ করেন। আল্লাহ অবশ্যই কিয়ামতের দিন প্রকাশ করে দেবেন, যে বিষয়ে তোমরা কলহ করতে। (৯৩) আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমাদের সবাইকে এক জাতি করে দিতে পারতেন, কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা বিপথগামী করেন এবং যাকে ইচ্ছা পথপ্রদর্শন করেন। তোমরা যা কর সে বিষয়ে অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হবে। (৯৪) তোমরা স্বীয় কসমসমূহকে পারস্পরিক কলহভঞ্নের বাহানা করো না। তা হলে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পা কসকে যাবে এবং তোমরা শাস্তির স্বাদ আছাদ করবে এ কারণে যে, তোমরা আমার পথে বাধাদান করেছ এবং তোমাদের কঠোর শাস্তি হবে। (৯৫) তোমরা আল্লাহর অঙ্গীকারের বিনিময়ে সামান্য মূল্য গ্রহণ করো না। নিশ্চয় আল্লাহর কাছে যা আছে তা উত্তম তোমাদের জন্য, যদি তোমরা জানী হও। (৯৬) তোমাদের কাছে যা আছে নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং আল্লাহর কাছে যা আছে, কখনও তা শেষ হবে না। যারা সবর করে, আমি তাদেরকে প্রাপ্য প্রতিদান দেব তাদের উত্তম কর্মের প্রতিদানস্বরূপ যা তারা করত।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(অঙ্গীকার পূর্ণ করার নির্দেশ এবং অঙ্গীকার ভঙ্গের নিষিদ্ধাঃ) তোমরা আল্লাহর অঙ্গীকার (অর্থাৎ আল্লাহ যে অঙ্গীকার পূর্ণ করার নির্দেশ দিয়েছেন, তাকে) পূর্ণ কর। (এর ফলে শরীয়তবিরোধী অঙ্গীকার এর আওতা বহির্ভূত হয়ে গেছে। অবশিষ্ট যাবতীয় অঙ্গীকার—আল্লাহর হক সম্পর্কিত হোক অথবা বান্দার হক সম্পর্কিত—এ আদেশের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।) যখন তোমরা তা (বিশেষভাবে অথবা সাধারণভাবে) নিজ দায়িত্বে করে নাও (বিশেষভাবে এই যে, স্পষ্টকৃত কোন কাজের দায়িত্ব গ্রহণ কর এবং সাধারণভাবে এই যে, ঈমান আনার পর যাবতীয় ফরয বিধানের দায়িত্ব প্রসঙ্গক্রমে নেওয়া হয়ে গেছে) এবং (বিশেষত যেসব অঙ্গীকারে কসমও খাওয়া হয়, সেগুলো অধিকতর পালনীয়। অতএব এসবের মধ্যে) কসমসমূহকে পাকা করার পর (অর্থাৎ আল্লাহর নাম নিয়ে কসম খাওয়ার পর তা) ভঙ্গ করো না এবং তোমরা (এসব কসমের কারণে অঙ্গীকারসমূহে) আল্লাহকে সাক্ষীও করেছ  $\text{بَعْدَ تَوْكِيدِهِمْ} \text{ قَدْ جَعَلْتُمْ}$  এবং  $\text{بَعْدَ تَوْكِيدِهِمْ}$

—এগুলো বাস্তব শর্ত, অঙ্গীকার পূরণে হুঁশিয়ার করার জন্য উল্লেখ করা

হয়েছে।) নিশ্চয় আল্লাহ জানেন তোমরা যা কর (অঙ্গীকার পূর্ণ কর কিংবা ভঙ্গ কর—তদনুযায়ী তোমাদের প্রতিদান দেবেন।) তোমরা (অঙ্গীকার ভঙ্গ করে) ঐ

(মক্কার জনৈক পাগলিনি) মহিলার মত হয়ো না, যে সূতা কাটার পর খণ্ড-বিখণ্ড করে ছিঁড়ে ফেলে, যাতে (তার মত) তোমরা (-ও) কসমসমূহকে (পাকা করার পর ভঙ্গ করে সেগুলোকে) পারস্পরিক কলহের অজুহাত গ্রহণ কর (কেননা কসম ও অঙ্গীকার ভঙ্গ করলে মিন্দদের মধ্যে অনাস্থা এবং শত্রুদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। এটা অশান্তির মূল। ভঙ্গ করাও শুধু) এ কারণে যে, একদল অন্য দলের চাইতে (সংখ্যাধিক্য অথবা ধনাঢ্যতায়) বেড়ে যায়। (উদাহরণত কাফিরদের দু'দলের মধ্যে শত্রুতা রয়েছে এবং তাদের একদলের সাথে তোমাদের মৈত্রী স্থাপিত হয়ে যায়। অতঃপর অপর দলকে অধিক ক্ষমতাবান দেখে মিন্দদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে অপর দলের সাথে তোমরা চরদ্ধে লিপ্ত হও। অথবা কেউ অমুসলমানদের দলভুক্ত হয়ে পেল। অতঃপর কাফিরদের অধিক জোর দেখে ইসলামের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে ধর্মত্যাগী হয়ে গেল। আর এই যে, একদল অন্যদলের চাইতে অধিক ক্ষমতাবান হয় অথবা অন্য কোন দলে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে বেড়ে যায়, তবে) এতদ্বারা (অর্থাৎ বেড়ে যাওয়া দ্বারা) আল্লাহ তা'আলা শুধু তোমাদের পরীক্ষা করেন (যে, কে অঙ্গীকার পূর্ণ করে এবং কে অধিক জোর দেখে সেদিকে ঝুঁকে পড়ে।) আর যেসব বিষয়ে তোমরা মতবিরোধ করতে (এবং বিভিন্ন পথে চলতে) কিয়ামতের দিন তিনি সব (-গুলোর স্বরূপ) তোমাদের সামনে প্রকাশ করে দেবেন (ফলে সত্যপন্থীরা পুরস্কার এবং মিথ্যা পন্থীরা শাস্তি পাবে। অতঃপর মধ্যবর্তী বাক্য হিসাবে এ মতবিরোধের রহস্য বর্ণনা করা হচ্ছে —) এবং (যদিও মতবিরোধ হতে না দেওয়ার শক্তিও আল্লাহর ছিল, সেমতে) আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমাদের সবাইকে একদল করে দিতে পারতেন, কিন্তু (রহস্যের তাগিদে যা বর্ণনা করা ও নির্দিষ্ট করা এখানে জরুরী নয় —তিনি) যাকে ইচ্ছা বিপথগামী করে দেন এবং যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করেন (সেমতে পথ প্রদর্শনের অন্যতম হচ্ছে অঙ্গীকার পূর্ণ করা এবং বিপথগামিতার অন্যতম হচ্ছে অঙ্গীকার ভঙ্গ করা। এরূপ মনে করা উচিত নয় যে, বিপথগামীরা দুনিয়াতে যেমন পূর্ণ শান্তি পায় না, তেমনি পরকালেও লাগামহীন থাকবে। তা কখনই নয়; বরং কিয়ামতে) তোমরা তোমাদের কর্ম সম্পর্কে অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হবে এবং (অঙ্গীকার ভঙ্গ করার কারণে যেমন বাহ্যিক ক্ষতি হয় যা উপরে বর্ণিত হয়েছে, তেমনিভাবে এর ফলে অভ্যন্তরীণ ক্ষতিও হয়। অতঃপর তাই উল্লেখ করা হচ্ছে। অর্থাৎ তোমরা স্বীয় কসমসমূহকে পারস্পরিক অনাস্থিটির কারণ করো না। (অর্থাৎ তোমরা অঙ্গীকার ও কসমসমূহ ভঙ্গ করো না)। কখনো (তা দেখে) অন্য কারণও পা ফসকে না যায় দৃষ্ট-ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর। (অর্থাৎ অন্যরাও তোমাদের অনুসরণ করবে এবং অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে থাকবে) অতঃপর তোমাদেরকে আল্লাহর পথে (অপরকে) বাধাদান করার কারণে কষ্ট ভোগ করতে হবে। (কেননা, অঙ্গীকার পালন করা হচ্ছে আল্লাহর পথ। অর্থাৎ তোমরা তা ভঙ্গ করার কারণ হয়েছো। এটাই হচ্ছে পূর্বোক্ত অভ্যন্তরীণ ক্ষতি; অর্থাৎ অপরকেও অঙ্গীকার ভঙ্গকারী করেছে।) এবং (কষ্ট এই যে, এমতাবস্থায়) তোমাদের কঠোর শাস্তি হবে। আর শক্তিশালী দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জনের উদ্দেশ্যে অঙ্গীকার ভঙ্গ করা যেমন নিষিদ্ধ যা উপরে বর্ণিত হল; তেমনি অর্থকড়ি উপার্জনের উদ্দেশ্যে অঙ্গীকার ভঙ্গ করার নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হচ্ছে: তোমরা

আল্লাহর অঙ্গীকারের বিনিময়ে (দুনিয়ার) কিঞ্চিৎ উপকার গ্রহণ করো না (আল্লাহর অঙ্গীকারের অর্থ শুরুতে জানা হয়েছে। 'যৎকিঞ্চিৎ উপকার' বলে দুনিয়া বোঝানো হয়েছে। কারণ, দুনিয়া অনেক হওয়া সত্ত্বেও অল্পই। এর স্বরূপ এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে,) আল্লাহর কাছে যা (অর্থাৎ পরকালের ডাঙার তাভোমাদের জন্য পাখিব সামগ্রীর চাইতে) অনেকগুণে উত্তম যদি তোমরা বুঝতে চাও। (অতএব পরকালের সামগ্রী বেশি এবং পাখিব সামগ্রী মতই কম হোক।) এবং (কম-বেশির তফাৎ ছাড়া আরও তফাৎ এই য়ে,) যা কিছু তোমাদের কাছে (দুনিয়াতে) আছে, তা (একদিন) নিঃশেষ হয়ে যাবে (হাত-ছাড়া হওয়ার কারণে কিংবা মৃত্যুর কারণে) এবং যা কিছু আল্লাহর কাছে আছে, তা চিরকাল থাকবে। যারা (অঙ্গীকার পূর্ণ করা ইত্যাদি ধর্মীয় বিধানে) দৃঢ়পদ আছে, আমি ভাল কাজের বিনিময়ে তাদের পুরস্কার (অর্থাৎ উল্লিখিত চিরস্থায়ী নিয়ামত) অবশ্যই তাদেরকে দেব। (সুতরাং অঙ্গীকার পূর্ণ করে প্রচুর অল্প ধন অর্জন কর এবং অল্প ধ্বংসশীল সামগ্রীর জন্য অঙ্গীকার ভঙ্গ করো না)।

### আনুষ্ঠানিক জাতিব্য বিষয়

**অঙ্গীকার ভঙ্গ করা হারাম :** যেসব জেনদেন ও চুক্তি মুখে জরুরী করে নেওয়া হয় অর্থাৎ দায়িত্ব নেওয়া হয়, কসম খাওয়া হোক বা না হোক, কাজ করার সাথে সম্পর্কযুক্ত হোক বা না করার সাথে সম্পর্কযুক্ত হোক, সবগুলোই **عقد** শব্দের অন্তর্ভুক্ত।

এই আয়াতসমূহ প্রকৃতপক্ষে পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের ব্যাখ্যা ও পূর্ণতা প্রদান। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে ন্যায়বিচার ও ইহসানের আদেশ দেওয়া হয়েছিল। **عَدْلٌ** শব্দের মর্মার্থের মধ্যে প্রতিজ্ঞা পূরণও অন্তর্ভুক্ত। —(কুরতুবী)

কারণ সাথে অঙ্গীকার করার পর অঙ্গীকার ভঙ্গ করা খুব বড় গোনাহ। কিন্তু এ ভঙ্গ করার কারণে কোন নিদিষ্ট কাফফারা দিতে হয় না; বরং পরকালে শাস্তি হবে। রসুলুল্লাহ (সা) বলেন : কিসামতের দিন অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর গিঠে একটি পতাকা খাড়া করা হবে, যা হাশরের মাঠে তার অপমানের কারণ হবে।

এমনিভাবে যে কাজের কসম খাওয়া হয়, তার বিপরীত করাও কবীরা গোনাহ! পরকালে বিরাট শাস্তি হবে এবং দুনিয়াতেও কোন কোন অবস্থায় কাফফারা জরুরী হয়। —(কুরতুবী)

أَنْ تَكُونَ أُمَّةً هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ

নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, কোন দলের সাথে তোমাদের চুক্তি হয়ে গেলে জাগতিক স্বার্থ ও উপকারের জন্য সে চুক্তি ভঙ্গ করো না। উদাহরণত তোমরা অনুভব কর যে, যে দল অথবা পার্টির সাথে চুক্তি হয়েছে, তারা দুর্বল ও সংখ্যায় কম কিংবা আর্থিক দিক দিয়ে নিঃশ্র। তাদের বিপরীতে অপর দল সংখ্যাগরিষ্ঠ, শক্তিশালী অথবা ধনাঢ্য। এমতাবস্থায় শুধু এই লোভে যে, শক্তিশালী ও ধনাঢ্য দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলে মুনাফা অধিক হবে,

প্রথম পার্টির সাথে কৃত অস্বীকার ভঙ্গ করা জায়েয নয়; বরং তোমরা অস্বীকারে অটল থাকবে এবং লাভ ও ক্ষতি আল্লাহর কাছে সোপর্দ করবে। তবে যে দল অথবা পার্টির সাথে অস্বীকার করা হয়, তারা যদি শরীয়তবিরোধী কাজকর্ম করে বা করায় তবে তাদের সাথে চুক্তি ভঙ্গ করা জায়েয। শর্ত এই যে, পরিকার ভাষায় তাদেরকে জানিয়ে দিতে হবে যে, আমরা এখন থেকে আর এ চুক্তি পালন করব না।

فَأَنهَذَا إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ

আম্মাতে তাই বলা হয়েছে।

আম্মাতের শেষে উপরোক্ত পরিস্থিতিকে মুসলমানদের পরীক্ষার উপায় বলা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এ বিষয়ে পরীক্ষা নেন যে, তারা মানসিক স্বার্থ ও বাসনার বশবর্তী হয়ে অস্বীকার ভঙ্গ করে, না আল্লাহর আদেশ পালনার্থে মানসিক প্রেরণাকে বিসর্জন দের?

ধৌকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে কসম খেলে ঈমান থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশংকা রয়েছে :

لَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ سَخِرَاءَ — এ আম্মাতে আরও একটি বিরাট শাস্তি ও গোনাহ

থেকে আত্মরক্ষার নির্দেশ রয়েছে। তা এই যে, যদি কেউ কসম খাওয়ার সময়ই কসমের খেলাফ করার ইচ্ছা রাখে এবং শুধু অপরকে ধৌকা দেওয়ার জন্য কসম খায়, তবে এটা সাধারণ কসম ভঙ্গ করার চাইতে অধিক বিপজ্জনক গোনাহ। এর পরিণতিতে ঈমান থেকেই বঞ্চিত হওয়ার আশংকা রয়েছে।

أَن تَزَلَ قَدَمُ بَعْدُ تَبَوَّأَهَا

উদ্দেশ্য তাই।

মুহ নেওয়া কঠোর হারাম এবং আল্লাহর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা :

وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا — অর্থাৎ আল্লাহর অস্বীকার সামান্য মূল্যের

বিনিময়ে ভঙ্গ করো না। এখানে 'সামান্য মূল্য' বলে দুনিয়ার মুনাফাকে বোঝানো হয়েছে। এগুলো পরিমাণে যত বেশিই হোক না কেন, পরকালের মুনাফার তুলনায় দুনিয়া ও দুনিয়ার সমস্ত ধনসম্পদ সামান্যই বটে। যে ব্যক্তি পরকালের বিনিময়ে দুনিয়া গ্রহণ করে, সে অত্যন্ত লোকসানের কারবার করে। কারণ, অনন্তকাল স্থায়ী উৎকৃষ্ট নিয়ামত ও ধনসম্পদকে ক্ষণভঙ্গুর ও অপকৃষ্ট বস্তুর বিনিময়ে বিক্রি করা কোন বুদ্ধিমান পছন্দ করতে পারে না।

ইবনে আতিয়্যা বলেন : যে কাজ সম্পন্ন করা কারো দায়িত্বে ওয়াজিব, সেটাই তার জন্য আল্লাহর অস্বীকার। এরূপ কাজ সম্পন্ন করার জন্য কারও কাছ থেকে বিনিময় গ্রহণ করা এবং বিনিময় না নিয়ে কাজ না করার অর্থই আল্লাহর অস্বীকার ভঙ্গ করা। এমনিভাবে যে কাজ না করা ওয়াজিব, কারও কাছ থেকে বিনিময় নিয়ে তা সম্পাদন করার অর্থও আল্লাহর অস্বীকার ভঙ্গ করা।

এতে বোঝা গেল, প্রচলিত সবরকম ঘুষই হারাম। উদাহরণত সরকারী কর্মচারী কোন কাজের বেতন সরকার থেকে পায়, সে বেতনের বিনিময়ে অপিত দায়িত্ব পালন করার ব্যাপারে আল্লাহর কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ। এখন যদি সে একাজ করার জন্য কারও কাছে বিনিময় চায় এবং বিনিময় ছাড়া কাজ করতে টালবাহানা করে, তবে সে আল্লাহর অঙ্গীকার ভঙ্গ করছে। এমনভাবে কর্তৃপক্ষ তাকে যে কাজ করার ক্ষমতা দেয়নি, ঘুষ নিয়ে তা করাও আল্লাহর অঙ্গীকার ভঙ্গ করার শামিল।--(বাহরে মুহীত)

ঘুষের সংজ্ঞা : ইবনে আতিয়্যার এ আলোচনায় ঘুষের সংজ্ঞাও এসে গেছে। তফসীর বাহরে মুহীতের ভাষায় তা এই :

اِخْذِ الْأَمْوَالَ عَلَىٰ مَا يَحِبُّ عَلَىٰ الْإِخْذِ فِعْلًا أَوْ ذَمًّا مَا يَحِبُّ عَلَيْهِ تَرْكًا

অর্থাৎ যে কাজ করা তার দায়িত্বে ওয়াজিব, তা করার জন্য বিনিময় গ্রহণ করা অথবা যে কাজ না করা তার জন্য ওয়াজিব, তা করার জন্য বিনিময় গ্রহণ করাকে ঘুষ বলে। --(বাহরে মুহীত, ৫৩৩ পৃঃ, ৫ম খণ্ড)

সমগ্র বিশ্বের সমগ্র নিয়ামত যে অল্প, তা পল্পবর্তী আয়াতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে :

مَا مَعَكُمْ يَنْفَعُكُمْ وَمَا مَعَنَا لِلَّهِ بَاقٍ

রয়েছে (এতে পাখিব মুনাফা বোঝানো হয়েছে) তা সবই নিঃশেষ ও ধ্বংস হবে। পক্ষান্তরে আল্লাহর কাছে যা রয়েছে (এতে পরকালের সওয়াব ও আযাব বোঝানো হয়েছে) তা চিরকাল অক্ষয় হয়ে থাকবে।

দুনিয়ার সুখ-দুঃখ বদ্ধ-শত্রুতা সবই ধ্বংসশীল এবং এগুলোর ফলাফল ও

পরিণতি, যা আল্লাহর কাছে রয়েছে, যা চিরকাল বাকী থাকবে : مَا مَعَكُمْ শব্দ

বলতে সাধারণত ধনসম্পদের দিকে মন যায়। শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ মাওলানা সৈয়দ আসগর হসাইন সাহেব মরহুম বলেন : مَا শব্দটি আভিধানিকভাবে ব্যাপক অর্থবহ। এখানে ব্যাপক অর্থ বোঝার ক্ষেত্রে কোন শরীয়তসম্মত বাধা নেই। তাই এতে পাখিব ধনসম্পদ তো অন্তর্ভুক্ত আছেই, এছাড়া দুনিয়াতে মানুষ আনন্দ-বিষাদ, সুখ-দুঃখ, সুস্থতা, অসুস্থতা, লাভ-লোকসান, বদ্ধ-শত্রুতা ইত্যাদি যেসব অবস্থার সম্মুখীন হয়, সেগুলোও এতে শামিল রয়েছে। এগুলো সবই ধ্বংসশীল। তবে এসব অবস্থা ও ব্যাপারের যে প্রতিক্রিয়া রয়েছে এবং কিয়ামতের দিন সেগুলোর কারণে সওয়াব ও আযাব হবে, সেগুলো সব অক্ষয় হয়ে থাকবে। অতএব ধ্বংসশীল অবস্থা ও কাজ-কারবারে মগ্ন হয়ে থাকা এবং জীবন ও জীবনের কর্মক্ষমতা এতেই নিয়োজিত করে চিরস্থায়ী আযাব ও সওয়াবের প্রতি উঁদাসীন্য প্রদর্শন করা কোন বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

دوران بقا چو باد صحرا بگذشت  
 تلخی و خوشی وزشت و زیبا بگذشت  
 پنداشت ستمگری جفا بر ما کرد  
 بر کردن و ما ند و بر ما بگذشت

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنْتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ  
 حَيٰوةً طَيِّبَةً ۗ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

(৯৭) যে সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং সে ঈমানদার, পুরুষ হোক কিংবা নারী  
 আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং প্রতিদানে তাদেরকে তাদের উত্তম কাজের  
 কারণে তাদের প্রাপ্য পুরস্কার দেব যা তারা করত।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে অঙ্গীকার পালনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ এবং অঙ্গীকার ভঙ্গের  
 নিন্দা বর্ণিত হয়েছিল। এটা ছিল একটি বিশেষ কাজ। আলোচ্য আয়াতে শাবতীয়  
 সৎকর্ম এবং সৎকর্মীদের ব্যাপক বর্ণনা রয়েছে। আয়াতের বিষয়বস্তু এই যে, পর-  
 কালের পুরস্কার ও সওয়াব এবং দুনিয়ার বরকত শুধু অঙ্গীকার পালনের মধ্যে সীমিত  
 নয় এবং কোন কর্মীরও কোন বৈশিষ্ট্য নেই; বরং সামগ্রিক নীতি এই যে, (যে কেউ  
 কোন সৎ কাজ করে, পুরুষ হোক কিংবা নারী—শর্ত এই যে, সে যদি ঈমানদার হয়  
 (কেননা কাফিরের সৎ কর্ম গ্রহণীয় নয়), তবে আমি তাকে (দুনিয়াতে তো) আনন্দময়  
 জীবন দেব এবং (পরকালে) তাদের উত্তম কাজের বিনিময়ে তাদের পুরস্কার দেব।

### আনুযায়িক জ্ঞাতব্য বিষয়

'হায়াতে তাইয়্যোবা' কি? সংখ্যাগরিষ্ঠ তফসীরবিদগণের মতে এখানে 'হায়াতে  
 তাইয়্যোবা' বলে দুনিয়ার পবিত্র ও আনন্দময় জীবন বোঝানো হয়েছে। কোন কোন তফসীর-  
 বিদের মতে পারলৌকিক জীবন বোঝানো হয়েছে। প্রথমোক্ত তফসীর অনুযায়ীও এরূপ  
 অর্থ নয় যে, সে কখনও অনাহার-উপবাস ও অসুখ-বিসুখের সম্মুখীন হবে না। বরং অর্থ  
 এই যে, মু'মিন ব্যক্তি কোন সময় আর্থিক অভাব-অনটন কিংবা কষ্ট পতিত হলেও  
 দু'টি বিষয় তাকে উদ্বিগ্ন হতে দেয় না। এক, অল্পেতৃপ্তি এবং অনাড়ম্বর জীবন-যাপনের  
 অভ্যাস, যা দারিদ্র্যের মাঝেও কেটে যায়। দুই, তার এ বিশ্বাস যে, এ অভাব-অনটন ও  
 অসুস্থতার বিনিময়ে পরকালে সুখহান, চিরস্থায়ী নিয়ামত পাওয়া যাবে। কাফির ও  
 পাগাচারী ব্যক্তির অবস্থা এর বিপরীত। সে অভাব-অনটন ও অসুস্থতার সম্মুখীন হলে

তার জন্য সান্ত্বনার কোন ব্যবস্থা নেই। ফলে সে কাণ্ডজান হারিয়ে ফেলে। প্রায়শ আশ্ব-  
হত্যা করে। পক্ষান্তরে সে যদি সচ্ছল জীবনেরও অধিকারী হয়, তবে লোভের আতিশয়া  
তাকে শান্তিতে থাকতে দেয় না। সে কোটিপতি হয়ে গেল অর্বপতি হওয়ার চিন্তায় জীবনকে  
বিড়ম্বনাময় করে তোলে।

ইবনে আতিয়া বলেন : ঈমানদার সৎকর্মশীলদের আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়াতেও  
প্রফুল্লতা ও আনন্দঘন জীবন দান করেন, যা কোন অবস্থাতেই পরিবর্তিত হয় না। সুস্থতা  
ও স্বাস্থ্যের সময় যে জীবন আনন্দময় হয়, তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না; বিশেষত  
একারণে যে, অনাবশ্যক সম্পদ বাড়ানোর লোভ তাদের মধ্যে থাকে না। এটাই সর্বাবস্থায়  
উদ্বিগ্নের কারণ হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে তারা যদি অভাব-অনটন অথবা অসুস্থতারও  
সম্মুখীন হয়, তবে আল্লাহ্‌র ওয়াদার উপর তাদের পরিপূর্ণ আস্থা এবং কণ্ঠের পরেই  
সুখ পাওয়ার দৃঢ় আশা তাদের জীবনকে নিরানন্দ হতে দেয় না। যেমন কুমক ফেটে শস্য  
বপনের পর তার নিড়ানি-বাছানি ও জল সেচনের সময় যত কণ্ঠই ককক, সব তার কাছে  
সুখ বলে অনুভূত হয়। কেননা, কিছু দিন অতিবাহিত হলেই সে এর বিরাট প্রতিদান পাবে।  
ব্যবসায়ী নিজের ব্যবসায়, চাকরিজীবী তার দায়িত্ব পালনে কতই না পরিশ্রম করে,  
এমনকি মাঝে মাঝে অপমানও সহ্য করে, কিন্তু একারণে আনন্দিত থাকে যে, কয়েক দিন  
পর সে ব্যবসায় বিরাট মুনাফা অথবা চাকরির বেতন পাবে বলে বিশ্বাস রাখে।  
মু'মিনও বিশ্বাস রাখে যে, প্রত্যেক কণ্ঠের জন্য সে প্রতিদান পাচ্ছে এবং পরকালে এর  
প্রতিদান চিরস্থায়ী নিয়ামতের আকারে পাওয়া যাবে। পরকালের তুলনায় পৃথিবী জীবনের  
কোন মূল্য নেই। তাই এখানে সে সুখ-দুঃখ এবং ঠাণ্ডা-গরম সব কিছুই হাসিমুখে সহ্য করে  
যায়। এমতাবস্থায়ও তার জীবন উদ্বিগ্নজনক ও নিরানন্দ হয় না। এটাই হচ্ছে 'হান্নাতে  
তাইয়োবা', যা মু'মিন দুনিয়াতে নগদ পায়।

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ٥٠ إِنَّهُ

لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ٥١ إِنَّمَا

سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ٥٢

(১৮) অতএব এখন আপনি কোরআন পাঠ করেন, তখন বিভাঙিত শয়তান  
থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় গ্রহণ করুন। (১৯) তার আধিপত্য চলে না তাদের উপর, যারা  
বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আপন পালনকর্তার ভরসা রাখে। (২০০) তার আধিপত্য তো  
তাদের উপরই চলে, যারা তাকে বন্ধু মনে করে এবং যারা তাকে অংশীদার মানে।

পূর্বাঙ্গের সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে প্রথমে অঙ্গীকার পূর্ণ করার প্রতি এবং  
সৎ কর্ম সম্পাদনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ ও উৎসাহিত করা হয়েছে। শয়তানের প্ররোচনায়ই  
মানুষ এসব বিধি-বিধান শৈথিল্য প্রদর্শন করে। তাই আলোচ্য আয়াতে বিভাঙিত শয়তান

থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ প্রার্থনা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি সৎকর্মের বেলায় এর প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে বিশেষভাবে কোরআন পাঠের সাথে এর উল্লেখ করা হয়েছে। এ বিশেষত্বের কারণ এটাও হতে পারে যে, কোরআন তিলাওয়াত এমন একটি কাজ, যশ্চান্না শয়তান পলায়ন করে, **ذو بکر یزدان قوم که قرآن خوانند**

যারা কোরআন পাঠ করে, তাদের কাছ থেকে দৈত্যদানব লেজ গুটিয়ে পালায়। এ ছাড়া কোন কোন বিশেষ আয়াত ও সূরা শয়তানী প্রভাব দূর করার জন্য পরীক্ষিত ব্যবস্থাপত্র। এগুলোর কার্যকারিতা ও উপকারিতা হাদীস ও কোরআন দ্বারাই প্রমাণিত। (বয়ানুল-কোরআন)

এ সম্বন্ধে যখন কোরআন তিলাওয়াতের সাথে শয়তান থেকে পানাহ চাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তখন অন্যান্য কাজের বেলায় এটা আরও জরুরী হয়ে যায়।

এ ছাড়া স্বয়ং কোনআন তিলাওয়াতের মধ্যে শয়তানী কুমন্ত্রণারও আশংকা থাকে। ফলে তিলাওয়াতের আদব-কায়দা কম হয়ে যায় এবং চিন্তা-ভাবনা ও বিনয়-নয়ত্বা থাকে না। এ জন্যও কুমন্ত্রণা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা জরুরী মনে করা হয়েছে। (ইবনে কাসীর, মাযহারী)

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(ইতিপূর্বে সৎ কর্মের শ্রেষ্ঠত্ব জানা গেল। শয়তান মাঝে মাঝে এতে ত্রুটি সৃষ্টি করে। কোন সময় অঙ্গীকার পালনে এবং কোন সময় অন্য কাজ যেমন কোরআন তিলাওয়াতেও ত্রুটি সৃষ্টি করে) অতএব (হে মুহাম্মদ, আপনি এবং আপনার মাধ্যমে আপনার উম্মতের লোকগণ শুনে নিন) যখন আপনি কোরআন পাঠ করতে চান, তখন বিভাঙিত শয়তান (এর অনিষ্ট) থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করুন। (আসলে তো মনেপ্রাণে আল্লাহর প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। আশ্রয় প্রার্থনার ব্যাপারে এটাই ওয়াজিব। মুখে পড়ে নেওয়াও সুন্নত। আশ্রয় প্রার্থনার নির্দেশ আমি এজন্য দেই যে,) নিশ্চয় তার জোর তাদের উপর চলে না, যারা ঈমানদার এবং পালনকর্তার উপর ভরসা রাখে। তার জোর শুধু তাদের উপরই চলে, যারা তার সাথে সম্পর্ক রাখে এবং তাদের উপর (চলে), যারা আল্লাহর সাথে শিরক করে।

### জানুয়ারি জাতব্য বিষয়

ইবনে কাসীর স্বীয় তফসীর গ্রন্থের ভূমিকায় বলেন : মানুষের শত্রু দু'রকম। এক. স্বয়ং মানবজাতির মধ্য থেকে; যেমন সাধারণ কাফির। দুই. জিনদের মধ্য থেকে অবাধ্য শয়তানের দল। ইসলাম প্রথম প্রকার শত্রুকে জিহাদ ও লড়াইয়ের মাধ্যমে প্রতিহত করার নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকার শত্রুর জন্য শুধু আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করার আদেশ দিয়েছে। কারণ প্রথম প্রকার শত্রু স্বজাতীয়। তার আক্রমণ প্রকাশ্যভাবে হয়। তাই তার সাথে জিহাদ ও লড়াই করণ করে দেওয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে শয়তানের শত্রুতা



দৃষ্টিগোচর হয় না। তার আক্রমণও মানুষের উপর সামনাসামনি হয় না। তাই তাকে প্রতিহত করার জন্য এমন সত্তার আশ্রয় গ্রহণ অপরিহার্য করা হয়েছে, যিনি মানুষ ও শয়তান কালও দৃষ্টিগোচর নয়। আর শয়তানকে প্রতিহত করার বিষয়টি আল্লাহর কাছে সমর্পণ করার মতার্থতা এই যে, যে ব্যক্তি শয়তানের কাছে পরাজিত হবে, সে আল্লাহর দরবার থেকে বিতাড়িত এবং অযাবের যোগ্য হবে। মানবশত্রুর বেলায় এমন নয়। কাফিরদের সাথে যুদ্ধে কেউ পরাজিত হলে কিংবা নিহত হলে সে শহীদ ও সওয়ালের অধিকারী হবে। তাই দেহ ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা মানবশত্রুর মুকাবিলা করা সর্বাবস্থায় লাভজনক—জরী হলে শত্রুর শক্তি নিশ্চিহ্ন হবে এবং পরাজিত হলে শহীদ হয়ে আল্লাহর কাছে সওয়ালের অধিকারী হবে।

মাস'আলা : কোরআন তিলাওয়াতের সময় 'আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম' পাঠ করা আলোচ্য আয়াতের আদেশ পালনকল্পে রসূলুল্লাহ্ (স) থেকে প্রমাণিত রয়েছে। কিন্তু তিনি মাঝে মাঝে তা পাঠ করেন নি বলেও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে। তাই অধিক সংখ্যক আলিম এ আদেশকে ওয়াজিব নয়—সুমত বলেছেন। ইবনে জরীর তারীখী এ বিষয়ে সবার ইজমা বর্ণনা করেছেন। —এ সম্পর্কে উক্তিগত ও কর্মগত যত হাদীস রয়েছে, তিলাওয়াতের পূর্বে 'আউযুবিল্লাহ্' অধিকাংশ অবস্থায় পড়ার এবং কোন অবস্থায় না পড়ার—সব বিবরণ ইবনে কাসীর স্বীয় তফসীর গ্রন্থের শুরুতে বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন।

নামাযে আউযুবিল্লাহ শুধু প্রথম রাক'আতের শুরুতে, না প্রত্যেক রাক'আতের শুরুতে পড়তে হবে, এ সম্পর্কে ফিকাহ বিদদের উক্তি বিভিন্নরূপ। ইমাম আবু হানীফার মতে শুধু প্রথম রাক'আতে পড়া উচিত। ইমাম শাফেয়ীর মতে প্রত্যেক রাক'আতের শুরুতে পড়া মোস্তাহাব। উত্তয়পক্ষের প্রমাণাদি তফসীরে মামহারীতে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

কোরআন তিলাওয়াত নামাযে হোক কিংবা নামাযের বাইরে—উত্তয় অবস্থাতেই তিলাওয়াতের পূর্বে আউযুবিল্লাহ্ পাঠ করা সুমত। তবে একবার পড়ে নিলে পরে যত বারই তিলাওয়াত হবে প্রথম আউযুবিল্লাহই মথলট হবে। মাঝখানে তিলাওয়াত বাদ দিয়ে কোনো সাংসারিক কাজে মশগুল হলে পুনর্বার তিলাওয়াতের সময় আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ্ পড়ে নেওয়া উচিত।

কোরআন তিলাওয়াত ছাড়া অন্য কোন কলাম অথবা কিতাব পাঠ করার পূর্বে আউযুবিল্লাহ পড়া সুমত নয়। সেক্ষেত্রে শুধু বিসমিল্লাহ্ পড়া উচিত।—(দূররে মুখতার)

তবে বিভিন্ন কাজ ও অবস্থায় আউযুবিল্লাহর শিক্ষা হাদীসে বর্ণিত রয়েছে। উদাহরণত কারও অধিক ক্রোধের উদ্বেক হলে হাদীসে আছে যে, আউযুবিল্লাহ পাঠ করলে ক্রোধ দমিত হয়ে যায়।—(ইবনে কাসীর)

হাদীসে আরও বলা হয়েছে, পায়খানায় প্রবেশ করার পূর্বে 'আল্লাহুমা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল খুবসে ওয়াল খাবাসেসে' পাঠ করা মোস্তাহাব।—(শামী)

আল্লাহর প্রতি ঈমান ও ভরসা শয়তানের আধিপত্য থেকে মুক্তির পথ : এ আয়াতে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা শয়তানকে এমন শক্তি দেননি যাতে সে যে কোন মানুষকে মন্দ কাজে বাধ্য করতে পারে। মানুষ স্বয়ং নিজের ক্রমতা ও শক্তি অসাবধানতা-বশত কিংবা কোন স্বার্থের কারণে প্রয়োগ না করলে সেটা তার দোষ। তাই বলা হয়েছে : যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং যাবতীয় অবস্থা ও কাজকর্মে স্বীয় ইচ্ছাশক্তির পরিবর্তে আল্লাহর উপর ভরসা রাখে, কেননা তিনিই সৎ কাজের তওফীক-দাতা এবং প্রত্যেকটি অনিষ্ট থেকে রক্ষাকারী, এ ধরনের লোকের উপর শয়তান আধিপত্য বিস্তার করতে পারে না। হ্যাঁ, যারা আত্মস্বার্থের কারণে শয়তানের সাথে বন্ধুত্ব করে, তার কথাবার্তা পছন্দ করে এবং আল্লাহর সাথে অন্যকে অংশীদার সাব্যস্ত করে, তাদের উপর শয়তান আধিপত্য বিস্তারের মাধ্যমে তাদেরকে কোন সৎ কাজের দিকে যেতে দেয় না এবং তারা সমস্ত মন্দ কাজের অগ্রভাগে থাকে।

সূরা হিজরের আয়াতে উল্লিখিত বিষয়বস্তুও তাই। তাতে শয়তানের দাবীর বিপরীতে আল্লাহ তা'আলা উত্তর দিয়েছেন **إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ**

الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ الْغَاوِينَ — অর্থাৎ আমার বিশেষ বান্দাদের উপর কোন জোর চালাতে পারবে না। তবে তার উপর চলবে, যে নিজেই বিপথগামী হয় এবং তোর অনুসরণ করতে থাকে।

وَإِذَا بَدَلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ ۖ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا  
 أَنْتَ مُفْتَرٍ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ  
 الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَ  
 بُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ۝ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ  
 بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجِبِي ۖ وَهَذَا لِسَانٌ  
 عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ ۝ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ۖ لَا يَهْدِيهِمُ  
 اللَّهُ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ إِنَّمَا يَفْتَرِے الْكُذِبَ الَّذِينَ  
 لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ ۝

(১০১) এবং যখন আমি এক আয়াতের স্থলে অন্য আয়াত উপস্থিত করি এবং আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেন তিনিই সে সম্পর্কে ভাল জানেন; তখন তারা বলে : আপনি তো মনগড়া উক্তি করেন, বরং তাদেরই অধিকাংশ লোক জানে না। (১০২) বলুন, একে পবিত্র ফেরেশতা পালনকর্তার পক্ষ থেকে নিশ্চিত সত্যসহ নাখিল করেছেন, যাতে মু'মিনদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং এটা মুসলমানদের জন্য পথনির্দেশ ও সুসংবাদ-স্বরূপ। (১০৩) আমি তো ভালভাবেই জানি যে, তারা বলে : তাকে জনৈক ব্যক্তি শিক্ষা দেয়। যার দিকে তারা ইঙ্গিত করে, তার ভাষা তো আরবী নয় এবং এ কোরআন পরিষ্কার আরবী ভাষায়। (১০৪) যারা আল্লাহ্‌র কথায় বিশ্বাস করে না, তাদেরকে আল্লাহ্ পথপ্রদর্শন করেন না এবং তাদের জন্য যন্ত্রপাাদায়ক শাস্তি রয়েছে। (১০৫) মিথ্যা কেবল তারা রচনা করে, যারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনে বিশ্বাস করে না। এবং তা'রাই মিথ্যাবাদী।

### তক্ষসীরের সার-সংক্ষেপ

**পূর্বাঙ্গ সম্পর্ক :** পূর্ববর্তী আয়াতে কোরআন তিলাওয়াতের সময় আউযুবিল্লাহ্ পড়ার নির্দেশ ছিল। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, শয়তান কোরআন তিলাওয়াতের সময় মানুষের মনে কুমন্ত্রণা দিয়ে থাকে। আলোচ্য আয়াতসমূহে শয়তানের এমনি ধরনের কুমন্ত্রণার জওয়াব দেওয়া হয়েছে।

**নবুয়্যত সম্পর্কে কাফিরদের সন্দেহের তিরস্কারপূর্ণ জওয়াব :** যখন আমি কোন আয়াত অন্য আয়াতের স্থলে পরিবর্তন করি, (অর্থাৎ এক আয়াতকে শব্দগত অথবা অর্থগতভাবে রহিত করে তৎস্থলে অন্য আদেশ দেই) অথচ আল্লাহ্ তা'আলা যে আদেশ (প্রথমবার অথবা দ্বিতীয়বার) প্রেরণ করেন (তার উপযোগিতা ও তাৎপর্য) তিনিই ভাল জানেন (যে, যাদেরকে এ আদেশ দেওয়া হয়েছে, তাদের অবস্থা অনুযায়ী এক সময়ে এক উপযোগিতা ছিল, অতঃপর অবস্থার পরিবর্তনে উপযোগিতা ও তাৎপর্য অন্যরূপ হয়ে গেছে) তখন তারা বলে : (নাউযুবিল্লাহ্!) আপনি (আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে) মনগড়া উক্তি করেন [নিজের কথাকে আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কযুক্ত করে দেন। তা না হলে আল্লাহ্‌র আদেশ হলে তা পরিবর্তন করার কি প্রয়োজন ছিল? আল্লাহ্ কি পূর্বে জানতেন না? তারা এ বিষয়ে চিন্তা করে না যে, মাঝে মাঝে সব অবস্থা জানা থাকা সত্ত্বেও প্রথম অবস্থায় প্রথম আদেশ দেওয়া হয় এবং দ্বিতীয় অবস্থা দেখা দেওয়ার কথা যদিও তখন জানা থাকে, কিন্তু উপযোগিতার তাগিদে তখন দ্বিতীয় অবস্থার আদেশ বর্ণনা করা হয় না; বরং অবস্থাটি যখন দেখা দেয়, তখনই তা বর্ণনা করা হয়। উদাহরণত ডাক্তার এক ওষুধ মনোনীত করে এবং সে জানে যে, এটা ব্যবহার করলে অবস্থা পরিবর্তিত হবে এবং অন্য ওষুধ দেওয়া হবে। কিন্তু রোগীকে প্রথমেই সব বিবরণ বলে না। কোরআন ও হাদীসেও বিধি-বিধান রহিত করার স্বরূপ তাই। যে ব্যক্তি এ স্বরূপ সম্পর্কে অবগত নয়, সে শয়তানের প্ররোচনায় নসখ অর্থাৎ রহিতকরণকে অস্বীকার করে। এ জন্যই এর জওয়াবে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন : রসুলুল্লাহ্ (সা) মনগড়া কথা বলেন না] বরং তাদেরই অধিকাংশ লোক মুর্থ (স্থলে বিধি-বিধানের রহিতকরণকে যুক্তি-প্রমাণ ছাড়াই

আল্লাহর কালাম হওয়ার পরিপন্থী মনে করেন।), আপনি (তাদের জওয়াবে) বলে দিন : (এই কালাম আমার রচিত নয়; বরং) একে পবিত্র আত্মা (অর্থাৎ জিবরাঈল) পালন-কর্তার পক্ষ থেকে তাৎপর্যের প্রেক্ষাপটে আনয়ন করেছেন। (তাই এটা আল্লাহর কালাম। বস্তুত বিধানের পরিবর্তন তাৎপর্য ও উপযোগিতার তাগিদে হয়। এই কালাম এজন্য প্রেরিত হয়েছে) যাতে ঈমানদারদেরকে (ঈমানের উপর) দৃঢ়পদ রাখেন এবং মুসল-মানদের জন্য হিদায়ত ও সুসংবাদ (-এর উপায়) হয়ে যায়। (এরপর কাফিরদের আরও একটি অনর্থক সম্মোহনের জওয়াব দেওয়া হচ্ছে যে) আমি জানি, তারা (অন্য একটি ব্রাহ্ম কথ্য) আরও বলে যে, তাকে তো জনৈক ব্যক্তি শিক্ষা দান করে [এতে একজন অনারব, রোমের আধিবাসী কর্মকারকে বোঝানো হয়েছে। তার নাম বাল'আম অথবা মকীস। সে রাসূলুল্লাহ (সা)-র কথাবার্তা মনোযোগ দিয়ে শুনত। তাই সে মাঝে মাঝে তাঁর কাছে বসত। সে ইঞ্জীল ইত্যাদি গ্রন্থও কিছু কিছু জানত। এ থেকেই কাফিররা রুটিয়ে দেয় যে, এ ব্যক্তিই মুহাম্মদকে কোরআনের কালাম শিক্ষা দেয়।— (দুররে মনসূর) আল্লাহ তা'আলা এর জওয়াব দিয়েছেন যে, কোরআন শব্দ ও অর্থের সমষ্টিতে বলা হয়। তোমরা যদি কোরআনের অর্থ ও তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম না হও, তবে কমপক্ষে আরবী ভাষার উচ্চমান অলংকার সম্পর্কে তো অনবগত নও। অতএব তোমাদের এতটুকু বোঝা উচিত যে, যদি ধরে নেওয়া যায়, কোরআনের অর্থ-ভাণ্ডার এই ব্যক্তি শিখিয়ে দিয়েছে, তবে কোরআনের ভাষা ও তার অনুপম অলংকার, যার মোকাবিলা করতে সমগ্র আরব অক্ষম—কোথেকে এসে গেল? কেননা] যার দিকে তারা ইঙ্গিত করে, তার ভাষা অনারব এবং এ কোরআনের ভাষা সুস্পষ্ট আরবী। [কোন অনারব ব্যক্তি এমন বাক্যাবলী কিরূপে রচনা করতে পারে? যদি বলা হয় যে, বাক্যাবলী রসূলুল্লাহ (সা) রচনা করে থাকবেন, তবে ঐ চ্যালেঞ্জ দ্বারা এর পুরোপুরি জওয়াব হয়ে গেছে, যা সূরা বাকারায় বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (সা) আল্লাহর আদেশে স্বীয় নবুয়ত ও কোরআনের সত্যতার মাপকাঠি এ বিষয়কেই স্থির করেছিলেন যে, তোমাদের বক্তব্য অনুযায়ী কোরআন মানবরচিত কালাম হলে তোমরাও তো মানুষ এবং অনুপম ভাবালংকারের দাবীদার। অতএব তোমরা তদনুরূপ কালাম বেশি না হোক এক আয়াত পরিমাপেই লিখে আন। কিন্তু সমগ্র আরব তাঁর বিরুদ্ধে যথাসর্বস্ব বিসর্জন দিতে প্রস্তুত থাকা সত্ত্বেও এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে সাহস পায়নি। এরপর নবুয়ত অস্বীকারকারী এবং কোরআনের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপনকারীদেরকে কঠোর ভাষায় হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে,] যারা আল্লাহর আয়াতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না, তাদেরকে আল্লাহ কখনো সুপথে আনবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (এরা যে আপনাকে, নাউম্বিল্লাহ—মিথ্যা কালাম রচয়িতা বলছে) মিথ্যা রচনাকারী তো তারাই; যারা আল্লাহর আয়াতসমূহের উপর বিশ্বাস রাখে না এবং এরা পুরোপুরি মিথ্যাবাদী।

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إيمَانِهِ إِلَّا مِنْ أَكْرَهٍ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ

بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَّ بِالْكَفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ  
 اللَّهِ، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٥٧﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ  
 الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ ۗ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٥٨﴾  
 أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمِعُوهُمْ وَأَبْصَارِهِمْ،  
 وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿٥٩﴾ لَا جَرَمَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ  
 الْخٰسِرُونَ ﴿٦٠﴾

(১০৬) যার উপর জোরজবরদস্তি করা হয় এবং তার অন্তর বিশ্বাসে অটল থাকে সে ব্যতীত যে কেউ বিশ্বাসী হওয়ার পর আল্লাহতে অবিশ্বাসী হয় এবং কুফরীরা জনা মন উন্মুক্ত করে দেয় তাদের উপর আগতিত হবে আল্লাহর গম্ব ও এবং তাদের জনা রয়েছে শান্তি। (১০৭) এটা এ জনা যে, তারা পাখিব জীবনকে পরকালের চাইতে প্রিয় মনে করেছে এবং আল্লাহ অবিশ্বাসীদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না। (১০৮) এরাই তারা, আল্লাহ তা'আলা এদেরই অন্তর, কর্ণ ও চক্ষুর উপর মোহর মেয়ে দিয়েছেন এবং এরাই কাণ্ডজানহীন। (১০৯) বলা বাহুল্য, পরকালে এরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যে ব্যক্তি বিশ্বাস স্থাপনের পর আল্লাহর সাথে কুফরী করে (এতে রসুলের সাথে কুফরী এবং কিয়ামত অস্বীকার ইত্যাদি সবই বোঝানো হয়েছে।) কিন্তু যার উপর (কাফিরদের পক্ষ থেকে) জবরদস্তি করা হয় (যে, যদি তুমি অমুক কুফরী কাজ না কর বা কথা না বল তবে আমরার তোমাকে হত্যা করব এবং অবস্থাদৃষ্টে বোঝাও যায় যে, তারা এরূপ করতে পারে তবে,) শর্ত এই যে, যদি তার অন্তর ঈমানে অটল থাকে (অর্থাৎ বিশ্বাসে কোনরূপ ত্রুটি না আসে এবং একথা ও কাজকে বিরূপ গোনাহ ও মন্দ মনে করে, তবে সে বণিত ধর্মত্যাগের শান্তির যোগ্য হবে না এবং বাহ্যত তার কুফরী বাক্য অথবা কাজে লিপ্ত হওয়া একটি ওহরের কারণে হবে। তাই পরবর্তী বাক্যে ধর্ম ত্যাগের যে শান্তি বণিত হচ্ছে, তা এরূপ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না)। অবশ্য যে ব্যক্তি মন খুলে (অর্থাৎ এ কুফরকে বিশুদ্ধ ও উত্তম মনে করে) কুফরী করে, এরূপ লোকদের উপর আল্লাহর গম্ব আগতিত হবে এবং তাদের বিরূপ শান্তি হবে (এবং) এই (গম্ব ও শান্তি) এই কারণে হবে যে, তারা পাখিব জীবনকে পরকালের চাইতে প্রিয় মনে করেছে এবং এই কারণে যে, আল্লাহ তা'আলা এরূপ অবিশ্বাসী লোকদেরকে (যারা ইহকালকে পরকালের উপর সবসময় অপ্রাধিকার দেয়) পথ প্রদর্শন করেন না। (এ দু'টি কারণ পৃথক

পৃথক নয়; বরং একই কারণের সমষ্টি। এর সারমর্ম এই যে, কাজের সংকল্প করার পর আল্লাহর রীতি অনুযায়ী কাজের সৃষ্টি হয়। এর উপর ভিত্তি করে কাজের বিকাশ ঘটে। আয়াতে **أَسْتَوْفُوا** দ্বারা সংকল্প এবং **لَا يُوَدَّى** দ্বারা কাজ সৃষ্টির দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এতদুভয়ের সমষ্টির উপর ভিত্তি করে সমস্ত কাজের বিকাশ ঘটেছে।) এরা তারা যে, (দুনিয়াতে তাদের কফর প্রীতির অবস্থা এই যে,) আল্লাহ তাদের অন্তরের উপর, কর্ণের উপর এবং চক্ষুর উপর মোহর মেঝে দিয়েছেন এবং তারা (পরিণাম থেকে) সম্পূর্ণ গাফিল। (তাই) নিশ্চিত কথা এই যে, পরকালে তারা সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

### আনুমানিক জাতব্য বিষয়

মাস'আলা : এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, যে ব্যক্তিকে হত্যার হুমকি দিয়ে কুফরী কালাম উচ্চারণ করতে বাধ্য করা হয়, যদি প্রবল বিশ্বাস থাকে যে, হুমকিদাতা তা কার্যে পরিণত করার পূর্ণ ক্ষমতা রাখে, তবে এমন জবরদস্তির ক্ষেত্রে সে যদি মুখে কুফরী কালাম উচ্চারণ করে, তবে তাতে কোন গোনাহ নেই এবং তার স্ত্রী তার জন্য হারাম হবে না। তবে শর্ত এই যে, তার অন্তর ঈমানে অটল থাকতে হবে এবং কুফরী কালামকে মিথ্যা ও মন্দ বলে বিশ্বাস করতে হবে।—(কুরতুবী, মায়হারী)

আলোচ্য আয়াতটি কতিপয় সাহাবী সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়, যাদেরকে মুশরিকরা গ্রেফতার করেছিল এবং হত্যার হুমকি দিয়ে কুফরী অবলম্বন করতে বাধ্য ছিল।

যাঁরা গ্রেফতার হয়েছিলেন, তাঁরা ছিলেন হযরত আশ্মার, তদীয় পিতা ইয়াসির, মাতা সুমাইয়া, সুহায়ব, বেলাল এবং খাক্বাব (রা)। তাঁদের মধ্যে হযরত ইয়াসির ও তদীয় সহধর্মিণী সুমাইয়া কুফরী কালাম উচ্চারণ করতে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। হযরত ইয়াসিরকে হত্যা করা হয় এবং হযরত সুমাইয়াকে দু' উটের মাঝখানে বেঁধে উট দু'টিকে দু'দিকে হাঁকিয়ে দেওয়া হয়। ফলে তিনি দ্বিখণ্ডিত হয়ে শহীদ হন। এ দু'জন মহাত্মাই ইসলামের জন্য সর্বপ্রথম শাহাদত বরণ করেন। এমনিভাবে হযরত খাক্বাবও কুফরী কালাম উচ্চারণ করতে অস্বীকার করে হাসিমুখে শাহাদত বরণ করেন। তাঁদের মধ্যে হযরত আশ্মার প্রাণের তলে কুফরীর মোখিক স্বীকারোক্তি করলেও তাঁর অন্তর ঈমানে অটল ছিল। শত্রুর কবল থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি যখন রসুলুল্লাহ (সা)-র খিদমতে উপস্থিত হন, তখন অত্যন্ত দুঃখের সাথে ঘটনাটি বর্ণনা করেন। রসুলুল্লাহ (সা) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন : তুমি যখন কুফরী কালাম বলেছিলে, তখন তোমার অন্তরের অবস্থা কি ছিল? তিনি আরব করলেন : আমার অন্তর ঈমানের উপর স্থির এবং অটল ছিল। তখন রসুলুল্লাহ (সা) তাঁকে আশ্বাস দেন যে, তোমাকে এজন্য কোন শাস্তি ভোগ করতে হবে না। রসুলুল্লাহ (সা)-র এ সিদ্ধান্তের সত্যায়নে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়।

জোর-জবরদস্তির সংজ্ঞা ও সীমা : **أَكْرَاهُ**--এর শাব্দিক অর্থ এই যে, কোন ব্যক্তিকে এমন কথা বলতে অথবা এমন কাজ করতে বাধ্য করা, যা বলতে বা করতে সে সম্মত নয়। এরূপ জোর-জবরদস্তির দৃষ্টি পর্যায় রয়েছে। এক, মনে-প্রাণে তত্তে সম্মত নয়, কিন্তু এমন অক্ষম ও অবশ্যও নয় যে, অস্বীকার করতে পারে না। ফিকাহ্‌বিদদের পরিভাষায় এ স্তরকে **أَكْرَاهُ فَهْرٍ مَلْجِي** বলা হয়। এরূপ জবরদস্তির কারণে কুফুরী বাধ্য অথবা কোন হারাম কাজ করা জায়েয নয়। তবে কোন কোন খুঁটিনাটি বিধানে এর কারণেও কিছু প্রতিক্রিয়া প্রমাণিত হয়। যার বিস্তারিত বিবরণ ফিকাহ্‌ শাস্ত্রে বর্ণিত রয়েছে।

জোর-জবরদস্তির দ্বিতীয় পর্যায় হচ্ছে এমন অক্ষম ও অপারক করে দেওয়া যে, সে যদি জোর-জবরদস্তিকারীদের কথামত কাজ না করে, তবে তাকে হত্যা করা হবে কিংবা তার কোন অঙ্গহানি করা হবে। ফিকাহ্‌বিদদের পরিভাষায় এ পর্যায়কে **أَكْرَاهُ مَلْجِي** বলা হয়। এর অর্থ হচ্ছে এমন জোর-জবরদস্তি, যা মানুষকে ক্ষমতাহীন ও অক্ষম করে দেয়। এমন জবরদস্তির অবস্থায় অন্তর ইমানের উপর স্থির ও অটল থাকার শর্তে মুখে কুফুরী কলিমা উচ্চারণ করা জায়েয। এমনভাবে কাউকে হত্যা করা ছাড়া অন্য কোন হারাম কাজ করতে বাধ্য করলে তা করলেও কোন গোনাহ্‌ নেই।

কিন্তু উভয় প্রকার জোর-জবরদস্তির মধ্যে শর্ত এই যে, হুমকিদাতা যে বিষয়ের হুমকি দেয়, তা বাস্তবায়নের শক্তিও তার থাকতে হবে এবং যাকে হুমকি দেওয়া হয়, তার প্রবল ধারণা থাকতে হবে যে, সে যদি তার কথা না মানে, তবে যে বিষয়ের হুমকি দিচ্ছে, তা অবশ্যই বাস্তবায়িত করে ফেলবে।—(মায়হারী)

লেনদেন দু'প্রকার। এক, যাতে আন্তরিকভাবে সম্মতি অপরিহার্য; যেমন কেনা-বেচা, দান-খয়রাত ইত্যাদি। এগুলোতে আন্তরিকভাবে সম্মত হওয়া শর্ত। কোরআন বলে : **لَا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً مِنْ تَرَاهُ مِنْكُمْ**—অর্থাৎ অপরের মাল হালাল হয় না যে পর্যন্ত উভয়পক্ষের সম্মতিতে ব্যবসা ইত্যাদির আদান-প্রদান না হয়। হাদীসে আছে, **لَا يَحِلُّ مَالُ امْرَأٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهَا**—অর্থাৎ কোন মুসলমানের মাল হালাল হয় না, যে পর্যন্ত সে মনের খুশিতে তা দিতে সম্মত না হয়।

এ জাতীয় লেনদেন যদি জোর-জবরদস্তির মাধ্যমে করা হয়, তবে শরীয়তের আইনে তা অপ্রাচ্য হবে। জোর-জবরদস্তির অবস্থা কেটে গেলে যখন সে স্বাধীন হবে—জোর-জবরদস্তির অবস্থায় কৃত কেনা-বেচা অথবা দান-খয়রাত ইচ্ছা করলে সে বহালও রাখতে পারে, না হয় বাতিলও করে দিতে পারে।

কিছু কাজ ও বিষয় এমনও রয়েছে যেগুলো শুধু মুখের কথার উপর নির্ভরশীল। ইচ্ছা, সম্মতি, খুশি ইত্যাদি শর্ত নয়; যেমন বিয়ে, ভালাক, ভালাক প্রত্যাহার, গোলাম মুক্তকরণ ইত্যাদি। এ জাতীয় ব্যাপার সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে :

ثَلَاثُ جَدِّهِ جَدُّهُ هَزْلُونٌ جَدُّهُ لَلنَّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ—وَأَوَّلُهُ  
أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ

অর্থাৎ দু'ব্যক্তি যদি মুখে বিয়ের ইজাব-কবুল শর্তানুযায়ী করে নেন অথবা কোন স্বামী স্ত্রীকে মুখে তালাক দিয়ে দেয় অথবা তালাকের পর মুখে তা প্রত্যাহার করে নেন হাসি-ঠাট্টার ছলে হলেও এবং অন্তরে বিয়ে, তালাক ও তালাক প্রত্যাহারের ইচ্ছা না থাকলেও মুখের কথা দ্বারা বিয়ে সম্পন্ন হয়ে যাবে, তালাক হয়ে যাবে এবং প্রত্যাহারও শুদ্ধ হবে।—(মাযহারী)

ইমাম আযম আবু হানীফা, শা'বী, মুহন্নী, নখয়ী ও কাতাদাহ্ (রহ) প্রমুখ বলেন : জবরদস্তির অবস্থায় যদিও সে তালাক দিতে আন্তরিকভাবে সম্মত ছিল না, অক্ষম হয়ে তালাক শব্দ বলে দিয়েছে, তবুও তালাক হয়ে যাবে। কারণ, তালাক হওয়ার সম্পর্ক শুধু তালাক শব্দ বলে দেওয়ার সাথে—মনের ইচ্ছা ও মনন শর্ত নয়; যেমন পূর্বোক্ত হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়েছে।

কিন্তু ইমাম শাফেরী, হযরত আলী ও ইবনে আক্বাস (রা)—এর মতে জবরদস্তি অবস্থায় তালাক হবে না। কেননা হাদীসে আছে,—**رَفَعْنَا عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ**—অর্থাৎ আমার উম্মত থেকে ভুল, বিস্মৃতি এবং যে কাজে তাদেরকে বাধ্য করা হয়, সব ভুলে নেওয়া হয়েছে।

ইমাম আবু হানীফার মতে এ হাদীসটি পরকালীন বিধানের সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ ভুল-বিস্মৃতির কারণে অথবা জবরদস্তির অবস্থায় কোন কথা অথবা কাজ শরীয়তের বিরুদ্ধে করে বা বলে ফেললে সেজন্য কোন গোনাহ্ হবে না। দুনিয়ার বিধান এবং এ কাজের অবশ্যস্বাবী পরিণতি, এগুলোর প্রতিফলন অনুভূত ও চাক্কুস। এর প্রতিফলনের কারণে দুনিয়ার যেসব বিধান হওয়া সম্ভব, সেগুলো অবশ্যই হবে। উদাহরণত একজন অন্য জনকে ভুলবশত হত্যা করল। এখানে হত্যার গোনাহ্ এবং পরকালের শাস্তি নিশ্চয়ই হবে না। কিন্তু হত্যার চাক্কুস পরিণতি অর্থাৎ নিহত ব্যক্তির প্রাণ বিয়োগ যেমন অবশ্যই হয়, তেমনি এর শরীয়তগত পরিণতিও সাব্যস্ত হবে যে, তার স্ত্রী ইদ্দতের পর পুনর্বিবাহ করতে পারবে এবং তার ধন-সম্পত্তি উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টন করা হবে। এমনিভাবে যখন তালাক, তা প্রত্যাহার ও বিবাহের শব্দ মুখে বলে দেয়, তখন তার শরীয়তগত পরিণতিও প্রতিফলিত হয়ে যাবে।—(মাযহারী, কুরতুবী)

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا قَاتَلُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا  
إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٠﴾ يَوْمَ تَأْتِي كُلَّ



نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ  
 لَا يظلمُونَ ۝ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً  
 يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ  
 فَأَذَقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ۝ وَلَقَدْ  
 جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ  
 ظَالِمُونَ ۝

(১১০) হারা দুঃখ-কষ্ট ভোগের পর দেশত্যাগী হয়েছে অতঃপর জিহাদ করেছে নিশ্চয় আপনার গালনকর্তা এসব বিষয়ের পরে অবশ্যই ক্রমান্বিত, পরম দয়ালু! (১১১) যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি আত্মসমর্পণে সওয়াল-জওয়াব করতে করতে আসবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি তাদের কৃতকর্মের পূর্ণ ফল পাবে এবং তাদের উপর জুলুম করা হবে না। (১১২) আল্লাহ্ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করছেন একটি জনপদের, যা ছিল নিরাপদ ও নিশ্চিত, তথায় প্রত্যেক জায়গা থেকে আসত প্রচুর জীবনোপকরণ। অতঃপর তারা আল্লাহর নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল। তখন আল্লাহ তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের কারণে মজা আত্মাদান করালেন, ক্ষুধা ও ভীতির। (১১৩) তাদের কাছে তাদের মধ্য থেকেই একজন রসূল আগমন করেছিলেন। অনন্তর ওরা তাঁর প্রতি মিথ্যারোপ করল। তখন আযাব এসে ওদেরকে পাকড়াও করল এবং নিশ্চিতই ওরা ছিল পাপাচারী।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কুফরের শাস্তি বর্ণিত হয়েছিল; আসল কুফর হোক কিংবা ধর্ম ত্যাগের কুফর। এর পর আলোচ্য প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে, যে কাফির কিংবা ধর্ম-ত্যাগী সত্যিকার ইমান আনে, তার বিগত সব গোনাহ্ মাক্ক হয়ে যায়। ইমান এমনি এক অমূল্য সম্পদ।

দ্বিতীয় আয়াতে কিয়ামতের কথা এজন্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, এসব প্রতিদান ও শাস্তি কিয়ামতের পরেই হবে। তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যে, কুফর ও গোনাহর আসল শাস্তি কিয়ামতের পরেই পাওয়া যাবে, কিন্তু কোন কোন গোনাহর কিছু কিছু শাস্তি দুনিয়া-তেও পাওয়া যায়। আয়াতের সংক্ষিপ্ত তফসীর এইরূপ :

এর পর ( যদি কুফরের পরে তারা বিশ্বাস স্থাপন করে তবে ) নিশ্চয় আপনার পালন-কর্তা তাদের জন্য, যারা কুফরে লিপ্ত হওয়ার পর ( ঈমান আনয়ন করে ) হিজরত করেছে, অতঃপর জিহাদ করেছে এবং ( ঈমানে ) অবিলম্ব রয়েছে, আপনার পালনকর্তা ( তাদের জন্য ) এ সবেদ ( অর্থাৎ এসব আমলের ) পর অত্যন্ত ক্ষমাকারী, দয়ালু । ( অর্থাৎ ঈমান ও সৎ কর্মের বন্ধকতে অতীতের যাবতীয় গোনাহ মাফ হয়ে যাবে । আল্লাহ তা'আলার রহমতে তারা জান্নাতে উচ্চ উচ্চ শ্রেণী পাবে । কুফর ও পূর্ববর্তী গোনাহ তো শুধু ঈমান দ্বারাই মাফ হয়ে যায়— জিহাদ ইত্যাদি সৎ কর্ম গোনাহ মাফ হওয়ার জন্য শর্ত নয়—কিন্তু সৎ কর্ম জান্নাতে উচ্চ শ্রেণী পাওয়ার কারণ । তাই এরই সাথে উল্লেখ করা হয়েছে । এ প্রতিদান ও শাস্তি সেদিন হবে ) যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের পক্ষে কথা বলবে ( এবং অন্যান্যের ব্যাপারে কিছু বলবে না ) এবং প্রত্যেকই স্বীয় কৃতকর্মের পুরোপুরি প্রতিদান পাবে । ( অর্থাৎ সৎ কাজের প্রতিদান কম হবে না, যদিও আল্লাহর রহমতে কিছু বেশি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । পক্ষান্তরে মন্দ কাজের বিনিময় বেশি হবে না, যদিও আল্লাহর রহমতে কিছু কম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । এটাই পরবর্তী বাক্যের উদ্দেশ্য । অর্থাৎ ) তাদের উপর জুলুম করা হবে না ( এর পর বলা হয়েছে যে, কুফর ও গোনাহর পূর্ণ শাস্তি হাশরের পরে হবে, কিন্তু কোন সময় দুনিয়াতেও এর শাস্তি আযাব আকারে এসে যায় । ) আল্লাহ তা'আলা একটি জনপদের অধিবাসীদের বিচিত্র অবস্থা বর্ণনা করেন । তারা ( খুব ) সুখ ও শান্তিতে বসবাস করত ( এবং ) তাদের আহর্ষও প্রচুর পরিমাণে চতুর্দিক থেকে তাদের কাছে পৌঁছাত । ( আল্লাহর নিয়ামতসমূহের শুকরিয়া আদায় না করে বরং ) তারা আল্লাহর নিয়ামতসমূহের না-শোকরী করল ( অর্থাৎ কুফর, শিরক ও গোনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ল । ) ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাদের কর্মের কারণে একটি সর্বগ্রাসী দুর্ভিক্ষ ও ভীতির স্বাদ আন্বাদন করালেন ( অর্থাৎ তারা ধন-দৌলতের প্রাচুর্য থেকে বঞ্চিত হয়ে দুর্ভিক্ষ ও ক্ষুধায় পতিত হল এবং শত্রুর ভয় চাপিয়ে দিয়ে তাদের সে জনপদের শান্তি ও নিরাপত্তা ব্যাহত করা হল । ) এবং ( এ শাস্তি প্রদানে আল্লাহর পক্ষ থেকে তড়িঘড়ি করা হয়নি; বরং প্রথমে তাদেরকে হ'শিয়ার করার জন্য ) তাদের কাছে তাদেরই মধ্য থেকে একজন রসূলও ( আল্লাহর পক্ষ থেকে ) আগমন করল ( যার সততা ও ধর্মপরায়ণতার অবস্থা তাদের স্বজাতিভুক্ত হওয়ার কারণে তাদের খুব ভাল করে জানা ছিল । ) তাঁকে ( রসূলকেও ) তাহারা মিথ্যাবাদী বলল । তখন তাদেরকে আযাব এসে ধৃত করল এমতাবস্থায় যে, তারা জুলুমে বন্ধপরিষ্কর ছিল ।

### জানুয়ারিক জাতক্য বিষয়

শেষ আয়াতে ক্ষুধা ও ভীতির স্বাদ আন্বাদনের জন্য 'জেবাস' শব্দ ব্যবহার করে বলা হয়েছে যে, তাদেরকে ক্ষুধা ও ভীতির পোশাক আন্বাদন করানো হয়েছে । অথচ পোশাক আন্বাদন করার বস্তু নয় । কিন্তু এখানে জেবাস শব্দটি পুরোপুরি পল্লিবিশ্টনকারী হওয়ার কারণে রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে । অর্থাৎ ক্ষুধা ও ভীতি তাদের সবাইকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে নিচ্ছে, যেমন পোশাক দেহের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে যায় । ক্ষুধা এবং ভীতিও তাদের উপর তেমনিভাবে চেপে বসে ।

আয়াতে বর্ণিত দৃষ্টান্তটি কোন কোন তফসীরবিদের মতে একটি সাধারণ দৃষ্টান্ত। এর সম্পর্ক বিশেষ কোন বস্তির সাথে নয়। অধিকাংশ তফসীরবিদ একে মক্কা মুকাররমার ঘটনা সাব্যস্ত করেছেন। মক্কাবাসীরা সাত বছর পর্যন্ত নিদারুণ দুর্ভিক্ষে পতিত ছিল। এমনকি, মৃত জন্তু, কুকুর ও ময়লা-আবর্জনা পর্যন্ত খেতে বাধ্য হয়ে পড়েছিল। এছাড়া মুসলমানদের উন্নত তাদেরকে পেয়ে বসেছিল। অবশেষে মক্কার সরদাররা রসূলুল্লাহ (সা)-র কাছে আবেদন করল যে, কুফর ও অবাধ্যতার দোষে তো পুরুষরা দোষী হতে পারে। কিন্তু শিশু ও মহিলারা তো নির্দোষ। এর পর রসূলুল্লাহ (সা) তাদের জন্য মদীনা থেকে খাদ্যসম্ভার পাঠিয়ে দেন। —(মায়হারী)

আবু সুফিয়ান কাফির অবস্থায় রসূলুল্লাহ (সা)-কে অনুরোধ করে যে, আপনি তো আশীর্ষিতা, দয়া-দাক্ষিণ্য ও মার্জনা শিক্ষা দেন। আপনারই স্বজাতি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। দুর্ভিক্ষ দূর করে দেওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করুন। এতে রসূলুল্লাহ (সা) তাদের জন্য দোয়া করেন এবং দুর্ভিক্ষ দূর হয়ে যায়।—(কুরতুবী)

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۖ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ  
 كُنتُمْ رِيبًا تَعْبُدُونَ ۖ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ  
 الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا  
 عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ  
 أَلْسِنَتِكُمْ كَذِبًا هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ  
 الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ  
 لَا يُفْلِحُونَ ۝ مَتَاءٌ قَلِيلٌ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ وَعَلَى  
 الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا  
 ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۝ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ  
 لِلَّذِينَ عَمِلُوا الشُّرُوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ سَابُّوا مِنِّي بَعْدَ ذَلِكَ  
 وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

(১১৪) অতএব আল্লাহ তোমাদেরকে যেসব হালাল ও পবিত্র বস্তু দিয়েছেন, তা তোমরা আহ্বার কর এবং আল্লাহর অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর যদি তোমরা তাঁরই ইবাদতকারী হয়ে থাক। (১১৫) অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের জন্য হারাম করেছেন রক্ত, শূকরের মাংস এবং যা জবাই কালে আল্লাহ ছাড়া অন্যের নাম উচ্চারণ করা হয়েছে। অতঃপর কেউ সীমালংঘনকারী না হয়ে নিরুপায় হয়ে পড়লে তবে, আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (১১৬) তোমাদের মুখ থেকে সাধারণত যেসব মিথ্যা বের হয়ে আসে সেভাবে তোমরা আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে বলা না যে, এটা হালাল এবং এটা হারাম। নিশ্চয় যারা আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে, তাদের মজল হবে না। (১১৭) স্বৎ সামান্য সুখ-সন্তোষ ডোং করে নিক। তাদের জন্য যত্বপাদায়ক শাস্তি রয়েছে। (১১৮) ইহুদীদের জন্য আমি তো কেবল তাই হারাম করেছিলাম যা ইতিপূর্বে আপনাদের নিকট উল্লেখ করেছি। আমি তাদের প্রতি কোন জুলুম করিনি, কিন্তু তারা ই নিজেদের উপর জুলুম করত। (১১৯) অনন্তর যারা অজ্ঞতাবশত মন্দ কাজ করে, অতঃপর তওবা করে এবং নিজেকে সংশোধন করে, আপনাদের পালনকর্তা এসবের পরে তাদের জন্য অবশ্যই ক্ষমাকারী, দয়ালু।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

পূর্ববর্তী আয়াতে কাফিরদের পক্ষ থেকে আল্লাহর নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা ও তাঁর আম্রবের উল্লেখ করা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে প্রথমে মুসলমানদেরকে অকৃতজ্ঞ না হওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে যেসব হালাল নিয়ামত দিয়েছেন, সেগুলো কৃতজ্ঞতা সহকারে ব্যবহার করতে বলা হয়েছে। এর পর বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার হালাল করা অনেক বস্তুকে নিজেদের পক্ষ থেকে হারাম বলা এবং আল্লাহ তা'আলার হারাম করা অনেক বস্তুকে হালাল বলা—এটা ছিল কাফির ও মুশরিকদের অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার অন্যতম পদ্ধতি। মুসলমানদেরকে হ'শিয়ান করা হয়েছে, তারা যেন এরূপ না করে। কোন বস্তুকে হালাল অথবা হারাম করার অধিকার একমাত্র সে সত্তারই রয়েছে, যিনি এগুলোকে সৃষ্টি করেছেন। নিজেদের পক্ষ থেকে এরূপ করা আল্লাহর ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ এবং তাঁর প্রতি মিথ্যা আরোপেরই নামান্তর।

অবশেষে আরো বলা হয়েছে যে, যারা অজ্ঞতাবশত এ জাতীয় অপরাধ করেছে, তারাও যেন আল্লাহর অনুক্ষমা থেকে নিরাশ না হয়। যদি তারা তওবা করে নেয় এবং বিস্তৃত ঈমান অবলম্বন করে, তবে আল্লাহ তা'আলা সমস্ত গোনাহ মার্ফ করে দেবেন। আয়াতগুলোর সংক্ষিপ্ত তফসীর নিম্নরূপ :

আল্লাহ তোমাদেরকে যেসব হালাল ও পবিত্র বস্তু দিয়েছেন, সেগুলোকে (হারাম মনে করো না; কেননা এটা মুশরিকদের মূর্খতাসূলভ প্রথা। বরং সেগুলোকে) খাও এবং আল্লাহর নিয়ামতের শোকর আদায় কর, যদি তোমরা (দাবী অনুযায়ী) তাঁরই ইবাদতকারী হয়ে থাক! (তোমরা যেসব বস্তুকে হারাম বল, সেগুলোর মধ্য থেকে তো) তোমাদের

প্রতি (আল্লাহ্ তা'আলা) শুধু মৃত জন্তকে হারাম করেছেন এবং (হারাম করেছেন) রক্ত ও শূকরের মাংস (ইত্যাদি) এবং যে বস্তু অন্যের নামে উৎসর্গ করা হয়। অতঃপর যে ব্যক্তি (ক্ষুধায়) একেবারে অস্থির হয়ে যায়--স্বাদ অন্বেষণকারী ও (প্রয়োজনের) সীমালংঘনকারী না হয়, আল্লাহ্ তা'আলা (তার জন্য, যদি সেগুলো খেয়ে ফেলে) ক্ষমাকারী, দয়ালু। যেসব বস্তু সম্পর্কে তোমরা শুধু মৌখিক মিথ্যা দাবী কর (অথচ তার কোন বিপুল প্রমাণ নেই), সেগুলো সম্পর্কে বলে দিয়ো না যে, অমুক বস্তু হালাল এবং অমুক বস্তু হারাম (যেমন, অষ্টম পারার চতুর্থাংশের কাছাকাছি **وَجَعَلُوا اللَّهَ** আয়াতে

তাদের এসব মিথ্যা দাবী বর্ণিত হয়েছে। এর সারমর্ম হবে এই যে) তোমরা আল্লাহ্ প্রতি অপবাদ আরোপ করবে? (কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা এরূপ করেন নি; বরং এর বিপরীত বলেছেন)। নিশ্চয় যারা আল্লাহ্ প্রতি মিথ্যা আরোপ করে, তারা সফল হবে না (হয় ইহকাল ও পরকাল উভয় ক্ষেত্রে, না হয় শুধু পরকালে) এটা রূপস্থায়ী (পাথিব) আয়েশ মাত্র। (সামনে মৃত্যুর পর) তাদের জন্য যন্ত্রপাদায়ক শাস্তি রয়েছে এবং মুশরিকরা ইব্রাহীমী দীনের অনুসারী হওয়ার দাবী করে, অথচ হযরত ইব্রাহীমের শরীয়তে যেসব বস্তু হারাম ছিল না, সেগুলোকে তারা হারাম সাব্যস্ত করেছে। তবে (অনেক দিন পর সেগুলোর মধ্য থেকে) শুধু ইহদীদের জন্য আমি এসব বস্তু হারাম করেছিলাম, যেগুলো ইতিপূর্বে (সূরা আন'আমে) আপনার কাছে বর্ণনা করেছি। (এগুলোকে হারাম করার ব্যাপারে) আমি তাদের প্রতি (দৃশ্যতও) কোন জুলুম করিনি, কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি (পয়গম্বরগণের বিরোধিতা করে জুলুম করত। সুতরাং জানা গেল যে, পবিত্র বস্তুসমূহকে ইচ্ছাকৃতভাবে তো কোন সময় হারাম করা হয়নি এবং ইব্রাহীমী শরীয়তে কোন সাময়িক প্রয়োজনেও হয়নি। এমতাবস্থায় তোমরা এগুলো কোথা থেকে গড়ে নিয়েছ? )

অতঃপর আপনার পালনকর্তা তাদের জন্য, যারা মুর্খতাবশত মন্দ কাজ করে ফেলে (তা যাই হোক) অতঃপর সেজন্য তওবা করে নেয় এবং (ভবিষ্যতের জন্য) স্বীয় কাজকর্ম সংশোধন করে নেয়, আপনার পালনকর্তা এসবের পর অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু।

### আনুষ্ঠানিক জ্ঞাতব্য বিষয়

উল্লিখিত চারের মধ্যেই হারাম বস্তু সীমাবদ্ধ নয় : এ আয়াতে ব্যবহৃত **أَنْفًا** শব্দ থেকে বোঝা যায় যে, হারাম বস্তু আয়াতে উল্লিখিত চারটিই। এর চাইতে আরও অধিক স্পষ্টভাবে **قُلْ لَا أَجِدُ فِيهَا أُوحِيَ إِلَيَّ حَرَامًا** আয়াত থেকে জানা যায় যে,

এগুলো ছাড়া অন্য কোন বস্তু হারাম নয়। অথচ কোরআন ও হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী ইজমা দ্বারা আরও অনেক বস্তু হারাম। এ সংশয়ের জওয়াব আলোচ্য আয়াতসমূহের বর্ণনান্তর্গত সম্পর্কে চিন্তা করলেই খুঁজে পাওয়া যায়। এখানে সাধারণ হালাল ও হারাম বস্তুসমূহের তালিকা বর্ণনা করার উদ্দেশ্য নয়; বরং জাহিলিয়াত আমলের মুশরিকরা

নিজেদের পক্ষ থেকে যে অনেক বস্তু হারাম করে নিয়েছিল অথচ, আল্লাহ্ তত্ত্বপ কোন নির্দেশ দেন নি, সেগুলো বর্ণনা করাই এখানে উদ্দেশ্য। অর্থাৎ তাদের হারাম করা বস্তুসমূহের মধ্যে আল্লাহর কাছে শুধু এগুলোই হারাম। এ আয়াতের পুরোপুরি তফসীর এবং চারটি হারাম বস্তুর বিস্তারিত বর্ণনা মা'আরেফুল-কোরআন প্রথম খণ্ডে সূরা বাক্বারার ১৭৩ আয়াতের তফসীরে দ্রষ্টব্য।

যে গোনাহ্ বুঝে-সুঝে করা হয় এবং যে গোনাহ্ না বুঝে করা হয় সবই তওবা দ্বারা

মাফ হতে পারে : আয়াতে **إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ** -এর

এর **علم** শব্দটি **جهل** শব্দ নয় বরং **جهالة** শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

বিপরীতে অজ্ঞানতা ও বোধহীনতা অর্থে আসে। পক্ষান্তরে **جهالة** -এর অর্থ হয়

মূর্খতাসুলভ কাণ্ড, যদিও তা বুঝে-সুঝে করা হয়। এতে বোঝা গেল যে, তওবা দ্বারা শুধু না বুঝে অথবা অনিচ্ছায় করা গোনাহ্ই মাফ হয় না; বরং যে গোনাহ্ সচেতনভাবে করা হয়, তাও মাফ হয়।

**إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ  
الشُّرِكِينَ ۝ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ إِجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ  
مُسْتَقِيمٍ ۝ وَاتَّيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ  
لَمِنَ الصَّالِحِينَ ۝ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ  
حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ  
اختلفوا فيه وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا  
كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝**

(১২০) নিশ্চয় ইব্রাহীম ছিলেন এক সম্প্রদায়ের প্রতীক, সরকিহু থেকে মুখ ফিরিয়ে এক আল্লাহরই অনুগত এবং তিনি শিরককারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। (১২১) তিনি তাঁর অনুগ্রহের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী ছিলেন। আল্লাহ্ তাঁকে মনোনীত করেছিলেন এবং সরল পথে পরিচালিত করেছিলেন। (১২২) আমি তাঁকে দুনিয়াতে দান করেছি কল্যাণ এবং তিনি পরকালেও সৎ কর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত। (১২৩) অতঃপর আপনার প্রতি প্রত্যাদেশ প্রেরণ করেছি যে, ইব্রাহীমের দীন অনুসরণ করুন, যিনি একনিষ্ঠ ছিলেন এবং শিরককারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। (১২৪) শনিবার দিন পালন

যে নির্ধারণ করা হয়েছিল, তা তাদের জন্যই শার: এতে মতবিরোধ করেছিল। আপনাদের পালনকর্তা কিয়ামতের দিন তাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করত।

**পূর্বাঙ্গ সম্পর্ক :** পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে শিরক ও কুফরের মূল অর্থাৎ তওহীদ ও রিসালতের স্বীকৃতি খণ্ডন এবং কুফর ও শিরকের কতিপয় শাখা অর্থাৎ হারামকে হালাল করা ও হালালকে হারাম করার বিষয়টিকে বিস্তারিতভাবে বাতিল করা হয়েছিল। কোরআন পাকের সম্বোধনের প্রথম ও প্রত্যক্ষ লক্ষ্য মক্কার মুশরিক সম্প্রদায়। মৃত্যুপূজায় লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও এরা দাবী করত যে, তারা ইব্রাহীম (আ)-এর ধর্মের অনুসারী এবং তাদের যাবতীয় কর্মকাণ্ড ইব্রাহীম (আ)-এরই শিক্ষা। তাই আলোচ্য চারটি আয়াতে তাদের এ দাবী খণ্ডন করা হয়েছে এবং তাদেরই স্বীকৃত নীতি দ্বারা তাদের মুখতাসুলত চিন্তাধারা বাতিল প্রতিপন্ন করা হয়েছে। বাতিল এভাবে করা হয়েছে যে, উল্লিখিত পাঁচ আয়াতের মধ্য থেকে প্রথম আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, হযরত ইব্রাহীম (আ) বিশ্বের জাতিসমূহের সর্বজন স্বীকৃত অনুসৃত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। এটা নবুয়ত ও রিসালতের সর্বোচ্চ স্তর। এতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি একজন মহান পয়গম্বর ছিলেন। এর সাথেই مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ বলে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তিনি একজন নিরুলুম একত্ববাদী ছিলেন।

দ্বিতীয় আয়াতে তিনি যে কৃতজ্ঞ এবং সরল পথের অনুসারী ছিলেন, একথা বর্ণনা করে মুশরিকদের হ'শিয়ার করা হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়েও নিজেদেরকে কোন মুখে ইব্রাহীমে (আ)-এর অনুসারী বলে দাবী করছ ?

তৃতীয় আয়াতে ব্যক্ত হয়েছে যে, ইব্রাহীম (আ) ইহকাল ও পরকালে সফলকাম ছিলেন। চতুর্থ আয়াতে রসুলুল্লাহ (সা)-র নবুয়ত প্রমাণ করার সাথে সাথে তিনি যে স্বার্থ মিলাতে-ইব্রাহীমীর অনুসারী, একথা বর্ণনা করে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তোমরা যদি নিজেদের দাবীতে সত্যবাদী হও, তবে রসুলুল্লাহ (সা)-র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ও তাঁর আনুগত্য ব্যতীত এ দাবী সত্য হতে পারে না।

أَلَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ السَّمْعَ —এই পঞ্চম আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মিলাতে

ইব্রাহীমীতে পবিত্র বস্তুসমূহ হারাম ছিল না। তোমরা এগুলোকে নিজেদের জন্য হারাম করে নিয়েছ। আয়াতসমূহের সংক্ষিপ্ত তফসীল নিম্নরূপ :

নিঃসন্দেহে ইব্রাহীম [ (আ) যাকে তোমরাও মান ] একান্ত অনুসরণযোগ্য ( অর্থাৎ দৃঢ়চেতা পয়গম্বর ও মহান উম্মতের অনুসরণযোগ্য নেতা ), আল্লাহর পুরোপুরি আনুগত্যশীল ছিলেন ( তাঁর কোন বিশ্বাস অথবা কর্ম স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ছিল না। এমতাবস্থায় তোমরা তার বিপরীতে নিছক প্রবৃত্তির অনুসরণ করে আল্লাহর হারামকে হালাল এবং হালালকে হারাম সাব্যস্ত কর কেন ? তিনি ) সম্পূর্ণ এক ( আল্লাহ )-মুখী ছিলেন। ( একমুখী হওয়ার অর্থ এই যে ) তিনি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। [ এমতাবস্থায় কেমন করে তোমরা

শিরক কর? মোটকথা, ইব্রাহীম (আ)-এর এই ছিল অবস্থা ও আদর্শ। তিনি আল্লাহর এমন প্রিয় ছিলেন যে ] আল্লাহ তা'আলা তাঁকে মনোনীত করে নিয়েছিলেন এবং তাঁকে সরল পথ প্রদর্শন করেছিলেন। আমি তাঁকে ইহকালেও (নবুয়ত ও রিসালতের জন্য মনোনয়ন ও সরল পথপ্রদর্শন ইত্যাদির মত) বৈশিষ্ট্য দান করেছিলাম এবং তিনি পরকালেও (উচ্চ মর্তবার) পূণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। (তাই তাঁর আদর্শ অনুসরণ করাই তোমাদের সবার কর্তব্য। বর্তমানে সেই অনুপম আদর্শ দীনে মুহাম্মদীর মধ্যে সীমিত। এর বর্ণনা এই যে) অতঃপর আমি আপনার কাছে ওহী প্রেরণ করেছি যে, আপনি ইব্রাহীমের দীন, যিনি সম্পূর্ণ এক (আল্লাহ)-মুখী ছিলেন, অনুসরণ করুন (যেহেতু সেকালে দীনে ইব্রাহীমীর দাবীদাররা কিছু না কিছু শিরকে লিপ্ত ছিল, তাই পুনশ্চ বলেছেন যে) তিনি শিরককারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না (যাতে মূর্তি পূজারীদের সাথে সাথে ইহুদী ও খৃস্টানদের বর্তমান পন্থারও খণ্ডন হয়ে যায়। কসরণ, তাদের পন্থা শিরক থেকে মুক্ত নয়। যেহেতু তারা পবিত্র বস্তুসমূহকে হারাম সাবাস্ত করার মত মূর্ত্যাসুলভ ও মূশরিকসুলভ কুনাকু ও কুপ্রথায় লিপ্ত ছিল, তাই বলা হয়েছে যে) শনিবারের সম্মান (অর্থাৎ শনিবার দিন মৎস্য শিকারের নিষেধাজ্ঞা, যা পবিত্র বস্তু হারাম করার অংশবিশেষ, তাতো) শুধু তাদের জন্যই অপরিহার্য করা হয়েছিল, যারা এতে (কার্যত) বিরুদ্ধাচরণ করেছিল অর্থাৎ কেউ মেনে নিয়ে তদনুরূপ কাজ করেছিল এবং কেউ বিপরীত কাজ করেছিল। এখানে ইহুদী সম্প্রদায়কে বোঝানো হয়েছে। কেননা, পবিত্র বস্তুসমূহ হারাম করার অন্যান্য প্রকারের মত এ প্রকারটি শুধু ইহুদীদের বৈশিষ্ট্য ছিল। দীনে-ইব্রাহীমীতে এসব বস্তু হারাম ছিল না। এরপর আল্লাহর বিধানাবলীতে মতবিরোধ করা সম্পর্কে বলা হয়েছে—নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা কিয়ামতের দিন (কার্যত) তাদের পরস্পরের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন, যে ব্যাপারে তারা (দুনিয়াতে) মতবিরোধ করত।

### আনুযায়িক জ্ঞাতব্য বিষয়

১। (উম্মত) শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। এর প্রসিদ্ধ অর্থ দল ও সম্প্রদায়। হযরত ইবনে আক্বাস (রা) থেকে এখানে এ অর্থই বর্ণিত রয়েছে। অর্থাৎ হযরত ইব্রাহীম (আ) একাই এক ব্যক্তি, এক সম্প্রদায় ও কওমের গুণাবলী ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ছিলেন। 'উম্মত' শব্দের আরেক অর্থ হচ্ছে জাতির অনুসৃত নেতা ও গুণাবলীর আধার। কোন কোন তফসীরকারক এখানে এ অর্থই নিয়েছেন। **قائمت** শব্দের অর্থ আক্তাবহ। হযরত ইব্রাহীম (আ) উভয় গুণে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। অনুসৃত এ কারণে যে, সমগ্র বিশ্বের প্রসিদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা সবাই এক বাক্যে তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং তাঁর দীনের অনুসরণকে সম্মান ও গৌরবের বিষয় মনে করে। ইহুদী, খৃস্টান ও মুসলমানরা তো তাঁর প্রতি অগাধ ভক্তি-শ্রদ্ধা রাখেই, আরবের মূশরিকরা মূর্তি পূজা সত্ত্বেও এ মূর্তি সংহারকের প্রতি ভক্তিতে গদগদ এবং তাঁর ধর্মের অনুসরণকে গর্বের বিষয় গণ্য করে। হযরত ইব্রাহীম (আ) যে আল্লাহর আক্তাবহ ও অনুগত ছিলেন, এর বিশেষ স্বাতন্ত্র্য সেসমস্ত পরীক্ষার মাধ্যমে ফুটে উঠে, যেগুলোতে আল্লাহর এ দোস্ত উজ্জীর্ণ হন। নমস্কদের অগ্নি, পরিবার-



পরিজনকে জনশূন্য প্রান্তরে ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ, অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষার পর পাওয়া পুত্রকে কুরবানী করতে উদ্যত হওয়া—এসব স্বাতন্ত্র্যের কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে উল্লিখিত উপাধিসমূহে সম্মানিত করেন।

রসূলুল্লাহ (সা)-র প্রতি দীনে ইব্রাহীমীর অনুসরণের নির্দেশ : আল্লাহ্ তা'আলা যে শরীয়ত ও বিধানাবলী হযরত ইব্রাহীম (আ)-কে দান করেছিলেন, শেষ নবী (সা)-র শরীয়তও কতিপয় বিশেষ বিধান ছাড়া তদ্রূপ রাখা হয়েছে। যদিও রসূলুল্লাহ (সা) পয়গম্বর ও রসূলগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতর ; কিন্তু এখানে শ্রেষ্ঠতরকে স্বল্পশ্রেষ্ঠ ব্যক্তির অনুসরণ করার নির্দেশ দানের পেছনে দু'টি তাৎপর্য কার্যকর। এক. সেই শরীয়ত পূর্বে দুনিয়াতে এসে গেছে এবং সর্বজনবিদিত ও প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে। সর্বশেষ শরীয়তও যেহেতু তদ্রূপ হবার ছিল, তাই একে অনুসরণ শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে। দুই. আল্লামা যমখশরীর ভাষায় অনুসরণের এ নির্দেশও হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর সম্মানসমূহের মধ্যে একটি বিশেষ সম্মান। এর বৈশিষ্ট্যের প্রতি **ثُمَّ** (অতঃপর) শব্দের মাধ্যমে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ইব্রাহীম (আ)-এর গুণাবলী ও শ্রেষ্ঠত্ব একদিকে এবং এগুলোর মধ্যে সর্বোপরি গুণ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল ও হাবীবকে তাঁর দীনের অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ

بِآيَاتِهِ هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ

وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿٣٥﴾ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا

عُوقِبْتُمْ بِهِ ۗ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴿٣٦﴾ وَاصْبِرْ

وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ۗ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَلٰٓئِقٍ

مِمَّا يَبْكُرُونَ ﴿٣٧﴾ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ

مُحْسِنُونَ ﴿٣٨﴾

(১২৫) আপন পালনকর্তার পথের পানে আহ্বান করুন জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে ও উপদেশ গুনিয়ে উত্তমরূপে এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন পছন্দযুক্ত পন্থায়। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তাই ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে বিশেষভাবে জ্ঞাত আছেন, যে তাঁর পথ থেকে

বিদ্যুত হয়ে পড়েছে এবং তিনিই ভাল জানেন তাদেরকে, যারা সঠিক পথে আছে। (১২৬) আর যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর, তবে ঐ পরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করবে, যে পরিমাণ তোমাদেরকে কষ্ট দেওয়া হয়। যদি সবর কর, তবে তা সবরকারীদের জন্য উত্তম। (১২৭) আপনি সবর করবেন। আপনার সবর আল্লাহর জন্য ব্যতীত নয়, তাদের জন্য দুঃখ করবেন না এবং তাদের চক্রান্তের কারণে মন ছোট করবেন না। (১২৮) নিশ্চয় আল্লাহ তাদের সঙ্গে আছেন, যারা পরহিযাণর এবং যারা সৎ কর্ম করে।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

পূর্বাগর সম্পর্ক : রসুলুল্লাহ (স)-র উম্মত তাঁর বিধানাবলী বাস্তবায়িত করে রিসালতের কর্তব্য পালন করুক, এ উদ্দেশ্যেই পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে রিসালত ও নবুয়ত সমান করা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে স্বয়ং রসুলুল্লাহ (স)-কে রিসালতের দায়িত্ব পালন ও শিল্পাচার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপক শিক্ষার আওতায় সমস্ত মু'মিন মুসলমান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সংক্ষিপ্ত তফসীর নিম্নরূপ :

আপনি পালনকর্তার পথের ( অর্থাৎ দীন ইসলামের ) পানে ( লোকদেরকে ) জানের কথা ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে দাওয়াত দিন। ( 'হিকমত' বলে দাওয়াতের সে পছা বোঝানো হয়েছে, যাতে সম্বোধিত ব্যক্তির অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে অন্তরে ক্রিয়ামূল হতে পারে—এমন কৌশল অবলম্বন করা হয়। উপদেশের অর্থ এই যে, শুভাকাঙ্ক্ষার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কথা বলতে হবে। উত্তম উপদেশের মর্ম এই যে, কথার ভাষাও যেন নরম হয়, মর্মবিদারক ও অপমানকর না হয়। ) এবং তাদের সাথে উত্তম পছায় বিতর্ক করুন ( অর্থাৎ যদি তর্ক-বিতর্কের প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে তাও কঠোরতা, নিষ্ঠুরতা, প্রতিপক্ষের প্রতি দোষারোপ এবং অন্যায়-অবিচার থেকে মুক্ত হতে হবে। বস্তুত আপনার কর্তব্য এতটুকুই। এরপর এ খোঁজাখুঁজির গেছনে পড়বেন না যে, কে মানল এবং কে মানল না—এ কাজ আল্লাহ তা'আলার ) আপনার পালনকর্তা সে সম্পর্কে খুব জাত রয়েছেন যে তাঁর পথ থেকে বিদ্যুত হয়ে পড়েছে এবং তিনিই সঠিক পথের অনুগামীদেরও খুব জানেন আর যদি ( কোন সময় প্রতিপক্ষ শিক্ষা বিষয়ক তর্ক-বিতর্কের সীমা অতিক্রম করে কার্যত ঝগড়া এবং হাত অথবা মুখের মাধ্যমে কষ্ট দিতে প্রস্তুত হয়, তবে এক্ষেত্রে আপনার এবং আপনার অনুসারীদের জন্য প্রতিশোধ নেওয়া এবং সবর করা উভয়টি আয়েয। অতঃপর যদি প্রথমোক্ত পথ অবলম্বন করেন, অর্থাৎ প্রতিশোধ নাও, তবে ততটুকুই প্রতিশোধ নেবে, যতটুকু তোমাদের সাথে দুর্ব্যবহার করা হয়েছে ( এর বেশি কিছু করো না ) আর যদি ( শেষোক্ত পথ অবলম্বন কর, অর্থাৎ নিপীড়নের পর ) সবর কর, তবে তা ( সবর করা ) সবরকারীদের পক্ষে খুবই উত্তম। কারণ, প্রতিপক্ষ ও দর্শক সবার উপরই এর উত্তম প্রভাব প্রতিফলিত হয় এবং পরকালেও বিরাট সওয়াব পাওয়া যায়। আর ( সবর করা যদিও সবার পক্ষেই উত্তম, কিন্তু আপনার মাহাত্ম্যের দিক দিয়ে বিশেষভাবে আপনাকে আদেশ করা হচ্ছে যে, আপনি প্রতিশোধের পথ বেছে নেবেন না ; বরং ) আপনি সবর করুন। আপনার সবর করা আল্লাহ তা'আলারই বিশেষ তওফীকের বদৌলতে হয়ে থাকে ( তাই আপনি নিশ্চিত থাকুন

যে, সবর করা আপনার পক্ষে কঠিন হবে না) এবং তাদের (অর্থাৎ তাদের বিশ্বাস স্থাপন না করার কারণে অথবা মুসলমানদেরকে কণ্ট দেওয়ার) কারণে আপনি দুঃখ করবেন না, এবং তারা যেসব চক্রান্ত করে, তজ্জন্য মন ছোট করবেন না। (তাদের বিরোধী চক্রান্ত দ্বারা আপনার কোন ক্ষতি হবে না। কেননা, আপনি সৎ কর্ম ও আল্লাহ্‌ জীতির গুণে গুণান্বিত এবং) আল্লাহ্‌ এমন লোকদের সঙ্গে রয়েছেন (অর্থাৎ তাদের সাহায্য করেন) যারা আল্লাহ্‌-ভীরু এবং সৎকর্মপরায়ণ।

### আনুষ্ঠানিক জ্ঞাতব্য বিষয়

দাওয়াত ও প্রচারের মূলনীতি এবং পূর্ণাঙ্গ কার্যক্রম : আলোচ্য আয়াতে দাওয়াত ও প্রচারের পূর্ণাঙ্গ কার্যক্রম, মূলনীতি ও শিষ্টাচারের পূর্ণ বিবরণ অল্প কথায় বিধৃত হয়েছে। তফসীর করতুবীতে রয়েছে, হযরত হরম ইবনে হাইয়ানের মৃত্যুর সময় তাঁর আত্মীয়-স্বজনরা অনুরোধ করল : আমাদেরকে কিছু ওসীয়াত করুন। তিনি বললেন : 'মানুষ সাধারণত অর্থসম্পদের ব্যাপারে ওসীয়াত করে। অর্থসম্পদ আমার কাছে নেই। কিন্তু আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্‌ তা'আলার আয়াতসমূহ বিশেষত সূরা নাহলের সর্বশেষ আয়াতসমূহের ব্যাপারে ওসীয়াত করছি। এগুলোকে শক্তভাবে আঁকড়ে থাকবে। উল্লিখিত আয়াতসমূহই হচ্ছে সে আয়াত।

ع-এর শাব্দিক অর্থ ডাকা, আহবান করা। পয়গম্বরগণের সর্বপ্রথম কর্তব্য হচ্ছে মানবজাতিকে আল্লাহ্র দিকে আহবান করা। এরপর নবী ও রসুলের সমস্ত শিক্ষা হচ্ছে এ দাওয়াতেরই ব্যাখ্যা। কোরআন পাকে রসুলুল্লাহ্‌ (সা)-র বিশেষ পদবী হচ্ছে আল্লাহ্র দিকে আহবানকারী হওয়া। সূরা আহ্‌যাবের ৪৬তম আয়াতে বলা হয়েছে :

وَدَاعِيَ إِلَى اللَّهِ بِأَذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا

বলা হয়েছে : يَا قَوْمَنَا اجْبِهُوْا دَاعِيَ اللَّهِ

রসুলুল্লাহ্‌ (সা)-র পদাঙ্ক অনুসরণ করে আল্লাহ্র দিকে দাওয়াত দেওয়া উম্মতের উপরও করণ করা হয়েছে। সূরা আলে ইমরানে আছে :

يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

তোমাদের মধ্যে একটি দল এমন থাকা উচিত, যারা মানুষকে মঙ্গলের প্রতি দাওয়াত দেবে (অর্থাৎ) সৎ কাজের আদেশ করবে এবং অসৎ কাজে নিষেধ করবে।

অন্য আয়াতে আছে :

وَمِنْ أَحْسَنِ قَوْلٍ دَعَا إِلَى اللَّهِ

সে ব্যক্তির চাইতে উত্তম কে হবে, যে আল্লাহ্র দিকে দাওয়াত দেয় ?

دَعْوَاتِ إِلَىٰ دَعْوَاتِ إِلَىٰ اللَّهِ কোন সময়  
বর্ণনায় বিষয়টিকে কোন সময়  
এবং কোন কোন সময়  
শিরোনাম দেওয়া হয়।  
সবগুলোর সারমর্ম এক। কেননা, আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেওয়ার দ্বারা তাঁর দীন এবং  
সরল পথের দিকেই দাওয়াত দেওয়া উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।

(পালনকর্তা) رَبِّ (পালনকর্তা) — إِلَىٰ سَيِّدِ رَبِّكَ

উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সা)-র প্রতি এর সম্বন্ধ করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে  
যে, দাওয়াতের কাজটি লালন ও পালনের সাথে সম্পর্ক রাখে। আল্লাহ তা'আলা যেমন  
তাঁকে পালন করেছেন, তেমনি তাঁরও প্রতিপালনের ভঙ্গিতে দাওয়াত দেওয়া উচিত। এতে  
প্রতিপক্ষের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে এমন পছা অবলম্বন করতে হবে যাতে, তার উপর বোঝা  
না চাপে এবং অধিকতর ক্রিয়াশীল হয়। স্বয়ং দাওয়াত শব্দটিও এই কর্ম প্রকাশ করে।  
কেননা, পয়গম্বরের দায়িত্ব শুধু বিধি-বিধান পৌঁছিয়ে দেওয়া ও গুনিয়ে দেওয়াই নয়, বরং  
লোকদেরকে তা পালন করার দাওয়াত দেওয়াও বটে। বলা বাহুল্য। যে ব্যক্তি কাউকে  
দাওয়াত দেয়, সে তাকে এমন সম্বোধন করে না, যাতে তার মনে বিরক্তি ও ঘৃণা জন্মে অথবা  
তার সাথে ঠাট্টা-বিদ্রুপ ও তামাশা করে না।

بِأَحْكَامِهِ — 'হিকমত' শব্দটি কোরআন পাকে অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

এস্থলে কোন কোন তফসীরবিদ হিকমতের অর্থ কোরআন, কেউ কেউ কোরআন ও  
সম্মাহ এবং কেউ কেউ অকাটা মুক্তি-প্রমাণ স্থির করেছেন। রাহুল মা'আনী বাহরে  
মুহীতের বরাত দিয়ে হিকমতের তফসীর নিম্নরূপ করেছেন :  
أَنَّهَا الْكَلَامُ الْمَوْجِبُ

الْوَاتِعِ مِنَ النَّفْسِ أَجْمَلِ مَوْجِعِ  
হয়, যা মানুষের মনে আসন করে নেয়। এ তফসীরের মধ্যে সব উক্তি সন্নিবেশিত  
হয়ে যায়। রাহুল বয়ানের গ্রন্থকারও প্রায় এই অর্থটিই এরূপ ভাষায় বর্ণনা করেছেন :  
“হিকমত বলে সে অন্তর্দৃষ্টিকে বোঝানো হয়েছে, যার সাহায্যে মানুষ অবস্থার তাগিদ  
জেনে নিলে তদনুযায়ী কথা বলে। এমন সময় ও সুযোগ খুঁজে নেয় যে, প্রতিপক্ষের উপর  
বোঝা হয় না। নব্বতার স্থলে নব্বতা এবং কঠোরতার স্থলে কঠোরতা অবলম্বন করে।  
যেখানে মনে করে যে, স্পষ্টভাবে বললে প্রতিপক্ষ লজ্জিত হবে সেখানে ইঙ্গিতে কথা  
বলে কিংবা এমন ভঙ্গি অবলম্বন করে, যদ্বরূপ প্রতিপক্ষ লজ্জার সম্মুখীন হয় না এবং  
তার মনে একগুয়েমিভাবও সৃষ্টি হয় না।”

وَعِظَةٌ — وَعِظَةٌ — وَعِظَةٌ — এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে কোন গুণেচ্ছামূলক

কথা এমনভাবে বলা, যাতে প্রতিপক্ষের মন তা কবুল করার জন্য নরম হয়ে যায়। উদাহরণত  
তার কাছে কবুল করার সওয়াব ও উপকারিতা এবং কবুল না করার শাস্তি ও অপকারিতা  
বর্ণনা করা—(কামুস, মুফরাদাতে-রাগিব)

الْحَسَنَةُ-এর অর্থ বর্ণনা ও শিরোনাম এমন হওয়া যে, প্রতিপক্ষের অন্তর নিশ্চিত হয়ে যায়, সন্দেহ দূর হয়ে যায় এবং অনুভব করে যে, এতে আপনার কোন স্বার্থ নেই-- শুধু তার শুভেচ্ছার খাতিরে বলছেন।

مَرْعَفَةٌ শব্দ দ্বারা শুভেচ্ছামূলক কথা কার্যকরী ভঙ্গিতে বলার বিষয়টি ফুটে উঠেছিল। কিন্তু শুভেচ্ছামূলক কথা মাঝে মাঝে মর্মবিদারক ভঙ্গিতে কিংবা এমনভাবে বলা হয় যে, প্রতিপক্ষ অপমানবোধ করে।--(রাহুল মা'আনী)

এ পছন্দ পন্নিত্যাগ করার জন্য حَسَنَةٌ শব্দটি সংযুক্ত করা হয়েছে।

جَادِلٌ--وَجَادِرٌ تَوْمٌ بِالتِّي هِيَ أَحْسَنُ শব্দটি مجادلة ধাতু থেকে উদ্ভূত।

এখানে بِالتِّي هِيَ أَحْسَنُ বলে আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক বোঝানো হয়েছে।

-এর অর্থ এই যে, যদি দাওয়াতের কাজে কোথাও তর্ক-বিতর্কের প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে তর্ক-বিতর্কও উত্তম পন্থায় হওয়া দরকার। রাহুল মা'আনীতে বলা হয়েছে, উত্তম পন্থায় মানে এই যে, কথা-বার্তায় নম্রতা ও কমনীয়তা অবলম্বন করতে হবে। এমন যুক্তি-প্রমাণ পেশ করতে হবে, যা প্রতিপক্ষ বুঝতে সক্ষম হয়। বহল প্রচলিত প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত বাস্তব-বলীর মাধ্যমে প্রমাণ দিতে হবে, যাতে প্রতিপক্ষের সন্দেহ বিদূরিত হয় এবং সে হঠকারিতার পথ অবলম্বন না করে। কোরআন পাকের অন্যান্য আয়াত সাক্ষ্য দেয় যে, 'উত্তম পন্থায় তর্ক-বিতর্ক' শুধু মুসলমানদের সাথেই বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত নয়; বরং আহলে কিতাব সম্পর্কে বিশেষভাবে কোরআন বলে যে,

وَلَا تَجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ--অন্য আয়াতে

تَوَلَّوْا لَهُمْ تَوَلَّوْا لَهُمْ নিদেশ নিয়ে আরও বলা হয়েছে

যে, ফিরাদুনের মত অবাধ্য কাফিরের সাথেও নম্র আচরণ করা উচিত।

দাওয়াতের মূলনীতি ও বিল্টাচার : আলোচ্য আয়াতে দাওয়াতের জন্য তিনটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে--এক, হিকমত। দুই, সদুপদেশ এবং তিন, উত্তম পন্থায় তর্ক-বিতর্ক। কোন কোন তফসীলকারক বলেন : এ তিনটি বিষয় তিন প্রকার প্রতিপক্ষের জন্য বণিত হয়েছে। হিকমতের মাধ্যমে দাওয়াত জানী ও সুখীজনের জন্য, উপদেশের মাধ্যমে দাওয়াত জনসাধারণের জন্য এবং বিতর্কের মাধ্যমে দাওয়াত তাদের জন্য যাদের অন্তরে সন্দেহ ও বিধা রয়েছে অথবা যারা হঠকারিতা ও একগুঁয়েমির কারণে কথা মেনে নিতে সম্মত হয় না।

হাকীমুল-উশ্মত হযরত খানজী (র) বয়ানুল কোরআনে বলেন : এ তিনটি বিষয় পৃথক পৃথক তিন প্রকার প্রতিপক্ষের জন্য হওয়া আয়াতের বর্ণনা পদ্ধতির দিক দিয়ে অযৌক্তিক মনে হয়।

বাহ্যিক অর্থ এই যে, দাওয়াতের এই সূত্রে পন্থাগুলো প্রত্যেকের জন্যই ব্যবহার্য। কেননা, দাওয়াতে সর্বপ্রথম হিকমতের মাধ্যমে প্রতিপক্ষের অবস্থা যাচাই করে তদনু-যায়ী শব্দ চয়ন করতে হবে। এরপর এসব বাক্য শুভেচ্ছা ও সহানুভূতির মনোভাব নিয়ে এমন যুক্তি-প্রমাণ পেশ করতে হবে, যা দ্বারা প্রতিপক্ষ নিশ্চিত হতে পারে। বর্ণনা-ভঙ্গি ও কথাবার্তা সহানুভূতিপূর্ণ ও নরম রাখতে হবে, যাতে প্রতিপক্ষ নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করে যে, সে যাকিছু বলছে, আমারই উপকারার্থে এবং হিতাকাঙ্ক্ষাবশত বলছে—আমাকে শরমিন্দা করা অথবা আমার মর্যাদাকে আহত করা তার লক্ষ্য নয়।

অবশ্য রাখল মা'আনীর গ্রন্থকার এ স্থলে একটি সুন্দর তত্ত্ব বর্ণনা করে বলেছেন যে, আয়াতের বর্ণনা পদ্ধতি থেকে জানা যায় আসলে দু'টি বিষয়ই দাওয়াতের মূলনীতি—হিকমত ও উপদেশ। তৃতীয় বিষয় বিতর্ক মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে দাওয়াতের পথে কোন কোন সময় এরও প্রয়োজন দেখা দেয়।

এ ব্যাপারে উপরোক্ত গ্রন্থকারের যুক্তি এই যে, যদি তিনটি বিষয়ই মূলনীতি হত, তবে স্থানের তাগিদ অনুসারে তিনটি বিষয়কেই **عطف** যোগে এভাবে বর্ণনা করা হত **بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَالْجِدَالِ الْأَحْسَنِ** কিন্তু কোরআন পাক হিকমত ও উপদেশকে **عطف** যোগে একই পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছে কিন্তু বিতর্কের জন্য আলাদা বাক্য **جَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ** অবলম্বন করেছে। এতে জানা যায় যে, শিক্ষা বিষয়ক বিতর্ক আসলে দাওয়াতের অন্তর্ভুক্ত অথবা শর্ত নয়; বরং দাওয়াতের পথে সংঘটিত ব্যাপারাদি সম্পর্কে একটি নির্দেশ মাত্র। যেমন, এর পরবর্তী আয়াতে সবার করার কথা বলা হয়েছে। কেননা, দাওয়াতের পথে মানুষ যে জালা-যত্না দেয়, তত্ননা সবার করা অপরিহার্য।

মোটকথা, দাওয়াতের মূলনীতি দু'টি—হিকমত ও উপদেশ। এগুলো থেকে কোন দাওয়াত খালি থাকা উচিত নয়, আলিম ও বিশেষ শ্রেণীর লোকদেরকে দাওয়াত দেওয়া হোক কিংবা সর্বসাধারণকে দাওয়াত দেওয়া হোক। তবে দাওয়াতের কাজে মাঝে মাঝে এমন লোকদেরও সম্মুখীন হতে হয়, যারা সন্দেহ ও বিধাঘর্ষে জড়িত থাকে এবং দাওয়াতদানকারীর সাথে তর্ক-বিতর্ক করতে উদ্যত হয়। এমতাবস্থায় তর্ক-বিতর্ক করার

শিক্ষা দান করা হয়েছে। কিন্তু সাথে সাথে **بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ** এর শর্ত

জুড়ে দিয়ে বলা হয়েছে যে, যে তর্ক-বিতর্ক এ শর্তের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়, শরীয়তে তার কোন মর্যাদা নেই।

দাওয়াতের পরামর্শসূত্র শিষ্টাচার : দাওয়াত প্রকৃতপক্ষে পরামর্শরূপে দায়িত্ব। আলিমরা যেহেতু তাঁদের স্থানাভিষিক্ত, তাই তাঁরা এ পদমর্যাদা ব্যবহার করেন। অতএব দাওয়াতের আদব ও রীতিনীতি তাদের কাছ থেকেই শিক্ষা করা অপরিহার্য। যে দাওয়াত তাঁদের কর্মপদ্ধতি থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে, সেটি দাওয়াতের পরিবর্তে 'আদাওয়াত' (শব্দ ত্যা) এবং কলহ-বিবাদের কারণ হয়ে যায়।



প্রতি! আমার মধ্যে কোন পথপ্রস্তুত নেই। আমি তো বিশ্ব পালনকর্তার তরফ থেকে প্রেরিত রসূল ও দূত। (তোমাদের উপকারের জন্যই আমার সকল প্রচেষ্টা।)

তাঁর পরবর্তী আঞ্জাহর দ্বিতীয় রসূল হযরত হদ (আ)-কে তাঁর সম্প্রদায় মু'জিয়া দেখা সত্ত্বেও হঠকান্নিতা করে বলল: আপনি নিজ দাবীর পক্ষে কোন প্রমাণ পেশ করেন নি। আমরা আপনার কথায় আমাদের উপাস্য দেবমূর্তিগুলোকে পরিত্যাগ করতে পারি না। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে যে, আপনি আমাদের উপাস্যদের প্রতি যে মূল্যবোধ প্রদর্শন করেছেন, তার কারণে আপনার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে।

হযরত হদ (আ) এসব কথা শুনে জওয়াব দিলেন:

اِنِّي اَشْهَدُ اللّٰهَ وَاَشْهَدُوْا اِنِّيْ بَرِيٌّ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ ۝

আল্লাহকে সাক্ষী করছি এবং তোমরাও সাক্ষী থাক, আমি ঐসব মূর্তি থেকে মুক্ত ও বিন্মুখ, যেগুলোকে তোমরা আমার আঞ্জাহর অংশীদার সাব্যস্ত করেছ।—(সূরা হদ)

সূরা আ'রাফে আছে যে, তাঁর সম্প্রদায় তাঁকে বলল:

اِذَا لَنَرَاكَ فِيْ سَفَاھَةٍ وَاِذَا لَنَنظُرَكَ مِنْ اَلْكَاٰذِبِيْنَ

আপনাকে নির্বোধ মনে করি এবং আমাদের ধারণা এই যে, আপনি একজন মিথ্যাবাদী।

স্বজাতির এ ধরনের পীড়াদায়ক সম্বোধনের জওয়াবে আঞ্জাহর রসূল (স) না তাদের প্রতি কোন বিদ্রূপবাক্য উচ্চারণ করেন এবং না তাদের বিপথগামিতা, মিথ্যা ও আঞ্জাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা ভাষণের কোন কথা বলেন; শুধু এতটুকু জওয়াব দেন যে,

يٰۤاَقْوَمِ لَيْسَ بِيْ سَفَاھَةً وَّلٰكِنِّيْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ

সম্প্রদায়, আমার মধ্যে কোন নিবুদ্ধিতা নেই। আমি তো রাসূল 'আলামীনের তরফ থেকে প্রেরিত একজন রসূল।

হযরত শোয়াইব (আ) পরগম্বরণের চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী স্বজাতিকে আঞ্জাহর দিকে দাওয়াত দেন এবং ওজন ও মাপে কম দেওয়ার যে একটি বড় দোষ তাদের মধ্যে ছিল, তা থেকে বিরত হওয়ার উপদেশ দেন। জওয়াবে তাঁর সম্প্রদায় ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে এবং তাঁকে অপমানকর সম্বোধন করে বলে:

يٰۤاَشْعِيْبُ اَصْلُوْكَ تَاْمُرُكَ اَنْ تَقْرٰى مَا يَعْبُدُ اٰبَاؤَنَا وَاَنْ نَّفْعَلَ فِيْۤ اَمْوَالِنَا مَا نَهَاۤءُ اِنَّكَ لَآتٰتُ الْعٰلِمِيْنَ الرَّشِيْدُ ۝

হে শোয়াইব, আপনার নামায কি আপনাকে আদেশ দেয় যে, আমরা বাপদাদার উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করি এবং আমরা যেসব ধনসম্পদের মালিক, সেগুলোতে নিজেদের ইচ্ছামত যা খুশী, তা না করি? বাস্তবিকই আপনি বড় ভানী ও ধামিক!



প্রথমে তো তারা এরূপ ভবেঁসনা করল যে, আপনার নামাযই আপনাকে নিবুঁদ্ধিতা শিক্কা দয়। দ্বিতীয় এই যে, ধনসম্পদ আমাদের। এগুলোর লেন-দেন এবং ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে আপনার অথবা আল্লাহর তরফ থেকে হস্তক্ষেপ করার অধিকার জন্মায় কিভাবে? বরং এগুলো যদুচ্ছা ব্যবহার করার অধিকার তো আমাদেরই। তৃতীয় বাক্যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে বলা হয়েছে যে, আপনি বড়ই বুদ্ধিমান, বড়ই ধার্মিক।

জানা গেল যে, ধর্মবিবাক্তিত অর্থনীতির পূজারি কেবলমাত্র আমাদের এ যুগেই জন্মগ্রহণ করেনি, তাদেরও কিছু সংখ্যক পূর্ববর্তী মনীষী রয়েছে, যাদের মতবাদ তাই ছিল, যা আজকের কতিপয় নামধারী মুসলমান বলছে। তাদের বক্তব্য এই যে, আমরা মুসলমান। ইসলাম আমাদের ধর্ম, কিন্তু অর্থনীতিতে আমরা সমকালীন বিজ্ঞানসম্মত পন্থা যথা ধনতন্ত্র বা সমাজতন্ত্র অনুসরণ করব। এতে ইসলামের কি আসে যায়? মোটকথা, জালিম কওমের ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও পৌড়াদায়ক বাক্যবাণের জওয়াবে আল্লাহর রসূল কি বলেন, দেখুন :

قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ بَيْئَةِ مِنْ رَبِّي وَرَزَقْنِي مَلَّةَ  
رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكُمْ إِلَىٰ مَا أَنهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ  
إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ  
الْمُنَابَا

হে আমার সম্প্রদায়, অচ্ছা বল তো যদি আমি পালনকর্তার পক্ষ থেকে প্রমাণের উপর কায়ম থাকি। তিনি আমাকে নিজেই পক্ষ থেকে উত্তম ধন অর্থাৎ নব্বয়ত দান করে থাকেন। এমতাবস্থায় আমি কিরূপে তা প্রচা় করব না এবং আমি নিজেও তো তোমাদেরকে যা বলি, তার বিরুদ্ধে কাজ করি না। আমি শুধু সংশোধন চাই যতটুকু আমার সাধ্যে রয়েছে। সংশোধন ও কর্মের যে তওফীক আমার হয়, তা একমাত্র আল্লাহর সাহায্যে। আমি তাঁর উপরই ভরসা করি এবং সব ব্যাপারে তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন করি।

হযরত মুসা (আ)-কে ফিরাতুনের কাছে প্রেরণ করার সময় আল্লাহর পক্ষ থেকে নতুন কথা বলার যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তা পুরোপুরি পালিত হওয়া সত্ত্বেও মুসা (আ)-র সাথে ফিরাতুনের সম্বোধন ছিল এরূপ :

قَالَ لَمْ تَرْبِكْ فِينَا وَ لِيَدَا وَ لِهَيْتَ فِينَا مِنْ عَمْرِكَ سَفِينٍ وَ فَعَلْتَ  
فَعَلْتِكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَ أَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ

ফির্‌আউন বলল : আমরা কি শৈশবে তোমাকে লালন-পালন করিনি ? তুমি বহুরের পর বছর আমাদের মধ্যে অবস্থান করেছ এবং তুমি এমন কাণ্ড করেছিলে, যা করছিলে। ( অর্থাৎ কিবতীকে হত্যা করেছিলে ) তুমি বড় অকৃতজ্ঞ !

এতে মুসা (আ)-র কাছে এ অনুগ্রহও প্রকাশ করেছে যে, আমরা শৈশবে তোমাকে লালন-পালন করেছি। বড় হয়ে যাওয়ার পরও বেশ অনেক দিন তুমি আমাদের কাছে অবস্থান করেছ। মুসা (আ)-র হাতে জনৈক কিবতী অনিচ্ছাকৃতভাবে নিহত হয়েছিল। ফির্‌আউন সে ঘটনার কথা উল্লেখ করে স্বীয় অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে এ কথাও বলেছে যে, তুমি কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছ।

এখানে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আভিধানিক অর্থ অকৃতজ্ঞ হতে পারে। উদ্দেশ্য এই যে, আমরা তো তোমার প্রতি অনেক অনুগ্রহ করেছি, কিন্তু তুমি আমাদের এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছ। এটা অকৃতজ্ঞতা। ফির্‌আউনের বক্তব্য পারিতোষিক অর্থেও হতে পারে। কেননা, ফির্‌আউন স্বয়ং খোদার দাবী করতে। সুতরাং যে ব্যক্তি তার খোদারী অস্বীকার করতে, তার দৃষ্টিতে সে ব্যক্তি তো কাফিরই হয়ে যেতো।

এখন এস্থলে হয়রত মুসা (আ)-র জওয়ান শুনুন, যা পরগম্বরসুলত নীতি-নিয়ম এবং চরিত্রের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এতে সর্বপ্রথম তিনি নিজের দু'টি ও দুর্বলতা স্বীকার করে নেন; অর্থাৎ এক সময় তিনি জনৈক ইসরাইলী ব্যক্তিকে হত্যার উদ্দেশ্যে আক্রমণরত জনৈক কিবতীকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার জন্য তাকে একটি ঘুমি মেরেছিলেন। ফলে তার প্রাণ-বায়ু বের হয়ে যায়। এ হত্যাকাণ্ড যদিও মুসার ইচ্ছাকৃত ছিল না, কিন্তু এর পক্ষে কোন ধর্মীয় ভাগিদও ছিল না। মুসা (আ)-র শরীয়তের আইনেও কিবতী হত্যাকাণ্ড ছিল না।

তাই প্রথমে স্বীকার করেন যে, فَعَلَتْهَا إِذَاوَأَنَا مِنَ الظَّالِمِينَ

অর্থাৎ আমি একাজটি তখন করেছিলাম, যখন আমি অবাধ ছিলাম।—( সূরা শু'আরা )

উদ্দেশ্য এই যে, এ কাজটি নব্বয়তপ্রাপ্তির পূর্বে ঘটে গিয়েছিল। তখন এ সম্পর্কে আলাহর কোন নির্দেশ আমার জানা ছিল না। এরপর বলেন :

فَرَوْنُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُمْ نُوْهُبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ

এরপর আমি ভীত হয়ে তোমাদের কাছ থেকে পালিয়ে গেলাম। অতঃপর আমার পালনকর্তা আমাকে বুদ্ধিমত্তা দান করলেন এবং আমাকে পরগম্বরগণের অন্তর্ভুক্ত করে দিলেন।—( সূরা শু'আরা )

অতঃপর ফির্‌আউনের অনুগ্রহ প্রকাশের উত্তরে বললেন যে, তোমার অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করা মথার্থ নয়। কেননা, আমার লালন-পালনের ব্যাপারটি তোমারই জুলুম ও উপীড়নের ফলশ্রুতি ছিল। তুমি ইসরাইল বংশের ছেল-সন্তানদেরকে হত্যার আদেশ জারি করে রেখেছিলে। তাই আমার জননী বাধ্য হয়ে আমাকে নদীতে নিক্ষেপ করেন

এবং তোমার গৃহে পৌঁছান ঘটনা ঘটে। বলেছেন : **وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ**

**مَدَدْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ** — (আমাকে লাজন-পালন করার) যে নিয়ামতের ঋণভার তুমি আমায় উপর রাখছ, তার কারণ এই যে তুমি ইসরাঈল বংশীয়দেরকে দাসত্বের নিগড়ে আবদ্ধ করে রেখেছিলে।

এরপর ফিরাউন যখন প্রসন্ন করল : **وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ** অর্থাৎ বিশ্বপালক

কে এবং কি? তখন তিনি উত্তরে বললেন : তিনি আসমান, যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যস্থিত সবকিছুর পালনকর্তা। এতে ফিরাউন বিদ্রুপের স্বরে উপস্থিত লোকদেরকে বলল :

**أَلَا تَطَّعُرُونِ** — অর্থাৎ তোমরা কি শুনতে পাচ্ছ না সে কিরূপ বোকার মত কথাবার্তা

বলে যাচ্ছে? তখন মুসা (আ) বললেন : **رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأُولِينَ** অর্থাৎ

তোমাদের এবং তোমাদের বাপদাদাদেরও তিনিই পালনকর্তা রুব।

ফিরাউন বিরক্ত হয়ে বলল : **إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْلُونٌ**

অর্থাৎ এই ব্যক্তি যে তোমাদের প্রতি আল্লাহর রসূল হওয়ার দাবী করছে, সে বন্ধ পাগল।

পাগল উপাধি দেওয়া সত্ত্বেও প্রতিপক্ষের পাগলামি এবং নিজেস্ব বুদ্ধিমত্তা প্রমাণ করার পরিবর্তে মুসা (আ) সেদিকে জ্বরেপণ করেন নি, বরং আল্লাহ রাসূল 'আলামীনের

আলম ও একটি গুণ প্রকাশ করে বললেন : **رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا**

**بَيْنَهُمَا** — তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের এবং এতদুভয়ের মধ্যকার সব-

কিছুর পালনকর্তা, যদি তোমরা বুঝ। — (সূরা শু'আরা)

সূরা শু'আরার তিন রুকুতে পরিব্যাপ্ত এটি হচ্ছে হযরত মুসা (আ) ও ফিরাউনের মধ্যকার ফিরাউনের দরবারে অনুষ্ঠিত একটি দীর্ঘ কথোপকথন। আল্লাহর প্রিয় রসূল মুসা (আ)-র এই কথোপকথনটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখুন, এতে না কোন ভাব-বেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে, না কষ্ট কথার জওয়াব আছে এবং না তার কষ্ট কথার জওয়াবে কোন কষ্টকথা বলা হয়েছে; বরং আগা-গোড়া আল্লাহ তা'আলার গুণাবলী ঐ প্রচার কাজ ব্যস্ত হয়েছে।

এ হচ্ছে একও'য়ে ও হঠকারী সম্প্রদায়ের সাথে পয়গম্বরগণের তর্ক-বিতর্কের সংক্ষিপ্ত নমুনা এবং এ হচ্ছে কোরআন বর্ণিত উত্তম পছন্দ তর্ক-বিতর্কের বাস্তব ব্যাখ্যা।

তর্ক-বিতর্ক ছাড়া দাওয়াত ও প্রচারের কাজে পয়গম্বরগণ প্রত্যেক ব্যক্তি ও স্থানোপ-যোগী কথা বলার ব্যাপারে যে সব বিভ্রাজনোচিত নীতি, ভঙ্গি, হিকমত ও উপযোগিতার

প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন এবং দাওয়াতকে জনপ্রিয়, কার্যকরী ও স্থায়ী করার জন্য যেসব কর্ম-পন্থা গ্রহণ করেছেন, সেগুলোই আসলে দাওয়াতের প্রাণ। এর বিস্তারিত বিবরণ রসুলুল্লাহ্ (সা)-র সমগ্র শিক্ষার মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে। নমুনা হিসাবে কয়েকটি বিষয় দেখুন।

রসুলুল্লাহ্ (সা) দাওয়াত, প্রচার ও ওয়াজ-নসীহতে শ্রোতাদের উপর যাতে বোঝা না চাপে, সেদিকে খুব খেয়াল রাখতেন। সাহায্যে কিরাম ছিলেন তাঁর আশিক। তাঁরা তাঁর কথা-বার্তা শুনে বিরক্তিবোধ করবেন এরূপ সম্ভাবনা ছিল না, কিন্তু তাঁদের বেলায়ও তাঁর অভ্যাস ছিল এই যে, প্রত্যহ ওয়াজ-নসীহত করতেন না—সম্প্রত্যহের কোন কোন দিন করতেন, যাতে শ্রোতাদের কাজ-কারবারে বিঘ্ন সৃষ্টি না হয় এবং তাদের মনের উপর বোঝা না চাপে।

সহীহ বুখারীতে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ বর্ণনা করেন, রসুলুল্লাহ্ (সা) সম্প্রত্যহের কোন কোন দিনই ওয়াজ করতেন, যাতে আমরা বিরক্ত না হয়ে পড়ি। তিনি অন্যদেরকেও এ নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন।

হযরত আনাসের রেওয়াজেতে রসুলুল্লাহ্ (সা) বলেন : **يسروا ولا تمسروا** —সহজ কর, কঠিন করো না। মানুষকে আত্মাহ্বয় রহমতের সুসংবাদ শোনাও, নিরাশ কিংবা পালিয়ে যেতে বাধ্য করো না।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন : তোমাদের রস্বানী দার্শনিক আলিম ও ফকীহ হওয়া উচিত। সহীহ বুখারীতে এ উক্তি উদ্ধৃত করে 'রস্বানী' শব্দের তফসীর করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি দাওয়াত প্রচার ও শিক্ষাদানে মাজন-পালনের নীতি অনুযায়ী প্রথমে সহজ সহজ বিষয় বর্ণনা করে, অতঃপর লোকেরা এসব বিষয়ে অভ্যস্ত হয়ে গেলে অন্যান্য কঠিন বিষয় বর্ণনা করে, তাকে 'আলিমে-রস্বানী' বলা হয়। আজকাল ওয়াজ ও প্রচারের প্রভাব খুব কম প্রতিফলিত হয়। এর বড় কারণ এই যে, সাধারণত এ কাজে যারা ব্রতী, তারা এসব নীতি-নীতির প্রতি বড় একটা লক্ষ্য রাখে না। সুদীর্ঘ বক্তৃতা সময়ে-অসময়ে উপদেশ, প্রতিপক্ষের অবস্থা জানা ব্যতিরেকেই তাকে কোন কাজ করতে বাধ্য করা তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে।

রসুলুল্লাহ্ (সা) দাওয়াত ও সংশোধনের কাজে এ দিকটির প্রতিও সমগ্র লক্ষ্য রাখতেন যে, প্রতিপক্ষ যেন লজ্জিত ও অপমানিত না হয়। এ জন্যই যখন কোন ব্যক্তিকে কোন ভুল মন্দ কাজে লিপ্ত দেখতেন, তখন তাকে সরাসরি সম্বোধন করার পরিবর্তে উপস্থিত সবাইকে লক্ষ্য করে বলতেন : **ما بال اقوام يفعلون كذا** —লোকদের কি হয়েছে যে, তারা অমুক কাজ করে ?

এই ব্যাপক সম্বোধনে যাকে শোনানো আসল লক্ষ্য হত, সে-ও শুনে নিত এবং মনে মনে লজ্জিত হয়ে সংশ্লিষ্ট কাজটি পরিত্যাগ করতে যত্নবান হতো।

প্রতিপক্ষকে লজ্জা থেকে বাঁচানোই ছিল পয়গম্বরগণের সাধারণ অভ্যাস। এ কারণেই তাঁরা মাঝে মাঝে প্রতিপক্ষের কাজকে নিজের কাজ বলে প্রকাশ করে সংশোধনের চেষ্টা করতেন। সূরা ইয়্যাসীনে বলা হয়েছে :

وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي

সৃষ্টিকর্তার ইবাদত করব না? বলা বাহুল্য, রসূলের এ দু'টি সদাসর্বদাই ইবাদতে মশগুল থাকতেন। তবে যে প্রতিপক্ষ ইবাদতে মশগুল ছিল না, তাকে শোনানোই উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু তিনি কাজটিকে নিজের কাজ বলে জাহির করেছেন।

দাওয়াতের অর্থ অপরাধকে নিজের কাছে ঢাকা—তুধু তার দোষ বর্ণনা করা নয়। এ ডাকা তখনই হতে পারে, যখন বক্তা ও তার সম্বোধিতদের মধ্যে কোন যোগসূত্র থাকে।

এজন্যই কোরআন পাকে পয়গম্বরগণের দাওয়াতের শিরোনাম অধিকাংশ ক্ষেত্রে يَا قَوْم বলে শুরু করা হয়েছে। এতে শ্রাতুসুলভ অভিমতা প্রথমে প্রকাশ করে পরে সংশোধন-মূলক কথা—বার্তা বলা হয়। অর্থাৎ আমরা তো একই সমাজভুক্ত লোক। কাজেই একের মনে অন্যের প্রতি কোনরূপ ঘৃণা থাকা উচিত নয়। এ কথা বলে পয়গম্বরগণ সংশোধনের কাজ আরম্ভ করেন।

রসূলুল্লাহ্ (স) দাওয়াতের যে চিঠি রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছে প্রেরণ করেছিলেন, তাতে প্রথমে রোম সম্রাটকে عظيم الروم (রোমের মহান আধিপতি) উপাধিতে ভূষিত করেন। এতে তার বৈধ সম্মান রয়েছে। কেননা, এতে মহান হওয়ার স্বীকারোক্তিও আছে, কিন্তু রোমকদের জন্য—নিজের জন্য নয়। অতঃপর নিম্নোক্ত ভাষায় তাকে ঈমানের দাওয়াত দেওয়া হয় :

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَمْ أَنْ لَا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ

হে আহলে-কিতাবগণ! আহবানের প্রতিটি বাক্যের দিকে এস, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে অভিন্ন। অর্থাৎ আমরা আল্লাহ ব্যতীত কাহ্নও ইবাদত করব না।

—(সূরা আলে ইমরান)

এতে প্রথমে পারস্পরিক ঐক্যের একটি অভিন্ন কেন্দ্রবিন্দু উল্লেখ করা হয়েছে। তা হলো এই যে, একত্ববাদের বিশ্বাস আমাদের ও তোমাদের মধ্যে অভিন্ন। এরপর খৃষ্টানদের ভুলপ্রাপ্তি সম্পর্কে হুঁশিয়ার করা হয়েছে।

রসূলুল্লাহ্ (স)–র শিক্ষার প্রতি লক্ষ্য করলে প্রত্যেক শিক্ষা ও দাওয়াতের মধ্যে এমনি ধরনের আদব ও নীতি পাওয়া যাবে। আজকাল প্রথমে তো দাওয়াত ও সংশোধন এবং সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধের প্রতি লক্ষ্যই করা হয় না। যারা এ কাজে নিয়োজিত তারা তুধু তর্কবিতর্ক, বিপক্ষের প্রতি দোষারোপ, বিদ্-পাশ্বক ধনি এবং অপমানিত ও লাঞ্ছিত করাকেই দাওয়াত ও প্রচার মনে করে নিয়েছে। এটা সূন্নতবিরোধী হওয়ার কারণে কখনও কার্যকর ও ফলপ্রসূ হয় না। তারা মনে করিতে থাকে যে, তারা

ইসলামের জন্য খুব কাজ করছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা লোকদেরকে ইসলাম থেকে বিমুখ করার কারণ হচ্ছে।

**প্রচলিত তর্ক-বিতর্কের ধর্মীয় ও পার্থিব জনিষ্ট :** আলোচ্য অয়াতের তফসীরে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, শরীয়তের আসল উদ্দেশ্য হল দাওয়াত। এর দু'টি মূলনীতি—হিকমত ও উত্তম উপদেশ। যদি কখনও তর্ক-বিতর্কে জড়িত হওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে, তবে احسن তথা উত্তম পছন্দ শর্তসাপেক্ষে তারও অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এটা প্রকৃতপক্ষে দাওয়াতের কোন পছন্দ নয়; বরং এর নেতিবাচক দিকের একটি কৌশল মাত্র।

এতে কোরআন পাক **بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ**—এর শর্ত লাগিয়ে যেমন ব্যক্ত করছে যে,

এটা নগ্নতা, শুভেচ্ছা ও সহানুভূতির মনোভাব নিয়ে করা উচিত, এতে প্রতিপক্ষের অবস্থা অনুযায়ী সুস্পষ্ট প্রমাণাদি বর্ণনা করা প্রয়োজন এবং প্রতিপক্ষের অপমান ও ঘৃণা থেকে পুরোপুরি বিরত থাকা উচিত, তেমনি স্বয়ং বক্তার জন্য ক্ষতিকর না হওয়াও এর উৎকর্ষের জন্য জরুরী। অর্থাৎ বক্তার মধ্যে চরিত্রহীনতা, হিংসা-বিদ্বেষ, অহংকার, আড়ম্বরপ্রীতি ইত্যাদি দোষ সৃষ্টি না হওয়া উচিত। এগুলো কঠিন আত্মিক পাপ। আজকালকার আলোচনা ও বিতর্কযুদ্ধে ঘটনাক্রমে আল্লাহর কোন বান্দা এগুলো থেকে মুক্ত থাকলে থাকতেও পারে। নতুবা স্বভাবত এগুলো থেকে বেঁচে থাকা খুবই কঠিন।

**ইমাম গাম্বালী (র) বলেন :** মদ যেমন যাবতীয় দুর্ভর্ষের মূল—নিজেও মহাপাপ এবং অন্যান্য বড় বড় দৈহিক পাপের উপায়ও বাটে, তেমনি তর্ক-বিতর্কে প্রতিপক্ষের উপর প্রাধান্য লাভ এবং মানুষের কাছে স্বীয় শিক্ষাগত প্রেষ্ঠত্ব ফুটিয়ে তোলা উদ্দেশ্য হল এটা যাবতীয় আধ্যাত্মিক দোষের মূল। এর ফলে অনেক আত্মিক অপরাধ জন্মলাভ করে। উদাহরণত হিংসা, বিদ্বেষ, অহংকার, পরনিন্দা, অপরের ছিদ্রান্বেষণ, পরশ্রীকান্তরতা, সত্যগ্রহণে অনীহা, অন্যের উক্তি নিয়ে ন্যায় পথে চিন্তা করার পরিবর্তে প্রতিপক্ষের মোকাবিলায় কোরআন ও সুন্নাহর ডিম্ব অর্থ বর্ণনা করতে হলেও তা করতে বিধানবিত না হওয়া।

এসব মারাত্মক দোষে মর্হাদাসম্পন্ন আলিমগণও লিপ্ত হন। কিন্তু ব্যাপারটি যখন তাদের অনুসারীদের কাছে পৌঁছে, তখন খস্তাখস্তি, মারামারি ও লড়াইয়ের বাজার গরম হয়ে যায়। ইম্মা লিলাহ ... ..।

হযরত ইমাম শাফেরী (র) বলেন :

জান হচ্ছে শিক্ষিত ও জ্ঞানীদের মধ্যে একটি পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক। এখন যারা জানকেই শত্রুতার রূপ দান করছে, তারা বিজ্ঞাতিকে নিজেদের ধর্ম অনুসরণের দাওয়াত কিভাবে দিতে পারে! অন্যদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করাই যখন তাদের লক্ষ্য তখন তাদের কাছ থেকে পারস্পরিক সম্প্রীতি, ভালবাসা ও মানবতাবোধের কল্পনা কেমন করে করা যেতে পারে? একজন মানুষের জন্য এম্ম চাইতে বড় অনিষ্ট আর কি হতে পারে যে, তাকে ইমানদার ও পরহিযগানের চরিত্র থেকে বঞ্চিত করে মুনাফিকের চরিত্রে রূপান্তরিত করে দেয়।

ইমাম গাযালী (র) বলেন : ধর্মীয় শিক্ষা ও দাওয়াতের কাজে ব্রতী ব্যক্তি হয় নির্ভুল নীতি অনুসরণ করে এবং মারাত্মক বিপদ থেকে বিরত থেকে চিরন্তন সৌভাগ্যের অধিকারী হয়ে যায়, না হয় এ স্থান থেকে বিচ্যুত হয়ে সীমাহীন দুর্ভাগ্যের দিকে ধাবিত হয়। মধ্যস্থলে অবস্থান করা তার পক্ষে অসম্ভব। কেননা, যে শিক্ষা উপকারী হয় না, তা আযাব বৈ কিছু নয়। রসুলুল্লাহ (সা) বলেন :

—**كَيْفَا** شد الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمة  
মতের দিন সর্বাধিক কঠোর আযাবে সে আলিম ব্যক্তি পতিত হবে, যার ইল্ম দ্বারা আল্লাহ তাকে কোন উপকার দেন নি।

অন্য এক সহীহ হাদীসে আছে :

لا تتعلموا العلم لتبها هوا به العلماء ولتماروا به السفهاء ولتصرفوا  
به وجوه الناس اليكم فمن فعل ذلك فهو في النار -

ধর্মীয় শিক্ষা এ উদ্দেশ্যে অর্জন করা না যে, তার মাধ্যমে অন্য আলিমদের মোকা-  
বিলায় গৌরব ও সম্মান অর্জন করবে কিংবা স্বল্প শিক্ষিতদের সাথে ঝগড়া করবে অথবা  
এর মাধ্যমে অন্যের দৃষ্টি নিজের দিকে আকর্ষণ করবে। যে এরূপ করে, সে জাহান্নামে  
যাবে।—(ইবনে মাজা)

এ কারণেই ফিকাহশাস্ত্রের ইমামগণ ও সত্যপন্থী মনীষীরাই শিক্ষণীয় ব্যাপারাদিতে  
ঝগড়া ও তর্ক-বিতর্ক কোন কালেই জায়েয মনে করতেন না। দাওয়াতের জন্য এতটুকুই  
যথেষ্ট যে, যাকে ভ্রান্তিতে লিপ্ত মনে কর, তাকে নস্রাতা ও শুভেচ্ছার ভঙ্গিতে যুক্তিসঙ্গতভাবে  
বিস্ময়টি বুঝিয়ে দাও। এরপর সে গ্রহণ করে নিলে উত্তম। নতুবা চুপ থাক এবং ঝগড়া  
কটুকথা থেকে পুরোপুরি বেঁচে থাক। হযরত ইমাম মালিক (র) বলেন :

كان مالك يقول المرء والجدال في العلم يذهب بتو العلم  
عن قلب العبد وقيل له رجل لك علم بالسنة فهل يجادل عنها قال لا ولكن  
يخبر بالسنة فان قهل منه والا سكت -

ইল্ম সম্পর্কে ঝগড়া ও বিতর্ক, ইল্মের গুচ্ছল্যকে মানুষের অন্তর থেকে নিঃশেষ  
করে দেয়। কেউ বলল : এক ব্যক্তি সুন্নাহর শিক্ষায় শিক্ষিত। সে কি সুন্নাহর হিকামতের  
জন্য তর্ক করতে পারে? তিনি বললেন : না, তার উচিত প্রতিপক্ষকে বিস্কৃত কথাটি বলে  
দেওয়া। এরপর যদি সে গ্রহণ করে, তবে উত্তম। নতুবা সে চুপ থাকবে।—(আওজামুল  
মাস্নালেক শরহে মুন্নাতা মালেক, ১ম খণ্ড, ১৫ পৃষ্ঠা)

বর্তমান যুগে দাওয়াত ও সংস্কার প্রচেষ্টা পুরোপুরি কার্যকর না হওয়ার কারণ দ্বিবিধ।

এক. যুগের অধঃপতন ও হারাম বস্তুসমূহের আধিকার কারণে সাধারণভাবে  
মানুষের অন্তর কঠোর ও পরকাল সম্পর্কে উদাসীন হয়ে গেছে এবং সত্য গ্রহণের তওফীফ

হুস পেয়েছে। ফেউ কেউ আল্লাহর সে গজবে পতিত রয়েছে, যার সংবাদ রসূলুল্লাহ (সা) দিয়েছিলেন যে, শেষ যমান্নর অধিকাংশ মানুষের অন্তর অধোমুখী হয়ে যাবে এবং ভাল-মন্দে পরিচয় এবং জায়েয-নাজাসেযের পার্থক্য তাদের অন্তর থেকে উঠে যাবে।

দুই. সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ এবং দাওয়াতের কর্তব্যের প্রতি অমনোযোগিতা ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। সর্বসাধারণের কথা না-ই বললাম, আলিম ও সজ্জনদের মধ্যেও এ প্রয়োজনের অনুভূতি খুবই কম। এটা বুঝে নেওয়া হয়েছে যে, নিজের কাজকর্ম সংশোধন করতে পারলেই যথেষ্ট। তাদের সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী, ভাই, বন্ধু-বান্ধব যত গোনাহেই লিপ্ত থাকুক না কেন, তাদের সংশোধনের চিন্তা যেন তাদের দায়িত্বই নয়। অথচ কোরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট বাক্যাবলী প্রত্যেক ব্যক্তির দায়িত্বে তার পরিবার-পরিজন ও সংশ্লিষ্টদের সংশোধন প্রচেষ্টা করায় করে দিয়েছে। বলা হয়েছে :

تَوَّابًا نَفْسَكُم

وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

নিজেকে এবং পরিবারবর্গকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর। যদি কিছু সংখ্যক লোক দাওয়াত ও সংশোধনের কাজের প্রতি দৃষ্টি দেয়ও, তবে তারা কোরআনের শিক্ষা এবং পয়গম্বরসুলভ দাওয়াতের রীতিনীতি সম্পর্কে অজ্ঞ। চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই যাকে যখন ইচ্ছা বলে দেয় এবং ধরে নেয়, তারা তাদের কর্তব্য সম্পাদন করে ফেলেছে। অথচ এ কর্মপদ্ধতি পয়গম্বরগণের সূরতের খেলাফ হওয়ার কারণে মানুষকে ধর্ম ও ধর্মের বিধানাবলী পালন থেকে অনেক দূরে নিক্ষেপ করে দেয়।

বিশেষ করে যেখানে অপরের সমালোচনা করা হয়, সেখানে সমালোচনার আড়ালে অপরকে হেয় প্রতিপন্ন এবং ঠাট্টা-বিদ্রূপ পর্যন্ত করা হয়। হযরত ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন :

যে ব্যক্তিকে তার কোন দু'টি-বিচারিত সম্পর্কে হ'শিয়ার করতে হয়, সে বিষয়টা যদি তুমি তাকে নির্জনে মনস্তাবে বুঝিয়ে দাও, তবে তা হবে উপদেশ। পক্ষান্তরে যদি প্রকাশ্যভাবে জনসমক্ষে তাকে লজ্জা দাও, তবে তাই হবে তাকে অপদস্থ করা।

আজকাল অপরের দোষত্রুটির ব্যাপারে পত্র-পত্রিকা ও প্রচারপত্রের মাধ্যমে জনসমক্ষে তুলে ধরাকে দীনের কাজ মনে করে নেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে দীন ও দীনের দাওয়াতের বিস্তৃত জ্ঞান এবং নীতি অনুযায়ী দীনের কাজ করার তওফীক দান করুন।

এ পর্যন্ত দাওয়াতের নীতি ও আদব বর্ণিত হল। এরপর বলা হয়েছে :

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

বাংলায় দীনের প্রতি দাওয়াতদাতাদের সান্দ্রনার জন্য বলা হয়েছে। কেননা, পূর্বোক্ত নীতি ও আদবের অনুসরণ সত্ত্বেও যখন প্রতিপক্ষ সত্য গ্রহণ না করে, তখন স্বভাবত মানুষ দারুণ ব্যথা অনুভব করে এবং মাঝে মাঝে এর এমন প্রতিক্রিয়াও হতে পারে যে, দাওয়াতের কোন উপকার না দেখে দাওয়াতদাতা নিরাশ হয়ে তা বর্জনও করে বসতে পারে। তাই এ ব্যক্তি বলা হয়েছে যে, আপনার কর্তব্য শুধু নির্ভুল নীতি অনুযায়ী দাওয়াতের কাজ করে



যাওয়া। দাওয়াত কবুল করা বা না করা, এতে আপনার কোন দখল নেই এবং এটা আপনার দায়িত্বও নয়। এটা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার কাজ। তিনিই জানেন, কে পথভ্রষ্ট থাকবে এবং কে সুপথ প্রাপ্ত হবে। আপনি এ চিন্তায় পড়বেন না। নিজের কাজ করুন যান। সাহস হারাবেন না এবং নিরাশ হবেন না। এতে বোঝা গেল যে, এ বাক্যটিও দাওয়াতের আদবেরই পরিশিষ্ট।

দাওয়াতদাতাকে কেউ কষ্ট দিলে প্রতিশোধ গ্রহণ করা জায়েয, কিন্তু সবর করা উত্তম : বিগত আয়াতের পরবর্তী তিন আয়াতে দাওয়াতদাতাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে। তা এই যে, দাওয়াতের কাজে মাঝে মাঝে এমন কঠোর-প্রাণ মুখদের সাথেও পাল্লা পড়ে যায় যে, তাদেরকে যতই নম্রতা ও শুভেচ্ছা সহকারে বোঝানো হোক না কেন, তারা উত্তেজিত হয়ে যায় কষ্টকথা বলে কষ্ট দেয় এবং কোন কোন সময় আরও বাড়ি-বাড়ি করে দাওয়াতদাতাদের উপর দৈহিক নির্ধাতন চালায়, এমনকি তাদেরকে হত্যা করতেও কুশিঁত হয় না। এমতাবস্থায় দাওয়াতদাতাদের কি করা উচিত ?

এ সম্পর্কে **وَإِن عَاثِبْتُمْ بِهِ** বাক্যে প্রথমত তাদেরকে আইনগত অধিকার

দেওয়া হয়েছে যে, যারা নির্ধাতন চালায়, তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করা আপনার জন্য বৈধ, কিন্তু এই শর্তে যে, প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষেত্রে নির্ধাতনের সীমা অতিক্রম করা যাবে না। যতটুকু জুলুম প্রতিপক্ষের তরফ থেকে করা হয়, প্রতিশোধ ততটুকুই গ্রহণ করতে হবে; বেশি হতে পারবে না।

আয়াতের শেষে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে, যদিও প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার রয়েছে কিন্তু সবর করা উত্তম।

আয়াতের শানে নুসুল এবং রসুলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবীদের পক্ষ থেকে নির্দেশ পালন : সংখ্যাগরিষ্ঠ তফসীরবিদগণের মতে এ আয়াতটি মদীনায় অবতীর্ণ। ওহদ যুদ্ধে সত্তর জন সাহাবীর শাহাদাত বরণ এবং হযরত হামযা (রা)-কে হত্যার পর তাঁর লাশের নাক-কান কর্তনের ঘটনা সম্পর্কে আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে। সহীহ্ বুখারীর স্নেওয়ালেত তদ্রুপই। দারা-কুতুনী হযরত ইবনে আব্বাসের রেওয়াজেতে বর্ণনা করেন যে :

ওহদের যুদ্ধ-ময়দান থেকে মুশরিকরা ফিরে যাওয়ার পর সত্তর জন সাহাবীর মৃতদেহ উদ্ধার করা হলো। তাঁদের মধ্যে রসুলুল্লাহ্ (সা)-র প্রক্ষেয় পিতৃব্য হযরত হামযা (রা)-র মৃতদেহও ছিল। তাঁর প্রতি মুশরিকদের প্রচণ্ড ক্রোধ ছিল। তাই তাঁকে হত্যা করার পর মনের ব্যাল মিটাতে গিয়ে তাঁর নাক, কান ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে এবং পেট চিরে দিয়েছিল। এ মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে রসুলুল্লাহ্ (সা) দারুণভাবে মর্মান্ত হইলেন। তিনি বললেন : আল্লাহ্‌র কসম, আমি হামযার পন্নিবার্তে মুশরিকদের সত্তর জনের মৃতদেহ

বিকৃত করব। এ ঘটনা সম্পর্কে আলোচ্য **وَإِن عَاثِبْتُمْ** শীর্ষক তিনটি আয়াত

নাখিল হয়েছে।—( তফসীর কুরত্বী )

কোন কোন রেওয়াজেতে রয়েছে যে, কাফিররা অন্যান্য সাহাবীর মৃতদেহও বিকৃত করেছিল।—( তিরমিযী, আহমদ, ইবনে খুযায়মা, ইবনে হাক্বান )

এক্সেত্র রসুলুল্লাহ্ (সা) সংখ্যার প্রতি লক্ষ্য না রেখেই দুঃখের আতিশয্যে বিকৃতদেহ সাহাবীদের পরিবর্তে সত্তর জন মুশরিকের মৃতদেহ বিকৃত করার সংকল্প করেছিলেন। এটা আল্লাহর কাছে সে সমতা ও সুবিচারের অনুকূল ছিল না, যা তাঁর মাধ্যমে দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্য ছিল। তাই প্রথমে হ'শিয়ান করা হয়েছে যে, প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার আপনায় রয়েছে বটে, কিন্তু সে পরিমাণেই, যে পরিমাণ জুলুম হয়েছে। সংখ্যার প্রতি লক্ষ্য না রেখে কয়েক জনের প্রতিশোধ সত্তর জনের উপর শিক্ষা দেওয়ার লক্ষ্যে ঠিক নয়। দ্বিতীয়ত, রসুলুল্লাহ্ (সা)-কে ন্যায়ানুগ আচরণ উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, সমপরিমাণ প্রতিশোধ নেওয়ার অনুমতি যদিও রয়েছে, কিন্তু তাও ছেড়ে দিন এবং অপরাধীদের প্রতি অনুগ্রহ করুন। এটা অধিক প্রের।

এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর রসুলুল্লাহ্ (সা) বললেন : এখন আমরা সবরই করব। একজনের উপরও প্রতিশোধ নেব না। এরপর তিনি কসমের কাফকারা আদায় করে দেন।—( মায়হারী )

মক্কা বিজয়ের সময় এসব মুশরিক পরাজিত হয়ে যখন রসুলুল্লাহ্ (সা) ও সাহাবায়ে কিরামের হস্তগত হয়, তখন ওহদ যুদ্ধের সময় কৃত সংকল্প পূর্ণ করার এটা উত্তম সুযোগ ছিল। কিন্তু উল্লিখিত আয়াত নাযিল হওয়ার সময়ই রসুলুল্লাহ্ (সা) স্বীয় সংকল্প পরিত্যাগ করে সবর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। তাই মক্কা বিজয়ের সময় তিনি আয়াত অনুযায়ী সশর অবলম্বন করেন। সম্ভবত এ কারণেই কোন কোন রেওয়াজেতে বলা হয়েছে যে, আলোচ্য আয়াতগুলো মক্কা বিজয়ের সময় অবতীর্ণ হয়েছিল। এটাও সম্ভব যে, আয়াতগুলো বারবার নাযিল হয়েছে। প্রথমে ওহদ যুদ্ধের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে এবং পরে মক্কা বিজয়ের সময় পুনর্বার অবতীর্ণ হয়েছে।—( মায়হারী )

মাস'আলা : আলোচ্য আয়াতটি প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষেত্রে সমতার আইন ব্যক্ত করেছে। এ কারণেই ফিকাহবিদগণ বলেছেন : যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করে, তাঁর বিনিময়ে হত্যাকারীকে হত্যা করা হবে। আহত করলে আহতকারীকে জখমের পরিমাণে জখম করা হবে। কেউ কাউকে হাত-পা কেটে হত্যা করলে নিহতের ওলীকে অধিকার দেওয়া হবে, সেও প্রথমে হত্যাকারীর হাত-পা কর্তন করবে, অতঃপর হত্যা করবে।

তবে কেউ যদি কাউকে পাথর মেরে কিংবা তীর দ্বারা আহত করে হত্যা করে, তাহলে এতে হত্যার প্রকারভেদের সঠিক পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভবপর নয় যে, কি পরিমাণ আঘাত দ্বারা হত্যা সংঘটিত হয়েছে এবং নিহত ব্যক্তি কি পরিমাণ কষ্ট পেয়েছে। এ ক্ষেত্রে সত্যিকার সমতার কোন মাপকাঠি নেই। তাই হত্যাকারীকে তরবারি দ্বারাই হত্যা করা হবে।—( জাসাস )

মাস'আলা : আয়াতটি যদিও দৈহিক কষ্ট ও দৈহিক ক্ষতি সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, কিন্তু ভাষা ব্যাপক এবং এতে আধিক ক্ষতিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। একারণেই ফিকাহবিদগণ বলেছেন : যে ব্যক্তি কারও অর্ধসম্পদ ছিনতাই করে, প্রতিপক্ষেরও অধিকার রয়েছে

সেই পরিমাণ অর্থসম্পদ তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার কিংবা অপহরণ করার। তবে শর্ত এই যে, অর্থসম্পদ সে ছিনিয়ে নেবে কিংবা অপহরণ করবে, তা ছিনতাইকৃত অর্থসম্পদের অঙ্কিত প্রকার হতে হবে। উদাহরণত নগদ টাকা-পয়সা ছিনতাই করলে বিনিময়ে সেই পরিমাণ নগদ টাকা-পয়সা তার কাছ থেকে ছিনতাই কিংবা অপহরণের মাধ্যমে নিতে। খাদ্যশস্য, বস্ত্র ইত্যাদি ছিনতাই করলে, সেই রকম খাদ্যশস্য ও বস্ত্র নিতে পারে। কিন্তু এক প্রকার সামগ্রীর বিনিময়ে অন্য প্রকার সামগ্রী নিতে পারবে না। উদাহরণত টাকা-পয়সার বিনিময়ে বস্ত্র অথবা অন্য কোন ব্যবহারিক বস্ত্র জোরপূর্বক নিতে পারবে না। কোন কোন ফিকাহবিদ সর্বাবস্থায় অনুমতি দিয়েছেন—এক প্রকার হোক কিংবা ভিন্ন প্রকার। এ মাস'আলার কিছু বিবরণ কুরতুবী শ্রীম তফসীরে লিপিবদ্ধ করেছেন। বিস্তারিত আলোচনা ফিকাহগ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

وَأَنْعَابُهُمْ—আয়াতে সাধারণ আইন বর্ণিত হয়েছিল। এতে সব

মুসলমানের জন্য সমান প্রতিশোধ গ্রহণ করা বৈধ, কিন্তু সবর করা প্রেরণ বলা হয়েছে। পরবর্তী আয়াতে রসুলুল্লাহ (সা)-কে বিশেষভাবে সম্বোধন করে সবর করতে উৎসাহ দান করা হয়েছে। কেননা তাঁর মহত্ত্ব ও উচ্চপদ হেতু অন্যের তুলনায় এটাই ছিল তাঁর পক্ষে অধিকতর উপযোগী। তাই বলা হয়েছে :

وَاصبر وما صبرك إلا بالله

—অর্থাৎ আপনি তো প্রতিশোধের ইচ্ছাই করবেন না—সবরই করুন। সাথে সাথে একথাও বলা হয়েছে যে, আপনার সবর আল্লাহর সাহায্যে হবে। অর্থাৎ সবর করা আপনার জন্য সহজ করে দেওয়া হবে।

শেষ আয়াতে আল্লাহ তা'আলার সাহায্য অর্জিত হওয়ার একটি সাধারণ কায়দা বলে দেওয়া হয়েছে যে,

إِنِ اللَّهُ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ—এর সারমর্ম এই

যে, আল্লাহ তা'আলার সাহায্য তাদের সাথে থাকে, যারা দু'টি গুণে গুণাবিত। এক. ভীকওয়া, ইহসান। ভীকওয়ার অর্থ সৎকর্ম করা এবং ইহসানের অর্থ এখানে সৃষ্ট জীবের সাথে সম্ভাবহার করা। অর্থাৎ যারা শরীয়তের অনুসারী হয়ে নিয়মিত সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং অপরের সাথে সম্ভাবহার করে, আল্লাহ তা'আলা তাদের সঙ্গে আছেন। বলা বাহুল্য, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সঙ্গ (সাহায্য) অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে, তার অনিষ্ট সাধন করার সাধ্য কার ?

وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بُرُكْنَا حَوْلَهُ لِلرَّبِّ إِنَّمَا مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿١٠﴾

পরম মেহেরবান দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু

(১০) পরম পবিত্র ও মহিমাযুক্ত সন্তা তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রি বেলায় ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত—যার চারদিকে আমি পর্যাপ্ত বরকত দান করেছি—যাতে আমি তাকে কুদরতের কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দেই। নিশ্চয়ই তিনি পরম শ্রবণকারী ও দর্শনশীল।

ভক্ষসীরের সার-সংক্ষেপ

পবিত্র সে সন্তা, যিনি স্বীয় বান্দা মুহাম্মদ (সা)-কে রাত্রিবেলায় সফর করিয়েছেন মসজিদে হারাম (অর্থাৎ কবাব মসজিদ) থেকে মসজিদে-আকসা (অর্থাৎ বায়তুল-মুকাম্বাস) পর্যন্ত যার আশেপাশে (এ ফিলিস্তীনে) আমি (ধর্মীয় ও পার্থিব) বরকতসমূহ রেখেছি। (ধর্মীয় বরকত এই যে, সেখানে বহু সংখ্যক পয়গম্বর সমাহিত রয়েছেন এবং পার্থিব বরকত এই যে, সেখানে বাগ-বাগিচা, নদ-নদী, ঝরণা ও ফসলের প্রাচুর্য রয়েছে। মোটকথা, সে মসজিদ পর্যন্ত বিস্ময়করভাবে এজেন্সি নিয়ে গেছি, যাতে আমি তাঁকে স্বীয় কুদরতের কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দিতে পারি। (তন্মধ্যে কিছু সংখ্যকের সম্পর্ক তো স্বয়ং সে জায়গার সাথে : উদাহরণত এত দীর্ঘ পথ খুব অল্প সময়ে অতিক্রম করা, সব পয়গম্বরের সাথে সাক্ষাত করা এবং তাঁদের কথাবার্তা শোনা ইত্যাদি এবং কিছু সংখ্যকের সম্পর্ক পরবর্তী পর্যায়ের সাথে। যেমন, আকাশে যাওয়া এবং সেখানকার অত্যশ্চর্য বস্তুসমূহ নিরীক্ষণ করা।) নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রোতা সর্বদ্রষ্টা। (যেহেতু তিনি রসূলুল্লাহ (সা)-র কথা শুনতেন এবং অবস্থা দেখতেন, তাই তাঁকে এতদসম্পূর্ণ বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও সম্মান দান করেছেন এবং এমন নৈকট্য দিয়েছেন, যা কেউ লাভ করেনি।

আনুশঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতে মি'রাজের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, যা আমাদের রসূল (সা)-এর একটি বিশেষ সম্মান ও স্বাতন্ত্র্যমূলক মু'জিয়া। **اسراء** শব্দটি ধাতু থেকে

উদ্ভূত। এর আভিধানিক অর্থ রাব্রো নিয়ে যাওয়া। এরপর **لَيْلًا** শব্দটি স্পষ্টত এ অর্থ ফুটিয়ে তুলেছে। **ذَكَرًا** শব্দটি ব্যবহার করে এদিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে,

সমগ্র ঘটনায় সম্পূর্ণ রাত্রি নয়; বরং রাত্রির একটা অংশ ব্যয়িত হয়েছে। আয়াতে উল্লিখিত মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত সফরকে 'ইসরা' বলা হয় এবং সেখান থেকে আসমান পর্যন্ত যে সফর হয়েছে, তার নাম মি'রাজ। ইসরা অকাট্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। আর মি'রাজ সূরা নজমে উল্লিখিত রয়েছে এবং অনেক মুতাওয়্যাতির হাদীস দ্বারা

প্রমাণিত। সম্মান ও গৌরবের স্তরে **بِعَهْدٍ** শব্দটি একটি বিশেষ প্রেমময়তার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং কাউকে 'আমার বান্দা' বললে এর চাইতে বড় সম্মান মানুষের জন্য আর হতে পারে না। হযরত হাসান দেহলভী চমৎকার বলেছেন :

بِئْدَةِ حَسَنِ بَدْرِ بَانَ كَفْتَا كَةِ بِنْدَةٍ تَوَامِ  
تَوِ بَزْبَانَ خُورِ بَكُو بِنْدَةِ نَوَازِ كَيْسْتِي

অর্থ : তোমার বান্দা হাসান তো শত মুখে বলে থাকে যে, আমি তোমার বান্দা; তুমি তোমার নিজের মুখে একবার বলনা যে, আমি তোমারই দাস !!

আল্লাহর তরফ থেকে বান্দাদের প্রতি এরূপ সম্বোধন একটা অতুলনীয় মর্যাদা। যেমন অন্য এক আয়াতে **عِبَادَ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ** বলে স্বীয় মকবুল বান্দাদের

সম্মান বৃদ্ধি করা লক্ষ্য রয়েছে। এতে আরও জানা গেল যে, আল্লাহর পরিপূর্ণ বান্দা হয়ে যাওয়াই মানুষের সর্ববৃহৎ গুণ। কেননা, বিশেষ সম্মানের স্তরে রসূলুল্লাহ (সা)-র অনেক গুণের মধ্য থেকে দাসত্ব গুণটি উল্লেখ করা হয়েছে। এ শব্দ দ্বারা আরও একটি বড় উপকল্প সাধন লক্ষ্য। তা এই যে, আগাগোড়া অলৌকিক ঘটনাবলীতে পূর্ণ এই সফর থেকে কল্পও মনে এরূপ ধারণা সৃষ্টি না হয়ে যায় যে, এ অলৌকিক উদ্‌ঘাটন ভ্রমণের ব্যাপারটি একটি আল্লাহর গুণের অংশবিশেষ। যেমন ইসা (আ)-র আকাশে উত্থিত হওয়ার ঘটনা থেকে খৃস্টান জাতি ধোঁকায় পড়েছে। তাই **عِبِدِ** (বান্দা) শব্দ বলে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, এসব গুণ, চরম পরাকাষ্ঠা ও মু'জিয়া সত্ত্বেও রসূলুল্লাহ (সা) আল্লাহর বান্দাই—স্বয়ং আল্লাহ বা আল্লাহর কোন অংশীদার নন।

কোরআন ও হাদীস থেকে দৈহিক মি'রাজের প্রমাণাদি ও ইজমা : ইসরা ও মি'রাজের সমগ্র সফর যে শুধু আভিক ছিল না, বরং সাধারণ মানুষের সফরের মত দৈহিক

ছিল, একথা কোরআন পাকের বক্তব্য ও অনেক মুতাওয়াজ্জির হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

— ۱۸۰ —

আলোচ্য আয়াতের প্রথম **سُبْحَانَ** শব্দের মধ্যে এদিকেই ইঙ্গিত রয়েছে। কেননা, এ শব্দটি আশ্চর্যজনক ও বিরাট বিষয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। মিরাজ যদি শুধু আশ্বিক অর্থাৎ স্বপ্নরূপে সংঘটিত হত তবে তাতে আশ্চর্যের বিষয় কি আছে? স্বপ্নে তো প্রত্যেক মুসলমান, বরং প্রত্যেক মানুষ দেখতে পারে যে, সে আকাশে উঠেছে, অবিস্বাস্য বহু কাজ করেছে।

**سُبْحَانَ** শব্দ দ্বারা এদিকেই দ্বিতীয় ইঙ্গিত করা হয়েছে। কারণ, শুধু আশ্বিকে দাস বলে না; বরং আত্মা ও দেহ উভয়ের সমষ্টিকেই দাস বলা হয়। এছাড়া রসুলুল্লাহ্ (সা) যখন মিরাজের ঘটনা হযরত উম্মে হানী (রা)-র কাছে বর্ণনা করলেন, তখন তিনি পরামর্শ দিলেন যে, আপনি কারও কাছে একথা প্রকাশ করবেন না; প্রকাশ করলে কাফিররা আপনার প্রতি আরও বেশি মিথ্যারোপ করবে। ব্যাপারটি যদি নিছক স্বপ্নই হত, তবে মিথ্যারোপ করার কি কারণ ছিল?

অতঃপর রসুলুল্লাহ্ (সা) যখন ঘটনা প্রকাশ করলেন, তখন কাফিররা মিথ্যারোপ করল এবং তাঁরা বিদ্রূপ করল। এমনকি, কতক নও-মুসলিম এ সংবাদ শুনে ধর্মত্যাগী হয়ে গেল। ব্যাপারটি স্বপ্নের হলে এতসব তুলকালামি কাণ্ড ঘটান সম্ভাবনা ছিল কি? তবে, এ ঘটনার আগে এবং স্বপ্নের আকারে কোন আশ্বিক মিরাজ হয়ে থাকলে তা এর

পরিপন্থী নয় **وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ** আয়াতে সংখ্যাগরিষ্ঠ তফসীরবিদদের মতে **رُؤْيَا** (স্বপ্ন) বলে **رُؤْيَا** (দেখা) বোঝানো হয়েছে, কিন্তু একে **رُؤْيَا** শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করার কারণ এই হতে পারে যে, এ ব্যাপারটিকে রূপক অর্থে **رُؤْيَا** বলা হয়েছে। অর্থাৎ এর দৃষ্টান্ত এমন, যেমন কেউ স্বপ্ন দেখে। পক্ষান্তরে যদি **رُؤْيَا** শব্দের অর্থ স্বপ্নই নেওয়া হয়, তবে এমনটিও অসম্ভব নয়। কারণ, মিরাজের ঘটনাটি দৈহিক হওয়া ছাড়া এবং আগে কিংবা পরে আশ্বিক অর্থাৎ স্বপ্নযোগেও হয়ে থাকবে এ কারণে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস এবং হযরত আরেশা (রা) থেকে যে স্বপ্নযোগে মিরাজ হওয়ার কথা বর্ণিত রয়েছে, তাও যথাস্থানে নির্ভুল। কিন্তু এতে শারীরিক মিরাজ না হওয়া প্রমাণিত হয় না।

তফসীর কুরতুবীতে আছে, ইসরার হাদীসসমূহ সব মুতাওয়াজ্জির। নাফাস এ সম্পর্কে বিশ জন সাহাবীর রেওয়াজ্জিতে উদ্ধৃত করেছেন এবং কাহী আয়্যাম শেফা গ্রন্থে আরও বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন।

ইমাম ইবনে কাসীর স্বীয় তফসীর গ্রন্থে এসব রেওয়াজ্জিতে পূর্ণরূপে যাচাই-বাহাই করে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর পঁচিশ জন সাহাবীর নাম উল্লেখ করেছেন, যাঁদের কাছ থেকে এসব রেওয়াজ্জিতে বর্ণিত হয়েছে। নামগুলো এই : হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব আলী মর্তুজা, ইবনে মসউদ, আবু মর গিফারী, মালেক ইবনে হা'ছা, আবু হোরায়রা, আবু সায়ীদ,

ইবনে আকাস, শাদ্দাদ ইবনে আউস, উবাই ইবনে কা'ব, আবদুর রহমান ইবনে কুর্শ, আবু হাইয়্যা, আবু লায়লা, আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর, জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ হযায়ফা ইবনে ইয়ামান, বুরায়দাহ, আবু আইউব আনসারী, আবু উমামা, সামুদা ইবনে জুনদুব, আবুল হামরা, সোহায়ব রুমী, উল্মে হানী, আয়েশা, আসমা বিনতে আবু বকর (রা)।

এরপর ইবনে কাসীর বলেন : **فقد يث الا سرا ا جمع عليه لسامون**  
**واعرف عن الزنارقة والملحدون** সম্পর্কে সব মুসলমানের ঐকমত্য

রয়েছে। শুধু ধর্মদ্রোহী মিস্ত্রীকরা একে মানেনি।

মিরাজের সংক্রান্ত ঘটনা ইবনে কাসীরের রেওয়াজেত্ত থেকে

ইমাম ইবনে কাসীর স্বীয় তফসীর গ্রন্থে আলোচ্য আয়াতের তফসীর এবং সংশ্লিষ্ট হাদীসসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করার পর বলেন : সত্য কথা এই যে, নবী করীম (সা) ইসরা সফর জাগ্রত অবস্থায় করেন; স্বপ্নে নয়। মক্কা মোকাবেলার মা থেকে বাইতুল মোকাদ্দাস পর্যন্ত এ সফর বোরাকযোগে করেন। বায়তুল মোকাদ্দাসের দ্বারে উপনীত হয়ে তিনি বোরাকটি অদূরে বেঁধে দেন এবং বায়তুল মোকাদ্দাসের মসজিদে প্রবেশ করেন এবং কেবলার দিকে মুখ করে দু'রাকআত তাহিয়াতুল মসজিদ নামায আদায় করেন। অতঃপর সীড়ি আনা হয়, যাতে নিচ থেকে উপরে যাওয়ার জন্য খাপ বানানো ছিল। তিনি সীড়ির সাহায্যে প্রথমে প্রথম আকাশে, অতঃপর অবশিষ্ট আকাশসমূহে গমন করেন। এ সীড়িটি কি এবং কিরূপ ছিল, তার প্রকৃত স্বরূপ আজাহ্ তা'আলাই জানেন। ইদানিং বঙ্গেও অনেক প্রকার সীড়ি পৃথিবীতে প্রচলিত রয়েছে। স্বয়ংক্রিয় লিফটের আকারে সীড়িও আছে। এই আলৌকিক সীড়ি সম্পর্কে সন্দেহ ও দ্বিধার কারণ নেই। প্রত্যেক আকাশে সেশানকার ফেরেশতারা তাঁকে অভ্যর্থনা জানায় এবং প্রত্যেক আকাশে সে সমস্ত পন্ন-গম্বরগণের সাথে সাক্ষাত হয়, যাঁদের অবস্থান কোন নির্দিষ্ট আকাশে রয়েছে। উদাহরণত ষষ্ঠ আকাশে হযরত মুসা (আ) এবং সপ্তম আকাশে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সাথে সাক্ষাত হয়। অতঃপর তিনি পন্নগম্বরগণের স্থানসমূহও অতিক্রম করে যান এবং এক ময়দানে পৌঁছেন, যেখানে ভাগ্যলিপি লেখার শব্দ শোনা যাস্থিল। তিনি 'সিদরাতুল মুত্তাহা' দেখেন, যেখানে আজাহ্ তা'আলার নির্দেশে স্বর্ণের প্রজাপতি এবং বিভিন্ন রঙ-এর প্রজাপতি ইতস্তত ছোট্টাছুটি করছিল। ফেরেশতারা স্থানটিকে ঘিরে রেখেছিল। এখানে রসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত জিবরাঈলকে তাঁর স্বরূপে দেখেন। তাঁর ছয় শত পাখা ছিল। সেখানেই তিনি একটি দিগন্তবেষ্টিত সবুজ রঙের রফরফ দেখতে পান। সবুজ রঙের গদি বিশিষ্ট পাফ্ফীকে রফরফ বলা হয়। তিনি বায়তুল-মা'মুরও দেখেন। বায়তুল-মা'মুরের নিকটেই কা'বার প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইবরাহীম (আ) প্রাচীরের সাথে হেলান দিয়ে উপবিষ্ট ছিলেন। এই বায়তুল মা'মুরে দৈনিক সত্তর হাজার ফেরেশতা প্রবেশ করে। কিয়ামত পর্যন্ত তাদের পুনর্বীর প্রবেশ করার পাল্লা আসবে না। রসূলুল্লাহ্ (সা) স্বচক্ষে জামাত ও দোষখ পরিদর্শন করেন। সে সময় তাঁর উশ্মতের জন্য প্রথমে পক্ষাণ ওয়াড়ের নামায করায় হওয়ার নির্দেশ হয়। অতঃপর তা হ্রাস করে পাঁচ ওয়াড় করে দেওয়া হয়। এ দ্বারা সব ইবাদতের মধ্যে নামাযের বিশেষ গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়।

অতঃপর তিনি বায়তুল মোকাদ্দাসে ফিরে আসেন এবং বিভিন্ন আকাশে যেসব পয়গম্বরের সাথে সাক্ষাত হয়েছিল তাঁরাও তাঁর সাথে বায়তুল মোকাদ্দাসে অবতরণ করেন। তাঁরা (যেন) তাঁকে বিদায় সম্বর্ধনা জানাবার জন্য বায়তুল মোকাদ্দাস পর্যন্ত আগমন করেন। তখন নামাযের সময় হয়ে যায় এবং তিনি পয়গম্বরগণের সাথে নামায আদায় করেন। সেটা সেদিনকার ফজরের নামাযও হতে পারে। ইবনে কাসীর বলেন : নামাযে পয়গম্বরগণের ইমাম হওয়ার এ ঘটনাটি কারও কারও মতে আকাশে মাওয়ার পূর্বে সংঘটিত হয়। কিন্তু বাহ্যত এ ঘটনাটি প্রত্যাবর্তনের পর ঘটে। কেননা, আকাশে পয়গম্বরগণের সাথে সাক্ষাতের ঘটনায় একথাও বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত জিবরাঈল সব পয়গম্বরগণের সাথে তাঁকে পরিচয় করিয়ে দেন। ইমামতির ঘটনা প্রথমে হয়ে থাকলে এখানে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কোন প্রয়োজন ছিল না। এছাড়া সফরের আসল উদ্দেশ্য ছিল ঊর্ধ্ব জগতে গমন করা। কাজেই এ কাজটি প্রথমে সেরে নেওয়াই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত মনে হয়। আসল কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর সব পয়গম্বর বিদায় দানের জন্য তাঁর সাথে বায়তুল মোকাদ্দাস পর্যন্ত আসেন এবং জিবরাঈলের ইলিতে তাঁকে সবার ইমাম বানিয়ে কার্যত তাঁর নেতৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দেওয়া হয়।

এরপর তিনি বায়তুল মোকাদ্দাস থেকে বিদায় নেন এবং বোরাককে সওয়ার হয়ে অন্ধকার থাকতে থাকতেই মক্কা মোকাররমা পৌঁছে যান।

## والله سبحانه وتعالى اعلم

মি'রাজের ঘটনা সম্পর্কে একজন অমুসলিমের সাক্ষ্য : তফসীর ইবনে কাসীরে বলা হয়েছে : হাফেয আবু নায়ীম ইম্পাহানী দালায়েলুলমুবুওয়ত গ্রন্থে মুহাম্মদ ইবনে ওমর ওয়াক্কেদী'র (১) সনদে মুহাম্মদ ইবনে কা'ব কুযায়ী'র বাচনিক নিম্নোক্ত ঘটনা বর্ণনা করছেন :

“রসূলুল্লাহ্ (সা) রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছে পত্র লিখে হযরত দেহইয়া ইবনে খলীফাকে প্রেরণ করেন। এরপর দেহইয়ার পত্র পৌঁছানো, রোম সম্রাট পর্যন্ত পৌঁছা এবং তিনি যে অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও বিচরুণ সম্রাট ছিলেন, এসব কথা বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে, যা সহীহ্ বুখারী এবং হাদীসের অন্যান্য নির্ভরযোগ্য গ্রন্থে বিদ্যমান রয়েছে। এ বর্ণনার উপসংহারে বলা হয়েছে যে, রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস পত্র পাঠ করার পর রসূলুল্লাহ্ (সা)-র অবস্থা জানার জন্য আরবের কিছুসংখ্যক লোককে দরবারে সমবেত করতে চাইলেন। আবু সুফিয়ান ইবনে হরব ও তাঁর সঙ্গীরা সে সময় বাণিজ্যিক কাফিলা নিয়ে সে দেশে গমন করেছিল। নির্দেশ অনুযায়ী তাদেরকে দরবারে উপস্থিত করা হল। হিরাক্লিয়াস তাদেরকে যেসব প্রশ্ন করেন, সেগুলোর বিস্তারিত বিবরণ সহীহ্ বুখারী মুসলিম

(১) ওয়াক্কেদী'কে হাদীস বর্ণনার হাদীসবিদগণ দুর্বল বলে আখ্যা দিয়েছেন।

কিন্তু ইবনে কাসীরের মত সাবধানী মুহাদ্দিস তাঁর রেওয়াজেত উদ্ধৃত করেছেন। কারণ, ব্যাপারটি আকীদা কিংবা হালাল-হারামের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়। এ ধরনের ঐতিহাসিক ব্যাপারে তাঁর রেওয়াজেত ধর্ষণ।



প্রভৃতি গ্রহে বিদ্যমান রয়েছে। আবু সুফিয়ানের আন্তরিক বাসনা ছিল যে, সে এই সুযোগে রসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কে এমন কিছু কথাবার্তা বলবে যাতে, সম্রাটের সামনে তাঁর ভাবমূর্তি সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু আবু সুফিয়ান নিজেই বলে যে, আমার এই ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করার পথে একটিমাত্র অন্তরায় ছিল। তা এই যে, আমার মুখ দিয়ে কোন সুম্পষ্ট মিথ্যা কথা বের হয়ে পড়লে সম্রাটের দৃষ্টিতে হয় পতিপন্ন হব এবং আমার সঙ্গীরা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে ভৎসনা করবে। তখন আমার মনে মি'রাজের ঘটনাটি বর্ণনা করার ইচ্ছা জাগে। এটা যে মিথ্যা ঘটনা তা সম্রাট নিজেই বুঝে নেবেন। আমি বললাম : আমি তাঁর ব্যাপারটি আপনার কাছে বর্ণনা করছি। আপনি নিজেই উপলক্ষি কর্তে পারবেন যে, ব্যাপারটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। হিরাক্লিয়াস জিজ্ঞেস করলেন, ঘটনাটি কি? আবু সুফিয়ান বলল : নবুয়তের এই দাবীদারের উক্তি এই যে, সে এক রাগ্নিতে মক্কা মোকাদ্দরমা থেকে বের হয়ে বায়তুল মোকাদ্দাস পর্যন্ত পৌঁছেছে এবং সে রাগ্নেই প্রত্যুষের পূর্বে মক্কা আমাদের কাছে ফিরে গেছে।

ইলিয়ান ( বায়তুল মোকাদ্দাসের ) সর্বপ্রধান শাজক ও পণ্ডিত তখন রোম সম্রাটের পেছনেই দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি বললেন : আমি সে রাগ্নি সম্পর্কে জানি। রোম সম্রাট তাঁর দিকে ফিরলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন : আপনি এ সম্পর্কে কিরূপে জানেন? সে বলল : আমার অভ্যাস ছিল যে, বায়তুল মোকাদ্দাসের সব দরজা বন্ধ না করা পর্যন্ত আমি শয্যা গ্রহণ করতাম না। সে রাগ্নে আমি অভ্যাস অনুযায়ী সব দরজা বন্ধ করে দিলাম, কিন্তু একটি দরজা আমার পক্ষে বন্ধ করা সম্ভব হল না। আমি আমার কর্মচারীদের ডেকে আনলাম। তারা সম্মিলিতভাবে চেষ্টা চালাল। কিন্তু দরজাটি তাদের পক্ষেও বন্ধ করা সম্ভব হল না। (দরজার রূপটি স্বস্থান থেকে মোটেই নড়ছিল না)। মনে হচ্ছিল যেন আমরা কোন পাহাড়ের গায়ে খান্না লাগাচ্ছি। আমি অপারক হয়ে কর্মকার ও মিস্ত্রীদেরকে ডেকে আনলাম। তারা পরীক্ষা করে বলল : রূপটির উপর দরজার প্রাচীরের বোঝা চেপে বসেছে। এখন ভোর না হওয়া পর্যন্ত দরজা বন্ধ করার কোন উপায় নেই। সকালে আমরা চেষ্টা করে দেখব, কি করা যায়। আমি বাধ্য হয়ে ফিরে এলাম এবং দরজার রূপটি খোলাই থেকে গেল। সকাল হওয়া মাত্র আমি সে দরজার নিকট উপস্থিত হয়ে দেখি যে, মসজিদের দরজার কাছে ছিন্ন করা একটি প্রস্তর খণ্ড পড়ে রয়েছে। মনে হচ্ছিল যে, ওখানে কোন জন্তু বাঁধা হয়েছিল। তখন আমি সঙ্গীদেরকে বলেছিলাম : আল্লাহ্ তা'আলা এ দরজাটি সম্ভবত একারণে বন্ধ হতে দেননি যে, কোন নবী এখানে আগমন করেছিলেন। অতঃপর তিনি বর্ণনা করেন যে, ঐ রাগ্নে তিনি আমাদের মসজিদে নামায পড়েন। অতঃপর তিনি আরও বিশদ বর্ণনা দিলেন।—( ইবনে কাসীর, ৩য় খণ্ড, ২৪ পৃঃ )

ইসরা ও মি'রাজের তারিখ : ইমাম কুরতুবী স্বীয় তফসীর গ্রন্থে বলেন : মি'রাজের তারিখ সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়াজে বর্ণিত রয়েছে। মুসা ইবনে ওকবার রেওয়াজে এই যে, ঘটনাটি হিজরতের ছয় মাস পূর্বে সংঘটিত হয়। হযরত আয়েশা (রা) বলেন : হযরত খাদীজা (রা)-র ওফাত নামায ফরয হওয়ার পূর্বেই হয়েছিল। ইমাম মুহন্নী বলেন : হযরত খাদীজা (রা)-র ওফাত নবুয়তপ্রাপ্তির সাত বছর পরে হয়েছিল।

কোন কোন রেওয়াজেতে রয়েছে, মি'রাজের ঘটনা নব্বয়ত প্রাপ্তির পাঁচ বছর পরে ঘটেছে। ইবনে ইসহাক বলেন : মি'রাজের ঘটনা তখন ঘটেছিল, যখন ইসলাম আনবের সাধারণ গোত্রসমূহে বিস্তৃতি লাভ করেছিল। এসব রেওয়াজেতের সান্নমর্ম এই যে, মি'রাজের ঘটনাটি হিজরতের কয়েক বছর পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল।

হরবী বলেন : ইসরা ও মি'রাজের ঘটনা রবিউসসানী মাসের ২৭ তম রাত্তিতে হিজরতের এক বছর পূর্বে ঘটেছে। ইবনে কাসেম সাহাবী বলেন : নব্বয়তপ্রাপ্তির আঠার মাস পর এ ঘটনা ঘটেছে। মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন রেওয়াজেত উল্লেখ করার পরে কোন সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করেন নি। কিন্তু সাধারণভাবে খ্যাত এই যে, রজব মাসের ২৭তম রাত্তি মি'রাজের রাত্তি। **والله سبحانه و اعلم**

মসজিদে হারাম ও মসজিদে আকসা : হযরত আব্বাস গিফারী (রা) বলেন : আমি রসুলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞেস করলাম : বিশ্বের সর্বপ্রথম মসজিদ কোনটি? তিনি বললেন : মসজিদে হারাম। অতঃপর আমি আরম্ভ করলাম : এরপর কোনটি? তিনি বললেন : মসজিদে আকসা। আমি জিজ্ঞেস করলাম : এতদূত্বয়ের নির্মাণের মধ্যে কত দিনের ব্যবধান রয়েছে? তিনি বললেন : চল্লিশ বছর। তিনি আরও বললেন : এ তো হচ্ছে মসজিদদ্বয়ের নির্মাণক্রম। কিন্তু আন্বাহ তা'আলা আমাদের জন্য সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠকেই মসজিদ করে দিয়েছেন। যেখানে নামাযের সময় হয়, সেখানেই নামায পড়ে নাও।—( মুসলিম )

তফসীরবিদ মুজাহিদ বলেন : আন্বাহ তা'আলা বায়তুল্লাহর স্থানকে সমগ্র ভূপৃষ্ঠ থেকে দু'হাজার বছর পূর্বে সৃষ্টি করেছেন এবং এর ভিত্তি স্তর সপ্তম যমীনের অভ্যন্তর পর্যন্ত পৌঁছেছে। মসজিদে আকসা হযরত সোলায়মান (আ) নির্মাণ করেছেন।—( নাসায়ী, তফসীর কুরতুবী, ১২৭ পৃ, ৪র্থ খণ্ড )

বায়তুল্লাহর চারপাশে নির্মিত মসজিদকে মসজিদে হারাম বলা হয়। মাঝে মাঝে সমগ্র হরমকেও মসজিদে হারাম বলে দেওয়া হয়। এ অর্থের দিক দিয়ে দু'টি রেওয়াজেতের এ বৈপরিত্যও দূর হয়ে যায় যে, এক রেওয়াজেতে বলা হয়েছে, রসুলুল্লাহ (সা)-র হযরত উম্ম হানীর গৃহ থেকে ঈসরার উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে যান এবং অন্য এক রেওয়াজেতে কা'বার হাতীম থেকে রওয়ানা হওয়ার কথা বর্ণিত রয়েছে। মসজিদে হারামের শেষোক্ত অর্থ নেওয়া হলে এটা অসম্ভব নয় যে, তিনি প্রথমে উম্ম হানীর গৃহে ছিলেন। অতঃপর সেখান থেকে কা'বার হাতীমে আগমন করেন এবং সেখান থেকে সফরের সূচনা হয়। **والله اعلم**

মসজিদে আকসা ও সিরিয়ায় বরকত : আন্বাহে **بَارَكْنَا حَوْلَهُ** বলা হয়েছে। এখানে **حول** বলে সমগ্র সিরিয়াকে বুঝানো হয়েছে। এক হাদীসে রয়েছে, আন্বাহ তা'আলা আবশ থেকে ফোরাত নদী পর্যন্ত বরকতময় ভূ-পৃষ্ঠকে বিশেষ পবিত্রতা দান করেছেন।—( রাহুল মা'আনী )

এর বরকতসমূহ দ্বিবিধ : ধর্মীয় ঐ জাগতিক । ধর্মীয় বরকত এই যে, এ ভূ-ভাগটি পূর্ববর্তী সব পরগণ্ডারের কেবলা, বাসস্থান এবং সমাধিস্থান । জাগতিক বরকত হচ্ছে যে, এর উর্বর ভূমি, অসংখ্য ঝরণা ও বহুমান নদ-নদী এবং অক্ষুরত ফল-ফসলের বাগানাদি । বিভিন্ন ধরনের সুমিষ্ট ফল উৎপাদনের ক্ষেত্রে এ অঞ্চলটির তুলনা সতাই বিরল ।

হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা) বলেন : রসূলুল্লাহ (সা)-র নেওয়ামতে আলাহ তা'আলা বলেছেন, হে শাম ভূমি ! শহরসমূহের মধ্যে তুমি আমার মনোনীত ভূ-ভাগ । আমি তোমার কাছেই স্বীয় মনোনীত বান্দাদেরকে পৌঁছে দেব । --(কুরতুবী) মসনদে আহমদ গ্রন্থে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, দাঈজান সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণ করবে, কিন্তু চারটি মসজিদ পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না--(১) মদীনার মসজিদ (২) মক্কার মসজিদ (৩) মসজিদে আকসা এবং (৪) মসজিদে তুর ।

وَأَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا تَنخَبُوا  
مِنْ دُونِي وَكَيْلًا ۝ ذُرِّيَّةً مِّنْ حَمَلَتَا نُوحٍ مِّائَةً كَانَتْ  
عِبَادًا أَكْثَرًا ۝

(২) আমি মুসাকে কিতাব দিয়েছি এবং সেটিকে বনী ইসরাঈলের জন্য হিদায়তে পরিণত করেছি যে, তোমরা আমাকে ছাড়া কাউকে কার্যনির্বাহী স্থির করো না ।  
(৩) তোমরা তাদের সন্তান, যাদেরকে আমি নূহের সাথে সওয়ার করিয়েছিলাম । নিশ্চয় সে ছিল রক্তজ বান্দা !

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং আমি মুসা (আ)-কে (তওরাত) গ্রন্থ দিয়েছি এবং আমি সেটিকে বনী-ইসরাঈলের জন্য হিদায়তে (অর্থাৎ হিদায়তের উপায়) করেছি ( তাতে অন্যান্য বিধানসহ তওহীদের এই গুরুত্বপূর্ণ বিধানও ছিল ) যে, তোমরা আমাকে ছাড়া (নিজেদের) কোন কার্যনির্বাহী স্থির করো না । হে সেই সব লোকের বংশধরেরা ; যাদেরকে আমি নূহ (আ)-র সাথে (নৌকায়) আনোহণ করিয়েছিলাম, (আমি তোমাদেরকে বলছি, যাতে সে নিয়ামতের কথা স্মরণ করে । আমি যদি তাদেরকে নৌকায় আনোহণ করিয়ে রাখা না করতাম, তবে কিরাপে আজ তোমরা তাদের বংশধর হতে ? নিয়ামতটি স্মরণ করে তার শোকর কর এবং শোকরের প্রধান অঙ্গ হচ্ছে তওহীদ । আর নূহ (আ) খুবই শোকর-ওয়ার বান্দা ছিলেন । (সূত্রাৎ পরগণ্ডারগণ যখন শোকর করেছেন, তখন তোমরা তা কিরাপে পরিত্যাগ করিতে পার ) ?

وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ  
 مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ۝ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا  
 عَلَيْكُمْ عِبَادًا نَّآؤُلُوبِي بَاسٍ شَدِيدٍ فَمَا سَوْأَ خَلَلِ الدِّيَارِ وَكَانَ  
 وَعْدًا مَّفْعُولًا ۝ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ  
 وَبَيِّنَاتٍ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ۝ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ  
 وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۚ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيُسُوءَا وَجُوهَكُمْ  
 وَلِيُدْخِلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا  
 تَتَّبِعُوا ۝ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ ۚ وَإِنْ عُدتُمْ عُدتُمْ فَجَعَلْنَا  
 جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ۝

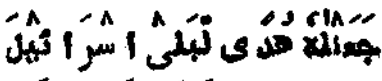
(৪) আমি বনী-ইসরাঈলকে কিতাবে পরিষ্কার বলে দিয়েছি যে, তোমরা পৃথিবীর  
 দু'বার অনর্থ সৃষ্টি করবে এবং অত্যন্ত বড় ধরনের অবাধ্যতা লিপ্ত হবে। (৫)  
 অতঃপর যখন প্রতিশ্রুত সেই প্রথম সময়টি এল, তখন আমি তোমাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ  
 করলাম আমার কঠোর যোদ্ধা বান্দাদেরকে। অতঃপর তারা প্রতিটি জনপদের জানাচে-  
 কানাচে পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল। এ ওয়াদা পূর্ণ হওয়ারই ছিল। (৬) অতঃপর আমি  
 তোমাদের জন্য তাদের বিরুদ্ধে পালা ঘুরিয়ে দিলাম, তোমাদেরকে ধনসম্পদ ও পুত্রসন্তান  
 দ্বারা সাহায্য করলাম এবং তোমাদেরকে জনসংখ্যার দিক দিয়ে একটা বিরাট বাহিনীতে  
 পরিণত করলাম। (৭) তোমরা যদি ভাল কর, তবে নিজেদেরই ভাল করবে এবং  
 যদি মন্দ কর তবে তাও নিজেদের জন্যই। এরপর যখন দ্বিতীয় সে সময়টি এল, তখন  
 অন্য বান্দাদেরকে প্রেরণ করলাম, যাতে তোমাদের মুখমণ্ডল বিকৃত করে দেয়, আর  
 মসজিদে ঢুকে পড়ে যেমন প্রথমবার ঢুকে ছিল এবং যেখানেই জম্মী হয়, সেখানেই পুরোপুরি  
 ধ্বংস যজ্ঞ চালায়। (৮) হরত তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন।  
 কিন্তু যদি পুনরায় তদ্রূপ কর, আমিও পুনরায় তাই করব। আমি জাহান্নামকে কাফিরদের  
 জন্য কয়েদখানা করেছি।

তক্ষসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি বনী-ইসরাঈলকে ( তওরাত অথবা ইসরাঈল বংশীয় অন্যান্য পয়গম্বরের সহীফা ) প্রহ্নে একথা ( ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে ) বলে দিয়েছিলাম, যে তোমরা ( শাম ) দেশে দু'বার ( প্রচুর গোনাহ্ করে ) অনর্থ সৃষ্টি করবে [ একবার মুসা (আ)-র শরীয়তের বিরোধিতা করে । ] এবং অন্যদের উপরও খুব বল প্রয়োগ করতে থাকবে ( অর্থাৎ অত্যা-

চাল-উৎপীড়ন করবে ) **تَفْسُدُنَّ** বলে আত্মাহ্ন হক নষ্ট করার প্রতি এবং **لَتَعْلُنَّ** বলে বান্দার হক নষ্ট করার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে । একথাও বলে দেওয়া হয়েছিল যে, উভয়বার তোমরা ভীষণ অমাবে পতিত হবে ) । অতঃপর যখন প্রথমবারের ওয়াদা আসবে, তখন আমি তোমাদের উপর এমন বান্দাদেরকে চাপিয়ে দেব, যারা অত্যন্ত যুদ্ধপ্রিয় হবে । অতঃপর তারা ( তোমাদের ) গৃহসমূহে প্রবেশ করবে ( এবং তোমাদেরকে হত্যা, বন্দী ও লুটতরাজ করবে ) । এটা ( শান্তির এমন ) এক ওয়াদা, যা অবশ্যই পূর্ণ হবে । অতঃপর ( যখন তোমরা স্বীয় কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হবে এবং তওবা করবে, তখন ) আমি পুনরায় ওদের উপর তোমাদেরকে প্রাধান্য দান করব ( যদিও তা হবে পরোক্ষভাবে । অর্থাৎ যে জাতি তাদের বিরুদ্ধে প্রাধান্য লাভ করবে, তারা তোমাদের মিত্র হয়ে যাবে ) । এভাবে তোমাদের শত্রু সে জাতির কাছে এবং তোমাদের কাছে পরাভূত হয়ে যাবে । এবং অর্থসম্পদ ও পুত্র-সন্তান দ্বারা ( যেগুলো বন্দী ও লুট করা হয়েছিল ) আমি তোমাদের সাহায্য করব অর্থাৎ এসব বস্তু-সামগ্রী তোমরা ফেরত পেয়ে যাবে । ফলে তোমরা শক্তিশালী হবে এবং আমি তোমাদের দল ( অর্থাৎ অনুসারীদের )-কে বৃদ্ধি করব । ( সুতরাং জাঁক-জমক, ধনসম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও অনুসারী সব কিছুতেই উন্নতি হবে । আর সে প্রহ্নে এ উপদেশও লিখেছিলাম যে ) যদি ( ভবিষ্যতে ) ভাল কাজ কর, তবে নিজেদের উপক রার্থেই তা করবে ( অর্থাৎ ইহকাল ও পরকালে এর উপকার পাবে ) এবং যদি ( পুনরায় ) তোমরা মন্দ কাজ কর তবে, তাও নিজেদের জন্যই করবে । ( অর্থাৎ আবার শান্তি ভোগ করবে । সেমতে তাই হয়েছে । যেমন, অতঃপর বর্ণনা করা হয়েছে যে ) এরপর যখন ( উপরোক্ত দু'বার অনর্থ সৃষ্টির মধ্য থেকে ) শেষবারের সময় আসবে [ তখন তোমরা ইসা (আ)-র শরীয়তের বিরোধিতা করবে ] তখন আমি পুনরায় তোমাদের উপর অপরকে জয়ী করে দেব, যাতে ( তারা পিঠিয়ে ) তোমাদের মুখমণ্ডল বিকৃত করে দেয় এবং যেভাবে তারা ( পূর্ববর্তী লোকেরা বায়তুল মোকাদাসের ) মসজিদে ( লুটতরাজ করতে করতে ) চুকেছিল, এরাও ( অর্থাৎ পরবর্তী লোকেরাও ) তাতে চুকে পড়বে এবং যে বস্তু তাদের হস্তগত হবে সেগুলোকে ( ধ্বংস ও ) বরবাদ করে দেবে । [ এবং সে প্রহ্নে একথাও লিখেছিলাম যে, এই দ্বিতীয়বারের পর যখন মুহাম্মদ (স)-এর আমল আসবে, তখন তোমরা বিরোধিতা ও অবাধ্যতা না করে তাঁর শরীয়তের অনুসরণ কর । তাতে ] আশ্চর্য নয় ( অর্থাৎ ওয়াদার অর্থে আশা রয়েছে ) যে, তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের প্রতি রহমত করবেন ( এবং তোমাদেরকে পুনরায় অপমানের হাত থেকে মুক্তি দেবেন ) এবং যদি তোমরা পুনরায় সে ( অপ ) কর্ম কর, তবে আমিও পুনরায় সে ( শান্তি ) ব্যবহার করব । ( সুতরাং রসুল্লাহ্

(সি)-র আমলে তারা তাঁর বিরোধিতা করলে পুনরায় নিহত, বন্দী ও লাঞ্ছিত হয়েছে। এটা হল ইহকালের শাস্তি এবং (পরকালে) আমি জাহান্নামকে (এমন) কাফিরদের জেলখানা করেই রেখেছি।

পূর্বাঙ্গ সম্পর্ক : ইতিপূর্বেকার  আয়াতে

শরীয়তের বিধি-বিধান এবং আক্কাহর নির্দেশাবলী অনুসরণের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে এগুলোর বিরুদ্ধাচরণের অশুভ পরিণতি সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন ও সাবধান বাণী উচ্চারণের বিষয় বর্ণিত হয়েছে। আয়াতগুলোতে শিক্ষা ও উপদেশের জন্য বনী-ইসরাঈলের দু'টি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমবার আক্কাহর নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত হলে আক্কাহ তা'আলা শত্রুদেরকে তাদের উপর চাপিয়ে দেন। ওরা তাদেরকে চরম বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দেয়। এরপর তারা কিছুটা হাঁশিয়ার হলে এবং অনাচারের অভি্যাস কিছুটা কমে আসলে তাদের অবস্থার উন্নতি হয়। কিন্তু কিছু দিন পর আবার তাদের মধ্যে অনাচার ও কুকর্ম মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ফলে আক্কাহ তা'আলা পুনরায় শত্রুদের হাতে লাঞ্ছিত করেন। কোরআন পাকে দু'টি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু ইতিহাসে এ ধরনের ছয়টি ঘটনা বিবৃত হয়েছে।

প্রথম ঘটনা : বর্তমান মসজিদে আকসার প্রতিষ্ঠাতা হযরত সোলায়মান (আ)-এর ওফাতের কিছু দিন পরে সংশ্লিষ্ট প্রথম ঘটনাটি সংঘটিত হয়। বায়তুল মোকাদ্দাসের শাসনকর্তা ধর্মদ্রোহিতা ও কুকর্মের পথ অবলম্বন করলে মিসরের জনৈক সম্রাট তাঁর উপর চড়াও হয় এবং বায়তুল মোকাদ্দাসের স্বর্ণ ও রৌপ্যের আসবাবপত্র লুট করে নিয়ে যায়, কিন্তু নগরী ও মসজিদকে বিধ্বস্ত করেনি।

দ্বিতীয় ঘটনা : এর প্রায় চারশত বছর পর সংঘটিত হয় দ্বিতীয় ঘটনাটি। বায়তুল মোকাদ্দাসে বসবাসকারী কতিপয় ইহুদী মূর্তি পূজা শুরু করে দেয় এবং অবশিষ্টরা অনৈক্যের শিকার হয়ে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহে লিপ্ত হয়। পরিণামে পুনরায় মিসরের জনৈক সম্রাট তাদের উপর আক্রমণ চালায় এবং নগরী ও মসজিদ প্রাচীরেরও কিছুটা ক্ষতিসাধন করে। এরপর তাদের অবস্থার যৎকিঞ্চিৎ উন্নতি হয়।

তৃতীয় ঘটনা : এর কয়েক বছর পর তৃতীয় ঘটনাটি সংঘটিত হয়, যখন বাবেল সম্রাট বুখতা নহর বায়তুল মোকাদ্দাস আক্রমণ করে এবং শহরটি পদানত করে প্রচুর ধনসম্পদ লুট করে নেয়। সে অনেক লোককে বন্দী করে সঙ্গে নিয়ে যায় এবং সাবেক সম্রাট পরিবারের জনৈক ব্যক্তিকে নিজের প্রতিনিধিরূপে মগরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে।

চতুর্থ ঘটনা : এর কারণ এই যে, উপরোক্ত নতুন সম্রাট ছিল মূর্তিপূজক ও অনাচারী। সে বুখতা নহরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে বুখতা নহর পুনরায় বায়তুল মোকাদ্দাস আক্রমণ করে। এবার সে হত্যা ও লুটতরাজের চূড়ান্ত করে দেয়। আশুন লাগিয়ে সমগ্র শহরটিকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে দেয়। এ দুর্ঘটনাটি সোলায়মান (আ) কর্তৃক মসজিদ নির্মাণের প্রায় ৪১৫ বছর পর সংঘটিত হয়। এরপর ইহুদীরা এখান থেকে নির্বাসিত হয়ে বাবেলে স্থানান্তরিত হয়। সেখানে চরম অপমান, লাঞ্ছনা ও দুর্গতির

মাঝে সত্তর বছর অতিবাহিত হয়। অতঃপর ইরান সম্রাট বাবেলেও চড়াও হয়ে বাবেল অধিকার করে নেয়। ইরান সম্রাট নির্বাসিত ইহুদীদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাদেরকে পুনরায় সিন্ধিয়ান পৌছে দেয় এবং তাদের লুণ্ঠিত প্রব্য-সামগ্রীও তাদের হাতে প্রত্যর্পণ করে। এ সময় ইহুদীরা নিজেদের কুকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে এবং নতুনভাবে বসতি স্থাপন করে ইরান সম্রাটের সহযোগিতায় পূর্বের নমুনা অনুযায়ী মসজিদে আকসা পুনর্নির্মাণ করে।

**পঞ্চম ঘটনা :** ইহুদীরা এখানে পুনরায় সুখে-শ্রাস্হন্দ্যে জীবন-যাপন করে অতীতকে সম্পূর্ণ ভুলে যায়। তারা আবার ব্যাপকভাবে গাপে লিপ্ত হয়ে পড়ে। অতঃপর হযরত ঈসা (আ)-র জন্মের ১৭০ বছর পূর্বে এ ঘটনাটি সংঘটিত হয়। আন্তাকিয়া শহরের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট ইহুদীদের উপর চড়াও হয়। সে চল্লিশ হাজার ইহুদীকে হত্যা এবং চল্লিশ হাজারকে বন্দী ও গোলাম বানিয়ে সঙ্গে নিয়ে যায়। সে মসজিদেও অবমাননা করে, কিন্তু মসজিদের মূল ভবনটি রক্ষা পেয়ে যায়। পরবর্তী পর্যায়ে এ সম্রাটের উত্তরাধিকারীরা শহর ও মসজিদকে সম্পূর্ণ মরদান্যে পরিণত করে দেয়। এর কিছু দিন পর বায়তুল মোকাদ্দাস রোম সম্রাটদের দখলে চলে যায়। তারা মসজিদে সংস্কার সাধন করে এবং এর আট বছর পর হযরত ঈসা (আ) দুনিয়াতে আগমন করেন।

**ষষ্ঠ ঘটনা :** হযরত ঈসা (আ)-র সশরীরে আকাশে উত্তীর্ণ হওয়ার চল্লিশ বছর পর ষষ্ঠ ঘটনাটি ঘটে। ইহুদীরা রোম সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। ফলে রোমকরা শহর ও মসজিদ পুনরায় বিধ্বস্ত করে পূর্বের ন্যায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে দেয়। তখনকার সম্রাটের নাম ছিল তাইতিস। সে ইহুদীও ছিল না এবং খৃষ্টানও ছিল না। কেননা তার অনেক দিন পর কনস্টানটাইন প্রথম খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে। এরপর থেকে খলীফা হযরত ওমর (রা)-এর আমল পর্যন্ত মসজিদটি বিধ্বস্ত অবস্থায় পড়ে ছিল। হযরত ওমর (রা) এটি পুনর্নির্মাণ করান। এ ছয়টি ঘটনা তফসীরে হকানীর বরাতে দিয়ে তফসীরে বয়ানুল কোরআনে লিখিত হয়েছে।

এখন প্রশ্ন এই যে, এই ছয়টি ঘটনার মধ্যে কোরআনে উল্লিখিত দু'টি ঘটনা কোনগুলো? এর চূড়ান্ত ফয়সলা করা কঠিন। তবে বাহাত এগুলো মধ্যে যে ঘটনাগুলো অধিক গুরুতর ও প্রধান এবং যেগুলোর মধ্যে ইহুদীদের নষ্টামিও অধিক হয়েছে এবং শাস্তিও কঠোরতর পেয়েছে, সেগুলোই বোঝা দরকার। বলা বাহুল্য, সেগুলো হচ্ছে চতুর্থ ও ষষ্ঠ ঘটনা। তফসীরে কুরতুবীতে এ প্রসঙ্গে সাহাবী হযরত হোযায়ফার বাচনিক একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাতেও নির্ধারিত হয় যে, এখানে চতুর্থ ও ষষ্ঠ ঘটনাই বোঝানো হয়েছে। দীর্ঘ হাদীসটির অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হল :

**হযরত হোযায়ফা বলেন :** আমি রাসুলুল্লাহ (সা)-র খিদমতে আরম্ভ করলাম, বায়তুল মোকাদ্দাস আজ্জাহ তা'আলার কাছে একটি বিরাট মর্যাদাসম্পন্ন মসজিদ। তিনি বললেন : দুনিয়ার সব গৃহের মধ্যে এটি একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মহান গৃহ। এটি আজ্জাহ তা'আলা সোলায়মান ইবনে দাউদ (আ)-এর জন্য স্বর্ণ-রৌপ্য, মণি-মুক্তা ইয়াকুত ও মস্কররদ দ্বারা নির্মাণ করেছিলেন। সোলায়মান (আ) যখন এর নির্মাণ কাজ আরম্ভ করেন,

তখন আল্লাহ্ তা'আলা জিনদের তাঁর আজাবহ করে দেন। জিনরা এসব মগি-মুক্তা ও স্বর্ণ-রৌপ্য সংগ্রহ করে মসজিদ নির্মাণ করে। হযরত হোয়ায়ফা বলেন : আমি আরহ করলাম, এরপর বায়তুল মোকাদ্দাস থেকে মগি-মুক্তা ও স্বর্ণ-রৌপ্য কোথায় এবং কিভাবে উধাও হয়ে গেল? রসুলুল্লাহ্ (সা) বললেন : বনী ইসরাঈলরা যখন আল্লাহ্‌র নাফরমানী করে, গোনাহ ও কুকর্মে লিপ্ত হন এবং পয়গম্বরগণকে হত্যা করল, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ঘাড়ে বুখতা নছরকে চাপিয়ে দিলেন। বুখতা নছর ছিল অগ্নি উপাসক।

সে সাত্তশ' বছর বায়তুল মোকাদ্দাস শাসন করে। কোরআন পাকের **فَاذْجَاءَ** আয়াতে এ **وَعَدَاؤُهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ**

ঘটনাই বোঝানো হয়েছে। বুখতা নছরের সৈন্যবাহিনী মসজিদে আকসায় ঢুকে পড়ে, পুরুষদের হত্যা, মহিলা ও শিশুদেরকে বন্দী করে এবং বায়তুল মোকাদ্দাসের সমস্ত ধনসম্পদ, স্বর্ণ-রৌপ্য ও মগি-মুক্তা এক লক্ষ সত্তর হাজার গাড়িতে বহন করে নিয়ে যায় এবং স্বদেশ বাবেলে সংরক্ষিত রাখে। সে বনী ইসরাঈলকে একশ' বছর পর্যন্ত লাশ্বনা সহকারে নানারকম কষ্টকর কাজে নিযুক্ত করে রাখে।

এরপর আল্লাহ্ তা'আলা ইরানের এক সম্রাটকে তার মুকাবেলার জন্য তৈরী করে দেন। সে বাবেল জয় করে এবং অবশিষ্ট বনী ইসরাঈলকে বুখতা নছরের বন্দীদশা থেকে মুক্ত করে। বুখতা নছর যেসব ধনসম্পদ বায়তুল মোকাদ্দাস থেকে নিয়ে গিয়েছিল, ইরানী বাদশাহ্ সেগুলোও বায়তুল মোকাদ্দাসে ফেরত পাঠিয়ে দেয়। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা বনী ইসরাঈলকে নির্দেশ দেন, যদি তোমরা আবারও নাফরমানী কর এবং গোনাহ্‌র দিকে ফিরে যাও, তবে আমিও পুনরায় হত্যা ও বন্দীত্বের আঘাৎ তোমাদের

উপর চাপিয়ে দেব। আয়াত **عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عَدْتُمْ عَدَا**

বলে একথাই বোঝানো হয়েছে।

বনী ইসরাঈলরা যখন বায়তুল মোকাদ্দাসে ফিরে এল এবং সমস্ত ধনসম্পদ ও আসবাবপত্র তাদের হস্তগত হয়ে গেল, তখন আবারও পাপ ও কুকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়ল। তখন আল্লাহ্ তা'আলা রোম সম্রাটকে তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেন।

**فَاذْجَاءَ وَعَدَاؤُهُمْ لِيَسُوءَ وَجْهَهُمْ** আয়াতে এ ঘটনাই

বোঝানো হয়েছে। রোম সম্রাট জলে ও স্থলে উভয় ক্ষেত্রে তাদের সাথে যুদ্ধ করে অগণিত লোককে হত্যা ও বন্দী করে এবং বায়তুল মোকাদ্দাসের সমস্ত ধনসম্পদ এক লক্ষ সত্তর হাজার গাড়িতে বোঝাই করে নিয়ে যায়। এসব ধনসম্পদ রোমের স্বর্ণ মন্দিরে এখনো পর্যন্ত সংরক্ষিত রয়েছে এবং থাকবে। শেষ যমানায় হযরত মাহ্‌দী আবির্ভূত হয়ে এগুলোকে আবার এক লক্ষ সত্তর হাজার নৌকা বোঝাই করে বায়তুল মোকাদ্দাসে ফিরিয়ে আনবেন



এবং এখানেই আলাহ্ তা'আলা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সব মানুষকে একত্র করবেন। (এ দীর্ঘ হাদীসটি কুরতুবী স্বীয় তফসীরে উদ্ধৃত করেছেন)।

বয়ানুল কোরআনে বলা হয়েছে, কোরআনে উল্লিখিত ঘটনাভয়ের অর্থ দুইটি শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণ। এক. মুসা (আ)-র শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণ এবং দুই. ইসা (আ)-র নবুয়ত লাভের পর তাঁর শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণ। উপরোল্লিখিত ঘটনাবলী প্রথম বিরুদ্ধাচরণের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। ঘটনাবলীর বিবরণের পর আলোচ্য আয়াতসমূহের তফসীর দেখুন।

### আনুমানিক জ্ঞাতব্য বিষয়

উল্লিখিত ঘটনাবলীর সারমর্ম এই যে, বনী ইসরাঈল সম্পর্কে আলাহ্ তা'আলার ফয়সালা ছিল এই : তারা যতদিন পর্যন্ত আলাহ্‌র আনুগত্য করবে, ততদিন ধর্মীয় ও জাগতিক ক্ষেত্রে কৃতকার্য ও সফলকাম থাকবে এবং যখনই ধর্মের প্রতি বিমুখ হয়ে পড়বে, তখনই লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে এবং শত্রুদের হাতে পিটুনি খাবে। শত্রুরা তাদের উপর প্রবল হয়ে শুধু তাদের জান ও মালেরই ক্ষতি করবে না; বরং তাদের পরম প্রিয় কেবলা বায়তুল মোকাদ্দাসও শত্রুর কবল থেকে নিরাপদ থাকবে না। তাদের কাফির শত্রু বায়তুল মোকাদ্দাসের মসজিদে ঢুকে এর অবমাননা করবে এবং একে পর্যুদস্ত করে ফেলবে। এটাও হবে বনী ইসরাঈলের শাস্তির একটি অংশবিশেষ। কোরআন পাক তাদের দু'টি ঘটনা বর্ণনা করেছে। প্রথম ঘটনা মুসা (আ)-র শরীয়ত চলাকালীন এবং দ্বিতীয় ঘটনা ইসা (আ)-র আমলের। উভয় ক্ষেত্রেই বনী ইসরাঈল সমকালীন শরীয়তের প্রতি পৃষ্ঠপদর্শন করে। ফলে প্রথম ঘটনায় জনৈক অগ্নিপূজক সন্ন্যাসিকে তাদের উপর এবং বায়তুল মোকাদ্দাসের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। সে অবর্ণনীয় ধ্বংসলীলা চালায় দ্বিতীয় ঘটনায় জনৈক রোম সন্ন্যাসিকে তাদের উপর চাপানো হয়। সে হত্যা ও লুণ্ঠিত্বরাজ করে এবং বায়তুল মোকাদ্দাসকে বিধ্বস্ত যুতোর পুরীতে পরিণত করে দেয়। সাথে সাথে একথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, উভয়ক্ষেত্রে বনী ইসরাঈলরা যখন স্বীয় কৃকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে, তখন আলাহ্ তা'আলা তাদের দেশ, ধনসম্পদ এবং জনবল ও সম্মান-সম্মতিকে পুনর্বহাল করে দেন।

এ ঘটনাঘর উল্লেখ করার পর পরিশেষে আলাহ্ তা'আলা এসব ব্যাপারে স্বীয় বিধি বর্ণনা করে বলেছেন : **وَأَن عَدُوَّكُمْ وَأَن عَدُوَّكُمْ** অর্থাৎ তোমরা পুনরায়

মানুষমানীর দিকে প্রত্যাবর্তন করলে আমিও পুনরায় এমনি ধরনের শাস্তি ও আশাব চাপিয়ে দেব। বর্ণিত এ বিধিটি কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। এতে বনী ইসরাঈলের সেসব লোককে সঙ্কোচন করা হয়েছে, যারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র আমলে বিদ্যমান ছিল। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, প্রথমবার মুসা (আ)-র শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণের কারণে এবং দ্বিতীয় বার ইসা (আ)-র শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণের কারণে যেভাবে তোমরা শাস্তি

ও আঘাবে পতিত হয়েছিলে, এখন তৃতীয় যুগ হচ্ছে শরীয়তে-মুহাম্মদীয় যুগ যা কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। এর বিরুদ্ধাচরণ করলেও তোমাদেরকে পূর্বের পরিণতিই ভোগ করতে হবে। আসলে তাই হয়েছে। তারা শরীয়তে-মুহাম্মদী ও ইসলামের বিরুদ্ধাচরণে প্ররুষ্ট হলে মুসলমানদের হাতে নির্বাসিত লান্হিত ও অপমানিত তো হয়েছেই, শেষ পর্যন্ত তাদের পবিত্র কেবলা বায়তুল মোকাদ্দাসও মুসলমানদের করতলগত হয়েছে। পার্থক্য এতটুকু যে, পূর্ববর্তী সম্রাটরা তাদেরকেও অপমানিত ও লান্হিত করেছিল এবং তাদের পবিত্র কেবলা বায়তুল মোকাদ্দাসেরও অবমাননা করেছিল। কিন্তু মুসলমানরা বায়তুল মোকাদ্দাস জয় করার পর শত শত বছর যাবত বিধ্বস্ত ও পরিত্যক্ত মসজিদটি নতুনভাবে পুনর্নির্মাণ করেন এবং পয়গম্বরগণের এ কিবলার মথামথ সম্মান পুনর্বহাল করেন।

বনী ইসরাইলের ঘটনাবলী মুসলমানদের জন্য শিক্ষাপ্রদ ॥ বায়তুল মোকাদ্দাসের বর্তমান ঘটনা, এ ঘটনা পরম্পরের একটি অংশ : বনী ইসরাইলদের এসব ঘটনা কোরআন পাকে বর্ণনা করা এবং মুসলমানদেরকে শোনার উদ্দেশ্য বাহ্যত এই যে, মুসলমানগণ এ আক্লাহ প্রদত্ত বিধি-ব্যবস্থা থেকে আলাদা নয়। তাদের ধর্মীয় ও পার্থিব সম্মান, শান-শওকত, অর্থসম্পদ ও আক্লাহর আনুগত্যের সাথে ওত্তপ্রোতভাবে জড়িত। যখন তারা আক্লাহ ও রসুলের আনুগত্য থেকে বিমুখ হয়ে যাবে, তখন তাদের শত্রু ও কাফিরদেরকে তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে, তাদের হাতে তাদের উপাসনালয় ও মসজিদ-সমূহেরও অবমাননা হবে +

সাম্প্রতিককালে বায়তুল মোকাদ্দাসের উপর ইহুদীদের অধিকার এবং তাতে অগ্নি-সংযোগের হাদিসবিদারুক ঘটনা সমগ্র মুসলিম বিশ্বকে উত্তেজিত করে রেখেছে। সত্য বলতে কি, এতে করে কোরআনের উপরোক্ত বক্তব্যেরই সত্যায়ন হচ্ছে। মুসলমানগণ আক্লাহ ও তাঁর রসুলকে বিস্মৃত হয়েছে, পরকাল থেকে পাকিল হয়ে পার্থিব শান-শওকতে মনোনিবেশ করেছে এবং কোরআন ও সুন্নাহর বিধি-বিধান থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করে নিয়েছে। ফলে আক্লাহর কুদরতের সেই বিধানই আশ্চর্যপ্রকাশ করেছে যে, কোটি কোটি আত্মবিরুদ্ধে কয়েক লাখ ইহুদী যুদ্ধে জয়লাভ করেছে। তারা আত্মবিরুদ্ধে ধনসম্পদের বিস্তার ক্ষতি সাধান করেছে এবং ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে বিশ্বের তিনটি শ্রেষ্ঠতম মসজিদের একটি মসজিদ—যা সব সময়ই পয়গম্বরগণের কিবলা ছিল—আত্মবিরুদ্ধে কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। যে জাতি বিশ্বে সর্বাধিক ঘৃণিত ও লান্হিত বলে গণ্য হত, আজ সে ইহুদী জাতিই আত্মবিরুদ্ধে উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে। তদুপরি দেখা যায়, এ জাতি সংখ্যান মুসলমানদের মুকাবিলায় কোন ধর্তব্যের মধ্যেই আসে না এবং মুসলমানদের সমষ্টিগত সমরাত্মের মুকাবিলায়ও ওদের কোন গুরুত্ব নেই। এতে আরও প্রতীয়মান হয় যে, এ ঘটনাটি ইহুদীদেরকে কোন সম্মানের আসন দান করে না। তবে এটা মুসলমানদের অবাধ্যতার শাস্তি অবশ্যই। এ থেকে পরিকার ফুটে উঠেছে যে, যা কিছু ঘটেছে, তা আমাদের কুকর্মের শাস্তি হিসাবেই ঘটেছে। এর একমাত্র প্রতিকার হিসাবে যদি আমরা স্বীয় দুর্কর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে ঠাণ্ডা মনে তওবা করি, আক্লাহর নির্দেশাবলীর আনুগত্যে আত্মনিয়োগ করি, সাদ্চা মুসলমান হয়ে যাই, বিজাতির অনুকল্পণ

ও বিজাতির উপর ভরসা করা থেকে বিরত হই, তবে ওয়াদা অনুযায়ী ইনশাআল্লাহ্ বায়তুল মোকাদ্দাস ও ফিলিস্তীন আবার আমাদের অধিকারভুক্ত হবে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, আজকালকার আরব শাসকবর্গ এবং সেখানকার মুসলমান জনগণ এখনও এ সত্য অনুধাবন করতে সক্ষম হয়নি। তারা এখন বিজাতির সাহায্যের উপর ভরসা করে বায়তুল মোকাদ্দাস উদ্ধার করার পরিকল্পনা ও নকশা তৈরী করছে। অথচ বাহ্যত এর কোন সন্ভাবনা দেখা যায় না। **فَا لِّلّٰهِ الْمَشْرِئُ**

যে অস্ত্র-শস্ত্র ও সমরোপকরণ যারা বায়তুল মোকাদ্দাস ও ফিলিস্তীন পুনরায় মুসলমানদের অধিকারে আসতে পারে, তা হচ্ছে শুধু আল্লাহর প্রতি প্রত্যাবর্তন, পরকালে বিশ্বাস, শরীয়তের বিধি-বিধানের অনুসরণ, নিজেদের সমাজ ব্যবস্থা ও রাজনীতিতে বিজাতির উপর ভরসা ও তাদের অনুকরণ থেকে আশ্রয়লাভ এবং পুনরায় আল্লাহর উপর ভরসা করে খাঁটি ইসলামী জিহাদ। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের আরব শাসকবর্গকে এবং অন্যান্য মুসলমানদেরকে এর তওফীক দান করুন।

একটি আশ্চর্যজনক ব্যাপার : আল্লাহ্ তা'আলা ভূ-পৃষ্ঠে ইবাদতের জন্য দু'টি স্থানকে ইবাদতকারীদের কেবলা করেছেন। একটি বায়তুল মোকাদ্দাস আর অপরাটি বায়তুল্লাহ্। কিন্তু আল্লাহর আইন উভয় ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন। বায়তুল্লাহর রক্ষণাবেক্ষণ এবং কাফিরদের হাত থেকে এনে রাখিয়ে রাখার দায়িত্ব আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং গ্রহণ করেছেন। এরই পরিণতি হস্তী বাহিনীর সে ঘটনা, যাকোরআন পাকের সূরা ফীলে উল্লেখ করা হয়েছে। ইমামানের খু'টান বাদশাহ্ বায়তুল্লাহ্ ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে অভিমান করলে আল্লাহ্ তা'আলা বিরাট হস্তী বাহিনীসহ তাকে বায়তুল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার পূর্বেই পাখীদের মাধ্যমে বিধ্বস্ত ও বরবাদ করে দেন।

কিন্তু বায়তুল মোকাদ্দাসের ক্ষেত্রে এ আইন নেই। বরং আলোচ্য আয়াতগুলো থেকে জানা যায় যে, মুসলমানরা যখন পথভ্রষ্টতা ও গোনাহে লিপ্ত হবে, তখন শাস্তি হিসাবে তাদের কাছ থেকে এ কিবলাও ছিনিয়ে নেওয়া হবে এবং কাফিররা এর উপর প্রাধান্য বিস্তার করবে।

কাফির আল্লাহর বান্দা, কিন্তু প্রিয় বান্দা নয় : উল্লিখিত প্রথম ঘটনায় কোরআন পাক বলেছে, আল্লাহর দীনের অনুসারীরা যখন ফিতনা ও ফাসাদে লিপ্ত হয়ে পড়বে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের উপর এমন বান্দাদেরকে চাপিয়ে দেবেন, যারা তাদের ঘরে প্রবেশ করে তাদের উপর হত্যা ও লুটতরাজ চালাবে। এ স্থলে কোরআন পাক **عِبَادًا لَّنَا**

শব্দ ব্যবহার করেছে— **عِبَادًا لَّنَا** বলেনি। অথচ এটাই ছিল সংক্ষিপ্ত। এর তাৎপর্য এই যে, আল্লাহর দিকে কোন বান্দার সম্বন্ধ হয়ে যাওয়া তার জন্য পরম সম্মানের বিষয়।

যেমন, এ সূরার প্রারম্ভে **أَسْرَىٰ بِعَبْدٍ لَّا** এর অধীনে এ কথা বর্ণনা করা হয়েছে যে, শবে মিরাজে রসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে চূড়ান্ত সম্মান ও অসাধারণ নৈফত্য লাভ করেছিলেন। কোরআন পাক এ ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র

নাম অথবা কোন বিশেষ বর্ণনা করার পরিবর্তে শুধু **عِبَادًا** (বান্দা) বলে ব্যক্ত করেছে যে, মানুষের সর্বশেষ উৎকর্ষ এবং সর্বোচ্চ মর্যাদা হচ্ছে আল্লাহ্ কর্তৃক তাকে বান্দা বলে আখ্যায়িত করা। বনী ইসরাঈলকে শান্তি দেওয়ার জন্য যেসব লোককে ব্যবহার করা হয়েছিল, তারা ছিল কাফির। তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে

**عِبَادًا** শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করার পরিবর্তে **أَضَانًا** তথা সম্বন্ধ পদ পরিহার করে **عِبَادًا لَّنَا** বলেছেন। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সৃষ্টিগতভাবে তো সমগ্র মানব-মণ্ডলীই আল্লাহর বান্দা; কিন্তু ইমান ব্যতীত প্রিয় বান্দা হয় না যে, তাদের **أَضَانًا** তথা সম্বন্ধ আল্লাহর দিকে হতে পারে।

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّذِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ  
يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ۝ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ  
بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝ وَيَذُوعُ الْإِنْسَانَ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ  
بِالْخَيْرِ ۝ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ۝

(৯) এই কোরআন এমন পথ প্রদর্শন করে, যা সর্বাধিক সরল এবং সৎকর্ম-পরিচালন মু'মিনদেরকে সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য মহা পুরস্কার রয়েছে। (১০) এবং যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, আমি তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করেছি। (১১) মানুষ যেভাবে কল্যাণ কামনা করে, সেইভাবেই অকল্যাণ কামনা করে। মানুষ তো খুবই দ্রুততাপ্রিয়।

পূর্বাঙ্গ সম্পর্ক : সূরার প্রারম্ভে মি'রাজের মু'জিবান মাধ্যমে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ত্রিসালত প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে কোরআনের মু'জিবান মাধ্যমে তা প্রমাণ করা হচ্ছে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

নিশ্চয় কোরআন এমন পথ নির্দেশ করে, যা সম্পূর্ণ সরল (অর্থাৎ ইসলাম) এবং এ পথ মান্যকারী ও অমান্যকারীদের প্রতিদান ও শাস্তিও ব্যক্ত করে) সৎ কর্ম সম্পাদনকারী মু'মিনদেরকে সুসংবাদ দেয় যে, তারা বিরাট সওয়াব পাবে এবং আরও বলে যে, যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, আমি তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তৈরী করে রেখেছি। কিছু মানুষ (যেমন, কাফিররা) অমঙ্গলের (অর্থাৎ আঘাবের) এমন দোয়া করে, যেমন মঙ্গলের দোয়া (করা হয়)। মানুষ (স্বভাবতই) কিছুটা দ্রুততাপ্রিয়।

আনুশঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

‘আকওয়াম’ পথঃ কোরআন পাক যে পথ নির্দেশ করে, তাকে ‘আকওয়াম’ বলা হয়েছে। ‘আকওয়াম’ সে পথ, যা অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে নিকটবর্তী, সহজ এবং বিপদাপদমুক্তও।—( কুরতুবী ) এ থেকে বোঝা গেল যে, কোরআন পাক মানব-জীবনের জন্য যেসব বিধি-বিধান দান করে, সেগুলোতে এ তিনটি গুণই বিদ্যমান রয়েছে। যদিও মানুষ স্বল্পবুদ্ধির কারণে মাঝে মাঝে এ পথকে দুর্গম ও বিপদসংকুল মনে করতে থাকে; কিন্তু ঝাব্বুল আলামীন সৃষ্টিজগতের প্রতিটি অণু-পরমাণু সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন এবং ভূত ও ভবিষ্যৎ তাঁর কাছে সমান। একমাত্র তিনিই এ সত্য জানতে পারেন যে, মানুষের উপকার কোন কাজে ও কিভাবে বেশি। স্বল্প মানুশ যেহেতু সামগ্রিক অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত নয়, তাই সে নিজের ভাল-মন্দও পুরোপুরি জানতে পারে না।

সত্ত্বত এদিকে লক্ষ্য রেখেই আলোচ্য আয়াতসমূহের সর্বশেষ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানুষ তো মাঝে মাঝে তাড়াহুড়া করে নিজের জন্য এমন দোয়া করে বসে, যা পরিণামে তার জন্য ধ্বংস ও বিপর্যয় ডেকে আনে। আচ্ছাহ্ তা’আলা এমন দোয়া কবুল করে নিলে সে নিশ্চিতই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। কিন্তু আচ্ছাহ্ তা’আলা অধিকাংশ সময় এমন দোয়া তাৎক্ষণিকভাবে কবুল করেন না। শেষ পর্যন্ত মানুষ নিজেই বুঝতে পারে যে, তার এ দোয়া ভ্রান্ত এবং তার জন্য ভীষণ ক্ষতিকর ছিল। আয়াতের সর্বশেষ বাক্যে মানুষের একটি স্বভাবগত দুর্বলতা বিধির আকারে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানুষ স্বভাবের তাড়ানায়ই দ্রুততাপ্রিয়। সে বাহ্যিক লাভ-লোকসানের দিকে দৃষ্টি রাখে, অথচ পরিণাম-দর্শিতায় ভুল করে; তাৎক্ষণিক সুখ অল্প হলেও তাকে বড় ও স্থায়ী সুখের উপর অগ্রাধিকার দান করে। এ বস্তুবোরে সার্বমর্ম এই যে, আলোচ্য আয়াতে সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক দুর্বলতা বর্ণিত হয়েছে।

কোন কোন তফসীরবিদ এ আয়াতটিকে একটি বিশেষ ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত বলে সাব্যস্ত করেছেন। ঘটনাটি এই যে, নযর ইবনে হারেস একবার ইসলামের বিরোধিতায় দোয়া করে বসে যে,

اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَابًا رَّءٍ مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ -

অর্থাৎ হে আল্লাহ্, যদি আপনার কাছে ইসলামই সত্য হয়, তবে আমাদের উপর আকাশ থেকে প্রসূর হৃষ্টি বর্ষণ করুন অথবা অন্য কোন মন্ত্রপাদায়ক শাস্তি প্রেরণ করুন। এমতাবস্থায় ‘ইনসান’ শব্দ দ্বারা এই বিশেষ ব্যক্তি অথবা তার সমস্তভাবমুক্তদের বুঝতে হবে।

وَجَعَلْنَا الْيَلَّ وَالنَّهَارَ آيَاتٍ فَمَحَوْنَا آيَةَ الْيَلِّ وَجَعَلْنَا آيَةَ

النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَ  
 الْحِسَابِ ۗ وَكُلَّ شَيْءٍ فَضَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا ۝ وَكُلَّ نَاسٍ الْزَمْنَهُ  
 ظِلَّةٌ فِي عُنُقِهِ ۗ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا ۝  
 إِقْرَأْ كِتَابَكَ ۗ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ۝ مِّنْ اهْتَدَىٰ  
 فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ  
 وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ۝

(১২) আমি রাত্রি ও দিনকে দু'টি নিদর্শন করেছি। অতঃপর নিষ্পত্ত করে দিয়েছি রাতের নিদর্শন এবং দিনের নিদর্শনকে দেখার উপযোগী করেছি, যাতে তোমরা তোমাদের পালনকর্তার অনুগ্রহ অন্বেষণ কর এবং যাতে তোমরা স্থির করতে পার বহুরসমূহের গণনা ও হিসাব এবং আমি সব বিষয়কে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি। (১৩) আমি প্রত্যেক মানুষের কর্মকে তার গ্রীবালাগ্ন করে রেখেছি। কিয়ামতের দিন বের করে দেখাব তাকে একটি কিতাব, যা সে খোলা অবস্থায় পাবে। (১৪) পাঠ কর তুমি তোমার কিতাব। আজ তোমার হিসাব প্রহণের জন্য তুমিই যথেষ্ট। (১৫) যে কেউ সৎ পথে চলে, তার নিজের মঙ্গলের জন্যই সৎ পথে চলে। আর যে পথভ্রষ্ট হয়, তার নিজের জমঙ্গলের জন্যই পথভ্রষ্ট হয়। কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না। কোন রসূল না পাঠানো পর্যন্ত আমি কাউকেই শাস্তি দান করি না।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি রাত ও দিনকে স্ত্রীয় কুদরতের নিদর্শন করেছি। অতঃপর রাতের নিদর্শন (অর্থাৎ স্বয়ং রাত্রি) কে আমি নিষ্পত্ত করে দিয়েছি এবং দিনের নিদর্শনকে উজ্জ্বল করেছি (যেন এতে যাবতীয় বস্তুরামগ্রী সহজেই দেখা যায়), যাতে (তোমরা দিনের বেলায়) পালনকর্তার রুহী অন্বেষণ কর এবং (দিবারাত্রির গমনাগমন, উভয়ের রঙের পার্থক্য—একটি উজ্জ্বল ও অপরাধি অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং উভয়ের পরিমাণের বিভিন্নতা দ্বারা) বহুরসমূহের গণনা এবং (অন্যান্য ছোটখাট) হিসাব জেনে নাও। (যেমন সূরা ইউনুসের প্রথম রুকুতে বর্ণিত হয়েছে)। আমি প্রত্যেক বিষয়কে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি। (জওহে মাহ্‌কুযে সমগ্র সৃষ্টবস্তুর পূর্ণাঙ্গ বিবরণ কোন রকম ব্যতিক্রম ছাড়াই লিপিবদ্ধ রয়েছে। কোরআন পাক ও প্রয়োজনীয় বিবরণ রয়েছে। কাজেই এ বর্ণনা উভয়টির সাথেই সম্পর্কযুক্ত হতে পারে)। এবং আমি প্রত্যেক (আমলকারী) মানুষের আমলকে (সৎ হোক কিংবা অসৎ) তার গলার হার বানিয়ে রেখেছি (অর্থাৎ প্রত্যেক আমল তার সাথে ওস্তপ্রা়তভাবে জড়িত)।

এবং (অন্তঃপর) আমি কিয়ামতের দিন তার আমলনামা তার (দেখার) জন্য বের করে সামনে দেব; যা সে উন্মুক্ত অবস্থায় দেখবে। (এবং তাকে বলা হবে যে) নিজের আমলনামা (নিজেই) পাঠ কর। আজ তুমি নিজেই নিজের হিসাব পরীক্ষার জন্য যথেষ্ট। (অর্থাৎ তোমার আমল অন্য কেউ গণনা করবে, এর প্রয়োজন নেই; বরং তুমি নিজেই নিজের আমলনামা পড়ে যাও এবং হিসাব করে যাও যে, তোমার কি পরিমাণ শাস্তি ও প্রতিদান হওয়া উচিত। উদ্দেশ্য এই যে, এখনও আযাব সামনে না এলেও তা উল্বে না। এমন এক সময় আসবে, যখন মানুষ নিজের সব কাজকর্ম খোলা চোখে দেখতে পাবে এবং আযাবের মুক্তিযুক্ত প্রমাণ তার বিরুদ্ধে কয়েম হয়ে যাবে এবং) যে ব্যক্তি (দুনিয়ার সোজা) সরল পথে চলে, সে নিজের উপকারার্থেই চলে এবং যে ব্যক্তি বিপথগামী হয় সে-ও নিজেরই ক্ষতির জন্য বিপথগামী হয়। (সে তখন এর সাজা ভোগ করবে। এতে অন্যের কোন ক্ষতি নেই। কেননা, আমার আইন এই যে) কারও (পাপের) বোঝা অন্য কেউ বহন করবে না (এবং যাকে কোন শাস্তি দেওয়া হয়, তা তার কাছে সপ্রমাণ করার পর দেওয়া হয়। কেননা, আমার আইন এই যে) আমি (কখনও) শাস্তি দান করি না, যে পর্যন্ত না (তার হিদায়তের জন্য) কোন রসূল প্রেরণ না করি।

### আনুষ্ঠানিক জাভাবা বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহকে প্রথমে দিবারাত্রির পরিবর্তনকে আলাহ তা'আলার অপার শক্তির নিদর্শন সাব্যস্ত করা হয়েছে। অন্তঃপর বলা হয়েছে যে, রাত্রিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং দিনকে উজ্জ্বল করার মধ্যে বহুবিধ তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। রাত্রিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করার তাৎপর্য এখানে বর্ণনা করা হয়নি। অন্যান্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, রাত্রির অন্ধকার নিদ্রা ও আরাহের জন্য উপযুক্ত। আলাহ তা'আলা এমন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, রাত্রির অন্ধকারেই প্রত্যেক মানুষ ও জন্তুর ঘুম আসে। সমগ্র জগত একই সময়ে ঘুমায়। যদি বিভিন্ন লোকের ঘুমের জন্য বিভিন্ন সময় নির্ধারিত থাকত, তবে জাগ্রতদের হট্টগোলে ঘুমন্তদের ঘুমেও ব্যাঘাত সৃষ্টি হত।

এখানে দিনকে উজ্জ্বল্যায় করার দু'টি কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। এক দিনের আলোতে মানুষ রুখী অশ্বেষণ করতে পারে। মেহনত, মজুরি, শিল্প ও কৃষিগরি সব কিছুইর জন্য আলো অত্যাৱশ্যক। দুই দিবারাত্রির গমনাগমনের দ্বারা সন-বছরের সংখ্যা নির্ণয় করা যায়। উদাহরণত ৩৬০ দিন পূর্ণ হলে একটি সন পূর্ণতা লাভ করে।

এমনিভাবে অন্যান্য হিসাব-নিকশও দিবারাত্রির গমনাগমনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। দিবারাত্রির এই পরিবর্তন না হলে মজুরের মজুরি, চাকুরের চাকুরি এবং লেন-দেনের মেয়াদ নির্দিষ্ট করা সুকঠিন হয়ে যাবে।

আমলনামা গলার হার হওয়ার মর্মার্থ : মানুষ যে কোন জায়গায় যে কোন অবস্থায় থাকুক, তার আমলনামা তার সাথে থাকে এবং তার আমল লিপিবদ্ধ হতে থাকে। মৃত্যুর পর তা বন্ধ করে রেখে দেওয়া হয়। কিয়ামতের দিন এ আমলনামা প্রত্যেকের হাতে হাতে দিয়ে দেওয়া হবে, যাতে নিজে পড়ে নিজেই মনে মনে কয়সাজা করে নিতে পারে যে, সে পুরস্কারের

যোগ্য, না আযাবের যোগ্য। হযরত কাতাদাহ থেকে বর্ণিত আছে, সেদিন লেখাপড়া না জানা ব্যক্তিও আমলনামা পড়ে ফেলবে। এ প্রসঙ্গে আন্সামা ইম্পাহানী হযরত আবু উমামার একটি রেওয়াজে উদ্ধৃত করেছেন। তাতে রসূলুল্লাহ (স) বলেন : কিয়ামতের দিন কোন কোন লোকের আমলনামা যখন তাদের হাতে দেওয়া হবে, তখন তারা নিজেদের কিছু কিছু সৎ কর্ম তাতে অনুপস্থিত দেখে আরম্ভ করবে : পরওয়ারদিগার ! এতে আমার অমুক অমুক সৎ কর্ম লেখা হয়নি। আন্সাহ তা'আলার পক্ষ থেকে উত্তর হবে : —আমি সে সব সৎ কর্ম নিশ্চিত করে দিয়েছি। কারণ, তোমরা অন্যদের গীত করতে।—(মাযহারী)

পন্নগছর প্রেরণ ব্যতীত আযাব না হওয়ার ব্যাখ্যা : এ আয়াতদুটো কোন কোন ফিকাহীদের মতে যাদের কাছে কোন নবী ও রসূলের দাওয়াত পৌঁছনি কাফির হওয়া সত্ত্বেও তাদের কোন আযাব হবে না। কোন কোন ইমামের মতে ইসলামের যেসব আকীদা বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা বোঝা যায়। যেমন, আন্সাহর অস্তিত্ব, তওহীদ প্রভৃতি—সেগুলো যারা অস্বীকার করে, কুফরের কারণে তাদের আযাব হবে ; যদিও তাদের কাছে নবী ও রসূলের দাওয়াত না পৌঁছে থাকে। তবে পন্নগছরগণের দাওয়াত ও তবলীগ ব্যতীত সাধারণ গোনাহর কারণে আযাব হবে না। কেউ কেউ এখানে রসূল শব্দের ব্যাপক অর্থ নিয়েছেন ; রসূল ও নবী অথবা তাদের কোন প্রতিনিধিও হতে পারেন কিংবা মানুষের বিবেক-বুদ্ধিও হতে পারে। কেননা, বিবেক-বুদ্ধিও এক দিক দিয়ে আন্সাহর রসূল বটে।

মুশরিকদের সন্তান-সন্ততির আযাব হবে না : لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তক্ষসীর মাযহারীতে লেখা রয়েছে, এতে প্রমাণিত হয় যে, মুশরিক ও কাফিরদের যেসব সন্তান বালেগ হওয়ার পূর্বে মারা যায়, তাদের আযাব হবে না। কেননা, পিতামাতার কুফরের কারণে তারা শাস্তির যোগ্য হবে না। এ প্রসঙ্গে ফিকাহীদের উক্তি বিভিন্নরূপ। এর বিস্তারিত বিবরণ এখানে অনাবশ্যক।

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ

عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ۝ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ

مِنْ بَعْدِ نُوحٍ ۝ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ۝

(১৬) যখন আমি কোন জনপদকে ধ্বংস করার ইচ্ছা করি তখন তার অবস্থাপন্ন লোকদেরকে উদ্ভূত করি অতঃপর তারা পাপাচারে মতে উঠে। তখন সে জনগোষ্ঠীর নুহের পর আমি অনেক উম্মতকে ধ্বংস করেছি। আপনার পালনকর্তাই বান্দাদের পাপাচারের সংবাদ জানা ও দেখার জন্যে মাথোঁট।

পূর্বাঙ্গ সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছিল যে, যে পর্যন্ত পন্নগছরগণের মাধ্যমে কোন সম্প্রদায়ের কাছে আন্সাহ তা'আলার হিদায়ত সম্বলিত বাণী না পৌঁছাত





হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে বিবেক-বুদ্ধি ও ইচ্ছা শক্তি দান করেছেন এবং আযাব ও সওয়ারের পথ সুস্পষ্টভাবে বাতলে দিয়েছেন। কেউ যদি স্বেচ্ছায় আযাবের পথে চলারই ইচ্ছা ও সংকল্প গ্রহণ করে, তবে আল্লাহর রীতি এই যে, তিনি তাকে সেই আযাবের উপায়-উপকরণাদি সরবরাহ করে দেন। কাজেই আযাবের আসল কারণ স্বয়ং তাদের কুফরী ও গোনাহের সংকল্প—আল্লাহর ইচ্ছাই একমাত্র কারণ নয়। তাই তারা ক্ষমার যোগ্য হতে পারে না।

আয়াতের অন্য একটি তফসীর : **أَمْرًا** শব্দের প্রচলিত অর্থ তাই, যা উপরে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ আমি আদেশ দেই। কিন্তু এ আয়াতে এ শব্দের বিভিন্ন কিরা'আত হয়েছে। আবু ওছমান নাহ্দী, আবু রাজা, আবুল আলিয়া ও মুজাহিদ অবলম্বিত এক কিরা'আতে এ শব্দটি মীমের তাশদীদযোগে পঠিত হয়েছে। এর অর্থ আমি অবস্থাপন বিত্তশালী লোকদেরকে প্রভাবশালী ও শাসক করে দেই। তারা পাপচারে মেতে উঠে এবং গোটা জাতির ধ্বংসের কারণ হয়ে যায়।

হযরত আলী ও ইবনে আব্বাস (রা)-এর এক কিরা'আত শব্দটিকে **أَمْرًا** পাঠ করা হয়েছে। তাঁদের কাছ থেকে এর তফসীর **أَثَرًا** বর্ণিত আছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যখন কোন জাতির উপর আযাব প্রেরণ করেন, তখন তার প্রাথমিক লক্ষণ এই প্রকাশ পায় যে, সে জাতির মধ্যে অবস্থাপন ধনী লোকদের প্রাচুর্য সৃষ্টি করা হয়। তারা পাপচারের মাধ্যমে সমগ্র জাতিকে আযাবে পতিত করার কারণ হয়ে যায়।

প্রথম কিরা'আতের সার্বমর্ম দাঁড়ায় এই যে, জাতির মধ্যে অবস্থাপন ভোগবিলাসী লোকদের শাসনকার্য অথবা এ ধরনের লোকের প্রাচুর্য মোটেই আনন্দের বিষয় নয় বরং আল্লাহর আযাবের লক্ষণ। আল্লাহ তা'আলা যখন কোন জাতির প্রতি অসন্তুষ্ট হন এবং তাকে আযাবে পতিত করতে চান, তখন এর প্রাথমিক লক্ষণ হিসাবে জাতির শাসনকর্তা ও নেতৃপদে এমন লোকদেরকে অধিষ্ঠিত করে দেন, যারা বিলাসপ্রিয় ও ইন্দ্রিয়সেবী। অথবা শাসনকর্তা না হলেও জাতির মধ্যে এ ধরনের লোকের আধিক্য সৃষ্টি করে দেওয়া হয়। উভয় অবস্থার পরিণতি দাঁড়ায় এই যে, তারা ইন্দ্রিয়সেবা ও বিলাসিতার প্রোতে গা ভাসিয়ে আল্লাহর না ফরমানী নিজেরাও করে এবং অন্যদের জন্যও ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। অবশেষে তাদের ওপর আল্লাহর আযাব নেমে আসে।

ধনীদের প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী হওয়া একটি স্বাভাবিক ব্যাপার : আয়াতে বিশেষ-ভাবে অবস্থাপন ধনীদের কথা উল্লেখ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, জনসাধারণ স্বাভাবিক-ভাবেই বিত্তশালী ও শাসক শ্রেণীর চরিত্র ও কর্মের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। এরা কুক্রমপ্ৰায়ণ হয়ে গেলে সমগ্র জাতি কুক্রমপ্ৰায়ণ হয়ে যায়। তাই আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে ধন দৌলত দান করেন, কর্ম ও চরিত্রের সংশোধনের প্রতি তাদের অধিকতর যত্নবান হওয়া উচিত। এমন হওয়া উচিত নয় যে, তারা বিলাসিতায় পড়ে কর্তব্য

ভুলে যাবে এবং তাদের কারণে সমগ্র জাতি ব্রাহ্ম পথে পরিচালিত হবে। এমনতাবস্থায় সমগ্র জাতির কুকর্মের শাস্তিও তাদেরকে ভোগ করতে হবে।

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ  
ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلُهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا ۝ وَمَنْ أَرَادَ  
الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ  
مَشْكُورًا ۝ كَلَّا بُدْهُهُؤَلَاءِ وَهُؤَلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ  
رَبِّكَ مَحْظُورًا ۝ أَنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَالْآخِرَةُ  
أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ۝

(১৮) যে কেউ ইহকাল কামনা করে, আমি সে সব লোককে যা ইচ্ছা সত্ত্বর দিয়ে দেই। অতঃপর তাদের জন্য জাহান্নাম নির্ধারণ করি। ওরা তাতে নিম্নিত-বিতাড়িত অবস্থায় প্রবেশ করবে। (১৯) আর যারা পরকাল কামনা করে এবং মু'মিন অবস্থায় তার জন্য যথাযথ চেষ্টা-সাধনা করে, এমন লোকদের চেষ্টা স্বীকৃত হয় থাকে। (২০) এদেরকে এবং ওদেরকে প্রত্যেককে আমি আপনার পালনকর্তার দান পৌঁছে দেই এবং আপনার পালনকর্তার দান অবধারিত। (২১) দেখুন, আমি তাদের একদলকে অপরদের উপর কিভাবে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিলাম। পরকাল তো নিশ্চয়ই মর্তব্য শ্রেষ্ঠ এবং ফযীলতে শ্রেষ্ঠতম।

### তক্ষসীরের সার-সংক্ষেপ

যে ব্যক্তি (স্বীয় সৎ কর্ম দ্বারা শুধু) ইহকালের (উপকারের) নিয়ত রাখবে (হয় এ কারণে যে, সে পরকালে বিশ্বাসী নয়, না হয় এ কারণে যে, সে পরকাল সম্পর্কে গাফিল) আমি তাকে ইহকালেই যতটুকু ইচ্ছা (তাও সবার জন্য নয়; বরং) যাকে ইচ্ছা নগদ দিয়ে দেব। (অর্থাৎ ইহকালেই সে কিছু প্রতিদান পেয়ে যাবে)। অতঃপর (পরকালে কিছুই পাবে না; বরং সেখানে) আমি তার জন্য জাহান্নাম অবধারিত করব। সে তাতে দুর্দশাগ্রস্ত বিতাড়িত হয়ে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি (স্বীয় কৃতকর্মে) পরকালের (সওয়াবের) নিয়ত রাখবে এবং এর জন্য যেরূপ চেষ্টা করা দরকার, তদুপচেষ্টা করবে (উদ্দেশ্য এই যে, যে কোন চেষ্টা উপকারী নয়; বরং যে চেষ্টা শরীয়ত ও সুন্নতের অনুসারী, শুধু তাই উপকারী। কেননা, এরূপ চেষ্টারই আদেশ করা হয়েছে।- যে কর্মও প্রচেষ্টা শরীয়ত ও সুন্নতের পরিপন্থী তা গ্রহণযোগ্য নয়। শর্ত এই যে, সে ঈমানদারও হবে) এমন লোকদের

চেষ্টাই গ্রহণীয় হবে। (মোট কথা, আল্লাহর কাছে সফলকাম হওয়ার শর্ত চারটি। এক. নিয়ত শুদ্ধ করা অর্থাৎ খাঁটি পরকালীন সওয়াবের নিয়ত করা—মানসিক স্বার্থ অন্তর্ভুক্ত না হওয়া। দুই. নিয়তের জন্য না করার প্রয়াস। শুধু নিয়ত ও ইচ্ছা দ্বারা কর্মসিদ্ধি হয় না, যে পর্যন্ত তাঁর জন্য কাজ না করা হয়। তিন. কর্মসিদ্ধি করা। অর্থাৎ শরীয়ত ও সুন্নত অনুযায়ী কর্মপ্রয়াস পরিচালনা। কেননা, অভীষ্ট লক্ষ্যের বিপরীত দিকে দৌড়ানো ও এতদুদ্দেশ্যে চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া উপকারী হওয়ার পরিবর্তে অভীষ্ট লক্ষ্য থেকে আরও দূরে ঠেলে দেয়। চার. বিশ্বাস। অর্থাৎ ঈমান শুদ্ধ করা। এ শর্তটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং সবগুলোর মূল ভিত্তি। এসব শর্ত ব্যতীত কোন কর্মই আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। কাফিরদের জন্য পাখিব নিয়ামতসমূহ অজিত হওয়া তাদের কর্মের গ্রহণীয়তার লক্ষণ নয়। কেননা, পাখিব নিয়ামত আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের জন্য নিদিষ্ট নয়; বরং আপনায় পালনকর্তার (পাখিব) দান থেকে আমি তাদেরকেও (অর্থাৎ প্রিয় বান্দাদেরকেও) সাহায্য করি (এবং তাদেরকেও। অর্থাৎ অপ্রিয় বান্দাদেরকেও সাহায্য করি)। আপনায় পালনকর্তার (পাখিব) দান (কারও জন্য) বন্ধ নয়। দেখুন আমি (পাখিব দানে ঈমান ও কুফরের শর্ত ব্যতিরেকে) এককে অপরের ওপর কিরূপ শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি! (এমনকি, অধিকাংশ কাফির অধিকাংশ মু'মিনের তুলনায় অধিক ধনসম্পদের মালিক। কেননা, এসব বস্তু গুরুত্বপূর্ণ নয়)। অবশ্যই পরকাল (যা প্রিয় বান্দাদের জন্য নিদিষ্ট, তা) মর্তবা ও শ্রেষ্ঠত্বের দিক দিয়ে বিরাট। (তাই এর জন্য যত্নবান হওয়া উচিত)।

### আনুষ্ঠানিক জাতব্য বিষয়

যারা স্থায়ী আমল দ্বারা শুধু ইহকাল লাভ করার ইচ্ছা করে, আলোচ্য আয়াতে তাদের

এবং তাদের শাস্তির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এ বর্ণনায় **مَنْ كَانَ يُرِيدُ الثَّالِثَةَ**

—বাক্যটি ব্যবহার করা হয়েছে। এটা **استمروا روادا** ক্রমাগত বলতে থাকা ও স্থায়ী হওয়া বুঝায়। উদ্দেশ্য এই যে, এই জাহান্নামের শাস্তি শুধু তখন হবে, যখন তার প্রত্যেক কর্মকে ক্রমাগতভাবে ও সদাসর্বদা শুধু ইহকালের উদ্দেশ্যেই আচ্ছন্ন করে রাখে—পরকালের প্রতি কোন লক্ষ্য না থাকে। পক্ষান্তরে পরকালের ইচ্ছা করা এবং তার

প্রতিদানের বর্ণনায় **أَوَادِ الْآخِرَةِ** বাক্যটি ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থ এই যে,

মু'মিন যখনই যে কাজে পরকালের ইচ্ছা ও নিয়ত করবে, তার সেই কাজ গ্রহণযোগ্য হবে; যদিও তার কোন কোন কাজের নিয়তে মন্দ মিশ্রিত হয়ে যায়।

প্রথমোক্ত অবস্থাটি শুধু কাফির বা পরকালে অবিশ্বাসী ব্যক্তিরই হতে পারে। তাই তার কোন কর্মই গ্রহণযোগ্য নয়। শেষোক্ত অবস্থাটি হল মু'মিনের। তার যে কর্ম খাঁটি নিয়ত সহকারে অন্যান্য শর্তানুযায়ী হবে, তা গ্রহণযোগ্য হবে এবং যে কর্ম এরূপ হবে না, তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

বিদ'আত ও মনগড়া আমল যতই ভাল দেখা যাক—গ্রহণযোগ্য নয় : এ আয়াতে

চেষ্ঠা ও কর্মের সাথে <sup>١١٨</sup>سَعِيًّا শব্দ যোগ করে বলা হয়েছে যে, প্রত্যেক কর্ম ও চেষ্ঠা কল্যাণ-কর ও আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না, বরং সেটিই ধর্তব্য হয়, যা ( পরকালের ) লক্ষ্যের উপযোগী। উপযোগী হওয়া না হওয়া শুধু আল্লাহ ও রসূলের বর্ণনা দ্বারাই জানা যেতে পারে। কাজেই যে সং কর্ম মনগড়া পছন্দ করা হয়—সাধারণ বিদ'আতী পন্থাও এর অন্তর্ভুক্ত, তা দৃশ্যত যতই সুন্দর ও উপকারী হোক না কেন—পরকালের জন্য উপযোগী নয়। তাই সেটা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয় এবং পরকালেও কল্যাণকর নয়।

তফসীর রহুল মা'আনী <sup>١١٨</sup>سَعِيًّا শব্দের ব্যাখ্যায় সুমত অনুযায়ী চেষ্ঠার সাথে সাথে এ কথা ও অভিমত ব্যক্ত করেছে যে, কর্মও দৃঢ়তা থাকতে হবে। অর্থাৎ কর্মটি সুমত অনুযায়ী এবং দৃঢ় অর্থাৎ সার্বজনিকও হতে হবে। বিশৃঙ্খলভাবে কোন সময় করল কোন সময় করল না—এতে পূর্ণ উপকার পাওয়া যায় না।

لَا يَجْعَلُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخَذُومًا ۖ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا آيَاتُهُ وَيَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنَّمَا يَبْلُغُنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۖ  
وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا  
رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا ۖ رَبِّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَادِقِينَ  
فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غُفُورًا ۖ

(২২) ছিন্ন করে না আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্য। তাহলে তুমি নিশ্চিত ও অসহায় হয়ে পড়বে। (২৩) তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করে না এবং পিতামাতার সাথে সন্মাবহার কর। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্বকে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে 'উফ' শব্দটিও বলে না এবং তাদেরকে ধমক দিও না এবং বল তাদেরকে শিষ্টাচারপূর্ণ কথা। (২৪) তাদের সামনে ভালবাসার সাথে, নম্রভাবে মাথা নত করে দাও এবং বল : হে পালনকর্তা, তাঁদের উভয়ের প্রতি রহম কর, যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে পালন-পালন করেছেন। (২৫) তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের মনে যা আছে তা ভালই জানেন। যদি তোমরা সৎ হও, তবে তিনি তওবাকারীদের জন্য ক্ষমাশীল।

পূর্বাঙ্গের সম্পর্ক : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কর্ম গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য কতিপয় শর্ত বর্ণনা করা হয়েছে। তন্মধ্যে একটি ছিল এই যে, ঈমানসহ এবং শরীয়ত ও সুন্নত অনুযায়ী যে কর্ম করা হয়, তাই গ্রহণযোগ্য হতে পারে। আলোচ্য আয়াতসমূহে এমনি ধরনের বিশেষ বিশেষ কর্ম সম্পাদনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেগুলো শরীয়ত বণিত। এসব নির্দেশের বাস্তবায়ন পরকালের সাফল্য এবং তার বিরুদ্ধাচরণ পরকালের ধ্বংসের কারণ। যেহেতু উল্লিখিত শর্তসমূহের মধ্যে ঈমানের শর্তটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, তাই সর্বপ্রথম সে নির্দেশ ও তওহীদের বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর বান্দার হক সম্পর্কিত নির্দেশ বণিত হয়েছে।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

( প্রথম নির্দেশ তওহীদ  $\text{لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ}$  —হে সম্বোধিত ব্যক্তি )

আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্য স্থির করো না। (অর্থাৎ শিরক করো না)। তাহলে তুমি দুর্দশাগ্রস্ত অসহায় হয়ে পড়বে। (অতঃপর এই তাগিদ করা হয়েছে যে) তোমার পালনকর্তা নির্দেশ দিয়েছেন যে, তিনি সত্য উপাস্য তাঁকে ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত করো না। (এটা পরকালের চেণ্টার পস্থা সংক্রান্ত বিবরণ)।

( দ্বিতীয় নির্দেশ পিতামাতার হক আদায় করা  $\text{وَبِأُولَئِكَ الدِّينِ إِحْسَانًا}$  )

তোমার পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। যদি (তারা) তোমার কাছে (থাকে এবং) তাদের একজন অথবা উভয়েই বার্বকো (অর্থাৎ বার্বকোর বয়সে) উপনীত হয় এবং সে কারণে সেবা-মত্বের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে এবং যখন স্বভাবতই তাদের সেবামত্ব করা কঠিন মনে হয়, তবে (তখনও এতটুকু আদব কর যে) তাদেরকে (হ্যাঁ থেকে) হ'—ও বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না এবং তাদের সাথে খুব আদব সহকারে কথা বল। তাদের সামনে ভালবাসার সাথে সবিনয়ে ইশ্বত-সম্মান করে দাও এবং (তাদের জন্য আল্লাহর কাছে) এরূপ দোয়া কর : হে পালনকর্তা, তাদের উভয়ের প্রতি রহম কর, যেমন তারা আমাকে শৈশবে লালন-পালন করেছেন। ( শুধু এই বাহ্যিক সম্মান প্রদর্শন-কেই যথেষ্ট মনে করো না। অন্তরেও তাদের প্রতি আদব ও আনুগত্যের ইচ্ছা পোষণ করবে। কেননা) তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের মনের কথা খুব জানেন। (একারণেই এর বাস্তবায়ন সহজ করার জন্য একটি হালকা আদেশও শুনাচ্ছেন যে) যদি তোমরা (প্রকৃতই আন্তরিকভাবে) সৎ হও, (এবং ভুলক্রমে, মেমাজের সংকীর্ণতা হেতু কিংবা বিরুদ্ধবশত কোন বাহ্যিক রুটি হয়ে যায়, অতঃপর অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে নাও) তবে তওবাকারীদের অপরাধ তিনি ক্ষমা করে দেন।

### আনুশঙ্গিক জাতব্য বিষয়

পিতামাতার আদব, সম্মান ও আনুগত্যের গুরুত্ব : ইমাম কুরতুবী বলেন : এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা পিতামাতার আদব, সম্মান এবং তাঁদের সাথে সদ্ব্যবহার

করাকে নিজের ইবাদতের সাথে একত্র করে ফরয করেছেন। যেমন সূরা লোকমানে নিজের শোকবের সাথে পিতামাতার শোকবকে একত্র করে অপরিহার্য করেছেন। বলা

হয়েছে : **أَنْ أَشْكُرَ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ** অর্থাৎ আমার শোকব কর এবং পিতামাতারও।

এতে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের পন্থ পিতামাতার আনুগত্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং আল্লাহ তা'আলার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার ন্যায় পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়াও ওয়াজিব। সহীহ বুখারীর একটি হাদীসও এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। হাদীসে রয়েছে, কোন এক ব্যক্তি রসুলুল্লাহ (সা)-কে প্রশ্ন করল : আল্লাহর কাছে সর্বাধিক প্রিয় কাজ কোনটি? তিনি বললেন : (মুস্তাহাব) সময় হলে নামায পড়া। সে আবার প্রশ্ন করল : এরপর কোন কাজটি সর্বাধিক প্রিয়? তিনি বললেন : পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার।—(কুরতুবী)

হাদীসের আলোকে পিতামাতার আনুগত্য ও সেবায়নের কফীলত : মসনদে আহমদ। তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মুস্তাদরাক হাকেমিে বিগুচ্ছ সনদসহ হযরত আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, রসুলুল্লাহ (সা) বলেন : পিতা জামাতের মধ্যবর্তী দরজা। এখন তোমাদের ইচ্ছা, এর হিফায়ত কর অথবা একে বিনশ্ট করে দাও। (মাযহারী) (১) তিরমিযী ও মুস্তাদরাক হাকেমিে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমরের রেওয়াজেতে বর্ণিত রয়েছে যে, রসুলুল্লাহ (সা) বলেন : পিতা জামাতের মধ্যবর্তী দরজা। এখন তোমাদের ইচ্ছা, এর হিফায়ত কর অথবা একে বিনশ্ট করে দাও। (মাযহারী) (২) তিরমিযী ও মুস্তাদরাক হাকেমিে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমরের রেওয়াজেতে বর্ণিত রয়েছে যে, রসুলুল্লাহ (সা) বলেন : আল্লাহর সন্তুষ্টি পিতার সন্তুষ্টির মধ্যে এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টি পিতার অসন্তুষ্টির মধ্যে নিহিত।

(৩) হযরত আবু উমামার বাচনিক ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি রসুলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞেস করল : সন্তানের উপর পিতামাতার হক কি? তিনি বললেন : তাঁরা উভয়েই তোমার জামাত অথবা জাহান্নাম। উদ্দেশ্য এই যে, তাঁদের আনুগত্য ও সেবায়ন জামাতে নিজে হয় এবং তাঁদের সাথে বেআদবি ও তাঁদের অসন্তুষ্টি জাহান্নামে পৌঁছে দেয়।

(৪) বায়হাকী শায়বুল-ইমান গ্রন্থে এবং ইবনে অসাকির হযরত ইবনে আক্বাসের বাচনিক উদ্ধৃত করেছেন যে, রসুলুল্লাহ (সা) বলেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে পিতামাতার আনুগত্য করে, তার জন্য জামাতের দু'টি দরজা খোলা থাকবে এবং যে ব্যক্তি তাদের অবাধ্য হবে, তার জন্য জাহান্নামের দু'টি দরজা খোলা থাকবে। যদি পিতামাতার মধ্য থেকে একজনই ছিল, তবে জামাত অথবা জাহান্নামের এক দরজা খোলা থাকবে। একথা শুনে জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করল : জাহান্নামের এই শাস্তিবাণী কি তখনও প্রযোজ্য যখন পিতামাতা এই ব্যক্তির প্রতি জুলুম করে? তিনি তিনবার বললেন :

**وَأَنْ ظَلَمُوا وَأَنْ ظَلَمُوا وَأَنْ ظَلَمُوا** অর্থাৎ যদি পিতামাতা সন্তানের প্রতি জুলুমও

করে তবু পিতামাতার অবাধ্যতার কারণে সন্তান জাহান্নামে যাবে। এর সার্বমর্ম এই যে, পিতামাতার কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার সন্তানের নেই। তাঁরা জুলুম করলে সন্তান সেবা-যত্ন ও আনুগত্যের হাত গুটিয়ে নিতে পারে না।

(৫) বায়হাকী হযরত ইবনে আব্বাসের বাচনিক উদ্ধৃত করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সা) বলেন : যে সেবায়ত্নকারী পুত্র পিতামাতার দিকে দয়া ও ভালবাসা সহকারে দৃষ্টিপাত করে, তার প্রত্যেক দৃষ্টির বিনিময়ে সে একটি মকবুল হজ্জের সওয়াব পায়। লোকেরা আরম্ভ করল : সে যদি দিনে একশ'বার এভাবে দৃষ্টিপাত করে? তিনি বললেন : হ্যাঁ, একশ'বার দৃষ্টিপাত করলেও প্রত্যেক দৃষ্টির বিনিময়ে এই সওয়াব পেতে থাকবে। সুবহান্নাহ্! তাঁর ভাঙারে কোন অভাব নেই।

পিতামাতার হক নষ্ট করার শাস্তি দুনিয়াতেও পাওয়া যায় :

(৬) বায়হাকী শোয়াবুল ইমানে আবু বকরার বাচনিক বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সা) বলেন : সমস্ত গোনাহের শাস্তির ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা যেগুলো ইচ্ছা করেন কিয়ামত পর্যন্ত পিছিয়ে নিয়ে যান। কিন্তু পিতামাতার হক নষ্ট করা এবং তাঁদের প্রতি অবাধ্য আচরণ করা এর ব্যতিক্রম। এর শাস্তি পরকালের পূর্বে ইহকালেও দেওয়া হয়। (এ সবগুলো রেওয়াজে তফসীরে মাহহারী থেকে উদ্ধৃত হয়েছে)।

কোন কোন বিষয়ে পিতামাতার আনুগত্য ওয়াজিব এবং কোন কোন বিষয়ে বিরুদ্ধাচরণের অবকাশ আছে : এ ব্যাপারে আলিম ও ফিকাহবিদগণ একমত যে, পিতামাতার আনুগত্য শুধু বৈধ কাজে ওয়াজিব। অবৈধ ও গোনাহর কাজে আনুগত্য ওয়াজিব তো নয়ই, বরং জায়েযও নয়। হাদীসে বলা হয়েছে : **لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ لَنْ** — অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তার নাকরমানীর কাজে কোন সৃষ্ট-জীবের আনুগত্য জায়েয নয়।

পিতামাতার সেবায়ত্ন ও সম্বাহারের জন্য তাঁদের মুসলমান হওয়া জরুরী নয় : ইমাম কুরতুবী এ বিষয়টির সমর্থনে বুখারী থেকে হযরত আসমা (রা)-র একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। হযরত আসমা (রা) রসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞেস করেন : আমার জননী মুশরিক। তিনি আমার সাথে দেখা করতে আসেন। তাঁকে আদর-আপ্যায়ন করা জায়েয হবে কি? তিনি বললেন : **صلى أمك** অর্থাৎ “তোমার জননীকে আদর-আপ্যায়ন কর।” কাফির পিতামাতা সম্পর্কে হযরত কোরআন পাক বলে :

**وَمَا حَبِهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا** — অর্থাৎ যার পিতামাতা কাফির এবং তাকেও

কাফির হওয়ার আদেশ করে এ ব্যাপারে তাদের আদেশ পালন করা জায়েয নয়, কিন্তু দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ভাব বজায় রেখে চলতে হবে। বলা বাহুল্য, আয়াতে মারাকফ' বলে তাদের সাথে আদর-আপ্যায়নমূলক ব্যবহার বুঝানো হয়েছে।



মাস'আলা : যে পর্যন্ত জিহাদ ফরযে আইন না হয়ে যায়, ফরযে কিফায়ার স্তরে থাকে, সে পর্যন্ত পিতামাতার অনুমতি ছাড়া সন্তানের জন্য জিহাদে যোগদান করা জায়েয নয়। সহীহ বুখারীতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা)-এর বাচনিক বর্ণিত রয়েছে, জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সা)-র কাছে জিহাদের অনুমতি নেওয়ার জন্য উপস্থিত হয়। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : তোমার পিতামাতা জীবিত আছেন কি? সে বলল : জী হ্যাঁ, জীবিত আছেন। রসূলুল্লাহ (সা) বললেন : **ففيهما نجا** অর্থাৎ তাহলে তুমি পিতামাতার সেবায় জে আত্মনিয়োগ করেই জিহাদ কর। অর্থাৎ তাঁদের সেবায়ের মাধ্যমেই তুমি জিহাদের সওয়াব পেয়ে যাবে। অন্য রেওয়াজেতে এর সাথে একথাও উল্লিখিত রয়েছে যে, লোকটি বলল : আমি পিতামাতাকে রুদনরত অবস্থায় ছেড়ে এসেছি। একথা শুনে রসূলুল্লাহ (সা) বললেন : যাও, তাঁদের হাসাও, যেমন কাঁদিয়েছ। অর্থাৎ তাঁদেরকে গিয়ে বল : এখন আমি আপনাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জিহাদে যাব না।—(কুরতুবী)

মাস'আলা : এ রেওয়াজেতে থেকে জানা গেল যে, কোন কাজ ফরযে আইন না হলে এবং ফরযে-কিফায়ার স্তরে থাকলে সন্তানের জন্য পিতামাতার অনুমতি ছাড়া সে কাজ করা জায়েয নয়। দীনী শিক্ষা অর্জন করা এবং তবলীগের কাজে সফর করাও এর অন্তর্ভুক্ত। ফরয পরিমাপ দীনী জ্ঞান যার অর্জিত আছে, সে যদি বড় আলিম হওয়ার জন্য সফর করে কিংবা তবলীগ ও দাওয়ারের কাজে সফর করে, তবে পিতামাতার অনুমতি ব্যতীত তা জায়েয নয়।

মাস'আলা : পিতামাতার সাথে সন্ধ্যাবহার করার যে নির্দেশ কোরআন ও হাদীসে উক্ত হয়েছে, পিতামাতার আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের সাথে সন্ধ্যাবহার করাও এর অন্তর্ভুক্ত। বিশেষ করে পিতামাতার মৃত্যুর পর। সহীহ বুখারীতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা)-এর বাচনিক বর্ণিত রয়েছে, রসূলুল্লাহ (সা) বললেন : পিতার সাথে সন্ধ্যাবহার এই যে, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বন্ধুদের সাথেও সন্ধ্যাবহার করতে হবে। হযরত আবু উসায়দ বদরী (রা) বর্ণনা করেন : আমি রসূলুল্লাহ (সা)-র সাথে বসেছিলাম, ইতিমধ্যে এক আনসার এসে প্রণয় করল : ইয়া রাসূলুল্লাহ! পিতামাতার ইন্তিকালের পরও তাঁদের কোন হক আমার যিম্মায় আছে কি? তিনি বললেন : হ্যাঁ তাদের জন্য দোয়া ও ইস্তেগফার করা, তাঁরা কারো সাথে কোন অসীকার করে থাকলে তা পূরণ করা, তাঁদের বন্ধুবর্গের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা এবং তাঁদের এমন আত্মীয়দের সাথে আত্মীয়তা বজায় রাখা, যাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক শুধু তাঁদেরই মাধ্যমে। পিতামাতার এসব হক তাঁদের ইন্তিকালের পরও তোমার যিম্মায় অবশিষ্ট রয়েছে।

রসূলুল্লাহ (সা)-র অভ্যাস ছিল যে, হযরত খাদীজা (রা)-র ওফাতের পর তিনি তাঁর বান্ধবীদের কাছে উপটৌকন প্রেরণ করতেন। এতে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল হযরত খাদীজা (রা)-র হক আদায় করা।

পিতামাতার জাদবের প্রতি লক্ষ্য রাখা, বিশেষত বার্বকে : পিতামাতার সেবায় ও আনুগত্য পিতামাতা হওয়ার দিক দিয়ে কোন সময়ও বলসের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নয়।

সর্বাবস্থায় এবং সব বয়সেই পিতামাতার সাথে সদ্যবহার করা ওয়াজিব। কিন্তু ওয়াজিব ও করায় কর্তব্যসমূহ পালনের ক্ষেত্রে স্বভাবত সেসব অবস্থা প্রতিবন্ধক হয়, কর্তব্য পালন সহজ করার উদ্দেশ্যে কোরআন পাক যেসব অবস্থায় বিভিন্ন ভঙ্গিতে চিন্তাধারার মালন-পালনও করে এবং এর জন্য অতিরিক্ত তাকিদও প্রদান করে। এটাই কোরআন পাকের সাধারণ নীতি!

বার্থকো উপনীত হয়ে পিতামাতা সন্তানের সেবা-যত্নের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে এবং তাদের জীবন সন্তানের দয়া ও রূপার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। তখন যদি সন্তানের পক্ষ থেকে সামান্যও বিমুখতা প্রকাশ পায়, তবে তাঁদের অন্তরে তা ক্ষত হয়ে দেখা দেয়। অপরদিকে বার্থকোর উপসর্গসমূহ স্বভাবগতভাবে মানুষকে খিটখিটে করে দেয়। তৃতীয়ত বার্থকোর শেষ প্রান্তে যখন বুদ্ধি-বিবেচনাও অকেজো হয়ে পড়ে, তখন পিতামাতার বাসনা এবং দাবীদাওয়াও এমনি ধরনের হয়ে যায়, যা পূর্ণ করা সন্তানের পক্ষে কঠিন হয়। কোরআন পাক এসব অবস্থায় পিতামাতার মনো-তৃষ্টি ও সুখ-শক্তি বিধানের আদেশ দেওয়ার সাথে সাথে সন্তানকে তার শৈশবকাল স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে, আজ পিতামাতা তোমার যতটুকু মুখাপেক্ষী, এক সময় তুমিও তদাপেক্ষা বেশী তাঁদের মুখাপেক্ষী ছিলে। তখন তাঁরা যেমন নিজেদের আরাহ-আয়েশ ও কামনা-বাসনা তোমার জন্য কুরবান করেছিলেন এবং তোমার অবুখ কথাবার্তাকে স্নেহ-মমতার আবরণ দ্বারা ঢেকে নিয়েছিলেন, তেমনি মুখাপেক্ষিতার এই দুঃসময়ে বিবেক ও সৌজন্যবোধের তাগিদ এই যে, তাঁদের পূর্ব ঋণ শোধ করা কর্তব্য।

مَا رَبَّيَا نِي مَغِيرًا — বাক্য এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতসমূহে পিতামাতার বার্থকো উপনীত হওয়ার সময় সম্পর্কিত কতিপয় আদেশ দান করা হয়েছে।

এক. তাঁদেরকে 'উফ'-ও বলবে না। এখানে 'উফ' শব্দটি বলে এমন শব্দ বুঝানো হয়েছে, যন্ত্রা বিরক্তি প্রকাশ পায়। এমনকি, তাঁদের কথা শুনে বিরক্তিবোধক দীর্ঘশ্বাস ছাড়াও এর অন্তর্ভুক্ত। হয়রত আলী (রা) বর্ণিত এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সা) বলেনঃ পীড়া দানের ক্ষেত্রে 'উফ' বলার চাইতেও কম কোন স্তর থাকলেও তাও অবশ্য উল্লেখ করা হত। (মোট কথা, যে কথায় পিতামাতার সামান্য কণ্ঠ হয়, তাও নিষিদ্ধ।)

দ্বিতীয়, نَهْرٌ — وَ لَا تَنْهَرُهُمَا শব্দের অর্থ ধমক দেওয়া। এটা যে কণ্ঠের কারণ তা বলাই বাহুল্য।

তৃতীয় আদেশ, وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا عَرِيْمًا প্রথমোক্ত দু'টি আদেশ ছিল নেতিবাচক

তাতে পিতামাতার সামান্যতম কণ্ঠ হতে পারে, এমন সব কাজেও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তৃতীয় আদেশে ইতিবাচক ভঙ্গিতে পিতামাতার সাথে কথা বলার আদব শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, তাঁদের সাথে সম্প্রীতি ও ভালবাসার সাথে নয় কথায় বলতে হবে। হয়রত

সাদ্দ ইবনে মুসাইয়্যিব বলেন : যেমন কোন গোলাম তার কাড়ম্বড়াব সম্পন্ন প্রভুর সাথে কথা বলে।

এর সারমর্ম --- **وَ اخْفِ لَوْ مَا جَنَاحَ الذَّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ** চতুর্থ আদেশ,

এই যে, তাদের সামনে নিজেকে অঙ্কম ও হেয় করে পেশ করবে; যেমন গোলাম প্রভুর সামনে। **جَنَاحَ** শব্দের অর্থ পাখা। শাব্দিক অর্থ হচ্ছে পিতামাতার জন্য নিজ নিজ

পাখা নম্রতা সহকারে নত করে দেবে। শেষে **مِنَ الرَّحْمَةِ** বলে প্রথমত ব্যক্ত করা হয়েছে যে, পিতামাতার সাথে এই ব্যবহার যেন নিছক লোক দেখানো না হয় বরং আন্তরিক মমতা ও সম্মানের ভিত্তিতে হওয়া কর্তব্য। দ্বিতীয়ত, এ দিকেও ইঙ্গিত হতে পারে যে, পিতামাতার সামনে নম্র ও হেয় হয়ে পেশ হওয়া সত্যিকার ইয়মতের পটভূমি। কেননা এরূপ করা বাস্তব অর্থে হেয় হওয়া নয়, বরং এর কারণ মহব্বত ও অনুকম্পা।

পঞ্চম আদেশ, **وَقُلْ رَبِّ ارْحَمُوهُمْ** -এর সারমর্ম এই যে, পিতামাতার ঘোঁ

আনা সুখশান্তি বিধান মানুষের সাধ্যাতীত। কাজেই সাধ্যানুযায়ী চেষ্টার সাথে সাথে তাঁদের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে দোয়া করবে যে, তিনি যেন করুণাবশত তাঁদের সব মুশকিল আসান করেন এবং কষ্ট দূর করেন। সর্বশেষ আদেশটি অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। পিতামাতার মৃত্যুর পরও দোয়ার মাধ্যমে সর্বদা পিতামাতার খিদমত করা যায়।

মাস'আলা : পিতামাতা মুসলমান হলে তো তাঁদের জন্য রহমতের দোয়া করা মাযেই; কিন্তু মুসলমান না হলে তাঁদের জীবদ্দশায় এ দোয়া জায়েয হবে এবং নিয়ত থাকবে এই যে, তাঁরা পাখির কণ্ট থেকে মুক্ত থাকুন এবং ঈমানের তওফীক লাভ করুন। মৃত্যুর পর তাঁদের জন্য রহমতের দোয়া করা জায়েয নয়।

একটি আশ্চর্য ঘটনা : কুরতুবী জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ থেকে রেওয়াজেত করেন যে, এক ব্যক্তি রসুলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে উপস্থিত হয়ে অভিযোগ করল যে, আমার পিতামাতা আমার ধনসম্পদ নিয়ে গেছেন। তিনি বললেন : তোমার পিতাকে ডেকে আন। এমন সময়ই জিবরাঈল আগমন করলেন এবং রসুলুল্লাহ্ (সা)-কে বললেন : তার পিতা এসে গেলে আপনি তাকে জিজ্ঞেস করবেন, এ বাকাগুলো কি, মেগুলো সে মনে মনে বলেছে এবং স্বয়ং তার কানও শুনে পাবনি। যখন লোকটি তার পিতাকে নিয়ে হাযির হল, তখন রসুলুল্লাহ্ (সা) বললেন : ব্যাপার কি, আপনার পুত্র আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ করল কেন? আপনি কি তার আসবাবপত্র ছিনিয়ে নিতে চান? পিতা বলল : আপনি তাকে এ প্রশ্ন করুন। আমি তার ফুফু, খালা এবং নিজের জীবন রক্ষার প্রয়োজন ব্যতীত কোথায় ব্যয় করি? রসুলুল্লাহ্ (সা) বললেন : **كَلْبًا** (অর্থাৎ ব্যস। আসল ব্যাপার জানা হয়ে গেছে। এখন আর কোন বলার শোনার দরকার নেই।) এরপর তার পিতাকে জিজ্ঞেস করলেন : এ বাকাগুলো কি, মেগুলো এখন পর্যন্ত স্বয়ং আপনার কানও

শোনেনি? লোকটি আরম্ভ করল : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ প্রত্যেক ব্যাপারেই আল্লাহ্ তা'আলা আপনার প্রতি আমাদের বিশ্বাস ও ঈমান বৃদ্ধি করে দেন। (সে কথা কেউ শোনেনি; তা আপনার জানা হয়ে গেছে। এটা একটা মু'জিবা) অতঃপর সে বলল : এটা ঠিক যে, আমি মনে মনে কয়েক লাইন কবিতা বলেছিলাম, যেগুলো আমার কানও শোনেনি। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) বললেন : কবিতাগুলো আমাকে শোনান। তখন সে নিম্নোক্ত পংক্তিশুলো আবৃত্তি করল :

غذو تك مولودا وملك يا نعا  
تعل بما اجنى على وتفهل

: আমি তোমাকে শৈশবে খাদ্য দিয়েছি এবং যৌবনেও তোমার দায়িত্ব বহন করেছি। তোমার স্বাবৃত্তীয় খাওয়া-পরা আমারই উপার্জন থেকে ছিল।

از الهلة ما فتى بالسقم لم ابت  
لسقمى الاساهرا اتململ

: কোন রাতে যখন তুমি অসুস্থ হয়ে পড়েছ, তখন আমি সারা রাত তোমার অসুস্থতার কারণে জেগে কাটিয়েছি।

ما نى انا المطر و قد و فك بالذى  
طوقت به د و نى فعينى لهمل

: যখন তোমার রোগ আমাকেই স্পর্শ করেছে—তোমাকে নয়। ফলে আমি সারা রাত কান্দন করেছি।

تخاف الردى نفسى عليك وانها  
لتعلم ان الموت وقت مؤجل

: আমার অন্তর তোমার মৃত্যুর ভয়ে ভীত হত; অথচ আমি জানতাম যে, মৃত্যুর জন্য দিন নির্দিষ্ট রয়েছে—আগেগিছে হতে পারবে না।

فلما بلغت السن والغاية التى  
اليها مدى ما كنت فيك أو مل

: অতঃপর যখন তুমি বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছ এবং আমার আকাঙ্ক্ষিত বয়সের সীমা পূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

جعلت جزائى غلظة و نفاظة  
كانى انت المنعم المتفضل

: তখন তুমি কঠোরতা ও রূঢ় ভাষাকে আমার প্রতিদান করে দিয়েছ; যখন তুমিই আমার প্রতি অনুগ্রহ ও কৃপা না করত।

فَلْيَتَكِ اِذْ لَمْ تَرَ حَقَّ اِبْوَتِي  
فَعَلْتَ كَمَا لَجَّارِ الْمَاصَاتِ يَفْعَلُ

ঃ আফসোস, যদি তোমার দ্বারা আমার পিতৃদের হক আদায় না হয়, তবে কম-পক্ষে ততটুকুই করতে যতটুকু একজন ডগ্ন প্রতিবেশী করে থাকে।

فَاوَلِيَّتِنِي حَقَّ الْجَوَارِ وَلَمْ تَكُنْ  
عَلَى مِمَالٍ دُونَ مَالِكَ تَبْخُلُ

ঃ তুমি কমপক্ষে আমাকে প্রতিবেশীর হক তো দিতে এবং স্বয়ং আমারই অর্থ-সম্পদে আমার বেলান রূপগতা না করতে!

রসুলুল্লাহ্ (সা) কবিতাগুলো শোনার পর পুত্রের জামার কলার চেপে ধরলেন এবং বললেন : **اَنْتَ وَمَالِكَ لَا يَبِيكُ** অর্থাৎ যাও, তুমি এবং তোমার ধনসম্পদ সবই তোমার পিতার। (কুরত্ববী, মঠ খণ্ড, ২৪ পৃঃ) কবিতাগুলো আরবী সাহিত্যের প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ ‘হামাসা’তেও উদ্ধৃত রয়েছে; কিন্তু কবির নাম লেখা হয়েছে উমাইয়া ইবনে আবুসুলত। কেউ কেউ বলেনঃ এগুলো আবদুল আ’লার কবিতা এবং কারও কারও মতে কবিতাগুলো আলি আব্বাস অঙ্কের।—(হাশিয়া—কুরত্ববী)

পিতার আদব ও সম্মান সম্পর্কিত উল্লিখিত আদেশসমূহের কারণে সম্মানদের মনে এমন একটা আশঙ্কা দেখা দিতে পারে যে, পিতামাতার সাথে সদাসর্বদা থাকতে হবে তাঁদের এবং নিজেদের অবস্থাও সব সময় সমান যায় না। কোন সময় মুখ দিয়ে এমন কথাও বের হয়ে যেতে পারে, যা ঔপরোক্ত আদবের পরিপন্থী। এর জন্য জাহান্নামের শাস্তির কথা শোনানো হয়েছে। কাজেই গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা খুবই কঠিন হবে।

আলোচ্য সর্বশেষ **رَبِّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِي نَفْسِكُمْ** —আল্লাহ্ মনের এই সংকীর্ণতা

দূর করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, বেআদবীর ইচ্ছা ব্যতিরেকে কোন সময় কোন পেরেশানী অথবা অসাবধানতার কারণে কোন কথা বের হয়ে গেলে এবং এজন্য তওবা করলে আল্লাহ্ তা’আলা মনের অবস্থা সম্পর্কে সত্যক অবগত রয়েছেন যে, কথাটি বেআদবী অথবা কল্টদানের জন্য বলা হয়নি। সুতরাং তিনি ক্ষমা করবেন। **اَوَّابِينَ** শব্দের অর্থ

**تَوَّابِينَ** অর্থাৎ তওবাকারী। হাদীসে বাদ মাগরিবের ছয় রাক’আত এবং ইশরাকের নফল নামাযকে **اَوَّابِينَ** বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এই নামাযগুলো পড়ার তওফীক তাদেরই হয়, যারা **اَوَّابِينَ** অর্থাৎ **تَوَّابِينَ** (তওবাকারী)।

وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْيَتَامَىٰ وَالسَّبِيلَ وَلَا تَبْدُرْ تَبْدِيرًا ۝  
 إِنَّ الْمُبْدِرِينَ كَالْأَخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۝

(২৬) আত্মীয়-স্বজনকে তার হক দান এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও। এবং কিছুতেই অপব্যয় করো না। (২৭) নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। শয়তান স্বীয় পালনকর্তার প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ।

### তক্ষসীরের সার-সংক্ষেপ

(আলোচ্য দু'টি আয়াতে বাস্তব হক সম্পর্কে আরও দু'টি নির্দেশ উল্লেখ করা হয়েছে। এক. পিতামাতা ছাড়া অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন ও মুসলিম জনগণের হক। দুই. অপব্যয় সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা। এর সংক্ষিপ্ত তক্ষসীর এরূপঃ) আত্মীয়কে তার (আধিক ও অন্যান্য) হক দান কর এবং মিসকীন ও মুসাফিরদেরকে (তাদের হক দাও)। (অর্থসম্পদ) অমথ্য ব্যয় করো না। নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই (অর্থাৎ শয়তানের মতই) আর শয়তান স্বীয় পালনকর্তার প্রতি খুবই অকৃতজ্ঞ। (আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বিবেক-বুদ্ধিতে স্মরণ করেছেন, কিন্তু সে এই সম্পদ আল্লাহ্ তা'আলার নাকরমানীর কাজে ব্যয় করেছে। এমনিভাবে অপব্যয়কারীদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা অর্থসম্পদ দান করেছেন। কিন্তু তারা সেগুলো আল্লাহ্র নাকরমানীতে ব্যয় করে)।

### আনুমানিক জাতব্য বিষয়

সকল আত্মীয়ের হক দিতে হবে : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে পিতামাতার হক এবং তাঁদের প্রতি আদব ও সম্মান প্রদর্শনের শিক্ষা ছিল। আলোচ্য আয়াতে সকল আত্মীয়ের হক বণিত হয়েছে যে, প্রত্যেক আত্মীয়ের হক আদায় করতে হবে। অর্থাৎ কমপক্ষে তাদের সাথে সুন্দরভাবে জীবন-স্থাপন ও সন্ধ্যাবহার করতে হবে। যদি তারা অভাবগ্রস্ত হয়, তবে সামর্থ্য অনুযায়ী তাদের আর্থিক সাহায্যও এর অন্তর্ভুক্ত। এ আয়াত দ্বারা এতটুকু বিষয় তো প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রত্যেকের ওপরই তার সাধারণ আত্মীয়দেরও হক রয়েছে। সে হক কি এবং কতটুকু তার বিশদ বর্ণনা আয়াতে নেই। তবে সাধারণভাবে আত্মীয়তা বজায় রাখা এবং সুন্দরভাবে জীবন স্থাপন করা যে এর অন্তর্ভুক্ত, তা না বললেও চলে। ইমাম আহমদ আবু হানীফা (র) বলেন : যাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ—এমন আত্মীয় মহিলা কিংবা বালক-বালিকা হয়, নিঃস্ব হয় এবং উপার্জন করতেও সক্ষম না হয়; এমনিভাবে সে যদি বিকলাঙ্গ কিংবা অন্ধ হয়, জীবন ধারণের মত ধনসম্পদের অধিকারী না হয়, তবে তার ভরণ-পোষণ করা সক্ষম আত্মীয়দের ওপর ফরম। যদি একই স্তরের কয়েকজন আত্মীয় সক্ষম হয়, তবে ভরণ-পোষণের দায়িত্ব ভাগাভাগি করে কয়েকজনকেই বহন করতে হবে। সূরা বাকারার আয়াতঃ

وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

মাযহারী)

এ আয়াতে আখীর, অভাবগ্রস্ত ও মুসাক্কিরদের আধিক সাহায্যদানকে তাদের হক হিসাবে গণ্য করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তাদের প্রতি দাতার অনুগ্রহ প্রকাশ করার কোন কারণ নেই। কেননা, তাদের হক তার মিশমায় ফরম। দাতা সে ফরমই পালন করছে মাত্র; কারও প্রতি অনুগ্রহ করছে না।

**تَبْذِيرٌ** অর্থাৎ অপব্যয়ের নিষেধাজ্ঞা : কোরআন পাক অপব্যয়কে দু'টি শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছে। একটি **تَبْذِيرٌ** এবং অপরটি **اسْرَافٌ**—আলোচ্য আয়াতে **تَبْذِيرٌ** নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং **وَلَا تُسْرِفُوا** আয়াতে **اسْرَافٌ** নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন : উক্ত শব্দ সমার্থবোধক। গোনাহর কাজে কিংবা অমথ্যা অস্থানে ব্যয় করাকে **تَبْذِيرٌ** ও **اسْرَافٌ** বলা হয়। কেউ কেউ বলেন : গোনাহর কাজে কিংবা সম্পূর্ণ অমথ্যা ও অস্থানে ব্যয় করাকে **تَبْذِيرٌ** বলা হয় আর বৈধ স্থানে প্রয়োজনের চাইতে অধিক ব্যয় করাকে **اسْرَافٌ** বলা হয়। তাই **اسْرَافٌ**—এর চাইতে গুরুতর। **تَبْذِيرٌ**—কারীদেরকে শয়তানের ভাই বলে অভিহিত করা হয়েছে।

হযরত মুজাহিদ বলেন : কেউ নিজের সমস্ত মাল হক আদায় করার জন্য ব্যয় করে দিলে তা অমথ্যা ব্যয় হবে না। পক্ষান্তরে যদি অন্যায়-অহেতুক কাজে এক মুদও (অর্ধসের) ব্যয় করে, তবে তা অমথ্যা ব্যয় বলে গণ্য হবে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন : হক নয় এমন অস্থানে ব্যয় করাকে **تَبْذِيرٌ** বলা হয় (মাযহারী)। ইমাম মালিক (রহ) বলেন : হক পথে অর্থ উপার্জন করে নাহক পথে ব্যয় করাকে **تَبْذِيرٌ** বলা হয়। একে **اسْرَافٌ**—ও বলে। এটা হারাম।—(কুরতুবী)

ইমাম কুরতুবী বলেন : হারাম ও অবৈধ কাজে এক দিনহাম খরচ করাও **تَبْذِيرٌ** এবং বৈধ ও অনুমোদিত কাজে সীমাতিরিক্ত খরচ করা, হৃদয়ন ভবিষ্যতে অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ার আশংকা দেখা দেয়—এটাও **تَبْذِيرٌ**—এর অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য যদি কেউ আসল মূলধন ঠিক রেখে তার মুনাক্কাকে বৈধ কাজে মুক্ত হস্তে ব্যয় করে, তবে তা **تَبْذِيرٌ**—এর অন্তর্ভুক্ত নয়।—(কুরতুবী)

وَمَا تَعْرَضْنَ عَنْهُمْ إِيْتَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا

مَّيْسُورًا

(২৮) এবং তোমার পালনকর্তার করুণার প্রত্যাশায় অপেক্ষমাণ থাকাকালে যদি কোন সময় তাদেরকে বিমুখ করতে হয়, তখন তাদের সাথে নম্রভাবে কথা বলো।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(এ আয়াতে বান্দার হক সম্পর্কে পঞ্চম আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, যদি কোন সময় অভাবগ্রস্তদেরকে তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী সাহায্য করার ব্যবস্থা না হয় তবে তখনও তাদেরকে যেন রুঢ় ভাষায় জগোয়াব না দেওয়া হয়; বরং সহানুভূতির সাথে ভবিষ্যৎ সুবিধার আশা দেওয়া হয়। তফসীর এরূপঃ)

এবং যদি (কোন সময় তোমার কাছে তাদেরকে দেওয়ার মত অর্থ-সম্পদ না থাকে এবং এজন্য) তোমাকে ঐ স্নিকের প্রতীক্ষায়, যা পাওয়ার আশা পালনকর্তার কাছে কর, (তা না আসা পর্যন্ত) তাদের কাছ থেকে মুখ ফিরাতে হয়, তবে (এতটুকু খেয়াল রাখবে যে) তাদেরকে নরম কথা বলে দেবে। (অর্থাৎ হৃৎচিন্তিতার সাথে তাদেরকে এরূপ ওয়াদা দেবে যে, ইনশাআল্লাহ্ ভবিষ্যতে কোনখান থেকে এনে দেবে। পীড়াদায়ক উত্তর দেবে না।)

### আনুমানিক জাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (স) ও তাঁর মাধ্যমে সমগ্র উম্মতকে অভূতপূর্ব নৈতিক চলিত শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, কোন সময় যদি অভাবগ্রস্ত লোকেরা সওয়াল করে এবং আপনার কাছে দেওয়ার মত কিছু না থাকার দরুন আপনি তাদের তরফ থেকে মুখ ফিরাতে বাধ্য হন, তবে এ মুখ ফিরানো আশ্চর্যরিতামুক্ত অথবা প্রতিপক্ষের জন্য অপমানজনক না হওয়া উচিত; বরং তা অপারকতা ও অক্রমতা প্রকাশ সহকারে হওয়া কর্তব্য।

এ আয়াতের শানে-নুহুল সম্পর্কে ইবনে জায়েদ রেওয়ায়েত করেন যে, কিছু সংখ্যক লোক রসূলুল্লাহ্ (স)-র কাছে অর্থকড়ি চাইত। তিনি জানতেন যে, এদেরকে অর্থকড়ি দিলে তা দুর্কর্মে ব্যয় করবে। তাই তিনি এদেরকে কিছু দিতে অস্বীকার করতেন এবং এটা ছিল তাদেরকে দুর্কর্ম থেকে বিরত রাখার একটি উপায়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতটি নাযিল হয়।

মসনদে সাঈদ ইবনে মনসুর সাবা ইবনে হাকামের বাচনিক উল্লিখিত আছে যে, একবার রসূলুল্লাহ্ (স)-র কাছে কিছু বস্ত্র আসলে তিনি তা হকদারদের মধ্যে বন্টন করে দেন। বন্টন শেষ হওয়ার পর আরও কিছু লোক আসলে তাদেরকে দেওয়া সম্ভব হয়নি। তাদের সম্পর্কেই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ



فَقَعَدَ مَلُومًا مَّخْسُورًا ۝ اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۝  
 اِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ۝

(২৯) তুমি একেবারে ব্যয়-কুষ্ঠ হইয়া না এবং একেবারে মুক্তহস্তও হইয়া না। তাহলে তুমি তিরস্কৃত, নিঃশ্ব হইয়ে বসে থাকবে। (৩০) নিশ্চয় তোমার পালনকর্তা থাকে ইচ্ছা অধিক জীবনোপকরণ দান করেন এবং তিনিই তা সংকুচিতও করে দেন। তিনিই তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে ভালোভাবে অবহিত,—সব কিছু দেখছেন।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তুমি নিজের হাত গর্দানের সাথে বেঁধে রেখো না (যে, চূড়ান্ত রূপগতার কারণে ব্যয় করা থেকে হাত ওঠিয়ে নেবে) এবং সম্পূর্ণ খুলেও দিয়ো না (যে, প্রয়োজনান্তিরিক্ত ব্যয় করে অপব্যয় করবে) নতুবা তিরস্কৃত (ও) রিক্ত হস্ত হইয়ে বসে থাকতে হবে। (কারও অভাব-অনটন দেখে নিজেকে বিপদের সম্মুখীন করা যুক্তিসঙ্গত নয়। কেননা) নিশ্চয় তোমার পালনকর্তা থাকে ইচ্ছা বেশী রিমিক দান করেন এবং তিনিই (যার জন্য ইচ্ছা) সংকুচিত করে দেন। নিশ্চয় তিনি স্বীয় বান্দাদের (অবস্থা ও উপযোগিতা) সম্পর্কে খুব ভালোভাবে জানেন, দেখেন। (সমগ্র বিশ্বের অভাব দূর করা স্বাক্ষর আলামীনেরই কাজ। তুমি এ চিন্তা কেন করবে যে, নিজেকে বিপদে ফেলে সবার অভাব-অনটন দূর করবে। এটা এজন্য অর্থহীন যে, সবকিছু করার পরও কারও অভাব দূর করা তোমার সাধ্যে কলাবে না। এর অর্থ এরূপ নয় যে, কেউ কারও দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করবে না বরং উদ্দেশ্য এই যে, সবার অভাব দূর করার সাধ্য কোন মানুষের নেই, যদিও সে নিজেকে যত বিপদে ফেলতেই সম্মত হোক। এ কাজ একমাত্র সৃষ্ট জগতের প্রভুর। তিনি সবার অভাব ও চাহিদা সম্পর্কে জানেন এবং সবার কল্যাণ সম্পর্কেও জ্ঞাত রয়েছেন। কখন, কোন ব্যক্তির, কোন অভাব কি পরিমাণ দূর করা উচিত তা তাঁরই জানা আছে। মানুষের কাজ শুধু মধ্যবর্তিতা অবলম্বন করা—খরচ করার জায়গায় রূপগতা না করা এবং এত বেশী খরচ না করা যে, আগামীকাল নিজেই ফকীর হইয়ে যায়, পরিবার-পরিজনের হক আদায় করতে অক্ষম হয়ে পড়ে, আর পরে আক্ষেপ করতে হয়।)

### আনুষ্ঠানিক জ্ঞাতব্য বিষয়

খরচ করার ব্যাপারে মধ্যবর্তিতার নির্দেশ : আলোচ্য আয়াতে সরাসরি রসূলুল্লাহ (সা)-কে এবং তাঁর মধ্যস্থতায় সমগ্র উম্মতকে সম্বোধন করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এমন মিতাচার শিক্ষা দেওয়া, যা অপরের সাহায্যে প্রতিবন্ধকও না হয় এবং নিজের জন্যও বিপদ ডেকে না আনে। এ আয়াতের শানে-নুযূলে ইবনে মারদওয়াইহ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে



বিশ্বংখলা। (মামহারী) <sup>٨٥ ٨٤ ٨٣</sup> مَلُومًا مَسْخُورًا শব্দদ্বয় সম্পর্কে তফসীরে মামহারীতে বলা হয়েছে যে, <sup>٨٥ ٨٤</sup> مَلُوم শব্দটি প্রথম অবস্থা অর্থাৎ রূপগতার সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ রূপগতার কারণে হাত ওঠিয়ে রাখলে মানুষের কাছে তিরস্কৃত হতে হবে। <sup>٨٥ ٨٤</sup> مَسْخُورًا শব্দটি দ্বিতীয় অবস্থার সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ বেশী বায় করে নিজে ফকীর হয়ে গেলে সে <sup>٨٥ ٨٤</sup> مَسْخُور অর্থাৎ শ্রান্ত, অক্ষম অথবা অনুতপ্ত হয়ে যাবে।

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةً ۖ اِمْلَاقٍ ۚ كُنْتُمْ كُرُوفًا ۚ وَمَوَالِيكُمْ ۗ اِنَّ قَتْلَهُمْ  
كَانَ خَطَا كَبِيرًا ۝

(৩৯) দারিদ্র্যের ভয়ে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না। তাদেরকে এবং তোমাদেরকে আমিই জীবনোপকরণ দিয়ে থাকি। নিশ্চয় তাদেরকে হত্যা করা মারাত্মক অপরাধ।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

সন্তানদের দারিদ্র্যের ভয়ে হত্যা করো না। (কেননা) সবার রিযিকদাতাই আমি। তাদেরকেও রিযিক দেই এবং তোমাদেরকেও। (রিযিকদাতা তোমরা হলে একরূপ চিন্তা করতে পারতে) নিশ্চয় তাদেরকে হত্যা করা মহাপাপ।

### আনুশঙ্গিক জাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে একের পর এক মানবিক অধিকার সংক্রান্ত নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে এই ষষ্ঠ নির্দেশটি জাহিলিয়ত যুগের একটি নিপীড়নমূলক অভ্যাস সংশোধনের নিমিত্তে উল্লিখিত হয়েছে। জাহিলিয়ত যুগ কেউ কেউ অপের পরপরই সন্তানদেরকে বিশেষ করে কন্যা সন্তানদেরকে হত্যা করত, যাতে তাদের ভরণপোষণের বোঝা বহন করতে না হয়। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাদের এই কর্মপন্থাটি যে অভ্যস্ত জঘন্য ও ভ্রান্ত তাই সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন। অনুধান করতে বলেছেন যে, রিযিকদানের তোমরা কে? এটা তো একান্তভাবে আল্লাহ তা'আলার কাজ। তোমাদেরকেও তো তিনিই রিযিক দিয়ে থাকেন। যিনি তোমাদেরকে দেন, তিনিই তাদেরকেও দেবেন। তোমরা এ চিন্তায় কেন সন্তান হত্যার অপরাধে অপরাধী হচ্ছ? বরং এ ক্ষেত্রে রিযিক দেওয়ার বর্ণনায় সন্তানদের কথা অগ্রে উল্লেখ করে ইঙ্গিত করেছেন যে, আমি আগে তাদেরকে ও পরে তোমাদেরকে দেব। এর প্রকৃত উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ-তা'আলা যে বাপ্পাকে নিজের পরিবার-পরিজনদের ভরণপোষণ ও অন্য দরিদ্রদের সাহায্য

করতে দেখেন, তাকে সে হিসাবেই দান করেন, যাতে সে নিজের প্রয়োজনও মেটাতে পারে এবং অন্যকেও সাহায্য করতে পারে। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন :

**أَفَمَا تَنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ بَعْضًا بِكُمْ** অর্থাৎ তোমাদের দুর্বল শ্রেণীর জন্যই আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের সাহায্য করা হয় এবং তোমাদেরকে ঋণিক দেওয়া হয়। এতে জানা গেল যে, পরিবার-পরিজনদের উন্নয়নপোষণকারী পিতামাতা যা কিছু পায়, তা দুর্বল চিত্ত নারী ও শিশু সন্তানের ওসিলাতেই পায়।

**মাস জালা :** কোরআন পাকের এই বক্তব্য থেকে সে বিষয়ের উপরও আলোকপাত হয় যাতে বর্তমান বিশ্ব আশ্চর্য-পূর্থে জড়িত হয়ে পড়েছে। আজকাল জনসংখ্যা বৃদ্ধির ভয়ে জননিয়ন্ত্রণ ও পরিবার-পরিরক্ষনাকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। নিজেদেরকে ঋণিকদাতা মনে করে নেওয়ার এই ব্রাহ্ম ও জাহেলিয়ত সুলভ দর্শনের উপরই এর ভিত্তি রাখা হয়েছে। সন্তান হত্যার সমান গোনাহ না হলেও এটা যে গণিত ও নিন্দনীয় কাজ, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

**وَلَا تَقْرُبُوا الرِّبِّيَّ إِنَّهُ كَانَ قَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝**

(৩২) আর ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না। নিশ্চয় এটা অশ্লীল কাজ এবং মন্দ পথ।

### তরুসীরের সার-সংক্ষেপ

আর ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না (অর্থাৎ এর প্রাথমিক কারণাদি থেকেও বঁচে থাক)। নিশ্চয় এটা (নিজেও) নিত্যন্ত অশ্লীল কাজ এবং (অন্যান্য অনিশ্চয়ের দিক দিয়েও) মন্দ পথ! (কেননা, এর পরিণতিতে শত্রুতা, গোত্রযোগ এবং বংশবিকৃতি দেখা দেয়।)

### আনুমানিক আতব্য বিষয়

ব্যভিচারের অবৈধতা সম্পর্কে এটি সপ্তম নির্দেশ। এতে ব্যভিচার হারাম হওয়ার দৃষ্টি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। এক এটি একটি অশ্লীল কাজ। মানুষের মধ্যে লজ্জা-শরম না থাকলে সে মনুষ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। অতঃপর তার দৃষ্টিতে ভালমন্দের পার্থক্য লোপ পায়। এ অর্থেই হাদীসে বলা হয়েছে **إِذَا فَاتَى الْهَيْبَاءَ فَا فَعَلَ**

অর্থাৎ তোমার লজ্জাই যখন লোপ পাবে, তখন যা খুশী তাই করতে পার। এজন্যই রসূলুল্লাহ (সা) লজ্জাকে ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ সাব্যস্ত করেছেন। বলেছেন :

**إِذَا فَاتَى الْهَيْبَاءَ فَا فَعَلَ** (বুখারী)। দ্বিতীয় কারণ সামাজিক অনাস্থিতি।

ব্যভিচারের কারণে এটা এত প্রসার লাভ করে যে, এর কোন সীমা-পারিসীমা থাকে না। এর অন্তর্ভুক্ত পরিণাম অনেক সময় সমগ্র গোত্র ও সম্প্রদায়কে বরবাদ করে দেয়।

বর্তমান বিশ্বে গোলযোগ, চুরি-ডাকাতি ও হত্যার যে ছড়াছড়ি, অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, তার অর্ধেকের চাইতে বেশী ঘটনার কারণ কোন পুরুষ ও নারী যারা এ অপকর্ম লিপ্ত। এ অপরাধটি যদিও সরাসরি বান্দার হকের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়; কিন্তু এখানে বান্দার হক সম্পর্কিত নির্দেশাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে একে উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত এই যে, এ অপরাধটি এমন অনেকগুলো অপরাধ সঙ্গে নিয়ে আসে, যার দ্বারা বান্দার হক ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং হত্যা ও লুটতরাজের হাঙ্গামা সংঘটিত হয়। একারণেই ইসলাম এ অপরাধটিকে সব অপরাধের চাইতে গুরুতর বলে সাব্যস্ত করেছে এবং এর শাস্তিও সব অপরাধের শাস্তির চাইতে কঠোর বিধান করেছে। কেননা, এই একটি অপরাধ অন্যান্য শত শত অপরাধকে নিজের মধ্যে সন্নিবেশিত করেছে।

রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : সপ্ত আকাশ এবং সপ্ত পৃথিবী বিবাহিত যিনাকারদের প্রতি অভিসম্পাত করে। জাহান্নামে এদের লজ্জাস্থান থেকে এমন দুর্গন্ধ ছড়াবে যে, জাহান্নামীরাও তা থেকে অতিষ্ঠ হয়ে পড়বে। আগুনের আঘাবের সাথে সাথে জাহান্নামে তাদের লাশুনাও হতে থাকবে।--( বাযযার )

হযরত আবু হোরায়রা (রা)-র বাচনিক অন্য এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : যিনাকার ব্যক্তি যিনা করার সময় মু'মিন থাকে না। চোর চুরি করার সময় মু'মিন থাকে না। মদ্যপায়ী মদ্য পান করার সময় মু'মিন থাকে না। হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত রয়েছে। আবু দাউদের রেওয়াজেতে এর ব্যাখ্যা এই যে, এসব অপরাধী যখন অপরাধে লিপ্ত হয়, তখন ঈমান তাদের অন্তর থেকে বাইরে চলে আসে। এরপর যখন অপরাধ থেকে ফিরে আসে, তখন ঈমানও ফিরে আসে।--( মাযহারী )

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قَتَلَ مَطْلُومًا

فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ

مَنْصُورًا ﴿٧٧﴾

(৩৩) সে প্রাণকে হত্যা করো না, যাকে আল্লাহ্ হারাম করেছেন; কিন্তু ন্যায্যভাবে। যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে নিহত হয়, আমি তার উত্তরাধিকারীকে ক্ষমতা দান করি। অতএব সে যেন হত্যার ব্যাপারে সীমা লংঘন না করে। নিশ্চয় সে সাহায্যপ্রাপ্ত।

তকসীরের সাল-সংক্ষেপ

এবং যে ব্যক্তির হত্যাকে আল্লাহ্ হারাম করেছেন, তাকে হত্যা করো না; কিন্তু ন্যায্যভাবে (হত্যা করা জায়েয। অর্থাৎ যখন কোন শরীয়তসম্মত বিধানের কারণে হত্যা করা ওয়াজিব কিংবা জায়েয হয়ে যায়, তখন তা আর হারামের আওতায় থাকে না।)

যাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়, আমি তার ( সত্যিকার অথবা নিয়োজিত ) উত্তরাধিকারীকে ( কিসাস গ্রহণের ) ক্ষমতা দান করেছি। অতএব হত্যার ব্যাপারে তার ( শরীয়তের ) সীমা লংঘন করা উচিত হবে না। [ অর্থাৎ হত্যার নিশ্চিত প্রমাণ ব্যতিরেকে হত্যাকারীকে হত্যা করবে না। হত্যাকারীর যেসব আত্মীয়-স্বজন হত্যাকাণ্ডে জড়িত নয়, শুধু প্রতিশোধ স্পৃহায় উন্মত্ত হয়ে তাদেরকে হত্যা করবে না। এছাড়া হত্যাকারীকেও শুধু হত্যাই করবে, নাক, কান অথবা হাত-পা কেটে 'মুসলা' ( অঙ্গবিকৃত ) করবে না কেননা ] সে ব্যক্তি ( কিসাসের সীমালংঘন না করলে শরীয়তের আইনে ) আল্লাহর সাহায্যের যোগ্য। ( আর সে যদি বাড়াবাড়ি করে থাকে তবে অপর পক্ষ উৎপীড়িত হওয়ার কারণে আল্লাহর সাহায্যযোগ্য হওয়ার কদম্ব করা এবং সীমালংঘন করে এ নিয়ামতকে বিনষ্ট না করা। )

### জানুয়ারিক জাতক্য বিষয়

অন্যায় হত্যার অবৈধতা বর্ণনা প্রসঙ্গে এটা অষ্টম নির্দেশ। অন্যায় হত্যা যে মহা অপরাধ, তা বিশ্বের দলমত ও ধর্মধর্ম নিবিশেষে সবার কাছে স্বীকৃত। রসূলুল্লাহ (স) বলেন : একজন মু'মিনকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার চাইতে আল্লাহর কাছে সমগ্র বিশ্বকে ধ্বংস করে দেওয়া লম্বু অপরাধ। কোন কোন রেওয়াজেতে এতৎসঙ্গে আরও বলা হয়েছে যে, যদি আল্লাহ তা'আলার সন্ত আকাশ ও সন্ত ভূমণ্ডলের অধিবাসীরা সম্মিলিতভাবে কোন মু'মিনকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে, তবে আল্লাহ তা'আলা সবাইকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।—( ইবনে মাজা, মসনদ হাসান, বায়হাকী-মায়হারী )

অন্য এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (স) বলেন : যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের হত্যাকাণ্ডে একটি কথা দ্বারা হত্যাকারীর সাহায্য করে, হাশরের মাঠে সে যখন আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে, তখন তার কপালে লেখা থাকবে **أُتِسَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ** অর্থাৎ এই লোকটিকে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ করে দেওয়া হয়েছে।—( মায়হারী, ইবনে মাজা হইতে )

বায়হাকী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও হযরত মুাবিয়ার রেওয়াজেতে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (স) বলেন : প্রত্যেক গোনাহ আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করবেন বলে আশা করা যায়; কিন্তু যে ব্যক্তি কুকুরী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে অথবা যে ব্যক্তি জেমেণ্ডনে ইচ্ছাপূর্বক কোন মুসলমানকে হত্যা করে, তার গোনাহ ক্ষমা করা হবে না।

অন্যায় হত্যার বাধা : ইমাম বুখারী ও মুসলিম হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাস-উদের রেওয়াজেতে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (স) বলেন : যে মুসলমান আল্লাহ এক এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল বলে সাক্ষ্য দেয়, তার রক্ত হালাল নয়; কিন্তু তিনটি কারণে তা হালাল হয়ে যায়। এক. বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও সে যদি যিনা করে, তবে প্রস্তুত বয়সে হত্যা করাই তার শরীয়তসম্মত শাস্তি। দুই. সে যদি অন্যায়ভাবে কোন মানুষকে হত্যা করে, তবে তার শাস্তি এই যে, নিহত ব্যক্তির ওলী তাকে কিসাস হিসাবে হত্যা করতে পারে। তিন. যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে, তার শাস্তিও হত্যা।

কিসাস নেওয়ার অধিকার কার? আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, এই অধিকার নিহত ব্যক্তির ওলীর। যদি রক্ত সম্পর্কিত ওলী না থাকে, তবে ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার-প্রধান এ অধিকার পাবে। কারণ, সরকারও এক দিক দিয়ে সব মুসলমানের ওলী। তাই তরুসীরের সার-সংক্ষেপে 'সত্যিকার অথবা নিয়োজিত ওলী' লেখা হয়েছে।

অন্যায়ের জওয়ার অন্যায় নয়—ইনসাফ। অপরাধীর শাস্তির বেলায়ও ইনসাফের

প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে : **فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ** এটা ইসলামী আইনের একটা

বিশেষ নির্দেশ। এর সারমর্ম এই যে, অন্যায়ের প্রতিশোধ অন্যায়ের মাধ্যমে নেওয়া জায়েয নয়। প্রতিশোধের বেলায়ও ইনসাফের প্রতি লক্ষ্য রাখা অপরিহার্য। যে পর্যন্ত নিহত ব্যক্তির ওলী ইনসাফ সহকারে নিহতের প্রতিশোধ কিসাস নিতে চাইবে, সেই পর্যন্ত শরীয়তের আইন তার পক্ষে থাকবে। আল্লাহ তা'আলা তার সাহায্যকারী হবে পক্ষান্তরে সে যদি প্রতিশোধম্পূর্য উশ্মত হয়ে কিসাসের সীমালংঘন করে, তবে সে ময়নুমের পরিবর্তে জালিমের জুমিকায় অবতীর্ণ হবে এবং জালিম ময়নুম হয়ে যাবেন। আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর আইন এখন তার সাহায্য করার পরিবর্তে প্রতিপক্ষের সাহায্য করবে এবং তাকে জুলুম থেকে বাঁচাবে।

মুর্থতা মূগের আরবে সাধারণত এক ব্যক্তির হত্যার পরিবর্তে হত্যাকারীর পরিবার অথবা স্ত্রী-সাহীদের মধ্য থেকে যাকেই পাওয়া যেত, তাকেই হত্যা করা হত। কোন কোন ক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তি গোত্রের সরদার অথবা বড়লোক হলে তার পরিবর্তে শুধু এক ব্যক্তিকে কিসাস হিসাবে হত্যা করা যথেষ্ট মনে করা হত না; বরং এক খুনের পরিবর্তে দু-তিন কিংবা আরও বেশি মানুষের প্রাণ সংহার করা হত। কেউ কেউ প্রতিশোধম্পূর্য উশ্মত হয়ে হত্যাকারীকে শুধু হত্যা করেই ক্ষান্ত হত না; বরং তার নাক, কান ইত্যাদি কেটে অঙ্গ বিকৃত করা হত। ইসলামী কিসাসের আইনে এগুলো সব অতিরিক্ত ও হারাম।

তাই **فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ** আয়াতে এ ধরনের বাড়িশাস্তিকে প্রতিরোধ করা হয়েছে।

একটি স্মরণীয় গল্প : একজন মুজাহিদ ইমামের সামনে জনৈক ব্যক্তি হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ ইসলামী ইতিহাসের সর্বাধিক জালিম এবং কুখ্যাত ব্যক্তি। সে হাজারো সাহাবী ও তাবয়ীকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে। তাই সাধারণভাবে তাকে মন্দ বলা যে মন্দ, সেদিকে কারও লক্ষ্য থাকে না। যে বৃখুর্গ ব্যক্তির সামনে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফকে দোষারোপ করা হয়, তিনি দোষারোপকারীকে জিজ্ঞেস করলেন : তোমার কাছে এই অভিযোগের পক্ষে কোন সনদ অথবা সাক্ষ্য রয়েছে কি? সে বলল : না। তিনি বললেন : যদি আল্লাহ তা'আলা জালিম হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের কাজ থেকে হাজারো নিরপরাধ নিহত ব্যক্তির প্রতিশোধ নেন, তবে মনে রেখ, যে ব্যক্তি হাজ্জাজের উপর কোন জুলুম করে, তাকেও প্রতিশোধের কবল থেকে অব্যাহতি দেওয়া হবে না। আল্লাহ তা'আলা তার কাজ থেকেও হাজ্জাজের প্রতিশোধ গ্রহণ

করবেন। তাঁর আদালতে কোন অবিচার নেই যে, অসৎ ও পাপী বান্দাদেরকে যা ইচ্ছা, তা দোষানোপ ও অপবাদ আরোপের জন্য অন্যদেরকে স্বাধীন ছেড়ে দেওয়া হবে।

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ  
وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۚ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ۖ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ ۚ إِذَا  
كَلَّمْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ ۚ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۖ

(৩৪) আর, এতীমের মালের কাছেও যেনো না, একমাত্র তার কল্যাণ আকাঙ্ক্ষা ছাড়া; সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির যৌবনে পদার্পণ করা পর্যন্ত এবং অঙ্গীকার পূর্ণ কর। নিশ্চয় অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। (৩৫) মেপে দেওয়ার সময় পূর্ণ মাপে দেবে এবং সঠিক দাঁড়িপাল্লায় ওজন করবে। এটা উত্তম এর পরিণাম শুভ।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এতীমের মালের কাছে যেনো না (অর্থাৎ তাতে হস্তক্ষেপ করো না) কিন্তু এমন পন্থায়, যা (শরীয়তের আইনে) উত্তম, যে পর্যন্ত সে প্রাপ্তবয়স্ক না হয়ে যায়। এবং (বৈধ) অঙ্গীকার পূর্ণ কর। নিশ্চয় (কিয়ামতে) অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। (বান্দা আন্নাহর সাথে যেসব অঙ্গীকার করেছে এবং মানুষের সাথে যেসব অঙ্গীকার করে থাকে, সবই এর অন্তর্ভুক্ত।) এবং (পরিমেষ বস্তুকে) যখন মেপে দাও তখন পুরোপুরি মেপে দাও এবং (ওজনের বস্তুকে) সঠিক দাঁড়িপাল্লা দ্বারা ওজন করে দাও। এটা (প্রকৃতই) উত্তম এবং এর পরিণাম শুভ। (পরকালে সওয়াব এবং দুনিয়াতে সুখ্যাতি, যা ব্যবসা ক্ষেত্রে উন্নতির উপায়।)

### আনুমানিক জাতবা বিষয়

আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে আর্থিক হক সম্পর্কিত তিনটি নির্দেশ যথা—নবম, দশম ও একাদশতম নির্দেশে বর্ণিত হয়েছে। পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে দৈহিক ও শারীরিক হক উল্লেখ করা হয়েছিল। এখানে আর্থিক হক বর্ণিত হয়েছে।

এতীমদের মাল সম্পর্কে সাবধানতা : প্রথম আয়াতে এতীমদের মালের রক্ষণাবেক্ষণ এবং এ ব্যাপারে সাবধানতা সম্পর্কে নবম নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে। এতে অত্যন্ত জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, এতীমদের মালের কাছেও যেনো না: অর্থাৎ এত যেন শরীয়তবিরোধী অথবা এতীমদের স্বার্থের পরিপন্থী কোন প্রকার হস্তক্ষেপ না হয়। এতীমদের মালের হিফায়ত ও ব্যবস্থাপনা যাদের দায়িত্বে অর্পিত হয় এ ব্যাপারে তাদের খুব সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। তারা শুধু এতীমদের স্বার্থ দেখে ব্যস্ত করবে। নিজেদের খেলাল-খুশীতে অথবা কোনরূপ চিন্তা-ভাবনা ব্যতিরেকে ব্যস্ত করবে না। এ কর্মধারা ততদিন



অব্যাহত থাকবে, যতদিন এতীম শিশু যৌবনে পদার্পণ করে নিজের মালের হিকমত নিজেই করতে সক্ষম না হয়। এর সর্বনিম্ন বয়স পনের বছর এবং সর্বোচ্চ বয়স আঠার বছর।

অবেধ পছায় যে কোন ব্যক্তির মাল খরচ করা জায়েয নয়। এখানে বিশেষ করে এতীমের কথা উল্লেখ করার কারণ এই যে, সে নিজে কোন হিসাব নেওয়ার যোগ্য নয়। অন্যরাও এ সম্পর্কে জানতে পারে না। যেখানে মানুষের পক্ষ থেকে হক দাবী করার কেউ না থাকে সেখানে আল্লাহর পক্ষ থেকে দাবী কর্তার তর হয়ে যায়। এতে দু'টি হলে সাধারণ মানুষের হকের তুলনায় গোনাহ্ আধিক হয়।

**অঙ্গীকার পূর্ণ ও কার্যকরী করার নির্দেশ :** অঙ্গীকার পূর্ণ করার তাকীদ হচ্ছে দশম নির্দেশ। অঙ্গীকার দুই প্রকার। এক. যা বান্দা ও আল্লাহর মধ্যে রয়েছে ; যেমন সৃষ্টির সূচনাকালে বান্দা অঙ্গীকার করেছিল যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের পালনকর্তা। এ অঙ্গীকারের অবশ্যস্বাবী প্রতিক্রিয়া এই যে, তাঁর নির্দেশাবলী মানতে হবে এবং সন্তুষ্টি অর্জন করতে হবে। এ অঙ্গীকার তো সে সময় প্রত্যেকেই করেছে—দুনিয়াতে সে মু'মিন হোক কিংবা কাফির। এছাড়া মু'মিনের একটি অঙ্গীকার রয়েছে যা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'র সাক্ষ্যের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে। এর সারমর্ম আল্লাহর বিধানাবলীর পূর্ণাঙ্গ আনুগত্য এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন।

দ্বিতীয় প্রকার অঙ্গীকার যা এক মানুষ অন্য মানুষের সাথে করে। এতে ব্যক্তিবর্গ অথবা গোষ্ঠীবর্গের মধ্যে সম্পাদিত সমস্ত রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক ও লেন-দেন সম্পর্কিত চুক্তি অন্তর্ভুক্ত।

প্রথম প্রকার অঙ্গীকার পূর্ণ করা মানুষের জন্য ওয়াজিব এবং দ্বিতীয় প্রকারের মধ্যে যেসব চুক্তি শরীয়তবিরোধী নয়, সেগুলো পূর্ণ করা ওয়াজিব। শরীয়তবিরোধী হলে প্রতিপক্ষকে জ্ঞাত করে তা খতম করে দেওয়া ওয়াজিব। যে চুক্তি পূর্ণ করা ওয়াজিব, যদি কোন এক পক্ষ তা পূর্ণ না করে, তবে আদালতে উত্থাপন করে তাকে পূর্ণ করতে বাধ্য করার অধিকার প্রতিপক্ষের রয়েছে। চুক্তির স্বরূপ হচ্ছে দুই পক্ষ সম্মত হয়ে কোন কাজ করা বা না করার অঙ্গীকার করা। যদি কোন লোক এক তরফাভাবে কারও সাথে ওয়াদা করে যে, অমুক বস্তু তাকে দেব অথবা অমুক কাজ করে দেব, তবে তা পূর্ণ করাও ওয়াজিব। কেউ কেউ একেও উল্লিখিত অঙ্গীকারের অন্তর্ভুক্ত করেছেন; কিন্তু পার্থক্য এই যে, দ্বিপাক্ষিক চুক্তিতে কেউ বিরুদ্ধাচরণ করলে ব্যাপারটি আদালতে উত্থাপন করে তাকে চুক্তি পালনে বাধ্য করা যায়; কিন্তু এক তরফা চুক্তিকে আদালতে উত্থাপন করে পূর্ণ করতে বাধ্য করা যায় না। হ্যাঁ শরীয়তসম্মত ওজর বাতিলকে কারও সাথে ওয়াদা করে তা ভুল করলে সে গোনাহ্গার হবে। হাদীসে একে কার্যত নিষ্কাব বলা হয়েছে।

আয়াতের শেষে বলা হয়েছে : **إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا** —অর্থাৎ কিয়ামতে

অন্যমন্য ফরমস ওয়াজিব কর্ম এবং আল্লাহর বিধানাবলী পালন করা বা না করা সম্পর্কে

যেমন জিজ্ঞাসাবাদ হবে, তেমনি পান্নস্পরিক চুক্তি সম্পর্কেও প্রস্ন করা হবে। এখানে শুধু 'প্রস্ন করা হবে' বলে বক্তব্য শেষ করে দেওয়া হয়েছে। প্রস্ন করার পর কি হবে, সেটাকে অব্যক্ত রাখার মধ্যে বিপদ যে গুরুতর হবে, সেদিকে ইঙ্গিত রয়েছে।

একাদশতম নির্দেশ হচ্ছে লেন-দেনের ক্ষেত্রে মাপ ও ওজন পূর্ণ করার আদেশ এবং কম মাপার নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে। এর বিস্তারিত বিবরণ সূরা মুতাফ্ফিফীনে উল্লিখিত আছে।

মাস'আলা : ফিকাহবিদগণ বলেছেন : আয়াতে মাপ ও ওজন সম্পর্কে যে নির্দেশ আছে, তার সারমর্ম এই যে, যার হাতটুকু হক, তার চাইতে কম দেওয়া হারাম। কাজেই কর্মচারী যদি তার নিদিষ্ট ও অপিত কাজের চাইতে কম কাজ করে অথবা নির্ধারিত সময়ের চাইতে কম সময় দেয় অথবা প্রমিক যদি কাজ চুরি করে, তবে তাও আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে হারাম হবে।

কম মাপ দেওয়া ও কম ওজন করার নিষেধাজ্ঞা : মাস'আলা— **أَوْفُوا**

**أَوْفُوا** তফসীরে বাহরে মুহীতে আবু হাইয়ান বলেন : এ আয়াতে মাপ পূর্ণ করার দায়িত্ব বিক্রেতার উপর অপিত হয়েছে। এতে বোঝা গেল যে, মাপ ও ওজন পূর্ণ করার জন্য বিক্রেতা দায়ী।

আয়াতের শেষে মাপ ও ওজন পূর্ণ করা সম্পর্কে বলা হয়েছে : **ذَٰلِكَ خَيْرٌ**

**ذَٰلِكَ خَيْرٌ** —এতে মাপ ও ওজন সমান করা সম্পর্কে দুটি বিষয় বলা হয়েছে।

এক. এর উত্তম হওয়া। অর্থাৎ এরূপ করা স্বত্তর দৃষ্টিতে উত্তম। শরীয়তের আইন ছাড়াও যুক্তি ও স্বভাবগতভাবেও কোন বিবেকবান ব্যক্তি কম মাপা ও কম ওজন করাকে ভাল মনে করতে পারে না। দুই. এর পরিণতি শুভ। এতে পরকাজের পরিণতি তথা সওয়াব ও জামাত ছাড়াও দুনিয়ার নিকৃষ্ট পরিণতির দিকেও ইঙ্গিত আছে। কোন ব্যবসা তত্ত্বরণ পর্যন্ত উন্নতি করতে পারে না, যে পর্যন্ত জনগণের বিশ্বাস ও আস্থা অর্জন করতে না পারে। বিশ্বাস ও আস্থা উপরোক্ত বাণিজ্যিক সত্ততা ব্যতীত অজিত হতে পারে না।

**وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ**

**أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولٌ ۖ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّكَ**

**لَنْ تُخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ۖ كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ**

**سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ۖ**

(৩৬) যে বিষয়ে তোমার কোন জান নেই, তার গিহনে পড়া না। নিশ্চয় কান চক্কু ও অন্তঃকরণ এদের প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে। (৩৭) পৃথিবীতে দস্তভরে পদচারণ করো না। নিশ্চয় তুমি তো ভূ-পৃষ্ঠকে কখনই বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতার তুমি কখনই পর্যন্তপ্রমাণ হতে পারবে না। (৩৮) এ সবেৰ মধ্যে যেগুলো মন্দ কাজ সেগুলো তোমার পালনকর্তার কাছে অপছন্দনীয়।

### তক্ষীরের সার-সংক্ষেপ

যে বিষয়ে তোমার জানা নেই, তাকে কার্যে পরিণত করো না। (কেননা) কান, চক্কু ও অন্তঃকরণ—এদের প্রত্যেকটিই (কিয়ামতের দিন) জিজ্ঞেস করা হবে (যে কান ও চক্কুকে কি কি কাজে ব্যবহার করা হয়েছে? সেই কাজ ভাল ছিল, না মন্দ? প্রমাণহীন বিষয়ের কল্পনা অন্তরে কেন স্থান দিয়েছে?) এবং ভূ-পৃষ্ঠে গর্ভভরে বিচরণ করো না। (কেননা) তুমি (ভূ-পৃষ্ঠে সজোরে পদক্ষেপ করে পদভারে) ভূ-পৃষ্ঠকে বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং (দেহকে উঁচু করে) পাহাড়ের উচ্চতার পৌঁছতে পারবে না। (উল্লিখিত) এসব মন্দ কাজ তোমার পালনকর্তার কাছে (সম্পূর্ণ) অপছন্দনীয়।

### আনুশঙ্গিক জাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে ঝাদশতম ও হায়দাশতম নির্দেশ সাধারণ সামাজিকতা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। ঝাদশতম নির্দেশে জানা ব্যতীত কোন বিষয়কে কার্যে পরিণত করতে নিষেধ করা হয়েছে।

এখানে এ বিষয়ে সচেতন রাখা জরুরী যে, জানার স্তর বিভিন্নরূপ হয়ে থাকে। এক প্রকার জানা হচ্ছে পুরোপুরি নিশ্চয়তার স্তর পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া এবং বিপরীত দিকের কোন সন্দেহও অবশিষ্ট না থাকা। দ্বিতীয় জানা হচ্ছে প্রবল ধারণার স্তরে পৌঁছা। এতে বিপরীত দিকের সম্ভাবনাও থাকে। এমনিভাবে বিধানাবলীও দু'প্রকার। এক, অকাটা ও নিশ্চিত বিধানাবলী; যেমন আকায়েদ ও ধর্মের মূলনীতিসমূহ। এগুলোতে প্রথম স্তরের জান বাহুন্নীয়। এ ছাড়া আমল করা জায়েমনয়। দুই, ظنیات অর্থাৎ ধারণা প্রসূত বিধানাবলী; যেমন শাখাগত কর্ম সম্পর্কিত বিধান। এই বর্ণনার পর আলোচ্য আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, নিশ্চিত ও অকাটা বিধানাবলীতে প্রথম স্তরের জান থাকা আবশ্যিক। অর্থাৎ আকায়েদ ও ইসলামী মূলনীতিসমূহে এরূপ জান না হলে তার কোন মূল্য নেই। শাখাগত ধারণা প্রসূত বিষয়াদিতে দ্বিতীয় স্তরের অর্থাৎ প্রবল ধারণাই যথেষ্ট।

—(বয়ানুল কোরআন)

কান চক্কু ও অন্তর সম্পর্কে কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসাবাদ : أَنْ السَّمْعِ

وَالْبَصَرِ وَالْفُؤَادِ أَلَمْ نَلْكَ يَا مَعْشَرَ الْفَالِغِينَ --- এ আয়াতে বলা হয়েছে

যে, কিয়ামতের দিন কান, চক্ষু ও অন্তঃকরণকে প্রসন্ন করা হবে : কানকে প্রসন্ন করা হবে : তুমি সারা জীবন কি কি শুনেছ? চক্ষুকে প্রসন্ন করা হবে : তুমি সারা জীবনে কি কি দেখছ? অন্তঃকরণকে প্রসন্ন করা হবে : সারা জীবনে মনে কি কি করনা করছ এবং কি কি বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করেছ? যদি কান দ্বারা শরীয়ত বিরোধী কথাবার্তা শুনে থাকে; যেমন কারও গীতত এবং হারাম গানবাদ্য কিংবা চক্ষু দ্বারা শরীয়তবিরোধী বস্তু দেখে থাকে; যেমন ভিন্ন স্ত্রী সূত্রী বাজকের প্রতি কুদৃষ্টি করা কিংবা অন্তরে কোরআন ও সুম্মাহ্‌বিরোধী বিশ্বাসকে স্থান দিয়ে থাকে অথবা কারও সম্পর্কে প্রমাণ ছাড়া কোন অভিযোগ মনে কামেম করে থাকে, তবে এ প্রকার ফলে আযাব ভোগ করতে হবে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্

প্রদত্ত সব নিয়ামত সম্পর্কেই প্রসন্ন করা হবে। **لَتَسْتَلْنَ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ**

অর্থাৎ কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে সব নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। এসব নিয়ামতের মধ্যে কান, চক্ষু ও অন্তঃকরণ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। তাই এখানে বিশেষভাবে এগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে।

তফসীরে কুরতুবী ও মাহহারীতে এরূপ অর্থও বর্ণিত হয়েছে যে, পূর্ববর্তী বাক্যে

বলা হয়েছিল **لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ** — অর্থাৎ যে বিষয়ে তোমার জানা নেই,

তা কার্যে পরিণত করো না। এর সাথে সাথে কান, চক্ষু ও অন্তঃকরণকে প্রসন্ন করার উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি জানা-শোনা ছাড়াই উদাহরণত কাউকে দোষারোপ করল কিংবা কোন কাজ করল, যদি তা কানে শোনার বস্তু হয়ে থাকে, তবে কানকে প্রসন্ন করা হবে, যদি চোখে দেখার বস্তু হয়, তবে চোখকে প্রসন্ন করা হবে এবং অন্তর দ্বারা হৃদয়ঙ্গম করার বস্তু হলে অন্তরকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, অন্তরে প্রতিষ্ঠিত অভিযোগ ও করনাটি সত্য ছিল, না মিথ্যা? প্রত্যেক ব্যক্তির অজ-প্রত্যজ এ ব্যাপারে স্বয়ং সাক্ষ্য দেবে। এটা হাশরের ময়দানে ভিডি-হীন অভিযোগকারী এবং না জেনে আমলকারীদের জন্য অত্যন্ত লাল্ছনার কারণ হবে।

সূরা ইয়াসীনে বলা হয়েছে : **الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا**

**أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ**

অর্থাৎ আজ (কিয়ামতের দিন) আমি এদের (অপরাধীদের) মুখ মোহর করে দেব। ফলে তাদের হাত আমাদের সাথে কথা বলবে এবং তাদের চরণসমূহ সাক্ষ্য দেবে তাদের কৃতকর্মের।

এখানে কান, চক্ষু ও অন্তরের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ স্বভাবত এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে এসব ইন্দ্রিয়চেতনা ও অনুভূতি এজন্যই দান করেছেন, যাতে মনে যেসব করনা ও বিশ্বাস আসে, সেগুলোকে এসব ইন্দ্রিয় ও চেতনা দ্বারা পরীক্ষা করে নেয়। বিস্তৃত হলে তা কার্যে পরিণত করবে এবং ভ্রান্ত হলে তা থেকে বিরত থাকবে।

যে ব্যক্তি এগুলোকে কাজে না লাগিয়ে অজানা বিষয়াদির পেছনে লেগে পড়ে, সে আল্লাহর এই নিয়ামতসমূহের নাশেকরী করে।

অতঃপর পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় দ্বারা মানুষ বিভিন্ন বস্তুর জ্ঞান লাভ করে—কর্ণ চক্ষু, নাসিকা, জিহ্বা এবং সমস্ত দেহে ছড়ানো ঐ অনুভূতি, যশ্দ্দ্বারা উত্তাপ ও শৈত্য উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু স্বভাবগতভাবে মানুষ অধিকতর জ্ঞান কর্ণ ও চক্ষু দ্বারা লাভ করে। নাকে ঘ্রাণ নিষ্পন্ন, জিহ্বা দ্বারা আস্বাদন করে এবং হাতে স্পর্শ করে যেসব বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করা হয়, সেগুলো শোনা ও দেখার বিষয়াদির তুলনায় অনেক কম। এখানে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মধ্য থেকে মাত্র দু'টি উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত তাই। এতদুভয়ের মধ্যেও কান অগ্রে উল্লিখিত হয়েছে। কোরআন পাকের অন্যত্র যেখানেই এ দুটি ইন্দ্রিয় এক সাথে উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে কানকেই অগ্রে রাখা হয়েছে। এর কারণও সম্ভবত এই যে, মানুষের জ্ঞান বিষয়াদির মধ্যে কানে শোনার বিষয়াদির সংখ্যাই বেশি। এগুলোর তুলনায় চোখে দেখার বিষয়াদি অনেক কম।

দ্বিতীয় আয়াতে ব্রায়োদশতম নির্দেশ এই : ভূ-পৃষ্ঠে দস্তভরে পদচারণ করো না। অর্থাৎ এমন ভঙ্গিতে চলো না, যশ্দ্দ্বারা অহংকার ও দস্ত প্রকাশ পায়। এটা নির্বোধসুলভ কাজ। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যেন এভাবে চলে ভূ-পৃষ্ঠকে বিদীর্ণ করে দিতে চায় এটা তার সাধ্যাতীত। বুক টান করে চলার উদ্দেশ্য যেন অনেক উঁচু হওয়া। আল্লাহর সৃষ্ট পাহাড় তার চাইতে অনেক উঁচু। অহংকার প্রকৃতপক্ষে মানুষের অন্তরের একটি কবীরা গোনাহ। মানুষের ব্যবহার ও চালচলনে যেসব বিষয় থেকে অহংকার ফুটে ওঠে, সেগুলোও অবৈধ। অহংকারের অর্থ হচ্ছে নিজেকে অন্যের চাইতে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ এবং অন্যকে নিজের তুলনায় হেয় ও ঘৃণ্য মনে করা। হাদীসে এর জন্য কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে।

ইমাম মুসলিম হযরত আয়্যাহ ইবনে আম্মার (রা)-এর রেওয়াজে বর্ণনা করেন—  
 ছেন যে, রসূলুল্লাহ (সা) বলেন : আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে আমার কাছে নির্দেশ পাঠিয়েছেন যে, নয়তা ও হেয়তা অবলম্বন কর। কেউ যেন অন্যের উপর গর্ব ও অহংকারের পথ অবলম্বন না করে এবং কেউ যেন কারও উপর জুলুম না করে।—( মাযহারী )

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :  
 যার অন্তরে কণা পরিমাণ অহংকার থাকে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। —( মুসলিম )

হযরত আবু হুরায়রার এক রেওয়াজে হাদীসে কুদসীতে রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন যে, আল্লাহ বলেন : বড়ত্ব আমার চাদর এবং শ্রেষ্ঠত্ব আমার লুঙ্গি। যে ব্যক্তি আমার কাছ থেকে এগুলো কেড়ে নিতে চায়, আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব। ( চাদর ও লুঙ্গি বলে পোশাক বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা দেহীও নন বা দৈহিক অবয়ব বিশিষ্টও নন যে, পোশাক দরকার হবে। তাই এখানে আল্লাহর মহত্ত্বগুণ বোঝানো হয়েছে। যে ব্যক্তি এ গুণে আল্লাহর শরীক হতে চায় সে জাহান্নামী। )

অন্য এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন : যারা অহংকার করে, কিয়ামতের দিন তাদেরকে ক্ষুদ্র পিপিলিকার সমান মানবাকৃতিতে উত্থিত করা হবে। তাদের উপর

চতুর্দিক থেকে অপমান ও লাঞ্ছনা বর্ষিত হতে থাকবে। তাদেরকে জাহান্নামের একটি কক্ষ প্রকোষ্ঠের দিকে হাঁকানো হবে, যার নাম বুল্‌স। তাদের উপর প্রখরতর অগ্নি প্রজ্বলিত হবে এবং তাদেরকে পান করার জন্য জাহান্নামীদের দেহ থেকে নির্গত পুঁজ রক্ত ইত্যাদি দেওয়া হবে।—( তিরমিযী )

খলীফা হযরত উমর ফারুক (রা) একবার এক ভাষণে বলেন : আমি রসূলুল্লাহ (সা)-র কাছে গুনেছি, যে ব্যক্তি বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে উচ্চ করে দেন। ফলে সে নিজের দৃষ্টিতে ছোট; কিন্তু অন্য সবার দৃষ্টিতে বড় হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অহংকার করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে হেয় করে দেন। ফলে সে নিজের দৃষ্টিতে বড় এবং অন্য সবার দৃষ্টিতে কুকুর ও শূকরের চাইতেও নিকৃষ্ট হয়।—( মায়হারী )

উল্লিখিত নির্দেশাবলী বর্ণনা করার পর আয়াতের শেষে বলা হয়েছে :

كُلُّ ذَلِكُمْ كَانَ مِنْ مَكْرٍ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا --- অর্থাৎ উল্লিখিত সব মন্দ কাজ আল্লাহর কাছে মকরাহ ও অপছন্দনীয়।

উল্লিখিত নির্দেশাবলীর মধ্যে যেগুলো হারাম ও নিষিদ্ধ, সেগুলো যে মন্দ ও অপছন্দনীয়, তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু এগুলোর মধ্যে কিছু কল্পনীয় আদেশও আছে; যেমন পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের হক আদায় করা, অঙ্গীকার পূর্ণ করা ইত্যাদি; যেহেতু এগুলোর মধ্যেও উদ্দেশ্য এদের বিপরীত কর্ম থেকে বেঁচে থাকা; অর্থাৎ পিতামাতাকে কষ্ট দেওয়া থেকে, আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক ছেদ করা থেকে এবং অঙ্গীকার ভঙ্গ করা থেকে বেঁচে থাকা, তাই এসবগুলোও হারাম ও অপছন্দনীয়।

ছ'শিয়ারি : পূর্বোল্লিখিত পনেরটি আয়াতে বর্ণিত নির্দেশাবলী একদিক দিয়ে আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় সাধনা ও কর্মেরই ব্যাখ্যা, যা আঠারো আয়াতের পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল : وَسَعَىٰ لَهَا سَعِيهَا এতে ব্যক্ত করা হয়েছিল যে, প্রত্যেক চেপ্টা ও কর্মই আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় নয়। বরং যে চেপ্টা ও কর্ম রসূলুল্লাহ (সা)-র সূন্নত ও শিক্ষার সাথে সঙ্গতিশীল, শুধু সেগুলোই গ্রহণীয়। এসব নির্দেশে গ্রহণীয় চেপ্টা ও কর্মের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়গুলো বর্ণিত হয়ে গেছে। তন্মধ্যে প্রথমে আল্লাহর হক ও পরে বান্দার হক বর্ণিত হয়েছে।

এই পনেরটি আয়াত সমগ্র তওরাতের সার-সংক্ষেপ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন : সমগ্র তওরাতের বিধানাবলী সূরা বনী ইসরাঈলের পনের আয়াতে সন্নিবেশিত করে দেওয়া হয়েছে।—( মায়হারী )

ذَلِكَ بِمَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا

اخْرَفْتَلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا ۝ اَقْصَفَكُمْ رِكْبِكُمْ بِالْبَنِينِ  
 وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ۝ وَلَقَدْ  
 صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ۝ قُلْ  
 لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذْ آلَا بُتْعُوا لَإِنَّهُمْ لَأِلَ عَالِي عَرْشِ  
 سَبِيلًا ۝ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُقُولُونَ عَلُوًّا كَبِيرًا ۝ تَسْبِيحُ لَهُ  
 السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ۚ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا لَيْسَ لَهُ  
 بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ۝

(৩৯) এটা ঐ হিকমতের অন্তর্ভুক্ত, যা আপনাদের পালনকর্তা আপনাকে ওহী মারফত দান করেছেন। আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্য স্থির করবেন না। তাহলে অভিশ্রুত ও আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে বিভাঙিত অবস্থায় জাহান্নামে নিষ্ক্রান্ত হবেন। (৪০) তোমাদের পালনকর্তা কি তোমাদের জন্য পুত্র সন্তান নির্ধারিত করেছেন এবং নিজের জন্য ফেরেশতাদেরকে কন্যারূপে গ্রহণ করেছেন? নিশ্চয় তোমরা গুরুতর কথাবার্তা বলছ। (৪১) আমি এই কোরআনে নানাভাবে বুঝিয়েছি, যাতে তারা চিন্তা করে। অথচ এতে তাদের কেবল বিমুখতাই বৃদ্ধি পায়। (৪২) বলুন; তাদের কথামত যদি তাঁর সাথে অন্যান্য উপাস্য থাকত; তবে তারা আরশের মালিক পর্যন্ত পৌঁছার পথ অব্যবহা করত। (৪৩) তিনি নেহায়তে পবিত্র ও মহিমাশ্রিত এবং তারা যা বলে থাকে তা থেকে বহু উর্ধ্ব। (৪৪) সন্ত আকাশ ও পৃথিবী এবং এগুলোর মধ্যে যা কিছু আছে সমস্ত কিছু তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। এবং এমন কিছু নেই যা তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না। কিন্তু তাদের পবিত্রতা মহিমা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করতে পার না। নিশ্চয় তিনি জতি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

[ হে মুহাম্মদ (সা), এগুলো অর্থাৎ উল্লিখিত নির্দেশাবলী ] ঐ হিকমতের অংশ, যা আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে আপনাদের কাছে প্রেরণ করেছেন। ( হে সম্বোধিত ব্যক্তি ) আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্য স্থির করো না। নতুবা তুমি অভিশ্রুত, বিভাঙিত হয়ে জাহান্নামে নিষ্ক্রান্ত হবে। ( উল্লিখিত নির্দেশাবলী প্রদানের সূচনাও তওহীদের বিষয়বস্তু দ্বারা করা হয়েছিল এবং শেষও এর মাধ্যমেই করা হয়েছে। এরপরও তওহীদের বিষয়বস্তু

বর্ণিত হচ্ছে যে, পূর্বে যখন শিরকের মন্দ ও বাতিল হওয়া জানা গেল, তখন এরপরও কি তোমরা তওহীদের পন্নিপছাঁ বিষয়াদিতে বিশ্বাস কর? উদাহরণত) তোমাদের পালনকর্তা কি তোমাদের জন্য পুত্র সন্তান নির্ধারিত করে দিয়েছেন এবং নিজে ফেরেশতাদেরকে (নিজের) কন্যারূপে গ্রহণ করেছেন? (আরবের মুখরা ফেরেশতাদেরকে আঞ্জাহর কন্যারূপে আখ্যায়িত করত। এটা দু'কারণে বাতিল। আঞ্জাহর জন্য সন্তান সাব্যস্ত এবং দুই, সন্তান ও কন্যাসন্তান যাদেরকে ফেউ নিজের জন্য পছন্দ করে না—অকেজা বলে মনে করে। এর ফলে আঞ্জাহকে আরও একটি দোষে দোষী সাব্যস্ত করা হয়।) নিশ্চয়ই তোমরা গুরুতর কথা বলছ। (পন্নিতাপের বিষয় যে, শিরকের খণ্ডন ও তওহীদের বিষয়বস্তুকে) আমি এই কোরআনে নানাভাবে বর্ণনা করেছি, যাতে তারা বুঝে নেয়। (বিভিন্ন পন্থার ব্যাবার তওহীদের বিষয়বস্তু সপ্রমাণ এবং শিরক বাতিল করা সম্বন্ধে তওহীদের প্রতি) তাদের অনীহাই কেবল বৃদ্ধি পায়। আপনি (শিরক বাতিল করার জন্য তাদেরকে) বলুন : যদি তাঁর (সত্য উপাস্যের) সাথে অন্য উপাস্যও (অংশীদার) হত; যেমন তারা বলে, তবে তদবস্থায় আরশের মালিক (সত্যিকার আঞ্জাহ) পর্যন্ত পৌছার স্মৃতি তারা (অর্থাৎ অন্য উপাস্যরা কবে) বের করে নিত। (অর্থাৎ তাদেরকে তোমরা আঞ্জাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত কর, যদি তারা বাস্তবিকই অংশীদার হত, তবে আরশের মালিক আঞ্জাহকে আক্রমণ করে বসত এবং পথ ধুঁজে নিত। যখন কথিত উপাস্য শক্তিগুলোর মধ্যে পরস্পর মুক্ত বেঁধে যেত, তখন পৃথিবীর ব্যবস্থাপনা কিভাবে চলতে পারত। অথচ দুনিয়া যে একটি অটল ব্যবস্থার অধীনে চালু রয়েছে, তা প্রত্যেকের দৃষ্টির সামনে বর্তমান আছে। তাই দুনিয়ার ব্যবস্থাপনা বিগুলভাবে চালু থাকাই এ বিশ্বের প্রমাণ হল যে, এক আঞ্জাহ ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ তাঁর অংশীদার নেই। এ থেকে প্রমাণিত হল যে) তারা যা কিছু বলে, আঞ্জাহ তা'আলা তা থেকে পবিত্র ও অনেক উর্ধ্ব। (তিনি এমন পবিত্র যে) সন্ত আকাশ ও পৃথিবী এবং এগুলোর মধ্যে যা কিছু (ফেরেশতা, মানুষ ও জিন) রয়েছে সবাই (ব্যক্তরূপে অথবা অবস্থাগতভাবে) তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করেছে এবং (এই পবিত্রতা বর্ণনা) শুধু বিবেকবান মানুষ ও জিনরাই করে না; কিন্তু তোমরা তাদের তসবীহ (অর্থাৎ পবিত্রতা বর্ণনাকে) বোঝ না। নিশ্চয় তিনি অতি সহনশীল, ক্ষমাপন্নায়ণ।

### মানুষজিক আত্মকা বিষয়

أَزَالَا بُتُغَوًّا

আঞ্জাতে তওহীদের প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে যে, যদি সমগ্র সৃষ্ট

জগতের স্রষ্টা, মালিক ও পন্নিচালক এক আঞ্জাহ না হন; বরং তাঁর আঞ্জাহতে অন্যরাও শরীক হয়, তবে অবশ্যই তাদের মধ্যে কোন মতানৈক্যও হবে। মতানৈক্য হলে সমগ্র বিশ্বের ব্যবস্থাপনা বরবাদ হয়ে যাবে। কেননা, তাদের সবার মধ্যে চিরস্থায়ী সন্ধি হওয়া এবং অনন্তকাল পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকা স্বভাবগতভাবে অসম্ভব। এ প্রমাণটি এখানে নেতিবাচক ডঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে; কিন্তু কলাম শাস্ত্রের গ্রন্থাদিতে এ প্রমাণটির





—অর্থাৎ আমি পাহাড়সমূহকে আভাবহ করে দিয়েছি। তারা দাউদের সাথে সকাহ-বিফাল  
তসবীহ পাঠ করে। সূরা বাঙ্কারায় পাহাড়ের পাথর সম্পর্কে বলা হয়েছে : **وَأَنْ مِّنْهَا**

**لَمَّا يَهَيِّطُ مِنَ خَشْيَةِ اللَّهِ** —অর্থাৎ কতক পাথর আল্লাহর ভয়ে নীচে পড়ে যায়।

এতে প্রমাণিত হয়েছে যে, পাথরের মধ্যেও চেতনা, অনুভূতি ও আল্লাহর ভয় রয়েছে। সূরা মসিয়্যেমে খৃস্টান সম্প্রদায় কর্তৃক হযরত ইসা (আ)-কে আল্লাহর পুত্র আখ্যায়িত করার প্রতিবাদে বলা হয়েছে :

**وَتَكْفُرُ الْجِبَالُ هَذَا أَنْ دَعَا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا** —অর্থাৎ এরা আল্লাহর

জন্য পুত্র সাব্যস্ত করে। তাদের এই কুফরী বাক্যের কারণে পাহাড় ভীত হয়ে পতিত হয়। বলা বাহুল্য, এই ভয়-ভীতি তাদের চেতনা ও অনুভূতির পরিচায়ক। চেতনা ও অনুভূতি থাকলে তসবীহ পাঠ করা অসম্ভব নয়।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন : এক পাহাড় অন্য পাহাড়কে ডেকে জিত্তেস করে, আল্লাহকে স্মরণ করে—এমন কোন বান্দা তোমার উপর দিয়ে পথ অতিক্রম করেছে কি? যদি সে উত্তরে হ্যাঁ বলে, তবে প্ররক্ষণী পাহাড় তাতে আনন্দিত হয়। এর প্রমাণ হিসাবে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ এ আয়াতটি পাঠ করেন :

**وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا** —অতঃপর বলেন : এ আয়াত থেকে যখন প্রমাণিত

হল যে, পাহাড় কুফরী বাক্য শুনে প্রভাবান্বিত হয় এবং ভীত হয়ে যায়, তখন তুমি কি মনে কর যে, তারা বাস্তব কথাবার্তা শোনে; কিন্তু সত্য কথা ও আল্লাহর মিকর শোনে না এবং তদ্বারা প্রভাবান্বিত হয় না? (কুরতুবী) রসূলুল্লাহ (সা) বলেন : কোন জিন, মানব, পাথর ও চিলা এমন নেই, যে মুয়াম্বিনের আওয়াজ শুনে কিয়ামতের দিন তার ঈমানদার ও সৎ হওয়ার সম্পর্কে সাক্ষ্য না দেয়।—(মুয়াত্তা ইমাম মালিক, ইবনে মাজা)

ইমাম বুখারীর রেওয়াজেতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন : আমরা খাওয়ার সময় খাদ্যের তসবীহর শব্দ শুনতাম। অন্য এক রেওয়াজেতে আছে, আমরা রসূলুল্লাহ (সা)-র সাথে খানা খেলে খাদ্যের তসবীহর শব্দ শুনতাম। মুসলিমে হযরত জাবেদের রেওয়াজেতে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন : আমি মক্কার ঐ পাথরটিকে চিনি, যে নবুয়ত লাভের পূর্বে আমাকে সালাম করত। আমি এখনও তাকে চিনি। কেউ কেউ বলেন : এই পাথরটি হচ্ছে “হাজর-আসওয়াদ।”

ইমাম কুরতুবী বলেন : এ বিষয়বলী সম্পর্কিত হাদীসের সংখ্যা প্রচুর। হাযানা স্তম্বের কাহিনী তো সকল মুসলমানদের মুখে মুখে প্রচলিত। মিসর তৈরী হওয়ার পর রসূলুল্লাহ (সা) যখন একে ছেড়ে মিসরে খুতবা দেওয়া শুরু করেন, তখন এর কামার শব্দ সাহাবায়ে কিরামও শুনেছিলেন।

এসব রেওয়াজেতে দৃষ্টে প্রমাণিত হয় যে, আসমান ও জমিনের প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে চেতনা ও অনুভূতি রয়েছে এবং প্রত্যেক বস্তু সত্যিকারভাবে আল্লাহর তসবীহ পাঠ করে। ইব্রাহীম (আ) বলেন : প্রাণীবাচক ও অপ্ৰাণীবাচক সব বস্তুর মধ্যেই এই তসবীহ বিদ্যমান আছে। এমন কি, দরজার কপাটে যে আওয়াজ হয়, তাতেও তসবীহ আছে। ইমাম কুরতুবী বলেন : তসবীহর অর্থ অবস্থাগত তসবীহ হলে উপরোক্ত আয়াতে হযরত দাউদের কোন বৈশিষ্ট্য নেই। অবস্থাগত তসবীহ প্রত্যেক চেতনাশীল মানুষ প্রত্যেক বস্তু থেকে জানতে পারে। তাই বাহ্যিক অর্থেই এটা ছিল উজ্জিগত তসবীহ। খাসায়সে কুবরা গ্রন্থের বরাতে দিয়ে পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, কংকনদের তসবীহ পাঠে মু'জিমা ছিল না। ওরা তো সর্বত্র, সর্বাবস্থায় এবং সব সময় তসবীহ পাঠ করে। রসুলুল্লাহ (সা)-র মু'জিমা ছিল এই যে, তাঁর পবিত্র হাতে আসার পর তাদের তসবীহ এমন শব্দময় হয়ে ওঠে, যা সাধারণ মানুষেরও শ্রুতিগোচর হয়। এমনভাবে পাহাড়-সমূহের তসবীহ পাঠও হযরত দাউদ (আ)-এর মু'জিমা এ হিসাবেই ছিল যে, তাঁর মু'জিয়ার ঐ তসবীহ কানে শোনার যোগ্য হয়ে গিয়েছিল।

وَإِذَا قُرَأَتِ الْقُرْآنُ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ  
حِجَابًا مَّسْتُورًا ۝ وَ جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي  
أَذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذُكِرْتِ رَبِّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْ أَنَّ عَلَىٰ أَذَانِهِمْ  
نُفُورًا ۝ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ  
نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ۝ أَنْظُرْ  
كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۝

(৪৫) যখন আপনি কোরআন পাঠ করেন, তখন আমি আপনার মধ্যে ও পর-  
কালে অশিখাসীদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন পর্দা ফেলে দেই। (৪৬) আমি তাদের জন্তরের  
উপর আবরণ রেখে দেই, যাতে তারা একে উপলব্ধি করতে না পারে এবং তাদের কণ্ঠ  
কুহরে বোঝা চাপিয়ে দেই। যখন আপনি কোরআনে পালনকর্তার একান্ত আনুভূতি করেন,  
তখনও অনীহাবশত পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে চলে যায়। (৪৭) যখন তারা কান পেতে আপনার  
কথা শোনে, তখন তারা কেন কান পেতে তা শোনে, তা আমি ভাল জানি এবং এও  
জানি গোপনে আলোচনাকালে যখন জাতিমরা বলে, তোমরা তো এক যাদুগ্রন্থ ব্যক্তির  
অনুসরণ করছ। (৪৮) দেখুন ওরা আপনার জন্য কেমন উপমা দেয়। ওরা পথভ্রষ্ট  
হয়েছে; অতএব ওরা পথ পেতে পারে না।

## তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বলা হয়েছিল যে, কোরআনে তওহীদের বিষয়বস্তু বিভিন্ন ভঙ্গিতে বিভিন্ন মুক্তিপ্রমাণসহ বারবার উল্লেখ করা সত্ত্বেও হতভাগা মুশরিকরা তা মানে না। আলোচ্য আয়াতসমূহে ওদের না মানার কারণ ব্যক্ত করা হয়েছে যে, ওরা এসব আয়াত সম্পর্কে চিন্তাভাবনাই করে না; বরং এগুলোকে ঘৃণা ও বিদ্রূপ করে। ফলে ওদেরকে সত্যের জ্ঞান থেকে অন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তফসীরের সার-সংক্ষেপ এরাপ : )

যখন আপনি (তবলীগের জন্য) কোরআন পাঠ করেন, তখন আমি আপনার ও ওদের মধ্যে একটি পর্দা আড়াল করে দেই, যারা পরকালে বিশ্বাস করে না। (পর্দা এই যে) আমি ওদের অন্তরের ওপর আবরণ ফেলে দেই, যাতে ওরা একে (অর্থাৎ কোরআনের উদ্দেশ্যকে) না বোঝে এবং ওদের কানের উপর বোঝা চাপিয়ে দেই। (যাতে ওরা একে হিদায়ত অর্জনের জন্য না শুনে। উদ্দেশ্য এই যে, সেই পর্দাটি হচ্ছে ওদের না বোঝার এবং বোঝার ইচ্ছাই না করার। বোঝার ইচ্ছা করলে ওরা আপনার নবুয়ত চিনতে পারত)। যখন আপনি কোরআনে শুধু স্বীয় পালনকর্তার (গুণাবলী) উল্লেখ করেন (এবং ওরা যেসব উপাস্যের উপাসনা করে, তাদের মধ্যে সেইসব গুণ নেই) তখন তারা (নির্বুদ্ধিতা বরং বক্র বুদ্ধিতার কারণে) ঘৃণাতরে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে চলে যায়। (অতঃপর তাদের এই কুকর্মের জন্য শাস্তির খবর বণিত হয়েছে যে) যখন তারা আপনার দিকে কান লাগায়, তখন আমি ভালভাবেই জানি, যে নিয়তে তারা শুনে (সেই নিয়ত হচ্ছে, আপত্তি উত্থাপন করা, দোষারোপ করা এবং সমালোচনা করা) এবং যখন ওরা (কোরআন শুনার পর) পরস্পর কানাকানি করে (আমি তাও ভালভাবেই জানি) যখন জালিমরা বলে : তোমরা তো [ অর্থাৎ ওদের মধ্য থেকে যারা রসুলুল্লাহ (স)-র অনুসরণে আত্মনিয়োগ করেছে ] এমন এক ব্যক্তির অনুসরণ করছ, যার উপর যাদুর (বিশেষ) ক্রিয়া [ অর্থাৎ পাগলামির ক্রিয়া ] হয়েছে। অর্থাৎ তার অদ্ভুত কথাবার্তা সবই মস্তিষ্কবিকৃতির ফল। হে মুহাম্মদ (স) ] দেখুন, তারা আপনার জন্যে কেমন উপাধি বের করেছে। অতএব ওরা (সম্পূর্ণই) পথভ্রান্ত হয়ে গেছে। এখন ওরা (সত্য) পথ পেতে পারবে না। (কেননা, এ ধরনের হঠকান্নিতা ও জেদ, বিশেষত জাহাঙ্গির রসুলের সাথে এ রকম ব্যবহারের কারণে মানুষের বুদ্ধি-বিবেচনা ও হিদায়তপ্রাপ্তির যোগ্যতা লোপ পায়)।

## আনুমানিক ভ্রাতব্য বিষয়

পরগছরের ওপর যাদুর ক্রিয়া হতে পারে : পরগছরগণ মানবিক বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্ত নন। তাঁরা যেমন রোগাক্রান্ত হতে পারেন, জ্বর ও ব্যথায় ভুগতে পারেন, তেমনি তাঁদের ওপর যাদুর ক্রিয়াও সম্ভবপর। কেননা, যাদুর ক্রিয়াও বিশেষ স্বভাবগত কারণে, জিন ইত্যাদির প্রভাবে হয়ে থাকে। হাদীসে প্রমাণিত আছে যে, একবার রসুলুল্লাহ (স)-র ওপরও যাদুর ক্রিয়া হয়েছিল। শেষ আয়াতে দাব্বিররা তাঁকে যাদুগ্রস্ত বলেছে এবং কোরআন তা খণ্ডন করেছে। এর সারমর্ম তাই, যার প্রতি তফসীরের সার-সংক্ষেপে

ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যাদুগ্রন্থ বলে তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল পাগল বলা। কোরআন তা'ই খণ্ডন করেছে। অতএব যাদুর হাদীসটি এই আয়াতের পরিপন্থী নয়।

আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াতে বর্ণিত বিষয়বস্তুর একটি বিশেষ শানে নুযুল আছে। কুরতুবী সাঈদ ইবনে যুবায়ের থেকে বর্ণনা করেন : কোরআনে যখন সূরা লাহাব নাখিল হয়, যাতে আবু লাহাবের জীরও নিন্দা উল্লেখ করা হয়েছে, তখন তার জ্ঞী রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মজলিসে উপস্থিত হয়। হযরত আবু বকর (রা) তখন মজলিসে বিদ্যমান ছিলেন। তাকে দূর থেকে আসতে দেখে তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বললেন : আপনি এখান থেকে সরে গেলে ভাল হয়। কারণ, সে অত্যন্ত কটুভাষিণী। সে এমন কটু কথা বলবে, যার ফলে আপনি কষ্ট পাবেন। তিনি বললেন : না, তার ও আমার মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা পর্দা ফেলে দেবেন। অতঃপর সে মজলিসে উপস্থিত হলে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দেখতে পেল না। সে হযরত আবু বকর (রা)-কে সম্বোধন করে বলতে লাগল : আপনার সঙ্গী আমার 'হিজ্র' (কবিতার মাধ্যমে নিন্দা) করেছেন। হযরত আবু বকর (রা) বললেন, আল্লাহ্‌র কসম, তিনি তো কবিতাই বলেন না। অতঃপর সে এফথা বলতে বলতে প্রস্থান করল যে, আপনিও তো তাকে সত্য বলে বিশ্বাসকারীদের অন্যতম। তার প্রস্থানের পর হযরত আবু বকর আরম্ভ করলেন : সে কি আপনাকে দেখিনি? রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : যতরূপ সে এখানে ছিল, ততরূপ একজন ফেরেশতা আমাকে তার দৃষ্টি থেকে আড়াল করে রেখেছিল।

শত্রুর দৃষ্টি থেকে গোপন থাকার একটি আয়ত : হযরত কা'ব বলেন : রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মুশরিকদের দৃষ্টি থেকে আত্মগোপন করতে চাইতেন, তখন কোরআনের তিনটি আয়াত পাঠ করতেন। এর প্রভাবে শত্রুরা তাঁকে দেখতে পেত না। আয়াতস্বরূপ এই : এক আয়াত—সূরা কাহাফের

إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ—দ্বিতীয় আয়াত সূরা নাহলের—

طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمِعَهُمْ وَابْصُرَهُمْ

أَفَرَأَيْتُم مِّمَّنْ اتَّخَذَ آلِهَةً هُوَ أَوْلَىٰ بِكُمْ وَاللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ

وَقَلْبَهُ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً

হযরত কা'ব বলেন : রসূলুল্লাহ্ (সা)-র এই ব্যাপারটি আমি সিরিয়ার জনৈক ব্যক্তির কাছে বর্ণনা করি। তিনি কোন প্রয়োজনবশত রোম দেশে গমন করেন। বেশ

কিছুদিন সেখানে অবস্থান করার পর তিনি রোমীয় কাফিরদের নির্মাতনের শিকার হয়ে পড়লে প্রাণের ভয়ে সেখান থেকে পলায়ন করেন। শত্রুরা তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করে। এহেন সংকট মুহূর্তে হঠাৎ হাদীসটি তাঁর মনে পড়ে গেল। তিনি কালবিলম্ব না করে আয়াত তিনটি পাঠ করতেই শত্রুদের দৃষ্টির সামনে পর্দা পড়ে গেল। যে রাস্তায় তিনি চলছিলেন, শত্রুরাও সেই রাস্তায় চলা-ফিরা করছিল; কিন্তু তারা তাঁকে দেখতে পাচ্ছিল না।

ইমাম সা'লাবী বলেন : হযরত কা'ব থেকে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যসমূহটি আমি 'রান্ন' অঞ্চলের জনৈক ব্যক্তির কাছে বর্ণনা করেছিলাম। ঘটনাক্রমে সায়লামের কাফিররা তাঁকে গ্রেফতার করে। তিনি কিছুদিন কয়েদে থাকার পর সুযোগ পেয়ে পলায়ন করেন। শত্রুরা তাঁকে পেছনে ধাওয়া করে। তিনি উল্লিখিত আয়াতত্রয় পাঠ করলে আল্লাহ তা'আলা তাদের চোখের ওপর পর্দা ফেলে দেন। ফলে তাদের দৃষ্টি থেকে তিনি অদৃশ্য হয়ে যান। অথচ তারা পাশাপাশি চলছিল এবং তাদের কাপড় তাঁর কাপড় স্পর্শ করছিল।

ইমাম কুরতুবী বলেন : উপরোক্ত আয়াতত্রয়ের সাথে সূরা ইয়াসীনের ঐ আয়াত-গুলোও মেলানো উচিত, যেগুলো রসূলুল্লাহ (সা) হিজরতের সময় পাঠ করেছিলেন। তখন মক্কার মুশরিকরা তাঁর বাসগৃহ ঘেরাও করে রেখেছিল। তিনি আয়াতগুলো পাঠ করে তাদের মাঝখান দিয়ে চলে যান; বরং তাদের মাথায় ধূলা নিক্ষেপ করতে করতে যান; কিন্তু তাদের কেউ টেরও পায়নি। সূরা ইয়াসীনের আয়াতগুলো এই :

يَسْ وَالْقُرْآنِ الْعَكِيمِ . أَفَكَلِمَ الْمُرْسَلِينَ . عَلَىٰ صِرَاطٍ

مُسْتَقِيمٍ . تَنْزِيلِ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ . لَتَنذِرْ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاءَهُمْ فَهُمْ

عَا فُلُونِ ۝ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ إِنَّا جَعَلْنَا فِي

أَعْيُنِهِمْ أَغْصَانًا فَلَا يَرَوْنَ إِلَّا آلَ الْأَنْفَالِ فَهُمْ لَا يَتَذَكَّرُونَ ۝ إِنَّا جَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ

أَيْدِيهِمْ سُدًّا ۝ وَمِنْ خَلْفِهِمْ سُدًّا ۝ إِنَّا فَضَّلْنَا هُمُ لَّا يَبْصُرُونَ ۝

ইমাম কুরতুবী বলেন : আমি স্বদেশ আন্দালুসে কর্ডোভার নিকটবর্তী মনসুর দুর্গে নিজেই এ ধরনের ঘটনার সম্মুখীন হয়েছিলাম। অবশেষে নিরুপায় অবস্থায় আমি শত্রুদের সম্মুখ দিয়ে দৌড়ে এক জায়গায় বসে গেলাম। শত্রুরা দু'জন অস্বারোহীকে আমার পশ্চাদ্ধাবন করার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করে। আমি সম্পূর্ণ খোলা মাঠেই ছিলাম। আড়াল করার মত কোন বস্তুই ছিল না। আমি তখন বসে বসে সূরা ইয়াসীনের আয়াতগুলো পাঠ করছিলাম। অস্বারোহী ব্যক্তিদ্বয় আমার সম্মুখ দিয়ে “লোকটি কোন শয়তান হবে”

বলতে বলতে যেখান থেকে এসেছিল সেখানেই ফিরে গেল। বলা বাহুল্য তারা আমাকে অবশ্যই দেখেনি। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আমার দিক থেকে অন্ধ করে দিয়েছিলেন। (কুরতুবী)

وَقَالُوا إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا إِنْ نَا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا  
جَدِيدًا ۝ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ۝ أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي  
صُدُورِكُمْ فَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا ۝ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۝  
فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ  
يَكُونَ قَرِيبًا ۝ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِنْ  
لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ۝

(৪৯) তারা বলে : যখন আমরা অস্থিতে পরিণত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাব, তখনও কি নতুন করে সৃজিত হয়ে উত্থিত হব? (৫০) বলুন : তোমরা পাথর হয়ে যাও কিংবা লোহা। (৫১) অথবা এমন কোন বস্তু, যা তোমাদের ধারণায় খুবই কঠিন; তথাপি তারা বলবে : আমাদেরকে পুনবার কে সৃষ্টি করবে? বলুন : যিনি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃজন করেছেন। অতঃপর তারা আপনার সামনে মাথা নাড়বে এবং বলবে : এটা কবে হবে? বলুন : হবে, সম্ভবত শীঘ্রই। (৫২) যে দিন তিনি তোমাদেরকে আহ্বান করবেন, অতঃপর তোমরা তাঁর প্রশংসা করতে করতে চলে আসবে। এবং তোমরা অনুমান করবে যে, সামান্য সময়ই অবস্থান করেছিল।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তারা বলে : তখন আমরা (মৃত্যুর পর) অস্থি এবং (অস্থি থেকেও অতঃপর) চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাব, তখনও কি (এরপর কিয়ামতে) নতুনভাবে সৃজিত ও জীবিত হব? (অর্থাৎ প্রথমত মৃত্যুর পর জীবিত হওয়াই কঠিন। কারণ দেহে জীবন-ধারণের যোগ্যতা অবশিষ্ট থাকে না। এরপর দেহও যখন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে, তখন এর পুনরুজ্জীবিত হওয়ার বিশ্বাসটি কে মনে নিতে পারে)? আপনি (উত্তরে) বলে দিন : (তোমরা তো অস্থি জীবিত হওয়াকেই অসম্ভব মনে করছ; কিন্তু আমি বলি যে তাহলে) তোমরা পাথর কিংবা এমন ধরনের কোন বস্তু হয়ে দেখে নাও, যা তোমাদের মনে (জীবন ধারণের উপযুক্ততা থেকে) অনেক দূরবর্তী। (এরপর দেখে যে, জীবিত হও কিনা। বলা বাহুল্য, পাথর ও লোহা জীবন থেকে দূরবর্তী হওয়ার কারণ এই যে, এদের

মধ্যে কোন সময়েই জৈব জীবন সংস্কারিত হয়নি। অস্থি এর বিপরীত। কারণ, এর মধ্যে পূর্বে জীবন ছিল। অতএব পাথর ও লোহাকে জীবিত করা যখন আল্লাহর জন্যে কঠিন নহ্ন, তখন মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে পুনর্বার জীবন দান করা কিরূপে কঠিন হবে? আয়াতে

كُوْنُوْا <sup>أَمْوَاتٌ</sup> আদেশ সূচক পদ বলে شرط و تعليل বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যদি শরৎ নেওয়ার পর্যায়ে তোমরা পাথর কিংবা লোহাও হয়ে যাও, তবে এমতাবস্থায়ও আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে পুনর্বার জীবিত করতে সক্ষম)। অতঃপর তারা জিজ্ঞেস করবে, কে আমাদেরকে পুনরায় জীবিত করবে? আপনি বলে দিন: যিনি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলেন। (প্রকৃত ব্যাপার এই যে, কোন বস্তুর অস্তিত্ব লাভের জন্যে দু'টি জিনিস জরুরী। এক, উপকরণ ও পাত্র অস্তিত্ব লাভের যোগ্যতা। দুই, তাকে অস্তিত্ব দানকারী শক্তি। প্রথম প্রয়োগ ছিল পাত্রের যোগ্যতা সম্পর্কে। অর্থাৎ মৃত্যুর পর দেহ জীবন ধারণের যোগ্য থাকে না। এর উত্তর দিয়ে পাত্রের যোগ্যতা সপ্রমাণ করা হয়েছে। এরপর দ্বিতীয় প্রয়োগ ছিল জীবন দানকারী শক্তি সম্পর্কে; অর্থাৎ কোন কর্তা স্রীয় কর্তৃত্বের বলে এই আশ্চর্যজনক কাজটি করবে? এর উত্তরে বলা হয়েছে যে, যিনি প্রথমে তোমাদেরকে এমন উপকরণ থেকে সৃষ্টি করেছিলেন, যার মধ্যে জীবন ধারণের যোগ্যতা আছে বলে কারও ধারণাও ছিল না। অতএব তার জন্যে পুনর্বার সৃষ্টি করা কিরূপে কঠিন হবে? যখন পাত্র ও কর্তা সম্পর্কিত উত্তর প্রশ্নের সমাধান হয়ে গেল, তখন পুনর্জীবনের ঘটনাটি কখন ঘটবে, তা জানার জন্যে) তারা আপনার সামনে মাথা নেড়ে নেড়ে বলবে: (আচ্ছা বলুন তো) এটা (অর্থাৎ জীবিত হওয়া) কবে হবে? আপনি বলে দিন, সম্ভবত এটা নিকটবর্তী। (অতঃপর ঐসব অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে, যেগুলো নতুন জীবন লাভের সময় দেখা দেবে)। এটা ঐদিন হবে, যখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে (জীবিত করা ও হাশরের ময়দানে একত্রিত করার জন্যে ফেরেশতার মাধ্যমে) ডাক দেবেন এবং তোমরা (বাধ্যতামূলকভাবে) তাঁর প্রশংসা করতে করতে আদেশ পালন করবে। (অর্থাৎ জীবিত হয়ে হাশরের ময়দানে একত্রিতও হয়ে যাবে)। এবং (ঐ দিনের উন্নতি দেখে তোমাদের অবস্থা হবে এই যে, দুনিয়ার গোটা ব্যয় ও কবরে অবস্থানের সময় সম্পর্কে) তোমারা অনুমান করবে যে, খুব কম সময়ই (দুনিয়াতে) অবস্থান করেছে। (কেননা, আজকের উন্নয়নের তার তুলনায় দুনিয়া ও কবরে কিছু না কিছু সুখ ছিল। বলা বাহুল্য, বিপদে পড়ার পর সুখের যমানী মানুষের কাছে খুব সংক্ষিপ্ত মনে হয়)।

### আনুশঙ্গিক জাতব্য বিষয়

كُوْنُوْا <sup>أَمْوَاتٌ</sup> - <sup>أَمْوَاتٌ</sup> - <sup>أَمْوَاتٌ</sup> - <sup>أَمْوَاتٌ</sup> - <sup>أَمْوَاتٌ</sup> - <sup>أَمْوَاتٌ</sup> - <sup>أَمْوَاتٌ</sup> থেকে

উদ্ভূত। এর অর্থ আওয়াজ দিয়ে ডাকা। আয়াতের অর্থ এই যে, যেদিন আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সবাইকে হাশরের ময়দানের দিকে ডাকবেন। এই ডাকা ফেরেশতা ইসরাফীলের মাধ্যমে হবে। তিনি যখন দ্বিতীয়বার শিঙ্গা ফুক দেবেন, তখন সব মৃত জীবিত হয়ে



হাশরের ময়দানে একত্রিত হবে। এ ছাড়া জীবিত হওয়ার পর হাশরের ময়দানে একত্রিত করার জন্য আওয়াজ দেওয়াও সম্ভবপর।—(কুরতুবী)

এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন : কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে তোমাদের নিজের এবং পিতার নাম ধরে ডাকা হবে। কাজেই ডাল নাম রাখবে। (অর্থহীন নাম রাখবে না)।

হাশরে কাফিররাও আল্লাহর প্রশংসা করতে করতে উখিত হবে :

﴿ فَتَسْتَجِبُونَ بِحَمْدِ اللَّهِ ﴾ শব্দের অর্থ ডাকার পর আদেশ পালন করা

এবং উপস্থিত হওয়া। আয়াতের অর্থ এই যে, হাশরের ময়দানে যখন তোমাদেরকে ডাকা হবে, তখন তোমরা সবাই ঐ আওয়াজ অনুসরণ করে একত্রিত হয়ে যাবে।

﴿ بِحَمْدِ اللَّهِ ﴾ অর্থাৎ ময়দানে আসার সময় তোমরা সবাই আল্লাহর প্রশংসা করতে করতে উপস্থিত হবে।

আয়াতের বাহ্যিক অর্থ থেকে জানা যায় যে, তখন মু'মিন ও কাফির সবারই এই অবস্থা হবে। কেননা আয়াতে আহলে কাফিরদেরকেই সম্বোধন করা হয়েছে। তাদের সম্পর্কেই বর্ণনা করা হচ্ছে যে, সবাই প্রশংসা করতে করতে উখিত হবে। তফসীরবিদদের মধ্যে হযরত সাঈদ ইবনে যুবায়র বলেন : কাফিররাও কবর থেকে বের হওয়ার সময় ﴿ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ ﴾ বলতে বলতে বের হবে। কিন্তু তখনকার প্রশংসা ও গুণকীর্তন তাদের কোন উপকারে আসবে না—(কুরতুবী) কেননা, তারা মৃত্যুর পর যখন জীবন দেখবে, তখন অনিচ্ছাকৃতভাবে তাদের মুখ থেকে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসাও গুণবাচক বাক্য উচ্চারিত হবে। এটা প্রতিদান পাওয়ার যোগ্য আমল হবে না।

কোন কোন তফসীরবিদ একে বিশেষভাবে মু'মিনদের অবস্থা আখ্যা দিয়েছেন। তাঁদের মুক্তি এই যে, কাফিরদের সম্পর্কে কোরআন পাকে বলা হয়েছে, যখন তাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে, তখন তারা একথা বলবে : ﴿ يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا ﴾

﴿ يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا ﴾ হায় অফসোস, কে আমাদেরকে কবর থেকে জীবিত করে উখিত

করেছে। অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে, তারা বলবে ﴿ يَا حَسْرَتْنَا عَلَىٰ مَا ﴾

﴿ قَرَّطْنَا فِيهَا جَنبَ اللَّهِ ﴾ হায় অফসোস, আমরা আল্লাহর ব্যাপারে বিরাট ত্রুটি করেছি।



**ভূকসীরের সার-সংক্ষেপ**

আপনি আমার (মুসলমান) বান্দাদেরকে বলে দিন, (যদি কাফিরদেরকে জওয়াব দেয় তবে) তারা যেন ঐ কথাই বলে, যা (নৈতিক দিক দিয়ে) উত্তম (অর্থাৎ গালি-গালাজ, কঠোরতা ও উত্তেজনাপূর্ণ কথা না হওয়া চাই। কেননা) শয়তান (কড়া কথা বলিয়ে) জোফদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধায়। নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। (এ শিক্ষাদানের কারণ এই যে, কঠোরতা দ্বারা কোন সময় কার্যোদ্ধার হয় না। হিদায়ত ও পথদ্রষ্টতা আল্লাহর ইচ্ছার অনুসারী)। তোমাদের সবার অবস্থা তোমাদের পালনকর্তা ভালভাবেই জানেন (যে, কে কিসের যোগ্য)। তিনি যদি চান, তোমাদের (মধ্য থেকে যা)-কে (ইচ্ছা) রহম করবেন (অর্থাৎ হিদায়ত করবেন)। অথবা তিনি যদি চান তোমাদের (মধ্য থেকে যা)-কে (ইচ্ছা) আযাব দেবেন (অর্থাৎ তাকে তওফীক ও হিদায়ত দেবেন না)। আমি আপনাকে (পর্যন্ত) তাদের (হিদায়তের) জন্য দায়ী করে প্রেরণ করিনি। নবী (হওয়া সত্ত্বেও যখন আপনাকে দায়ী করা হয়নি; তখন অন্যের কি সাধ্য? কাজেই পীড়াপীড়ি ও কঠোরতা করা নিষ্পয়োজন)। আপনার পালনকর্তা ভালভাবেই জানেন তাদেরকে (ও), যারা আকাশসমূহে রয়েছে এবং (তাদেরকেও, যারা) ভূপৃষ্ঠে রয়েছে। (আকাশের অধিবাসী বলে ফেরেশতাদেরকে এবং ভূপৃষ্ঠের অধিবাসী বলে মানব ও জিন জাতিকে বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আমি ভালভাবেই জানি, তাদের মধ্যে কে নবী ও রসূল হওয়ার যোগ্য এবং কে অযোগ্য। তাই আমি যে আপনাকে নবী বানিয়েছি, এতে আশ্চর্যের কি রয়েছে?) এবং (এমনিভাবে যদি আমি আপনাকে অন্য পয়গম্বরদের ওপর প্রেরিত্ব দান করে থাকি, তবে আশ্চর্যের কি আছে? কেননা) আমি (পূর্বেও) কতক পয়গম্বরকে কতক পয়গম্বরের ওপর প্রেরিত্ব দান করেছি। (এবং এমনিভাবে আমি যদি আপনাকে ফোরআন দিয়ে থাকি, তবে তা আশ্চর্যের বিষয় হল কিরূপে? কেননা আপনার পূর্বে) আমি দাউদকে যবুর দান করেছি।

**অনুশাসিত জাতব্য বিষয়**

কটুকথা ও কড়া কথা কাফিরদের সাথেও জায়েয নয় : প্রথম আয়াতে মুসলমানদেরকে কাফিরদের সাথে কড়া কথা বলতে নিষেধ করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য এই যে, বিনা প্রয়োজনে কঠোরতা করা যাবে না এবং প্রয়োজন হলে হত্যা পর্যন্ত করার অনুমতি রয়েছে।

که بے حکم شرع اب خوردن خطاست  
وگـر خون بفتوی بریزی رواست

হত্যা ও শূকর মাধ্যমে কুফরের শান-শওকত এবং ইসলামের বিরোধিতাকে নির্মূল করা যায়। তাই এর অনুমতি রয়েছে। গালি-গালাজ ও কটুকথা দ্বারা কোন দুর্গ জয় করা যায় না এবং কারণ হিদায়ত হয় না। তাই এটা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ইমাম-কুরতুবী বলেন : আলোচ্য আয়াত হযরত উমর (রা)-এর ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়।

ঘটনা ছিল এই : জনৈক ব্যক্তি হযরত উমর (রা)-কে গালি দিলে প্রত্যুত্তরে তিনিও তার বিরুদ্ধে কঠোর ভাষা প্রয়োগ করেন। শুধু তাই নয়, তিনি তাকে হত্যা করতেও মনস্থ করেন। ফলে দুই গোত্রের মধ্যে যুদ্ধ বেঁধে যাওয়ার আশংকা দেখা দেয়। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।

কুরতুবীর বক্তব্য এই যে, এই আয়াতে মুসলমানদেরকে পারস্পরিক কথাবার্তা বলা সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, পারস্পরিক মতানৈক্যের সময় কঠোর ভাষা প্রয়োগ করো না। এর মাধ্যমে শয়তান তোমাদের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ ও কলহ সৃষ্টি করে দেয়।

وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ۖ — এখানে বিশেষভাবে যবুরের কথা উল্লেখ করার

কারণ সম্ভবত এই যে, যবুর গ্রন্থে রসূলুল্লাহ (সা) সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তিনি পয়-  
গম্বর হওয়ার সাথে সাথে দেশ ও সাম্রাজ্যের অধিকারীও হবেন। কোরআনে বলা  
হয়েছে : <sup>٨٥</sup> <sup>٨٦</sup> <sup>٨٧</sup> <sup>٨٨</sup> <sup>٨٩</sup> <sup>٩٠</sup> <sup>٩١</sup> <sup>٩٢</sup> <sup>٩٣</sup> <sup>٩٤</sup> <sup>٩٥</sup> <sup>٩٦</sup> <sup>٩٧</sup> <sup>٩٨</sup> <sup>٩٩</sup> <sup>١٠٠</sup> <sup>١٠١</sup> <sup>١٠٢</sup> <sup>١٠٣</sup> <sup>١٠٤</sup> <sup>١٠٥</sup> <sup>١٠٦</sup> <sup>١٠٧</sup> <sup>١٠٨</sup> <sup>١٠٩</sup> <sup>١١٠</sup> <sup>١١١</sup> <sup>١١٢</sup> <sup>١١٣</sup> <sup>١١٤</sup> <sup>١١٥</sup> <sup>١١٦</sup> <sup>١١٧</sup> <sup>١١٨</sup> <sup>١١٩</sup> <sup>١٢٠</sup> <sup>١٢١</sup> <sup>١٢٢</sup> <sup>١٢٣</sup> <sup>١٢٤</sup> <sup>١٢٥</sup> <sup>١٢٦</sup> <sup>١٢٧</sup> <sup>١٢٨</sup> <sup>١٢٩</sup> <sup>١٣٠</sup> <sup>١٣١</sup> <sup>١٣٢</sup> <sup>١٣٣</sup> <sup>١٣٤</sup> <sup>١٣٥</sup> <sup>١٣٦</sup> <sup>١٣٧</sup> <sup>١٣٨</sup> <sup>١٣٩</sup> <sup>١٤٠</sup> <sup>١٤١</sup> <sup>١٤٢</sup> <sup>١٤٣</sup> <sup>١٤٤</sup> <sup>١٤٥</sup> <sup>١٤٦</sup> <sup>١٤٧</sup> <sup>١٤٨</sup> <sup>١٤٩</sup> <sup>١٥٠</sup> <sup>١٥١</sup> <sup>١٥٢</sup> <sup>١٥٣</sup> <sup>١٥٤</sup> <sup>١٥٥</sup> <sup>١٥٦</sup> <sup>١٥٧</sup> <sup>١٥٨</sup> <sup>١٥٩</sup> <sup>١٦٠</sup> <sup>١٦١</sup> <sup>١٦٢</sup> <sup>١٦٣</sup> <sup>١٦٤</sup> <sup>١٦٥</sup> <sup>١٦٦</sup> <sup>١٦٧</sup> <sup>١٦٨</sup> <sup>١٦٩</sup> <sup>١٧٠</sup> <sup>١٧١</sup> <sup>١٧٢</sup> <sup>١٧٣</sup> <sup>١٧٤</sup> <sup>١٧٥</sup> <sup>١٧٦</sup> <sup>١٧٧</sup> <sup>١٧٨</sup> <sup>١٧٩</sup> <sup>١٨٠</sup> <sup>١٨١</sup> <sup>١٨٢</sup> <sup>١٨٣</sup> <sup>١٨٤</sup> <sup>١٨٥</sup> <sup>١٨٦</sup> <sup>١٨٧</sup> <sup>١٨٨</sup> <sup>١٨٩</sup> <sup>١٩٠</sup> <sup>١٩١</sup> <sup>١٩٢</sup> <sup>١٩٣</sup> <sup>١٩٤</sup> <sup>١٩٥</sup> <sup>١٩٦</sup> <sup>١٩٧</sup> <sup>١٩٨</sup> <sup>١٩٩</sup> <sup>٢٠٠</sup> <sup>٢٠١</sup> <sup>٢٠٢</sup> <sup>٢٠٣</sup> <sup>٢٠٤</sup> <sup>٢٠٥</sup> <sup>٢٠٦</sup> <sup>٢٠٧</sup> <sup>٢٠٨</sup> <sup>٢٠٩</sup> <sup>٢١٠</sup> <sup>٢١١</sup> <sup>٢١٢</sup> <sup>٢١٣</sup> <sup>٢١٤</sup> <sup>٢١٥</sup> <sup>٢١٦</sup> <sup>٢١٧</sup> <sup>٢١٨</sup> <sup>٢١٩</sup> <sup>٢٢٠</sup> <sup>٢٢١</sup> <sup>٢٢٢</sup> <sup>٢٢٣</sup> <sup>٢٢٤</sup> <sup>٢٢٥</sup> <sup>٢٢٦</sup> <sup>٢٢٧</sup> <sup>٢٢٨</sup> <sup>٢٢٩</sup> <sup>٢٣٠</sup> <sup>٢٣١</sup> <sup>٢٣٢</sup> <sup>٢٣٣</sup> <sup>٢٣٤</sup> <sup>٢٣٥</sup> <sup>٢٣٦</sup> <sup>٢٣٧</sup> <sup>٢٣٨</sup> <sup>٢٣٩</sup> <sup>٢٤٠</sup> <sup>٢٤١</sup> <sup>٢٤٢</sup> <sup>٢٤٣</sup> <sup>٢٤٤</sup> <sup>٢٤٥</sup> <sup>٢٤٦</sup> <sup>٢٤٧</sup> <sup>٢٤٨</sup> <sup>٢٤٩</sup> <sup>٢٥٠</sup> <sup>٢٥١</sup> <sup>٢٥٢</sup> <sup>٢٥٣</sup> <sup>٢٥٤</sup> <sup>٢٥٥</sup> <sup>٢٥٦</sup> <sup>٢٥٧</sup> <sup>٢٥٨</sup> <sup>٢٥٩</sup> <sup>٢٦٠</sup> <sup>٢٦١</sup> <sup>٢٦٢</sup> <sup>٢٦٣</sup> <sup>٢٦٤</sup> <sup>٢٦٥</sup> <sup>٢٦٦</sup> <sup>٢٦٧</sup> <sup>٢٦٨</sup> <sup>٢٦٩</sup> <sup>٢٧٠</sup> <sup>٢٧١</sup> <sup>٢٧٢</sup> <sup>٢٧٣</sup> <sup>٢٧٤</sup> <sup>٢٧٥</sup> <sup>٢٧٦</sup> <sup>٢٧٧</sup> <sup>٢٧٨</sup> <sup>٢٧٩</sup> <sup>٢٨٠</sup> <sup>٢٨١</sup> <sup>٢٨٢</sup> <sup>٢٨٣</sup> <sup>٢٨٤</sup> <sup>٢٨٥</sup> <sup>٢٨٦</sup> <sup>٢٨٧</sup> <sup>٢٨٨</sup> <sup>٢٨٩</sup> <sup>٢٩٠</sup> <sup>٢٩١</sup> <sup>٢٩٢</sup> <sup>٢٩٣</sup> <sup>٢٩٤</sup> <sup>٢٩٥</sup> <sup>٢٩٦</sup> <sup>٢٩٧</sup> <sup>٢٩٨</sup> <sup>٢٩٩</sup> <sup>٣٠٠</sup> <sup>٣٠١</sup> <sup>٣٠٢</sup> <sup>٣٠٣</sup> <sup>٣٠٤</sup> <sup>٣٠٥</sup> <sup>٣٠٦</sup> <sup>٣٠٧</sup> <sup>٣٠٨</sup> <sup>٣٠٩</sup> <sup>٣١٠</sup> <sup>٣١١</sup> <sup>٣١٢</sup> <sup>٣١٣</sup> <sup>٣١٤</sup> <sup>٣١٥</sup> <sup>٣١٦</sup> <sup>٣١٧</sup> <sup>٣١٨</sup> <sup>٣١٩</sup> <sup>٣٢٠</sup> <sup>٣٢١</sup> <sup>٣٢٢</sup> <sup>٣٢٣</sup> <sup>٣٢٤</sup> <sup>٣٢٥</sup> <sup>٣٢٦</sup> <sup>٣٢٧</sup> <sup>٣٢٨</sup> <sup>٣٢٩</sup> <sup>٣٣٠</sup> <sup>٣٣١</sup> <sup>٣٣٢</sup> <sup>٣٣٣</sup> <sup>٣٣٤</sup> <sup>٣٣٥</sup> <sup>٣٣٦</sup> <sup>٣٣٧</sup> <sup>٣٣٨</sup> <sup>٣٣٩</sup> <sup>٣٤٠</sup> <sup>٣٤١</sup> <sup>٣٤٢</sup> <sup>٣٤٣</sup> <sup>٣٤٤</sup> <sup>٣٤٥</sup> <sup>٣٤٦</sup> <sup>٣٤٧</sup> <sup>٣٤٨</sup> <sup>٣٤٩</sup> <sup>٣٥٠</sup> <sup>٣٥١</sup> <sup>٣٥٢</sup> <sup>٣٥٣</sup> <sup>٣٥٤</sup> <sup>٣٥٥</sup> <sup>٣٥٦</sup> <sup>٣٥٧</sup> <sup>٣٥٨</sup> <sup>٣٥٩</sup> <sup>٣٦٠</sup> <sup>٣٦١</sup> <sup>٣٦٢</sup> <sup>٣٦٣</sup> <sup>٣٦٤</sup> <sup>٣٦٥</sup> <sup>٣٦٦</sup> <sup>٣٦٧</sup> <sup>٣٦٨</sup> <sup>٣٦٩</sup> <sup>٣٧٠</sup> <sup>٣٧١</sup> <sup>٣٧٢</sup> <sup>٣٧٣</sup> <sup>٣٧٤</sup> <sup>٣٧٥</sup> <sup>٣٧٦</sup> <sup>٣٧٧</sup> <sup>٣٧٨</sup> <sup>٣٧٩</sup> <sup>٣٨٠</sup> <sup>٣٨١</sup> <sup>٣٨٢</sup> <sup>٣٨٣</sup> <sup>٣٨٤</sup> <sup>٣٨٥</sup> <sup>٣٨٦</sup> <sup>٣٨٧</sup> <sup>٣٨٨</sup> <sup>٣٨٩</sup> <sup>٣٩٠</sup> <sup>٣٩١</sup> <sup>٣٩٢</sup> <sup>٣٩٣</sup> <sup>٣٩٤</sup> <sup>٣٩٥</sup> <sup>٣٩٦</sup> <sup>٣٩٧</sup> <sup>٣٩٨</sup> <sup>٣٩٩</sup> <sup>٤٠٠</sup> <sup>٤٠١</sup> <sup>٤٠٢</sup> <sup>٤٠٣</sup> <sup>٤٠٤</sup> <sup>٤٠٥</sup> <sup>٤٠٦</sup> <sup>٤٠٧</sup> <sup>٤٠٨</sup> <sup>٤٠٩</sup> <sup>٤١٠</sup> <sup>٤١١</sup> <sup>٤١٢</sup> <sup>٤١٣</sup> <sup>٤١٤</sup> <sup>٤١٥</sup> <sup>٤١٦</sup> <sup>٤١٧</sup> <sup>٤١٨</sup> <sup>٤١٩</sup> <sup>٤٢٠</sup> <sup>٤٢١</sup> <sup>٤٢٢</sup> <sup>٤٢٣</sup> <sup>٤٢٤</sup> <sup>٤٢٥</sup> <sup>٤٢٦</sup> <sup>٤٢٧</sup> <sup>٤٢٨</sup> <sup>٤٢٩</sup> <sup>٤٣٠</sup> <sup>٤٣١</sup> <sup>٤٣٢</sup> <sup>٤٣٣</sup> <sup>٤٣٤</sup> <sup>٤٣٥</sup> <sup>٤٣٦</sup> <sup>٤٣٧</sup> <sup>٤٣٨</sup> <sup>٤٣٩</sup> <sup>٤٤٠</sup> <sup>٤٤١</sup> <sup>٤٤٢</sup> <sup>٤٤٣</sup> <sup>٤٤٤</sup> <sup>٤٤٥</sup> <sup>٤٤٦</sup> <sup>٤٤٧</sup> <sup>٤٤٨</sup> <sup>٤٤٩</sup> <sup>٤٥٠</sup> <sup>٤٥١</sup> <sup>٤٥٢</sup> <sup>٤٥٣</sup> <sup>٤٥٤</sup> <sup>٤٥٥</sup> <sup>٤٥٦</sup> <sup>٤٥٧</sup> <sup>٤٥٨</sup> <sup>٤٥٩</sup> <sup>٤٦٠</sup> <sup>٤٦١</sup> <sup>٤٦٢</sup> <sup>٤٦٣</sup> <sup>٤٦٤</sup> <sup>٤٦٥</sup> <sup>٤٦٦</sup> <sup>٤٦٧</sup> <sup>٤٦٨</sup> <sup>٤٦٩</sup> <sup>٤٧٠</sup> <sup>٤٧١</sup> <sup>٤٧٢</sup> <sup>٤٧٣</sup> <sup>٤٧٤</sup> <sup>٤٧٥</sup> <sup>٤٧٦</sup> <sup>٤٧٧</sup> <sup>٤٧٨</sup> <sup>٤٧٩</sup> <sup>٤٨٠</sup> <sup>٤٨١</sup> <sup>٤٨٢</sup> <sup>٤٨٣</sup> <sup>٤٨٤</sup> <sup>٤٨٥</sup> <sup>٤٨٦</sup> <sup>٤٨٧</sup> <sup>٤٨٨</sup> <sup>٤٨٩</sup> <sup>٤٩٠</sup> <sup>٤٩١</sup> <sup>٤٩٢</sup> <sup>٤٩٣</sup> <sup>٤٩٤</sup> <sup>٤٩٥</sup> <sup>٤٩٦</sup> <sup>٤٩٧</sup> <sup>٤٩٨</sup> <sup>٤٩٩</sup> <sup>٥٠٠</sup> <sup>٥٠١</sup> <sup>٥٠٢</sup> <sup>٥٠٣</sup> <sup>٥٠٤</sup> <sup>٥٠٥</sup> <sup>٥٠٦</sup> <sup>٥٠٧</sup> <sup>٥٠٨</sup> <sup>٥٠٩</sup> <sup>٥١٠</sup> <sup>٥١١</sup> <sup>٥١٢</sup> <sup>٥١٣</sup> <sup>٥١٤</sup> <sup>٥١٥</sup> <sup>٥١٦</sup> <sup>٥١٧</sup> <sup>٥١٨</sup> <sup>٥١٩</sup> <sup>٥٢٠</sup> <sup>٥٢١</sup> <sup>٥٢٢</sup> <sup>٥٢٣</sup> <sup>٥٢٤</sup> <sup>٥٢٥</sup> <sup>٥٢٦</sup> <sup>٥٢٧</sup> <sup>٥٢٨</sup> <sup>٥٢٩</sup> <sup>٥٣٠</sup> <sup>٥٣١</sup> <sup>٥٣٢</sup> <sup>٥٣٣</sup> <sup>٥٣٤</sup> <sup>٥٣٥</sup> <sup>٥٣٦</sup> <sup>٥٣٧</sup> <sup>٥٣٨</sup> <sup>٥٣٩</sup> <sup>٥٤٠</sup> <sup>٥٤١</sup> <sup>٥٤٢</sup> <sup>٥٤٣</sup> <sup>٥٤٤</sup> <sup>٥٤٥</sup> <sup>٥٤٦</sup> <sup>٥٤٧</sup> <sup>٥٤٨</sup> <sup>٥٤٩</sup> <sup>٥٥٠</sup> <sup>٥٥١</sup> <sup>٥٥٢</sup> <sup>٥٥٣</sup> <sup>٥٥٤</sup> <sup>٥٥٥</sup> <sup>٥٥٦</sup> <sup>٥٥٧</sup> <sup>٥٥٨</sup> <sup>٥٥٩</sup> <sup>٥٦٠</sup> <sup>٥٦١</sup> <sup>٥٦٢</sup> <sup>٥٦٣</sup> <sup>٥٦٤</sup> <sup>٥٦٥</sup> <sup>٥٦٦</sup> <sup>٥٦٧</sup> <sup>٥٦٨</sup> <sup>٥٦٩</sup> <sup>٥٧٠</sup> <sup>٥٧١</sup> <sup>٥٧٢</sup> <sup>٥٧٣</sup> <sup>٥٧٤</sup> <sup>٥٧٥</sup> <sup>٥٧٦</sup> <sup>٥٧٧</sup> <sup>٥٧٨</sup> <sup>٥٧٩</sup> <sup>٥٨٠</sup> <sup>٥٨١</sup> <sup>٥٨٢</sup> <sup>٥٨٣</sup> <sup>٥٨٤</sup> <sup>٥٨٥</sup> <sup>٥٨٦</sup> <sup>٥٨٧</sup> <sup>٥٨٨</sup> <sup>٥٨٩</sup> <sup>٥٩٠</sup> <sup>٥٩١</sup> <sup>٥٩٢</sup> <sup>٥٩٣</sup> <sup>٥٩٤</sup> <sup>٥٩٥</sup> <sup>٥٩٦</sup> <sup>٥٩٧</sup> <sup>٥٩٨</sup> <sup>٥٩٩</sup> <sup>٦٠٠</sup> <sup>٦٠١</sup> <sup>٦٠٢</sup> <sup>٦٠٣</sup> <sup>٦٠٤</sup> <sup>٦٠٥</sup> <sup>٦٠٦</sup> <sup>٦٠٧</sup> <sup>٦٠٨</sup> <sup>٦٠٩</sup> <sup>٦١٠</sup> <sup>٦١١</sup> <sup>٦١٢</sup> <sup>٦١٣</sup> <sup>٦١٤</sup> <sup>٦١٥</sup> <sup>٦١٦</sup> <sup>٦١٧</sup> <sup>٦١٨</sup> <sup>٦١٩</sup> <sup>٦٢٠</sup> <sup>٦٢١</sup> <sup>٦٢٢</sup> <sup>٦٢٣</sup> <sup>٦٢٤</sup> <sup>٦٢٥</sup> <sup>٦٢٦</sup> <sup>٦٢٧</sup> <sup>٦٢٨</sup> <sup>٦٢٩</sup> <sup>٦٣٠</sup> <sup>٦٣١</sup> <sup>٦٣٢</sup> <sup>٦٣٣</sup> <sup>٦٣٤</sup> <sup>٦٣٥</sup> <sup>٦٣٦</sup> <sup>٦٣٧</sup> <sup>٦٣٨</sup> <sup>٦٣٩</sup> <sup>٦٤٠</sup> <sup>٦٤١</sup> <sup>٦٤٢</sup> <sup>٦٤٣</sup> <sup>٦٤٤</sup> <sup>٦٤٥</sup> <sup>٦٤٦</sup> <sup>٦٤٧</sup> <sup>٦٤٨</sup> <sup>٦٤٩</sup> <sup>٦٥٠</sup> <sup>٦٥١</sup> <sup>٦٥٢</sup> <sup>٦٥٣</sup> <sup>٦٥٤</sup> <sup>٦٥٥</sup> <sup>٦٥٦</sup> <sup>٦٥٧</sup> <sup>٦٥٨</sup> <sup>٦٥٩</sup> <sup>٦٦٠</sup> <sup>٦٦١</sup> <sup>٦٦٢</sup> <sup>٦٦٣</sup> <sup>٦٦٤</sup> <sup>٦٦٥</sup> <sup>٦٦٦</sup> <sup>٦٦٧</sup> <sup>٦٦٨</sup> <sup>٦٦٩</sup> <sup>٦٧٠</sup> <sup>٦٧١</sup> <sup>٦٧٢</sup> <sup>٦٧٣</sup> <sup>٦٧٤</sup> <sup>٦٧٥</sup> <sup>٦٧٦</sup> <sup>٦٧٧</sup> <sup>٦٧٨</sup> <sup>٦٧٩</sup> <sup>٦٨٠</sup> <sup>٦٨١</sup> <sup>٦٨٢</sup> <sup>٦٨٣</sup> <sup>٦٨٤</sup> <sup>٦٨٥</sup> <sup>٦٨٦</sup> <sup>٦٨٧</sup> <sup>٦٨٨</sup> <sup>٦٨٩</sup> <sup>٦٩٠</sup> <sup>٦٩١</sup> <sup>٦٩٢</sup> <sup>٦٩٣</sup> <sup>٦٩٤</sup> <sup>٦٩٥</sup> <sup>٦٩٦</sup> <sup>٦٩٧</sup> <sup>٦٩٨</sup> <sup>٦٩٩</sup> <sup>٧٠٠</sup> <sup>٧٠١</sup> <sup>٧٠٢</sup> <sup>٧٠٣</sup> <sup>٧٠٤</sup> <sup>٧٠٥</sup> <sup>٧٠٦</sup> <sup>٧٠٧</sup> <sup>٧٠٨</sup> <sup>٧٠٩</sup> <sup>٧١٠</sup> <sup>٧١١</sup> <sup>٧١٢</sup> <sup>٧١٣</sup> <sup>٧١٤</sup> <sup>٧١٥</sup> <sup>٧١٦</sup> <sup>٧١٧</sup> <sup>٧١٨</sup> <sup>٧١٩</sup> <sup>٧٢٠</sup> <sup>٧٢١</sup> <sup>٧٢٢</sup> <sup>٧٢٣</sup> <sup>٧٢٤</sup> <sup>٧٢٥</sup> <sup>٧٢٦</sup> <sup>٧٢٧</sup> <sup>٧٢٨</sup> <sup>٧٢٩</sup> <sup>٧٣٠</sup> <sup>٧٣١</sup> <sup>٧٣٢</sup> <sup>٧٣٣</sup> <sup>٧٣٤</sup> <sup>٧٣٥</sup> <sup>٧٣٦</sup> <sup>٧٣٧</sup> <sup>٧٣٨</sup> <sup>٧٣٩</sup> <sup>٧٤٠</sup> <sup>٧٤١</sup> <sup>٧٤٢</sup> <sup>٧٤٣</sup> <sup>٧٤٤</sup> <sup>٧٤٥</sup> <sup>٧٤٦</sup> <sup>٧٤٧</sup> <sup>٧٤٨</sup> <sup>٧٤٩</sup> <sup>٧٥٠</sup> <sup>٧٥١</sup> <sup>٧٥٢</sup> <sup>٧٥٣</sup> <sup>٧٥٤</sup> <sup>٧٥٥</sup> <sup>٧٥٦</sup> <sup>٧٥٧</sup> <sup>٧٥٨</sup> <sup>٧٥٩</sup> <sup>٧٦٠</sup> <sup>٧٦١</sup> <sup>٧٦٢</sup> <sup>٧٦٣</sup> <sup>٧٦٤</sup> <sup>٧٦٥</sup> <sup>٧٦٦</sup> <sup>٧٦٧</sup> <sup>٧٦٨</sup> <sup>٧٦٩</sup> <sup>٧٧٠</sup> <sup>٧٧١</sup> <sup>٧٧٢</sup> <sup>٧٧٣</sup> <sup>٧٧٤</sup> <sup>٧٧٥</sup> <sup>٧٧٦</sup> <sup>٧٧٧</sup> <sup>٧٧٨</sup> <sup>٧٧٩</sup> <sup>٧٨٠</sup> <sup>٧٨١</sup> <sup>٧٨٢</sup> <sup>٧٨٣</sup> <sup>٧٨٤</sup> <sup>٧٨٥</sup> <sup>٧٨٦</sup> <sup>٧٨٧</sup> <sup>٧٨٨</sup> <sup>٧٨٩</sup> <sup>٧٩٠</sup> <sup>٧٩١</sup> <sup>٧٩٢</sup> <sup>٧٩٣</sup> <sup>٧٩٤</sup> <sup>٧٩٥</sup> <sup>٧٩٦</sup> <sup>٧٩٧</sup> <sup>٧٩٨</sup> <sup>٧٩٩</sup> <sup>٨٠٠</sup> <sup>٨٠١</sup> <sup>٨٠٢</sup> <sup>٨٠٣</sup> <sup>٨٠٤</sup> <sup>٨٠٥</sup> <sup>٨٠٦</sup> <sup>٨٠٧</sup> <sup>٨٠٨</sup> <sup>٨٠٩</sup> <sup>٨١٠</sup> <sup>٨١١</sup> <sup>٨١٢</sup> <sup>٨١٣</sup> <sup>٨١٤</sup> <sup>٨١٥</sup> <sup>٨١٦</sup> <sup>٨١٧</sup> <sup>٨١٨</sup> <sup>٨١٩</sup> <sup>٨٢٠</sup> <sup>٨٢١</sup> <sup>٨٢٢</sup> <sup>٨٢٣</sup> <sup>٨٢٤</sup> <sup>٨٢٥</sup> <sup>٨٢٦</sup> <sup>٨٢٧</sup> <sup>٨٢٨</sup> <sup>٨٢٩</sup> <sup>٨٣٠</sup> <sup>٨٣١</sup> <sup>٨٣٢</sup> <sup>٨٣٣</sup> <sup>٨٣٤</sup> <sup>٨٣٥</sup> <sup>٨٣٦</sup> <sup>٨٣٧</sup> <sup>٨٣٨</sup> <sup>٨٣٩</sup> <sup>٨٤٠</sup> <sup>٨٤١</sup> <sup>٨٤٢</sup> <sup>٨٤٣</sup> <sup>٨٤٤</sup> <sup>٨٤٥</sup> <sup>٨٤٦</sup> <sup>٨٤٧</sup> <sup>٨٤٨</sup> <sup>٨٤٩</sup> <sup>٨٥٠</sup> <sup>٨٥١</sup> <sup>٨٥٢</sup> <sup>٨٥٣</sup> <sup>٨٥٤</sup> <sup>٨٥٥</sup> <sup>٨٥٦</sup> <sup>٨٥٧</sup> <sup>٨٥٨</sup> <sup>٨٥٩</sup> <sup>٨٦٠</sup> <sup>٨٦١</sup> <sup>٨٦٢</sup> <sup>٨٦٣</sup> <sup>٨٦٤</sup> <sup>٨٦٥</sup> <sup>٨٦٦</sup> <sup>٨٦٧</sup> <sup>٨٦٨</sup> <sup>٨٦٩</sup> <sup>٨٧٠</sup> <sup>٨٧١</sup> <sup>٨٧٢</sup> <sup>٨٧٣</sup> <sup>٨٧٤</sup> <sup>٨٧٥</sup> <sup>٨٧٦</sup> <sup>٨٧٧</sup> <sup>٨٧٨</sup> <sup>٨٧٩</sup> <sup>٨٨٠</sup> <sup>٨٨١</sup> <sup>٨٨٢</sup> <sup>٨٨٣</sup> <sup>٨٨٤</sup> <sup>٨٨٥</sup> <sup>٨٨٦</sup> <sup>٨٨٧</sup> <sup>٨٨٨</sup> <sup>٨٨٩</sup> <sup>٨٩٠</sup> <sup>٨٩١</sup> <sup>٨٩٢</sup> <sup>٨٩٣</sup> <sup>٨٩٤</sup> <sup>٨٩٥</sup> <sup>٨٩٦</sup> <sup>٨٩٧</sup> <sup>٨٩٨</sup> <sup>٨٩٩</sup> <sup>٩٠٠</sup> <sup>٩٠١</sup> <sup>٩٠٢</sup> <sup>٩٠٣</sup> <sup>٩٠٤</sup> <sup>٩٠٥</sup> <sup>٩٠٦</sup> <sup>٩٠٧</sup> <sup>٩٠٨</sup> <sup>٩٠٩</sup> <sup>٩١٠</sup> <sup>٩١١</sup> <sup>٩١٢</sup> <sup>٩١٣</sup> <sup>٩١٤</sup> <sup>٩١٥</sup> <sup>٩١٦</sup> <sup>٩١٧</sup> <sup>٩١٨</sup> <sup>٩١٩</sup> <sup>٩٢٠</sup> <sup>٩٢١</sup> <sup>٩٢٢</sup> <sup>٩٢٣</sup> <sup>٩٢٤</sup> <sup>٩٢٥</sup> <sup>٩٢٦</sup> <sup>٩٢٧</sup> <sup>٩٢٨</sup> <sup>٩٢٩</sup> <sup>٩٣٠</sup> <sup>٩٣١</sup> <sup>٩٣٢</sup> <sup>٩٣٣</sup> <sup>٩٣٤</sup> <sup>٩٣٥</sup> <sup>٩٣٦</sup> <sup>٩٣٧</sup> <sup>٩٣٨</sup> <sup>٩٣٩</sup> <sup>٩٤٠</sup> <sup>٩٤١</sup> <sup>٩٤٢</sup> <sup>٩٤٣</sup> <sup>٩٤٤</sup> <sup>٩٤٥</sup> <sup>٩٤٦</sup> <sup>٩٤٧</sup> <sup>٩٤٨</sup> <sup>٩٤٩</sup> <sup>٩٥٠</sup> <sup>٩٥١</sup> <sup>٩٥٢</sup> <sup>٩٥٣</sup> <sup>٩٥٤</sup> <sup>٩٥٥</sup> <sup>٩٥٦</sup> <sup>٩٥٧</sup> <sup>٩٥٨</sup> <sup>٩٥٩</sup> <sup>٩٦٠</sup> <sup>٩٦١</sup> <sup>٩٦٢</sup> <sup>٩٦٣</sup> <sup>٩٦٤</sup> <sup>٩٦٥</sup> <sup>٩٦٦</sup> <sup>٩٦٧</sup> <sup>٩٦٨</sup> <sup>٩٦٩</sup> <sup>٩٧٠</sup> <sup>٩٧١</sup> <sup>٩٧٢</sup> <sup>٩٧٣</sup> <sup>٩٧٤</sup> <sup>٩٧٥</sup> <sup>٩٧٦</sup> <sup>٩٧٧</sup> <sup>٩٧٨</sup> <sup>٩٧٩</sup> <sup>٩٨٠</sup> <sup>٩٨١</sup> <sup>٩٨٢</sup> <sup>٩٨٣</sup> <sup>٩٨٤</sup> <sup>٩٨٥</sup> <sup>٩٨٦</sup> <sup>٩٨٧</sup> <sup>٩٨٨</sup> <sup>٩٨٩</sup> <sup>٩٩٠</sup> <sup>٩٩١</sup> <sup>٩٩٢</sup> <sup>٩٩٣</sup> <sup>٩٩٤</sup> <sup>٩٩٥</sup> <sup>٩٩٦</sup> <sup>٩٩٧</sup> <sup>٩٩٨</sup> <sup>٩٩٩</sup> <sup>١٠٠٠</sup> <sup>١٠٠١</sup> <sup>١٠٠٢</sup> <sup>١٠٠٣</sup> <sup>١٠٠٤</sup> <sup>١٠٠٥</sup> <sup>١٠٠٦</sup> <sup>١٠٠٧</sup> <sup>١٠٠٨</sup> <sup>١٠٠٩</sup> <sup>١٠١٠</sup> <sup>١٠١١</sup> <sup>١٠١٢</sup> <sup>١٠١٣</sup> <sup>١٠١٤</sup> <sup>١٠١٥</sup> <sup>١٠١٦</sup> <sup>١٠١٧</sup> <sup>١٠١٨</sup> <sup>١٠١٩</sup> <sup>١٠٢٠</sup> <sup>١٠٢١</sup> <sup>١٠٢٢</sup> <sup>١٠٢٣</sup> <sup>١٠٢٤</sup> <sup>١٠٢٥</sup> <sup>١٠٢٦</sup> <sup>١٠٢٧</sup> <sup>١٠٢٨</sup> <sup>١٠٢٩</sup> <sup>١٠٣٠</sup> <sup>١٠٣١</sup> <sup>١٠٣٢</sup> <sup>١٠٣٣</sup> <sup>١٠٣٤</sup> <sup>١٠٣٥</sup> <sup>١٠٣٦</sup> <sup>١٠٣٧</sup> <sup>١٠٣٨</sup> <sup>١٠٣٩</sup> <sup>١٠٤٠</sup> <sup>١٠٤١</sup> <sup>١٠٤٢</sup> <sup>١٠٤٣</sup> <sup>١٠٤٤</sup> <sup>١٠٤٥</sup> <sup>١٠٤٦</sup> <sup>١٠٤٧</sup> <sup>١٠٤٨</sup> <sup>١٠٤٩</sup> <sup>١٠٥٠</sup> <sup>١٠٥١</sup> <sup>١٠٥٢</sup> <sup>١٠٥٣</sup> <sup>١٠٥٤</sup> <sup>١٠٥٥</sup> <sup>١٠٥٦</sup> <sup>١٠٥٧</sup> <sup>١٠٥٨</sup> <sup>١٠٥٩</sup> <sup>١٠٦٠</sup> <sup>١٠٦١</sup> <sup>١٠٦٢</sup> <sup>١٠</sup>

তো তাদের পালনকর্তার নৈকট্য লাভের জন্য মধ্যস্থতা তাজাশ করে যে, তাদের মধ্যে কে নৈকট্যশীল। তারা তাঁর রহমতের আশা করে এবং তাঁর শাস্তিকে ভয় করে। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তার শাস্তি ভয়াবহ (৫৮) এমন কোন জনপদ নেই, যাকে আমি কিয়ামত দিবসের পূর্বে ধ্বংস করব না অথবা যাকে কাঠোর শাস্তি দেব না। এটা তো গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে।

### তক্ষসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি ( তাদেরকে ) বলে দিন : আল্লাহ্ ব্যতীত যাদেরকে তোমরা ( উপাস্য ) মনে করছ, যেমন ফেরেশতা ও জিন ) তাদেরকে ( নিজেদের কষ্ট দূর করার জন্য ) ডাক। অতএব তারা না তোমাদের কষ্ট দূর করার ক্ষমতা রাখে এবং না তা পরিবর্তন করার ( উদাহরণত কষ্ট সম্পূর্ণ দূর করতে না পারলে তা কিছুটা হালকা করে দেবে )। মুশরিকরা যাদেরকে ( অভাব পূরণ এবং বিপদ দূর করার জন্য ) ডাকে, তারা স্বয়ং পালনকর্তার দিকে ( পৌছার জন্য ) মধ্যস্থতা তাজাশ করে যে, তাদের মধ্যে কে অধিক নৈকট্যশীল হয় ( অর্থাৎ তারা স্বয়ং ইবাদত ও আনুগত্যে মশগুল—যাতে আল্লাহর নৈকট্য অর্জিত হয় এবং তারা চায় যে, নৈকট্যের স্তর আরও উন্নীত হোক। ) তারা তাঁর রহমত প্রার্থনা করে এবং ( অবাধ্যতা করলে ) তাঁর আযাবকে ভয় করে। নিশ্চয় আপনার পালনকর্তার আযাব ভয় করার মতই। ( উদ্দেশ্য এই যে, তারা যখন স্বয়ং ইবাদতকারী, তখন মাবুদ কিরাপে হতে পারে? তারা নিজেরাই যখন কোন অভাব অনটন ও কষ্ট দূর করার ব্যাপারে আল্লাহর মুখাপেক্ষী, তখন তারা অপরের অভাব-অনটন কিরাপে দূর করতে পারবে? ) এবং ( কাফিরদের ) এমন কোন জনপদ নেই, যাকে আমি কিয়ামতের পূর্বে ধ্বংস করে দেব না অথবা ( কিয়ামতের দিন ) তাকে ( অর্থাৎ তার অধিবাসীদেরকে দোষখের ) কাঠোর শাস্তি দেব না। এ বিষয়টি গ্রন্থে ( অর্থাৎ লওহে মাহফুযে ) লিখিত আছে। ( সুতরাং কোন কাফির এখানে ধ্বংসের হাত থেকে বেঁচে গেলেও কিয়ামত দিবসের ভীষণ শাস্তি থেকে বাঁচবে না। স্বাভাবিক মৃত্যু দ্বারা তো শুধু কাফিররাই ধ্বংস হয় না—সবাই মৃত্যুবরণ করে। তাই জনপদ ধ্বংস করার কথা বলে এখানে আযাব ও বিপর্যয় দ্বারা ধ্বংস করা বোঝানো হয়েছে। মোটকথা এই যে, কাফিরদের উপর তো কোন কোন সময় দুনিয়াতেও আযাব প্রেরণ করা হয় এবং পরকালের আযাব এরও অতিরিক্ত হবে। আযাব কোন সময় দুনিয়াতে কোন আযাবই আসে না। কিন্তু পরকালের আযাব থেকে সর্বাবস্থায় মুক্তি নেই )।

### আনুশঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

وسيلة—يبتغون إلى ربهم الوسيلة

কারণও কাছে পৌছার উপায় হিসাবে গ্রহণ করা হয়। আল্লাহর জন্য ওসিলা হচ্ছে কথায় ও কাজে আল্লাহর মজির প্রতি সব সময় লক্ষ্য রাখা এবং শরীয়তের বিধিবিধান অনুসরণ

করা। উদ্দেশ্য এই যে, তাঁরা সবাই সৎ কর্মের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অন্বেষণে মশগুল আছেন।

يَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيُؤْتُونَ عَدَا بَهُ — হযরত সহল ইবনে আবদুল্লাহ

বলেন : আল্লাহর রহমতের আশা করিতে থাকা এবং ভয়ও করিতে থাকা—মানুষের এ দু'টি ভিন্নমুখী অবস্থা যে পর্যন্ত সমান সমান পর্যায়ে থাকে, সেই পর্যন্ত মানুষ সঠিক পথে অনুগমন করে। পক্ষান্তরে যদি কোন একটি অবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে, তবে সেই পরিমাণে সে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে।—(কুরতুবী)

وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا  
 ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَحْوِيفًا ﴿٥٦﴾  
 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ احْطِطُوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرَّيْبِيَّ الَّذِي أَرَيْنَاكَ  
 إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُحُوفُهُمْ قَمَا  
 يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا ﴿٥٧﴾

(৫৬) পূর্ববর্তীগণ কর্তৃক নিদর্শন স্বীকার করার ফলেই আমাকে নিদর্শনাবলী প্রেরণ থেকে বিরত থাকতে হয়েছে। আমি তাদেরকে বোঝাবার জন্য সামুদকে উক্কী দিয়েছিলাম। অতঃপর তারা তার প্রতি জুলুম করেছিল। আমি ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যেই নিদর্শনাবলী প্রেরণ করি। (৫৭) এবং স্মরণ করুন, আমি আপনাকে বলে দিয়েছিলাম যে, আপনার পালনকর্তা মানুষকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং যে দৃশ্য আমি আপনাকে দেখিয়েছি তাও কোরআনে উল্লিখিত অজিহাদ হুকুম কেবল মানুষের পরীক্ষার জন্য। আমি তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করি। কিন্তু এতে তাদের অবাধ্যতাই আরও হ্রাস পায়।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমার পক্ষ থেকে বিশেষ (ফরমায়েশী) মু'জিয়াসমূহ প্রেরণে এটাই প্রতিবন্ধক যে, (তাদের সমর্থনী) পূর্ববর্তী লোকেরা এগুলোকে (অর্থাৎ ফরমায়েশী মু'জিয়াসমূহকে) মিথ্যারূপ করেছে। সব কাফিরের মেযাজ ও স্বভাব এক-রকম। তাই বাহ্যত বোঝা যায় যে, ওরাও মিথ্যারূপ করবে। এবং (নমুনা হিসাবে একটি কাহিনীও শুনে নাও যে) আমি সামুদ সম্প্রদায়কে [ তাদের ফরমায়েশ অনুযায়ী সাগরে (আ)-এর মু'জিয়া হিসাবে ] উক্কী দিয়েছিলাম, (যা উদ্ভূত উপায়ে পল্লদা হয়েছিল এবং) যা (মু'জিয়া হও-র কারণে) জানলাভের উপায় ছিল। অতঃপর তারা (এ থেকে জান অর্জন করেনি ;

বরং তার প্রতি জুলুম করেছে (অর্থাৎ তাকে হত্যা করেছে। কাজেই বর্তমান (লোক-দেরকে ফরমায়েশী মু'জিয়া দেখানো হলে তারাও তদ্রূপ করবে)। আমি মু'জিয়াসমূহ শুধু (এ বিষয়ে) ভয় প্রদর্শনের জন্য প্রেরণ করি (যে যদি এই মু'জিয়া দেখেও বিশ্বাস স্থাপন না কর, তবে অনতিবিলম্বে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। বাস্তবেও তাই হয়েছে। যাদেরকে ফরমায়েশী মু'জিয়া দেখানো হয়েছে, তারা বিশ্বাস স্থাপন করেনি। ফলে এটাই তাদের ধ্বংস ও আমাবের কারণ হয়ে গেছে। তবে এদেরকে এই মুহূর্তে ধ্বংস না করাই আল্লাহর রহস্যের তাগিদ। তাই তাদের ফরমায়েশী মু'জিয়া প্রকাশ করা হয়নি। সে ঘটনা থেকে এর সমর্থন পাওয়া যায়, যার সম্মুখীন তারা পূর্বে হয়েছে। এর বর্ণনা এরূপঃ) আপনি সমরণ করুন, যখন আমি আপনাকে বলেছিলাম যে, আপনাদের পালনকর্তা (স্বীয় জ্ঞান দ্বারা) সব মানুষকে (অর্থাৎ তাদের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অবস্থাসমূহকে) পরিবেষ্টিত করে রয়েছেন। (ভবিষ্যতে তাদের বিশ্বাস স্থাপন না করাও আল্লাহ তা'আলার জ্ঞান আছে, যার এক প্রমাণ তাদেরই এ ঘটনা যে) আমি (মি'রাজের ঘটনায়) যে দৃশ্যাবলী (জাগ্রত অবস্থায়) আপনাকে দেখিয়েছিলাম এবং যে রুকের কোন্‌রআনে নিন্দা করা হয়েছে (অর্থাৎ কাফিরদের খাদ্য হাক্কুম রুক) আমি এই উভয় বস্তুকে তাদের জন্য গোমরাহীর কারণ করে দিয়েছি। (অর্থাৎ তারা উভয় ব্যাপার শুনে মিথ্যারোপ করেছে। মি'রাজকে মিথ্যারোপ করার কারণ ছিল এই যে, এক রাত্রিতে সিরিয়ান গমন করা, অতঃপর আকাশে যাওয়া তাদের কাছে সম্ভবপর ছিল না। হাক্কুম রুককে মিথ্যারোপ করার কারণ ছিল এই যে, রুকটি দোষে রয়েছে বলা হয়। অথচ আশুনের মধ্যে রুক থাকার অসম্ভব। থাকলেও তা আশুনে পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে। অথচ এক রাত্রিতে সুদীর্ঘ পথ সফর করা যুক্তিগতভাবে যেমন অসম্ভব নয় তেমনি আকাশে যাওয়াও অসম্ভব নয়। এমনভাবে কোন রুকের প্রকৃতি যদি আল্লাহ তা'আলা এমন করে দেন যে, সে পানির পরিবর্তে আশুনে লালিত-পালিত হয়, তবে এটা অসম্ভব হবে কিরূপে)? আমি তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করি, কিন্তু তাদের অবাধ্যতা রুদ্ধিই পেতে থাকে। (হাক্কুম রুক অস্বীকার করার সাথে সাথে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপও করত। সূরা সাফফাত-এ এ সম্পর্কে আরও বর্ণনা আসবে)।

### আনুমানিক জাতব্য বিষয়

وَمَا جَعَلْنَا لِرُؤْيَا لَتِي أَرِيْنَا إِلَّا نَذْلَةً لِّلنَّاسِ—অর্থাৎ শবে-

মি'রাজে যে দৃশ্যাবলী আমি আপনাকে দেখিয়েছিলাম, তা মানুষের জন্য একটি ফিতনা ছিল। আরবী ভাষায় 'ফিতনা' শব্দটি অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এর এক অর্থ তফসীরের সার-সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে; অর্থাৎ গোমরাহী। এর এক অর্থ পরীক্ষাও হয় এবং অন্য এক অর্থ হাঙ্গামা ও গোলযোগ। এখানে সব অর্থের সম্ভাবনা বিদ্যমান। হযরত আয়শা, সুফিয়ান হাসান, মুজাহিদ (র) প্রমুখ তফসীরবিদ এখানে শেষোক্ত অর্থ নিয়েছেন। তাঁরা বলেনঃ এটা ছিল ধর্মত্যাগের ফিতনা। রসূলুল্লাহ (সা) যখন শবে মি'রাজে বায়তুল-মুকাদ্দাস, সেখান থেকে আকাশে যাওয়ার এবং প্রত্যুষের পূর্বে ফিরে আসার কথা

প্রকাশ করলেন, তখন কোন কোন অপক্স নওমুসলিম এ কথাকে মিথ্যা মনে করে মুরতাদ হয়ে গেল।—(কুরতুবী)

এ ঘটনা থেকে একথাও প্রমাণিত হয়ে গেল যে, **رُؤْيَا** শব্দটি আরবী ভাষায় যদিও স্বপ্নের অর্থেও আসে, কিন্তু এখানে স্বপ্নের কিসসা বোঝানো হয়নি। কারণ, এরূপ হলে কিছু লোকের মুরতাদ হয়ে মাওয়ার কোন কারণ ছিল না। স্বপ্ন তো প্রত্যেকেই দেখতে পারে। বরং এখানে **رُؤْيَا** শব্দ দ্বারা জাগ্রত অবস্থার অভিনব ঘটনা দেখানো বোঝানো হয়েছে। আলোচ্য আয়াতের তফসীরে কোন কোন তফসীরবিদ মিরাজের ঘটনা ছাড়া অন্যান্য ঘটনা বোঝানোর প্রয়াস পেয়েছেন, কিন্তু সেগুলো এখানে খাপ খায় না। একারণেই অধিক সংখ্যক তফসীরবিদ মিরাজের ঘটনাকেই আয়াতের লক্ষ্য সাব্যস্ত করেছেন।—(কুরতুবী)

وَأَذِّنَا لِلْمَلَائِكَةِ أَسْبِغُواْ لِأَدْمَ فِجْدًا وَالْأَبْلِيْسَ قَالَ أَسْبِغُواْ  
لِيْنَ خَلَقْتِ طِينًا ۝ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتِ عَلَيَّ لِيْنَ أَخْرَجْتِ  
إِلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَاحْتَنِكْتِ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا ۝ قَالَ أَذْهَبُ فَمَنْ  
تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُهُمْ جَزَاءً مَّوْفُورًا ۝ وَاسْتَفْزِرُّ مِنْ  
أَسْطِطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبُ عَلَيْهِمْ بِخِيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ  
فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدَّتُهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ۝ إِنَّ  
عِبَادِي لَكُ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنٌ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا ۝

(৬১) স্মরণ কর, যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম : জাদমকে সিজদা কর তখন ইবলীস ব্যতীত সবাই সিজদায় পড়ে গেল। কিন্তু সে বলল : আমি কি এমন ব্যক্তিকে সিজদা করব, যাকে আপনি মাটির দ্বারা সৃষ্টি করেছেন? (৬২) সে বলল : দেখেন তো, এ না সে ব্যক্তি, যাকে আপনি আমার চাইতেও উচ্চমর্যাদা দিয়ে দিয়েছেন। যদি আপনি আমাকে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত সময় দেন, তবে আমি সামান্যসংখ্যক ছাড়া তার বংশধরদেরকে সম্মুখে নষ্ট করে দেব। (৬৩) আজ্জাহ্ বলেন : চলে যা, অতঃপর তাদের মধ্য থেকে যে ভোর অনুগামী হবে, জাহান্নামই হবে তাদের সবার শাস্তি—তরপুর শাস্তি। (৬৪) তুই সভ্যচ্যুত করে তাদের মধ্য থেকে যাকে পারিস স্বীয় আওয়ারাজ দ্বারা, স্বীয় অস্ত্রাঙ্গাহী ও পদাতিক বাহিনী নিয়ে তাদেরকে আক্রমণ কর, তাদের অর্থসম্পদ ও



সন্তান-সন্ততিতে শরীক হয়ে যা এবং তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দে। হলনা ছাড়া শয়তান তাদেরকে কোন প্রতিশ্রুতি দেয় না। (৬৫) আমার বান্দাদের উপর তোমার কোন ক্ষমতা নেই। আপনার পালনকর্তা যথেষ্ট কার্যনির্বাহী।

### তক্ষসীয়ের সার-সংক্ষেপ

এবং (সে সময়টি স্মরণযোগ্য) যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম : আদমকে সিজদা কর, তখন সবাই সিজদা করল; কিন্তু ইবলিস (করেনি এবং) বলল : আমি কি এমন ব্যক্তিকে সিজদা করব, যাকে আপনি মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন? (এ কারণে সে বিতাড়িত হয়ে গেল। তখন) বলতে লাগল : এ ব্যক্তিকে যে আপনি আমার উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন (এবং এ কারণেই তাকে সিজদা করার আদেশ দিয়েছেন), আচ্ছা বলুন তো (এর মধ্যে কি শ্রেষ্ঠত্ব আছে, যে কারণে আমি বিতাড়িত হয়েছি?) যদি আপনি (আমার প্রার্থনা অনুযায়ী) আমাকে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত (মৃত্যু থেকে) সময় দেন তবে আমি (ও) অল্প কয়েকজন ছাড়া (যারা খাঁটি হবে, অবশিষ্ট) তার সব সন্তানকে নিজের বশীভূত করে নেব (অর্থাৎ গোমরাহ্ করে দেব) আল্লাহ্ বললেন : যা (তুই যা করতে পারিস, করে নে), তাদের মধ্যে যে তোমার সঙ্গী হবে, তাদের সবার শক্তি জাহান্নাম—উরুপুর শক্তি। তাদের মধ্য থেকে যার উপর তোমার আধিপত্য চলে স্বীয় আওয়াজ দ্বারা (অর্থাৎ কুমন্ত্রণা ও অপহরণ দ্বারা) তার পা (সৎ পথ থেকে) উপড়িয়ে দে এবং তাদের উপর স্বীয় অস্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী নিয়ে যা (অর্থাৎ তোমার গোটা বাহিনী সম্মিলিতভাবে পথভ্রষ্ট করার কাজে শক্তি নিয়োজিত করুক) এবং তাদের ধনসম্পদ ও সন্তানাদিতে নিজের অংশ স্থাপন করে নে (অর্থাৎ ধনসম্পদ ও সন্তানাদিতে পথভ্রষ্টতার উপায় করে নে; যেমন তাই হতে দেখা যায়) এবং তাদের সাথে (মিছামিহি) ওয়াদা করে নে (যে, কিয়ামতে গোনাহর হিসাব হবে না। হুমকি-হুশিয়ারির ছলে শয়তানকে এসব কথা বলা হয়েছে।) শয়তান তাদের সাথে সম্পূর্ণ মিথ্যা ওয়াদা করে। (এ কথাটি মধ্যবর্তী বাক্য হিসাবে বলা হয়েছে।) অন্তঃপর আবার শয়তানকে বলা হচ্ছে : আমার খাটি বান্দাদের উপর তোমার ক্ষমতা চলবে না। (হে মুহাম্মদ, খাঁটি বান্দাদের উপর তার ক্ষমতা কিভাবে চলতে পারে) আপনার পালনকর্তা (তাদের) যথেষ্ট কার্যনির্বাহী।

### আনুশঙ্গিক জাতব্য বিষয়

اٰحْتَنٰى - لاٰحْتَنٰى শব্দের অর্থ কোন বস্তুর মূলোৎপাটন করা, ধ্বংস করা

اسْتَفْزَزُوا - اسْتَفْزَزُوا শব্দের আসল অর্থ বিচ্ছিন্ন

অথবা সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করা।

করা। এখানে সত্য থেকে বিচ্ছিন্ন করা বোঝানো হয়েছে। **صَوْتٌ—بِهِوْتِكِ** শব্দের

অর্থ আওয়াজ। শয়তানের আওয়াজ কি? এ সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন : গান, বাদ্যযন্ত্র ও রং তামাশার আওয়াজই শয়তানের আওয়াজ। এর মাধ্যমে সে মানুষকে সত্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এ থেকে জানা গেল যে, বাদ্যযন্ত্র ও গান-বাজনা হারাম।  
—(কুরতুবী)

ইবলীস হযরত আদমকে সিঁদুর না করার সময় দু'টি কথা বলেছিল। এক. আদম মাটি দ্বারা সৃষ্টিত হয়েছে এবং আমি অগ্নি দ্বারা সৃষ্টিত। আপনি মাটিকে অগ্নির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করলেন কেন? এ প্রশ্নটি আদমের আদেশের বিপরীতে, নির্দেশের রহস্য জানার সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল। কোন আদিষ্ট ব্যক্তির এরূপ প্রশ্ন করার অধিকার নেই। আদমের পক্ষ থেকে আদিষ্ট ব্যক্তির যে রহস্য অনুসন্ধানের অধিকার নেই, এ কথা বলাই বাহুল্য। কারণ, দুনিয়াতে স্বয়ং মানুষ তার চাকরকে এ অধিকার দেয় না যে, সে তার চাকরকে কোন কাজ করতে বলবে এবং চাকর সেই কাজটি করার পরিবর্তে প্রভুকে প্রশ্ন করবে যে, এর রহস্য কি? তাই ইবলীসের এই প্রশ্নটিকে উত্তরের অযোগ্য সাব্যস্ত করে আয়াতে তার উত্তর দেওয়া হয়নি। এছাড়া বাহ্যিক উত্তর এটাই যে, এক বস্তুকে অন্য বস্তুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করার অধিকার একমাত্র সে সত্তার, যিনি সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা। তিনি যখন যে বস্তুকে অন্য বস্তুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করবেন, তখন তাই শ্রেষ্ঠ হয়ে যাবে।

ইবলীসের দ্বিতীয় কথা ছিল এই যে, যদি আমাকে কিয়ামত পর্যন্ত জীবন দান করা হয়, তবে আমি আদমের গোটা বংশধরকে অবশ্য তাদের কয়েকজন ছাড়া পথভ্রষ্ট করে ছাড়ব। আয়াতে আদম তা'আলা এর উত্তরে বলেছেন : আমার খাঁটি বান্দা যারা, তাদের উপর তোমার কোন ক্ষমতা চলবে না; যদিও তোমার গোটা বাহিনী ও সর্বশক্তি এ কাজে নিয়োজিত হয়। অবশিষ্ট অর্থাৎ বান্দারা তোমার বশীভূত হয়ে গেলে তাদেরও দুর্দশা তাই হবে, যা তোমার জন্য নির্ধারিত, অর্থাৎ জাহান্নামের আয়াবে তাদের সবাই গ্রেফতার হবে।

আয়াতের **أَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ** বাক্যে শয়তানের অস্বারোহী ও

পদাতিক বাহিনীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এতে করে বাস্তবেও শয়তানের কিছু অস্বারোহী ও কিছু পদাতিক বাহিনী জরুরী বিবেচিত হয় না; বরং এই বাক্যপদ্ধতিটি পূর্ণ বাহিনী তথা পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। বাস্তবে যদি এরূপ থেকেও থাকে, তবে তাও স্বীকার করার কোন কারণ নেই। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন : যারা কুফরের সমর্থনে যুদ্ধ করতে যান, সেসব অস্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী শয়তানেরই অস্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী। এখন প্রশ্ন রইল, শয়তান কিরূপে জানতে পারল যে, সে আদমের বংশধরগণকে কুমন্ত্রণা দিয়ে পথভ্রান্ত করতে সক্ষম হবে? সম্ভবত সে মানুষের গঠনপ্রকৃতি দেখে বুঝে নিয়েছে যে, এর মধ্যে কুপ্রবৃত্তির প্রাবল্য হবে। তাই কুমন্ত্রণার ফাঁদে পড়ে যাওয়া কঠিন হবে না। এছাড়া এটা যে মিছামিছি দাবীই ছিল, তাও অবাস্তব নয়।

وَشَارِكِهِمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ - মানুষের ধনসম্পদ ও সন্তান-

সন্ততির মধ্যে শয়তানের শরীকানার অর্থ, হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর মতে এই যে, ধনসম্পদকে অবৈধ হারাম পন্থায় উপার্জন করা অথবা হারাম কাজে ব্যয় করাই হচ্ছে ধনসম্পদে শয়তানের শরীকানা। সন্তান-সন্ততির মধ্যে শয়তানের শরীকানা কয়েকভাবে হতে পারে : সন্তান অবৈধ ও জারজ হলে, সন্তানের মুশরিকসুলভ নাম রাখা হলে তাদের জালাল-পালনে অবৈধ পন্থায় উপার্জন করলে।—(কুরত্ববী)

رَبِّكُمْ الَّذِي يُزِيحُ لَكُمْ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضَّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا آيَاتُهُ فَلَمَّا نَجَّيْكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا ۝ أَفَأَمْنْتُمْ أَنْ يَخْشِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكَيْلًا ۝ أَمْ آمَنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ السَّمَاءِ فَيَغْرِقَكُمْ فِي الْبَارِّ كَمَا غَرَّقْتُمْ ثُمَّ لَا تُجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا ۝ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۝

(৬৬) তোমাদের পালনকর্তা তিনিই, যিনি তোমাদের জন্য সমুদ্রে জলযান চালনা করেন, যাতে তোমরা তার অনুগ্রহ অন্বেষণ করতে পারো। নিঃসন্দেহে তিনি তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু। (৬৭) যখন সমুদ্রে তোমাদের উপর বিপদ আসে, তখন শুধু আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে তোমরা আহ্বান করে থাক তাদেরকে তোমরা বিস্মৃত হয়ে যাও। অতঃপর তিনি যখন তোমাদেরকে স্থলে ভিড়িয়ে উদ্ধার করে নেন, তখন তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও। মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ। (৬৮) তোমরা কি এ বিষয়ে নিশ্চিত রয়েছে যে, তিনি তোমাদিগকে স্থলভাগে কোথাও ডুগর্ভস্থ করবেন না। অথবা তোমাদের উপর প্রসূর বর্ষণকারী ঘৃণিষড় প্রেরণ করবেন না, তখন তোমরা নিজেদের জন্য কোন কর্মবিধায়ক পাবে না। (৬৯) অথবা তোমরা কি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, তিনি তোমাদেরকে আরেকবার

সমুদ্রে নিয়ে যাবেন না, অতঃপর তোমাদের জন্য মহা ঝটিকা প্রেরণ করবেন না, অতঃপর অকৃতজ্ঞতার শাস্তিস্বরূপ তোমাদেরকে নিমজ্জিত করবেন না, তখন তোমরা আমার বিরুদ্ধে এ বিষয়ে সাহায্যকারী কাউকে পাবে না। (৭০) নিশ্চয় আমি আদম-সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি, আমি তাদেরকে স্থলে ও জলে চলাচলের বাহন দান করেছি; তাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ প্রদান করেছি এবং তাদেরকে অনেক সুষ্ঠু বস্তুর উপর শ্রেষ্ঠ দান করেছি।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে তওহীদের স্বপক্ষে এবং অংশীবাদের বাতিল প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছিল। আলোচিত আয়াতসমূহে এ বিষয়ের উপরই এক বিশেষ উল্লিখে আলোকপাত করা হয়েছে। এ আলোচনার সার হলো, আল্লাহ্ তা'আলার যে অগণন ও মহান নিয়ামতরাজি মানবসমাজকে সর্বক্ষণ পরিবেষ্টিত করে রয়েছে তা বর্ণনার মাধ্যমে এ কথা ব্যক্ত করাই উদ্দেশ্য ছিল যে, এ সকল নিয়ামতরাজি দানকারী একমাত্র আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন ব্যতীত অন্য কেউই হতে পারে না। সমগ্র নিয়ামতরাজিই একমাত্র মহান রব্বুল আলামীনের। সুতরাং তাঁর সাথে আর কাউকে শরীফ কিংবা অংশীবাদ করি অপরিমেয় পথভ্রষ্টতা। ইরশাদ করেছেনঃ) তোমাদের পালনকর্তা এমন (নিয়ামত-দাতা) যে, তোমাদের (কল্যাণের) জন্য সমুদ্রে জলমান পরিচালনা করেন, যাতে তোমরা তার মাধ্যমে রিযিক সন্ধান করতে পার। (এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, সমুদ্র-সফর ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য সাধারণত যথেষ্ট পরিমাণ লাভের কারণ হয়ে থাকে।) নিঃসন্দেহে তিনি তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু। এবং সমুদ্রে যখন তোমাদের উপর কোন বিপদ আপত্তি হয়, (যেমন সমুদ্রতরঙ্গ ও ঝড়-তুফানের কারণে নিমজ্জিত হবার আশংকা) এক আল্লাহ্ ব্যতীত তোমরা অন্যান্য যাদের উপাসনা করে থাকো, তারা সব উধাও হয়ে যায়; (তখন ওদের কথা তোমাদের নিজেদেরই যেমন মনে থাকে না, তেমনি ওদেরকে আহবানও কর না। যদিও বা তাদেরকে আহবান করে থাকো, তো তাদের কাছ থেকে বিন্দুমাত্র সাহায্য প্রাপ্তির প্রত্যাশাও তোমাদের মনে জাগরক হয় না। এ হলো স্বয়ং তোমাদের নিজেদের পক্ষ থেকেই তওহীদের স্বীকৃতি এবং শিরকের মিথ্যা হওয়ার অনুমোদন। অতঃপর তিনি যখন স্থলে ভিড়িয়ে দিয়ে তোমাদেরকে উদ্ধার করেন, তখন তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও। মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ (যে, এত অল্প সময়ের মধ্যেই তারা আল্লাহ্র প্রতিদান ও নিজের আহাজারি এবং কান্নাকাটির কথা ভুলে যায়। এবং তোমরা যারা স্থলে পৌছে নিজেদের মুখ ফিরিয়ে রাখো) তোমরা কি নিশ্চিত আছ যে, তোমাদের স্থলে এনেই ভূগর্ভস্থ করবেন না? (সারকথা এই যে, আল্লাহ্র কাছে স্থল ও সমুদ্রের মধ্যে কোন বিশেষ তফাত নেই। তিনি যেমন সমুদ্রে নিমজ্জিত করতে পারেন, তেমনি স্থলেও তোমাদেরকে ভূগর্ভস্থ করে ফেলতে পারেন।) অথবা (তোমরা কি নিশ্চিত রয়েছ যে) তোমাদের উপর কংকর বর্ষণকারী ঝটিকা প্রেরণ করবেন না? (যেমন আদ জাতির জন্য এ রকম বায়ু ঝড় প্রেরণ করেই তোমাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল।)

তখন তোমরা তোমাদের কোন কর্মবিধায়ক পাবে না। অথবা তোমরা কি নিশ্চিত রয়েছ যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে আরেকবার সমুদ্রে নিয়ে যাবেন না এবং তোমাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ঝটিকা পাঠাবেন না এবং তোমাদের কুফরের জন্য তোমাদেরকে নিমজ্জিত করে দেবেন না? তখন এ বিষয়ে (অর্থাৎ নিমজ্জিত করার ব্যাপারে) তোমরা আমার বিরুদ্ধে কোন সাহায্যকারীই পাবে না (যিনি এজন্য তোমাদের বদলা নিতে পারেন)। এবং আমি তো' আদম সন্তানকে (বিশেষ গুণাবলীতে অভিমুখিত করে) মর্যাদা দান করেছি এবং আমরা তাদেরকে স্থলে ও সমুদ্রে (জানোয়ার ও জলখানের উপর) সওয়ার করিয়েছি, তাদেরকে উত্তম জীবনোপকরণ প্রদান করেছি এবং আমি তাদেরকে আমার সৃষ্ট অনেকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।

### আনুষ্ঠানিক জাতব্য বিষয়

অধিকাংশ সৃষ্টজীবের উপর আদম-সন্তানের শ্রেষ্ঠত্ব কেন? : সর্বশেষ আয়াতে অধিকাংশ সৃষ্টজীবের উপর আদম সন্তানদের শ্রেষ্ঠত্ব উল্লিখিত হয়েছে। এ ব্যাপারে দু'টি বিষয় প্রাধান্যযোগ্য। এক, এই শ্রেষ্ঠত্ব কি গুণাবলী ও কি কারণের উপর নির্ভরশীল? দুই, অধিকাংশ সৃষ্টজীবের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদানের কথা বলে কি বোঝানো হয়েছে?

প্রথম প্রশ্নের উত্তর এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা আদম সন্তানকে বিভিন্ন দিক দিয়ে এমন সব বৈশিষ্ট্য দান করেছেন, যেগুলো অন্যান্য সৃষ্টজীবের মধ্যে নেই। উদাহরণত সূত্রী চেহারা, সুমম দেহ, সুমম প্রকৃতি এবং অঙ্গসৌন্দর্য। এগুলো মানুষকে দান করা হয়েছে—যা অন্য কোন জীবের মধ্যে নেই। এ ছাড়া বুদ্ধি ও চেতনায় মানুষকে বিশেষ স্বাতন্ত্র্য দান করা হয়েছে। এর সাহায্যে সে সমগ্র ঔর্ধ্ব-জগত ও অধঃজগতকে নিজের কাজে নিয়োজিত করতে পারে। আল্লাহ্ তা'আলা তাকে বিভিন্ন সৃষ্টবস্তুর সংমিশ্রণে বিভিন্ন শিক্ষদ্রব্য প্রস্তুত করার শক্তি দিয়েছেন, সেগুলো তার বসবাস, চলাফেরা, আহাৰ্য ও পোশাক-পরিচ্ছদে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বাকশক্তি ও পারস্পরিক বোঝাপড়ার যে নৈপুণ্য মানুষ লাভ করেছে, তা অন্য কোন প্রাণীর মধ্যে নেই। ইঙ্গিতের মাধ্যমে মনের কথা অন্যকে বলে দেওয়া, লেখা ও চিত্রিত মাধ্যমে গোপন ভেদে অন্যজন পর্যন্ত পৌঁছানো—এগুলো সব মানুষেরই স্বাতন্ত্র্য। কোন কোন আলিম বলেন : হাতের অঙ্গুলি দ্বারা আহাৰ্য করাও মানুষেরই বিশেষ গুণ। মানুষ বাতীত সব জন্তু মুখে আহাৰ্য গ্রহণ করে। বিভিন্ন জিনিসের সংমিশ্রণে খাদ্যবস্তুকে সৃষ্টি করেও মানুষেরই কাজ। অন্যান্য সব প্রাণী একক বস্তু আহাৰ্য করে। কেউ কাঁচা মাংস, কেউ মাছ এবং কেউ ফল আহাৰ্য করে। মানুষই কেবল সংমিশ্রিত খাদ্য প্রস্তুত করে। বিবেক-বুদ্ধি ও চেতনা মানুষের সর্বপ্রধান শ্রেষ্ঠত্ব। এর মাধ্যমে সে স্বীয় সৃষ্টিকর্তা ও প্রভুর পরিচয় এবং তাঁর পছন্দ ও অপছন্দ জেনে পছন্দের অনুগমন করে এবং অপছন্দ থেকে বিরত থাকে। বিবেক-বুদ্ধি ও চেতনার দিক দিয়ে সৃষ্টজীবকে এভাবে ভাগ করা যায় যে, সাধারণ জীবজন্তুর মধ্যে কামডাব ও কামনা-বাসনা আছে, কিন্তু বুদ্ধি ও চেতনা নেই। ফেরেশতাদের মধ্যেই বুদ্ধি ও চেতনা আছে, কিন্তু কামডাব

ও বাসনা নেই। একমাত্র মানুষের মধ্যেই বিবেক-বুদ্ধি ও চেতনা আছে এবং কামভাব ও কামনা-বাসনাও আছে। এ কারণেই সে বুদ্ধি ও চেতনার সাহায্যে কামভাব ও বাসনাকে পরাভূত করে দেয় এবং আল্লাহ্ তা'আলার অপছন্দনীয় বিষয়াদি থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে। ফলে তার স্থান ফেরেশতার চাইতেও উর্দে উন্নীত হয়।

দ্বিতীয় প্রশ্ন আদম-সন্তানকে অনেক সৃষ্টজীবের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করার অর্থ কি? এ ব্যাপারে কারও ভ্রমত পোষণ করার অবকাশ নেই যে, সমগ্র উর্ধ্ব ও অধঃ-জগতের সৃষ্টজীব এবং সমস্ত জীবজন্তুর চাইতেও আদম-সন্তান শ্রেষ্ঠ। এমনিভাবে বুদ্ধি ও চেতনায় মানুষের সমতুল্য জিন জাতির চাইতেও আদম-সন্তানের শ্রেষ্ঠত্ব সবার কাছে স্বীকৃত। এখন শুধু ফেরেশতাদের ব্যাপারে প্রশ্ন থেকে যাক্ষে যে, মানুষ ও ফেরেশতাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? এ ব্যাপারে সূচিকৃত কথা এই যে, মানুষের মধ্যে যাঁরা সাধারণ ঈমানদার ও সৎকর্মী, যেমন আওলিয়া-দরবেশ, তাঁরা সাধারণত ফেরেশতাদের চাইতে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু বিশেষ শ্রেণীর ফেরেশতা; যেমন জিবরাঈল মীকাঈল প্রমুখ, তাঁরা সাধারণ সৎকর্মী মু'মিনদের চাইতে শ্রেষ্ঠ। বিশেষ শ্রেণীর মু'মিন, যেমন পয়গম্বর শ্রেণী, তাঁরা বিশেষ শ্রেণীর ফেরেশতাদের চাইতেও শ্রেষ্ঠ। এখন রহিল কাফির ও পাপিষ্ঠ মানুষের কথা। বলা বাহুল্য, এরা ফেরেশতাদের চাইতে উত্তম হওয়া তো দূরের কথা, আসল লক্ষ্য সাফল্য ও মুক্তির দিক দিয়ে জন্তু-জানোয়ারের চাইতেও অধম। এদের সম্পর্কে কোরআনের

করসাল্লা এই : **أُولَٰئِكَ لَا نُلَاقُهُمْ إِلَّا فِي سَبِيلٍ أَوْ لَا تَأْتِيهِمُ الْبُحْرَانُ** অর্থাৎ এরা চতুষ্পদ জন্তুদের ন্যায়; বরং তাদের চাইতেও পথভ্রান্ত।---( মাযহারী )

**يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمامِهِمْ فَمَنْ أَوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظَلَمُونَ فِيهِمْ شَيْئًا ۖ وَمَنْ كَانَ فِي هُدًى أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ۖ**

(৭১) স্মরণ কর, যেদিন আমি প্রত্যেক দলকে তাদের নেতাসহ আহ্বান করব, অতঃপর যাদেরকে ডানহাতে তাদের আমলনামা দেওয়া হবে, তারা নিজেদের আমলনামা পাঠ করবে এবং তাদের প্রতি সামান্য পরিমাণও জুলুম হবে না। (৭২) যে ব্যক্তি ইহকালে অন্ধ ছিল, সে পরকালেও অন্ধ এবং অধিকতর পথভ্রান্ত।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(সে দিনটি স্মরণ করা উচিত) যেদিন আমি সব মানুষকে তাদের আমলনামাসহ (হাশরের ময়দানে) আহ্বান করব। (আমলনামাগুলো উড়িয়ে দেওয়া হবে, অতঃপর তা

কারও ডান হাতে এবং কারও বাম হাতে এসে পড়বে) অতঃপর যার আমলনামা তার ডান হাতে দেওয়া হবে (তার) হবে ঈমানদার), এমন লোকেরাই নিজেদের আমলনামা (সম্পত্তিচিন্তে) পাঠ করবে এবং তাদের বিশুদ্ধমাত্রও ক্ষতি করা হবে না (অর্থাৎ তাদের ঈমান ও সৎ কর্মসমূহের পুরস্কার পুরোপুরি দেওয়া হবে—বিশুদ্ধমাত্রও কম দেওয়া হবে না; বরং বেশি দেওয়া যেতে পারে। তারা আমাব থেকে মুক্তিও পাবে, প্রথম পর্যায়েই কিংবা গোনাহর শাস্তি ভোগ করার পর) এবং যে ব্যক্তি দুনিয়াতে (মুক্তির পথ প্রাপ্তি থেকে) অন্ধ ছিল, সে পরকালেও (মুক্তির মন্বিলে পৌঁছা থেকে) অন্ধ থাকবে এবং (বরং সেখানে দুনিয়ার চাইতেও) অধিক পথভ্রান্ত হবে। (কেননা দুনিয়াতে পথভ্রষ্টতার প্রতিকার সম্ভবপর ছিল, সেখানে তাও হবে না। এরাই তারা, যাদের আমলনামা বাম হাতে দেওয়া হবে)।

### আনুষ্ঠানিক জ্ঞাতব্য বিষয়

أَمَّا مَ—এখানে মা শব্দের অর্থ গ্রহ; যেমন  
يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِمَا مَهِمَّ

সূরা ইয়াসীনে রয়েছে, وَأَمَّا مَ صَبِيحِينَ وَكُلَّ شَيْءٍ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ فِي لَيْلٍ مُّبِينٍ এখানে এখানে মা শব্দের অর্থ গ্রহ। গ্রন্থকে ইমাম বলায় কারণ এই যে, জুলদ্রাতি ও দ্বিমত দেখা দিলে গ্রন্থেরই আশ্রয় নেওয়া হয়; যেমন কোন অনুসৃত ইমামের আশ্রয় নেওয়া হয়।—(কুরতুবী)

হযরত আবু হুরায়রা (রা)-র রেওয়াজেতে তিরমিযীর হাদীস থেকেও জানা যায় যে, আয়াতে ইমাম শব্দের অর্থ গ্রহ। হাদীসের ভাষা এরূপ :

يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِمَا مَهِمَّ قَالِ يَدْعَىٰ أَحَدُهُمْ فَيُعْطَىٰ كِتَابَ بِيَمِينِهِ

অর্থাৎ يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِمَا مَهِمَّ—আয়াতের তফসীলে স্বয়ং

রসূলুল্লাহ (সা) বলেন যে, এক এক ব্যক্তিকে ডাকা হবে এবং তার আমলনামা তার ডানহাতে দেওয়া হবে।

এ হাদীস থেকে নির্ণীত হয়ে গেল যে, ইমাম শব্দের অর্থ গ্রহ এবং গ্রহ অর্থ, আমলনামা করা হয়েছে।

হযরত আলী (রা) ও মুজাহিদ থেকে এখানে ইমাম শব্দের অর্থ নেতাও বর্ণিত রয়েছে। অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার নেতার নাম নিয়ে ডাকা হবে—এই নেতা পয়গম্বর ও তাঁদের নামের মশায়েখ ও ওলামা হোক কিংবা পথভ্রষ্টতার প্রতি আহ্বানকারী নেতা হোক।—(কুরতুবী)

এ অর্থের দিক দিয়ে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, হাশরের ময়দানে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার নেতার নাম দ্বারা ডাকা হবে এবং সবাইকে এক জায়গায় জমায়তে করা হবে। উদাহরণত

ইবরাহীম (আ)-এর অনুসারী দল, মুসা (আ)-র অনুসারী দল, ইসা (আ)-র অনুসারী দল এবং মুহাম্মদ (সা)-এর অনুসারী দল। এ প্রসঙ্গে এসব অনুসারীর প্রত্যেক নেতাদের নাম নেওয়াও সম্ভবপর।

আমলনামা : কোরআন পাকের একাধিক আয়াত থেকে জানা যায় যে, শুধু কাফিরদেরকেই বামহাতে আমলনামা দেওয়া হবে; যেমন এক আয়াতে রয়েছে

اِنَّ ظَنَّ اَنْ لَّنْ ۙ اِنَّ ظَنَّ اَنْ لَّنْ ۙ اِنَّ ظَنَّ اَنْ لَّنْ ۙ

অন্য এক আয়াতে রয়েছে,

—**پُحُوْر**—প্রথম আয়াতে স্পষ্টভাবে ঈমান না থাকার কথা বলা হয়েছে এবং দ্বিতীয় আয়াতে পরকালে অবিশ্বাসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এটাও কুফরই। এ থেকে জানা গেল যে, ডানহাতে আমলনামা ঈমানদারদেরকে দেওয়া হবে; পরহিসগার হোক কিংবা গোনাহ্গার। তারা আনন্দচিহ্নে আমলনামা পাঠ করবে এবং অন্যদেরকেও পাঠ করতে দেবে। এ আনন্দ ঈমান ও চিরস্থায়ী আযাব থেকে মুক্তির হবে; যদিও কোন কোন কৃতকর্মের জন্য তাদেরকে শাস্তিও ভোগ করতে হবে।

কোরআন পাকে আমলনামা ডান অথবা বামহাতে অর্পণের অবস্থা বর্ণিত হয়নি, কিন্তু কোন কোন হাদীসে **تَطَايِرُ الْكُتُبِ** শব্দটি উল্লিখিত আছে; অর্থাৎ আমলনামা উড়ে এসে হাতে পড়বে। কোন কোন হাদীসে আছে, সব আমলনামা আরশের নীচে একত্রিত হবে। অতঃপর বাতাস প্রবাহিত হবে এবং সবগুলোকে উড়িয়ে মানুষের হাতে পৌঁছে দেবে—কারও ডান হাতে এবং কারও বাম হাতে। --(বয়ানুল কোরআন)

وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أُوحِيَ بِكَ إِتَّقِ اللَّهَ لَعَلَّكَ تُتَّقَىٰ عَلَىٰ عَيْنِي وَأَنتَ مُخْلِئٌ مَّا تُشَاءُ ۚ وَإِذَا لَا تَأْخُذُوكَ حَلِيلًا ۚ وَلَوْ لَا أَنْ تَشْتَكَّ لَقَدْ كُذِّبَتْ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ۚ إِذَا الْأَذْقُنُكَ ضِعْفًا حَيَوَةً وَضِعْفًا الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُكَ عَلَيْكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ۚ وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّوكَ مِنَ الْأَرْضِ لَيَخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خَلْقَكَ إِلَّا قَلِيلًا ۚ سُبْحَانَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ۚ

(৭৩) তারা তো আপনাকে হাট্টিয়ে দিতে চাচ্ছিল যে বিষয় আমি আপনাকে প্রতি ওহীর মাধ্যমে যা প্রেরণ করেছি তা থেকে আপনাকে পদস্থলন ঘটানোর জন্য তারা চূড়ান্ত চেষ্টা



করছে; যাতে আপনি আমার প্রতি কিছু মিথ্যা সঙ্কল্পযুক্ত করেন। এতে সফল হলে তারা আপনাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে নিত। (৭৪) আমি আপনাকে দৃঢ়পদ না রাখলে আপনি তাদের প্রতি কিছুটা ঝুঁকেই পড়তেন। (৭৫) তখন আমি অবশ্যই আপনাকে ইহজীবনে ও পরজীবনে দ্বিগুণ শাস্তির আশ্বাদন করাতাম। এ সময় আপনি আমার মুকাবিলায় কোন সাহায্যকারী পেতেন না। (৭৬) তারা তো আপনাকে এ ভূখণ্ড থেকে উৎখাত করে দিতে চূড়ান্ত চেষ্টা করেছিল যাতে আপনাকে এখান থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া যায়। তখন তারাও আপনার পর সেখানে অল্পকালই মাত্র টিকে থাকত। (৭৭) আপনার পূর্বে আমি যত রসূল প্রেরণ করেছি, তাদের ক্ষেত্রেও এরূপ নিয়ম ছিল। আপনি আমার নিয়মের কোন ব্যতিক্রম পাবেন না।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং এ কাফিররা (শক্তিশালী কৌশলের মাধ্যমে) আপনাকে সে বিষয় থেকে পদ-স্থলন ঘটাতে চাচ্ছিল, যা আমি ওহীর মাধ্যমে আপনার প্রতি প্রেরণ করেছি (অর্থাৎ আপনার দ্বারা আলাহর নির্দেশের বিপরীত কাজ করার চেষ্টায় মেতেছিল এবং) যাতে আপনি এছাড়া (অর্থাৎ আলাহর নির্দেশ ছাড়া) আমার প্রতি (কার্যক্ষেত্রে) মিথ্যা বিষয় সঙ্কল্পযুক্ত করে দেন। [কেননা নবীর কাজ শরীয়তের বিরুদ্ধে হয় না। কাজেই নাউ-যুবিল্লাহ রসূলুল্লাহ (সা) যদি শরীয়তের বিরুদ্ধে কোন কাজ করতেন, তবে এর অর্থ এই দাঁড়ত যে, তিনি যেন শরীয়তবিরুদ্ধ কাজটি আলাহর প্রতি সঙ্কল্পযুক্ত করেছেন।] এমতাবস্থায় তারা আপনাকে অকুগ্রিম বন্ধু বানিয়ে নিত। (তাদের এই অপচেষ্টা এত তীব্র ছিল যে) যদি আমি আপনাকে দৃঢ়পদ না বানাতাম (অর্থাৎ নিষ্পাপ না করতাম) তবে আপনি তাদের দিকে কিছুটা ঝুঁকে যেতেন। এরূপ হলে (অর্থাৎ তাদের প্রতি আপনার কিছুটা ঝোঁক হলে) আমি আপনাকে (নৈকট্যশীলদের উচ্চ মর্তবার কারণে) জীবনে ও মরণে দ্বিগুণ শাস্তি আশ্বাদন করাতাম। অতঃপর আপনি আমার মুকাবিলায় কোন সাহায্যকারীও পেতেন না। (কিন্তু যেহেতু আমি আপনাকে নিষ্পাপ ও দৃঢ়পদ করেছি, তাই তাদের প্রতি আপনার বিন্দুমাত্রও ঝোঁক হয়নি এবং আপনি শাস্তির কবল থেকে বেঁচে গেছেন।) এবং তারা (অর্থাৎ কাফিররা) এ দেশ (মক্কা অথবা মদীন!) থেকে আপনার পা-ই উপড়িয়ে দিতে চেয়েছিল, যাতে আপনাকে এখান থেকে বহিষ্কার করে দেয়। এরূপ হলে আপনার পর তারাও খুব কমই (এখানে) টিকেতে পারত; যেমন পয়গম্বরদের সম্পর্কে (আমার) এই নীতি ছিল, যাদেরকে আপনার পূর্বে রসূল করে প্রেরণ করেছিলাম। (তাদের সম্প্রদায় যখন তাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কার করেছে, তখন তাদেরও সেখানে বাস করার ভাগ্য হয়নি।) আপনি আমার নিয়মে কোন পরিবর্তন পাবেন না।

### আনুমানিক জাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রথম তিন আয়াত একটি বিশেষ ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত। তফসীর মাযহাবীতে ঘটনাটি নির্ণয় করার ব্যাপারে কয়েকটি রেওয়াজে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

তন্মধ্যে ঘুবায়ের ইবনে নুফায়র (রা)-এর রেওয়াজেতে বর্ণিত ঘটনাটি সত্যের অধিক নিকটবর্তী এবং কোরআনের ইঙ্গিত দ্বারা সমর্থিত। ঘটনাটি এই যে, কতিপয় কুরায়শ সরদার রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে উপস্থিত হয়ে আরম্ভ করল : আপনি যদি বাস্তবিকই আমাদের জন্য প্রেরিত হয়ে থাকেন, তবে আপনার মজলিস থেকে সে সব দুর্দশাগ্রস্ত ছিন্নমূল লোককে বের করে দিন, যাদের সাথে একত্রে বসি আমাদের জন্য অপমানকর। এরূপ করলে আমরাও আপনার সাহাবী ও বন্ধু হয়ে যাব। তাদের এই আবদার শুনে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মনেও কিছুটা কল্লনা জাগে যে এদের দাবী পূরণ করা হলে সম্ভবত এরা মুসলমান হয়ে যাবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়।

আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে খবরদার করা হয়েছে যে, তাদের আবদার একটি ফিতনা এবং তাদের বন্ধুত্বও ফিতনা। আপনি তাদের কথা মেনে নেবেন না। এরপর বলা হয়েছে : যদি আমার পক্ষ থেকে আপনার প্রশিক্ষণ এবং আপনাকে দৃঢ়পদ রাখার ব্যবস্থা না হত, তবে তাদের আবদারের দিকে ঝুঁকে পড়ার কিছু কাছাকাছি হয়ে যাওয়া আপনার কাছে অসম্ভব ছিল না।

তফসীর মায়হানীতে বলা হয়েছে, এ আয়াত থেকে পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে, কাফিরদের অনর্থক আবদারের দিকে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র ঝুঁকে পড়ার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। হ্যাঁ, ঝুঁকে পড়ার কাছাকাছি হওয়ার সামান্য পরিমাণে সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে নিষ্পাপ করে এ থেকেও বাঁচিয়ে রেখেছেন। চিন্তা করলে এ আয়াতটি পয়গম্বরদের সুউচ্চ ও পবিত্রতম চরিত্র ও স্বভাবের একটি সুলভ প্রমাণ। পয়গম্বর-সুলভ পাপমুক্ততা না থাকলেও কাফিরদের অনর্থক আবদারের দিকে ঝুঁকে পড়া পয়গম্বরের স্বভাবের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। হ্যাঁ, ঝুঁকে পড়ার কিছু কাছাকাছি হওয়ার সামান্য পরিমাণে সম্ভাবনা ছিল। পয়গম্বরসুলভ নিষ্পাপ চরিত্রের কারণে তাও দূর করে দেওয়া হয়েছে।

— اِنَّ اِلَّا زَقَاۗىۡ ضَعْفَ الْحَيٰۗاَتِ وَضَعْفَ الْمَمٰتِ — অর্থাৎ যদি

অসম্ভবকে ধরে নেওয়ার পর্যায়ে আপনি তাদের ভ্রান্ত কার্যক্রমের দিকে ঝুঁকে পড়ার কাছাকাছি হয়ে যেতেন, তবে আপনার শাস্তি ইহকালেও দ্বিগুণ হত এবং মৃত্যুর পর কবর অথবা পয়কালেও দ্বিগুণ হত। কেননা, নৈকট্যপীলদের মামুলি ভ্রান্তিকেও বিরাট মনে করা হয়। এ বিষয়বস্তুটি সে বিষয়বস্তুর প্রায় অনুরূপ, যা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পক্ষীদের সম্পর্কে কোরআনে বর্ণিত হয়েছে—

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ مِنْ يٰۤاَن مِّنْكَ بِفَاحِشَةٍ مَّبِيْنَةٍ يُّفَاعَفُ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ

অর্থাৎ হে নবী পক্ষীরা, যদি তোমাদের মধ্যে কেউ প্রকাশ্যে নির্লজ্জ কাজ করে, তবে তাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেওয়া হবে।

سَتَغْرَازُونَ كَادُوا لِيَسْتَفْزُوا فَكَ—এর শাব্দিক অর্থ, কর্তন করা।

এখানে রসূলুল্লাহ (সা)-কে স্বীয় বাসভূমি মক্কা অথবা মদীনা থেকে বের করে দেওয়া বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, কাফিররা আপনাকে নিজ দেশ থেকে বের করে দেওয়ার উপক্রম করেছিল। তারা যদি এরূপ করত, তবে এর শাস্তি ছিল এই যে, তারাও আপনার পক্ষে বেশি দিন এ শহরে বাস করতে পারত না। এটি অপর একটি ঘটনার বর্ণনা, যার নির্ণয়েও দু'রকম রেওয়াজে বর্ণিত রয়েছে। একটি মদীনা তাইয়েবার ঘটনা এবং অপরটি মক্কা মোকাবেলার। মদীনার ঘটনা এই যে, একদিন মদীনার ইহুদীরা রসূলুল্লাহ (সা)-র কাছে উপস্থিত হয়ে আরম্ভ করল : হে আবুল কাসেম (সা) যদি আপনি নবুওয়তের দাবীতে সত্যবাদী হয়ে থাকেন, তবে সিরিয়ায় গিয়ে বসবাস করাই আপনার পক্ষে সমীচীন। কেমনা, সিরিয়াই হবে হাশরের মাঠ এবং সেটাই পয়গম্বরদের বাসভূমি। রসূলুল্লাহ (সা)-র মনে তাদের একথা কিছুটা রেখাপাত করে। তাবুক যুদ্ধের সময় তিনি যখন সিরিয়া সফর করেন, তখন সিরিয়াকে অন্যতম বাসস্থান করার ইচ্ছা তাঁর

মনে জাগ্রত হয়। কিন্তু আলোচ্য **وَإِنْ كَادُوا لِيَسْتَفْزُوا فَكَ** আয়াতটি নাখিল করে, এতে তাঁকে এ ইচ্ছা বাস্তবায়ন নিষেধ করে দেওয়া হয়। ইবনে কাসীর রেওয়াজেতটি উদ্ধৃত করে একে অসন্তোষজনক আখ্যা দিয়েছেন।

তিনি অপর একটি ঘটনার প্রতিও আয়াতের ইঙ্গিত বর্ণনা করেছেন। ঘটনাটি মক্কায় সংঘটিত হয়। সূরাটির মক্কায় অবতীর্ণ হওয়ার পক্ষে শক্তিশালী ইঙ্গিত। ঘটনাটি এই যে, একবার কোরায়শেরা রসূলুল্লাহ (সা)-কে মক্কা থেকে বের করে দেওয়ার ইচ্ছা করে। তখন আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এতে কাফিরদেরকে হ'শিয়ার করা হয়েছে যে, যদি তারা রসূলুল্লাহ (সা)-কে মক্কা থেকে বহিস্কার করে দেয়, তবে নিজেরাও মক্কায় বেশি দিন সুখে-শান্তিতে টিকতে পারবে না। ইবনে কাসীর আয়াতের ইঙ্গিত হিসাবে এ ঘটনাটিকেই অগ্রাধিকার দান করেছেন এবং বলেছেন, কোরআন পাকের এই হ'শিয়ারিও মক্কায় কাফিররা খোলা চোখে দেখে নিচ্ছে। রসূলুল্লাহ (সা) যখন মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করতেন, তখন মক্কা ওয়ালারা একদিনও মক্কায় আরামে থাকতে পারেনি। মাত্র দেড় বছর পর আব্বাহ তা'আলা তাদেরকে বদরের ময়দানে উপস্থিত করে দেন, যেখানে তাদের সত্তর জন সরদার মিত্ত হয় এবং গোটা শক্তি হিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এরপর ওহদ যুদ্ধের শেষ পরিশ্রান্তে তাদের উপর আরও ভয়ভীতি চড়াও হয়ে যায় এবং খন্দক যুদ্ধের সর্বশেষ সংঘর্ষ তো তাদের মেরুদণ্ডই ভেঙ্গে দেয়। হিজরী অষ্টম বর্ষে রসূলুল্লাহ (সা) সমগ্র মক্কা মোকাবেলার জয় করে নেন।

سَنَّةٌ مِّن قَدَارِ سَلْنَا—এ আয়াতে বলা হয়েছে, আব্বাহ তা'আলার সাধারণ

নিয়ম পূর্ব থেকেই এরূপ চালু রয়েছে যে, যখন কোন জাতি তাদের পয়গম্বরকে তাঁর

মাতৃভূমি থেকে বের করে দেয়, তখন সেই জাতিকেও সেখানে বেশি দিন টিকিয়ে রাখা হয় না। তাদের উপর আলাহ্‌র আযাব নাযিল হয়।

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى عَسَقِ النَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ  
 الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ۝ وَمِنَ النَّيْلِ فَمَنْ يَنْجَدِيهِ نَافِلَةٌ لَكَ ۚ عَسَى  
 أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ۝ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ  
 وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا ۝  
 وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ۝ وَ  
 نُنزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۚ وَلَا يَزِيدُ  
 الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ۝

(৭৮) সূর্য চলে পড়ার সময় থেকে রাত্রির অন্ধকার পর্যন্ত নামায কায়েম করুন এবং ফজরের কোরআন পাঠও। নিশ্চয় ফযরের কোরআন পাঠ মুখোমুখি হয়। (৭৯) রাত্রির কিছু অংশ কোরআন পাঠসহ জাগ্রত থাকুন। এটা আপনার জন্য অতিরিক্ত। হয়ত বা আপনার পালনকর্তা আপনাকে মোকামে মাহমুদে পৌঁছাবেন। (৮০) বলুন : হে পালনকর্তা আমাকে দাখিল করুন সত্যরূপে এবং আমাকে বের করুন সত্যরূপে এবং দান করুন আমাকে নিজের কাছ থেকে রাক্তীয় সাহায্য। (৮১) বলুন : সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয় মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল। (৮২) আমি কোরআনে এমন বিষয় নাযিল করি, যা রোগের সুচিকিৎসা এবং মু'মিনদের জন্য রহমত। গোনাহ-পারদের তো এতে শুধু ক্ষতিই বৃদ্ধি পায়।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

সূর্য চলে পড়ার পর থেকে রাত্রির অন্ধকার পর্যন্ত নামায আদায় করুন (এতে মোহর, আসর, মাগরিব ও এশা—এই চার ওয়াক্তের নামায এসে গেছে; যেমন হাদীসে এর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে) এবং ফজরের নামাযও (আদায় করুন)। নিশ্চয় ফজরের নামায (ফেরেশতাদের) হাজির হওয়ার সময়। ফজরের সময়টি নিদ্রা থেকে জাগ্রত হওয়ার সময়। এতে অলসতার আশংকা ছিল, তাই একে আলাদাভাবে গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা করা হয়েছে। সাথে সাথে এর একটি অতিরিক্ত ফযীলতও বর্ণনা করা হয়েছে যে, এ সময়

ফেরেশতারা জমায়েত হয়। হাদীসে এর বিবরণ দিয়ে বলা হয়েছে যে, মানুষের হিফায়ত ও আমলসমূহ লিপিবদ্ধ করার ফেরেশতা, দিনের বেলায় আলাদা এবং রাত্রি বেলায় আলাদা রয়েছে। ফজরের নামাযের সময় ফেরেশতাদের উভয় দল একত্রিত হয়। রাত্রির ফেরেশতারা নিজেদের কাজ শেষ করা এবং দিনের ফেরেশতারা নিজেদের কাজ শুরু করার জন্য একত্রিত হয়। এমনিভাবে বিকালে আসরের নামাযে উভয় দল একত্রিত হয়। বলা বাহুল্য, ফেরেশতাদের সমাবেশ বরকতের কারণ। এবং রাত্রির কিছু অংশেও (নামায আদায় করুন) অর্থাৎ তাতে তাহাজ্জুদের নামায পড়ুন, যা আপনার জন্য (পাঁচ ওয়াস্তের নামায ছাড়া) অতিরিক্ত [এই অতিরিক্তের অর্থ, কারও কারও মতে অতিরিক্ত ফরয, যা বিশেষভাবে রসূলুল্লাহ (সা)-র প্রতি ফরয করা হয়েছে এবং কারও কারও মতে এর অর্থ নফল]। আশা (অর্থাৎ ওয়াদা) এই যে, আপনার পালনকর্তা আপনাকে 'মকামে মাহমুদে' স্থান দেবেন। [ 'মকামে মাহমুদের' অর্থ, শাফায়াতে কুবরার বা প্রধান শাফায়েতের মর্তবা—যা হাশরের মাঠে সমগ্র মানব জাতির জন্য রসূলুল্লাহ (সা)-কে দান করা হবে ]। আপনি দোয়া করুন : হে আমার পালনকর্তা, (মক্কা থেকে যাওয়ার পর) আমাকে (যেখানে দাখিল করবেন) উত্তমরূপে (অর্থাৎ আরাবের সাথে) দাখিল করুন এবং (যখন মক্কা থেকে বের করেন, তখন) আমাকে উত্তমরূপে (অর্থাৎ আরাবের সাথে) বের করুন এবং আমাকে নিজের কাছ থেকে (কাফিরদের বিরুদ্ধে) এমন বিজয় দান করুন, যার সাথে (আপনার) সাহায্য থাকে; মন্দরূপে সে বিজয় দীর্ঘস্থায়ী ও উন্নত হয়। নতুবা সাময়িক বিজয় তো কোন সময় কাফিররাও লাভ করে। কিন্তু তার সাথে আল্লাহর সাহায্য থাকে না। ফলে দীর্ঘস্থায়ীও হয় না। বলে দিন : (বাস এখন) সত্য (ধর্ম বিজয়ের পথে) এসে গেছে (এবং বাতিল বিলীন হওয়ার পথে। বাস্তবিক বাতিল তো ক্ষণভঙ্গুরই হয়। হিজরতের পর মক্কা বিজয়ের সাথে সাথে এসব ওয়াদা পূর্ণ হয়ে যায়)। আমি এমন বস্তু অর্থাৎ কোরআন নাযিল করি, যা ঈমানদারদের জন্য রোগের সুচিকিৎসা ও রহমত। (কেননা তারা একে মানে ও এর নির্দেশমত কাজ করে। ফলে তাদের প্রতি রহমত হয় এবং তারা মিথ্যা বিশ্বাস এবং দৃষ্ট কল্পনার কবল থেকে আরোগ্য লাভ করে)। জালিমদের তো এর দ্বারা ক্ষতিই রুজি পায়। (কেননা তারা যখন কোরআনকে অমান্য করে, তখন আল্লাহ ক্রোধ ও গম্বকের যোগ্য হয়ে যায়)।

### আনুশঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

শত্রুদের দুর্ভিসন্ধি থেকে আত্মরক্ষার উত্তম প্রতিকার নামায : পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে শত্রুদের বিরোধিতা, রসূলুল্লাহ (সা)-কে বিভিন্ন প্রকার কণ্ট পতিত করার অপচেষ্টা এবং এর জওয়াব উল্লেখ করা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে রসূলুল্লাহ (সা)-কে নামায কায়ম করার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, শত্রুদের দুর্ভিসন্ধি ও উৎপীড়ন থেকে আত্মরক্ষার উত্তম প্রতিকার হচ্ছে নামায কায়ম করা। সূরা হিজরের আয়াতে আরও স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে :

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرَكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ  
وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ

অর্থাৎ আমি জানি যে, কাকিরদের পীড়াদায়ক কথা-বার্তা শুনে আপনার অন্তর সংকুচিত হয়ে যায়। অতএব আপনি আপনার পালনকর্তার প্রশংসা দ্বারা তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন এবং সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান।—(কুরত্ববী)

এ আয়াতে আঞ্জাহর যিকর, প্রশংসা, তসবীহ ও নামাযে মশগুল হয়ে যাওয়াকে শত্রুদের উৎপীড়নের প্রতিকার সাব্যস্ত করা হয়েছে। আঞ্জাহর যিকর ও নামায বিশেষভাবে এ থেকে আত্মরক্ষার প্রতিকার। এ ব্যাখ্যাও অবাস্তর নয় যে, শত্রুদের উৎপীড়ন থেকে আত্মরক্ষা করা আঞ্জাহর সাহায্যের উপর নির্ভরশীল এবং আঞ্জাহর সাহায্য লাভ করার উত্তম পন্থা হচ্ছে নামায; যেমন কোরআন পাক বলে :

وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ

অর্থাৎ সবর ও নামায দ্বারা সাহায্য প্রার্থনা কর।

পাঞ্জেরানা নামাযের নির্দেশ : সাধারণ তফসীরবিদের মতে এ আয়াতটি পাঁচ ওয়াক্তের নামাযের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ নির্দেশ। কেননা, **لَوْك** শব্দের অর্থ, আসলে ঝুঁকে পড়া। সূর্যের ঝুঁকে পড়া তখন শুরু হয় যখন সূর্য পশ্চিমাকাশে চলে পড়ে, সূর্যাস্তকেও **لَوْك** বলা যায়। কিন্তু সাধারণ সাহাবী ও তাবয়ীগণ এ স্থলে শব্দের অর্থ সূর্যের চলে পড়াই নিয়েছেন।—(কুরত্ববী, মাযহারী, ইবনে কাসীর)

**غَسَقَ** — **إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ** শব্দের অর্থ রাত্রির অন্ধকার সম্পূর্ণ হয়ে যাওয়া।

ইমাম মালিক হযরত ইবনে আব্বাস থেকে এ তফসীর বর্ণনা করেছেন।

এভাবে **لَوْكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ** এর মধ্যে চারটি নামায

এসে গেছে : যোহর, আসর, মাগরিব ও এশা। এদের মধ্যে দু'নামাযের প্রথম ওয়াক্তও বলে দেওয়া হয়েছে যে, যোহরের প্রথম ওয়াক্ত সূর্য চলার সময় থেকে শুরু হয় এবং এশার সময় **غَسَقِ لَيْلٍ** অর্থাৎ অন্ধকার পূর্ণ হয়ে গেলে হয়। একারণেই ইমাম আমর আবু হানীফা সে সময়কে এশার ওয়াক্তের শুরু সাব্যস্ত করেছেন, যখন সূর্যাস্তের লাল আভার পর সাদা আভাও অন্তর্ভুক্ত হয়। এটা সবারই জানা যে, সূর্যাস্তের পর পর পশ্চিম দিগন্তে লাল আভা দেখা দেয়। এরপর এক প্রকার সাদা আভা দিগন্তে ছড়িয়ে থাকে। এরপর এই সাদা আভাও অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। বলা বাহুল্য, দিগন্তের শুভ্র আভা শেষ

হয়ে গেলেই রাশ্বির অন্ধকার পূর্ণতা লাভ করে। তাই আয়াতের এই শব্দের মধ্যে ইমাম আবু হানিফার মাহহাবের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। অন্য ঈমামগণ লাল আভা অঙ্কিত হওয়াকে এশার ওয়াস্তের শুরু সাব্যস্ত করেছেন এবং একই **فَسَقَّ اللَّيْلُ** এর তফসীর স্থির করেছেন।

<sup>٨-٨</sup> <sup>١٨-١</sup> **قُرْآنَ الْفَجْرِ** — এখানে **قُرْآن** শব্দ বলে নামায বোঝানো হয়েছে।

কেননা, কোরআন নামাযের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। ইবনে কাসীর, কুরতুবী, মাহহাবী প্রমুখ অধিকাংশ তফসীরবিদ এ অর্থই লিখেছেন। কাজেই আয়াতের অর্থ এই দাঁড়ায় যে,

<sup>٨٥</sup> <sup>٨٥</sup> <sup>٨٥</sup> **نُورِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ** বাক্যে চার নামাযের বর্ণনা ছিল এবং এতে

পঞ্চম নামাযের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। একে আলাদা করে বর্ণনা করার মধ্যে এই নামাযের বিশেষ গুরুত্ব ও ফযীলতের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে।

<sup>٨٥</sup> <sup>٨٥</sup> **شَاهِدَاتٍ مِّنْهُنَّ** — শাহাদাত থেকে এর উৎপত্তি। অর্থ, উপস্থিত হওয়া

সহীহ হাদীসসমূহের বর্ণনা অনুযায়ী এ সময় দিবা-রাশ্বির উত্তর দল ফেরেশতা নামাযে উপস্থিত হয়। তাই একে **مَشْهُودٌ** বলা হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতে পাঞ্জগানা নামাযের নির্দেশ সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। এর পূর্ণ তফসীর ও ব্যাখ্যা রসূলুল্লাহ্ (স) কথা ও কাজ দ্বারা ব্যক্ত করেছেন। এই ব্যাখ্যা গ্রহণ না করা পর্যন্ত কোন ব্যক্তি নামায আদায়ই করতে পারে না। জানিনা, হাদীস কোরআনকে হাদীস ও রসূলের বর্ণনা ছাড়াই বোঝার দাবী করে তারা নামায কিভাবে পড়ে? এমনভাবে এ আয়াতে নামাযে কোরআন পাঠের কথাও সংক্ষেপে উল্লিখিত হয়েছে। এর বিবরণ রসূলুল্লাহ্ (স)-র কথা ও কাজ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে; অর্থাৎ ফজরের নামাযে সামর্থ্যানুযায়ী দীর্ঘ কিরাআত করতে হবে। মাগরিবে দীর্ঘ কিরাআত এবং ফজরে সংক্ষিপ্ত কিরাআতের কথা কোন কোন রেওয়াজেতে বর্ণিত হয়েছে; কিন্তু তা কার্যত পরিত্যক্ত। সহীহ মুসলিমের যে রেওয়াজেতে মাগরিবের নামাযে সূরা আ'রাক, মুর-সালাত ইত্যাদি দীর্ঘ সূরা পাঠ করা এবং ফজরের নামাযে শুধু 'কুল আউযু বিরাশ্বিল ফালাক' ও 'কুল আউযু বিরাশ্বিল্লাস' পাঠ করার কথা বর্ণিত আছে, ইমাম কুরতুবী সেই রেওয়াজেতে উদ্ধৃত করে বলেছেন :

**فَمَرَوْا بِالْعَمَلِ وَالْإِذَا عَلَى مَعَانِهَا لِلتَّوْبِيلِ وَبِأَمْرٍ لَا ثَمَّةَ**

**بِالتَّخْفِيفِ** — অর্থাৎ মাগরিবে দীর্ঘ কিরাআত ও ফজরে সংক্ষিপ্ত কিরাআতের এসব কদাচিৎ ঘটনা রসূলুল্লাহ্ (স)-র সার্বজনিক আমল ও মৌখিক উক্তি দ্বারা পরিত্যক্ত।

তাহাজ্জুদ নামাযের সময় ও বিধানাবলী : **وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ**

শব্দটি **تَهَجَّد** থেকে উদ্ভূত। নিদ্রা যাওয়া ও জাগ্রত হওয়া এই পরস্পর-বিরোধী দুই অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়। আয়াতের অর্থ এই যে, রাত্তির কিছু অংশে কোরআন পাঠসহ জাগ্রত থাকুন। কেননা, ১১- এর সর্বনাম দ্বারা কোরআন বোঝানো হয়েছে। (মাযহারী) কোরআন পাঠসহ জাগ্রত থাকার অর্থ নামায পড়া। এ কারণেই শরীয়তের পরিভাষায় রাত্তিকালীন নামাযকে 'নামাযে তাহাজ্জুদ' বলা হয়। সাধারণত এর অর্থ এরূপ নেওয়া হয় যে, কিছুকণ নিদ্রা হওয়ার পর যে নামায পড়া হয় তাই তাহাজ্জুদের নামায। কিন্তু তফসীর মাযহারীতে রয়েছে, আয়াতের অর্থ এতটুকুই যে, রাত্তির কিছু অংশ নামায পড়ার জন্য নিদ্রা ত্যাগ কর। কিছুকণ নিদ্রা যাওয়ার পর জাগ্রত হয়ে নামায পড়লে যেমন এই অর্থ ঠিক থাকে, তেমনি প্রথমেই নামাযের জন্য নিদ্রাকে পিছিয়ে নিলেও এ অর্থের ব্যতিক্রম হয় না। তাই তাহাজ্জুদের জন্য প্রথমে নিদ্রা যাওয়ার শর্ত কোরআনের অভিপ্রেত অর্থ নয়। এরপর কোন কোন হাদীস দ্বারা তাহাজ্জুদের এই সাধারণ অর্থ প্রমাণ করা হয়েছে।

ইবনে কাসীর হযরত হাসান বসরী (রহ) থেকে তাহাজ্জুদের যে সংজ্ঞা উদ্ধৃত করেছেন, তাও এই ব্যাপক অর্থের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। ইবনে কাসীর লেখেন :

**قال الحسن البصري هو ما كان بعد العشاء ويكمل على ما كان بعد النوم**

অর্থাৎ হযরত হাসান বসরী বলেন : এশার পরে পড়া হয় এমন প্রত্যেক নামাযকে তাহাজ্জুদ বলা যায়। তবে প্রচলিত পদ্ধতির কারণে কিছুকণ নিদ্রা যাওয়ার পর পড়ার অর্থে বোঝা দরকার।

এর সারমর্ম এই যে, তাহাজ্জুদের আসল অর্থে নিদ্রার পরে হওয়ার শর্ত নেই এবং কোরআনের ভাষায়ও এরূপ শর্তের অস্তিত্ব নেই ; কিন্তু সাধারণত রসূলুল্লাহ (সা) ও সাহাবায়ে কিরাম শেমরাতে জাগ্রত হয়ে তাহাজ্জুদের নামায পড়তেন। তাই এভাবে পড়াই উত্তম হবে।

তাহাজ্জুদ ফরয না নফল ? : **نَا فَلَةٌ نَفْلٌ** শব্দের আভি-

ধানিক অর্থ অতিরিক্ত। একারণেই যেসব নামায ও সদকা-খয়রাত ওয়াজিব ও জরুরী নয়—করলে সওয়াব পাওয়া যায় এবং না করলে গোনাহ্ নাই, সেগুলোকে নফল বলা হয়। আয়াতে নামাযে তাহাজ্জুদের সাথে **نَا فَلَةٌ لَكَ** শব্দ সংযুক্ত হওয়ার বাহ্যত বোঝা যায় যে, তাহাজ্জুদের নামায বিশেষভাবে রসূলুল্লাহ (সা)-র জন্য নফল। অথচ এটা সমগ্র উম্মতের জন্যও নফল। এজন্যই কোন কোন তফসীরবিদ এখানে **نَا فَلَةٌ** শব্দটিকে **فَرِيضَةٌ** এর বিশেষণ সাব্যস্ত করে অর্থ এরূপ স্থির করেছেন যে, সাধারণ



উম্মতের ওপর তো শুধু পাঞ্জগানা নামামই ফরয; কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা) র ওপর তাহাজ্জুদও একটি অতিরিক্ত ফরয। অতএব এখানে **فَلَا** শব্দের অর্থ, অতিরিক্ত ফরয — নফলের সাধারণ অর্থে নয়।

এ ব্যাপারে সৃষ্টিত বক্তব্য এই যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে যখন সূরা মুযাশেমল অবতীর্ণ হয়, তখন পাঞ্জগানা নামাম ফরয ছিল না, শুধু তাহাজ্জুদের নামাম সবার ওপর ফরয ছিল। সূরা মুযাশেমলে এর উল্লেখ রয়েছে। এরপর শবে মি'রাজে যখন পাঞ্জগানা নামাম ফরয করা হয়, তখন তাহাজ্জুদের ফরয নামাম সাধারণ উম্মতের পক্ষে সর্বসম্মতিক্রমে রহিত হয়ে যায় এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পক্ষেও রহিত হয় কি না, সে ব্যাপারে মতভেদ থেকে যায়। আলোচ্য আয়াতের **فَلَا لِي** বাক্যের অর্থ তাই এই যে, তাহাজ্জুদের নামাম রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পক্ষে একটি অতিরিক্ত ফরয। কিন্তু তফসীরে কুরতুবীতে কয়েক কারণে এ বক্তব্যকে অস্বীকার করা হয়েছে। এক ফরযকে নফল শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করার কোন কারণ নেই। যদি রূপক অর্থ বলা হয়, তবে এটি এমন একটি রূপক অর্থ হবে, যার কোন প্রকৃত অর্থ নেই। দুই. সহীহ্ হাদীসসমূহে শুধু পাঞ্জগানা নামাম ফরয হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং এক হাদীসের শেষে একথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, শবে মি'রাজে প্রথমে পঞ্চাশ ওয়াজ নামাম ফরয করা হয়েছিল। অতঃপর তা হ্রাস করে পাঁচ ওয়াজ করে দেওয়া হয়। এখানে যদিও সংখ্যা হ্রাস করা হয়েছে; কিন্তু সওয়াব পঞ্চাশ ওয়াজেরই পাওয়া যাবে। এরপর বলা হয়েছে :

— لَا يَبْدُلُ الْقَوْلَ لَدِي

অর্থাৎ আমার কথা পরিবর্তিত হয় না। যখন পঞ্চাশ

ওয়াজের নির্দেশ দিয়েছিলাম, তখন সওয়াব পঞ্চাশ ওয়াজেরই দেওয়া হবে, যদিও কাজ হালকা করে দেওয়া হয়েছে।

এসব রেওয়াজের সারমর্ম এই যে, সাধারণ উম্মত এবং রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উপর পাঞ্জগানা নামাম ছাড়া কোন নামাম ফরয ছিল না। আরও এক কারণ এই যে, **فَلَا** শব্দটি যদি এখানে অতিরিক্ত ফরযের অর্থে হত, তবে এর পরে **لِي** শব্দের পরিবর্তে **عَلَيْكَ** হওয়া উচিত ছিল, যা ওয়াজিব হওয়ার অর্থ দেয়। **لِي** তো শুধু জায়েয হওয়া ও অনুমতির অর্থ বুঝায়।

তফসীর মাযহাবীতে এ ব্যাখ্যাকেই বিস্বস্ত বলা হয়েছে। অর্থাৎ তাহাজ্জুদের ফরয নামাম যখন উম্মতের পক্ষে রহিত হয়ে যায়, তখন তা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র পক্ষেও রহিত হয়ে যায় এবং সবার জন্য নফল থেকে যায়। কিন্তু এমতাবস্থায় প্রশ্ন দেখা দেয় যে, তাহলে **فَلَا لِي** বলার কি মানে হবে? তাহাজ্জুদ তো সবার জন্যই নফল। এতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র বৈশিষ্ট্য কি? উত্তর এই যে, হাদীসসমূহের বর্ণনা অনুযায়ী সমগ্র উম্মতের নফল ইবাদত তাদের গোনাহের কাফফারী এবং ফরয নামাম-সমূহের ভুলি পূরণের উপকারে লাগে। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা) গোনাহ থেকে এবং ফরয

নামাযের ব্রুটি থেকেও মুক্ত। কাজেই তাঁর পক্ষে নফল ইবাদত সম্পূর্ণ অতিরিক্ত বৈ নয়। তাঁর নফল ইবাদত কোন ব্রুটি পূরণের জন্য নয়; বরং তা শুধু অধিক নৈকট্য লাভের উপায়।—(কুরতুবী, মায়হারী)

তাহাজ্জুদ নফল, না সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ : ফিকাহবিদদের মতে সুন্নতে মোয়াক্কাদাহর সাধারণ সংজ্ঞা এই যে, রসুলুল্লাহ্ (সা) যে কাজ স্থায়ীভাবে করেছেন এবং বিনা ওযরে ত্যাগ করেননি, তাই সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ। তবে যদি কোন শরীয়তসম্মত প্রমাণ দ্বারা বোঝা যায় যে, কাজটি একান্তভাবে রসুলুল্লাহ্ (সা)-রই বৈশিষ্ট্য—সাধারণ উশ্মতের জন্য নয়, তবে তা সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ নয়। এই সংজ্ঞার বাহ্যিক তাগিদ এই যে, তাহাজ্জুদও সবার জন্য সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ হওয়া চাই, শুধু নফল নয়। কেননা, তাহাজ্জুদের নামায স্থায়ীভাবে পড়া রসুলুল্লাহ্ (সা) থেকে মৃত্যুওয়াতির হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে এবং তাঁর বৈশিষ্ট্য হওয়ারও কোন প্রমাণ নেই। তুফসীরে মায়হারীতে একেই পছন্দনীয় ও অপ্রগণ্য উক্তি সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং এর পক্ষে হযরত ইবনে মাসউদের একটি হাদীসও প্রমাণ হিসেবে পেশ করা হয়েছে। হাদীসে রসুলুল্লাহ্ (সা)-কে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়, যে পূর্বে তাহাজ্জুদের নামায পড়ত এবং পরে ত্যাগ করে। তিনি উত্তরে বলেন : তার কর্ণকুহরে শয়তান পেশাব করে দিয়েছে। এ ধরনের বিরূপ মন্তব্য ও হুঁশিয়ারি শুধু নফলের জন্য হতে পারে না। এতে বোঝা যায় যে, তাহাজ্জুদের নামায সুন্নতে মোয়াক্কাদাহ।

যারা তাহাজ্জুদকে শুধু নফল মনে করেন, তারা স্থায়ীভাবে তাহাজ্জুদ পড়াকে রসুলুল্লাহ্ (সা)-র বৈশিষ্ট্য সাব্যস্ত করেছেন। উপরোক্ত হাদীসে তাহাজ্জুদ তরক করার কারণে রসুলুল্লাহ্ (সা) যে বিরূপ মন্তব্য করেছেন, এটা প্রকৃতপক্ষে নিছক তরক করার কারণে নয়; বরং প্রথমে অভ্যাস গড়ে তোলার পর তরক করার কারণে। কেননা, একবার কোন নফলের অভ্যাস করার পর তা নিয়মিতভাবে পালন করে যাওয়া সবার মতেই বাঞ্ছনীয়। অভ্যাস গড়ে তোলার পর ত্যাগ করা নিন্দনীয়। কেননা, অভ্যাসের পর বিনা ওযরে ত্যাগ করা এক প্রকার বিমুখতার লক্ষণ। যে ব্যক্তি প্রথম থেকেই অভ্যাস করে না, সে নিন্দার পাত্র নয়।

তাহাজ্জুদের রাকআত সংখ্যা : সহীহ বুখারী ও মুসলিমের রেওয়াজেতে হযরত আয়েশা (রা) বলেন : রসুলুল্লাহ্ (সা) রমযানে অথবা রমযানের বাইরে কোন সময় এগার রাকআতের বেশি পড়তেন না। তন্মধ্যে হানাফীদের মতে তিন রাকআত ছিল বিত্তরের নামায এবং অবশিষ্ট আট রাকআত তাহাজ্জুদের।

মুসলিমের অপর এক রেওয়াজেতে হযরত আয়েশা (রা) বলেন : রসুলুল্লাহ্ (সা) রাতে তের রাকআত পড়তেন। বিত্তরের তিন রাকআত এবং ফজরের দুই রাকআত সুন্নতও এর অন্তর্ভুক্ত (মায়হারী) রমযানের কারণে ফজরের সুন্নতকে রাষ্ট্রিকালীন নামাযের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে। এসব রেওয়াজেত থেকে জানা গেল যে, তাহাজ্জুদের নামায আট রাকআত পড়াই রাসুলুল্লাহ্ (সা)-র সাধারণ অভ্যাস ছিল।

কিন্তু হযরত আয়েশা (রা)-রই অপরা এক রেওয়াজেতে থেকে জানা যায় যে, মাঝে মাঝে উপরোক্ত সংখ্যা থেকে কম চার অথবা ছয় রাকআতও পড়েছেন, যেমন সহীহ বুখারীর রেওয়াজেতে মস্কুক (রা) হযরত আয়েশাকে তাহাজ্জুদের নামায সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন : সাত, নয় ও এগার রাকআত হত ফজরের সূন্নত ছাড়া। (মাযহারী) হানাফী নিয়ম অনুযায়ী বেতেনের তিন রাকআত বাদ দিলে সাতের মধ্যে চার, নয়র মধ্যে ছয় এবং এগারর মধ্যে আট তাহাজ্জুদের রাকআত থেকে যায়।

তাহাজ্জুদের নামায পড়ার নিয়ম : বিভিন্ন হাদীস থেকে যা প্রমাণিত আছে, তা এই যে, প্রথমে দু'রাকআত হালকা ও সংক্ষিপ্ত কিরাআতে অতঃপর অবিশিষ্ট রাকআত-গুলোতে কিরাআতও দীর্ঘ এবং রুকু-সিজদাও দীর্ঘ করা হত। মাঝে মাঝে খুব বেশি দীর্ঘ করা হত এবং মাঝে মাঝে কম। (এ হচ্ছে ঐসব হাদীসের সংক্ষিপ্ত সার, যেগুলো তফসীর মাযহারীতে উদ্ধৃত করা হয়েছে।)

‘মকামে মাহমুদ’ : আলোচ্য আয়াতে রসূলুল্লাহ (সা)-কে মকামে মাহমুদের ওয়াদা দেওয়া হয়েছে। এই মকাম রসূলুল্লাহ (সা)-র জন্যই বিশেষভাবে নির্দিষ্ট—অন্য কোন পয়গম্বরের জন্য নয়। এর তফসীর প্রসঙ্গে বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে। সহীহ হাদীসসমূহে স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণিত আছে যে, এ হচ্ছে শাফাআতে কুবরার মকাম। হাশরের ময়দানে যখন সমগ্র মানব জাতি একত্রিত হবে এবং প্রত্যেক পয়গম্বরের সমীপে শাফাআতের দরখাস্ত করবে, তখন সব পয়গম্বরই ওয়র পেশ করবেন। একমাত্র রসূলুল্লাহ (সা)-ই এই মহান সম্মান লাভ করবেন এবং সমগ্র মানবজাতির জন্য শাফাআত করবেন। এ সম্পর্কে ইবনে কাসীর ও তফসীর মাযহারীতে লিখিত রেওয়াজেতে সমূহের বিবরণ নাস্তির্দীর্ঘ।

পয়গম্বর ও সৎলোকদের শাফাআত গ্রহণীয় হবে : ইসলামী উপদল সমূহের মধ্যে খারিজী ও মুতাযিলা সম্প্রদায় পয়গম্বরদের শাফাআত স্বীকার করে না। তারা বলে : কবিরা গোনাহ কারও শাফাআত দ্বারা মাফ হবে না। কিন্তু মুতাযিলাতির হাদীসসমূহ সাক্ষ্য দেয় যে, পয়গম্বরগণের এমন কি, সৎলোকদেরও শাফাআত গোনাহগারদের পক্ষে কবুল করা হবে। অনেক মানুষের গোনাহ শাফাআতের ফলে মাফ হয়ে যাবে।

ইবনে মাজা ও বায়হাকীতে হযরত উসমান (রা)-এর রেওয়াজেতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সা) বলেন : কিরাআতের দিন সর্বপ্রথম পয়গম্বরগণ গোনাহগারদের জন্য শাফাআত করবেন, এরপর আলিমগণ, এরপর শহীদগণ শাফাআত করবেন। দায়গমী হযরত ইবনে উমরের রেওয়াজেতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (সা) বলেন : “আজিমকে বলা হবে, আপনি স্বীয় শিষ্যদের জন্য শাফাআত করতে পারেন, যদিও তাদের সংখ্যা আকাশের তারকাসমূহের সমান।”

আবু দাউদ ও ইবনে হাইয়ান আবুদারদার রেওয়াজেতে রসূলুল্লাহ (সা)-র উক্তি বর্ণনা করেন যে, শহীদের শাফাআত তার পরিবারের সত্ত্ব জনের জন্য কবুল করা হবে।

হযরত আবু উমামার স্নেহমায়েতে বর্ণিত এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন : আমার উম্মতের এক ব্যক্তির শাফায়াতের ফলে রবিয়া ও মুযার গোত্রের সমগ্র জন-গোষ্ঠীর চাইতে বেশী লোক জাহা্মাতে প্রবেশ করবে।—(মসনদে আহমদ, তাবারানী, বায়হাকী)।

একটি প্রশ্ন ও উত্তর : এখানে প্রশ্ন হয় যে, যখন স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সা) শাফাআত করবেন এবং তাঁর শাফাআতের ফলে কোন ঈমানদার দোষে থাকবে না, তখন আলিম ও সৎলোকদের শাফাআত কেন এবং কিভাবে হবে? তফসীর মাযহাবীতে বলা হয়েছে, সম্ভবত আলিম ও সৎলোকদের মধ্যে যারা শাফাআত করতে চাইবেন, তাঁরা নিজ নিজ শাফাআত রসূলুল্লাহ (সা)-র কাছে পেশ করবেন। এরপর রসূলুল্লাহ (সা) আল্লাহর দরবারে শাফাআত করবেন।

ফায়দা : এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন : **شفا عتي لا هل الكبا ئر** অর্থাৎ আমার শাফাআত তাদের জন্য হবে, আমার উম্মতের মধ্যে থেকে যারা কবীরা গোনাহ করেছিল। এ থেকে বাহ্যত জানা যায় যে, রসূলুল্লাহ (সা) বিশেষভাবে কবীরা গোনাহগারদের জন্য শাফাআত করবেন। কোন ক্ষেত্রশতা অথবা উম্মতের কোন ব্যক্তি তাদের জন্য শাফাআত করতে পারবে না। বরং উম্মতের সৎকর্মশীলদের শাফাআত সগীরা গোনাহগারদের জন্য হবে।

শাফাআতের মর্তবা অর্জনে তাহাজ্জুদের নামাযের বিশেষ প্রভাব আছে : হযরত মুজাদ্দিদ আলফেসানী (র) বলেন : এ আয়াতে রসূলুল্লাহ (সা)-কে প্রথমে তাহাজ্জুদের নামায পড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে; অতঃপর মকামে মাহমুদ অর্থাৎ শাফাআতে কুবরার ওয়াদা করা হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় যে, শাফাআতের মর্তবা অর্জনে তাহাজ্জুদের নামাযের বিশেষ প্রভাব বিদ্যমান।

**وَقُلْ رَبِّ ادْخُلْنِي**—পূর্ববর্তী আয়াতসমূহের মধ্যে প্রথমে মক্কার কাফিরদের

উৎপীড়ন এবং রসূলুল্লাহ (সা)-কে কষ্ট দেওয়ার অপকৌশলের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। এর সাথে একথাও বলা হয়েছিল যে, তাদের এসব অপকৌশল সফল হবে না। তাদের মুকাবিলায় রসূলুল্লাহ (সা)-কে আসল তদবীরের পর্যায়ে শুধু পাঞ্জেশানা নামায কামেয় করা ও তাহাজ্জুদ পড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এরপর পরকালে তাঁকে সব পয়গম্বরের তুলনায় উচ্চ মকাম অর্থাৎ 'মকামে মাহমুদ' দান করার ওয়াদা করা হয়েছে; এ ওয়াদা পরকালে পূর্ণ হবে। আলোচ্য **وَقُلْ رَبِّ ادْخُلْنِي** আয়াতে আল্লাহ তা'আলা

ইহকালেই রসূলুল্লাহ (সা)-কে কাফিরদের দুরভিসন্ধি ও উৎপীড়ন থেকে মুক্তি দেওয়ার কৌশল মদীনায হিজরতের আকারে ব্যক্ত করেছেন, অতঃপর **وَقُلْ جَاءَ لَكُمْ**— আয়াতে মক্কা বিজয়ের সুসংবাদ দান করেছেন।

তিরমিশীর রিওয়ামাতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সা) মক্কায় ছিলেন, অতঃপর তাঁকে মদীনায় হিজরত করার নির্দেশ দেওয়া হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত নাযিল হয় :

وَ قُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مَدْخُلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مَخْرَجَ صِدْقٍ

এখানে -এর অর্থ, প্রকাশ করার স্থান ও বহির্গমনের স্থান। উভয়ের সাথে মখ্ৰজ মَدْخُلُ صِدْقٍ বিশেষণ মুক্ত হওয়ার অর্থ এই যে, এই প্রবেশ ও বহির্গমন সব আল্লাহ্‌র ইচ্ছানুযায়ী উত্তম পন্থায় হোক। কেননা, আরবী ভাষায় صِدْقُ এমন কাজের জন্য ব্যবহৃত হয়, যা বাহ্যত ও অন্তরগত উভয় দিক দিয়ে সঠিক ও উত্তম হবে। কোরআন পাকে مَقْعَدٌ صِدْقٍ وَّ لِسَانٌ صِدْقٍ قَدَمٌ صِدْقٍ শব্দগুলো এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

‘প্রবেশ করার স্থান’ বলে মদীনা এবং বহির্গমনের স্থান বলে মক্কা বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, হে আল্লাহ্ মদীনায় আমার প্রবেশ উত্তমভাবে সম্পন্ন হোক। সেখানে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘেন না ঘটে এবং মক্কা থেকে আমার বের হওয়া উত্তমভাবে সম্পন্ন হোক। মাতৃভূমি এবং বাড়ী-ঘরের মহত্বতে অন্তর যেন জড়িয়ে না পড়ে। এই আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে আরও বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত রয়েছে। কিন্তু এই তফসীরটি হযরত হাসান বসরী ও কাভাদাহ্ থেকে বর্ণিত রয়েছে। ইবনে কাসীর একে সর্বাধিক বিস্তৃত তফসীর আখ্যা দিয়েছেন। ইবনে জরীরও এ তফসীরই গ্রহণ করেছেন। তবে এখানে প্রথমে বহির্গমনের স্থান ও পরে প্রবেশ করার স্থান উল্লেখ করা সঙ্গত ছিল। এই ক্রম উক্তিটিকে দেয়ার মধ্যে সঙ্গত ইঙ্গিত রয়েছে যে, মক্কা থেকে বের হওয়া স্বয়ং কোন লক্ষ্য ছিল না; বরং বায়তুল্লাহকে ত্যাগ করে যাওয়া অত্যন্ত বেদনাদায়ক বিষয় ছিল। অবশ্য ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য শান্তির আবাসস্থল খোঁজ করা ছিল এখানে লক্ষ্য। মদীনা প্রবেশের মাধ্যমে এ লক্ষ্য অর্জিত হওয়ার আশা ছিল। তাই লক্ষ্যবস্তুকেই অগ্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যের জন্য মক্কুল দোয়া : হিজরতের সময় আল্লাহ্ তা‘আলা রসূলুল্লাহ (সা)-কে এ দোয়াটি শিক্ষা দেন যে, মক্কা থেকে বহির্গমন এবং মদীনায় পৌঁছা উভয়টি উত্তমভাবে ও নিরাপদে সম্পন্ন হোক। এ দোয়ার ফলেই হিজরতের সময় পশ্চাচ্ছাবনকারী কাফিরদের কবল থেকে আল্লাহ্ তা‘আলা-তাঁকে প্রতি পদক্ষেপে বাঁচিয়ে রেখেছেন এবং মদীনাকে বাহ্যত ও অন্তরগত উত্তম দিক দিয়েই তাঁর জন্য ও মুসলমানদের জন্য উপযোগী করেছেন। এ কারণেই কোন খালিম বলেন : এই দোয়াটি লক্ষ্য অর্জনের গুরুতে প্রত্যেক মুসলমানদের মনে রাখা উচিত। প্রত্যেক লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে দোয়াটি

উপকারী। গল্পবতী বাক্য **وَأَجْعَلْ لِّي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا** এ

দোয়ায়ই পরিশিষ্ট। হযরত কাতাদাহ্ বলেন : রসুলুল্লাহ্ (সা) জানতেন যে, শত্রুদের চক্রান্ত-জালের মধ্যে অবস্থান করে রিসালতের কর্তব্য পালন সাধ্যতীত ব্যাপার। তাই তিনি আল্লাহর দরবারে বিজয় ও সাহায্যের দোয়া করেন, যা কবুল হয় এবং এর শুভফল সবার দৃষ্টিগোচর হয়।

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ —এ আয়াতটি হিজরতের পর মক্কা

বিজয় সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন : মক্কা বিজয়ের দিন রসুলুল্লাহ্ (সা) যখন মক্কায় প্রবেশ করেন, তখন বায়তুল্লাহর চতুর্দিকে তিন শ' মাটি মুঠি ছাপিত ছিল। এই বিশেষ সংখ্যার কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে কোন কোন আলিম বলেন : বছরের প্রত্যেক দিনের জন্য মুশরিকদের আলাদা আলাদা মুঠি ছিল এবং তারা প্রত্যহ নির্ধারিত মুঠিরই উপাসনা করত। (কুরতুবী) রসুলুল্লাহ্ (সা) যখন সেখানে পৌছেন,

তখন তাঁর মুখে এ আয়াতটি উচ্চারিত হচ্ছিল : جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ এবং

তিনি স্বীয় ছড়ি দ্বারা প্রত্যেক মুঠির বন্ধে আঘাত করে যান্ধিলেন। (বুখারী, মুসলিম)

কোন কোন রেওয়াজে রয়েছে, ঐ ছড়ির নিচ দিকে রাসলতা অথবা জোহার রজত ছিল। রসুলুল্লাহ্ (সা) যখন কোন মুঠির বন্ধে আঘাত করতেন, তখন তা উল্টে পড়ে যেত। এভাবে সব মুঠিই ভুমিসাৎ হয়ে যায়। অতঃপর তিনি সেগুলো ভেঙ্গে চূরনার করার আদেশ দেন।—(কুরতুবী)

শিরক ও কুফরের চিহ্ন মিটিলে দেওয়া ওয়াজিব : ইমাম কুরতুবী বলেন : এ আয়াতে প্রমাণ রয়েছে যে, মুশরিকদের মুঠি ও অন্যান্য মুশরিকসুলভ চিহ্ন মিটিয়ে দেওয়া ওয়াজিব। যেসব হাতিয়ার যন্ত্রপাতি গোনাহর কাজে ব্যবহৃত হয়, সেগুলো মিটিয়ে দেওয়াও এ নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত। ইবনে মুনিয়র বলেন : কাঠ, পিতল ইত্যাদি দ্বারা নির্মিত চিত্র ও ভাস্কর্য শিল্পও মুঠির অন্তর্ভুক্ত। রসুলুল্লাহ্ (সা) স্বপ্নবেরোর চিত্র অংকিত পর্দা হিঁড়ে ফেলেছিলেন। এ থেকে সাধারণ চিত্রের বিধান জানা যায়। হযরত ঈসা (আ) যখন শেষ সমানায় আগমন করবেন, তখন সহীহ্ হাদীস অনুযায়ী খৃষ্টানদের ক্রুশ ভেঙ্গে দেবেন এবং শূকর হত্যা করবেন। শিরক, কুফর ও বাতিলের আসবাবপত্র ভেঙ্গে দেওয়া যে ওয়াজিব, এসব বিষয় তারই প্রমাণ।

وَلَقَدْ لُمْنَا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شَاءَ —কোরআন পাক যে অন্তরের ঔষধ

এবং শিরক, কুফর, কুচরিত্র ও আত্মিক রোগসমূহ থেকে মনের মুক্তিদাতা, এটা সর্বজন স্বীকৃত সত্য। কোন কোন আলিমের মতে কোরআন যেমন আত্মিক রোগসমূহের ঔষধ,

তেমনি বাহ্যিক রোগসমূহের অমোঘ ব্যবস্থাপত্র। কোরআনের আয়াত পাঠ করে রোগীর গায়ে হুঁ দেওয়া এবং তাবিজ লিখে গলায় খুলানো বাহ্যিক রোগ নিরাময়ের কারণ হয়ে থাকে। হাদীসের অনেক রেওয়াজেও এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। আবু সাঈদ খুদরী'র এই হাদীস সব প্রস্থেই বিদ্যমান দেখা যায় যে, সাহাবীদের একটি দল একবার সফররত ছিলেন। কোন এক গ্রামের জনৈক এক সন্ন্যাসকে বিষ্ণু দংশন করলে লোকেরা সাহাবীদের কাছে জিজ্ঞেস করল : আপনারা এই রোগীর চিকিৎসা করতে পারেন কি? সাহাবীরা সাতবার সূরা ফাতিহা পাঠ করে রোগীর গায়ে হুঁ দিলে রোগী সুস্থ হয়ে যায়। এরপর রসূলুল্লাহ (সা)-র কাছে ঘটনা বর্ণনা করা হলে তিনি এ কার্যক্রমকে জামে'হ বলে মত প্রকাশ করেন।

এমনিভাবে আরও অনেক হাদীস থেকে স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সা)-র 'কুল আউযু' শীর্ষক সূরা সমূহ পাঠ করে হুঁ দেওয়ার প্রমাণ পওয়া যায়। সাহাবী ও তাবয়ীগণও কোরআনের আয়াত দ্বারা রোগীর চিকিৎসা করেছেন বলে প্রমাণিত আছে। এ আয়াতের অধীনে কুরতুবী এর বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন।

وَلَا يَزِيدُ الْفَاسِقِينَ إِلَّا خَسَارًا—এ থেকে জানা যায় যে, বিশ্বাস ও

ভক্তি সহকারে কোরআন পাঠ করলে যেমন কোরআন রোগের চিকিৎসা হয়ে থাকে তেমনি অশিষ্টতা এবং কোরআনের প্রতি খুঁটত্যা প্রদর্শন ক্ষতি ও বিপদাপদের কারণও হয়ে থাকে।

وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَىٰ نَاسٍ أَعْرَضُوا وَإِذَا آتَيْنَاهُم مِّنَّا فَكَّرُوا أَنَّكُم مِّنَّا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَىٰ نَاسٍ أَعْرَضُوا وَإِذَا آتَيْنَاهُم مِّنَّا فَكَّرُوا أَنَّكُم مِّنَّا  
 قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ  
 أَهْدَىٰ سَبِيلًا

(৮৩) আমি মানুষকে নিয়ামত দান করলে সে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং অহংকারে দূরে সরে যায়; যখন তাকে কোন অনিষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে একেবারে হতাশ হয়ে পড়ে। (৮৪) বলুন : প্রত্যেকই নিজ রীতি অনুযায়ী কাজ করে। অতঃপর আপনার পালনকর্তা বিশেষরূপে জানেন, কে সর্বাপেক্ষা নিতুল পথে আছে।

**তফসীরের সার-সংক্ষেপ**

এবং (কতক) মানুষ (অর্থাৎ কাফির এমন যে, তাদের)-কে যখন আমি নিয়ামত দান করি, তখন (আমার দিক থেকে এবং আমার নির্দেশাবলীর দিক থেকে তারা) মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং পাশ কেটে যায় এবং যখন তাদেরকে কোন কষ্ট স্পর্শ করে, তখন (রহমত থেকে সম্পূর্ণ) নিরাশ হয়ে যায়। (উজ্জ্বল অবস্থা আল্লাহর সাথে সম্পর্কহীনতার

প্রমাণ। এটাই কুফর ও পথভ্রষ্টতার ভিত্তি।) আপনি বলে দিন : (‘মু’মিন কাফির, সৎ লোক ও অসৎ লোকদের মধ্য থেকে) প্রত্যেকেই নিজ রীতি অনুযায়ী কাজ করছে (অর্থাৎ নিজ নিজ বিস্তৃত্ত বিবেক-বুদ্ধি অবলম্বন করছে এবং জ্ঞান অথবা মুশ্বতার ভিত্তিতে বিভিন্ন স্ব-ম-কাজ করছে।) অতএব, আপনার পালনকর্তা বিশেষভাবে জানেন, কে অধিক সঠিক পথে আছে। (এমনিভাবে যে সঠিক পথে নয়, তাকেও জানেন। তিনি প্রত্যেককে তার কর্ম অনুযায়ী প্রতিদান অথবা শাস্তি দেবেন। এরূপ নয় যে, যার মনে চাইবে কোন প্রমাণ ব্যক্তিকে নিজেই সঠিক পথের অনুসারী মনে করবেন।)

### আনুমানিক জাতব্য বিষয়

كُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ—এখানে كَلَّمَ শব্দের তফসীর প্রসঙ্গে স্বভাব,

অভ্যাস, প্রকৃতি, নিয়ত, রীতি ইত্যাদি বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত রয়েছে। সবগুলোর সারমর্ম, পরিবেশ। অভ্যাস এবং প্রথা ও প্রচলনের দিক দিয়ে প্রত্যেক মানুষের একটি অভ্যাস ও মানসিকতা গড়ে উঠে। এই অভ্যাস ও মানসিকতা অনুযায়ী তার কাজকর্ম হয়ে থাকে। —(কুরতুবী) এতে মানুষকে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, মন্দ পরিবেশ, মন্দ সংসর্গ ও মন্দ অভ্যাস থেকে বিরত থাকা দরকার এবং সৎ লোকদের সংসর্গ ও সৎ অভ্যাস গড়ে তোলা উচিত। (জাসসাস) কেননা, পরিবেশ সংসর্গ এবং প্রথা ও প্রচলিত রীতি দ্বারা মানুষের যে স্বভাব গড়ে উঠে, তার প্রত্যেক কাজ তদনুযায়ীই হয়ে থাকে। ইমাম জাসসাস এখানে كَلَّمَ-এর এক অর্থ, সমজ্ঞাপন্নও উল্লেখ করেছেন। এদিক দিয়ে আশ্রিতের উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তি তার সমজ্ঞাপন্ন ব্যক্তির সাথে অন্তরঙ্গ হয়। সাধু সাধুর সাথে এবং দুশ্চরিত্রের সাথে অন্তরঙ্গ হয় এবং তারই কর্মপন্থা অনুসরণ করে, আশ্রিত তা'আলার নিশেনাজ উক্তি এর নজীর :

أَلْكَفِيئَاتُ لِلْكَفِيئِينَ وَاللَّطِيئَاتُ لِلطَّيِّبِينَ—অর্থাৎ মল্লট নারী মল্লট

পুরুষদের জন্য এবং পবিত্র নারী পবিত্র পুরুষদের জন্য। উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেকেই নিজ নিজ প্রকৃতির অনুরূপ পুরুষ ও নারীর সাথে অন্তরঙ্গ হয়। এর সারমর্মও এই যে, খারাপ সংসর্গ ও খারাপ অভ্যাস থেকে বিরত থাকার প্রতি স্বরবান হওয়া উচিত।

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ

الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَلَكِنَّ شِئْنَا لَنُدَّهِنَ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا

تَجِدُكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكَيْلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ

كَانَ عَلَيْكَ كَثِيرًا قُلْ لِّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ



يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ  
ظَهِيرًا ۝ وَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۚ  
فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۝

(৮৫) তারা আপনাকে 'রাহ্' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলে দিন : রাহ্ আমার পালনকর্তার আদেশঘটিত। এ বিষয়ে তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই দান করা হয়েছে। আমি ইচ্ছা করলে আপনার কাছে ওহীর মাধ্যমে যা প্রেরণ করেছি তা অবশ্যই প্রত্যাহার করতে পারিতাম। অতঃপর আপনি নিজের জন্য তা জানয়নের ব্যাপারে আমার মুকাবিলায় কোন দায়িত্ব বহনকারী পাবেন না। (৮৭) এ প্রত্যাহার না করা আপনার পালনকর্তার মেহেরবানি। নিশ্চয় আপনার প্রতি তাঁর করুণা বিরাট। (৮৮) বলুন : যদি মানব ও জিন এই কোরআনের অনুরূপ রচনা করে জানয়নের জন্য জড়ো হয়, এবং তারা পরম্পরের সাহায্যকারী হয়; তবুও তারা কখনও এর অনুরূপ রচনা করে জানতে পারবে না। (৮৯) আমি এই কোরআনে মানুষকে বিভিন্ন উপকার দ্বারা সব রকম বিষয়বস্তু বুঝিয়েছি। কিন্তু অধিকাংশ লোক অস্বীকার না করে থাকেনি।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং তারা আপনাকে (পরীক্ষার্থে) রাহ্ সম্পর্কে (অর্থাৎ রাহের স্বরূপ সম্পর্কে) জিজ্ঞেস করে। আপনি (উত্তরে) বলে দিন : রাহ্ (সম্পর্কে এতটুকু বুঝে নাও যে, সেটা এমন এক বস্তু, যা) আমার পালনকর্তার আদেশ দ্বারা গঠিত এবং (এর বিস্তারিত স্বরূপ সম্পর্কে) তোমাদেরকে খুব কম জ্ঞান (তোমাদের বোধশক্তি ও প্রয়োজন পরিমানে) দান করা হয়েছে। (রাহের স্বরূপ জানা আবশ্যকীয় বিষয় নয় এবং এর স্বরূপ সাধারণভাবে হৃদয়ঙ্গমও হতে পারে না। তাই কোরআন এর স্বরূপ বর্ণনা করে না।) যদি আমি ইচ্ছা করি, তবে আপনার কাছে যে পরিমাণ ওহী প্রেরণ করেছি (এবং এর মাধ্যমে আপনাকে জ্ঞান দান করেছি) সব উত্তিয়ে নিতে পারি। অতঃপর আপনি তার (এই ওহী ফিরিয়ে আনার) জন্য আমার মুকাবিলায় কোন সমর্থকও পাবেন না; কিন্তু (এটা) আপনার পালনকর্তারই দয়া (সে, এরূপ করেননি)। নিশ্চয় আপনার প্রতি তাঁর বড় করুণা। (উদ্দেশ্য এই যে, রাহ্ ইত্যাদির প্রত্যেক বস্তুর জ্ঞান হওয়ার দুইয়ের কথা, মানুষকে ওহীর মাধ্যমে যে যে-সামান্য জ্ঞান আল্লাহর পক্ষ থেকে দান করা হয়েছে, তাও তার কোন জাগ্রগর নয়। আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে দেয়ার পরও ফিরিয়ে নিতে পারেন। কিন্তু তিনি রহমতবশত এরূপ করেন না। কারণ এই যে, রসুলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি আল্লাহর বড় করুণা।) আপনি বলে দিন : যদি সমস্ত মানব ও জিন এই কোরআনের অনুরূপ কালাম রচনা করে আনার





পক্ষান্তরে ইবনে আব্বাসের রেওয়াজে অনুসারে প্রমাণ মন্সাজ করা হয়েছিল। এ দিক দিয়ে গোটা সুরার ন্যায় এ আয়াতটিও মন্সাজ। এ কারণেই ইবনে কাসীর এ সম্ভাবনা-কেই অগ্রাধিকার দিয়ে ইবনে মাসউদের হাদীসের উত্তরে বলেছেন যে, সম্ভবত এ আয়াতটি মদীনায় পূর্ববার নাছিল হয়েছে; স্বৈমন কোরআনের অনেক আয়াতের পূর্ববার অবতরণ সবার কাছেই স্বীকৃত। তফসীর মাযহারী ইবনে মাসউদের রেওয়াজে অগ্রাধিকার দিয়ে প্রমাণ মদীনায় এবং আয়াতকে মদনী সাব্যস্ত করেছে। তফসীর মাযহারী এর দুটি কারণ উল্লেখ করেছে। এক, এ রেওয়াজে দু'খারী ও মুসলিমে বর্তমান। এর সন্দেহ ইবনে আব্বাসের রেওয়াজে সন্দেহের চাইতে শক্তিশালী। দুই, এতে বর্ণনাকারী ইবনে মাসউদ স্বয়ং নিজের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। ইবনে আব্বাসের রেওয়াজে থেকে বাহাত এটাই বোঝা যায় যে, তিনি বিষয়টি কারও কাছে শুনেছেন।

উল্লিখিত প্রবন্ধের জওয়াব : প্রবন্ধের উত্তরে কুরআন বলেছে : **قُلِ الرُّوحُ**

من أمري <sup>أش</sup> <sup>أ</sup> <sup>أ</sup> এই জওয়াবের ব্যাখ্যায় তফসীরবিদদের উক্তি বিভিন্নরূপ। তন্মধ্যে কাযী সানাউল্লাহ পানিপথীর উক্তিটিই সর্বাধিক বোধগম্য ও স্পষ্ট। তা এই যে, এ জওয়াবে ষতটুকু বিষয় বলা জরুরী ছিল এবং ষতটুকু বিষয় সাধারণ লোকের বোধগম্য ছিল, ততটুকুই বলে দেওয়া হয়েছে। রূহের সম্পূর্ণ স্বরূপ সম্পর্কে যে প্রশ্ন ছিল জবাবে তা বলা হয়নি। কারণ, তা বোঝা সাধারণ লোকের সাধ্যাতীত ব্যাপার ছিল এবং তাদের কোন প্রয়োজন এটা বোঝার উপর নির্ভরশীলও ছিল না। এখানে রসুলুল্লাহ (সা)-কে আদেশ করা হয়েছে যে, আপনি তাদেরকে উত্তরে বলে দিন : রূহ আমার পালনকর্তার আদেশের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ রূহ সাধারণ সৃষ্টিজীবের মতো উপাদানের সমন্বয়ে এবং জন্ম ও বংশ বিস্তারের মাধ্যমে অস্তিত্ব লাভ করেনি; বরং তা সরাসরি আল্লাহ তা'আলার আদেশ **كُنْ** (হও) দ্বারা সৃষ্টিত। এই জওয়াব একথা স্মৃষ্টিতে তুলেছে যে, রূহকে সাধারণ বস্তুনিচয়ের মাপকাঠিতে পরখ করা যায় না। ফলে রূহকে সাধারণ বস্তুনিচয়ের মাপকাঠিতে পরখ করার ফলশ্রুতিতে যেসব সন্দেহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠে সেগুলো দূর হয়ে গেল। রূহ সম্পর্কে এতটুকু জ্ঞান মানুষের জন্য যথেষ্ট। এর বেশি জ্ঞানের উপর তার কোন ধর্মীয় অথবা পাখিব প্রয়োজন আটকা নয়। তাই প্রবন্ধের সেই অংশটিকে অনর্থক ও বাজে সাব্যস্ত করে জওয়াব দেওয়া হয়নি; বিশেষত যে ক্ষেত্রে এর স্বরূপ বোঝা সাধারণ লোকের তো কথাই নেই, বড় বড় দার্শনিক পণ্ডিতের পক্ষেও সহজ নয়।

প্রত্যেক প্রবন্ধের উত্তর দেওয়া জরুরী নয়, প্রসকারীর ধর্মীয় উপকারিতার প্রতি লক্ষ্য রাখা অপরিহার্য : ইমাম জাসসাস এই জওয়াব থেকে এ মাস'আলা বের করেছেন যে, প্রসকারীর প্রত্যেক প্রশ্ন এবং তার দিকের জওয়াব দেওয়া মুক্তা ও আলিমের দায়িত্বে জরুরী নয়; বরং তার ধর্মীয় উপযোগিতার প্রতি লক্ষ্য রেখে জওয়াব দেওয়া উচিত। যে জওয়াব প্রতিপক্ষের বোধশক্তির অতীত অথবা যে জওয়াবে প্রতিপক্ষের ভুল বোঝা-



জিজ্ঞেস কর, হিনি পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম সফর করেছিলেন। তার ঘটনাকি? তিন, রাত্ সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর।

প্রতিনিধি দলটি ফিরে এসে তিনটি প্রসই রসুলুল্লাহ্ (সা)-এর সামনে পেশ করে দিল। তিনি বললেন : আগামীকাল এর উত্তর দেব। কিন্তু তিনি 'ইনশা'ল্লাহ্' না বলার এর ফলশ্রুতিতে কয়েকদিন পর্যন্ত ওহীর আয়গন বন্ধ রইল। বিভিন্ন রেওয়াজে এই বিরতিকাল বার থেকে শুরু করে চল্লিশ দিন পর্যন্ত বণিত রয়েছে। কোরাইশরা বিদ্রূপ ও দেশান্তরোপের সুযোগ পেয়ে গেল। রসুলুল্লাহ্ (সা) ও উবিদ্ব হলে। এরপর হযরত জিবরাঈল এই আয়াত নিয়ে অবতীর্ণ হলেন :

—وَلَا تَقُولَنَّ لَشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكُمْ غَدًا ۚ لَآ أَن يَشَاءَ اللَّهُ

রসুলুল্লাহ্ (সা)-কে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, ভবিষ্যতে কোন কাজের ওয়াদা করা হলে 'ইনশা'ল্লাহ্' বলে করতে হবে। এরপর রাত্ সম্পর্কে উল্লিখিত আয়াত অবতীর্ণ হয়। গর্ভে আশ্বগোপনকারীদের সম্পর্কে আসহাবে কাহাফের ঘটনা এবং পূর্ব পশ্চিমে সফরকারী মুগকারনাইনের ঘটনা সম্পর্কেও আয়াত নাযিল হয়। পরবর্তী সূরা কাহাফে তা বণিত হবে। ঐ সূরার আসহাবে কাহাফ ও মুগকারনাইনের ঘটনা উত্তরে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তবে রাহের স্বরূপ সম্পর্কে যে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তার জওয়াব দেওয়া হয়নি। (ফলে নবুয়তের সত্যতা সম্পর্কে ইহুদীদের বণিত আলামত সত্যে পরিণত হয়।) তিরমিযীও এ রেওয়াজেটটি সংক্ষেপে উল্লেখ করেছে। (মাযহারী)

সূরা হিজরের ২৯ আয়াত وَنَفَخْتَ نَفِيَةً مِنْ رُوحِي এর অধীনে রাত্ নফস

ইত্যাদির স্বরূপ সম্পর্কে তরুসীর মাযহারীর বরাতে দিল্লি বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তাতে রাহের প্রকারভেদ ও প্রত্যেক প্রকারের স্বরূপ যথেষ্ট পরিমাণে স্ফুটিলে তোলা হয়েছে।

—وَلَكِن شَأْنًا لَدَّ هَبَسَ—পূর্ববর্তী আয়াতে রাত্ সম্পর্কিত প্রশ্নের প্রস্নোজন

পরিমাণে উত্তর দিলে রাহের স্বরূপ আবিষ্কারের প্রস্নাস থেকে একথা বলে নিরুদ্ধ করা হয়েছিল যে, মানুষের জ্ঞান যত বেশিই হোক না কেন, বস্তুনিচয়ের সর্বব্যাপী স্বরূপের দিক দিয়ে তা অল্পই। তাই অনাবশ্যক আলোচনা ও ধোঁজাধুঁজিতে লিপ্ত হওয়া মূল্য-বান সময় নষ্ট করারই নামান্তর। وَلَكِن شَأْنًا আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে

যে, মানুষকে যতটুকুই জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, তাও তার ব্যক্তিগত জায়গির নয়। আল্লাহ্ তা'আলা ইচ্ছা করলে তাও হিনিয়ে নিতে পারেন। কাজেই বর্তমান জ্ঞানের জন্য তার কৃতজ্ঞ থাকা এবং অনর্থক ও বাজে গবেষণার সময় নষ্ট না করা উচিত; বিশেষত যখন উদ্দেশ্য গবেষণা করা নয়, বরং অপরকে পরীক্ষা করা ও লজ্জিত করাই উদ্দেশ্য

হয়। মানুষ যদি এরাপ করে, তবে এই বক্তার পরিপত্তিতে তার অজিত জানটুকু বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া আশ্চর্য নয়। এ আয়াতে যদিও রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সম্বোধন করা হয়েছে, কিন্তু আসলে উদ্দেশ্যে শোনানোই উদ্দেশ্য, অর্থাৎ রসূলের জানও যখন তার ক্ষমতাহীন নয়, তখন অন্যের তো প্রসই উঠে না।

قُلْ لِّئِي أَجْتَمَعْتِ الْإِنْسُ وَالْجِنِّ — এ বিষয়বস্তুটি কোরআন পাকের

কয়েকটি আয়াতেই ব্যক্ত হয়েছে। এতে সমগ্র মানবগোষ্ঠীকে সম্বোধন করে দাবি করা হয়েছে যে, যদি তোমরা কোরআনকে আল্লাহর কালাম স্বীকার না কর, বরং কোন মানব রচিত কালাম মনে কর, তবে তোমরা তো মানব, এর সমতুল্য কালাম রচনা করে তোমরা দেখিয়ে দাও। আয়াতে একথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, শুধু মানবই নয়, জিনদেরকেও সাথে মিলিয়ে নাও। অতঃপর সবাই মিলে কোরআনের একটি সূরা বরং একটি আয়াতের অনুরূপও রচনা করতে সক্ষম হবে না।

এ বিষয়বস্তুর এখানে পুনরাবৃত্তি সম্ভবত একারণে যে, তোমরা আমার রসূলকে নবুয়ত ও রিসালত পরীক্ষা করার জন্য রাহ্ ইত্যাদি সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার প্রশ্ন তাঁর প্রতি করে থাক। তোমরা কেন এসব অনর্থক কাজে ব্যাপ্ত রয়েছ? স্বয়ং কোরআনকে দেখে নিজেই তাঁর নবুয়ত ও রিসালত সম্পর্কে কোন সন্দেহ ও দ্বিধাধ্বংসের অবকাশ থাকবে না। কেননা, সমগ্র বিশ্বের মানব ও জিন যখন তাঁর সামান্যতম দৃষ্টান্ত রচনা করতে সক্ষম নয়, তখন এটা যে আল্লাহর কালাম, তাতে কি সন্দেহ অবশিষ্ট থাকে? কোরআনের আল্লাহর কালাম হওয়া যখন এভাবে প্রমাণিত হয়ে যায়, তখন রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নবুয়ত ও রিসালত সম্পর্কেও কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا — আয়াতে বলা হয়েছে যে, যদিও কোরআনের সু'জিয়া

এতটুকু জাঙ্ঘল্যমান যে, এরপর কোন প্রশ্ন ও সন্দেহের অবকাশ থাকে না, কিন্তু বাস্তব হচ্ছে এই যে, অধিকাংশ লোক আল্লাহর নিয়ামতের শোকার করেন না এবং কোরআনরূপী নিয়ামতকেও মূলা দেয় না। তাই পঞ্চত্রুটভায় উদভ্রান্ত হয়ে তারা ঘোরাকেরা করে।

وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا ۙ أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتِ عَلَيْنَا كَسَفًا أَوْ تَأْتِي بِلَهُةٍ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا ۙ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرٍ أَوْ تَرْفٍ فِي السَّمَاءِ ۙ وَلَنْ

تُؤْمِنَ لِرُؤْيَاكَ حَتَّىٰ تُنزِلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرُؤُهُ ۗ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ ۗ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ۗ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ۗ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا ۗ

رَسُولًا ۗ

(৯০) এবং তারা বলে : আমরা কখনও আপনাকে বিশ্বাস করব না, যে পর্যন্ত না আপনি ডুপূঠ থেকে আমাদের জন্য একটি বরফা প্রবাহিত করে দিন, (৯১) অথবা আপনার জন্য খেজুরের ও জাম্বুরের একটি বাগান হবে, অতঃপর আপনি তার মধ্যে নির্ঝরিশীসমূহ প্রবাহিত করে দেবেন, (৯২) অথবা আপনি যেমন বলে থাকেন, তেমনিভাবে আমাদের ওপর আসমানকে খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলে দেবেন অথবা আলাহ ও ফেরেশতাদেরকে আমাদের সামনে নিয়ে আসবেন, (৯৩) অথবা আপনার কোন সেনার তৈরী পূহ হবে অথবা আপনি আরোহণ করবেন এবং আমরা আপনার আকাশে আরোহণকে কখনও বিশ্বাস করব না, যে পর্যন্ত না আপনি অবতীর্ণ করেন আমাদের প্রতি এক প্রহু, যা আমরা পাঠ করব। বলুন : পবিত্র মহান আমার পালন কর্তা, একজন মানব, একজন রসূল বা আমি কে? (৯৪) 'আলাহ কি মানুষকে পরমধর করে পাঠিয়েছেন?' তাদের এই উক্তিই মানুষকে ঈমান জানয়ন থেকে বিরত রাখে, যখন তাদের নিকট আসে হিদায়ত। (৯৫) বলুন : যদি পৃথিবীতে ফেরেশতারা সম্বন্ধে বিচরণ করত, তবে আমি আকাশ থেকে কোন ফেরেশতাকেই তাদের নিকট পরমধর করে প্রেরণ করতাম।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

[ পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে কাফিরদের কতিপয় প্রহ ও উত্তর উল্লেখ করা হয়েছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে তাদের কয়েকটি হঠকারিতাপূর্ণ প্রহ ও আগাগোড়াহীন কল্পনামূলক এবং সেগুলোর জওয়াব উল্লেখ করা হয়েছে। (ইবনে জারীর) ] তারা (কোরআনের অলৌকিকতার মাধ্যমে রসূলুল্লাহ (সা)-র নবুয়ত ও রিসালতের যথেষ্ট প্রমাণাদি পাওয়া সত্ত্বেও ঈমান আনে না এবং বাহানা করে) বলে : আমরা আপনার প্রতি কখনও বিশ্বাস স্থাপন করবো না, যে পর্যন্ত না আপনি আমাদের জন্য (মক্কার) ডুপূঠ থেকে কোন বরফা প্রবাহিত করে দেন অথবা (বিশেষভাবে) আপনার জন্য খেজুর ও জাম্বুরের কোন বাগান হয়ে যায়, অতঃপর বাগানের মাঝে মাঝে স্থানে স্থানে অনেকে-গুলো নির্ঝরিশী আপনি প্রবাহিত করে দেন অথবা আপনার কথামত আপনি আসমানকে খণ্ড-বিখণ্ড করে আমাদের ওপর ফেলে দেন [যেমন এ আয়াতে বলা হয়েছে :



ان نُنشِئُ لَهُمُ الْاَرْضَ وَنَسْفُتْ عَلَيْهِمْ كَسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ (অর্থাৎ আমি

ইচ্ছা করলে তাদেরকে ভূগর্ভে পুতে দিতে পারি অথবা তাদের ওপর আসমান খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলে দিতে পারি) ] অথবা আপনি আল্লাহকে ও ফেরেশতাদেরকে (আমাদের) সামনে এনে দিন (যাতে আমরা খোলাখুলি দেখে নেই) অথবা আপনার কাছে কোন স্বর্ণনির্মিত গৃহ হবে অথবা আপনি (আমাদের সামনে) আকাশে আনোহরণ করবেন এবং আমরা আপনার (আকাশে) আনোহরণকে কখনও বিশ্বাস করব না, যে পর্যন্ত না আপনি (সেখান থেকে) আমাদের কাছে একটি গ্রন্থ নিয়ে আসেন, যাকে আমরা পড়েও নেব (এবং তাতে যেন আপনার আকাশে আনোহরণের সত্যতা স্বীকৃতিপত্ররূপে লেখা থাকে) (এসব প্রমাণোক্তির জওয়াবে) বলে দিন : পবিত্র মহান আমার পালনকর্তা, একজন প্রেরিত মানব বৈ আমি কে (সে, এসব ফরমায়েশ পূর্ণ করার সাধ্য আমার থাকবে? এ ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই। মানবত্ব নিজ সত্তার অপারগতা ও অক্ষমতার পরিচায়ক। আল্লাহর রসূল হলেও তাঁর প্রত্যেক বিষয়ের পরিপূর্ণ ক্ষমতা থাকতে পারে না। বরং রিসালতের জন্য এমন কোন প্রমাণ থাকাই যথেষ্ট, যা বুদ্ধিজীবীদের কাছে আপত্তিকর না হয়। সে প্রমাণ কোরআনের অলৌকিকতা ও অন্যান্য মু'জিবাত আকারে বহুবার উপস্থিত করা হয়েছে। তাই রিসালতের জন্য এসব ফরমায়েশ সম্পূর্ণ নিরর্থক। হ্যাঁ, আল্লাহ তা'আলার সবকিছু করার ক্ষমতা রয়েছে। কিন্তু তাঁর কাছে দাবি করার অধিকার কারও নেই। তিনি কোন বিষয়কে রহস্যের উপযুক্ত দেখলে তা প্রকাশও করে দেন, কিন্তু এতে তোমাদের সব ফরমায়েশ পূর্ণ করা জরুরী নয়।) যখন তাদের কাছে তিসায়ত (অর্থাৎ রিসালতের বিস্তৃত প্রমাণ, যেমন কোরআনের অলৌকিকতা) এসে গেছে, তখন তাদের বিশ্বাস স্থাপনে এছাড়া কোন (দ্রুক্ষেপযোগ্য) বাধা নেই যে, তারা (মানবত্বকে রিসালতের পরিপন্থী মনে করে) বলেছে : আল্লাহ তা'আলা কি মানবকে পয়গম্বর করে প্রেরণ করেছেন? (অর্থাৎ এরূপ হতে পারে না।) আপনি (জওয়াবে আমার পক্ষ থেকে) বলে দিন : যদি পৃথিবীতে ফেরেশতারা নিশ্চিন্তে বিচরণ করত, তবে আমি অবশ্যই তাদের প্রতি আকাশ থেকে ফেরেশতাকে রসূল করে প্রেরণ করতাম।

### আনুমানিক জাতব্য বিষয়

অসামঞ্জস্য প্রবন্ধের পয়গম্বরসূত্র জওয়াব : আলোচ্য আয়াতসমূহে যে সব প্রমাণ ও ফরমায়েশ বিশ্বাস স্থাপনের শর্ত হিসাবে রসূলুল্লাহ (সা)-র কাছে করা হয়েছে প্রত্যেক মানুষ এগুলোকে এক প্রকার ঠাট্টা এবং বিশ্বাস স্থাপন না করার বেহুদা বাহানা ছাড়া আর কিছুই মনে করতে পারে না। এ ধরনের প্রবন্ধের জওয়াবে স্বভাবতই রাগের বশবর্তী হয়ে জওয়াব দেয়। কিন্তু আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় পয়গম্বরকে যে জওয়াব শিক্ষা দিয়েছেন, তা প্রাণিধানযোগ্য, সংস্কারকদের জন্য চির সম্বলণীয় এবং কর্মের আদর্শ করার বিষয়। সবগুলো প্রবন্ধের জওয়াবে তাদের নিবু'ছিত্তা প্রকাশ

করা হয়নি এবং হঠকারিতাপূর্ণ দৃষ্টান্তিও ফুটিয়ে তোলা হয়নি। তাদের বিরুদ্ধে কোন বিদ্‌পাদক বা কণ্ড ও উচ্চারণ করা হয়নি; বরং সাধাসিধা ভাষায় আসল রূপ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে, সম্ভবত তোমাদের ধারণা এই যে, আল্লাহর রসূলও সমগ্র খোদায়ী ক্ষমতার মালিক এবং সবকিছু করতে সক্ষম হওয়া উচিত। এরূপ ধারণা ভ্রান্ত। রসূলের কাজ শুধু আল্লাহর পয়গাম পৌঁছানো। আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিসালত সপ্রমাণ করার জন্য অনেক মু'জিয়াও প্রেরণ করেন। কিন্তু সেগুলো নিছক আল্লাহ তা'আলার কুদরত ও ক্ষমতা দ্বারা হয়। রসূল খোদায়ী ক্ষমতা লাভ করেন না। তিনি একজন মানব, কাজেই মানবিক শক্তিবহির্ভূত নন। তবে যদি আল্লাহ তা'আলাই তাঁর সাহায্যার্থে শীঘ্র শক্তি প্রকাশ করেন, তবে তা ভিন্ন কথা।

মানবের রসূল মানবই হতে পারেন—ফেরেশতা মানবের রসূল হতে পারে না; সাধারণ কাফির ও মুশরিকদের ধারণা ছিল, মানব আল্লাহর রসূল হতে পারে না। কেননা সে মানবীয় অভাব ও প্রয়োজনে অভ্যস্ত হয়। কাজেই সাধারণ মানুষের ওপর তার কোন প্রেষ্ঠত্ব নেই যে, তারা তাকে রসূল মনে করে অনুসরণ করবে। তাদের এ ধারণার জওয়ান কোরআন পাকে কয়েক জায়গায় বিভিন্ন শিরোনামে দেওয়া হয়েছে।

এখানে مَا مَعَّ النَّاسِ আয়াতে যে জওয়াব দেওয়া হয়েছে, তার সারমর্ম হলো যে, রসূলকে যাদের প্রতি প্রেরণ করা হয়, তাকে তাদেরই শ্রেণীভুক্ত হতে হবে। তারা মানব হলে রসূলেরও মানব হওয়া উচিত। কেননা, ভিন্ন শ্রেণীর সাথে পারস্পরিক মিল ব্যতীত হিদায়ত ও পথপ্রদর্শনের উপকার অর্জিত হয় না। ফেরেশতা ক্ষুধা-পিপাসা জানে না, কাম-প্রবৃত্তিরও জ্ঞান রাখে না এবং শীত-গ্রীষ্মের অনুভূতি ও পরিশ্রমজনিত ক্লান্তি থেকেও মুক্ত। এমতাবস্থায় মানুষের প্রতি কোন ফেরেশতাকে রসূল করে প্রেরণ করা হলে সে মানবের কাছেও উপলব্ধিরূপ কর্ম আশা করতো এবং মানবের দুর্বলতা ও অক্ষমতা উপলব্ধি করতো না। এমনিভাবে মানব যখন বুঝত যে, সে ফেরেশতা, তার কাজকর্মের অনুকরণ করার যোগ্যতা মানুষের নেই, তখনই মানব তার অনুসরণ মোটেই করতো না। সংশোধন ও পথপ্রদর্শনের উপকার তখনই অর্জিত হতে পারে, যখন আল্লাহর রসূল মানব জাতির মধ্যে পেকে হয়। তিনি একদিকে মানবীয় ভাবাবেগ ও স্বভাবগত কামনা-বাসনার বাহকও হবেন এবং সাথে সাথে এক প্রকার ফেরেশতাসুলভ শানেরও অধিকারী হবেন—যাতে সাধারণ মানব ও ফেরেশতাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন ও মধ্যস্থতার দায়িত্ব পালন করতে পারে এবং ওহী নিয়ে আগমনকারী ফেরেশতার কাছ থেকে ওহী বুঝে নিরে স্বজাতীয় মানবের কাছে পৌঁছাতে পারে।

উপলব্ধি বস্তু্য দ্বারা এ সন্দেহও দূর হয়ে গেল যে, মানুষ ফেরেশতার কাছ থেকে উপকার লাভে সক্ষম না হলে রসূল মানব হওয়া সম্ভবও ফেরেশতার কাছ থেকে ওহী কিরূপে লাভ করতে পারবে?

প্রশ্ন হয় যে, রসূল ও উশ্মতের সমজাতি হওয়া যখন শর্ত, তখন রসূলদ্বারা (সো) জিন জাতির রসূল নিযুক্ত হলেন কিরূপে? জিন তো মানবের সমজাতি নয়।

উত্তর এই যে, রসূল শুধু মানবই নন; বরং তিনি ফেরেশতাসুলভ ব্যক্তিত্ব ও মর্গাদারও অধিকারী। এ কারণে তাঁর সাথে জিনদেরও সম্পর্ক থাকতে পারে।

আমাদের শেষে বলা হয়েছে : তোমরা মানব হওয়া সত্ত্বেও দাবি কর যে, তোমাদের রসূল ফেরেশতা হওয়া উচিত। এ দাবি অযৌক্তিক। যদি পৃথিবীতে ফেরেশতারা বসবাস করত এবং তাদের প্রতি রসূল প্রেরণ করার প্রয়োজন দেখা দিত; তবে ফেরেশতাকেই রসূল করা হত। এখানে পৃথিবীতে বসবাসকারী ফেরেশতাদের বিশেষণ

﴿مَشُونِ مَطْمَئِنِينَ﴾ উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ তারা পৃথিবীতে নিশ্চিন্তে বিচরণ করে। এ থেকে জানা যায় যে, ফেরেশতাদের প্রতি ফেরেশতাকে রসূল করে প্রেরণ করার প্রয়োজন তখনই হত, যখন পৃথিবীর ফেরেশতারা স্বয়ং আকাশে যেতে না পারত; বরং পৃথিবীতেই বিচরণ করতে হত। পক্ষান্তরে যদি তারা স্বয়ং আকাশে ফাওয়ার শক্তি রাখত, তবে পৃথিবীতে রসূল প্রেরণ করার প্রয়োজনই দেখা দিত না।

قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا  
 بَصِيرًا ۝ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مُنْتَهَىٰ وَمَنْ يَضِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ  
 أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ يُؤْتُوا الْقِيمَةَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عَمِيًّا وَبِكُنَّا  
 وَصَمَاءَ مَاؤُهُمْ جَهَنَّمَ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ۝ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ  
 بِمَا كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا إرَائِنَا لَمَبْعُوثُونَ  
 خَلْقًا جَدِيدًا ۝ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ  
 قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَإِنِّي  
 الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفْرًا ۝ قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذَا  
 لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَنُورًا ۝

(৯৬) বলুন : আমার ও তোমাদের মধ্যে সত্য প্রতিষ্ঠাকারী হিসাব আলাহই যথেষ্ট। তিনি তো স্বীয় বান্দাদের বিষয়ে খবর রাখেন ও দেখেন। (৯৭) আলাহ যাকে পথপ্রদর্শন করেন, সেই তো সত্যিক পথপ্রাপ্ত এবং যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তাদের জন্য আপনি আলাহ ছাড়া কোন সাহায্যকারী পাবেন না। আমিকিয়ামতের দিন তাদের সমবেত করব তাদের মুখে তর দিয়ে চলা অবস্থায়, জল অবস্থায়, মুক অবস্থায় এবং বধির অবস্থায়। তাদের আবাসস্থল জাহান্নাম। যখনই নির্ধারিত হওয়ার উপক্রম হবে

আমি তখন তাদের জন্য অগ্নি আরও বৃদ্ধি করে দিব। (৯৮) এটাই তাদের শাস্তি, কারণ তারা আমার নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করেছে এবং বলেছে : আমরা যখন অস্থিতে পরিশত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাব, তখনও কি আমরা নতুনভাবে সৃজিত হয়ে উদ্ভিত হব? (৯৯) তারা কি দেখেনি যে, যে আল্লাহ্‌ আসমান ও জমিন সৃজিত করেছেন, তিনি তাদের মত মানুষও পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম? তিনি তাদের জন্য ছিন্ন করেছেন একটি নির্দিষ্ট কাল এতে কোন সন্দেহ নেই; অতঃপর আলিমরা অস্বীকার হাড়া কিছু করেনি। (১০০) বলুন : যদি আমার পালনকর্তার রহমতের ভাণ্ডার তোমাদের হাতে থাকত, তবে ব্যয়িত হয়ে যাওয়ার আশংকার অবশ্যই তা ধরে রাখতে। মানুষ তো অতিশয় রূপণ।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(যখন তারা রিসালতের সুস্পষ্ট প্রমাণাদি আসার এবং মা'বতীর সন্দেহ দূর হয়ে যাওয়ার পরও বিশ্বাস স্থাপন করে না, তখন) আপনি (শেষ কথা) বলে দিন : আল্লাহ্‌ তা'আলা আমার ও তোমাদের মধ্যে (মতবিরোধের ব্যাপারে) যথেষ্ট সাক্ষী। (অর্থাৎ আল্লাহ্‌ জানেন যে, আমি বাস্তবিকই আল্লাহ্র রসূল; কেননা) তিনি স্বীয় বান্দাদের (অবস্থা)-কে ভালোভাবে জানেন, ভালোভাবে দেখেন (তোমাদের হঠকারীতাকেও দেখেন)। আল্লাহ্‌ যাকে পথে আনেন, সে-ই পথে আসে এবং যাকে পথচ্যুত করে দেন, আপনি আল্লাহ্‌ ব্যতীত এমন লোকদের সাহায্যকারী কাউকে পাবেন না। (কুফরের কারণে তারা আল্লাহ্র সাহায্য থেকে বঞ্চিত। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সাহায্য না হলে হিদায়তও হতে পারে না এবং আযাব থেকে মুক্তি পেতে পারে না।) আমি কিরামতের দিন তাদেরকে অন্ধ, বধির ও মূক করে মুখে ভর করে চালিত করব। তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। (এর অবস্থা এই যে) তা (অর্থাৎ জাহান্নামের অগ্নি) যখনই নিঃপ্রভ হতে থাকবে, তখনই আমি তাদের জন্য আরও প্রজ্জ্বলিত করে দেব। এটা তাদের শাস্তি, একারণে যে, তারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছিল এবং বলেছিল : আমরা যখন অস্থি এবং (তাও) চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে, তখনও কি আমরা নতুনভাবে সৃজিত হয়ে (কবর থেকে) উদ্ভিত হব? তাদের কি এতটুকু জানা নেই যে, যে আল্লাহ্‌ আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন, তিনি (আরও উত্তমরূপে) তাদের মত মানুষ পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম? এবং (অবিশ্বাসীরা সত্ত্ববত মনে করে যে, হাজারো জাতি মানুষ মরে গেছে; কিন্তু পুনরুজ্জীবনের ওয়াদা আজ পর্যন্ত পূর্ণ হয়নি। শোন, এর কারণ এই যে) তাদের। (পুনরুজ্জীবনের) জন্য তিনি একটি সময় নির্দিষ্ট করে রেখেছেন, এতে (অর্থাৎ এ সময়ের আগমনে) বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই। এতদসত্ত্বেও আলিমরা অস্বীকার না করে থাকেনি। আপনি বলে দিন : যদি আমার পালনকর্তার রহমতের (অর্থাৎ নবুস্বতের) ভাণ্ডার (অর্থাৎ গুণাবলী) তোমাদের হাতে থাকত (অর্থাৎ যাকে ইচ্ছা করতে, যাকে ইচ্ছা না দিতে) তবে তোমরা ব্যয়িত হয়ে যাওয়ার আশংকার অবশ্যই তা বন্ধ করে রাখতে (কোনো কাউকে দিতে না; অথচ এটা কাউকে দিলে হ্রাসও

পালন না।) মানুষ বড়ই ছোট মন। (ক্ষম পায় না—এমন বস্তুও সে দান করতে বিধারোধ করে। এর কারণ পয়গম্বরদের সাথে শত্রুতা এবং কৃপণতা ছাড়া সম্ভবত এটাও যে, কাউকে নবী করলে তার নির্দেশাবলী পালন করতে হবে; যেমন কোন জাতি পারম্পরিক ঐকমত্যে কাউকে বাদশাহ মনোনীত করলে যদিও তারাই মনোনীত করে থাকে; কিন্তু মনোনীত হয়ে গাওয়ার পর তার আদেশই সবাইকে পালন করতে হয়।)

### আনুশঙ্গিক জাতব্য বিষয়

সর্বশেষ আয়াতে বলা হয়েছে : যদি তোমরা আল্লাহর রহমতের ভাণ্ডারের মালিক হয়ে যাও, তবে তাতেও কৃপণতা করবে। কাউকে দেবে না এ আশংকায় যে, এভাবে দিতে থাকলে ভাণ্ডারই নিঃশেষ হয়ে যাবে। অবশ্য আল্লাহর রহমতের ভাণ্ডার কখনও নিঃশেষ হয় না। কিন্তু মানুষ স্বভাবগতভাবে ছোটমনা ও কম সাহসী। অকাতরে দান করার সাহস তার নেই।

এখানে সাধারণ তফসীরবিদগণ ‘পালনকর্তার রহমতের ভাণ্ডার’ শব্দের অর্থ নিয়েছেন ধনভাণ্ডার। পূর্ববর্তী বাক্যের সাথে এর সম্পর্ক এই যে, মস্কাত্‌ল কার্ফিররা ফরমায়েশ করেছিল, যদি আপনি বাস্তবিকই সত্য নবী হন, তবে মস্কাত্‌ল মরুভূমিতে নদী-নালা প্রবাহিত করে একে সিরিয়ার মত সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা করে দিন। এর জওয়ালে পূর্বে উজ্জ্বল করা হয়েছে যে, তোমরা যেন আমাকে খোদাই মনে করে নিয়োহ। ফলে আমার কাছ থেকে খোদায়ী ক্ষমতা দাবী করছ। আমি তো একজন রসূল মাত্র। খোদা নই যে, তোমরা যা চাইবে, তাই করব। আলোচ্য আয়াতকে যদি এর সাথেই সম্পর্কযুক্ত করা হয়, তবে উদ্দেশ্য এই যে, মস্কাত্‌ল মরুভূমিকে নদী-নালা বিধৌত শস্য শ্যামলা প্রাপ্তিরে পরিণত করার ফরমায়েশ যদি আমার রিসালত পরীক্ষা করার জন্য হয়, তবে এর জন্য কোরআনের অলৌকিকতার মু’জিহাটি সংশ্লিষ্ট। অন্য ফরমায়েশের প্রয়োজন নেই। পক্ষান্তরে যদি জাতীয় প্রয়োজন মিটানোর জন্য হয়, তবে সমরণ রেশ, যদি তোমাদের ফরমায়েশ অনুযায়ী মস্কাত্‌ল ভূখণ্ডে তোমাদেরকে সবকিছু দেওয়াও হয় এবং ধন-ভাণ্ডারের মালিক তোমাদেরকে করে দেওয়া হয়, তবে এর পরিণামও জাতীয় ও জনগণের সুখ-স্বাস্থ্য হবেনা; বরং মানবীয় অভ্যাস অনুযায়ী স্বার হাতে এই ধন-ভাণ্ডার থাকবে, সে সর্প হয়ে তার উপর বসে যাবে, জনগণের কলাপার্থে ব্যয় করতে চাইবে না দারিদ্রের আশংকা করবে। যেভাবেই মস্কাত্‌ল গুটি-কতক বিত্তশালীর আরও বিত্তশালী ও সুখী হওয়া ছাড়া জনগণের কি উপকার হবে? অধিকাংশ তফসীরবিদ আলোচ্য আয়াতের এ অর্থই সাব্যস্ত করেছেন।

কিন্তু হাকীমুল উম্মত হযরত খানজী (র) বয়ানুল কোরআনকে এখানে রহমতের অর্থ নব্বুত ও রিসালত এবং ভাণ্ডারের অর্থ নব্বুতের উৎকর্ষ নিয়েছেন! এ তফসীর অনুযায়ী পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক এই যে, তোমরা আমার নব্বুত ও রিসালতের জন্য যেসব আগাগোড়াহীন অনর্থক দাবি করছ, সেগুলোর সারমর্ম এই যে, তোমরা আমার নব্বুত স্বীকার করতে চাও না। অতঃপর তোমরা কি চাও যে, নব্বুতের

ব্যবস্থাপনা তোমাদের হাতে অর্পণ করা হোক, যাতে তোমরা থাকে ইচ্ছা নবী করে দাও।  
এরাপ কল্পা হলে এর পরিণতি হবে এই যে, তোমরা কাউকে নব্বয়ত দেবে না—কৃপণ  
হয়ে বসে থাকবে। হযরত খানজী (র) এই তফসীর লিপিবদ্ধ করে বলেছেন যে, এটা  
আলাহ তা'আলার অন্যতম দান। তফসীরটি খুবই স্থানোপযোগী। এ স্থলে নব্বয়তকে  
রহমত শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা এমন, যেমন <sup>أَهْمُ</sup> <sup>يُقَسِّمُونَ</sup> <sup>رَحْمَةً</sup> <sup>رَبِّكَ</sup> আয়াতে

وَاللَّهُ سَبْعًا نَعَةً وَتَعَالَىٰ أَعْلَمُ نَبِّئَهُمْ

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَمَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ  
لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَهُودِيًّا مَثْبُورًا ۖ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَمَا أَنزَلُ  
هُوَ كَذِبٌ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَاحِبِهِ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَفِرْعَوْنُ  
مَثْبُورًا ۖ فَأَرَادَ أَنْ يَنْتَفِرَ بِهِمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا ۖ  
وَقُلْنَا مَنْ بَعْدَهُ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ  
جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ۖ وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَّلُ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا  
وَنَذِيرًا ۖ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مَكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ  
تَنْزِيلًا ۖ قُلْ أُمُّوَابَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا هَادٍ ۖ الَّذِينَ آتَوْا الْعَامَ مِنْ قَبْلِهِ  
إِذَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْهِمْ يَاجِرُونَ لِلَّذِينَ سَجِدَا ۖ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا  
إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ۖ وَيَاجِرُونَ لِلَّذِينَ آتَوْا الْعَامَ مِنْ قَبْلِهِ  
يَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ۖ

(১০১) আপনি বনী ইসরাইলকে জিত্তেস করুন, আমি মুসাকে নয়টি প্রকাশ্য  
নিদর্শন দান করেছি। যখন তিনি তাদের কাছে আগমন করেন, ফিরাউন তাকে বলল :  
হে মুসা, আমার ধারণায় তুমি তো যাদুশক্ত। (১০২) তিনি বললেন : তুমি জান যে  
আসমান ও জমিনের পালনকর্তাই এ সব নিদর্শনাবলী প্রত্যক্ষ প্রমাণস্বরূপ নাশিল  
করেছেন। হে ফিরাউন, আমার ধারণায় তুমি ধ্বংস হতে চলেছ। (১০৩) অতঃপর সে

বনী ইসরাঈলকে দেশ থেকে উৎখাত করতে চাইল, তখন আমি তাকে ও তার সঙ্গীদের সবাইকে নিমজ্জিত করে দিলাম। (১০৪) তারপর আমি বনী ইসরাঈলকে বললাম : এদেশে তোমরা বসবাস কর। অতঃপর যখন পরকালের ওয়াদা বাস্তবায়িত হবে, তখন তোমাদেরকে জড়ো করে নিয়ে উপস্থিত হবে। (১০৫) আমি সত্যসহ এ কোরআন নাখিল করেছি এবং সত্যসহ এটা নাখিল হয়েছে। আমি তো আপনাকে শুধু সুসংবাদদাতা ও ডর প্রদর্শক করেই প্রেরণ করেছি। (১০৬) আমি কোরআনকে যতিচিহ্নসহ পৃথক পৃথকভাবে পার্শ্বের উপযোগী করেছি, যাতে আপনি একে লোকদের কাছে ধীরে ধীরে পাঠ করেন এবং আমি একে যথাযথভাবে অবতীর্ণ করেছি। (১০৭) বলুন : তোমরা কোরআনকে মান্য কর অথবা অমান্য কর; যারা এর পূর্ব থেকে ইলুমপ্রাপ্ত হয়েছে, যখন তাদের কাছে এর তিলাওয়াত করা হয়, তখন তারা নত মস্তকে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে (১০৮) এবং বলে : আমাদের পালনকর্তা পবিত্র মহান। নিঃসন্দেহে আমাদের পালনকর্তার ওয়াদা অবশ্যই পূর্ণ হবে। (১০৯) তারা ক্রন্দন করতে করতে নত মস্তকে তুমিতে লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের বিনয়ভাষ আরো বৃদ্ধি পায়।

#### তক্ষসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং আমি মুসা (আ)-কে নয়টি প্রকাশ্য মু'জিয়া দান করেছি (এগুলো নবম পার্বার ষষ্ঠ ককুর প্রথম আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে।) যখন তিনি বনী ইসরাঈলের কাছে এসেছিলেন। অতএব আপনি বনী ইসরাঈলকে (ও ইচ্ছা করলে) জিজ্ঞেস করে দেখুন। [যেহেতু মুসা (আ) ফিরআউনের প্রতিও প্রেরিত হয়েছিলেন এবং ফিরআউন ও ফিরআউন বংশীয়দের ঈমান না আনার কারণে মু'জিয়াগুলো প্রকাশিত হয়েছিল, তাই মুসা (আ) ফিরআউনকে পুনরায় ঈমান আনার জন্য হু'শিয়ার করেন এবং মু'জিয়ার মাধ্যমে ডর প্রদর্শন করেন।] ফিরআউন বলল : হে মুসা, আমার খারপায় অবশ্যই তোমার উপর কেউ যাদু করেছে, (যদ্বকরন তোমার জান-বুদ্ধি নষ্ট হয়ে গেছে এবং তুমি আবো-লতাবোল কথাবার্তা বলছ।) মুসা (আ) বললেন : তুমি (মনে মনে) জান (যদিও লজ্জার কারণে মুখে স্বীকার কর না।) যে, এগুলো আসমান ও জমিনের পালনকর্তাই নাখিল করেছেন এমতাবস্থায় যে, এগুলো জানের জন্য (যথেষ্ট) উপায়। আমার খারপায় হে ফিরআউন, তোমার দুর্ভাগ্যের দিন ঘনিয়ে এসেছে। [এক সময় ফিরআউনের অবস্থা ছিল এই যে, মুসা (আ)-র অনুরোধ সত্ত্বেও সে বনী ইসরাঈলকে মিসর ত্যাগের অনুমতি দিত না এবং] অতঃপর (অবস্থা এই হয়েছে যে) সে [মুসা (আ)-র প্রভাবে বনী ইসরাঈলের শক্তিশালী হয়ে যাওয়ার আশংকায় নিজেই] বনী ইসরাঈলকে দেশ থেকে উৎখাত করতে চাইল (অর্থাৎ তাদেরকে দেশান্তরিত করতে চাইল।) অতঃপর আমি (তার সফল হওয়ার পূর্বেই স্বয়ং) তাকে ও তার সঙ্গী সবাইকে নিমজ্জিত করে দিলাম এবং তাঁর (অর্থাৎ তাকে নিমজ্জিত করার) পর আমি বনী ইসরাঈলকে বললাম : (এখন) এদেশে (–র যে স্থান থেকে তোমাদেরকে উৎখাত করতে চেয়েছিল, সে স্থানের মালিক তোমরাই। কাজেই এতে) বসবাস কর (প্রত্যক্ষভাবে কিংবা পরোক্ষভাবে; কিন্তু

এই মালিকানা পার্থিব জীবন পর্যন্ত)। অতঃপর যখন পরকালের ওয়াদা আসবে, তখন আমি সবাইকে জড়ো করে (কিয়ামতের ময়দানে গোলামের মতো) নিয়ে আসব। (প্রথমে এরূপ হবে। এরপর মু'মিন ও কাফির এবং সৎ ও অসৎকে আলাদা করে দেওয়া হবে। আমি মুসাকে যেমন মু'জিহা দিয়েছি, তেমনি আপনাকেও অনেক মু'জিহা দান করেছি। তন্মধ্যে একটি বিরাট মু'জিহা হচ্ছে কোরআন।) আমি এ কোরআনকে সত্যসহ নাখিল করেছি এবং তা সত্যসহই (আপনার প্রতি) নাখিল হয়েছে। (অর্থাৎ প্রেক্ষকের কাছ থেকে যেমনটি রওয়ানা হয়েছিল, প্রাপকের কাছে তেমনটিই পৌঁছেছে। মাঝখানে কোনরূপ পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও হস্তক্ষেপ হয়নি। অতএব আগাগোড়া সবই সত্য।) এবং [ আমি যেমন মুসা (আ)-কে পয়গম্বর করেছিলাম এবং হিদায়ত তাঁর ক্ষমতাসীম ছিল না, তেমনি ] আমি আপনাকে (ও) শুখু (ঈমানের সওয়ালের) সুসংবাদদাতা এবং (কুকল্পের আঘাবের) ভয় প্রদর্শন করে প্রেরণ করেছি (কেউ ঈমান না আনলে কোন চিন্তা করবেন না)। এবং কোরআনে (সত্যের সাথে সাথে রহমতের তাগিদ অনুযায়ী আরও এমন গুণাবলীর প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে, যেগুলো দ্বারা হিদায়তে অধিক সহজ হয়। এক এই যে, আমি (আয়াত ইত্যাদির) স্থানে স্থানে প্রভেদ রেখেছি, যাতে আপনি থেমে থেমে পাঠ করেন। (এভাবে তারা ভালরূপে বুঝতে পারবে। কেননা, উপস্থাপিত দীর্ঘ বক্তব্য মাঝে মাঝে আয়ত্ত করা যায় না।) এবং (দ্বিতীয় এই যে) আমি নাখিলও (ঘটনাবলী অনুযায়ী) ক্রমান্বয়ে করেছি (যাতে অর্থ চমৎকাররূপে ফুটে উঠে। এসব বিষয়ের তাগিদ অনুযায়ী তাদের বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত ছিল। কিন্তু এর পরও বিশ্বাস স্থাপন না করলে আপনি পরওয়া করবেন না; বরং) আপনি (পরিষ্কার) বলে দিন: তোমরা কোরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর অথবা করো না, (আমার কোন পরওয়া নেই দু'কল্পে। এক এতে আমার কি ক্ষতি? দুই, তোমরা বিশ্বাস স্থাপন না করলে কি হবে, অন্য লোকেরা বিশ্বাস স্থাপন করবে। সেমতে) যাদেরকে কোরআনের (অর্থাৎ কোরআন নাখিল হওয়ার) পূর্বে (ধর্মের) ইলুম দেওয়া হয়েছিল (অর্থাৎ গ্রন্থধারী সম্প্রদায়ের সত্যপন্থী আলিম), তাদের সামনে যখন কোরআন পাঠ করা হয়, তখন নতথুতনি সিদ্ধান্ত পড়ে যায় এবং বলে: আমাদের পালনকর্তা (ওয়াদার খেলাপ করা থেকে) পবিত্র। নিশ্চয় আমাদের পালনকর্তার ওয়াদা অবশ্যই পূর্ণ হয়। (সেমতে তিনি যে নবীর প্রতি যে কিতাব নাখিল করার ওয়াদা পূর্ববর্তী গ্রন্থসমূহে করেছিলেন, তা পূর্ণ করেছেন।) এবং নতথুতনি লুটিয়ে পড়ে ক্রন্দন করতে করতে। এই কোরআন (অর্থাৎ কোরআন পাঠ শোনা) তাদের (অন্তরের) বিনয়ভাব আরও বাড়িয়ে দেয়। (কেননা, বাহ্যিক অবস্থা ও আন্তরিক অবস্থার মিল বিনয়ভাবকে শক্তিশালী করে দেয়।)

আনুশঙ্গিক জাতব্য বিষয়

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ

—এতে মুসা (আ)-কে নয়টি প্রকাশ্য



নিদর্শন দেওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ﴿٥١﴾ শব্দটি মু'জিযা এবং কোরআনী আয়াতের অর্থাৎ আহ্‌কামে ইলাহীর অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ স্থলে উক্ত অর্থের সম্ভাবনা আছে। একদল তফসীরবিদ এখানে ﴿٥١﴾ এর অর্থ মু'জিযা নিয়েছেন। নয় সংখ্যা উল্লেখ করার নয়ের বেশি না হওয়া জরুরী নয়। কিন্তু এখানে বিশেষ গুরুত্বের কারণে নয় উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস নয়টি মু'জিযা এভাবে গণনা করেছেন : ১. মুসা (আ)-এর লাঠি, যা অজগর সাপ হয়ে যেত, ২. শুভ্র হাত, যা জামান নিচ থেকে বের করতেই চমকতে থাকত, ৩. মুশের তোৎলামি--যা দুই করে দেওয়া হয়েছিল, ৪. বনী ইসরাঈলকে নদী পার করার জন্য নদীকে দু'ভাগে বিভক্ত করে রাখা করে দেওয়া, ৫. অস্বাভাবিকভাবে পঙ্গপালের আযাব প্রেরণ করা, ৬. তুফান প্রেরণ করা, ৭. শরীরের কাপড়ে এত উকুন সৃষ্টি করা, যা থেকে আশ্রয়-কার কোন উপায় ছিল না, (৮) ব্যাঙের আযাব চাপিয়ে দেওয়া, ফলে প্রত্যেক পানাহারের বস্তুতে ব্যাঙ ফিলবিল করত এবং ৯. রক্তের আযাব প্রেরণ করা। ফলে প্রত্যেক পাতে ও পানাহারের বস্তুতে রক্ত দেখা যেত।

অপর একটি সহীহ হাদীস থেকে জানা যায় যে, এখানে ﴿٥٢﴾ বলে আলাহর বিধি-বিধান বোঝানো হয়েছে। এই হাদীসটি আবু দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযী ও ইবনে মাজায় বিস্তৃত সনদ সহকারে সাক্ষওয়ান ইবনে আসসাল (রা)-এর রেওয়ামেতে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন : জনৈক ইহুদী তার সঙ্গীকে বলল : আমাকে এই নবীর কাছে নিয়ে চল। সঙ্গী বলল : নবী বলো না। সে যদি জানতে পারে যে, আমরাও তাকে নবী বলি, তবে তার চার চক্ষু গজাবে। অর্থাৎ সে গর্বিত ও আনন্দিত হওয়ার সুযোগ পেয়ে যাবে। অতঃপর তারা উভয়েই রসুলুল্লাহ (সা)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে বলল : মুসা (আ) যে নয়টি প্রকাশ্য আয়াত প্রাপ্ত হয়েছিলেন, সেগুলো কি কি? রসুলুল্লাহ (সা) বললেন : ১. আলাহর সাথে কাউকে শরীক করো না, ২. চুরি করো না, ৩. মিনা করো না, ৪. যে প্রাণকে আলাহ হারাম করেছেন, তাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করো না, ৫. কোন নিরপরাধ ব্যক্তিকে মিথ্যা দোষারোপ করে হত্যা ও শাস্তির জন্য পেষ করো না, ৬. যাদু করো না, ৭. সুদ খেয়ো না, ৮. সতীসাহসী নারীর প্রতি ব্যক্তিচরিত্রের অপবাদ আরোপ করো না, ৯. জিহাদের ময়দান থেকে প্রাণ বাঁচিয়ে পলায়ন করো না। হে ইহুদী সম্প্রদায়, বিশেষ করে তোমাদের জন্য এ বিধানও আছে যে, শনিবার সম্পর্কে যেসব বিধান তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে, সেগুলো ভুল করো না।

এসব কথা শুনে উক্ত ইহুদী রসুলুল্লাহ (সা)-এর হস্তপদ চুম্বন করে বলল : আমরা সাক্ষ্য দেই যে, আপনি আলাহর রসূল। তিনি বললেন : তাহলে আমাকে অনুসরণ করতে তোমাদের বাধা কি? তারা বলল : হযরত দাউদ (আ) স্বীয় পাকন-কর্তার কাছে দোয়া করেছিলেন যে, তাঁর বংশধরের মধ্যে যেন সব সময় নবী জন্মগ্রহণ

করবে। আমাদের আশংকা, যদি আমরা আপনাকে অনুসরণ করি, তাহলে ইহদীরা আমাদেরকে বধ করবে।

এই তফসীরটি সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তাই অনেক তফসীরবিদ একেই অগ্রগণ্যতা দান করেছেন।

﴿ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴾

—তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে : কোরআন

তিলাওয়াতের সময় ক্রন্দন করা মুস্তাহাব। হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : যে ব্যক্তি আত্মাহু'র ভয়ে ক্রন্দন করে, সে জাহান্নামে যাবে না, যে পর্যন্ত না দোহন করা দুধ পুনর্বীর স্তনে ফিরে আসে। (অর্থাৎ দোহন করা দুধ স্তনে ফিরে যাওয়া যেমন সম্ভবপর নয়, তেমনিভাবে আত্মাহু'র ভয়ে ক্রন্দনকারী ব্যক্তির জাহান্নামে যাওয়াও অসম্ভব।) অন্য এক রেওয়াজে রয়েছে : আত্মাহু' তা'আলা দু'টি চকুর উপর জাহান্নামের অগ্নি হারাম করেছেন। এক, যে আত্মাহু'র ভয়ে ক্রন্দন করে। দুই, যে ইসলামী সীমান্তের হিফাযতে রাষ্ট্রিকালে জাগ্রত থাকে। (বায়হাকী, হাকিম) হযরত নযর ইবনে সা'দ বলেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : যে সম্প্রদায়ে আত্মাহু'র ভয়ে ক্রন্দনকারী রয়েছে, আত্মাহু' তা'আলা সেই সম্প্রদায়কে তার কারণে অগ্নি থেকে মুক্তি দেবেন।—(রাহল আ'আনী)

আজ মুসলমান জাতি যে মহাবিপদে পতিত আছে, এর কারণ এটাই যে, তাদের মধ্যে আত্মাহু'র ভয়ে ক্রন্দনকারীর সংখ্যা খুবই কম। রাহল মা'আনীর প্রসূকল্পে এখানে আত্মাহু'র ভয়ে ক্রন্দনের ফযীলত সম্পর্কিত অনেক হাদীস উদ্ধৃত করার পর বলেন :

﴿ وَيَذْبَغِي أَنْ يَكُونَ ذَاكَ حَالُ الْعُلَمَاءِ ﴾ অর্থাৎ আলিমদের এরূপ অবস্থাই

হওয়া উচিত। কেননা, ইবনে জরীর, ইবনে মুযির প্রমুখ তফসীরবিদ আবদুল আ'লা তায়মী (রহ)—এর এই উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, যে ব্যক্তি শুধু এমন ইল্ম প্রাপ্ত হয়েছে, যা তাকে ক্রন্দন করায় না, বুঝে নাও যে, সে উপকারী ইল্ম প্রাপ্ত হয়নি।

﴿ قُلْ ادْعُوا اللَّهَ أَوْ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ﴾

﴿ وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴾

﴿ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي

﴿ الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الدُّنْيَا وَكَبِيرًا ۝ ﴾

(১১০) বলুন : আত্মাহু' বলে আহ্বান কর কিংবা রহমান বলে, যে নামেই আহ্বান কর না কেন, সব সুন্দর নাম তারই। আপনি নিজের নামায আদায়কালে এর

উচ্চগ্রামে নিয়ে গিয়ে পড়বেন না এবং নিঃশব্দেও পড়বেন না। এতদুভয়ের মধ্যম পন্থা অবলম্বন করুন। (১১১) বলুনঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি না কোন সন্তান রাখেন, না তার সার্বভৌমত্বে কোন শরীক আছে এবং যিনি দুর্দশাগ্রস্ত হন না, যে কারণে তাঁর কোন সাহায্যকারীর প্রয়োজন হতে পারে। সুতরাং আপনি সসভ্রমে তাঁর সাহায্য বর্ণনা করতে থাকুন।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি বলে দিনঃ তোমরা 'আল্লাহ্' নামে আহ্বান কর অথবা 'রহমান' নামে আহ্বান কর, যে নামেই আহ্বান কর না কেন (তাই ভালো, কারণ) তাঁর জন্য রয়েছে অনেক সুন্দর সুন্দর নাম। (এবং এর সাথে অংশীবাদীতার কোন সম্পর্ক নেই। কারণ একই সত্তার একাধিক নাম হওয়ার ফলে তাঁর একত্ববাদের মধ্যে কোন হেরফের হয় না।) এবং আপনি নিজ নামায় আদায়কালে স্বর উচ্চগ্রামেও নিয়ে যাবেন না (যে, অংশীবাদিরা শুনবে এবং যথেষ্ট বাজে কথা বলবে, ফলে নামায় আদায়রত চিত্ত মনো-মোগছিন্ন হয়ে পড়বে) এবং অতিশয় ক্ষীণভাবেও পড়বেন না (যে, মুক্তাদী নামাযীদেরও শ্রুতিগোচর হবে না। কারণ, তা'হলে তাদের শিক্ষাদীক্ষায় অপূর্ণাঙ্গতা এসে যাবে।) এবং এ দুইয়ের মধ্যবর্তী একটি (মধ্য) পন্থা অবলম্বন করুন (যাতে করে যথো-পযোগিতা ব্যাহত না হয় এবং অবাঞ্ছিত পরিবেশ মুকাবিলা করতে না হয়)। আর (কাফিরদের বক্তব্য শুননের জন্য প্রকাশ্য ঘোষণায়) বলে দিনঃ সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্যে (বিশেষভাবে নির্ধারিত), যিনি না কোন সন্তান গ্রহণ করেন, না তাঁর সার্ব-ভৌমত্বে কোন অংশীদার আছে এবং যিনি দুর্দশাগ্রস্তও হন না, যে কারণে তাঁর সাহায্য-কারীর প্রয়োজন হতে পারে। সুতরাং সসভ্রমে তাঁর সাহায্য ঘোষণা করুন।

### আনুশঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এগুলো সূরা বনী ইসরাঈলের সর্বশেষ আয়াত। এ সূরার প্রারম্ভেও আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্রতা ও তওহীদের বর্ণনা ছিল এবং সর্বশেষ আয়াতগুলোতেও এ বিষয়-বস্তুই বিস্তৃত হয়েছে। কয়েকটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। এক, রসূলুল্লাহ্ (সা) একদিন দোয়াক 'ইয়া আল্লাহ্' ইয়া রহমান বলে আহ্বান করলে মুশরিকরা মনে করতেন থাকে যে, তিনি দু' আল্লাহকে আহ্বান করেন। তারা বলাবলি করতে থাকে যে, আমাদেরকে তো একজন ব্যতীত অন্য কাউকে ডাকতে নিষেধ করেন অথচ নিজেই দু' উপাস্যকে ডাকেন। আয়াতের প্রথম অংশে এর জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার দু'টিই নয়, আরও অনেক সুন্দর সুন্দর নাম আছে। যে নামেই ডাকা হবে, উদ্দেশ্য একই সত্তা। কাজেই তোমাদের জল্পনা-কল্পনা ভ্রান্ত।

দ্বিতীয় ঘটনা এই যে, মক্কায় রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন নামাযে উচ্চ স্বরে তিলাওয়াত করতেন, তখন মুশরিকরা তাঁটী-বিদ্রূপ করত এবং কেলরআন, জিবরাঈল ও স্বয়ং আল্লাহ্



নির্দেশও আছে যে, মানুষ যতই আল্লাহ তা'আলার ইবাদত ও ভসবীহ পাঠ করুক, নিজের আমলকে কম মনে করা এবং দু'টি স্বীকার করা তার জন্য অপরিহার্য। (মায়হারী)

হযরত আনাস (রা) বলেন : আবদুল মুত্তালিবের পরিবারে যখন কোন শিশু কথা বলার যোগ্য হয়ে যেত, তখন রসূলুলাহ্ (সা) তাকে এ আয়াত শিখিয়ে দিতেন :

قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمَلِكِ  
وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِنَ الدَّلِّ وَكِبْرًا كَبِيرًا

হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন : একদিন আমি রসূলুলাহ্ (সা)-এর সাথে বাইরে গেলাম। তখন আমার হাত তাঁর হাতে অবদ্ধ ছিল। তিনি জনৈক দুর্দশাগ্রস্ত ও উন্মিষ্ট ব্যক্তির কাছে দিয়ে পমন করার সময় তাকে জিজ্ঞেস করলেন : তোমার এই দুর্দশা কেন? লোকটি আশ্রয় করল : রোগব্যাধি ও দারিদ্র্যের কারণে রসূলুলাহ্ (সা) বললেন : আমি তোমাকে কয়েকটি বাক্য বলে দিই। এগুলো পাঠ করলে

তোমার রোগব্যাধি ও অভাব-জনটন দূর হয়ে যাবে। বাক্যগুলো এই: **تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ**

এর কিছু দিন **الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا** **الْآيَةَ**

পর রসূলুলাহ্ (সা) আমার সে দিকে গমন করলে লোকটিকে সুখী দেখতে পেয়ে আনন্দ প্রকাশ করলেন। সে আরম্ভ করল : যেদিন আপনি আমাকে বাক্যগুলো বলে দেন, সেদিন থেকে নিয়মিতই সেগুলো পাঠ করি।—(মায়হারী)

## সূরা কাহ্‌ফ

মক্কায় অবতীর্ণ : ১১০ আয়াত : ১২ রুক্ব

সূরা কাহ্‌ফের বৈশিষ্ট্য ও কবীলত : মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও মসনদ আহমদে হযরত আবুদান্দা থেকে একটি রেওয়াজেতে বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি সূরা কাহ্‌ফের প্রথম দশ আয়াত মুখস্থ করেন, সে দাজ্জালের ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকবে। উল্লিখিত গ্রন্থসমূহে হযরত আবুদান্দা থেকেই অপরা একাধিক রেওয়াজেতে এই বিষয়বস্তুর সূরা কাহ্‌ফের শেষ দশ আয়াত মুখস্থ করা সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে।

মসনদে আহমদে হযরত সাহল ইবনে সু'আযের রেওয়াজেতে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (সা) বলেন যে ব্যক্তি সূরা কাহ্‌ফের প্রথম ও শেষ আয়াতগুলো পাঠ করে, তার জন্য তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত একটি নূর হয়ে যায় এবং যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ সূরা পাঠ করে, তার জন্য জমিন থেকে আসমান পর্যন্ত নূর হয়ে যায়।

কোন কোন রেওয়াজেতে বর্ণিত রয়েছে, যে ব্যক্তি শুক্রবার দিন সূরা কাহ্‌ফ তিলাওয়াত করে, তার পা থেকে আকাশের উচ্চতা পর্যন্ত নূর হয়ে যাবে, যা কিয়ামতের দিন আলো দেবে এবং বিগত জুম'আ থেকে এই জুম'আ পর্যন্ত তার সব গোনাহ্‌ মাকফ হয়ে যাবে।—( ইমাম ইবনে-কাসীর এই রেওয়াজেতটিকে মওকুফ বলেছেন। )

হাফেয জিয়া মুকাদ্দাসী 'মুখতারাহ্' গ্রন্থে হযরত আলী (রা)-এর রেওয়াজেতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (সা) বলেন : যে ব্যক্তি জুম'আর দিন সূরা কাহ্‌ফ পাঠ করবে, সে আট দিন পর্যন্ত সর্বপ্রকার ফিতনা থেকে মুক্ত থাকবে। যদি দাজ্জাল বের হয়, তবে সে তার ফিতনা থেকেও মুক্ত থাকবে।—( এসব রেওয়াজেতে ইবনে-কাসীর থেকে গৃহীত। )

রাহুল-মা'আনীতে হযরত আনাস (রা)-এর বর্ণিত রেওয়াজেতে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন : সূরা কাহ্‌ফ সম্পূর্ণটুকু এক সময়ে নাযিল হয়েছে এবং সত্তর হাজার ফিরিশতা এর সঙ্গে আগমন করেছেন। এতে এর মাহাত্ম্য প্রকাশ পায়।

শানে নুহুল : ইমাম ইবনে জারীর তাবারী হযরত ইবনে আক্বাসের রেওয়াজেতে বর্ণনা করেন : যখন মক্কায় রসূলুল্লাহ (সা)-এর নবুয়তের চর্চা শুরু হয় এবং কোরাযশরী তাতে বিরত বোধ করতে থাকে, তখন তারা নযর ইবনে হারিস ও ওকবা ইবনে আবী মুস্লামাকে মদীনার ইহদী আলিমদের কাছে প্রেরণ করে। তারা পূর্ববর্তী গ্রন্থ তওরাত ও ইঞ্জিলের পণ্ডিত ছিল। রসূলুল্লাহ (সা) সম্পর্কে তারা কি বলে, একথা জানার জন্য এই প্রতিনিধি দল প্রেরিত হয়েছিল। ইহদী আলিমরা তাদেরকে বলে দেন যে, তোমরা তাঁকে ভিনটি প্রশ্ন কর। তিনি এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিলে বুঝে নাও যে, তিনি

আল্লাহর রসূল। অন্যথায় বুঝতে হবে যে, তিনি একজন বাগাড়ম্বরকারী—রসূল নন। এক, তাঁকে ঐসব যুবকের অবস্থা জিজ্ঞেস কর, যারা প্রাচীনকালে শহর ছেড়ে চলে গিয়েছিল। তাদের ঘটনা কি? কেননা, এটা অত্যন্ত বিস্ময়কর ঘটনা। দুই, তাঁকে সে ব্যক্তির অবস্থা জিজ্ঞেস কর, যে পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম এবং সারা বিশ্ব সফর করেছিল। তার ঘটনা কি? তিনি, তাঁকে রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন কর যে, এটা কি?

উভয় কোরাযশী মক্কায় ফিরে এসে দ্রাতৃসমাজকে বলল : আমরা একটি চূড়ান্ত ফয়সালার পরিস্থিতি সৃষ্টি করে ফিরে এসেছি। অতঃপর তারা তাদেরকে ইহদী আলিমদের কাহিনী শুনিয়ে দিল। কোরাযশরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এ প্রশ্নগুলো নিয়ে হাজির হল। তিনি শুনে বললেন : আগামীকাল উত্তর দেব। কিন্তু তিনি ইনশাআল্লাহ্ বলতে ভুলে গেলেন। কোরাযশরা ফিরে গেল। রসূলুল্লাহ্ (সা) ওহীর আলোকে জওয়াব দেবার জন্য ওহীর অপেক্ষায় রইলেন। কিন্তু ওয়াদা অনুযায়ী পরদিবস পর্যন্ত ওহী আগমন করল না। বরং পনের দিন এ অবস্থায়ই কেটে গেল। ইতিমধ্যে জিবরাঈলও এলেন না এবং কোন ওহীও নাযিল হল না। অবস্থাদুটে কোরাযশরা ঠাট্টা-বিদ্রূপ আরম্ভ করে দিল। এতে রসূলুল্লাহ্ (সা) খুবই দুঃখিত ও চিন্তিত হলেন।

পনের দিন পর জিবরাঈল সূরা কাহ্‌ফ নিয়ে অবতরণ করলেন। এতে ওহীর বিশেষের কারণও বর্ণনা করে দেওয়া হল যে, ভবিষ্যতে কোন কাজ করার ওয়াদা করা হলে ইনশাআল্লাহ্ বলা উচিত। এ ঘটনায় এরূপ না হওয়ার কারণে হ'শিয়ান করার জন্য বিলম্বে ওহী নাযিল করা হয়েছে। এ সম্পর্কে এ সূরায় নিম্নোক্ত আয়াত আসবে :

— وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكُمْ غَدًا ۚ لَأَنْ يَشَاءَ اللَّهُ

যুবকদের ঘটনাও পুরোপুরি বর্ণনা করা হয়েছে। তাদেরকে 'আসহাবে কাহ্‌ফ' বলা হয়। পূর্ব ও পশ্চিমে সফরকারী যুলকারনাইনের ঘটনাও বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে এবং রাহ্ সম্পর্কিত প্রশ্নের জওয়াবও।—(কুরতুবী, মাযহারী) কিন্তু রাহ্ সম্পর্কিত প্রশ্নের জওয়াব সংক্ষেপে দেওয়াই সমীচীন ছিল। তাই সূরা বনী ইসরাঈলের শেষে আলাদাভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং এ কারণেরই সূরা কাহ্‌ফকে সূরা বনী ইসরাঈলের পরে স্থান দেওয়া হয়েছে।—(সুন্নতী)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ۝

قِيمًا لِيَنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِمَّنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ

يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ۝ مَا كَثِيرٌ فِيهِ آيَاتٌ

وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۚ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا  
 لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ۚ إِنَّ يَقُولُونَ إِلَّا  
 كَذِبًا ۚ فَلِعَاكَ يَا خَيْرُ نَفْسِكَ عَلَىٰ أَثَرِهِمْ ۚ إِنَّ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا  
 الْحَدِيثِ آسَفًا ۚ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا  
 لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا  
 جَدْرًا ۚ

পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে

(১) সব প্রশংসা আল্লাহর যিনি নিজের বান্দার প্রতি এ গ্রন্থ নাযিল করেছেন এবং তাতে কোন বক্তৃতা রাখেননি। (২) একে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন যাতে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি ভীষণ বিপদের ভয় প্রদর্শন করে এবং মু'মিনদেরকে—যারা সৎকর্ম সম্পাদন করে—তাদেরকে এই সুসংবাদ দান করে যে, তাদের জন্য উত্তম প্রতিদান রয়েছে। (৩) তারা তাতে চিরকাল অবস্থান করবে। (৪) এবং তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করার জন্য যারা বলে যে, আল্লাহ সন্তান রাখেন। (৫) এ সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞান নেই এবং তাদের পিতৃপুরুষদেরও নেই। কত বড় তাদের মুখনিসৃত কথা। তারা যা বলে তা তো সবই মিথ্যা। (৬) যদি তারা এই বিষয়বস্তুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করে, তবে তাদের পশ্চাতে সত্ত্বত আপনি পরিভাষা করতে করতে নিজের প্রাণ নিপাত করবেন। (৭) আমি পৃথিবীস্থ সব কিছুকে পৃথিবীর জন্য শোভা করেছি, যাতে লোকদের পরীক্ষা করি যে, তাদের মধ্যে কে ভাল কাজ করে। (৮) এবং তার উপর যা কিছু রয়েছে, অবশ্যই তা আমি উদ্ভিদশূন্য মৃত্তিকায় পরিণত করে দেব।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

সব প্রশংসা আল্লাহর যিনি নিজের (বিশেষ) বান্দা [মুহাম্মদ (সা)]-এর প্রতি এ গ্রন্থ নাযিল করেছেন এবং এতে (এ গ্রন্থে কোন প্রকার) সামান্যও বক্তৃতা রাখেননি (শাস্তিকণ্ড নয় যে, অলংকার শাস্ত্রের পরিপন্থী হবে এবং অর্থগতও নয় যে, এর কোন বিধান হিকমতের বিরুদ্ধে যাবে; বরং একে) সম্পূর্ণ সঠিক হওয়ান্না গুণে গুণান্বিত করেছেন। (নাযিল এ জন্য করেছেন) যাতে তা (অর্থাৎ এ গ্রন্থ কাকিরদেরকে সাধারণভাবে) একটি ঘোর বিপদের—যা আল্লাহর পক্ষ থেকে (তাদের উপর পরকালে) পতিত হবে—ভয় প্রদর্শন করে এবং বিশ্বাসীদেরকে—যারা সৎকর্ম সম্পাদন করে—সুসংবাদ



দান করে যে, তারা পরকালে উত্তম প্রতিদান পাবে। তাতে তারা চিরকাল থাকবে এবং যাতে (কাফিরদের মধ্য থেকে বিশেষভাবে) তাদেরকে (আযাবের) ভয় প্রদর্শন করে যারা বলে : (নাউযুবিল্লাহ্) আল্লাহ্ তা'আলা সন্তান রাখেন। (সন্তানের বিশ্বাস পোষণকারী কাফিরদেরকে সাধারণ কাফির থেকে আলাদা করে বর্ণনা করার কারণ এই যে, এই দ্রাস্ত বিশ্বাসে আযাবের সাধারণ লোক—মুশরিক, ইহুদী ও খৃস্টান সবাই লিপ্ত ছিল।) এর কোন প্রমাণ তাদের কাছে নেই এবং তাদের পিতৃপুরুষের কাছেও নেই। খুব গুরুতর কথা তাদের মুখ থেকে বের হয়েছে। তারা যা বলে, তা তো সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে। (এটা যুক্তির দিক দিয়েও অসম্ভব। কোন স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিও এর প্রবৃত্তা হতে পারে না। আপনি তাদের কুফর ও অস্বীকারের কারণে এতটুকু দুঃখিত যে) যদি তারা এই (কোরআনী) বিষয়বস্তুতে বিশ্বাস স্থাপন না করে, তবে সম্ভবত আপনি তাদের পশ্চাতে দুঃখ করতে করতে নিজের প্রাণ নিপাত করবেন! (অর্থাৎ এতটুকু দুঃখ করবেন না যে, নিজেকে ধ্বংসের সম্মুখীন করে দেবেন। কারণ, এই বিশ্ব পরীক্ষা কেন্দ্র। এখানে ঈমান, কুফর এবং ভাল-মন্দের সমাবেশই থাকবে এরূপ হবে না যে, সবাই ঈমানদার হয়ে যাবে। এ পরীক্ষার জন্যই) আমি পৃথিবীস্থ বস্তুসমূহকে তার (পৃথিবীর) জন্য শোভা করেছি, যাতে (এর মাধ্যমে) মানুষের পরীক্ষা নেই যে, কে তাদের মধ্যে ভাল কাজ করে। (অর্থাৎ এরূপ পরীক্ষা নেওয়া উদ্দেশ্য যে, কে দুনিয়ার সাজ-সজ্জা ও চাকচিক্যে মুগ্ধ হয়ে আল্লাহ্ ও পরকাল থেকে বিমুগ্ধ হয়ে যায় এবং কে হয় না। মোটকথা এই যে, এটা পরীক্ষা জগত। সৃষ্টিগতভাবে এখানে কেউ মু'মিন হবে এবং কেউ কাফির থাকবে। অতএব চিন্তা অনর্থক। আপনি নিজের কাজ করে যান এবং তাদের কুফরের ফল দুনিয়াতেই প্রকাশিত হওয়ার অপেক্ষা করবেন না। কেননা, এটা আমার কাজ। নির্দিষ্ট সময়ে হবে। সেমতে এমন একদিন আসবে যে,) আমি পৃথিবীস্থ সবকিছুকে একটি খোলা ময়দান করে দেব। (তখন এখানে কোন বসতকান্নী থাকবে না এবং কোন স্বল্প, পাহাড়, দালান-কোঠা ইত্যাদি কিছুই থাকবে না। মোটকথা এই যে, আপনি প্রচার কাজ অব্যাহত রাখুন। অবিশ্বাসীদের কুপন্থিগামের জন্য এত দুঃখিত হবেন না।)

### আনুশঙ্গিক জাতব্য বিষয়

عَوَجٌ — وَ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ عَوْجًا قِيمًا

দিকে ঝুঁকে পড়া। কোরআন পাক শাস্তিক ও আর্থিক উৎকর্ষে এ থেকে পবিত্র। অজং-কাল শাস্ত্রের দিক দিয়েও এর কোন জায়গায় এতটুকু হ্রুটি অথবা বক্রতা থাকতে পারে

না এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞার দিক দিয়েও নয়। وَ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ عَوْجًا

ধনাঙ্ক আকারে ব্যক্ত হয়েছে, তাগিদে জন্ম এ অর্থকেই **قِيمًا** শব্দের মধ্যে ধনাঙ্ক

আকারে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কেননা, **قِيمًا** -এর অর্থ হচ্ছে **مُسْتَقِيمًا** (সঠিক)।

**مُسْتَقِيمًا** তাকেই বলা হবে, যার মধ্যে সামান্যতম বক্রতা এবং একদিকে ঝোঁক না থাকে। এখানে **قِيم** শব্দের আরও একটি অর্থ হতে পারে; অর্থাৎ রক্ষক ও হিফায়ত-কারী। এ অর্থের দিক দিয়ে উদ্দেশ্য এই যে, কোরআন পাক নিজে যেমন সম্পূর্ণ এবং সর্বপ্রকার বক্রতা, ভ্রুটি ও বাড়াবাড়ি থেকে মুক্ত, তেমনিভাবে সে অপনুকেও সঠিক পথে রাখে এবং বান্দাদের যাবতীয় উপকারিতার হিফায়ত করে। এখন উভয় শব্দের সার-সংক্ষেপ এই যে, কোরআন পাক নিজেও সম্পূর্ণ এবং মানুষকেও স্বয়ংসম্পূর্ণকারী।— (মাযহারী)

**إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا** --- অর্থাৎ পৃথিবীর জীবজন্তু, উদ্ভিদ,

জড় পদার্থ এবং ভূগর্ভস্থ বিভিন্ন বস্তুর খনি---এগুলো সবই পৃথিবীর সাজসজ্জা ও চাক-চিক্য। এখানে প্রশ্ন হয় যে, পৃথিবীর সৃষ্টজীবের মধ্যে সাপ, বিহু, হিংস্র জন্তু এবং অনেক ক্ষতিকর ও ধ্বংসাত্মক বস্তু রয়েছে। এগুলোকে পৃথিবীর সাজসজ্জা ও চাক-চিক্য কিরূপে বলা যায়? উত্তর এই যে, দুনিয়াতে যেসব বস্তু বাহ্যত ধ্বংসাত্মক ও খারাপ, সেগুলো একদিক দিয়ে খারাপ হলেও সমষ্টিগতভাবে কোন কিছুই খারাপ নয়। কেননা, প্রত্যেক মন্দ বস্তুর মধ্যে অন্যান্য নানা দিক দিয়ে আল্লাহ তা'আলা অনেক উপকারও নিহিত রেখেছেন। বিষাক্ত জন্তু ও হিংস্র প্রাণীদের দ্বারা মানুষের চিকিৎসা ইত্যাদি সংক্রান্ত হাজারো অভাব পূরণ করা হয়। তাই যেসব বস্তু একদিক দিয়ে মন্দ, বিশ্বচরাচরের গোটা কারখানার দিক দিয়ে সেগুলোও মন্দ নয়। কবি চমৎকার বলেছেন :

نہیں ہے چہز نکمی کوئی ز ما نے میں  
کوئی برا نہیں قدرت کے کا رخا نے میں

**أَمْ حَسِبْتُمْ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا ۝**

**إِذْ أَوْسَى الْفِتْيَةَ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً**

وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ۝ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي

الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ۝ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْجَزْبِينَ

أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمْدًا ۝

(৯) আপনি কি ধারণা করেন যে, ওহা ও গর্তের অধিবাসীরা আমার নিদর্শনাবলীর মধ্যে বিস্ময়কর ছিল? (১০) যখন যুবকরা পাহাড়ের ওহায় অপ্রয় গ্রহণ করে তখন দোয়া করে : হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে নিজের কাছ থেকে রহমত দান করুন এবং আমাদের জন্য আমাদের কাজ সঠিকভাবে পূর্ণ করুন। (১১) তখন আমি কয়েক বছরের জন্য ওহায় তাদের কানের উপর নিদ্রার পদা ফেলে দেই। (১২) অতঃপর আমি তাদেরকে পুনরুজ্জিত করি, একথা জানার জন্য যে, দুই দলের মধ্যে কোন দল তাদের অবস্থানকাল সম্পর্কে অধিক নির্ণয় করতে পারে।

শব্দার্থ : فَهَيِّئْ—এর অর্থ বিস্তীর্ণ পার্বত্য ওহা। বিস্তীর্ণ না হলে তাকে غار বলা হয়। مَرْقُومٍ—এর শাব্দিক অর্থ স্রুতি বা লিখিত বস্তু। এস্থলে কিবোঝানো হয়েছে, এ সম্পর্কে তফসীরবিদগণের বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত রয়েছে। হযরত ইবনে আক্বাসের রেওয়াজেতে দৃষ্টে যাহ্‌ফাক, সুন্দী ও ইবনে সুবায়নের মতে এর অর্থ একটি লিখিত ফলক। সমসাময়িক বাদশাহ্ এই ফলকে আসহাবে কাহ্‌ফের নাম লিপিবদ্ধ করে ওহায় প্রবেশ পথে ঝুলিয়ে রেখেছিল। এ কারণেই আসহাবে-কাহ্‌ফকে রুকীমও ভলা হয়। কাতাদাহ, আতিয়া, আউফী ও মুজাহিদ বলেন : রুকীম সে পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত উপত্যকার নাম, যাতে আসহাবে-কাহ্‌ফের ওহা ছিল। কেউ কেউ স্বয়ং পাহাড়টিকেই রুকীম বলেছেন। হযরত ইব্রাহীম বলেন : আমি ইবনে আক্বাসকে বলতে শুনেছি যে, রুকীম কোন লিখিত ফলকের নাম না জনবসতির নাম, তা আমার জানা নেই। কা'ব আহ্বার, ওয়াহাব ইবনে মুনাবেহ হযরত ইবনে আক্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, রুকীম নামে অবস্থিত আয়লাহ্ অর্থাৎ, আকাবার নিকটবর্তী একটি শহরের নাম। قَابِئَةَ

শব্দটি বহুবচন। এর একবচন فَتَى—অর্থ যুবক। فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ—এর

শাব্দিক অর্থ কর্ণকুহর বন্ধ করে দেওয়া। অচেতন নিদ্রাকে এই ভাষায় ব্যক্ত করা হয়। কেননা, নিদ্রায় সর্বপ্রথম চক্ষু বন্ধ হয়, কিন্তু কান সক্রিয় থাকে। আওয়াজ শোনা যায়। অতঃপর যখন নিদ্রা পরিপূর্ণ ও প্রবল হয়ে যায়, তখন কানও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। জাগরণের সময় সর্বপ্রথম কান সক্রিয় হয়। আওয়াজের কারণে নিদ্রিত ব্যক্তি সচকিত হয়, অতঃপর জাগ্রত হয়।

## তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি কি এ ধারণা করেন যে, আসহাবে কাহ্ফ ও আসহাবে রক্বীম (এ দু'টি একই দলের উপাধি) আমার নিদর্শনাবলীর মধ্যে বিফলকর নিদর্শন ছিল? [যেমন ইহদীরা বলেছিল যে, তাদের ঘটনা আশ্চর্যজনক অথবা স্বয়ং প্রমত্তকারী কোরআনশরীফ একে আশ্চর্যজনক মনে করে প্রমত্ত করেছিল! এখানে রসূলুল্লাহ (সা)-কে সম্বোধন করে অন্য লোকদেরকে শোনানো উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, এ ঘটনাটি যদিও আশ্চর্যজনক, কিন্তু আল্লাহ তা'আলার অন্যান্য আশ্চর্য বস্তুর মুকাবিলায় এতটুকু আশ্চর্যজনক নয়, যতটুকু তারা মনে করেছে। কেননা, যমীন, আসমান, চন্দ্র ও সমগ্র সৃষ্টজগতকে অসম্ভিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনয়ন করাটা আসল আশ্চর্যজনক ব্যাপার। কয়েকজন যুবকের দীর্ঘকাল পর্যন্ত নিদ্রিত থাকা, অতঃপর জাগ্রত হওয়া তার মুকাবিলায় মোটেই আশ্চর্যজনক ব্যাপার নয়। এই ভূমিকার পর আসহাবে কাহ্ফের কাহিনী এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে:] ঐ সময়টি সম্মুখযোগ্য, যখন যুবকরা (তৎকালীন বে-দ্বীন বাদশাহের কবুল থেকে পলায়ন করে) গুহায় (যার কাহিনী পরে বর্ণিত হবে) আশ্রয় গ্রহণ করে। অতঃপর (আল্লাহর কাছে এভাবে দোয়া করে যে,) তারা বলে : হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে নিজের কাছ থেকে রহমত দান করুন এবং আমাদের (এ) কাজকে সঠিক করুন। (সম্ভবত রহমত বলে উদ্দেশ্য সাধন এবং সঠিক করা বলে উদ্দেশ্য সাধনে জরুরী উপকরণাদি বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাদের দোয়া কবুল করেন এবং তাদের হিফায়ত ও সক্ষম প্রকার পেরেশানী থেকে মুক্তির উপায় এভাবে বর্ণনা করেন যে,) আমি গুহায় কয়েক বছরের জন্য তাদের কামের উপর নিদ্রার পর্দা ফেলে দেই। অতঃপর আমি তাদেরকে (নিদ্রা থেকে) পুনরুজ্জীবিত করি (বাহিকভাবেও) একথা জানার জন্য যে, (গর্তে অবস্থানকাল সম্পর্কে মত্তভেদকারীদের মধ্য থেকে) কোন দল তাদের অবস্থানের সময় সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত ছিল। (নিদ্রা থেকে জাগ্রত হওয়ার পর তাদের একদলের বক্তব্য ছিল এই যে, আমরা পূর্ণ একদিন অথবা একদিনের কিছু অংশ ঘুমিয়েছি। অপর দল বলল : আল্লাহ তা'আলাই জানেন যে, তোমরা কতদিন ঘুমিয়েছ। অঃয়াতে এদিকেই ইঙ্গিত রয়েছে যে দ্বিতীয় দলই অধিক জ্ঞাত ছিল। তারা সময় নির্ধারণের ব্যাপারটি আল্লাহর উপরই ছেড়ে দেয়। কারণ, এর কোন প্রমাণ তাদের কাছে ছিল না।)

## আনুমানিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আসহাবে কাহ্ফ ও রক্বীমের কাহিনী : এ কাহিনীতে কয়েকটি আলোচ্য বিষয় আছে। এক, 'আসহাবে কাহ্ফ' ও 'আসহাবে রক্বীম' একই দলের দুই নাম, না তারা আলাদা দু'টি দল? যদিও কোন সহীহ হাদীসে এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোন বর্ণনা নেই, কিন্তু ইমাম বুখারী 'সহীহ' নামক গ্রন্থে আসহাবে কাহ্ফ ও আসহাবে রক্বীমের দু'টি আলাদা আলাদা শিরোনাম রেখেছেন। অতঃপর আসহাবে রক্বীম শিরোনামের অধীনে তিন ব্যক্তির গুহায় আটক পড়া, তৎপর দোয়ার মাধ্যমে রাস্তা খুলে যাওয়ার প্রসিদ্ধ কাহিনীটি উল্লেখ করেছেন, যা সব হাদীস গ্রন্থেই বিস্তারিতভাবে বিদ্যমান আছে। ইমাম

বুখারীর এ কাজ থেকে বোঝা যায় যে, তাঁর মতে আসহাবে কাহ্ফ ও আসহাবে রুকীম পৃথক পৃথক দু'টি দল এবং আসহাবে রুকীম ঐ তিন ব্যক্তিকে বলা হয়েছে। যারা কোন সময় পাহাড়ের গুহার আশ্রয়পত্র করেছিল। এরপর পাহাড়ের একটি বিরাট পাথর গুহার মুখে পড়ে যাওয়ার গুহা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায় এবং তাদের বের হওয়ার পথ থাকে না। আটক ব্যক্তিদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ সংস্রাজের ওসীলা দিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করে যে, যদি আমরা এ কাজটি খাঁটিভাবে আপনার সন্তুষ্টির জন্য করে থাকি, তবে নিজ রূপায় আমাদের পথ খুলে দিন। প্রথম ব্যক্তির দোয়ার পাথর কিছুটা সরে যায়। ফলে ভিতরে আলো আসতে থাকে। দ্বিতীয় ব্যক্তির দোয়ার আরও একটু সরে যায় এবং তৃতীয় ব্যক্তির দোয়ার রাস্তা সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হয়ে যায়।

কিন্তু হাফেয ইবনে হাজার (রহ) বুখারীর টীকায় বলেছেন যে, উপরোক্ত তিন ব্যক্তির নাম আসহাবে রুকীম, হাদীসদৃষ্টে এর কোন সুস্পষ্ট প্রমাণ নেই। ব্যাপার এতটুকু যে, গুহার ঘটনার বর্ণনাকারী নো'মান ইবনে বশীরের রেওয়াজেতে কোন কোন রাবী এই কথাগুলো সংযুক্ত করেছেন : নো'মান ইবনে বশীর বলেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে রুকীমের প্রসঙ্গে আলোচনা করতে শুনেছি। তিনি গুহায় আবদ্ধ তিন ব্যক্তির ঘটনা বর্ণনা করেছিলেন। এই অতিরিক্ত কথাগুলো ফতহুল বাহীতে বাযযার ও তাবারানীর রেওয়াজেতে উদ্ধৃত হয়েছে। কিন্তু প্রখ্যাত সিহাহ্ সিন্ধা ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে এই হাদীসের সাধারণ রাবীদের যেসব রেওয়াজেতে বিদ্যমান আছে, সেগুলোতে কেউ নো'মান ইবনে বশীরের উপরোক্ত বাণ্য উদ্ধৃত করেননি। স্বয়ং বুখারীর রেওয়াজেতেও এই বাণ্য থেকে মুক্ত। দ্বিতীয়ত এই বাণ্যেও এ কথার উল্লেখ নেই যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) গুহায় আবদ্ধ তিন ব্যক্তিকে আসহাবে রুকীম বলেছিলেন। বরং বলা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) রুকীমের প্রসঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। এবং এ প্রসঙ্গে তিন ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেছিলেন। রুকীমের অর্থ সম্পর্কে সাহাবী, তাবয়ী ও সংখ্যাগরিষ্ঠ তফসীরবিদদের মধ্যে যে মতবিরোধ উপরে বর্ণিত হয়েছে এটাই তার প্রমাণ যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে রুকীমের অর্থ নির্ধারণ সম্পর্কে কোন হাদীস ছিল না। মতুবা রসূলুল্লাহ্ (সা) কোন অর্থ নির্দিষ্ট করে দিলে সাহাবী, তাবয়ী ও অন্যান্য তফসীরবিদ এর বিপরীতে অন্য কোন অর্থ নেননি—এটা কিরূপে সম্ভবপর ছিল? এ কারণেই বুখারীর টীকাকার হাফেয ইবনে হাজার আসহাবে কাহ্ফ ও আসহাবে রুকীমের দু'টি আলাদা আলাদা দল হওয়ার বিষয়টিকে অস্বীকার করেছেন। তাঁর মতে একই দলের দুই নাম হওয়াই ঠিক। রুকীমের আলোচনার সাথে সাথে গুহার আবদ্ধ তিন ব্যক্তির আলোচনা এসে গেছে। এ থেকে জরুরী হয় না যে, এই তিন ব্যক্তিই আসহাবে রুকীম ছিল।

এস্থলে হাফেয ইবনে হাজার একথাও প্রকাশ করেছেন যে, আসহাবে কাহ্ফ সম্পর্কে কোরআনের পূর্বাপর বর্ণনা স্বয়ং ব্যক্ত করছে যে, আসহাবে কাহ্ফ ও আসহাবে রুকীম একই দল। এ কারণেই অধিকাংশ তফসীরবিদগণ এ বিষয়ে একমত যে, তাঁরা একই দল।

দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয় হচ্ছে স্বয়ং এ কাহিনীর বিবরণ। এর দু'টি অংশ আছে। এক, এ কাহিনীর প্রাণ ও আসল উদ্দেশ্য, যন্ত্রদ্বারা ইহুদীদের প্রণয়ের জওয়াব হয়ে যায়

এবং মুসলমানদের জন্য হিদায়েত ও উপদেশ। ত্রিতীয় অংশের সম্পর্ক শুধু এ কাহিনীর ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক পটভূমিকার সাথে। আসল উদ্দেশ্য বর্ণনায় এর বিশেষ কোন প্রভাব নেই। উদাহরণত ঘটনাটি কোন কালে এবং কোন শহরে ও জনপদে সংঘটিত হয় যে, কাফির বাদশাহর কাছ থেকে পলায়ন করে তাঁরা গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন, সে কে ছিল? তার ধর্ম বিশ্বাস ও চিন্তাধারা কি ছিল? সে তাঁদের সাথে কি ব্যবহার করেছিল, যত্নরূপে তাঁরা পলায়ন করতে ও গুহায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন? তাঁদের সংখ্যা কত ছিল? তাঁরা কতকাল হুমত অবস্থায় ছিলেন? তাঁরা এখনও জীবিত আছেন, না মরে গেছেন?

কোরআন পাক স্মীয় বিশ্বজনোচিত মূলনীতি ও বিশেষ বর্ণনা পদ্ধতি অনুযায়ী সমগ্র কোরআনে একটি মাত্র কাহিনী তথা ইউসুফ-কাহিনী ব্যতীত কোন কাহিনী সাধারণ ঐতিহাসিক গ্রন্থাদির অনুরূপ পূর্ণ বিবরণ ও ক্রমসহকারে বর্ণনা করেনি; বরং প্রত্যেক কাহিনীর শুধু ঐ অংশ স্থানে স্থানে বর্ণনা করেছে, যা মানবীয় হিদায়েত ও শিক্ষার সাথে সম্পর্কযুক্ত। (ইউসুফ-কাহিনীকে এ পদ্ধতির বাইরে রাখার কারণ সূরা ইউসুফের তফসীরে বর্ণিত হয়েছে।)

আসহাবে কাহ্ফের কাহিনীতেও এ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। কোরআন বর্ণিত অংশগুলোর এর আসল উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত। অবশিষ্ট যেসব অংশ নিজেই ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক, সেগুলো উল্লেখ করা হয়নি। আসহাবে কাহ্ফের সংখ্যা ও হুমের সময়কাল সম্পর্কিত প্রমাণও এখানে উল্লেখ করা হয়েছে এবং জওয়াবের প্রতিও ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে, কিন্তু সাথে সাথে এ নির্দেশও প্রদত্ত হয়েছে যে, এ জাতীয় প্রসঙ্গে বেশি চিন্তা-ভাবনা ও তর্ক-বিতর্ক করা সমীচীন নয়। এগুলো আল্লাহর উপরই ছেড়ে দেওয়া উচিত।

কোরআনের শিক্ষা বর্ণনা করা রসুলুল্লাহ (সা)-এর অভীষ্ট কর্তব্য ছিল। উপরোক্ত কারণে তিনিও কাহিনীর এসব অংশ বর্ণনা করেননি। প্রধান প্রধান সাহাবী ও তাবেয়ীগণ কোরআনী বর্ণনা-পদ্ধতি অনুযায়ীই এ ধরনের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত কর্মপন্থা অবলম্বন করেছেন : **يُؤْمَرُ مَا لَا يَنْفَعُ** অর্থাৎ, যেসব বিষয়কে আল্লাহ তা'আলা অস্পষ্ট রেখেছেন, সেগুলোকে তোমরাও অস্পষ্ট থাকতে দাও। (কারণ এতে আলোচনা ও গবেষণা উপকারী নয়।)---(ইতকান, সূরুতী)

প্রধান প্রধান সাহাবী ও তাবেয়ীগণের এই কর্মপন্থার তাগিদ অনুযায়ী এই তফসীরেও কাহিনীর এসব অংশ বাদ দেওয়া উচিত ছিল, যেগুলো কোরআন ও হাদীস বাদ দিয়েছে। কিন্তু বর্তমান যুগে ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক তথ্য আবিষ্কারকেই সর্বত্রই কৃত্রিম মনে করা হয়। পরবর্তী যুগের তফসীরবিদগণ এ জন্যই তাঁদের গ্রন্থে কম-বেশি এসব অংশও বর্ণনা করেছেন। তাই আলোচ্য তফসীরে কাহিনীর যেসব অংশ স্বয়ং কোরআনে উল্লিখিত আছে, সেগুলো তো আয়াতের তফসীরের অধীনে বর্ণিত হবেই, এছড়া অবশিষ্ট ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক অংশও প্রয়োজন অনুসারে বর্ণনা করা হচ্ছে। বর্ণনা করার

—অর্থাৎ— ثُمَّ بَدَأَ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا آيَاتِ لَيْسَجْنَةِ حَتَّىٰ حِينٍ

এর পর আশীষ ও তাঁর পার্শ্বদবর্গ কিছু দিনের জন্য ইউসুফ (আ)-কে জেলে আবদ্ধ রাখাটাই মঙ্গলজনক বলে বিবেচনা করলেন এবং সে মতে ইউসুফ (আ) জেলে প্রেরিত হলেন।

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيْنِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا

وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أُحْمَلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِينَا

يَتَأْوِيلُهُ إِنَّا نُرِيكَ مِنَ الْبُحْسِينِ ۝ قَالَ لَا يَا تُبَيِّكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِ

إِلَّا نَبَأُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكُمَا مَتَاعًا لِيُبَيِّنَ لِي رَبِّي إِنِّي

تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ ۝ وَ

اتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نَشْرِكَ

بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكُمْ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ

النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ۝ يَصَاحِبِي السِّجْنِ ۝ أَرَبُكَ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ

الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا

أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ

أَمْرًا لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ۝ ذَلِكُمُ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ

النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ يَصَاحِبِي السِّجْنِ ۝ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقَى رَبَّهُ

خَمْرًا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصَلِّبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ ۝ قَضَى الْأَمْرَ

الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِينَ ۝ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا إِذْ كُرِنِي عِنْدَ

رَبِّكَ فَانْسَهُ الشَّيْطَانُ ذَكَرَ رَبَّهُ فَلْيَكُنْ فِي السِّجْنِ بِضَعْرَسَيْنِ ۝

(৩৬) তাঁর সাথে কারাগারে দু'জন যুবক প্রবেশ করল। তাদের একজন বলল : আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি মদ নিওড়াচ্ছি। অপরজন বলল : আমি দেখলাম যে, নিজ মাথায় রুটি বহন করছি। তা থেকে পাখি ঠুকিয়ে খাচ্ছে। আমাদেরকে এর ব্যাখ্যা বলুন। আমরা আপনাকে সৎকর্মশীল দেখতে পাচ্ছি। (৩৭) তিনি বললেন : তোমাদেরকে প্রত্যহ যে খাদ্য দেওয়া হয়, তা তোমাদের কাছে আসার আগেই আমি তার ব্যাখ্যা বলে দেব। এ জ্ঞান আমার পালনকর্তা আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন। আমি ঐসব লোকের ধর্ম পরিত্যাগ করেছি যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না এবং পরকালে অবিশ্বাসী। (৩৮) আমি আপন পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুবের ধর্ম অনুসরণ করছি। আমাদের জন্য শোভা পায়না যে, কোন বস্তুকে আল্লাহর অংশীদার করি। এটা আমাদের প্রতি এবং অন্য সব লোকের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ। কিন্তু অধিকাংশ লোক অনুগ্রহ স্বীকার করে না। (৩৯) হে কারাগারের সঙ্গীরা! পৃথক পৃথক অনেক উপাস্য ভাল, না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ? (৪০) তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে নিছক কতগুলো নামের ইবাদত কর, সেগুলো তোমরা এবং তোমাদের বাপদাদারা সাবাস্ত করে নিয়েছে। আল্লাহ এদের কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেন নি। আল্লাহ ছাড়া কারও বিধান দেবার ক্ষমতা নেই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত করো না। এটাই সরল পথ। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না। (৪১) হে কারাগারের সঙ্গীরা! তোমাদের একজন আপন প্রভুকে মদ্যপান করাবে এবং দ্বিতীয়জন, তাকে শুলে চড়ানো হবে। অতঃপর তার মস্তক থেকে পাখি আহার করবে। তোমরা যে বিষয়ে জানার আগ্রহী তার সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। (৪২) যে ব্যক্তি সম্পর্কে ধারণা ছিল যে, সে মুক্তি পাবে, তাকে ইউসুফ বলে দিল : আপন প্রভুর কাছে আমার আলোচনা করবে। অতঃপর শয়তান তাকে প্রভুর কাছে আলোচনার কথা ভুলিয়ে দিল। ফলে তাঁকে কয়েক বছর কারাগারে থাকতে হল।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

ইউসুফ (আ)-এর সাথে (অর্থাৎ সে সময়েই) আরও দু'জন শাহী ক্বীতদাস কারাগারে প্রবেশ করল। [ তাদের একজন বাদশাহকে সুরা পান করাত এবং অপরজন ছিল রুটি পাকানোর বাবুচি। তাদের বন্দীত্বের কারণ ছিল এই যে, তারা বাদশাহর খাদ্যে ও মদে বিষ মিশ্রিত করেছিল বলে সন্দেহ করা হয়েছিল। এ মোকদ্দমা আদালতে বিচারার্থীন থাকাকালে তাদেরকে বন্দী করা হয়। তারা ইউসুফ (আ)-এর মধ্যে সাধুতার চিহ্ন দেখতে পেয়েছিল। তাই] তাদের একজন (ইউসুফকে) বলল : আমি নিজেকে স্বপ্ন দেখেছি (যেন) মদ ( তৈরী করার জন্য আগুনের রস) নিওড়াচ্ছি (এবং বাদশাহকে সেই মদ পান করছি)। অন্যজন বলল : আমি নিজেকে দেখি, (যেন) মাথায় রুটি নিয়ে যাচ্ছি, এবং তা থেকে পাখি (অঁচড়িয়ে অঁচড়িয়ে) আহার করছে, আমাদেরকে এ স্বপ্নের (যা আমরা উভয়ে দেখেছি) ব্যাখ্যা বলে দিন। আমরা আপনাকে একজন সৎলোক মনে করি। ইউসুফ [ যখন দেখলেন যে, তারা সরল বিশ্বাসে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে, তখন তিনি তাদেরকে সর্বপ্রথম ঈমানের দাওয়াত দিতে চাইলেন। তাই প্রথমে



তিনি যে নবী, তা একটি মু'জিয়া দ্বারা প্রমাণ করার জন্য) বললেন : (দেখ) তোমাদের কাছে যে খাদ্য আসে যা তোমরা খাওয়ার জন্য (কারাগারে) পাও, তা আসার আগেই আমি তার স্বরূপ তোমাদেরকে বলে দেই যে, অমুক বস্তু আসবে এবং এমন এমন হবে এবং। এ বলে দেওয়া ঐ ভানের বদৌলতে, যা আমাকে আমার পালনকর্তা শিক্ষা দিয়েছেন (অর্থাৎ আমি ওহীর মাধ্যমে জেনে ফেলি। অতএব এটা একটি মু'জিয়া, যা নবুয়্যতের প্রমাণ। এ সময়ে এ মু'জিয়াটি বিশেষভাবে স্থানোপযোগী ছিল। কারণ, যে ঘটনার বন্দীরা ব্যাখ্যার জন্য তাঁর শরণাপন্ন হয়েছিল, তাও খাদ্যের সাথেই সম্পৃক্ত ছিল। নবুয়্যত সপ্রমাণ করার পর একত্ববাদ সপ্রমাণের বিষয়বস্তু বর্ণনা করে বললেন : ) আমি তো তাদের ধর্ম (প্রথমেই) পরিত্যাগ করেছি, যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেনি এবং তারা পরকালেও অবিশ্বাসী। আমি আপন (মহাপুরুষ) বাপদাদার ধর্ম অবলম্বন করেছি—ইবরাহীম, ইসহাক, ইয়াকুব (আ)—এর। (এ ধর্মের প্রধান স্তম্ভ এই যে) আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে (ইবাদতে) শরীক সাব্যস্ত করা আমাদের জন্য মোটেই শোভা পায় না। এটা (অর্থাৎ একত্ববাদের বিশ্বাস) আমাদের প্রতি এবং (অন্যান্য) লোকদের প্রতি (ও) আল্লাহ তা'আলার একটি অনুগ্রহ। (কারণ, এর মাধ্যমেই ইহকাল ও পরকালের মঙ্গল সাধিত হয়) কিন্তু অধিকাংশ লোক (এ নিয়ামতের) শোকর (আদায়) করে না। (অর্থাৎ একত্ববাদ অবলম্বন করে না।) হে কারাগারের সঙ্গীরা! (একটু চিন্তা করে বল যে, ইবাদতের জন্য) বিভিন্ন উপাস্য ভাল, না এক সত্য উপাস্য ভাল, যিনি পরাক্রমশালী? তোমরা তো আল্লাহকে ছেড়ে নিছক কতগুলো ভিত্তিহীন নামের ইবাদত কর, যেগুলো তোমরা এবং তোমাদের পিতৃপুরুষেরা (নিজেরাই) সাব্যস্ত করে নিয়েছ। আল্লাহ তা'আলা তাদের (উপাস্য হওয়ার) কোন যুক্তিগত অথবা ইতিহাসগত প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি এবং বিধান একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, তাঁকে ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত করা না। এটাই অর্থাৎ একত্ববাদ ও ইবাদতকে একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করা সরল পথ; কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না। (ঈমানের দাওয়াতের পর এখন তাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলছেন যে, হে কারাগারের সঙ্গীরা!) তোমাদের একজন তো নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে স্বীয় প্রভুকে মথারীতি মদ্যপান করাবে এবং অন্যজন দোষী সাব্যস্ত হয়ে শূনে চড়বে এবং তাঁর মস্তক পাখির ঠুকরে ঠুকরে ধাবে। যে সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞেস করছিলে, তা এমনিভাবে অবধারিত হয়ে গেছে। (সেমতে মোকদ্দমার তদন্ত শেষে তাই হল। একজন বেকসুর খালাস এবং অন্যজন অপরাধী সাব্যস্ত হল। উভয়কে কারাগার থেকে ডেকে নেওয়া হল; একজনকে মুক্তিদানের জন্য এবং অপরজনকে শূনে চড়ানোর জন্য।) এবং (যখন তারা কারাগার ত্যাগ করে যেতে লাগল, তখন) যে ব্যক্তি সম্পর্কে মুক্তি পাওয়ার ধারণা ছিল, তাকে ইউসূফ (আ) বললেন : আপন প্রভুর সামনে আমার কথাও আলোচনা করবে যে, একজন নির্দোষ ব্যক্তি কারাগারে আবদ্ধ রয়েছে। সে ওয়াদা করল। অতঃপর আপন প্রভুর কাছে ইউসূফের প্রসঙ্গে আলোচনা করার কথা শ্রুতান তাকে ডুলিয়ে দিল। ফলে কারাগারে আরও কয়েক বছর তাঁকে থাকতে হল।

### আনুশঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে ইউসূফ (আ)-এর কাহিনীর একটি প্রাসঙ্গিক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এ কথা বার বার বলা হয়েছে যে, কোরআন-পাক কোন ঐতিহাসিক ও কিসসা-কাহিনীর গ্রন্থ নয়। এতে যেসব ঐতিহাসিক ঘটনা অথবা কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলোর একমাত্র উদ্দেশ্য মানুষকে শিক্ষা, উপদেশ ও জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ প্রদান করা। সমগ্র কোরআন এবং অসংখ্য পয়গম্বরের ঘটনাবলীর মধ্যে একমাত্র ইউসূফ (আ)-এর কাহিনীটিই কোরআন ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করেছে। নতুবা স্থানোপযোগী ঐতিহাসিক ঘটনার কোন অত্যাবশ্যকীয় অংশই শুধু উল্লেখ করা হয়েছে।

ইউসূফ (আ)-এর কাহিনীটি আদ্যোপান্ত পর্যালোচনা করলে এতে শিক্ষা ও উপদেশের অনেক উপাদান এবং মানব জীবনের বিভিন্ন স্তরের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পথনির্দেশ রয়েছে। প্রাসঙ্গিক এ ঘটনাটিতেও অনেক হিদায়ত নিহিত রয়েছে।

ঘটনা এই যে, ইউসূফ (আ)-এর নিষ্পাপ চরিত্র ও পবিত্রতা দিবালোকের মত ফুটে ওঠা সত্ত্বেও আযীযে-মিসর ও তার স্ত্রী লোক নিন্দা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে কিছু দিনের জন্য ইউসূফ (আ)-কে কারাগারে প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। এটা প্রকৃতপক্ষে ইউসূফ (আ)-এর দোয়া ও বাসনার বাস্তব রূপায়ণ ছিল। কেননা, আযীযে-মিসরের গৃহে বাস করে চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষা করা কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ইউসূফ (আ) কারাগারে পৌঁছেলে সাথে আরও দু'জন অভিযুক্ত কয়েদীও কারাগারে প্রবেশ করল। তাদের একজন বাদশাহ্কে মদ্যপান করাত এবং অপরজন বাবুটি ছিল। ইবনে কাসীর তফসীরবিদগণের বরাতে দিয়ে লিখেছেন : তারা উভয়েই বাদশাহর খাদ্যে বিষ মিশ্রিত করার অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছিল। মোকাদ্দমার তদন্ত চলছিল বলে তাদেরকে কারাগারে আটক রাখা হয়েছিল।

ইউসূফ (আ) কারাগারে প্রবেশ করে পয়গম্বরসুলভ চরিত্র, দয়া ও অনুকম্পার কারণে সব কয়েদীর প্রতি সহমতিতা প্রদর্শন এবং সাধ্যমত তাদের দেখাশোনা করতেন। কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে তার সেবা-শুশ্রূষা করতেন। কাউকে চিন্তিত ও উৎকর্ষিত দেখলে তাকে সান্ত্বনা দিতেন। ধৈর্য শিক্ষা এবং মুক্তির আশা দিয়ে তার হিম্মত বাড়াতেন। নিজে কষ্ট করে অপরের সুখ-শান্তি নিশ্চিত করতেন এবং সারারাত আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন থাকতেন। তাঁর এহেন অবস্থা দেখে কারাগারের সব কয়েদী তাঁর ডাক্ত হয়ে গেল। কারাধ্যক্ষও তাঁর চরিত্রে মুগ্ধ হল এবং বলল : আমার ক্ষমতা থাকলে আপনাকে ছেড়ে দিতাম। এখানে যাতে আপনার কোথাও কষ্ট না হয়, এখন শুধু সেদিকেই লক্ষ্য রাখতে পারি।

**একটি আশ্চর্য ঘটনা :** কারাধ্যক্ষ কিংবা কয়েদীদের মধ্যে কেউ হয়রাত ইউসূফ (আ)-এর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা ও মহব্বত প্রকাশ করে বলল : আমরা আপনাকে খুব মহব্বত করি। ইউসূফ (আ) বললেন : আল্লাহর কসম আমাকে মহব্বত করে না। কারণ, যখনই কে আমাকে মহব্বত করেছে, তখনই আমি কোন না কোন বিপদে জড়িয়ে পড়েছি।

শেষে ফুফু আমাকে মহক্বত করতেন। ফলে আমার উপর চূড়ির অভিযোগ আনা হয়। এরপর আমার পিতা আমাকে মহক্বত করেন। ফলে ভাইদের হাতে কূপে নিক্ষিপ্ত অতঃপর গোলামি ও নির্বাসনে পতিত হয়েছি। সর্বশেষে বেগম আশীষের মহক্বতের পরিণামে এ কারাগারে পৌঁছেছি। —( ইবনে কাসীর, মায়হারী । )

ইউসুফ (আ)-এর সাথে কারাগারে প্রবেশকারী দু'জন কয়েদী একদিন বলল : আমাদের দৃষ্টিতে আপনি একজন সৎ ও মহানুভব ব্যক্তি। তাই আপনার কাছে আমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করতে চাই। হযরত ইবনে আক্বাস ও অন্যান্য তফসীরবিদ বলেন : তারা বাস্তবিকই এ স্বপ্ন দেখেছিল। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন : প্রকৃত স্বপ্ন ছিল না। শুধু ইউসুফ (আ)-এর মহানুভবতা ও সত্যতা পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে স্বপ্ন রচনা করা হয়েছিল।

মোটকথা তাদের একজন অর্থাৎ যে ব্যক্তি বাদশাহকে মদ্যপান করাত, সে বলল : আমি স্বপ্ন দেখি যে, আজুর থেকে শরাব বের করছি। দ্বিতীয়জন অর্থাৎ বাবুচি বলল : আমি দেখি যে, আমার মাথায় রুটিভিত্তি একটি ঝড়ি রয়েছে। তা থেকে পাখিরা ঠুকরে ঠুকরে আহার করছে। তারা উভয়ে স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দিতে অনুরোধ জানাল।

ইউসুফ (আ)-কে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করা হয়েছে; কিন্তু তিনি পল্লগম্বরসূত্রভঙ্গিতে এ প্রশ্নের উত্তর দানের পূর্বে ইমানের দাওয়াত ও ধর্ম প্রচারের কাজ আরম্ভ করে দিলেন। প্রচারের মূলনীতি অনুযায়ী প্রজা ও বৃদ্ধিমতাকে কাজে লাগিয়ে সর্বপ্রথম তাদের অন্তরে আস্থা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে একটি মু'জিয়া উল্লেখ করলেন যে, তোমাদের জন্য প্রত্যহ যে খাদ্য তোমাদের বাসা থেকে কিংবা অন্য কোন জায়গা থেকে আসে, তা আসার আগেই আমি তোমাদেরকে খাদ্যের প্রকার, গুণাগুণ, পরিমাণ ও সময় সম্পর্কে বলে দেই।

বাস্তবে আমার সরবরাহকৃত তথ্য সব সত্য হয়। ذٰلِكَ مِمَّا عَلَّمَنِی رَبِّیْ অর্থাৎ

এটা কোন ভবিষ্যৎ কথন, জ্যোতিষ বিদ্যা অথবা অতীন্দ্রিবাদের ভেল্কি নয় বরং আমার পালনকর্তা ওহীর মাধ্যমে আমাকে মা বলে দেন, আমি তাই তোমাদেরকে জানিয়ে দেই। নিঃসন্দেহে এ প্রকাশ্য মু'জিয়াটি নব্বয়তের প্রমাণ এবং আস্থার অনেক বড় কারণ। এরপর প্রথমে কুফরের নিন্দা এবং কাফিরদের ধর্মের প্রতি স্বীয় বিমুখতা বর্ণনা করেছেন। অতঃপর আরও বলেছেন যে, আমি নবী পন্থিবানেরই একজন এবং তাঁদেরই সত্য ধর্মের অনুসারী। আমার পিতৃপুরুষ হচ্ছেন ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুব। এ বংশগত আভিজাত্যও স্বভাবত মানুষের আস্থা অর্জনে সহায়ক হয়। এরপর বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলার সাথে কাউকে আল্লাহর গুণাবলীতে অংশীদার মনে করা আমাদের জন্য মোটেই বৈধ নয়। এ সত্য ধর্মের তওফীক আমাদের প্রতি এবং সব লোকের প্রতি আল্লাহ তা'আলারই অনুগ্রহ। তিনি সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি দান করে সত্যকে গ্রহণ করা আমাদের জন্য সহজ করে দিয়েছেন কিন্তু অনেক লোক এ নিয়ামতের কদর ও অনুগ্রহ স্বীকার করে না। অতঃপর তিনি কয়েদীদেরকেই প্রশ্ন করলেন : আচ্ছা তোমরাই বল, অনেক



বর্ণনা করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা মিথ্যা স্বপ্ন তৈরী করার যে গোনাহ করেছ, এখন তার শাস্তি তাই, যা ব্যাখ্যায় বর্ণিত হয়েছে।

অন্তঃপর যে ব্যক্তি সম্পর্কে ধারণা ছিল যে, সে রেহাই পাবে, তাকে ইউসূফ (জা) বললেন : যখন তুমি মুক্ত হয়ে কারাগারের বাইরে যাবে এবং শাহী দরবারে পৌছবে, তখন বাদশাহর কাছে আমার বিষয়েও আলোচনা করবে যে, এ নিরপরাধ লোকটি কারাগারে পড়ে রয়েছে। কিন্তু মুক্ত হয়ে লোকটি ইউসূফ (জা)-এর কথা ভুলে গেল। ফলে ইউসূফ (জা)-এর মুক্তি আরও বিলম্বিত হয়ে গেল এবং এ ঘটনার পর আরও কয়েক বছর তাঁকে কারাগারে কাটাতে হল। আয়াতে **بُذِعَ سِنِينَ** বলা হয়েছে। শব্দটি তিন থেকে নয় পর্যন্ত সংখ্যা বুঝায়। কোন কোন তফসীরবিদ বলেন, এ ঘটনার পর আরও সাত বছর তাঁকে জেলে থাকতে হয়েছে।

বিধি-বিধান ও মাস'আলা : আলোচ্য আয়াতগুলো থেকে অনেক বিধিবিধান, মাস'আলা ও নির্দেশ জানা যায়। এগুলো সম্পর্কে চিন্তা করা যেতে পারে।

মাস'আলা : (১) ইউসূফ (জা) কারাগারে প্রেরিত হন। কারাগার গুপ্তা, বদমায়েশ ও অপরাধীদের আড্ডা। কিন্তু তিনি তাদের সাথেও এমন সৌজন্যমূলক ব্যবহার করেন যে, তারা সবাই তাঁর ভক্ত হয়ে যায়। এতে বোঝা গেল যে, অপরাধী ও পাপাচারীদের সাথে দয়া ও সহানুভূতিমূলক ব্যবহার করে তাদেরকে বশে ও আয়ত্তাধীন রাখা প্রত্যেক সংস্কারকের অবশ্য কর্তব্য। তাদের প্রতি যুগা ও বিতৃষ্ণার ভাব প্রকাশ করা উচিত নয়।

মাস'আলা : (২) আয়াতের **إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ** বাক্য থেকে জানা গেল যে, যাদেরকে পূণ্যবান, সৎকর্মী ও সহানুভূতিশীল বলে বিশ্বাস করা হয়, স্বপ্নের ব্যাখ্যা তাদের কাছেই জিজ্ঞেস করা উচিত।

মাস'আলা : (৩) যারা সত্যের দাওয়াত দেন এবং সংস্কারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন, তাঁদের কর্মপন্থা এরূপ হওয়া উচিত যে, প্রথমে স্বীয় চরিত্রমাধুর্য এবং জনগত ও কর্মগত পত্রিকাঠার মাধ্যমে জনগণের আস্থাভাজন হতে হবে; যদিও এতে নিজের কিছু গুণগত বৈশিষ্ট্য প্রকাশও করতে হয়, যেমন ইউসূফ (জা) একেত্রে স্বীয় মূ'জিয়াও উল্লেখ করেছেন এবং তিনি যে নবী পরিবারের একজন তাও প্রকাশ করেছেন। এ গুণগত বৈশিষ্ট্য প্রকাশ যদি জনসংস্কারের উদ্দেশ্যে হয় এবং নিজের প্রার্থিত্ব জাহির করার জন্য না হয়, তবে তা কোরআনে মিথিষ্ক নিজের শূচিতা নিজে প্রকাশ করার অন্তর্ভুক্ত নয়। কোরআনে বলা হয়েছে : **فَلَا تَرْكُوا أَنْفُسَكُمْ** অর্থাৎ নিজের শূচিতা নিজে প্রকাশ করো না।

মাস'আলা : (৪) প্রচারক ও সংস্কারকের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে স্বীয় প্রচারবৃত্তিকে সব কাজের অগ্রে রাখা। প্রচারকর্মের এ একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি, যা আলোচ্য আয়াতসমূহে ব্যক্ত হয়েছে। কেউ তাঁর কাছে কোন কার্যোপলক্ষে আগমন করলে তাঁর আসল কর্তব্য

বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়, যেমন ইউসুফ (আ)-এর কাছে কয়েদীরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করতে এসেছিল। তিনি উত্তরদানের পূর্বে দাওয়াত এবং প্রচারের মাধ্যমে তাদেরকে হেদায়েত উপহার দিলেন। এরূপ বোঝা উচিত নয় যে, দাওয়াত ও প্রচার জনসভা, মিথর অথবা মঞ্চেই হয়। ব্যক্তিগত সাক্ষাত ও একান্ত আলোচনার মাধ্যমেই বরং এ কাজ আরও বেশী কার্যকর হয়ে থাকে।

মাস'আলা : (৫) পথপ্রদর্শন ও সংস্কারের ক্ষেত্রে প্রভা ও বুদ্ধিমত্তা সহকারে এমন কথা বলা উচিত, যা সম্বোধিত ব্যক্তির চিন্তাকর্ষণ করতে পারে, যেমন ইউসুফ (আ) কয়েদীদেরকে দেখিয়েছেন যে, তিনি যা কিছু গুণগত বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছেন, তা কুফরী ধর্ম পরিত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করায়ই ফলশ্রুতি। এরপর তিনি কুফর ও শিরকের অনিশ্চকারিতা চিন্তাকর্ষক ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছেন।

মাস'আলা : (৬) এ থেকে প্রমাণিত হল : যে ব্যাপার সম্বোধিত ব্যক্তির জন্য কষ্টকর ও অপ্রিয় এবং তা প্রকাশ করা জরুরী, তা তার সামনে যতদূর সম্ভব এমন ভঙ্গিতে প্রকাশ করতে হবে যে, তার কষ্ট মথাসম্ভব কম হয়, যেমন স্বপ্নের ব্যাখ্যায় এক ব্যক্তির মৃত্যু নিশ্চিত ছিল কিন্তু ইউসুফ (আ) তা অস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। এরূপ নিশ্চিত করে বলেননি যে, তোমাকে শুলীতে চড়ানো হবে।-- (ইবনে-কাসীর, মাহহারী)

মাস'আলা : (৭) ইউসুফ (আ) কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য কয়েদীকে বললেন : যখন বাদশাহর কাছে যাবে তখন আমার কথা আলোচনা করবে যে, সে নিরপরাধ—কারাগারে আবদ্ধ রয়েছে। এতে বোঝা গেল যে, বিপদ থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য কোন ব্যক্তিকে চেষ্টা-তদবীরের মাধ্যমে স্থির করা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়।

মাস'আলা : (৮) আল্লাহ তা'আলা মনোনীত পয়গম্বরগণের জন্য সকল বৈধ প্রচেষ্টাও পছন্দ করেন না ; যেমন, তাঁরা মুক্তির জন্য কোন মানুষকে মধ্যস্থতাকারী স্থির করবেন। তাঁদের ও আল্লাহ তা'আলার মাঝখানে কোন মধ্যস্থতা না থাকাই পয়গম্বরগণের আসল স্থান। সম্ভবত এ কারণেই মুক্তিপ্রাপ্ত কয়েদী ইউসুফ (আ)-এর কথা শুনে যায় এবং তাঁকে আরও কয়েক বছর কারাগারে থাকতে হয়। এক হাদীসেও রসূলুল্লাহ (সা) এদিকে ইঙ্গিত করেছেন।

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلْنَ سَبْعَ  
عِجَافٍ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخْرَى يُسْتَبَيَّتُ بِأَيُّهَا الْمَلَأَ أُنُوتِي  
فِي رُؤْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ ۝ قَالُوا أَضْغَاثُ أَخْلَامٍ وَمَا  
نَحْنُ بِتَلْوِيلِ الْأَخْلَامِ بِعَلَمِينَ ۝ وَقَالَ الَّذِي نَجَّى مِنْهَا  
وَإِذْ كَرِهَ أُمَّةٌ أَنَا أُنْتَبِئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ ۝ يُوسُفُ

أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ  
 عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَبْيَسُ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ  
 لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابَّاءَ ۖ فَمَا حَصَدْتُمْ  
 فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ﴿٥٨﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ  
 ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَحْصِنُونَ  
 ﴿٥٩﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِضُونَ ﴿٦٠﴾  
 وَقَالَ الْمَلِكُ انْتُونِي بِهِ ۖ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ  
 فَسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ۚ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ  
 عَلِيمٌ ﴿٦١﴾

عَلِيمٌ ﴿٦١﴾

(৪৩) বাদশাহ বলল : আমি স্বপ্নে দেখলাম, সাতটি মোটাতাজা গাভী—এদেরকে সাতটি শীর্ণ গাভী খেয়ে থাকে এবং সাতটি সবুজ শীষ ও অন্যগুলো গুচ্ছ। হে পার্শ্বদেব ! তোমরা আমাকে আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা বল, যদি তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা পারদর্শী হয়ে থাক।

(৪৪) তারা বলল : এটা কল্পনাপ্রসূত স্বপ্ন। এরূপ স্বপ্নের ব্যাখ্যা আমাদের জানা নেই।

(৪৫) দু'জন কারাকুরুর মধ্য থেকে যে ব্যক্তি মুক্তি পেয়েছিল এবং দীর্ঘকাল পর ফেরত হলো, সে বলল, আমি তোমাদেরকে এর ব্যাখ্যা বলছি। তোমরা আমাকে প্রেরণ কর।

(৪৬) সে তথ্যই পৌঁছে বলল : হে ইউসূফ ! হে সত্যবাদী ! সাতটি মোটাতাজা গাভী—তাদেরকে খাচ্ছে সাতটি শীর্ণ গাভী এবং সাতটি সবুজ শীষ ও অন্যগুলো গুচ্ছ ; আপনি আমাদেরকে এ স্বপ্ন সম্পর্কে পথনির্দেশ প্রদান করুন : যাতে আমি তাদের কাছে ফিরে গিয়ে তাদের অবগত করাতে পারি। (৪৭) বলল : তোমরা সাত বছর উত্তমরূপে চাষাবাদ করবে। জাতঃপন্ন যা কাটবে, তার মধ্যে যে সামান্য পরিমাণ তোমরা খাবে তা ছাড়া অবশিষ্ট শস্য শীষ সমেত রেখে দেবে। (৪৮) এবং এরপরে আসবে দু'বছর সাত বছর ; তোমরা এ দিনের জন্যে যা রেখেছিলে, তা খেয়ে থাকবে, কিন্তু অল্প পরিমাণ স্বাতীত, যা তোমরা তুলে রাখবে। (৪৯) এরপরই আসবে একবছর—এতে মানুষের উপর হুণ্ডি বর্ষিত হবে এবং এতে তারা রস নিঃসৃতাবে। (৫০) বাদশাহ বলল : ফিরে যাও তোমাদের প্রভুর কাছে এবং জিজ্ঞেস কর তাঁকে : ঐ মহিলাদের স্বরূপ কি, যারা স্বীয় হস্ত কর্তন করেছিল ! আমার পালনকর্তা তো তাদের ছলনা সবই জানেন।

### মানুষিক জাতক্য বিষয়

মিসরের বাদশাহ্ (-ও একটি স্বপ্ন দেখল এবং পান্নিসদবর্গকে একত্র করে) বলল : আমি (স্বপ্ন) দেখি যে, সাতটি মোটাতাজা গাভীকে সাতটি শীর্ণ গাভী খেয়ে ফেলেছে এবং সাতটি সবুজ শীষ ও আরও সাতটি শুষ্ক শীষ। শুষ্ক শীষগুলো এমনভাবে সবুজ শীষ-গুলোকে জড়িয়ে ধরে তাদেরকে শুষ্ক করে দিয়েছে। হে সভাসদবর্গ, যদি তোমরা (স্বপ্নের) ব্যাখ্যা দিতে পার, তবে আমার এ স্বপ্ন সম্বন্ধে আমাকে উত্তর দাও। তারা বলল : (প্রথমত এটা কোন স্বপ্নই নয় যে, আপনি চিন্তিত হবেন।) এমনি বিক্ষিপ্ত কল্পনা এবং (দ্বিতীয়ত) আমরা (রাজকাৰ্যে পারদর্শী) স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কে জ্ঞান রাখি না। (দু'রকম উত্তর দেয়ার কারণ এই যে, প্রথম উত্তর দ্বারা বাদশাহ্‌র মন থেকে অস্থিরতা ও উদ্বেগ দূর করা উদ্দেশ্য এবং দ্বিতীয় উত্তর দ্বারা নিজেদের অক্রমতা প্রকাশ করা লক্ষ্য। মোটামুটি ব্যাপার এই যে, প্রথমত এরূপ স্বপ্ন ব্যাখ্যাস্বোগ্য নয় এবং দ্বিতীয়ত আমরা এ শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ।) এবং (উল্লেখিত) দু'কয়েদীর মধ্যে যে মুক্তি পেয়েছিল, (সে দরবারে উপস্থিত ছিল) সে বলল এবং দীর্ঘকাল পর তার (ইউসুফের উপদেশের কথা) স্মরণ হয়েছিল : আমি এর ব্যাখ্যার খবর জানছি। আপনারা আমাকে একটু সাওয়ান অনুমতি দিন। (দরবার থেকে তাকে অনুমতি দেওয়া হল। সে কয়েদখানায় ইউসুফের কাছে পৌঁছে বলল : ) হে ইউসুফ হে সততার মূর্ত প্রতীক, আপনি আমাদেরকে এর (অর্থাৎ স্বপ্নের) জওয়ান (অর্থাৎ ব্যাখ্যা) দিন যে, সাতটি মোটাতাজা গাভীকে সাতটি শীর্ণ গাভী খেয়ে ফেলেছে এবং সাতটি সবুজ শীষ এবং এ ছাড়া (সাতটি) শুষ্কও। (শুষ্কগুলোতো জড়িয়ে ধরার ফলে সবুজগুলোও শুষ্ক হয়ে গেছে। আপনি ব্যাখ্যা দিন, ) যাতে আমি (যারা আমাকে পাঠিয়েছে) তাদের কাছে ফিরে যাই, (এবং বর্ণনা করি) যাতে (এর ব্যাখ্যা এবং ফলে আপনার অবস্থা) তাদেরও জানা হয়ে যায় (তারা ব্যাখ্যা অনুযায়ী কর্মপন্থা নিরূপণ করে এবং আপনার মুক্তির উপায় হয়)। তিনি বললেন : (সাতটি মোটাতাজা গাভী এবং সাতটি সবুজ শীষের অর্থ হচ্ছে প্রচুর উৎপাদন ও বৃষ্টির বছর। অতএব) তোমরা সাত বছর উপযু পুরি (খুব) শস্য বণন করবে, অতঃপর ফসল কেটে তাকে শীষের মতোই থাকতে দেবে, (যাতে যুগ লোপে না যায়) তবে অল্প পরিমাণে, যা তোমাদের খাওয়ান্ন লাগবে, (তাই শীষ থেকে বের করা হবে।) অতঃপর এর (অর্থাৎ সাত বছরের) পর সাত বছর এমন কঠিন (ও দুর্ভিক্ষের) আসবে যে, ঐ (গাভী) ভাঙার খেয়ে ফেলবে, যা তোমরা এ বছরগুলোর জন্য সঞ্চয় করে রেখে থাকবে কিন্তু অল্প পরিমাণে, যা (বীজের জন্য) রেখে দেবে (তা অবশ্য বেঁচে যাবে। শুষ্ক শীষ ও শীর্ণ গাভী এ সাত বছরের প্রতিই ইঙ্গিত বহন করে)। অতঃপর (অর্থাৎ সাত বছর পর) এক বছর এমন আসবে, যাতে মানুষের জন্য খুব বৃষ্টিপাত হবে এবং এতে (আলুরের পর্যাপ্ত ফলনের কারণে) রসও নিংড়াবে (এবং মদ্যপান করবে। মোটকথা, এ ব্যক্তি ব্যাখ্যা নিয়ে দরবারে পৌঁছল) এবং (পৌঁছে বর্ণনা করল)। বাদশাহ্ (যখন শুনল, তখন ইউসুফের জ্ঞানে ও গুণে মুগ্ধ হয়ে গেল এবং) নির্দেশ দিল : তাকে আমার কাছে নিয়ে এস। (সেমতে দরবার থেকে দূত রওয়ানা হল) অতঃপর যখন দূত তাঁর কাছে পৌঁছল (এবং বার্তা দিল তখন) তিনি বললেন : (যতরূপ পর্যন্ত আমার এ অপবাদ থেকে মুক্ত হওয়া ও নির্দোষ হওয়া প্রমাণিত না হয়ে যায়, ততরূপ আমি যাব না।) তুমি তোমার প্রচুর কাছে ফিরে যাও,



অতঃপর তাঁকে জিজ্ঞেস কর যে, ( আপনি কিছু জানেন কি ) ঐ মহিলাদের কি অবস্থা, যারা আপন হস্ত কেটে ফেলেছিল? ( উদ্দেশ্য এই যে, তাদেরকে ডেকে যে ঘটনায় আমাকে বন্দী করা হয়েছে, তার তদন্ত করা হোক। 'মহিলাদের অবস্থা' বলে ইউসুফের অবস্থা তাদের জানা রয়েছে, কি জানা নেই, তা বোঝান হয়েছে। বিশেষ করে মহিলাদের কথা বলার কারণ সত্ত্বত এই যে, তাদের সামনে মুদায়না স্বীকার করেছিল **وَلَقَدْ وَادَّوْنَا عَنْ نَفْسِهِ** )

فَاَسْتَعْمِ

আমার পালনকর্তা এ নারীদের হতন সম্পর্কে খুব জ্ঞাত রয়েছেন।

( অর্থাৎ আল্লাহর তো জানাই আছে যে, মুদায়না কর্তৃক আমাকে অপবাদ আরোপ একটি হতন। কিন্তু মানুষের কাছেও বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাওয়া দরকার। সেমতে বাদশাহ্ মহিলাদেরকে দরবারে উপস্থিত করলেন। )

আনুমানিক জাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ইউসুফ (আ)-এর মুক্তির জন্য অদৃশ্য যবনিকার অন্তরাল থেকে একটি উপায় সৃষ্টি করলেন। বাদশাহ্ একটি স্বপ্ন দেখে উদ্বেগাকুল হলেন এবং রাজ্যের জানী ব্যাখ্যাতা ও অতীন্দ্রিয়বাদীদেরকে একত্র করে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করলেন। স্বপ্নটি কারও বোধগম্য হল না। তাই সবাই উত্তর

দিলা: **أَمْضَاثُ أَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالَمِينَ** এখানে

শব্দটি **أَمْضَاثُ** এর বহুবচন। এর অর্থ এমন পুঁটলী, যাতে বিভিন্ন প্রকার আবর্জনা ও ঘাসখড় জমা থাকে। অর্থ এই যে, এ স্বপ্নটি মিশ্র ধরনের। এতে কল্পনা ইত্যাদি শামিল রয়েছে। আমরা এরূপ স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানি না। সঠিক স্বপ্ন হলে ব্যাখ্যা দিতে পারতাম।

এ ঘটনা দেখে দীর্ঘকাল পর ইউসুফ (আ)-এর কথা মুক্তিপ্রাপ্ত সেই কয়েদীর মনে পড়ল। সে অগ্রসর হয়ে বলল: আমি এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলতে পারব। তখন সে ইউসুফ (আ)-এর গুণাবলী, স্বপ্ন ব্যাখ্যান পারদর্শিতা এবং মজলুম হয়ে কারাগারে আবদ্ধ হওয়ার কথা বর্ণনা করে অনুরোধ করল যে, তাঁকে কারাগারে তাঁর সাথে সাক্ষাতের অনুমতি দেওয়া হোক। বাদশাহ্ এ সাক্ষাতের ব্যবস্থা করলেন এবং সে ইউসুফ (আ)-এর কাছে উপস্থিত

হল। কোরআন পাক এসব ঘটনা একটিমাত্র শব্দ **فَأَرْسَلُونِي** দ্বারা বর্ণনা করেছে।

এর অর্থ আমাকে পাঠিয়ে দিন। ইউসুফ (আ)-এর নামোল্লেখ, সরকারী মঞ্জুরি অতঃপর কারাগারে পৌঁছা—এসব ঘটনা আপনা আপনি বোঝা যায়। তাই এগুলো পরিষ্কার উল্লেখ

করা প্রয়োজন মনে করা হয়নি বরং এ বর্ণনা গুরু করা হয়েছে; **يُوسُفُ أَيُّهَا**

الصِدْقُ --- অর্থাৎ লোকটি কারাগারে পৌঁছে ঘটনার বর্ণনা শুরু করে প্রথমে ইউসুফ

(আ)-এর صِدْقُ অর্থাৎ কথা ও কাজে সাদ্কা হওয়ার কথা স্বীকার করেছে। অতঃপর দরখাস্ত করেছে যে, আমাকে একটি স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দিন। স্বপ্ন এই যে, বাদশাহ সাতটি মোটাতাজা গাভী দেখেছেন। এগুলোকেই অন্য সাতটি শীর্ণ গাভী খেয়ে যাবে। তিনি আরও সাতটি গমের সবুজ শীষ ও সাতটি শুষ্ক শীষ দেখেছেন।

لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ --- অর্থাৎ আপনি ব্যাখ্যা বলে

দিলে অচিরে আমি ফিরে যাব এবং তাদের কাছে ব্যাখ্যা বর্ণনা করব। এতে সম্ভবত তাঁরা আপনার জ্ঞানগরিমা সম্পর্কে অবগত হবে।

তফসীরে-মাসহাবীতে বলা হয়েছে, 'আলমে-মিসাল' তথা প্রত্যাকৃতি-জগতে ঘটনা-বলী যে আকারে থাকে, স্বপ্নে তাই দৃষ্টিগোচর হয়। এ জগতের প্রত্যাকৃতিসমূহের বিশেষ অর্থ আছে। স্বপ্ন ব্যাখ্যা শাস্ত্র পুরাপুরিই এ সব অর্থ জানার ওপর নির্ভরশীল। আল্লাহ্ তা'আলা ইউসুফ (আ)-কে এ শাস্ত্র পুরাপুরি শিক্ষা দান করেছিলেন। তিনি স্বপ্নের বিবরণ শুনে বুঝে নিলেন যে, সাতটি মোটাতাজা গাভী ও সাতটি সবুজ শীষের অর্থ হচ্ছে প্রচুর ফলনসম্পন্ন সাত বছর। কেননা, মুক্তিকা চমায় ও ফসল ফলানোর কাজে গাভীর বিশেষ ভূমিকা থাকে। এমনিভাবে সাতটি শীর্ণ গাভী ও সাতটি শুষ্ক শীষের অর্থ হচ্ছে, প্রথম সাত বছরের পর ভয়াবহ দুভিক্ষের সাতটি বছর আসবে। শীর্ণ সাতটি গাভী মোটাতাজা সাতটি গাভীকে খেয়ে ফেলার অর্থ এই যে, পূর্ববর্তী সাত বছরে খাদ্যশস্যের যে ভাণ্ডার সঞ্চিত থাকবে, তা সবই দুভিক্ষের সাত বছরে নিঃশেষ হয়ে যাবে। শুধু বীজের জন্য কিছু খাদ্যশস্য বেঁচে যাবে।

বাদশাহর স্বপ্নে বাহ্যত এতটুকুই ছিল যে, সাত বছর ভাল ফলন হবে, এরপর সাত বছর দুভিক্ষ হবে। কিন্তু ইউসুফ (আ) আরও কিছু বাড়িয়ে বললেন যে, দুভিক্ষের বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলে এক বছর খুব বৃষ্টিপাত হবে এবং প্রচুর ফসল উৎপন্ন হবে। এ বিষয়টি ইউসুফ (আ) এভাবে জানতে পারেন যে, দুভিক্ষের বছর যখন সর্বমোট সাতটি, তখন আল্লাহর চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী অষ্টম বছর বৃষ্টিপাত ও উৎপাদন হবে। হযরত কাতাদাহ্ (রা) বলেন : আল্লাহ্ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে ইউসুফ (আ)-কে এ বিষয়ে জ্ঞাত করিয়েছিলেন, যাতে স্বপ্নের ব্যাখ্যার অতিরিক্ত কিছু সংবাদ তাঁরা লাভ করে, তাঁর জ্ঞান-গরিমা প্রকাশ পায় এবং তাঁর মুক্তির পথ প্রশস্ত হয়। তদুপরি ইউসুফ (আ) শুধু স্বপ্নের ব্যাখ্যা করেই ক্ষান্ত হননি; বরং এর সাথে একটি বিজ্ঞানোচিত ও সহানুভূতিমূলক পরামর্শও দিয়েছিলেন যে, প্রথম সাত বছরে যে অতিরিক্ত শস্য উৎপন্ন হবে, তা গমের শীষের মধ্যেই সংরক্ষিত রাখতে হবে—যাতে পুরানো হওয়ার পর গমে পোকা না লাগে—অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা গেছে যে, শস্য যতদিন শীষের মধ্যে থাকে, ততদিন তাতে পোকা লাগে না।

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَيْنِ يَدَيْكَ سَبْعُ شِدَائٍ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ — অর্থাৎ প্রথম সাত

বছরের পর উয়াবহ খরা ও দুভিক্ষের সাত বছর আসবে এবং পূর্ব সঞ্চিত শস্যভাণ্ডার খেয়ে ফেলবে। বাদশাহ্ স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, শীর্ণ ও দুর্বল গাভীগুলো মোটাতাজা ও শক্তি-শালী গাভীগুলোকে খেয়ে ফেলছে। তাই ব্যাখ্যায় এর সাথে মিল রেখে বলেছেন যে, দুভিক্ষের বছরগুলো পূর্ববর্তী বছরগুলোর সঞ্চিত শস্যভাণ্ডার খেয়ে ফেলবে; যদিও বছর এমন কোন বস্তু নয়, যা কোন কিছুকে ভক্ষণ করতে পারে। উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ ও জীব-জন্তুতে দুভিক্ষের বছরগুলোতে পূর্ব-সঞ্চিত শস্যভাণ্ডার খেয়ে ফেলবে।

কাহিনীর গতিধারা দেখে বোঝা যায় যে, এ ব্যক্তি স্বপ্নের ব্যাখ্যা নিয়ে ফিরে এসেছে এবং বাদশাহ্‌কে তা অবহিত করেছে। বাদশাহ্ বৃন্তান্ত শুনে নিশ্চিত্ত ও ইউসুফ (আ)-এর গুণ-গরিমায় মুগ্ধ হয়েছেন। কিন্তু কোরআন পাক এসব বিষয় উল্লেখ করা দরকার মনে করেনি। কারণ, এগুলো আপনা থেকেই বোঝা যায়। পরবর্তী ঘটনা বর্ণনা করে বলা হয়েছে :

وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُؤْتِنِي بِهٖ — অর্থাৎ বাদশাহ্ আদেশ দিলেন যে, ইউসুফ

(আ)-কে কারাগার থেকে বাইরে নিয়ে এস। অতঃপর বাদশাহ্‌র জনৈক দূত এ বার্তা নিয়ে কারাগারে পৌঁছল।

ইউসুফ (আ) দীর্ঘ বন্দীজীবনের দুঃসহ ঘটনায় অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিলেন এবং মনে মনে মুক্তি কামনা করছিলেন। কাজেই বাদশাহ্‌র প্রেরিত বার্তাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে তিনি তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হয়ে বের হয়ে আসতে পারতেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা পয়-গম্বরগণকে যে উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন, তা অন্যের পক্ষে অনুধাবন করাও সম্ভব নয়।

তিনি দূতকে উত্তর দিলেন :

قَالَ أَرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسَأَلَا مَا بَالُ النِّسْوَةِ الَّتِي قَطَعْنَ

أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ۝

অর্থাৎ ইউসুফ (আ) দূতকে বললেন : তুমি বাদশাহ্‌র কাছে ফিরে গিয়ে প্রথমে জিজ্ঞেস কর যে, আপনাদের মতে ঐ মহিলাদের ব্যাপারটি কিরূপ, যারা হাত কেটে ফেলেছিল? বাদশাহ্ এ ব্যাপারে আমাকে সন্দেহ করেন কি না এবং আমাকে দোষী মনে করেন কি না।

এখানে এ বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য যে, ইউসুফ (আ) এখানে হস্ত কর্তনকারিণী মহিলা-দের কথা উল্লেখ করেছেন, আশীষ-পত্নীর নাম উল্লেখ করেন নি; অথচ সে-ই ছিল ঘটনার মূল কেন্দ্রবিন্দু। বলা বাহুল্য, এতে ঐ নিমকের কদম্ব করা হয়েছে, যা ইউসুফ (আ) আযীযের

গৃহে লালিত পালিত হয়ে খেয়েছিলেন। প্রকৃত ভদ্র স্বভাবের নোকেরা স্বভাবতই এরূপ নিমকহালালী করার চেষ্টা করে থাকেন।—(কুরতুবী)

আরেক কারণ এই যে, নিজের পবিত্রতা প্রমাণ করাই ছিল আসল উদ্দেশ্য। এ মহিলা-দের মাধ্যমেও এ উদ্দেশ্য অর্জিত হতে পারত এবং এতে তাদেরও তেমন কোন অপমান ছিল না। তারা সত্যকথা স্বীকার করলে শুধু পরামর্শ দানের দোষ তাদের ঘাড়ে চাপত। আশীষ-পন্নীর অবস্থা এরূপ ছিল না। সরাসরি তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হলে তাকে যিরেই তদন্ত কার্য অনুষ্ঠিত হত। ফলে তার অপমান বেশী হত। ইউসুফ (আ) সাথে সাথে আরও বললেন : **أَنْ رَبِّي بِكَيْدِهِمْ عَلِيمٌ** অর্থাৎ আমার পালনকর্তা

তো তাদের মিথ্যা ও ছলচাতুরী অবহিতই রয়েছেন। আমি চাই যে, বাদশাহ্ ও বাস্তব সত্য সম্পর্কে অবগত হোন। এ বাক্যে সূক্ষ্ম ভঙ্গিতে নিজের পবিত্রতাও বর্ণিত হয়েছে।

হমরত আবু হুরায়রার রেওয়াজেতে বুখারী ও তিরমিযীর এক হাদীসে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র উক্তি বর্ণিত রয়েছে যে, যদি আমি এত দীর্ঘকাল কারাগারে থাকতাম, অতঃপর আমাকে মুক্তিদানের জন্য ডাকা হত, তবে আমি তৎক্ষণাৎ সম্মত হয়ে যেতাম।

ইমাম তাবারীর রেওয়াজেতে বলা হয়েছে : ইউসুফ (আ)-এর ধৈর্য, সহনশীলতা ও সচ্চরিত্রতা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। কারাগারে যখন তাঁকে বাদশাহ্‌র স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করা হয়, তখন আমি তাঁর জায়গায় থাকলে বলতাম যে, আগে আমাকে কারাগার থেকে মুক্ত কর, এর পর ব্যাখ্যা দেব। দ্বিতীয় বার যখন মুক্তির বার্তা নিয়ে দূত আগমন করে, তখন তাঁর জায়গায় থাকলে তৎক্ষণাৎ কারাগারের দরজার দিকে পা বাড়াতাম।—(কুরতুবী)

এ হাদীসে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, ইউসুফ (আ)-এর ধৈর্য, সহনশীলতা ও সচ্চরিত্রতার প্রশংসা করাই হাদীসের উদ্দেশ্য। কিন্তু এর বিপরীতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নিজের কর্মপন্থা বর্ণিত হয়েছে, যা আমি থাকলে দেবী করতাম না—এর অর্থ কি? যদি এর অর্থ এই হয় যে, তিনি ইউসুফ (আ)-এর কর্মপন্থাকে উত্তম এবং নিজের কর্মপন্থাকে অনুত্তম বলেছেন; তবে এটা শ্রেষ্ঠতম পরগম্বরের অবস্থার সাথে সঙ্গতিসম্পন্ন নয়। এর উত্তরে বলা যায় যে, নিঃসন্দেহে রসূলুল্লাহ্ (সা) শ্রেষ্ঠতম পরগম্বর। কিন্তু কোন আংশিক কাজে অন্য পরগম্বরও শ্রেষ্ঠতম হতে পারেন।

এ ছাড়া তফসীরে কুরতুবীতে বলা হয়েছে : এরূপ অর্থও হতে পারে যে, ইউসুফ (আ)-এর কর্মপন্থার মধ্যে ধৈর্য, সহনশীলতা ও মহান চরিত্রের অনন্যসাধারণ প্রমাণ রয়েছে, তা যথাস্থানে প্রশংসনীয় কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (সা) নিজের যে কর্মপন্থা বর্ণনা করেছেন, উশ্মতের শিক্ষা ও জনগণের হিতাকাঙ্ক্ষার দিক দিয়ে তাই উপযুক্ত ও উত্তম। কেননা, বাদশাহ্‌দের মেজাজের কোন স্থিরতা নেই। এরূপ ক্ষেত্রে শর্ত যোগ করা অথবা দেবী করা সাধারণ লোকদের পক্ষে উপযুক্ত হয় না। কারণ, বাদশাহ্‌র মত পাণ্ডেট যেতে পারে। ফলে কারাবাসের বিপদ যথারীতি অব্যাহত থাকতে পারে। ইউসুফ (আ) তো পরগম্বর হওয়ার কারণে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এ কথা জেনেও থাকতে পারেন যে, এ বিলম্বের

কারণে কোন ক্ষতি হবে না। কিন্তু সাধারণ লোক তো এ স্তরে উন্নীত নয়! রাহমাতুল্লিল আলামীন (সা)-এর মেজাজ ও অভিরুচিতে সর্বসাধারণের কল্যাণ চিন্তার গুরুত্ব ছিল অধিক। তাই তিনি বলেছেন : আমি এরূপ সুযোগ পেলে দেবী করতাম না।

قَالَ مَا خَطْبُكَ إِذْ رَأَوْتَنِّي يُوْسُفُ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا عَلِمْنَا  
عَلَيْهِ مِنْ سُوْءٍ قَالَتْ اَمْرَاَتُ الْعَزِيْزِ اِنَّنِىْ حَصْحَصَ الْحَقُّ اَنَا رَاوَدْتُهُ  
عَنْ نَفْسِهِ وَاِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝ ذٰلِكَ لِيَعْلَمَ اَنِّىْ لَمْ اَخْنَهُ  
بِالْغَيْبِ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ كَيْدَ الْخٰٓئِنِيْنَ ۝

(৫১) বাদশাহ্ মহিলাদেরকে বললেন : তোমাদের হাল-হকিকত কি, যখন তোমরা ইউসুফকে আশ্বসংবরণ থেকে ফুসলিয়েছিলে? তারা বলল : আল্লাহ্ মহান, আমরা তার সম্পর্কে মন্দ কিছু জানি না। আশীয-পরী বলল : এখন সত্য কথা প্রকাশ হয়ে গেছে। আমিই তাকে আশ্বসংবরণ থেকে ফুসলিয়েছিলাম এবং সে সত্যবাদী। (৫২) ইউসুফ বললেন : এটা এজন্য, যাতে আশীয জেনে নেয় যে, আমি গোপনে তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। আরও এই যে, আল্লাহ্ বিশ্বাসঘাতকদের প্রতারণাকে এণ্ডতে দেন না।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

বলল : তোমাদের ব্যাপার কি, যখন তোমরা ইউসুফ (আ)-এর কাছে কুমতলবের বাসনা করেছিলে? (অর্থাৎ একজনে খায়েশ করেছিলে ও অবশিষ্টরা তাকে সাহায্য করেছিলে। কাজেই সাহায্যও কাজের মতই। তখন তোমরা কি বুঝতে পারলে? বাদশাহ্‌র এভাবে জিজ্ঞেস করার কারণ সম্ভবত এই : অপরাধী গুনে নিক যে, একজন মহিলা যে তার কাছে কুমতলবের বাসনা করেছিল, বাদশাহ্ তা জানেন এবং সম্ভবত তার নামও জানেন; এমতাবস্থায় অস্বীকার করা চলবে না। সুতরাং এভাবে সম্ভবত নিজেই সে স্বীকারোক্তি করবে।) মহিলারা উত্তর দিল : আল্লাহ্ মহান, আমাদের তো তাঁর সম্পর্কে বিশ্ণুমান্তও খারাপ কিছু জানা নেই। (সে সম্পূর্ণ নিফলুশ ও পবিত্র। মহিলারা সম্ভবত মুলায়খার স্বীকারোক্তি এ কারণে প্রকাশ করেনি যে, ইউসুফের পবিত্রতা প্রমাণ করাই ছিল উদ্দেশ্য। তা হয়ে গেছে। অথবা মুলায়খা উপস্থিত থাকার কারণে তার নাম উল্লেখ করতে লজ্জাবোধ করেছে।) আশীয-পরী (সে উপস্থিত ছিল) বলল : এখন তো সত্য কথা (সবার সামনে) জাহির হয়েই গেছে (এখন গোপন করা রুখা। সত্য বলতে কি) আমিই তাঁর কাছে কুমতলবের খায়েশ করেছিলাম (সে নয়; যেমন ইতিপূর্বে

আমি অপবাদ আরোপ করেছিলাম

مَا جَزَاءُ مَنْ

বলে) এবং নিশ্চয়ই সে

সত্যবাদী। (সম্ভবত অপারক অবস্থায় যুলায়খা এ বিষয়টি স্বীকার করেছিল। মোটকথা, মোকদ্দমার পূর্ণ রুজুত, এজাহার ও ইউসুফের পবিত্রতার প্রমাণ তাঁর কাছে বলে পাঠানো হলো। তখন) ইউসুফ বললঃ এসব বিচার-আচার (যা আমি দায়ের করেছি) শুধু এ কারণে যে, আশীষ যেন দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে জেনে নেয় যে, আমি তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর ইয়যতের ওপর হস্তক্ষেপ করিনি এবং এ কথা (জানা হয়ে যায়) যে, আল্লাহ্ তা'আলা বিশ্বাসঘাতকদের প্রত্যয়ণকে এভাবে দেন না। (যুলায়খা অপরের প্রতি লোলুপ দৃষ্টিটিকে পেরিয়ে আশীষের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। আল্লাহ্ তা'আলা এর মুখোশ খুলে দিয়েছেন। আমার উদ্দেশ্য এটাই ছিল।)

### আনুমানিক জাতব্য বিষয়

ইউসুফ (আ)-কে যখন রাজকীয় দূত মুক্তির পয়গাম দিয়ে ডেকে নিতে আসে, তখন তিনি দূতকে উত্তর দেন যে, প্রথমে ঐ মহিলাদের অবস্থা তদন্ত করা হোক যারা হাত কেটে ফেলেছিল। এতে অনেক রহস্য নিহিত ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা পয়গম্বর-দেরকে যেমন পূর্ণ ধার্মিকতা দান করেছিলেন, তেমনি তাঁদেরকে পূর্ণ বুদ্ধিমত্তা ও বিভিন্ন ব্যাপারাদি সম্পর্কে পূর্ণ দূরদৃষ্টিও দান করেছিলেন। রাজকীয় পয়গাম পেয়ে ইউসুফ (আ) অনুমান করে নেন যে, কারামুক্তির পর মিসরের বাদশাহ্ তাঁকে কোন সম্মানে ভূষিত করবেন। তখন এটাই ছিল বুদ্ধিমত্তা যে, যে অপকর্মের অপবাদ তাঁর প্রতি আরোপ করা হয়েছিল এবং যে কারণে তাঁকে কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছিল তার স্বরূপ বাদশাহ্ ও অন্য সবার দৃষ্টিতে ফুটে উঠুক এবং তাঁর পবিত্রতার ব্যাপারে কারও মনে কোনরূপ সন্দেহ না থাকুক। নতুবা এর পরিণাম হবে এই যে, রাজকীয় সম্মানের কারণে জনসাধারণের মুখ বন্ধ হয়ে গেলেও তাদের অন্তরে এ ধারণা ঘুরপাক খাবে যে, এ ব্যক্তিই যে মালিকের স্ত্রীর প্রতি কুমতলবের হাত প্রসারিত করেছিল। কোন সময় এ জাতীয় ধারণা দ্বারা স্বয়ং বাদশাহ্‌রও প্রভাবান্বিত হয়ে যাওয়ার মত পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। তাই মুক্তির পূর্বে এ ব্যাপারে সাক্ষাই ও তদন্তকে তিনি জরুরী মনে করলেন। উল্লিখিত দু' আয়াতের দ্বিতীয় আয়াতে স্বয়ং ইউসুফ (আ) এ কর্ম ও মুক্তি বিলম্বিত করার দু'টি কারণ বর্ণনা করেছেন।

ذٰلِكَ لِيَعْلَمَ اَنِّي لَمْ اَخْلَعْ بِاَلَيْفٍ  
প্রথম এ বিলম্বের কারণ হচ্ছে,

যাতে আশীষে-মিসর নিশ্চিত হন যে, আমি তাঁর অবর্তমানে তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করিনি।

তাঁকে নিশ্চয়তা দানের জন্যে উদগ্রীব হওয়ার কারণ এই যে, আশীষে-মিসরের মনে আমার প্রতি সন্দেহ থাকলে এবং রাজকীয় সম্মানের কারণে আমাকে কিছু বলতে না পারলে তাতে একটি অস্বস্তিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হবে। আমার রাজকীয় সম্মানও তাঁর কাছে অপ্রিয় থাকবে এবং চুপ থাকা তাঁর জন্য আরও কষ্টকর হবে। যে ব্যক্তি কিছুকাল পর্যন্ত প্রভু ছিল, তাঁর মনে কষ্ট দেওয়া ইউসুফ (আ) পছন্দ করেন নি। এ ছাড়া

আসীযে-মিসর তাঁর পবিত্রতার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে গেলে অন্যদের মুখ আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যেত।

দ্বিতীয় কারণ, **وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ**—অর্থাৎ এসব তদন্তের

কারণ হচ্ছে, যাতে সবাই জেনে নেয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা বিশ্বাসঘাতকদের প্রতারণা এড়তে দেন না।

এর দুটি অর্থ হতে পারে। এক, তদন্তের মাধ্যমে বিশ্বাসঘাতকদের বিশ্বাসঘাতকতা ফুটে উঠবে এবং সবাই জানতে পারবে যে, বিশ্বাসঘাতককে পরিণামে লাঞ্ছনাই ভোগ করতে হয়। ফলে ভবিষ্যতে সবাই এহেন কাজ থেকে বেঁচে থাকার সম্বন্ধ চেষ্টা করবে। দুই, যদি এ ঘোলাটে পরিস্থিতিতে ইউসুফ (আ) রাজকীয় সম্মানে ভূষিত হতেন, তবে অন্যরা ধারণা করতে পারত যে, বিশ্বাসঘাতকরাও বড় বড় পদমর্যাদা লাভ করতে পারে। ফলে তাদের বিশ্বাসে হ্রুটি দেখা দিত এবং বিশ্বাসঘাতকতার কুফল মন থেকে মুছে যেত। মোটকথা, উল্লিখিত কারণসমূহের পল্লিপ্রেক্ষিতে ইউসুফ (আ) মুক্তির পন্থাগাম পাওয়া মাত্রই কারাগার থেকে বের হয়ে পড়া পছন্দ করেন নি বরং রাজকীয় পর্যায়ে তদন্ত দাবী করেছেন।

আলোচ্য প্রথম আয়াতে এ তদন্তের সারমর্ম উল্লেখ করা হয়েছে :

قَالَ

**مَا خَطْبُكَ إِذْ رَأَوْنَكَ يَوْمَ سَفَا عَنْ نَفْسِهِ**—অর্থাৎ বাদশাহ্ হস্ত কর্তনকারিণী

মহিলাদেরকে উপস্থিত করে প্রশ্ন করলেন : কি ব্যাপার ঘটেছে যখন তোমরা ইউসুফের কাছে কুমতলবের খায়েশ করেছিলে? বাদশাহ্‌র এ প্রশ্ন থেকে জানা যায় যে, স্বস্থানে তাঁর মনে এ বিশ্বাস জন্মেছিল যে, দোষ ইউসুফের নয়—মহিলাদেরই। তাই তিনি বলেছেন : তোমরা তার কাছে কুমতলবের খায়েশ করেছিলে। এরপর মহিলাদের উত্তর উল্লেখ করা হয়েছে :

**قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ ط قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ  
إِنَّا حَصَمَ الْحَقُّ أَنَا وَارِدُكُنَّ مِنْ نَفْسِهِ وَإِنَّ لِمِنَ الْمَارِقِينَ**

অর্থাৎ সবাই বলল : আল্লাহ্ মহান, আমরা তাঁর মধ্যে বিন্দুমাত্রও মন্দ কোন কিছু জানি না। আসীয-পন্নী বলল : এখন তো সত্য কথা ফুটেই উঠেছে! আমিই তাঁর কাছে কুমতলবের কামনা করেছিলাম। সে নিশ্চিতই সত্যবাদী।

ইউসুফ (আ) তদন্তের দাবীতে আসীয-পন্নীর নাম চাপা দিয়েছিলেন। কিন্তু আল্লাহ্ যখন কাউকে ইয্‌ত দান করেন, তখন তার সত্যতা ও সাফাই প্রকাশে মানুষের মুখ আপনা

থেকেই খুলে যায়। এ ক্ষেত্রে আযীয-পত্নী সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে নিজেই সত্য প্রকাশ করে দিয়েছে।

এ পর্যন্ত বর্ণিত ইউসুফ (আ)-এর অবস্থা ও ঘটনাবলীতে অনেক উপকারিতা, মাস-আলা ও মানবজীবনের গুরুত্বপূর্ণ পথনির্দেশ রয়েছে। তন্মধ্যে ইতিপূর্বে আটটি বিষয় বর্ণিত হয়েছে। আরও কিছু মাস'আলা ও পথনির্দেশ নিম্নে বর্ণিত হল :

**মাস'আলা :** (৯) আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় বান্দাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য নিজেই অদৃশ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তাঁরা কোন সৃষ্ট জীবের কাছে ঋণী হোন---এটা তিনি পছন্দ করেন না। এ কারণেই ইউসুফ (আ) যখন মুক্তিপ্রাপ্ত কয়েদীকে বললেন : বাদশাহর কাছে আমার কথা বলো, তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে অনেক দিন পর্যন্ত বিস্মৃত করে রাখেন এবং অদৃশ্য যবনিকার অন্তরাল থেকে এমন ব্যবস্থা করেন, যাতে ইউসুফ (আ) কারও কাছে ঋণী না হন এবং পূর্ণ মান-সম্ভ্রমের সাথে কারাগার থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যেও পূর্ণ হয়।

এ ব্যবস্থা ছিল এই যে, মিসরের বাদশাহকে একটি উদ্বেগজনক স্বপ্ন দেখানো হল, যার ব্যাখ্যা দিতে দরবারের সবাই অক্ষমতা প্রকাশ করল। ফলে ইউসুফ (আ)-এর কাছে যেতে হল।

**মাস'আলা :** (১০) এতে সচ্চরিত্রতার শিক্ষা রয়েছে। মুক্তিপ্রাপ্ত কয়েদী বাদশাহর কাছে বজে দেয়ার মত কাজটাও না করার দরুন ইউসুফ (আ)-কে অতিরিক্ত সাত বছর পর্যন্ত বন্দী জীবনের দুঃসহ হাতনা ভোগ করতে হয়। সাত বছর পর যখন সে স্বপ্নের ব্যাখ্যা নেয়ার জন্য আগমন করল, তখন তিনি স্বভাবতই তাকে ভৎসনা করতে পারতেন এবং বলতে পারতেন যে, তোমার দ্বারা আমার এতটুকু কাজও হল না! কিন্তু ইউসুফ (আ) তা করেন নি। তিনি পয়গম্বরসুলভ চরিত্রের পরিচয় দিয়ে এ বিষয়টি উল্লেখ পর্যন্ত করেন নি-- (ইবনে-কাসীর, কুরতুবী)

**মাস'আলা :** (১১) সাধারণ লোকদের পারলৌকিক মঙ্গল চিন্তা করা এবং তাদেরকে পরকালে ক্ষতিকর কাজকর্ম থেকে বাঁচিয়ে রাখা যেমন পয়গম্বর ও আলিমদের কর্তব্য, তেমনি মুসলমানদের অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখাও তাদের দায়িত্ব। ইউসুফ (আ) এক্ষেত্রে শুধু স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিয়েই ক্ষান্ত হন নি; বরং বিজ্ঞানোচিত ও হিতাকাঙ্ক্ষার পরামর্শও দেন যে, উৎপন্ন গম শীঘ্রের মধ্যেই থাকতে দেবে এবং খোরাকীর পরিমাণে বের করবে---যাতে সেসব শস্য নষ্ট না হয়ে যায়।

**মাস'আলা :** (১২) অনুসরণযোগ্য আলিম সমাজের এদিকেও লক্ষ্য রাখা উচিত যে, তাদের সম্পর্কে জনগণের মধ্যে যেন কোন মিথ্যা বা ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি না হয়। কেননা কুধারণা মুখতাপ্রসূত হলেও তা দাওয়াত ও প্রচারকার্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। জনগণের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কথার ওজন থাকে না।---(কুরতুবী)

রসূলুল্লাহ (সা) বলেন :



অপবাদের স্থান থেকে বেঁচে থাক। অর্থাৎ এমন অবস্থা ও ক্ষেত্র থেকেও নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখ, যেখানে কেউ তোমার প্রতি অপবাদ আরোপ করার সুযোগ পায়। এ নির্দেশ সাধারণ মুসলমানদের জন্য। তবে আলিম শ্রেণীকে এ ব্যাপারে দ্বিগুণ সাবধান হতে হবে। রসূলুল্লাহ্ (সা) যাবতীয় গোনাহ্ থেকে মুক্ত ও পবিত্র ছিলেন; তা সত্ত্বেও তিনি এ ব্যাপারে বিশেষ রকম যত্নবান ছিলেন। একবার তাঁর একজন স্ত্রী তাঁর সাথে মদীনার এক গলিতে হেঁটে মাছিছিলেন। জনৈক সাহাবীকে সম্মুখ থেকে আসতে দেখে তিনি দূর থেকেই বলে দিলেন, আমার সাথে আমার অমুক স্ত্রী রয়েছে। উদ্দেশ্য, যাতে তিনি অনাখ্যায়া কোন মহিলার সাথে পথ অতিক্রম করছেন বলে কেউ সন্দেহ না করে। এ ক্ষেত্রে ইউসুফ (আ) কারাগার থেকে মুক্তি এবং রাজকীয় আহ্বান পাওয়া সত্ত্বেও মুক্তির পূর্বে জনগণের মন থেকে সন্দেহ দূর করার চেষ্টা করেছেন।

মাস'আলা : (১৩) অধিকারের ভিত্তিতে যার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা জরুরী যদি অনিবার্য পরিস্থিতিতে তার বিরুদ্ধে কোন কার্যক্রম গ্রহণ করতেও হয়, তবে এতেও সাধ্যানুযায়ী অধিকার ও সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রাখা উদ্ভূততার দাবি। ইউসুফ (আ) স্বীয় পবিত্রতা সপ্রমাণ করার জন্য যখন ঘটনার তদন্ত দাবি করেন, তখন আযীয ও তাঁর পত্নীর নাম উল্লেখ করার পরিবর্তে ঐ মহিলাদের কথা বলেছেন, যারা হাত কেটে ফেলে-ছিলেন।—(কুরতুবী) কেননা উদ্দেশ্য এতেও সিদ্ধ হতে পারত।

মাস'আলা : (১৪) এতে উত্তম চরিত্রের একটি শিক্ষা রয়েছে যে, যাদের হাতে সাত অথবা বার বছর পর্যন্ত কারাভোগ করতে হয়েছিল, মুক্তির পর ক্ষমতাপেয়েও ইউসুফ (আ) তাদের উপর কোন প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নি। অধিকন্তু তিনি তাদেরকে এতটুকু কষ্ট দেয়াও পছন্দ করেন নি, যেমন **لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخْذُ بِالْغَيْبِ** আশ্বাসে এ বিষয়ের উপরই গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

**وَمَا يُرِيّ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۗ**  
**إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُؤْمِنُ بِهٖ اسْتِخْلَاصُهُ**  
**لِنَفْسِي، فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ۝**  
**قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمُ ۝ وَكَذَلِكَ**  
**مَكَّنَّا يُوْسُفَ فِي الْأَرْضِ، يَتَّبِعُوا مِنْهَا حَيْثُ شَاءَ، وَنُصِيبُ**  
**بِرَحْمَتِنَا مَنْ شَاءَ، وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ۝ وَلَا جُرْأَلُودُ**

## خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٥٦﴾

(৫৬) আমি নিজেকে নির্দোষ বলি না। নিশ্চয় মানুষের মন মন্দ কর্মপ্রবণ, কিন্তু সে ময়--আমার পালনকর্তা যার প্রতি অনুগ্রহ করেন। নিশ্চয় আমার পালনকর্তা ক্ষমাশীল, দয়ালু। (৫৭) বাদশাহ্ বললঃ তাকে আমার কাছে নিয়ে এস। আমি তাকে নিজের বিশ্বস্ত সহচর করে রাখব। ততঃপর যখন তার সাথে মত বিনিময় করল তখন বললঃ নিশ্চয়ই আপনি আমার কাছে আজ থেকে বিশ্বস্ত হিসাবে মর্যাদার স্থান লাভ করেছেন। (৫৮) ইউসুফ বললঃ আমাকে দেশের ধন-ভাণ্ডারে নিযুক্ত করুন। আমি বিশ্বস্ত রক্ষক ও অধিক জ্ঞানবান। (৫৯) এমনভাবে আমি ইউসুফকে সে দেশের বুক প্রতিষ্ঠা দান করেছি। সে তথায় যেখানে ইচ্ছা স্থান করে নিতে পারত। আমি স্বীয় রহমত হাকে ইচ্ছা পৌঁছে দেই এবং আমি পুণ্যবানদের প্রতিদান বিনষ্ট করি না। (৬০) এবং ঐ লোকদের জন্য পরকালে প্রতিদান উত্তম যারা ঈমান এনেছে ও সতর্কতা অবলম্বন করে।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি নিজের মনকে (- ও সন্তোষিত দিক দিয়ে) মুক্ত (ও পবিত্র) বলি না। (কেননা প্রত্যেকের) মন মন্দেরই আদেশ দেয়, ঐ মন ছাড়া--যার প্রতি আমার পালনকর্তা অনুগ্রহ করেন [এবং যার মধ্যে মন্দের বীজ না রাখেন; যেমন পয়গম্বরদের মন। এগুলোকে 'মুতমায়িনা' (প্রশান্ত) বলা হয়। ইউসুফ (আ)-এর মনও ছিল এগুলোর অন্তর্ভুক্ত। উদ্দেশ্য এই যে, আমার পবিত্রতা ও সাধুতা আমার মনের সন্তোষিত গুণ নয়, বরং আল্লাহর অনুগ্রহ ও সুদৃষ্টির ফল। তাই আমার মন মন্দ কাজের আদেশ দেয় না। নতুবা অন্য লোকদের মন যেমন, আমার মনও তেমনি হত]। নিশ্চয় আমার পালনকর্তা অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। অর্থাৎ উপরে মনের দু'প্রকার শ্রেণীভেদ জানা গেছেঃ 'আশ্মারা' ও 'মুতমায়িনা'। আশ্মারা তওবা করলে ক্ষমাপ্রাপ্ত হয় এবং এ পর্যায়ে তাকে 'লাওয়ামা' বলা হয়। মুতমায়িনার গুণ তার সন্তার জরুরী অঙ্গ নয়, বরং আল্লাহর অনুকম্পা ও রহমতের ফল। অতএব আশ্মারা যখন লাওয়ামা হয়, তখন 'ক্ষমা' গুণ প্রকাশ পায় এবং 'মুতমায়িনা' 'দয়ালু' গুণ প্রকাশ পায়।

এসব হচ্ছে ইউসুফ (আ)-এর বক্তব্যের বিষয়বস্তু। এখন প্রশ্ন এই যে, অপবিত্রতা প্রমাণের এ কাজটি মুক্তির পরও তো সম্ভবপর ছিল। মুক্তির আগে তা কেন করা হল? সম্ভবত এর কারণ এই যে, মুক্তির পূর্বে এ পবিত্রতা প্রমাণ করলে যতটুকু বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে, মুক্তির পর ততটুকু হতে পারে না। কেননা, মুক্তি-প্রমাণ মুক্তির আগে ও পরে উভয় অবস্থাতে পবিত্রতা সপ্রমাণ করত ঠিক; কিন্তু মুক্তির আগে পেশকৃত মুক্তি-প্রমাণের সাথে একটি অতিরিক্ত বিষয়ও রয়েছে। তা এই যে, বাদশাহ্ ও আশীয যেন বুঝতে পারেন যে, যখন পবিত্রতা প্রমাণ ব্যতিরেকে ইউসুফ মুক্ত হতে চায় না, অথচ এমতাবস্থায় মুক্তিই

কয়েদীর পরম বাসনা হয়ে থাকে ; তখন বোঝা যায় যে, স্বীয় পবিত্রতার ব্যাপারে তিনি পূর্ণ আস্থাবান। তাই তা প্রমাণিত হয়ে যাবে বলে নিশ্চিত। বলা বাহুল্য, এরূপ পূর্ণ আস্থা নির্দোষ ব্যক্তিরই হতে পারে—দোষী ব্যক্তির নয়। বাদশাহ্ এসব কথাবার্তা শুনে ] এবং ( শুনে ) বাদশাহ্ বললেন : তাকে আমার কাছে নিয়ে এস। আমি তাকে একান্তভাবে নিজের ( কাজের ) জন্য রাখব ( এবং আযীমের কাছ থেকে নিয়ে নেব। সে আর তার অধীনে থাকবে না। লোকেরা তাকে বাদশাহ্‌র কাছে নিয়ে এল )। যখন বাদশাহ্ তাঁর সাথে কথা বললেন ( এবং কথাবার্তার মধ্যে তাঁর আরও গুণ-গরিমা প্রকাশ পেল ) তখন বাদশাহ্ ( তাঁকে ) বললেন : আপনি আমার কাছে আজ ( থেকে ) খুবই সম্মানার্থ ও বিশুদ্ধ। ( এরপর স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কে আলোচনা হল। বাদশাহ্ বললেন : এতবড় দুর্ভিক্ষের মুকাবেলা করা খুবই কঠিন কাজ। এর ব্যবস্থাপনা কার দায়িত্বে দেয়া যায় ? ) ইউসূফ (আ) বললেন : আমাকে জাতীয় সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত করুন। আমি ( এগুলোর ) রক্ষণাবেক্ষণ (-ও) করব এবং ( আমি আমদানী-রক্ষতানীর ব্যবস্থা ও হিসাব-কিতাবের পদ্ধতি সম্পর্কেও ) পুরাপুরি অভিজ্ঞতা রাখি ( সেমতে তাঁকে বিশেষ কোন পদ দানের পরিবর্তে নিজের প্রতিভা হিসাবে সর্বপ্রকার ক্ষমতাই দান করলেন। বাস্তবে যেন ইউসূফই বাদশাহ্ হয়ে গেলেন এবং তিনি নামেমাত্র বাদশাহ্ রইলেন। ইউসূফ (আ) আযীমের পদাধিকারী বলে খ্যাত হয়ে গেলেন। তাই আল্লাহ্ বলেন : ) আমি এমনি ( আশ্চর্যজনক ) ভাবে ইউসূফকে ( মিসর ) দেশে ক্ষমতাশালী করে দিলাম। সে যথা ইচ্ছা, তথায় বসবাস করতে পারে। ( যেমন বাদশাহ্‌গণ এ ব্যাপারে স্বাধীন হয়। অর্থাৎ এমন এক সময় ছিল, যখন তিনি কুপে বন্দী ছিলেন। এরপর আযীমের অধীনে গোলাম ছিলেন। আজ এমন সময় এসেছে যে, তিনি পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করেছেন। ব্যাপার এই যে ) আমি যাকে ইচ্ছা, স্বীয় অনুগ্রহ পৌঁছে দেই এবং আমি সৎকর্মশীলদের প্রতিদান বিনষ্ট করি না। ( অর্থাৎ ইহ-কালেও সৎকাজের প্রতিদান পায় অর্থাৎ পবিত্র জীবন লাভ করে। হয় ধনাঢ্য হয়ে— যেমন ইউসূফ লাভ করেছেন, না হয় ধনাঢ্যতা ব্যতিরেকে— অল্পে তৃপ্তি ও সন্তুষ্টির মাধ্যমে মধুর জীবন প্রাপ্ত হয়ে। এ হচ্ছে ইহকালের কথা ) এবং পরকালের প্রতিদান আরও উত্তম স্ৰীমান ও আল্লাহ্-ভীতি অবলম্বনকারীদের জন্য।

### আনুমানিক জ্ঞাতব্য বিষয়

নিজের পবিত্রতা বর্ণনা করা দুরন্ত নয় ; কিন্তু বিশেষ অবস্থায় : পূর্ববর্তী আয়াতে ইউসূফ (আ)-এর এ উক্তি বর্ণিত হয়েছিল : আমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের পুরাপুরি তদন্তের পূর্বে আমি কারাগার থেকে মুক্তি পছন্দ করি না—যাতে আযীম ও বাদশাহ্‌র মনে পুরাপুরি বিশ্বাস জন্মে যে, আমি কোন বিশ্বাসঘাতকতা করিনি এবং অভিযোগটি নিছক মিথ্যা ছিল। এ উক্তিতে একটি অনিবার্য প্রয়োজনে নিজের মুখেই নিজের পবিত্রতা বর্ণিত হয়েছিল, যা বাহ্যিক নিজের শুচিতা নিজে বর্ণনা করার শামিল। এটা আল্লাহ্ তা'আলার পছন্দনীয় নয় ; যেমন কোরআনে বলা হয়েছে :

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْكُونَ أَنفُسَهُمْ بِاللَّهِ يَزْكُونَ مِنْ يَشَاءُ

অর্থাৎ আপনি কি তাদেরকে দেখেন না যারা নিজেরাই নিজেদেরকে শুচিশুদ্ধ বলে? বরং আল্লাহ্ তা'আলারই অধিকার আছে, তিনি যাকে ইচ্ছা, শুচিশুদ্ধ সাব্যস্ত করবেন। সূরা নজমেও এ বিষয়বস্তু সম্বলিত একটি আয়াত রয়েছে :

فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى

নিজে দাবি করো না। আল্লাহ্ তা'আলারই সম্যক জ্ঞাত আছেন, কে বাস্তবিক পরহিজগার ও আল্লাহভীরু।

তাই আলোচ্য আয়াতে ইউসুফ (আ) আপন পবিত্রতা প্রকাশ করার সাথে সাথেই এ সত্যও ফুটিয়ে তুলেছেন যে, আমার এ কথা বলা নিজের আল্লাহভীরুতা ও পবিত্রতা প্রকাশ করার জন্য নয়; বরং সত্য এই যে, প্রত্যেক মানুষের মন, যার মৌল উপাদান চার বস্তু যথা— অগ্নি, পানি, সৃষ্টিকা ও বায়ু দ্বারা গঠিত হয়েছে, এ মন আপন স্বভাবে প্রত্যেককে মন্দ কাজের দিকেই আকৃষ্ট করে। তবে ঐ মন এর ব্যতিক্রম, যার প্রতি আমার পালনকর্তা অনুগ্রহ করেন এবং মন্দ স্পৃহা থেকে পবিত্র রাখেন। পয়গম্বরগণের মন এরূপই হয়ে থাকে। কোরআন পাকে এরূপ মনকে 'নফসে মুতময়িনা' আখ্যা দেয়া হয়েছে। মোটকথা, এমন কঠোর পরীক্ষার সময় গোনাহ্ থেকে বেঁচে যাওয়াটা আমার কোন সত্তাগত পরাকাষ্ঠী ছিল না; বরং আল্লাহ্ তা'আলারই রহমত ও পথ প্রদর্শনের ফল ছিল। তিনি যদি আমার মন থেকে হীন প্রবৃত্তিকে বহিষ্কার করে না দিতেন, তবে আমিও সাধারণ মানুষের মত কুপ্রবৃত্তির হাতে পরাভূত হয়ে যেতাম।

কোন কোন হাদীসে আছে, ইউসুফ (আ)-এর এ কথা বলার কারণ এই যে, তাঁর মনেও এক প্রকার কল্পনা সৃষ্টি হয়েই গিয়েছিল, যদিও তা অনিশ্চায়িত ধারণার পর্যায়ে ছিল। কিন্তু নবুয়তের মাপকাঠিতে এটাও পদস্থলনই ছিল। তাই এ কথা ব্যক্ত করেছেন যে, আমি নিজের মনকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র মনে করি না।

মানব-মন তিন প্রকার : আয়াতে এ বিষয়টি চিন্তাসাপেক্ষ যে, এতে প্রত্যেক মানব-মনকেই **أَسْرَارَةٌ بِالسُّوءِ** (মন্দ কাজের আদেশদাতা) বলা হয়েছে; যেমন এক

হাদীসে আছে, রসূলুল্লাহ্ (সা) সাহাবায়ে কিরামকে প্রশ্ন করলেন : এরূপ সাথী সম্পর্কে তোমাদের কি ধারণা থাকে সম্মান-সমাদর করলে অর্থাৎ অন্ন দিলে, বস্ত্র দিলে সে তোমাদেরকে বিপদে ফেলে দেয়। পক্ষান্তরে তার অবমাননা করা হলে অর্থাৎ তাকে ক্ষুধার্ত ও উলঙ্গ রাখা হলে সে তোমাদের সাথে সদ্ভাবহার করে? সাহাবায়ে কিরাম আশ্রয় করলেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ্ ! এর চাইতে অধিক মন্দ দুনিয়াতে আর কোন কিছু হতে পারে না। তিনি বললেন : ঐ সত্তার কসম, যার কজায় আমার প্রাণ, তোমাদের বুকের মধ্যে যে মনটি আছে সে এই ধরনের সাথী :—(কুরতুবী) অন্য এক হাদীসে আছে,

তোমাদের প্রধান শত্রু স্বয়ং তোমাদের মন। সে তোমাদেরকে মন্দ কাজে লিপ্ত করে লালিত ও অপমানিত করে এবং নানাবিধ বিপদাপদেও জড়িত করে দেয়।

মোটকথা, উল্লিখিত আয়াত এবং হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, মানব-মন মন্দ কাজেই উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু সূরা কিয়ামায় এ মানব-মনকেই 'লাওয়ামা' উপাধি দিয়ে এভাবে সম্মানিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা এর কসম খেয়েছেন :

—এবং সূরা আল

لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الثَّقِيَا مَةِ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ لَلْوَا مَةِ

কাজে এ মনকেই 'মৃতমান্নিমা' আখ্যায়িত করে জামাতের সুসংবাদ দান করা হয়েছে—

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ

এভাবে মানব-মনকে এক জায়গায়

مطمئنك بآية لَوَا مَةِ

—দ্বিতীয় জায়গায়

وَأَمَّا رَاةٌ بِالسُّوءِ

এবং তৃতীয় জায়গায়

বলা হয়েছে।

এর ব্যাখ্যা এই যে, প্রত্যেক মানব-মন আপন সত্তার দিক দিয়ে

أَمَّا رَاةٌ بِالسُّوءِ

অর্থাৎ মন্দ কাজের আদেশদাতা। কিন্তু মানুষ যখন আল্লাহ্ ও পরকালের ভয়ে মনের আদেশ পালনে বিরত থাকে, তখন তা

لَوَا مَةِ

হয়ে যায়। অর্থাৎ মন্দ কাজের জন্য তিরস্কারকারী ও মন্দ কাজ থেকে তওবাকারী ; যেমন সাধারণ সাধু-সজ্জনদের মন এবং যখন কোন মানুষ নিজের মনের বিরুদ্ধে সাধনা করতে করতে মনকে এ স্তরে পৌঁছিয়ে দেয় যে, তার মধ্যে মন্দ কাজের কোন স্পৃহাই অবশিষ্ট থাকে না, তখন তা 'মৃতমান্নিমা' হয়ে যায় অর্থাৎ প্রশান্ত ও বিরুদ্ধেগ মন। পূণ্যবানরা চেষ্টা ও সাধনার মাধ্যমে এ স্তর অর্জন করতে পারে ; কিন্তু তা সদাসর্বদা অব্যাহত থাকা নিশ্চিত নয়। পঙ্গলস্বরগণকে আল্লাহ্ তা'আলা আপনা-আপনি পূর্বসাধনা ব্যতিরেকেই এ মন দান করেন এবং তাঁরা সদাসর্বদা এ স্তরেই অবস্থান করেন। এভাবে মনের তিনটি অবস্থার দিক দিয়ে তিন প্রকার ক্রিয়াকর্মকে তার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

আয়াতের শেষে

أَن رَّبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ

—বলা হয়েছে। অর্থাৎ আমার পালন-

কর্তা অত্যন্ত ক্ষমাশীল, দয়ালু।

غَفُورٌ

শব্দে ইঙ্গিত আছে যে, নফসে-আম্মারা যখন স্বীয় গোনাহর জন্য অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে এবং 'লাওয়ামা' হয়ে যায়, তখন আল্লাহ্ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল, তিনি ক্ষমা করে দেবেন।

رَّحِيمٌ

শব্দে ইঙ্গিত রয়েছে যে, নফসে-মৃতমান্নিমা প্রাপ্ত হওয়াও আল্লাহ্ তা'আলার রহমত তথা দয়ারই ফল।

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي الْحِجَابَ ۝۱۰۰

মহিলাদের কাছে ঘটনার তদন্ত করলেন এবং শূন্যতা ও অন্যান্য সব মহিলা বাস্তব ঘটনা স্বীকার করল, তখন বাদশাহ্ নির্দেশ দিলেন : ইউসুফ (আ)-কে আমার কাছে নিয়ে এস-- যাতে আমি তাকে একান্ত উপদেষ্টা করে নেই। নির্দেশ অনুযায়ী তাঁকে সম্মানে কারাগার থেকে দরবারে আনা হল। অতঃপর পারম্পরিক আলাপ-আলোচনার ফলে তাঁর যোগ্যতা ও প্রতিভা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে বাদশাহ্ বললেন : আপনি আজ থেকে আমার কাছে অত্যন্ত সম্মানার্থে এবং বিশ্বস্ত।

ইমাম বগভী বর্ণনা করেন, যখন বাদশাহ্‌র দূত দ্বিতীয় বার কারাগারে ইউসুফ (আ)-এর কাছে পৌঁছল এবং বাদশাহ্‌র পয়গাম পৌঁছাল, তখন ইউসুফ (আ) সব কারাবাসীদের জন্য দোয়া করলেন এবং গোসল করে নতুন কাপড় পরিধান করলেন। তিনি বাদশাহ্‌র দরবারে পৌঁছে এ দোয়া করলেন :

حَسْبِيَ رَبِّي مِنْ دُنْيَايَ وَحَسْبِيَ رَبِّي مِنْ خَلْقِكَ عَزَّ جَارٌ وَجَلَّ ثَنَا تَهُ  
وَاللَّهُ غَيْرُهُ

অর্থাৎ—আমার দুনিয়ার জন্য আমার পালনকর্তাই যথেষ্ট এবং সকল সৃষ্ট জীবের মুকাবিলায় আমার পালনকর্তা আমার জন্য যথেষ্ট। যে তাঁর আশ্রয়ে আসে, সে সম্পূর্ণ নিরাপদ। তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই।

দরবারে পৌঁছে আল্লাহ্‌র দিকে রুজু হয়ে দোয়া করেন এবং আরবী ভাষায় সালাম করেন : আসসালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্ এবং বাদশাহ্‌র জন্য হিব্রু ভাষায় দোয়া করলেন। বাদশাহ্ অনেক ভাষা জানতেন, কিন্তু আরবী ও হিব্রু ভাষা তাঁর জানা ছিল না। ইউসুফ (আ) বলে দেন যে, সালাম আরবী ভাষায় এবং দোয়া হিব্রু ভাষায় করা হয়েছে।

এ রিওয়ামতে আরও বলা হয়েছে যে, বাদশাহ্ ইউসুফ (আ)-এর সাথে বিভিন্ন ভাষায় কথাবার্তা বলেন। তিনি তাঁকে প্রত্যেক ভাষায়ই উত্তর দেন এবং আরবী ও হিব্রু এ দু'টি অতিরিক্ত ভাষা শুনিয়ে দেন। এতে বাদশাহ্‌র মনে ইউসুফ (আ)-এর যোগ্যতা গভীরভাবে রেখাপাত করে।

অতঃপর বাদশাহ্ বললেন : আমি আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা আপনাদের মখ থেকে সরাসরি শুনেতে চাই। ইউসুফ (আ) প্রথমে স্বপ্নের এমন বিবরণ দিলেন, যা আজ পর্যন্ত বাদশাহ্ নিজেও কারও কাছে বর্ণনা করেন নি। এরপর ব্যাখ্যা বললেন।

বাদশাহ্ বললেন : আমি আশ্চর্য বোধ করছি যে, আপনি এসব বিষয় কি করে জানলেন! অতঃপর তিনি পরামর্শ চাইলেন যে, এখন কি করা দরকার? ইউসুফ (আ) বললেন :

প্রথম সাত বছর খুব বৃষ্টিপাত হবে। এ সময় অধিকতর পরিমাণে চাষাবাদ করে অতি-ব্রিঙ্ক ফসল উৎপাদনের ব্যবস্থা করতে হবে। জনগণকে অধিক ফসল ফলানোর জন্য নির্দেশ দিতে হবে। উৎপন্ন ফসলের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ নিজের কাছে সঞ্চিতও রাখতে হবে।

এভাবে দুভিক্ষের সাত বছরের জন্য মিসরবাসীদের কাছে প্রচুর শস্যভাণ্ডার মজুদ থাকবে এবং আপনি তাদের পক্ষ থেকে নিশ্চিত থাকবেন। রাজস্ব আয় ও খাস জমি থেকে যে পরিমাণ ফসল সরকারের হাতে আসবে, তা ভিন্দেশী লোকদের জন্য রাখতে হবে। কারণ, এ দুভিক্ষ হবে সুদূর দেশ অবধি বিস্তৃত। ভিন্দেশীরা তখন আপনার মুখাপেক্ষী হবে। আপনি খাদ্যশস্য দিয়ে সেসব আর্তমানুষকে সাহায্য করবেন। বিনিময়ে যৎকিঞ্চিৎ মূল্য গ্রহণ করলেও সরকারী ধনভাণ্ডারে অভূতপূর্ব অর্থ সমাগম হবে। এ পরামর্শ শুনে বাদশাহ্ মুগ্ধ ও আনন্দিত হয়ে বললেন : এ বিরাট পরিকল্পনার ব্যবস্থাপনা কিভাবে হবে এবং কে করবে ? ইউসুফ (আ) বললেন :

اجعلني على خزائن الارض اني حفيف عليهم --- অর্থাৎ জমির উৎপন্ন

ফসলসহ দেশীয় সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আপনি আমাকে সোপর্দ করুন। আমি এগুলোর পূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ করতে সক্ষম এবং ব্যয়ের খাত ও পরিমাণ সম্পর্কেও আমার পুরাপুরি জ্ঞান আছে।—(কুরতুবী)

একজন অর্থমন্ত্রীর মধ্যে যেসব গুণ থাকার দরকার, উপরোক্ত দু'টি শব্দের মধ্যে ইউসুফ (আ) তার সবগুলোই বর্ণনা করে দিয়েছেন। কেননা, অর্থমন্ত্রীর জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন হচ্ছে সরকারী ধনসম্পদ বিনষ্ট হতে না দেওয়া, বরং পূর্ণ হিফাযত সহকারে একত্রিত করা এবং অনাবশ্যক ও দ্বন্দ্ব খাতে ব্যয় না করা। দ্বিতীয় প্রয়োজন হচ্ছে, যেখানে যে পরিমাণ ব্যয় করা জরুরী, সেখানে সেই পরিমাণে ব্যয় করা এবং এক্ষেত্রে কোন কমবেশী না করা।

حفيظ শব্দটি প্রথম প্রয়োজনের এবং عليهم শব্দটি দ্বিতীয় প্রয়োজনের গ্যারাণ্টি।

বাদশাহ্ যদিও ইউসুফ (আ)-এর গুণাবলীতে মুগ্ধ ও তাঁর ধর্মপরায়ণতা ও বুদ্ধি-মত্তায় পুরাপুরি বিশ্বাসী হয়ে গিয়েছিলেন, তথাপি কার্যত তাকে অর্থমন্ত্রীর পদ সোপর্দ করলেন না ; বরং এক বছর পর্যন্ত একজন সম্মানিত অতিথি হিসাবে দরবারে রেখে দিলেন।

এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পর শুধু অর্থ মন্ত্রণালয়ই নয় ; বরং যাবতীয় সরকারী দায়িত্বও তাঁকে সোপর্দ করে দেওয়া হলো। সম্ভবত এ বিলম্বের কারণ ছিল এই যে, নিকট-সামিথ্যে রেখে চরিত্র ও অভ্যাস সম্পর্কে পুরাপুরি অভিজ্ঞতা অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত তাকে এত বড় পদ দান করা উপযুক্ত ছিল না ; যেমন শেখ সাদী বলেন :

چویوسف کسے در صلاح و تمیز  
بیک سال باید که گورد عزیز

অর্থাৎ : কেমন ব্যক্তির মধ্যে যদি ইউসুফ সমতুল্য যোগ্যতা ও মিস্ট চার থাকে, তার পক্ষে এক বছর কালের মধ্যেই মন্ত্রী পর্যায়ের মর্যাদা লাভ সম্ভব।





আশংকা না থাকে, তবে পদটি নিজে চেয়ে নেয়াও জায়েয। তবে শর্ত এই যে, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও অর্থকড়ির মোহে নয় বরং জনগণের বিগ্ৰহ সেবা ও ইনসাফের সাথে তাদের অধিকার সংরক্ষণ করাই উদ্দেশ্য থাকতে হবে; যেমন ইউসুফ (আ)-এর সামনে এ লক্ষ্যই ছিল। আর যেখানে এরূপ অবস্থা না হয়, সেখানে রসুলুল্লাহ্ (সা) কোন সরকারী পদ প্রার্থনা করতে নিষেধ করেছেন। যে ব্যক্তি নিজে কোন পদের জন্য আবেদন করেছে, তিনি তাকে পদ দেন নি।

মুসলিমের এক হাদীসে আছে, রসুলুল্লাহ্ (সা) আবদুর রহমান ইবনে সামরা (রা)-কে বললেন : কখনও প্রশাসকের পদ প্রার্থনা করো না। নিজে প্রার্থনা করে যদি প্রশাসকের পদ পেয়েও ফেল, তবে আল্লাহর সাহায্য ও সমর্থন পাবে না। ফলে, তুমি ভুল-ভ্রান্তি ও পদক্খলন থেকে বাঁচতে পারবে না। পক্ষান্তরে দরখাস্ত ব্যক্তিরকে যদি তোমাকে কোন পদ দান করা হয়, তবে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য ও সমর্থন পাবে। ফলে তুমি পদের পূর্ণ মর্যাদা রক্ষা করতে সক্ষম হবে।

মুসলিমের অপর এক হাদীসে আছে, এক ব্যক্তি রসুলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে একটি পদ প্রার্থনা করলে তিনি বললেন : **إِنَّا لَنُستعمل على عملنا من أراد**। যে ব্যক্তি নিজে পদ প্রার্থনা করে, আমি তাকে সরকারী পদ দান করি না।

ইউসুফ (আ)-এর পদ প্রার্থনা বিশেষ রহস্যের উপর ভিত্তিশীল ছিল : ইউসুফ (আ)-এর ব্যাপারটি এই প্রেক্ষাপট থেকে ভিন্ন। কারণ তিনি জানতেন যে, বাদশাহ্ কাফির। তার কর্মচারীরাও তেমনি। এদিকে দুভিক্ষের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। এমতাবস্থায় স্বার্থ-বাদী মহল জনগণের প্রতি দয়াদ্র' হবে না। ফলে লাঞ্ছনা মানুষ না খেয়ে মারা যাবে। এমন কোন দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল না, যে গরীবের প্রতি সুবিচার করতে পারে। তাই তিনি নিজেই এ পদের জন্য আবেদন করলেন। তবে এর সাথে নিজের কিছু গুণগত বৈশিষ্ট্যও তাঁকে প্রকাশ করতে হয়েছে, যাতে বাদশাহ্ সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে এ পদ দান করেন।

আজও যদি কেউ সরকারী এমন কোন পদ দেখে যে, এ কর্তব্য যথাযথ পালন করার মত অন্য কেউ নেই এবং তিনি নিজে তা বিগ্ৰহভাবে সম্পন্ন করতে পারবেন বলে বিশ্বাস করেন, তবে সে পদের জন্য দরখাস্ত করা তাঁর জন্য জায়েয তো বটেই বরং ওয়াজিব; কিন্তু প্রভাব-প্রতিপত্তি ও অর্থকড়ি লাভ নয় বরং জনসেবা এখানে প্রধান উদ্দেশ্য থাকতে হবে। এর সম্পর্ক আন্তরিক ইচ্ছার সাথে, যে সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা খুব উত্তমভাবে পরিজ্ঞাত।—(কুরতুবী)

খোলাফায়ে-রাশেদীন স্বেচ্ছায় খিলাফতের দায়িত্ব পালন করেছেন। এর কারণও তাই ছিল যে, তাঁরা জানতেন, অন্য কেউ এ দায়িত্ব সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে পারবে না। সাহাবায়ে-কিরামের মধ্যে হযরত আলী, হযরত মু'আবিয়া, হযরত হসান, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মুবায়্যের প্রমুখের মতানৈক্যও এ বিষয়ের ওপর ভিত্তিশীল ছিল যে, তাঁদের প্রত্যেকের ধারণা ছিল যে, তৎকালীন প্রেক্ষিতে খিলাফতের দায়িত্ব প্রতিপক্ষের তুলনায় তিনি অধিক সূহৃৎভাবে পালন করতে পারবেন। প্রভাব-প্রতিপত্তি কিংবা অর্থকড়ি অর্জন করার মূল লক্ষ্য ছিল না।

অমুসলিম রাষ্ট্রে সরকারী পদ গ্রহণ করা জায়েয কি না ; মাস'আলা : (৩) হযরত ইউসুফ (আ) মিসর-সম্রাটের চাকুরী গ্রহণ করেছিলেন। অথচ সম্রাট ছিল কাফির ; এ থেকে বোঝা যায় যে, কাফির অথবা ফাসিক শাসনকর্তার অধীনে সরকারী পদ গ্রহণ করা বিশেষ অবস্থায় জায়েয।

কিন্তু ইমাম জাসসাস **فَلَنْ أَكُونَ ظَهْرًا لِلْمُكَرِمِينَ** (আমি কখনও

অপরাধীদের সাহায্যকারী হব না) আয়াতের অধীনে লিখেছেন : এ আয়াতদুগ্ধেট জালিম ও কাফিরদের সাহায্য করা অবৈধ প্রমাণিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, কাফিরদের অধীনে সরকারী পদ গ্রহণ করা তাদের কার্যে অংশীদার হওয়া এবং সাহায্য করার নামান্তর। এ ধরনের সাহায্যকে কোরআন পাকের অনেক আয়াতে হারাম বলা হয়েছে।

হযরত ইউসুফ (আ) এ চাকুরী শুধু গ্রহণই করেন নি বরং দরখাস্ত করে লাভ করেছেন। তফসীরবিদ মুজাহিদের মতে এর বিশেষ কারণ এই যে, বাদশাহ তখন মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু কোরআন-হাদীসে এর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাই অধিকাংশ তফসীরবিদের মতে এর ফারস এই যে, ইউসুফ (আ) বাদশাহর আচরণদৃষ্টিে অনুভব করেছিলেন যে, তিনি তাঁর কাজে হস্তক্ষেপ করবেন না এবং শরীয়ত বিরোধী কোন আইন জারি করতে তাঁকে বাধ্য করবেন না। তাঁকে পূর্ণ ক্ষমতা অর্পণ করা হবে। ফলে তিনি স্বীয় অভিমত ও ন্যায্যনুগ আইন অনুযায়ী কাজ করতে পারবেন। শরীয়তবিরোধী কোন আইন মানতে বাধ্য করা হবে না—এরূপ পূর্ণ ক্ষমতা নিয়ে কোন কাফির অথবা জালিমের চাকুরী করার মধ্য যদিও কাফিরের সাথে সহযোগিতা করার দোষ বিদ্যমান থাকে, তথাপি যে পরিস্থিতিতে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করার শক্তি না থাকে এবং পদ গ্রহণ না করলে জনগণের অধিকার খর্ব হওয়ার অথবা অত্যাচার ও উৎপীড়নের প্রবল আশংকা থাকে, সেই পরিস্থিতিতে এতটুকু সহযোগিতা করার অবকাশ ইউসুফ (আ)-এর কর্ম দ্বারা প্রমাণিত হয়ে যায়, যতটুকুতে স্বয়ং কোন শরীয়ত-বিরোধী কাজ সম্পাদন করতে না হয়। কেননা, এটা প্রকৃতপক্ষে তার গোমরাহীর কাজে সাহায্য করা হবে না ; যদিও দূরবর্তী কারণ হিসেবে এতেও তার সাহায্য হয়ে যায়। উল্লিখিত পরিস্থিতিতে সাহায্যের দূরবর্তী কারণ সম্পর্কে শরীয়তসম্মত অবকাশ আছে। ফিকাহবিদগণ এর পূর্ণ বিবরণ দান করেছেন। পূর্ববর্তী সাহাবী ও তাবেয়ীগণের অনেকেই এহেন পরিস্থিতিতে অত্যাচারী শাসনকর্তাদের চাকুরী গ্রহণ করেছেন বলে প্রমাণিত আছে।—(কুরতুবী, মাযহারী)

আজামা মাওযারদি 'শরীয়তসম্মত রাজনীতি' সম্পর্কে স্বীয় গ্রন্থে লিখেছেন যে, কেউ কেউ ইউসুফ (আ)-এর এ কর্মের ভিত্তিতে কাফির ও জালিম শাসকদের অধীনে চাকুরী কিংবা রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব গ্রহণ করা এই শর্তে জায়েয বলেছেন যে, স্বয়ং তাকে শরীয়তবিরোধী কোন কাজ করতে না হয়। পক্ষান্তরে কেউ কেউ এ শর্ত সহকারেও এরূপ চাকুরী নাজায়েয বলেছেন। কারণ, এতেও জুলুমকারীদেরকে শক্তিশালী ও পরোক্ষভাবে সমর্থন করা হয়। তাঁরা ইউসুফ (আ)-এর এ কাজের বিভিন্ন কারণ বর্ণনা করে থাকেন। এগুলোর সারমর্ম এই যে, এ কাজটি গ্রহণ করা ইউসুফ (আ)-এর সত্তা অথবা তাঁর শরীয়তের বৈশিষ্ট্য ছিল। অন্যায়ের জন্য

এখন তা জায়েয নয়! কিন্তু অধিক সংখ্যক আলিম ও ফিকাহবিদ প্রথমোক্ত মতামত গ্রহণ করে একে জায়েয বলেছেন। —(কুরতুবী)

তফসীর বাহরে-মুহীতে আছে : যে ক্ষেত্রে জানা যায় যে, আলিম ও পুণ্যবান ব্যক্তিরূপে এ পদ গ্রহণ না করলে সর্বসাধারণের অধিকার ক্ষুণ্ণ হবে এবং সুবিচার পদে পদে ব্যাহত হবে, সেখানে পদ গ্রহণ করা জায়েয বরং সওয়াবের কাজ, শর্ত এই যে, এ পদ গ্রহণ করে যদি স্বয়ং তাকে কোন শরীয়তবিরোধী কাজ করতে না হয়।

মাস'আলা : (৪) ইউসূফ (আ)-এর **فِي حَفِيظَتِهِمْ** উক্তি থেকে প্রমাণিত হয় যে,

প্রয়োজনের ক্ষেত্রে নিজের কোন গুণগত বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা অবৈধ নয়। এটা কোর-আনে নিষিদ্ধ 'নিজের মুখে নিজের পবিত্রতা জাহির করা' অন্তর্ভুক্ত নয়, অবশ্য যদি তা অহ-কর, গর্ব ও আক্ষাফানবশত না হয়।

وَكَذَلِكَ سَكَنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُوا مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نَصِيبٌ

بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نَضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ۝

অর্থাৎ আমি ইউসূফকে বাদশাহর দরবারে যেভাবে মান-সম্মান ও উচ্চ পদমর্যাদা দান করেছি, এমনিভাবে আমি তাকে সমগ্র মিসরের শাসনকর্তৃত্ব দান করেছি। এখানে সে যেভাবে ইচ্ছা আদেশ জারি করতে পারে। আমি যাকে ইচ্ছা স্বীয় রহমত ও নিয়ামত দ্বারা সৌভাগ্যমণ্ডিত করি এবং আমি সংকর্মশীলদের প্রতিদান বিনশ্রুটি করি না।

ঘটনা এ ভাবে বর্ণনা করা হয় যে, এক বছর অভিজ্ঞতা অর্জনের পর বাদশাহ্ দরবারে একটি উৎসবের আয়োজন করেন। রাজ্যের সমস্ত সন্ত্রাস্ত পদাধিকারী ব্যক্তি ও কর্মকর্তা এতে আমন্ত্রিত হন। ইউসূফ (আ)-কে রাজমুকুট পরিহিত অবস্থায় দরবারে হাজির করা হয় এবং শুধু অর্থ দফতরের দায়িত্ব নয়—যাবতীয় রাজকর্মই কার্যত ইউসূফ (আ)-কে সোপর্দ করে বাদশাহ্ নির্জনবাসী হয়ে যান।—( কুরতুবী, মাযহারী )

ইউসূফ (আ) এমন সুশুখল ও সুঠুভাবে রাজকর্ম পরিচালনা করলেন যে, কারও কোন অভিযোগ রইল না। গোটা দেশ তাঁর প্রশংসায় মুগ্ধ হয়ে উঠল এবং সর্বত্র শান্তি-শুখলা ও স্বাচ্ছন্দ্য বিরাজ করতে লাগল। রাষ্ট্রের দায়িত্ব পালনে স্বয়ং ইউসূফ (আ)-ও কোনরূপ বাধাবিপত্তি কিংবা কষ্টের সম্মুখীন হননি।

তফসীরবিদ মুজাহিদ বলেন : এসব প্রভাব-প্রতিপত্তি ও রাজকর্তৃত্ব দ্বারা ইউসূফ (আ)-এর একমাত্র লক্ষ্য ছিল আল্লাহর বিধি-বিধান জারি করা এবং তাঁর দীন প্রতিষ্ঠিত করা। তিনি কোন সময় এ কর্তব্য বিস্মৃত হননি এবং অব্যাহতভাবে বাদশাহ্কে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন। তাঁর অবিরাম দাওয়াত ও প্রচেষ্টার ফলে শেষ পর্যন্ত বাদশাহ্ ও মুসলমান হয়ে যান।

وَلَا جُرْأَلْآ خَيْرَ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَفُوا يَتَّقُونَ ۝ অর্থাৎ পরকালের প্রতি-

দান ও সওয়াব দুনিয়ার নিয়ামতের চাইতে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ তাদের জন্য, যারা ঈমানদার এবং যারা ভাকওয়া ও পরহেযগারী অবলম্বন করে।

জনগণের সুখশান্তি নিশ্চিত করার জন্য ইউসুফ (আ) এমন কাজ করেন, যার নজির খুঁজে পাওয়া দুস্কর। সপ্তের ব্যাখ্যা অনুযায়ী সুখ-শান্তির সাত বছর অতিবাহিত হওয়ার পর দুড়িক দেখা দিল। ইউসুফ (আ) পেট ভরে খাওয়া ছেড়ে দিলেন। সবাই বলল : মিসর সাম্রাজ্যের যাবতীয় ধনভাণ্ডার আপনার কবজায়, অর্থাৎ আপনি ক্ষুধার্ত থাকেন, একেমন কথা। তিনি বললেন : সাধারণ মানুষের ক্ষুধার অনুভূতি যাতে আমার অন্তর থেকে উধাও হয়ে না যায়, সেজন্য এটা করি। তিনি শাহী বাবুচিদেরকে নির্দেশ দিলেন : দিনে মাত্র একবার ছিপ্রহরের খাদ্য রান্না করবে, যাতে রাজপরিবারের সদস্যবর্গও জনসাধারণের ক্ষুধায় কিছু অংশগ্রহণ করতে পারে।

وَجَاءَ إِخْوَتُهُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ

۝ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَّازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِآخِ لَكُمْ مِّنْ أَيْنِكُمْ

أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوْفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ۝ فَإِنْ لَّمْ

تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُون ۝ قَالُوا

سَرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ۝ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا

بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ

لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝

(৫৮) ইউসুফের ভ্রাতারা আগমন করল, অতঃপর তার কাছে উপস্থিত হল। সে তাদেরকে চিনল এবং তারা তাকে চিনল না। (৫৯) এবং সে যখন তাদেরকে তাদের রসদ প্রস্তুত করে দিল, তখন সে বলল : তোমাদের বৈমাত্রের ডাইকে আমার কাছে নিয়ে এসো। তোমরা কি দেখ না যে, আমি পুরা মাপ দেই এবং মেহমানদেরকে উত্তম সমাদর করি? (৬০) অতঃপর যদি তাকে আমার কাছে না জান, তবে আমার কাছে তোমাদের কোন বরাদ্দ নেই এবং তোমরা আমার কাছে আসতে পারবে না। (৬১) তারা বলল : আমরা তার সম্পর্কে তার পিতাকে সন্দেহ করার চেষ্টা করব এবং আমাদেরকে এ কাজ করতেই হবে। (৬২)

এবং সে ভৃত্যদেরকে বলল : তাদের পণ্যমূল্য তাদের রসদ-পত্রের মধ্যে রাখো—সম্ভবত তারা গৃহে পৌঁছে তা বুঝতে পারবে, সম্ভবত তারা পুনর্বার আসবে।

### তরুসীরের সার-সংক্ষেপ

(মোটকথা, ইউসূফ [আ] ক্রমতাসীন হয়ে খাদ্যাশস্যের চাষাবাদ করাতো ও তার ব্যাপক সঞ্চয় করাতো শুরু করলেন সাত বছর পর দুর্ভিক্ষ শুরু হল। মিসরে সরকারের তরফ থেকে খাদ্যাশস্য বিক্রি করা হচ্ছে—এ সংবাদ শুনে দুর্-দুরান্ত থেকে দলে দলে লোক আসতে শুরু করল) এবং (কেননাও দুর্ভিক্ষ দেখা দিল।) ইউসূফ (আ)-এর ভ্রাতারা (-ও বেনি-রামিন ছাড়া খাদ্যাশস্য নিতে মিসরে) আগমন করল। অতঃপর ইউসূফ (আ)-এর কাছে উপস্থিত হলে ইউসূফ (তো) তাদেরকে চিনলেন, কিন্তু তারা তাঁকে চিনল না। (কেননা, তাদের চেহারা-ছবিতে পরিবর্তন কম হয়েছিল। এছাড়া তারা যে আসবেই সে সম্পর্কে ইউসূফ (আ)-এর প্রবল ধারণা ছিল। আপনি কে, কোথা থেকে এসেছেন—নবাগতকে এরূপ জিজ্ঞাসাবাদও করা যায় এবং পূর্বপরিচিত হলে সামান্য অনুসন্ধান দ্বারা চিনেও নেওয়া যায়। কিন্তু ইউসূফ [আ]-এর অবস্থা এরূপ ছিল না। তিনি ভাইদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সময় কটি বালক ছিলেন। ফলে তাঁর চেহারা-ছবিতে বিরাট পরিবর্তন এসে গিয়েছিল। তিনি যে ইউসূফ হবেন, ভ্রাতাদের মনে এরূপ ধারণাও ছিল না। এ 'ছাড়া আপনি থেকে কে', শাসক-বর্গকে এরূপ জিজ্ঞাসা করারও রীতি নেই। ইউসূফ [আ]-এর রীতি ছিল, তিনি প্রত্যেকের কাছে তার প্রয়োজনের পরিমাণ খাদ্যাশস্য বিক্রি করতেন। ভ্রাতারা যখন দেখল যে, তাদেরও মূল্যের বিনিময়ে মাথাপিছু এক উট বোঝাই খাদ্যাশস্য দেয়া হচ্ছে, তখন তারা বলল : আমাদের আরও একটি বৈমাত্রেয় ভাই আছে। আমাদের পিতার একটি ছেলে ছোট বেলায় নিখোঁজ হয়ে গেছে। তাই সঙ্কল্পনার জন্য পিতা তাকে নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন! অতএব, তার অংশেরও এক উট বোঝাই খাদ্যাশস্যের আমাদেরকে দেয়া হোক। ইউসূফ [আ] বললেন : এটা আইনের বিপরীত। তার অংশ নিতে হলে তাকে স্বয়ং আসতে হবে। শেষ পর্যন্ত তাদের অংশের খাদ্যাশস্য তাদেরকে প্রদত্ত হল।) যখন ইউসূফ [আ] তাদের (খাদ্যাশস্যের) বোঝা প্রস্তুত করে দিলেন, তখন (প্রস্থানের সময়) বলে দিলেন : (এ খাদ্যাশস্য শেষ হওয়ার পর যদি আবার আসতে চাও তবে) তোমাদের বৈমাত্রেয় ভাইকেও (সাথে) আনবে (যাতে তার অংশও দেয়া যায়)। তোমরা কি দেখ না যে, আমি পুরাপুরি মেপে দেই এবং আমি সর্বাধিক অতিথিপূরায়ণ? (অতএব তোমাদের ঐ ভাই আসলে তাকে আমি পুরাপুরি অংশ দেব এবং তাকে আদর-আপায়ন করব; যেমন তোমরা নিজেদের ব্যাপারে তা দেখেছ। মোটকথা, তার আগমনে তোমাদেরই উপকার নিহিত রয়েছে) এবং যদি তোমরা (দ্বিতীয় বার আস এবং) তাকে আমার কাছে না আন, তবে (আমি বুঝব যে, তোমরা আমাকে প্রতারণিত করে অধিক খাদ্যাশস্য নিতে চেয়েছিলে। এর শাস্তি এই যে,) আমার কাছে তোমাদের নামের কোন খাদ্যাশস্য বরাদ্দ নেই এবং তোমরা আমার কাছে আসতেও পারবে না। (অতএব তাকে না আনলে তোমাদের ক্ষতি এই যে, তোমাদের অংশের খাদ্যাশস্যও বাতিল হয়ে যাবে)। তারা বলল : (দেখুন) আমরা (যথাসাধ্য) তাঁর পিতার কাছ থেকে তাকে চাইব এবং আমরা

এ কাজ ( অর্থাৎ চেষ্টা ও অনুরোধ ) অবশ্যই করব। ( এরপর পিতার ইচ্ছা ) এবং ( যখন সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে তারা চলতে লাগল, তখন ) ইউসূফ (আ) চাকরদেরকে বললেন : তাদের দেয়া পণ্যমূল্য ( যার বিনিময়ে তারা খাদ্যশস্য ক্রয় করেছে ) তাদেরই আসবাবপত্রের মধ্যে ( গোপনে ) রেখে দাও—যাতে গৃহে পৌঁছে একে ( যখন আসবাব-পত্রের ভেতর থেকে বের হয়ে আসে তখন ) চিনে। সম্ভবত ( এ দয়া ও অনুগ্রহ দেখে ) তারা পুনর্বীর ফিরে আসবে। ( তাদের পুনর্বীর আসা এবং ভাইকে নিয়ে আসা ইউসূফ [আ]-এর কামা ছিল। তাই তিনি এর উপায় অবলম্বন করেছেন। প্রথমত তিনি ওয়াদা করেছেন যে, তাকে নিয়ে আসলে তার অংশ পাওয়া যাবে। দ্বিতীয়ত সাবধান করে দিয়েছেন যে, তাকে না জানলে নিজেদের অংশও পাবে না। তৃতীয়ত মূল্য ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে, যা প্রচলিত মুদ্রার পরিবর্তে অন্য কোন বস্তু ছিল। এর পেছনে দু'টি ধারণা কার্যকরত ছিল। এক. একে দয়া ও অনুগ্রহ বুঝে তারা আবার আসবে। দুই. সম্ভবত তাদের কাছে এ-ছাড়া কোন মূল্য নেই; ফলে পুনর্বীর আসতে সক্ষম হবে না। এ মূল্য পেয়ে এগুলো নিয়েই তারা পুনর্বীর আসতে পারবে। )

### আনুমানিক জাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, ইউসূফ (আ) আত্মাহর কৃপায় মিসরের পূর্ণ শাসন ক্ষমতা লাভ করলেন। আলোচ্য আয়াতসমূহে ইউসূফ-প্রাতাদের খাদ্যশস্যের জন্য মিসরে আগমন উল্লেখ করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে একথাও বলা হয়েছে যে, দশ ভাই মিসরে আগমন করেছিল। ইউসূফ (আ)-এর সহোদর ছোট ভাই তাদের সাথে ছিল না।

কাহিনীর মধ্যবর্তী অংশ কোরআন বর্ণনা করেন নি। কারণ, তা আপনা-আপনি বোঝা যায়।

ইবনে-কাসীর সুন্দী, মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক প্রমুখ তফসীরবিদের বরাতে যে বিবরণ দিয়েছেন, তা ঐতিহাসিক ও ইসরাইলী রেওয়াজে থেকে গৃহীত হলেও কিছুটা গ্রহণ-যোগ্য। কারণ, কোরআনের বর্ণনারীতিতে এর প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

তঁারা বলেছেন : ইউসূফ (আ)-এর হাতে মিসরের শাসনভার অর্পিত হওয়ার পর স্বপ্নের ব্যাখ্যা অনুযায়ী প্রথম সাত বছর সমগ্র দেশের জন্য প্রভূত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও কল্যাণ নিয়ে আসে। অতেন ক্রসল উপায় হয় এবং তা অধিকতর পরিমাণে অর্জন ও সঞ্চয়ের চেষ্টা করা হয়। এরপর স্বপ্নের দ্বিতীয় অংশ প্রকাশ পেতে থাকে। উন্মাদহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং তা দীর্ঘ সাত বছর অব্যাহত থাকে। ইউসূফ (আ) পূর্ব থেকেই জ্ঞাত ছিলেন যে, দুর্ভিক্ষ সাত বছর পর্যন্ত অবিরাম অব্যাহত থাকবে। তাই দুর্ভিক্ষের প্রথম বছরে তিনি দেশের মওজুদ শস্যভান্ডার খুব সাবধানে সঞ্চিত ও সংরক্ষিত রাখলেন।

মিসরের অধিবাসীদের কাছে তাদের প্রয়োজন পরিমাণে খাদ্যশস্য পূর্ব থেকে সঞ্চিত করানো হলো। এখন দুর্ভিক্ষ ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়ল এবং চতুর্দিক থেকে বৃদ্ধক জন-সাধারণ মিসরে আগমন করতে লাগল। ইউসূফ (আ) একটি বিশেষ পদ্ধতিতে খাদ্যশস্য বিক্রয় করতে শুরু করলেন। অর্থাৎ এক ব্যক্তিকে এক উট-বোঝাই খাদ্যশস্য দিওন—

এর বেশি দিতেন না। কুরতুবী এর পরিমাণ এক ওসক্ অর্থাৎ ষাট সা' লিখেছেন, যা আমাদের ওজন অনুযায়ী দূশ দশ সের অর্থাৎ পাঁচ মণের কিছু বেশি হয়।

তিনি এ কাজকে এতটুকু গুরুত্ব দেন যে, বিক্রয় কার্যের তদারকি নিজেই করতেন। শুধু মিসরেরই দুর্ভিক্ষ সীমাবদ্ধ ছিল না বরং দূর-দূরান্ত অঞ্চল এর করালগ্রাসে পতিত হয়েছিল। হযরত ইয়াকুব (আ)-এর জন্মভূমি কেনান ছিল ফিলিস্তীনের একটি অংশ। অদ্যাবধি তা 'খজিল' নামে একটি সমৃদ্ধ শহরের আকারে বিদ্যমান রয়েছে। এখানে হযরত ইবরাহীম, ইসহাক, ইয়াকুব ও ইউসূফ (আ)-এর সমাধি অবস্থিত। এ বাসভূমিও দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস থেকে মুক্ত ছিল না। ফলে ইয়াকুব (আ)-এর পরিবারেও অনটন দেখা দেয়। সাথে সাথেই মিসরের এ সুখ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে যে, সেখানে মূল্যের বিনিময়ে খাদ্যশস্য পাওয়া যায়। হযরত ইয়াকুব (আ)-এর কানে এ সংবাদ পৌঁছে যে, মিসরের বাদশাহ্ অত্যন্ত সৎ ও দয়ালু ব্যক্তি। তিনি জনসাধারণের মধ্যে খাদ্যশস্য বিতরণ করেন। অতঃপর তিনি পুত্রদেরকে বললেন : তোমরাও যাও এবং মিসর থেকে খাদ্যশস্য নিয়ে এস।

এ কথাও জানাজানি হয়ে গিয়েছিল যে, একজনকে এক উটের বোঝার চাইতে বেশি খাদ্যশস্য দেওয়া হয় না! তাই তিনি সব পুত্রকেই পাঠাতে মনস্থ করলেন। সর্ব কনিষ্ঠ পুত্র বেনিয়ামিন ছিল ইউসূফ (আ)-এর সহোদর। ইউসূফ নির্খোজ হওয়ার পর ইয়াকুব (আ)-এর স্নেহ ও ভালবাসা তার প্রতি কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। তাই সন্তানা ও দেখাশোনার জন্য তাঁকে নিজেই কাছে রেখে দিলেন।

দশ ভাই কেনান থেকে মিসর পৌঁছল। ইউসূফ (আ) শাহী পোশাকে রাজ্যাধিপতির বেশে তাদের সামনে এলেন। শৈশবে সাত বছর বয়সে ভ্রাতারা তাঁকে ফাফেলার লোকজনের কাছে বিক্রয় করে দিয়েছিল কিন্তু এখন আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের রেওয়াজে অনুযায়ী তাঁর বয়স ছিল চল্লিশ বছর। ---(কুরতুবী, মামহারী)

বলা বাহুল্য, এত দীর্ঘ সময়ে মানুষের অজাবম্বল পরিবর্তিত হয়ে কোথা থেকে কোথায় পৌঁছে যায়! তাদের ধারণাও এ কথা ছিল না যে, যে বালককে তারা গোলামরূপে বিক্রয় করেছিল, সে কোন দেশের মন্ত্রী বা বাদশাহ্ হয়ে যেতে পারে। তাই তারা ইউসূফ (আ)-কে

চিনল না; কিন্তু ইউসূফ (আ) তাদেরকে চিনে ফেললেন। فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ

বাক্যের অর্থ তাই। আরবী ভাষায় مُنْكَرُونَ শব্দের আসল অর্থ অপরিচিত মনে করা, তাই مُنْكَرُونَ-এর অর্থ অজ্ঞ ও অপরিচিত।

ইউসূফ (আ)-এর চিনে নেওয়া সম্পর্কে সুন্দীর বরাতে দিয়ে ইবনে কাসীর আরও বর্ণনা করেন যে, দশ ভাই দরবারে পৌঁছলে ইউসূফ (আ) তাদেরকে এমনভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন, যেমন সন্দেহমুক্ত লোকদেরকে করা হয়--যাতে তারা সম্পূর্ণ সত্য উদঘাটন করে দেয়। প্রথমত জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা মিসরের অধিবাসী নও। তোমাদের ভাষাও হিব্রু। এমতাবস্থায় এখানে কিরূপে এলে? তারা বলল : আমাদের দেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ। আমরা আপনার প্রশংসা শুনে খাদ্যশস্যের জন্য এখানে এসেছি। দ্বিতীয়ত প্রশ্ন করলেন : তোমরা যে সত্য বলছ এবং

তোমরা কোন শত্রু চর নও—একথা কিরূপে বিশ্বাস করব? তারা বলল : আল্লাহর পানাহ! আমাদের দ্বারা এরূপ কখনও হতে পারে না। আমরা আল্লাহর নবী ইয়াকুব (আ)-এর সন্তান। তিনি কেনানে বসবাস করেন।

হযরত ইয়াকুব (আ)-এর ও তাঁর পরিবারের বর্তমান হাল অবস্থা জানা এবং ওদের মুখ থেকেই অতীতের কিছু ঘটনা বর্ণিত হোক—তাদেরকে প্রশ্ন করার পেছনে এটাই ছিল ইউসুফ (আ)-এর লক্ষ্য। এরপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন : তোমাদের পিতার আরও কোন সন্তান আছে কি? তারা বলল : আমরা বারো ভাই ছিলাম। তন্মধ্যে ছোট এক ভাই জন্মে নিখোঁজ হয়ে গেছে। আমাদের পিতা তাকেই সর্বাধিক আদর করতেন। এরপর তার ছোট সহোদর ভাইকে আদর করতে শুরু করেন। এ সন্তানের জন্য তাকে আমাদের সাথে এ সফরে পাঠান নি।

এ সব কথা শুনে ইউসুফ (আ) তাদেরকে রাজকীয় মেহমানের মর্যাদায় রাখা এবং যথারীতি খাদ্যশস্য প্রদান করার আদেশ দিলেন।

বন্টনের ব্যাপারে ইউসুফ (আ)-এর রীতি ছিল এই যে, একবারে কোন এক ব্যক্তিকে এক উটের বোঝার চাইতে বেশি পরিমাণ খাদ্যশস্য দিতেন না। হিসাব অনুযায়ী যখন তা শেষ হয়ে যেত, তখন পুনর্ব্যবস্থা দিতেন।

ভাইদের কাছে সব বিবরণ জানার পর তাঁর মনে এরূপ আকাঙ্ক্ষা উদয় হওয়া স্বাভাবিক ছিল যে, তারা পুনর্ব্যবস্থা আসুক। এর জন্য একটি প্রকাশ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করে তিনি যখন ভাইদেরকে বললেন :

اِقْتُونِي بِاَخِ لَكُمْ مِّنْ اَبْوَابِكُمْ اَلَا تَرَوْنَ اَنِّي اُوفِي الْكَيْلَ وَاَنَا

خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ۝

অর্থাৎ, তোমরা যখন পুনর্ব্যবস্থা আসবে, তখন তোমাদের সেই ভাইকেও নিয়ে আসবে। তোমরা দেখতেই পাচ্ছে যে, আমি কিভাবে পুরাপুরি খাদ্যশস্য প্রদান করি এবং কিভাবে অতিথি আপ্যায়ন করি।

এরপর একটি সাবধানবাণীও শুনিতে দিলেন :

فَاِنْ لَّمْ تَاْتُونِي بِهٖ ذَلَا كَيْلَ لَكُمْ مِّنْدِي وَلَا تَقْرَبُونِ

অর্থাৎ তোমরা

যদি ভাইকে সাথে না আন, তবে আমি তোমাদের কাউকেই খাদ্যশস্য দেব না (কেননা, আমি মনে করব যে, তোমরা আমার সাথে মিথ্যা বলেছ)। এভাবে তোমরা আমার কাছে আসবে না।

অপর একটি গোপন ব্যবস্থা এই করলেন যে, তারা খাদ্যশস্যের মূল্য বাবদ যেসব নগদ অর্থকড়ি কিংবা অলংকার জমা দিয়েছিল, সেগুলো গোপনে তাদের আসবাবপত্রের মধ্যে



দেখে দেওয়ার জন্য কর্মচারীদেরকে আদেশ দিলেন, যাতে বাড়ীতে পৌঁছে যখন তারা আসবার খুশি এবং নগদ অর্থ ও অলংকার পাবে, তখন যেন পুনর্বার খাদ্যশস্য নেওয়ার জন্য আসতে পারে।

ইবনে কাসীর ইউসূফ (আ)-এর এ কাজের কয়েকটি সম্ভাব্য কারণ বর্ণনা করেছেন। এক ইউসূফ (আ) মনে করলেন যে, তাদের কাছে এ নগদ অর্থ ও অলংকার ছাড়া সম্ভবত আর কিছুই নেই। ফলে পুনর্বার খাদ্যশস্য নেওয়ার জন্য তারা আসতে পারবে না। দুই-তিনি পিতা ও ভাইদের কাছে থেকে খাদ্যশস্যের মূল্য গ্রহণ করা পছন্দ করেন নি। তাই শাহী ভাণ্ডারে নিজের কাছ থেকে পণ্যমূল্য জমা করে দিয়েছেন এবং তাদের অর্থ তাদেরকে ফেরত দিয়েছেন। তিন-তিনি জানতেন যে তাদের অর্থ যখন তাদের কাছে ফিরে যাবে এবং পিতা তা জানতে পারবেন, তখন তিনি আল্লাহর নবী বিধায় এ অর্থকে মিসরীয় রাজভাণ্ডারের আমানত মনে করে অবশ্যই ফেরত পাঠাবেন। ফলে ভাইদের পুনর্বার আসা আরও নিশ্চিত হয়ে যাবে।

মোটকথা, ইউসূফ (আ)-কর্তৃক এসব ব্যবস্থা সম্পন্ন করার কারণ ছিল এই যে, ভবিষ্যতেও ভাইদের আগমন যেন অব্যাহত থাকে এবং ছোট সহোদর ভাইয়ের সাথেও তাঁর সাক্ষাত ঘটান সুযোগ উপস্থিত হয়।

জনুধাবনযোগ্য মাস'আলা : ইউসূফ (আ)-এর এ ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে, যদি দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থা এমন চরমে পৌঁছে যে, সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে অনেক লোক জীবন ধারণের অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যসামগ্রী থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়বে, তবে সরকার এমন দ্রব্য-সামগ্রীকে স্বীয় নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিতে পারে এবং খাদ্যশস্যের উপযুক্ত মূল্য নির্ধারণ করে দিতে পারে। ফিকাহবিদগণ এ বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছেন।

ইউসূফ (আ)-এর অবস্থা সম্পর্কে পিতাকে অবহিত না করা আল্লাহর আদেশের কারণে ছিল : ইউসূফ (আ)-এর ঘটনায় একটি চরম বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, একদিকে তাঁর পিতা আল্লাহর নবী ইয়াকুব (আ) তাঁর বিরহ-ব্যথায় অশ্রু বিসর্জন করতে করতে অন্ধ হয়ে গেলেন এবং অন্যদিকে ইউসূফ (আ) স্বয়ং নবী ও রসূল, পিতার প্রতি স্বভাবগত ভালবাসা ব্যতীত তাঁর অধিকার সম্পর্কেও সচেতন ছিলেন। কিন্তু সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর সময়ের মধ্যে তিনি একবারও বিরহ-যাতনায় অস্থির ও মুহ্যমান পিতাকে কোন উপায়ে স্বীয় কুশল সংবাদ পৌঁছানোর কথা চিন্তাও করলেন না। সংবাদ পৌঁছানো তখনও অসম্ভব ছিল না, যখন তিনি গোলাম হয়ে মিসরে পৌঁছেছিলেন। আজীজে-মিসরের গৃহে তাঁর সব রকম স্বাধীনতা ও সুযোগ-সুবিধার সামগ্রী বিদ্যমান ছিল। তখন কারও মাধ্যমে পর অথবা খবর পৌঁছিয়ে দেওয়া তাঁর পক্ষে তেমন কঠিন ছিল না। এমনিভাবে কারাগারের জীবনেও যে সংবাদ এদিক সেদিক পৌঁছাতে পারে, তা কে না জানে। বিশেষত আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁকে সসম্মানে কারাগার থেকে মুক্তি দেন এবং মিসরের শাসনকর্তৃতা তাঁর হাতে আসে, তখন নিজে গিয়ে পিতার কাছে উপস্থিত হওয়া তাঁর সর্বপ্রথম কাজ হওয়া উচিত ছিল। এটা কোন কারণে অসমীচীন হলে কমপক্ষে দূত প্রেরণ করে পিতাকে নিরুদ্বেগ করে দেওয়া তো ছিল তাঁর জন্য নেহাত মামুলি ব্যাপার।

কিন্তু আল্লাহর পরগণন ইউসূফ (আ) এরূপ ইচ্ছা করেছেন বলেও কোথাও বর্ণিত

নেই। নিজে ইচ্ছা কর্তা দুয়ের কথা, যখন খাদ্যশস্য নেওয়ার জন্য প্রাতারা আগমন করল, তখনও আসল ঘটনা প্রকাশ না করে তাদেরকে বিদায় করে দিলেন।

এ অবস্থা কোন সামান্যতম মানুষের কাছ থেকেও কল্পনা করা যায় না। আল্লাহর মনোনীত পয়গম্বর হয়ে তিনি তা কিরাপে বরদাশত করলেন!

এ বিস্ময়কর নীরবতার জওয়াবে সব সময় মনে একথা জাগ্রত হয় যে, সম্ভবত আল্লাহ তা'আলা বিশেষ রহস্যের অধীনে ইউসূফ (আ)-কে আত্মপ্রকাশে বিরত রেখেছিলেন। তফসীর কুরতুবীতে পরে সুস্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া গেল যে, আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে ইউসূফ (আ)-কে নিজের সম্পর্কে কোন সংবাদ গৃহে প্রেরণ করতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন।

আল্লাহ তা'আলার রহস্য একমাত্র তিনিই জানেন। মানুষের পক্ষে তা বোঝা কিরাপে সম্ভব! তবে মাঝে মাঝে কোন বিষয় কারণে বোধগম্য হয়েও যায়। এখানে বাহ্যত ইয়াকুব (আ)-এর পরীক্ষাকে পূর্ণতা দান করাই ছিল আসল রহস্য। এ কারণেই ঘটনার শুরুতে যখন ইয়াকুব (আ) বুঝতে পেরেছিলেন যে, ইউসূফকে বাঘে খায়নি, বরং এটা তাঁর ডাইদের দৃষ্টি, তখন স্বাভাবিকভাবেই সেখানে পৌঁছে সরেজমিনে তদন্ত করা তাঁর কর্তব্য ছিল। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁর মনকে এ দিকে যেতে দেন নি। অতঃপর দীর্ঘদিন পর তিনি ছোলেদেরকে বললেন: তোমরা যাও, ইউসূফ ও তার ডাইকে তালাশ কর। আল্লাহ তা'আলা যখন কোন কাজ করতে চান, তখন তার কারণাদি এমনিভাবে সন্নিবেশিত করে দেন।

فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ  
مَعَنَا آخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۝ قَالَ هَلْ أَمْتِكُمْ عَلَيْهِ  
إِلَّا كَمَا أَمْتِكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ ۚ قَالَ اللَّهُ خَيْرَ حِفْظًا ۖ وَهُوَ أَرْحَمُ  
الرَّحِيمِينَ ۝ وَكَلَّمَا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ  
إِلَيْهِمْ ۖ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ  
أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَٰلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ ۝ قَالَ  
لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنِي بِهِ  
إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ ۚ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا

نَقُولُ وَكَيْلٌ ۝

(৬৩) তারা যখন তাদের পিতার কাছে ফিরে এল, তখন বলল : হে আমাদের পিতা, আমাদের জন্য খাদ্যশস্যের বরাদ্দ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অতএব আপনি আমাদের ভাইকে আমাদের সাথে প্রেরণ করুন, যাতে আমরা খাদ্যশস্যের বরাদ্দ আনতে পারি এবং আমরা অবশ্যই তার পুরাপুরি হিফায়ত করব। (৬৪) বললেন, আমি তার সম্পর্কে তোমাদেরকে কি সেরূপ বিশ্বাস করব, যেমন ইতিপূর্বে তার ভাই সম্পর্কে বিশ্বাস করেছিলাম? অতএব আল্লাহ উত্তম হিফায়তকারী এবং তিনিই সর্বাধিক দয়ালু। (৬৫) এবং যখন তারা আসবাবপত্র খুলল, তখন দেখতে পেল যে, তাদেরকে তাদের পণ্যমূল্য ফেরত দেয়া হয়েছে। তারা বলল : হে- আমাদের পিতা, আমরা আর কি চাইতে পারি! এই আমাদের প্রদত্ত পণ্যমূল্য, আমাদেরকে ফেরত দেওয়া হয়েছে। এখন আমরা আবার আমাদের পরিবারবর্গের জন্যে রসদ আনব, এবং আমাদের ভাইয়ের দেখাশোনা করব এবং এক উটের বরাদ্দ খাদ্যশস্য আমরা অতিরিক্ত আনব। ঐ বরাদ্দ সহজ। (৬৬) বললেন : তাকে ততক্ষণ তোমাদের সাথে পাঠাব না, যতক্ষণ তোমরা আমাকে আল্লাহর নামে জরীকার না দাও যে, তাকে অবশ্যই আমার কাছে পৌঁছিয়ে দেবে, কিন্তু যদি তোমরা সবাই একান্তই অসহায় না হয়ে যাও। অতঃপর যখন সবাই তাঁকে জরীকার দিল, তখন তিনি বললেন : আমাদের মধ্যে যা কথাবার্তা হলো সে ব্যাপারে আল্লাহই মধ্যস্থ রইলেন।

### তক্ষসীরের সার-সংক্ষেপ

মোটকথা, তারা যখন পিতা ( ইয়াকুব আ )-র কাছে ফিরে এল, তখন বলল : হে আমাদের পিতা, ( আমাদের খুব সমাদর হয়েছে, খাদ্যশস্যও পেয়েছি, কিন্তু বেনিয়ামিনের অংশ পাইনি। ভবিষ্যতেও বেনিয়ামিনকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া ব্যতীত ) আমাদের জন্য খাদ্যশস্যের বরাদ্দ ( একেবারেই ) নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অতএব এমতাবস্থায় জরুরী যে, আপনি ভাই ( বেনিয়ামিন )-কে আমাদের সাথে প্রেরণ করুন, যাতে ( পুনর্বার খাদ্যশস্য আনার পথে যে বাধা, তা অপসারিত হয়ে যায় এবং ) আমরা ( আবার ) খাদ্যশস্যের বরাদ্দ আনতে পারি এবং ( যদি তাকে প্রেরণ করতে আপনি কোন আশংকা বোধ করেন, তবে সে সম্পর্কে আরয় এই যে ) আমরা তার পুরাপুরি হিফায়ত করব। ইয়াকুব (আ) বললেন : বাস, ( রাখ রাখ ) আমি কি তার সম্পর্কেও তোমাদেরকে তেমনি বিশ্বাস করবো, যেমন ইতিপূর্বে তার ভাই ( ইউসুফ )-এর ব্যাপারে তোমাদেরকে বিশ্বাস করেছিলাম? ( অর্থাৎ আমার মন তো সাক্ষ্য দেয় না ; কিন্তু তোমরা বলছ যে, তার যাওয়া ব্যতীত ভবিষ্যতে খাদ্যশস্য বরাদ্দ পাওয়া যাবে না ; অথচ খাদ্যশস্যের উপর জীবন নির্ভরশীল এবং জান বাঁচানো ফরয )। অতএব ( যদি নিয়েই যাও, তবে ) আল্লাহ তা'আলার ( কাছে তাকে সোপর্দ করলাম। তিনি ) সর্বোত্তম রক্ষণাবেক্ষণকারী। ( আমার রক্ষণাবেক্ষণে কি হয়! ) এবং তিনি সব দয়ালুর চাইতে দয়ালু। ( আমার দয়া ও রেহে কি হয়! ) এবং ( এ কথাবার্তার পর ) যখন তারা আসবাবপত্র খুলল, তখন ( তাতে ) তাদের জমা দেওয়া পণ্যমূল্য ( -ও ) পাওয়া গেল, যা তাদেরকে ফেরত দেওয়া হয়েছে। তারা বলল : পিতা : ( নিন ) আমরা আর কি চাই! এই আমাদের জমা দেওয়া পণ্যমূল্য,

যা আমাদেরকেই ফেরত দেওয়া হয়েছে! (এমন দয়ালু বাদশাহ! আমরা এর চাইতে বেশি কোন দয়ার জন্য অপেক্ষা করব? এটাই মঞ্চেট। এ কারণে আমাদের পুনর্বীর বাদশাহর কাছে যাওয়া উচিত। এটা ভাইকে নিয়ে যাওয়ার উপর নির্ভরশীল। কাজেই অনুমতি দিন, আমরা তাকে নিয়ে যাব) এবং পরিবারের জন্য (আরও) রসদ আনব এবং ডাইয়ের খুব হিফায়ত করব এবং এক উটের বরাদ্দ পরিমাণ খাদ্যশস্য বেশি আনব। (কেননা, এখন যে পরিমাণ এনেছি) এ তো অপ্রতুল। (শীঘ্র শেষ হয়ে যাবে। অতঃপর আরও প্রয়োজন হবে এবং তা পাওয়া ভাইকে নিয়ে যাওয়ার উপর নির্ভরশীল)। ইয়াকুব (আ) বললেন: তাকে আমি ততক্ষণ তোমাদের সাথে পাঠাব না, যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহর নামে অঙ্গীকার কর যে, তোমরা তাকে অবশ্যই আমার নিকট পৌঁছে দেবে! অবশ্য যদি তোমরা একান্তভাবেই অসহায় হয়ে পড় তাহলে ভিন্ন কথা। (এমতাবস্থায় পাঠাতে অঙ্গীকার করি না, কিন্তু) যতক্ষণ তোমরা হিফায়তের কসম না খাও (ততক্ষণ আমি পাঠাতে অক্ষম। সেমতে তারা সবাই কসম খেল)। যখন তারা কসম খেয়ে পিতাকে অঙ্গীকার দিল, তখন তিনি বললেন: আমরা যাকিছু বলছি; তা আল্লাহ তা 'আলায় সমর্পিত (অর্থাৎ তিনিই আমাদের কথা ও অঙ্গীকারের সাক্ষী। কারণ, তিনি শুনছেন। তিনি একথা পূর্ণ করতে পারেন। অতএব এ কথা বলার দু'উদ্দেশ্য—এক. তাদেরকে আপন অঙ্গীকারের প্রতি গম্ভ্য রাখতে উৎসাহিত ও সতর্ক করা। আল্লাহকে 'হাজির' ও 'নায়ির' মনে করলে তা অর্জিত হয়। দুই. তুফদীরকে এই তদবীরের শেষ সীমা স্থির করা, যা তাওয়াক্কুলের সারমর্ম। অতঃপর বেনিয়ামিনকে সাথে যাওয়ার অনুমতি দিয়ে দিলেন। পুনর্বীর মিসর সফরের জন্য বেনিয়ামিনসহ তারা সবাই প্রস্তুত হয়ে গেল)।

### জানুশরিক জাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে ঘটনার অবশিষ্টাংশ বর্ণিত হয়েছে যে, ইউসুফ (আ)-এর ভ্রাতারা যখন মিসর থেকে খাদ্যশস্য নিয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করল, তখন পিতার কাছে মিসরের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে এ কথাও বলল: আজীজে-মিসর ভবিষ্যতের জন্য আমাদেরকে খাদ্যশস্য দেওয়ার ব্যাপারে একটি শর্ত আরোপ করেছেন। তিনি বললেন যে, ছোট ভাইকে সাথে আনলে খাদ্যশস্য পাবে, অন্যথায় নয়। তাই আপনি ভবিষ্যতে বেনিয়ামিনকেও আমাদের সাথে প্রেরণ করুন—যাতে ভবিষ্যতেও আমরা খাদ্যশস্য পাই। আমরা তার পুরাপুরি হিফায়ত করব। তার কোনরূপ কলট হবে না।

পিতা বললেন: আমি কি তার সম্পর্কে তোমাদেরকে তেমনি বিশ্বাস করব, যেমন ইতিপূর্বে তার ভাই ইউসুফের ব্যাপারে করেছিলাম? উদ্দেশ্য, এখন তোমাদের কথায় কি বিশ্বাস! একবার বিশ্বাস করে বিপদ ভোগ করেছি। তখনও হিফায়তের ব্যাপারে তোমরা এ ভাষাই প্রয়োগ করেছিলে।

এটা ছিল তাদের কথার উত্তর। কিন্তু পরে পরিবারের প্রয়োজনের পরিপ্ৰেক্ষিতে পয়গম্বরসুলভ তাওয়াক্কুল এবং এ বাস্তবতায় ফিরে গেলেন যে, লাভ-ক্ষতি কোনটাই বাস্তব ক্ষমতাহীন নয়—যতক্ষণ আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা না করেন। আল্লাহর ইচ্ছা হয়ে গেলে তা



বন্দাদ অতিরিক্ত পাব। কারণ, আমরা যা এনেছি, তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। অল্প-দিনের মধ্যেই নিঃশেষ হয়ে যাবে।

مَا نَهْنِي ۙ বাক্যের এক অর্থ বর্ণিত হল। এ বাক্যের مَا শব্দটি 'না' বোধক

অর্থে নিজে বাক্যের আরেকটি অর্থ এরূপও হতে পারে যে, তারা পিতাকে বলল : এখন তো আমাদের কাছে খাদ্যশস্য আনার জন্য মূল্যও রয়েছে। আমরা আপনার কাছে কিছুই চাই না--শুধু ভাইকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দিন।

এসব কথা শুনে পিতা উত্তর দিলেন :

لَنْ أُرْسِلَٰ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُونِي مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتُنِي بِهِ

অর্থাৎ আমি বেনিয়ামিনকে তোমাদের সাথে ততক্ষণ পর্যন্ত পাঠাব না, যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহর কসম এবং সাথে এরূপ ওয়াদা-অঙ্গীকার আমাকে দাও যে, তোমরা অবশ্যই তাকে সাথে নিয়ে আসবে। কিন্তু সত্যদর্শীদের দৃষ্টি থেকে এ বিষয় কোন সময় উঠাও হয় না যে, মানুষ বাহ্যত যত শক্তি-সামর্থ্যই রাখুক, আল্লাহর শক্তির সামনে সে নিতান্তই অপারক ও অক্ষম। সে কাউকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনার কতটুকু ওয়াদা-অঙ্গীকারই বা করতে পারে। কারণ, তা পালন করার পূর্ণ শক্তি তার নেই। তাই ইয়াকুব (আ) এ ওয়াদা-অঙ্গীকারের সাথে একটি ব্যতিক্রমও জুড়ে দিলেন : **إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ** অর্থাৎ এ অবস্থা বাতীত,

যখন তোমরা সবাই কোন বেষ্টনীতে পড়ে যাও। তফসীরবিদ মুজাহিদ বলেন : এর অর্থ এই যে, তোমরা সবাই মৃত্যুমুখে পতিত হও। কাভাদাহর মতে অর্থ এই যে, তোমরা সম্পূর্ণ অক্ষম ও পরাভূত হয়ে পড়।

فَلَمَّا اتَّوَعَّ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ

প্রার্থিত পন্থায় ওয়াদা-অঙ্গীকার করল অর্থাৎ সবাই কসম খেল এবং পিতাকে আশ্বস্ত করার জন্য কঠোর ভাষায় প্রতিজ্ঞা করল, তখন ইয়াকুব (আ) বললেন : বেনিয়ামিনের হিফায়তের জন্য হলফ নেয়া ও হলফ করার যে কাজ আমরা করেছি, আল্লাহ তা'আলার উপরই তার নির্ভর। তিনি শক্তি দিলেই কেউ কারও হিফায়ত করতে পারে এবং দেয় অঙ্গীকার পূর্ণ করতে পারে। নতুবা মানুষ অসহায়; তার ব্যক্তিগত সামর্থ্যাধীন কোন কিছু নয়।

নির্দেশ ও মাস'আলা : আলোচ্য আয়াতসমূহে মানুষের জন্য অনেক নির্দেশ ও মাস-আলা বিদ্যমান রয়েছে। এগুলো স্মরণ রাখা দরকার :

সন্তান তুলনুটি করলে সম্পর্কহেদের পরিবর্তে সংশোধনের চিন্তা করাই একান্ত বিধেয় :

মাস'আলা (১) : ইউসুফ-ভ্রাতারা ইতিপূর্বে যে ভুল করেছিল, তাতে অনেক কবীরা

ও জঘন্য গোনাহ্ সংঘটিত হয়েছিল। উদাহরণত এক মিথ্যা কথা বলে ইউসুফকে তাদের সাথে খেলাধুলার জন্য প্রেরণ করতে পিতাকে সম্মত করা। দুই পিতার সাথে অসীকার করে তা ভঙ্গ করা। তিন কচি ও নিষ্পাপ ভাইয়ের সাথে নির্দয় ও নির্ভূর ব্যবহার করা। চার বৃদ্ধ পিতাকে নিদারুণ মনোকষ্ট দানে ব্রুক্লেপ না করা। পাঁচ একটি নিরপরাধ লোককে হত্যা করার পরিকল্পনা করা। ছয় একজন মুক্ত ও স্বাধীন লোককে জোর-জবরদস্তি ক্রীতদাসরূপে বিক্রি করে দেয়া।

এগুলো ছিল চরম অপরাধ। ইয়াকুব (আ) যখন জানতে পারলেন যে, তারা মিথ্যা ভাষণ দিয়েছে এবং স্বেচ্ছায় ও সন্তানে ইউসুফকে কোথাও রেখে এসেছে, তখন বাহ্যত এটা ছেলেদের সাথে সম্পর্কহেদ করার কিংবা ওদেরকে বাড়ি থেকে বের করে দেয়ার মত বিষয় ছিল। কিন্তু তিনি তা করেন নি। বরং তারা যথারীতি পিতার কাছেই থাকে। এমনকি, মিসর থেকে খাদ্যশস্য আনার জন্য পিতা তাদেরকেই প্রেরণ করেন। তদুপরি দ্বিতীয়বার তার ছোট ভাই সম্পর্কে পিতার কাছে আবেদন-নিবেদন করার সুযোগ পায় এবং অবশেষে তাদের কথা মেনে নিয়ে ছোট ছেলেকেও তাদের হাতেই সমর্পণ করেন।

এ থেকে জানা গেল যে, সন্তান কোন গোনাহ্ ও ভুলি করে ফেললে পিতার কর্তব্য হচ্ছে শিক্ষা ও উপদেশ দানের মাধ্যমে তার সংশোধন করা এবং যতক্ষণ পর্যন্ত সংশোধনের আশা থাকে, ততক্ষণ সম্পর্কহেদ না করা। হযরত ইয়াকুব (আ) তাই করেছিলেন। অবশেষে ছেলেরা সবাই কৃত অপরাধের জন্য অন্ততপ্ত হয়েছে এবং গোনাহ্র জন্য তওবা করেছে। হ্যাঁ, যদি সংশোধনের আশা না থাকে এবং তাদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখার মধ্যে অন্যদের ধর্মীয় ক্ষতির আশংকা থাকে, তবে সম্পর্কহেদ করাই অধিকতর সমীচীন।

মাস'আলা (২) : এখানে ইয়াকুব (আ) সদাচরণ ও সচ্চরিত্রতার অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ছেলেদের এহেন কঠিন অপরাধ সত্ত্বেও তিনি এমন আচরণ দেখিয়েছেন যে, তারা পুনর্বীর ছোট ভাইকে সাথে নিয়ে যাওয়ার অনুরোধ জানাতে সাহসী হয়েছে।

মাস'আলা (৩) : এমতাবস্থায় সংশোধনের উদ্দেশ্যে অন্যান্যকারীকে একথা বলে দেওয়াও সমীচীন যে, বিগত আচরণের কারণে তোমার কথা প্রত্যাখ্যান করাই উচিত ছিল, কিন্তু আমি তা ক্ষমা করে দিচ্ছি। এতে সে নজ্জিত হয়ে ভবিষ্যতে পূরাপুরি তওবা করার সুযোগ পাবে। যেমন ইয়াকুব (আ) প্রথমে বলে নিয়েছিলেন যে, বেনিইয়ামিনের ব্যাপারেও কি আমি তোমাদেরকে তেমনি বিশ্বাস করব, যেমন ইউসুফের ব্যাপারে করেছিলাম? কিন্তু বলার পর অবস্থার প্রেক্ষিতে তাদের তওবার কথা জেনে তিনি আল্লাহ্র উপর ভরসা করেছেন এবং ছোট ছেলেকে তাদের হাতে সঁপে দিয়েছেন।

মাস'আলা (৪) : কোন মানুষের ওয়াদা ও হিফায়তের আশ্বাসের উপর সত্যিকারভাবে ভরসা করা ভুল। প্রকৃত ভরসা শুধু আল্লাহ্র উপর হওয়া উচিত। তিনিই সত্যিকার কার্শনির্বাহী এবং কারণ উদ্ভাবক। কারণ সরবরাহ করা অতঃপর তাতে ক্রিয়া-শক্তি দান করার ক্ষমতা তাঁরই। এ কারণেই ইয়াকুব (আ) বলেছেন :

فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا

কা'বে আহবাব বলেন : এবার ইয়াকুব (আ) শুধু ছেলেদের উপর ভরসা করেন নি, বরং ব্যাপারটি আল্লাহ্‌র হাতে সোপর্দ করেছেন। তাই আল্লাহ্ বললেন : আমার ইয়মত ও প্রতাপের কসম, এখন আমি আপনার উভয় সন্তানকেই আপনার কাছে ফেরত পাঠাব।

মাস'আলা (৫) : যদি অন্য ব্যক্তির মাল অথবা কোন বস্তু আসবাব-পত্রের মধ্যে পাওয়া যায় এবং বলিষ্ঠ আলামত দ্বারা বোঝা যায় যে, সে তাকে দেওয়ার জন্য ইচ্ছা পূর্বক আসবাবপত্রের মধ্যে রেখে দিয়েছে তবে তা গ্রহণ করা এবং তাকে নিজ কাজে ব্যয় করা জায়েয। ইউসুফ ভ্রাতাদের আসবাবপত্রের মধ্যে যে পণ্যমূল্য পাওয়া গিয়েছিল সে সম্পর্কে বলিষ্ঠ আলামতের সাক্ষ্য ছিল এই যে, ভুল অথবা অনিচ্ছা বশত তা হয়নি, বরং ইচ্ছাপূর্বকই তা ফেরত দেওয়া হয়েছে। তাই ইয়াকুব (আ) তা ফেরত পাঠানোর নির্দেশ দেন নি। কিন্তু যে ক্ষেত্রে ভুলবশত এসে যাওয়ার সম্ভেদ থাকে, সেখানে মালিকের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করা ব্যতীত তা ব্যবহার করা বৈধ নয়।

মাস'আলা (৬) : কোন ব্যক্তিকে এরূপ কসম দেওয়া উচিত নয়, যা পূর্ণ করা তার সাধ্যাতীত। যেমন, ইয়াকুব (আ) বেনিয়ামিনকে সুস্থ ও নিরাপদে ফিরিয়ে আনার কসম দেওয়ার সাথে সাথে একটি অবস্থার ব্যতিক্রম প্রকাশ করেছেন যে, যদি তারা সম্পূর্ণ অপারক ও অক্ষম হয়ে পড়ে কিংবা সবাই ধ্বংসের মুখে পতিত হয়, তবে ভিন্ন কথা।

এ কারণেই রসূলুল্লাহ্ (সা) যখন সাহাবায়ে-কিরামের কাছ থেকে স্বীয় আনুগত্যের অঙ্গীকার নেন, তখন নিজেই তাতে 'সাধ্যের শর্ত' যুক্ত করে দেন। অর্থাৎ আমরা সাধ্যানু-যায়ী আপনার পূরাপূরি আনুগত্য করব।

মাস'আলা (৭) : ইউসুফ-ভ্রাতাদের কাছ থেকে এরূপ ওয়াদা-অঙ্গীকার নেওয়া যে, তারা বেনিয়ামিনকে ফিরিয়ে আনবে---এ থেকে বোঝা যায় যে, (ব্যক্তির জামানত) বৈধ। অর্থাৎ কোন মোকদ্দমার আসামীকে মোকদ্দমার তারিখে আদালতে হাশির করার জামানত নেওয়া জায়েয।

এ মাস'আলায় ইমাম মালেক (র) দ্বিমত প্রকাশ করেছেন। তিনি শুধু আধিক জামানতকে বৈধ মনে করেন এবং ব্যক্তির জামানতকে অবৈধ আখ্যায়িত করেন।

وَقَالَ يَبْنَئِي لَا تَدْخُلُوا مِنِّي بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنِّي أَبْوَابٍ  
 مُتَفَرِّقَةٍ ۖ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ  
 عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ۝ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ  
 أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ ۖ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ إِلَّا



حَاجَةٌ فِي نَفْسٍ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَدُوْعٌ عَلِيمٌ لِمَا عَلَّمْنَاهُ  
 وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ  
 أَوْسَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا  
 كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

(৬৭) ইয়াকুব বললেন : হে আমার বৎসগণ! সবাই একই প্রবেশদ্বার দিয়ে যেয়ো না, বরং পৃথক পৃথক দরজা দিয়ে প্রবেশ করো। আন্নাহর কোন বিধান থেকে আমি তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারি না। নির্দেশ আন্নাহরই চলে। তাঁরই উপর আমি ভরসা করি এবং তাঁরই উপর ভরসা করা উচিত ভরসাকারীদের। (৬৮) তারা যখন পিতার কথামত প্রবেশ করল, তখন আন্নাহর বিধানের বিরুদ্ধে তা তাদের বাঁচাতে পারল না। কিন্তু ইয়াকুবের সিদ্ধান্তে তাঁর মনের একটি বাসনা ছিল, যা তিনি পূর্ণ করেছেন। এবং তিনি তো আমার শেখানো বিষয় অবগত ছিলেন। কিন্তু অনেক মানুষ অবগত নয়। (৬৯) যখন তারা ইউসুফের কাছে উপস্থিত হল, তখন সে আপন ভ্রাতাকে নিজের কাছে রাখল। বলল : নিশ্চয়ই আমি তোমার সহোদর। অতএব তাদের কৃতকর্মের জন্য দুঃখ করো না।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং (রওয়ানা হওয়ার সময়) ইয়াকুব (আ) (তাদেরকে) বললেন : বৎসগণ, (যখন মিসরে পৌঁছবে, তখন) সবাই একই প্রবেশদ্বার দিয়ে যেয়ো না; বরং পৃথক পৃথক দরজা দিয়ে যেয়ো এবং (এটা কুদৃষ্টি ইত্যাদি অপছন্দনীয় বিষয় থেকে আত্মরক্ষার একটি বাহ্যিক তদবীর মাত্র। নতুবা) আন্নাহর নির্দেশকে আমি তোমাদের উপর থেকে হটাতে পারি না। নির্দেশ তো একমাত্র আন্নাহরই (চলে; এ বাহ্যিক তদবীর সত্ত্বেও মনেপ্রাণে) তাঁর উপরই ভরসা রাখি। এবং ভরসাকারীদের উচিত, তাঁরই উপর ভরসা রাখা। (অর্থাৎ তোমরাও তাঁর উপরই ভরসা রেখো --- তদবীরের দিকে দৃষ্টি দিও না। মোটকথা, সবাই বিদায় নিয়ে চলল।) যখন (মিসরে পৌঁছে) পিতার কথামত (শহরে) প্রবেশ করল, তখন পিতার মনোবাসনা পূর্ণ হয়ে গেল। (নতুবা) তাদের উপর থেকে, (এ তদবীর বলে) আন্নাহর নির্দেশ এড়ানো পিতার উদ্দেশ্য ছিল না (যে, তার কাজে কোনরূপ আপত্তি উত্থাপন করা যাবে কিংবা তদবীর উপকারী না হওয়ার দরুন তার প্রতি সন্দেহ করা হবে। তিনি নিজেই তো বলেছিলেন : مَا أَغْنَىٰ عَنْكَ مَا أَجْرُكَ أَمْ لَا ۚ

কিন্তু ইয়াকুব (আ)-এর মনে (তদবীর পর্যায়ে) একটি বাসনা (এ যে) ছিল, যা তিনি প্রকাশ করেছেন এবং তিনি নিশ্চিতই বড় আলিম ছিলেন এ কারণে যে, আমি তাকে শিক্ষা

দিয়েছিলাম। (তিনি ইলমের বিপরীত তদবীরকে বিশ্বাসের পর্যায়ে সত্যিকার প্রভাবশালী কিরাপে মনে করতে পারতেন? তার এ উক্তি'র কারণ সেই তদবীরই ছিল, যা শরীয়তসিদ্ধ ও প্রশংসনীয়।) কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না (বরং মুর্খতাভাবশত তদবীরকে সত্যিকার প্রভাবশালী বলে বিশ্বাস করে নেয়) এবং যখন তারা (অর্থাৎ ইউসূফ-ভ্রাতারা) ইউসূফ (আ)-এর কাছে পৌঁছল (এবং বেনিয়ামিনকে উপস্থিত করে বলল : আপনার নির্দেশে আমরা তাকে এনেছি) তখন সে ডাইকে নিজের কাছে ডেকে নিল এবং ( একান্তে তাকে ) বলল : আমি তোমার ভাই (ইউসূফ)। অতএব তারা যা কিছু (অসদাচরণ) করেছে, সেজনা দুঃখ করো না। (কেননা, এখন আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে মিলিত করে দিয়েছেন। এখন সব দুঃখ ভুলে যাওয়া উচিত। ইউসূফ (আ)-এর সাথে অসদাচরণ-হারের কথা তো সবারই জানা। বেনিয়ামিনকেও হয়তো তারা কষ্ট দিয়ে থাকবে। যদি কষ্ট না-ও দিয়ে থাকে, তবে ইউসূফের বিচ্ছেদ কি তার জন্য কম কষ্টদায়ক ছিল? অতঃপর উভয় ভ্রাতা মিলে পরামর্শ করলেন বেনিয়ামিনকে কিভাবে রেখে দেওয়া যায়। এমনিতে রাখলে ভ্রাতারা অস্বীকার ও কসমের কারণে নিয়ে যেতে পীড়াপীড়ি করবে। ফলে অমথা কথা কাটাকাটি হবে। পক্ষান্তরে রাখার কারণ প্রকাশ হয়ে পড়লে গোপন ভেদ ফাঁস হয়ে যাবে। আর কারণ গোপন থাকলে ইয়াকুব (আ)-এর কষ্ট বাড়বে যে, বিনা কারণে কেন রাখা হল, কিংবা কেন রইল? ইউসূফ (আ) বললেন : উপায় তো রয়েছে, কিন্তু এতে তোমার বদনাম হবে। বেনিয়ামিন বলল : বদনামের পরওয়া করি না। মোটকথা, তাদের মধ্যে একথাই সাবাস্ত হয়ে গেল। এদিকে সবাইকে খাদ্যশস্য দিয়ে বিদায় দেওয়ার আয়োজন করা হল।)

### আনুমানিক জাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে ছোট ডাইকে সাথে নিয়ে ইউসূফ-ভ্রাতাদের দ্বিতীয়বার মিসর সফরের কথা বর্ণিত হয়েছে। তখন ইয়াকুব (আ) তাদেরকে মিসর শহরে প্রবেশ-করার জন্য একটি বিশেষ উপদেশ দেন যে, তোমরা এগারো ডাই শহরের একই প্রবেশ দ্বার দিয়ে প্রবেশ করো না, বরং নগর-প্রাচীরের কাছে পৌঁছে ছয়ভঙ্গ হয়ে যেয়ো এবং বিভিন্ন দরজা দিয়ে শহরে প্রবেশ করো।

এরূপ উপদেশ দানের কারণ এই আশংকা ছিল যে, স্বাস্থ্যবান, সুঠাম দেহী, সুদর্শন এবং রূপ ও গুণ্ডলোর অধিকারী এসব যুবক সম্পর্কে যখন লোকেরা জানবে যে, এরা একই পিতার সন্তান এবং ডাই ডাই, তখন কারও বদ নজর লেগে তাদের ক্ষতি হতে পারে। অথবা সংঘবদ্ধভাবে প্রবেশ করার কারণে হয়তো কেউ হিংসাপরায়ণ হয়ে তাদের ক্ষতি সাধন করতে পারে।

ইয়াকুব (আ) তাদেরকে প্রথম সফরের সময় এরূপ উপদেশ দেন নি, দ্বিতীয় সফরের প্রাক্কালেই দিয়েছেন। এর কারণ সম্ভবত এই যে, প্রথমবার তারা মুসাফিরের বেশে এবং দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় মিসরে প্রবেশ করেছিল। কেউ তাদেরকে চিনত না এবং তাদের প্রতি কারও অতিরিক্ত মনোযোগ দানের আশংকা ছিল না। কিন্তু প্রথম সফরেই মিসরসম্রাট



লাগায় আক্রান্ত হলে মার চোখ লাগে, তার হাত, পা ও মুখমণ্ডল খোয়া পানি রোগীর দেহে  
চেলে দিলে চোখ লাগার অনিশ্চয় বিদূষিত হয়ে যায়।

কুরতুবী বলেন : আহলে সুন্নত ওয়াল-জমাআতের সব শীর্ষস্থানীয় আলিম এ  
বিষয়ে একমত যে, চোখ লাগা এবং তন্দব্বারা ক্ষতি সাধিত হওয়া সত্য।

ইয়াকুব (আ) একদিকে কুদৃষ্টি অথবা হিংসার আশংকাবশত ছেলেদেরকে একই  
দরজা দিয়ে শহরে প্রবেশ করতে নিষেধ করেছেন এবং অন্যদিকে একটি বাস্তব সত্য প্রকাশ  
করাও জরুরী মনে করেছেন। এ সত্যের প্রতি ঔদাসীন্যের ফলে এ জাতীয় ব্যাপারাদিতে  
জনসাধারণ মুখতাসুলভ ধারণা ও কুসংস্কারের শিকার হয়ে পড়ে। সত্যটি এই যে, কোন  
মানুষের জান ও মালের মধ্যে কুদৃষ্টির প্রভাব এক প্রকার মেসমেরিজম। ক্ষতিকর ঔষধ  
কিংবা খাদ্য যেমন মানুষকে অসুস্থ করে দেয় এবং শীত ও গ্রীষ্মের তীব্রতায় রোগব্যাধি  
জন্ম নেয়, তেমনি কুদৃষ্টি ও মেসমেরিজমের প্রভাবও এসব অভ্যন্তরীণ কারণের অধীন।  
দৃষ্টি অথবা কল্পনার শক্তিবলে এদের প্রভাব প্রতিফলিত হয়। স্বয়ং এদের মধ্যে কোন  
সত্যিকার প্রভাবশক্তি নাই। বরং সব কারণ আল্লাহ তা'আলার অপার শক্তি, ইচ্ছা ও  
ইরাদার অধীন। আল্লাহর তরুদীরের বিপরীতে কোন উপকারী তদব্বীরে উপকার হতে  
পারে না এবং ক্ষতিকর তদব্বীরের ক্ষতির প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। তাই ইয়াকুব  
(আ) বলেছেন :

وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَحْكَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ  
تَوَكُّاتٍ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ۝

অর্থাৎ কুদৃষ্টি থেকে আশ্রয়কার যে তদব্বীর আমি বলেছি, আমি জানি যে তা  
আল্লাহর ইচ্ছাকে এড়াতে পারবে না। আদেশ একমাত্র আল্লাহরই চলে। তবে মানুষের  
প্রতি বাহ্যিক তদব্বীর করার নির্দেশ আছে। তাই এ উপদেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমি  
তদব্বীরের উপর ভরসা করি না বরং আল্লাহর উপরই ভরসা করি। তাঁর উপরই ভরসা  
করা এবং বাহ্যিক ও বস্তুভিত্তিক তদব্বীরের উপর ভরসা না করা প্রত্যেক মানুষের  
অবশ্য কর্তব্য।

ইয়াকুব (আ) যে সত্য প্রকাশ করেছেন, ঘটনাচক্রে হয়েছেও কিছুটা তেমনি। এ  
সফরেও বেনিয়ামিনকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনার যাবতীয় তদব্বীর চূড়ান্ত করা সত্ত্বেও সব  
বার্থতায় পর্যবসিত হয়েছে এবং বেনিয়ামিনকে মিসরে আটকে রাখা হয়েছে। ফলে ইয়াকুব  
(আ) আরও একটি আঘাত পেয়েছেন। তাঁর তদব্বীরের বার্থতা পরবর্তী আঘাতে স্পষ্ট করে  
উল্লেখ করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য তাই যে, আসল লক্ষ্যের দিক দিয়ে তদব্বীর বার্থ হয়েছে,  
যদিও কুদৃষ্টি হিংসা ইত্যাদি থেকে আশ্রয়কার তদব্বীর সফল হয়েছে। কারণ, সফরে  
অপ্রীতিকর কোন ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত তরুদীরে যে দুর্ঘটনা  
অনিবার্য ছিল, ইয়াকুব (আ)-এর দৃষ্টি সেদিকে যায়নি এবং এর জন্য কোন তদব্বীর করতে

পারেন নি। এ বাহ্যিক ব্যর্থতা সত্ত্বেও আল্লাহ্র উপর ভরসার বরকতে এ দ্বিতীয় আঘাত প্রথম আঘাতেরও প্রতিকার প্রমাণিত হয়েছে এবং পরিণামে পরম নিরাপত্তা ও ইচ্ছতের সাথে ইউসূফ ও বেনিয়ামিন উভয়ের সাথে সাক্ষাৎ ঘটেছে।

পরবর্তী আয়াতে এ বিষয়বস্তুটিই বর্ণিত হয়েছে যে, ছেলেরা পিতার আদেশ পালন করে বিভিন্ন দরজা দিয়ে শহরে প্রবেশ করে। ফলে পিতার নির্দেশ কার্যকর হয়ে গেল। অবশ্য এ তদবীর আল্লাহ্র কোন নির্দেশকে এড়াতে পারত না, কিন্তু পিতৃসুলভ স্নেহ-মমতার চাহিদা ছিল যা, তা তিনি পূর্ণ করেছেন।

এ আয়াতের শেষভাগে ইয়াকুব (আ)-এর প্রশংসা করে বলা হয়েছে :

اٰرۡخَاۡءُ ذٰلِكَ لَدُوۡرِ عَلِيمٍ لِّمَا عَلَّمٰهُ وَلٰكِنۡ اَكۡثَرَ النَّاسِ لَا يَعۡلَمُوۡنَ ۝

ইয়াকুব (আ) বড় বিদ্বান ছিলেন, কারণ আমি তাঁকে বিদ্যা দান করেছিলাম। উদ্দেশ্য এই যে, সাধারণ লোকদের ন্যায় তাঁর বিদ্যা পুঁথিগত ও অনুশীলনজন্য নয় বরং তা ছিল সরাসরি আল্লাহ্র দান। এ কারণেই তিনি শরীয়তসম্মত ও প্রশংসনীয় বাহ্যিক তদবীর অবলম্বন করলেও তার উপর ভরসা করেন নি। কিন্তু অনেক লোক এ সত্য জানে না এবং অজ্ঞতাবশত ইয়াকুব (আ) সম্পর্কে সম্বেদ প্রকাশ করে যে, একজন পয়গম্বরের পক্ষে এ জাতীয় তদবীর শোভনীয় ছিল না।

কোন কোন তফসীরবিদ বলেন : প্রথম শব্দটি দ্বারা ইল্ম অনুযায়ী আমল করা বুঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আমি তাঁকে যে ইল্ম দিয়েছিলাম তিনি তদনুযায়ী আমল করতেন। এ কারণেই বাহ্যিক তদবীরের উপর ভরসা করেন নি বরং একমাত্র আল্লাহ্র উপরই ভরসা করেছেন।

فَلَمَّا رَاۡخُلُوۡا عَلٰۤى يُوۡسُفَ اٰوٰى اِلَيْهٖ اَخَاهُ قَالِ اِنِّىۡ اَنَا اٰخُوۡكَ  
ذٰلَا تَهْتٰسُ بِهٖا كَاۡنُوۡا يَعۡمَلُوۡنَ -

অর্থাৎ মিসরে পৌঁছার পর যখন সব ভাই ইউসূফ (আ)-এর দরবারে উপস্থিত হল এবং তিনি দেখলেন যে, ওয়াদা অনুযায়ী তারা তাঁর সহোদর ছোট ভাইকেও নিয়ে এসেছে, তখন ইউসূফ (আ) ছোট ভাই বেনিয়ামিনকে বিশেষভাবে নিজের সাথে রাখলেন। তফসীরবিদ কাতাদাহ বলেন : সব ভাইয়ের বসবাসের ব্যবস্থা করে ইউসূফ (আ) প্রতি দু'জনকে একটি করে কক্ষ দিলেন। ফলে বেনিয়ামিন একা থেকে যায়। ইউসূফ তাকে নিজের সাথে অবস্থান করতে বললেন। যখন উভয়েই একান্তে গেলেন, তখন ইউসূফ (আ) সহোদর ভাইয়ের কাছে নিজের পরিচয় প্রকাশ করে বললেন : আমিই তোমার সহোদর ভাই ইউসূফ ; এখন তোমার কোন চিন্তা নেই। অন্য ভাইগণ এ মারত যে সব দুর্খাবহার করেছে, তজ্জন্য মনোকন্টে পতিত হওয়ারও প্রয়োজন নেই।

নির্দেশ ও মাস'আলা : আলোচ্য দু' আয়াত থেকে কতিপয় মাস'আলা ও নির্দেশ জানা যায় :

(১) চোখ লাগা সত্য। সুতরাং ক্রতিকর খাদ্য ও ক্রতিকর ক্রিয়াকর্ম থেকে আত্মরক্ষার তদবীর করার ন্যায় এ থেকে আত্মরক্ষার তদবীর করাও সমভাবে শরীয়তসিদ্ধ ও প্রশংসনীয়।

(২) প্রতিহিংসা থেকে আত্মরক্ষার জন্য বিশেষ নিয়ামত ও গুণগত বৈশিষ্ট্যকে গোপন রাখা দুরূহ।

(৩) ক্রতিকর প্রভাব থেকে আত্মরক্ষার জন্য বাহ্যিক ও বস্তুভিত্তিক তদবীর করা তাওয়াফুল ও পরগম্বরণগণের পদমর্হাদার পরিপন্থী নয়।

(৪) যদি কেউ অন্য কারও সম্পর্কে আশংকা পোষণ করে যে, সে দুঃখ-কষ্টে পতিত হবে, তবে তাকে অবহিত করা এবং দুঃখ-কষ্টের হাত থেকে আত্মরক্ষার সম্ভাব্য উপায় বাতলে দেওয়া উত্তম, যেমন ইয়াকুব (আ) করেছিলেন।

(৫) যদি অন্য কারও কোন গুণ অথবা নিয়ামত দৃষ্টিতে বিস্ময়কর ঠেকে এবং চোখ লেগে যাওয়ার আশংকা হয়, তবে তা দেখে **مَا شَاءَ اللَّهُ** অথবা **بَارِكْ اللَّهُ** বলা দরকার, যাতে অন্যের কোন ক্রতি না হয়।

(৬) চোখ লাগা থেকে আত্মরক্ষার জন্য যে কোন সম্ভাব্য তদবীর করা জায়েয। তন্মধ্যে দোয়া-তাবীজ ইত্যাদি দ্বারা প্রতিকার করাও অন্যতম, যেমন রসূলুল্লাহ (সা) জা'ফর ইবনে আবু তালিবের দু'ছেলেকে দুর্বল দেখে তাবীজ ইত্যাদি দ্বারা চিকিৎসা করার অনুমতি দিয়েছিলেন।

(৭) বিজ্ঞ মুসলমানের কর্তব্য হচ্ছে প্রত্যেক কাজে আসল ভরসা আল্লাহর উপর রাখা। কিন্তু বাহ্যিক ও বস্তুভিত্তিক উপায়াদিকেও উপেক্ষা করবে না এবং সাধ্যানুযায়ী বৈধ উপায়াদি অবলম্বন করতে চুটি করবে না। ইয়াকুব (আ) তাই করেছিলেন এবং রসূলুল্লাহ (সা)-ও তাই শিক্ষা দিয়েছেন। মাওলানা রুমী বলেন :

بَرْتَوْكُلْ زَانُوئِے اَشْتَرُ بَہ بِنْدِ

এটাই পরগম্বরণসুলভ তাওয়াফুল ও রাসূল (সা)-এর সূত্র।

(৮) এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, ইউসুফ (আ) ছোট ভাইকে আনার জন্য চেষ্টা করেছেন এবং যখন সে এসেছে, তখন তার কাছে নিজের পরিচয়ও প্রকাশ করে দিয়েছেন। কিন্তু পিতাকে আনার জন্য কোন চিন্তাও করেন নি এবং তাঁকে স্বীয় কুশল সংবাদ অবগত করানোর কোন পদক্ষেপও গ্রহণ করেন নি। এর কারণ পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, চল্লিশ বছর সময়ের মধ্যে এমন অনেক সুযোগ ছিল, যখন তিনি পিতাকে স্বীয় অবস্থা ও কুশল সংবাদ দিতে পারতেন, কিন্তু যা কিছু হয়েছে, সব আল্লাহর নির্ধারিত তকদীর ও ওহীর ইজিভেই হয়েছে। হয়তো তখন পর্যন্ত আল্লাহর পক্ষ থেকে পিতাকে স্বীয় অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করার অনুমতি ছিল না। কারণ, তখনও প্রিয় পুত্র বেনিয়ামিনের বিচ্ছেদের

মাধ্যমে পিতার আরও একটি পরীক্ষা বাকী ছিল। এ পরীক্ষা সমাপ্ত করার জন্যই সব ব্যবস্থাদি সম্পন্ন হয়েছে।

فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَّازِهِمْ جَعَلَ السَّقَايَةَ فِي رِجْلِ أَخِيهِ ثُمَّ  
 أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيُّهَا الْعَيْرِ إِنَّكُمْ لَسَرِقُونَ ۝ قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ  
 مَاذَا تَفْقَدُونَ ۝ قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاءَ الْمَلِكِ وَلَسَنَ جَاءَ بِهِ حِمْلُ  
 يَئِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ۝ قَالُوا تَاللَّهِ كَفَدْنَا عَلِيمٌ قَا جِئْنَا لِنَفْسِدَ  
 فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَرِقِينَ ۝ قَالُوا فَمَا جَزَاءُوهُ إِن كُنْتُمْ  
 كَذِبِينَ ۝ قَالُوا جَزَاءُوهُ مَنْ وَجَدَ فِي رِجْلِهِ فهُوَ جَزَاءُوهُ  
 كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ۝ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَّتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ  
 ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ ۝ كَذَلِكَ كَذَّبَ لِيُؤَسِّفَ مَا كَانَ  
 لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۝ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ  
 مَنْ نَشَاءُ ۝ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ۝

(৭০) অতঃপর যখন ইউসুফ তাদের রসদপত্র প্রস্তুত করে দিলেন, তখন পানপাত্র আপন ডাইয়ের রসদের মধ্যে রেখে দিল। অতঃপর একজন ঘোষক ডেকে বলল : হে কাফিলার লোকজন, তোমরা অবশ্যই চোর। (৭১) তারা ওদের দিকে মুখ করে বলল : তোমাদের কি হারিয়েছে? (৭২) তারা বলল : আমরা বাদশাহর পানপাত্র হারিয়েছি এবং যে কেউ এটা এনে দেবে সে এক উটের বোঝা পরিমাণ মাল পাবে এবং আমি এর যামিন। (৭৩) তারা বলল : আল্লাহর কসম, তোমরা তো জান, আমরা অনর্থ ঘটতে এদেশে আসিনি এবং আমরা কখনও চোর ছিলাম না। (৭৪) তারা বলল : যদি তোমরা মিথ্যাবাদী হও, তবে যে চুরি করেছে তার কি শাস্তি? (৭৫) তারা বলল : এর শাস্তি এই যে, যার রসদপত্র থেকে তা পাওয়া যাবে, এর প্রতিদানে সে দাসত্বে যাবে। আমরা জালিমদেরকে এভাবেই শাস্তি দিই। (৭৬) অতঃপর ইউসুফ আপন ডাইয়ের খলের পূর্বে তাদের খলে তলাশী শুরু করলেন। অবশেষে সেই পাত্র আপন ডাইয়ের খলের মধ্য থেকে বের করলেন। এমনিভাবে আমি ইউসুফকে কৌশল শিক্ষা দিয়েছিলাম। সে

বাদশাহর আইনে আপন ভাইকে কখনও দাসত্বে নিতে পারত না, কিন্তু আল্লাহ যদি ইচ্ছা করেন। আমি যাকে ইচ্ছা, মর্খাদায় উন্নীত করি এবং প্রত্যেক জানীর উপরে আছেন। অধিকতর এক জানীজন।

### তফসীলের সার-সংক্ষেপ

অতঃপর যখন ইউসুফ (আ) তাদের (খাদ্যশস্য ও রওয়ানা হওয়ার) রসদপত্রাদি প্রস্তুত করে দিলেন তখন ( নিজেই কিংবা কোন নির্ভরযোগ্য কর্মচারীর মাধ্যমে) পানপাত্র (খাদ্যশস্য দেওয়ার মাগও ছিল তাই) আপন ভাইয়ের রসদের মধ্যে রেখে দিলেন। অতঃপর (যখন তারা রওয়ানা হল, তখন ইউসুফের আদেশে পেছন দিক থেকে) একজন আহ-বানকারী ডেকে বলল : হে কাফেলার লোকজন, তোমরা অবশ্যই চোর। তারা তাদের (অর্থাৎ অবৈধগণকারীদের) দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল : তোমাদের কি বস্তু হারিয়েছে (যা চুরির ব্যাপারে আমাদেরকে সন্দেহ করছ)? তারা বলল : আমরা শাহী পরিমাপ পাত্র পাচ্ছি না (তা উধাও হয়ে গেছে)। যে ব্যক্তি তা (এনে) উপস্থিত করবে, সে এক উট বোঝাই খাদ্যশস্য (পুরস্কার হিসাবে শস্যভাণ্ডার থেকে) পাবে। (কিংবা উদ্দেশ্য এই যে, যদি স্বয়ং চোর মাল ফেরত দেয়, তবে ক্ষমার পর পুরস্কার পাবে) আমি তার (পুরস্কার আদায় করে দেওয়ার) যামিন। [সত্ত্বত ইউসুফ (আ)-এর আদেশেই এ আহবান ও পুরস্কারের ওয়াদা করা হয়েছিল] তারা বলল : আল্লাহর কসম তোমরা ভাল রাপেই জান যে, আমরা দেশে অশান্তি ছড়ানোর জন্য (যার মধ্যে চুরি অন্যতম) আসিনি এবং আমরা চোর নই (অর্থাৎ এটা আমাদের অভ্যাস নয়)। তারা (অনুসন্ধানকারীরা) বলল : আচ্ছা যদি তোমরা মিথ্যাবাদী হও, (এবং তোমাদের মধ্যে কারও চুরি প্রমাণিত হয়ে যায়) তবে তার (চৌর্থ-কর্মের) শাস্তি কি? তারা [ইয়াকুব (আ)-এর শরীয়তানুযায়ী] উত্তর দিল : তার শাস্তি এই যে, যার রসদপত্রের মধ্যে তা পাওয়া যায়, সে নিজেই তার শাস্তি (অর্থাৎ চুরির বিনিময়ে সংশ্লিষ্ট চোরকে গোলাম বানিয়ে নেবে)। আমরা জালিম (অর্থাৎ) চোরদেরকে এমনি শাস্তি দেই। (অর্থাৎ আমাদের শরীয়তের নির্দেশ ও কাজ তাই। মোটকথা, পরম্পরে এসব কথাবার্তা সাব্যস্ত হওয়ার পর রসদপত্র নামানো হল)। অতঃপর (তল্লাশি নেওয়ার সময়) ইউসুফ (নিজে অথবা কোন নির্ভরযোগ্য কর্মচারীর মাধ্যমে) আপন ভাইয়ের (রসদপত্রের) খলের আগে অন্য ভাইদের খলে তল্লাশি শুরু করলেন। অতঃপর (শেষে) এটিকে (অর্থাৎ পানপাত্রটিকে) আপন ভাইয়ের (রসদপত্রের) খলে থেকে বের করলেন। আমি ইউসুফ (আ)-এর খাতিরে এভাবে (বেনিয়ামিনকে) তার নিকটে রাখার তদবীর করেছি (এ তদবীরের কারণ এই যে) ইউসুফ স্বীয় ভাইকে বাদশাহর আইন অনুযায়ী নিতে পারতেন না; (কেননা বাদশাহর আইনে চুরির শাস্তি কিছু মারপিট ও জরিমানা ছিল।—তিবরানী রহল মাজানী) কিন্তু এটা আল্লাহ তা'আলারই কামা ছিল। (তাই ইউসুফের মনে এই তদবীর জাগ্রত হয়েছে এবং তার ভাইয়ের মুখ থেকে এরূপ সিদ্ধান্তের কথা বের হয়েছে। উভয়টি মিশে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়ে গেছে। এখানে সত্যিকারভাবে গোলাম করা হয়নি বরং বেনিয়ামিনের সম্মতিক্রমে গোলামের রূপ ধারণ করা হয়েছিল মাত্র।



কাজেই এখানে **اَسْتَرْقَاتِي حُرًّا** অর্থাৎ মুক্ত ব্যক্তিকে গোলামে পরিণত করার সন্দেহ অমূলক। ইউসুফ যদিও বড় আলিম ও বুদ্ধিমান ছিলেন, তথাপি আমার তদবীর শেখানোর প্রতি মুখাপেক্ষী ছিলেন। বরং আমি) যাকে ইচ্ছা (ইচ্ছা) বিশেষ স্তর পর্যন্ত উন্নীত করি এবং সব বিজ্ঞানের চাইতে বড় বিজ্ঞান রয়েছে। (অর্থাৎ আল্লাহ্) সৃষ্টজীবের জ্ঞান অপূর্ণ এবং স্রষ্টার জ্ঞান পূর্ণ। অতএব প্রত্যেক সৃষ্টজীব জ্ঞান ও তদবীরের মুখাপেক্ষী। তাই **إِنَّا أَنشَاءَ اللَّهُ وَكَدْنَا** বলা হয়েছে। মোট কথা এই যে, তাদের রসদ বা আসবাবপত্র থেকে যখন পানপাত্র বের হয়ে পড়ল এবং বেনিয়ামিনকে আটকানো হল, তখন তারা সবাই নিরুতিশয় লজ্জিত হল।

### আনুশঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, সহোদর ভাই বেনিয়ামিনকে রেখে দেওয়ার জন্য ইউসুফ (আ) একটি কৌশল ও তদবীর অবলম্বন করলেন। যখন সব ভাইকে নিয়ম মারফিক খাদ্যশস্য দেওয়া হল, তখন প্রত্যেক ভাইয়ের খাদ্যশস্য পৃথক পৃথক উটের পিঠে পৃথক পৃথক নামে চাপানো হল।

বেনিয়ামিনের যে খাদ্যশস্য উটের পিঠে চাপানো হল, তাতে একটি পাত্র গোপনে রেখে দেওয়া হল। কোরআন পাক এ পাত্রটিকে এক জায়গায় **سِقَايَةَ** শব্দের দ্বারা এবং

অন্যত্র **الْمَلِكِ عِصْوَاعَ** শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছে। **سِقَايَةَ** শব্দের অর্থ পানি পান

করার পাত্র এবং **عِصْوَاعَ** শব্দটিও এমনি ধরনের পাত্রের অর্থে ব্যবহৃত হয়। একে

**مَلِكِ** তথা বাদশাহর দিকে নির্দেশিত করার ফলে আরও জানা গেল যে, এ পাত্রটি বিশেষ মূল্যবান ও মর্যাদাবান ছিল। কোন কোন রেওয়াজে রয়েছে যে, পাত্রটি 'যবরজদ' পাথর দ্বারা নিমিত ছিল। আবার কেউ স্বর্ণ নিমিত এবং রৌপ্য নিমিতও বলেছেন। মোট কথা, বেনিয়ামিনের রসদপত্রে গোপনে রক্ষিত এ পাত্রটি যথেষ্ট মূল্যবান হওয়া ছাড়াও বাদশাহর সাথে এর বিশেষ সম্পর্কও ছিল। বাদশাহ্ নিজে তা ব্যবহার করতেন অথবা বাদশাহর আদেশে তা খাদ্যশস্য পরিমাপের পাত্ররূপে ব্যবহৃত হত।

**ثُمَّ أَذِّنْ مُرْدِنًا أَيْتَهَا الْعِيبَرُ إِنَّكُمْ لَعَارِتُونَ**—অর্থাৎ কিছুক্ষণ পর

জৈনিক ঘোষক ডেকে বলল : হে কাফিলার লোকজন, তোমরা চোর।

এখানে <sup>=</sup> **قَالُوا** শব্দ দ্বারা জানা যায় যে, এ ঘোষণা তৎক্ষণাৎ করা হয়নি বরং কাফিলা রওয়ানা হয়ে যাওয়ার পর করা হয়েছে—যাতে কেউ জালিয়াতির সন্দেহ না করতে পারে। মোট কথা, ঘোষক ইউসুফ-ভ্রাতাদের কাফিলাকে চোর আখ্যা দিল।

**قَالُوا وَاقْتُلُوا عَلَيْهِم مَّا ذَا لَأَقْتُلُوا وَن**—অর্থাৎ ইউসুফ-ভ্রাতাগণ ঘোষণা-

কারীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল : তোমরা আমাদেরকে চোর বলছ। প্রথমে এ কথা আমাদের বল যে, তোমাদের কি বস্তু চুরি হয়েছে ?

**قَالُوا نَفَقْدُ مَوَاعِ الْمَلِكِ وَلَمِنُ جَاءَ بِهٖ حَمْلُ بِهٖرٍ وَاذَا بَهٗ زَعَمُ**

—ঘোষণাকারিগণ বলল, বাদশাহর পানপাত্র হারিয়ে গেছে। যে ব্যক্তি তা বের করে দেবে, সে এক উটের বোঝাই পরিমাণ খাদ্যসম্পদ পুরস্কার পাবে এবং আমি এর যামিন।

এখানে প্রথমে প্রশ্ন এই যে, ইউসুফ (আ) বেনিয়ামিনকে আটকানোর জন্য এ কৌশল কেন করলেন, অথচ তিনি জানতেন যে, স্বয়ং তাঁর বিচ্ছেদের আঘাত পিতার জন্য অসহনীয় ছিল? এমতাবস্থায় অপর ভাইকে আটকে তাঁকে আরও একটি আঘাত দেওয়া তিনি কিরূপে পছন্দ করলেন ?

দ্বিতীয় প্রশ্ন আরও গুরুত্বপূর্ণ। তা এই যে, নিরপরাধ ভাইদের বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ আনা, গোপনে তাদের আসবাব-পত্রের মধ্যে কোন বস্তু রেখে দেওয়ার মত জালিয়াতি করা এবং প্রকাশ্যে তাদেরকে লাঞ্চিত করা—এসব কাজ অবৈধ। আদালতের পয়গম্বর ইউসুফ (আ) এগুলো কিভাবে সহ্য করলেন ?

কুরতুবী প্রমুখ তফসীরবিদ বর্ণনা করেন : বেনিয়ামিন যখন ইউসুফ (আ)-কে নিশ্চিতরূপে চিনে ফেলে, তখন সে নিজেই ভাইকে অনুরোধ করে যে, তাকে যেন ভাইদের কাছে ফেরত পাঠানো না হয়। বরং ইউসুফ (আ)-এর কাছে রাখা হয়। ইউসুফ (আ) প্রথমে এ অজুহাতই পেশ করলেন যে, তাকে এখানে রাখা হলে পিতার মনোকন্ঠের অন্ত থাকবে না। দ্বিতীয়ত তাকে এখানে রাখার একমাত্র উপায় হচ্ছে, তাকে চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত করে গ্রেফতার করে আটক রাখা। বেনিয়ামিন ভাইদের সাথে বসবাস করতে এতই নারাজ ছিল যে, সে এ জাতীয় প্রস্তাবেও সম্মত হয়ে যায়।

কিন্তু এ ঘটনা সত্য হলেও পিতার মনোকন্ঠ, ভাইদের লাঞ্ছনা এবং তাদেরকে চোর বলা শুধু বেনিয়ামিনের সম্মতির কারণে বৈধ হতে পারে না। কেউ কেউ কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে, ঘোষক বোধ হয় ইউসুফ (আ)-এর অজান্তেই এবং বিনা অনুমতিতে ভাইদের চোর বলেছিল। এ উক্তি যেমন প্রমাণহীন, তেমনি ঘটনার সাথে বেখাপ্পা। এমনিভাবে কেউ কেউ বলেন : ভ্রাতাগণ ইউসুফ (আ)-কে পিতার কাছ থেকে চুরি করে বিক্রয় করেছিল। তাই তাদেরকে চোর বলা হয়েছে। এটাও একটা নিছক ব্যাখ্যা বৈ নয়। অতএব, এসব প্রশ্নের বিস্তৃত উত্তর তাই—যা কুরতুবী, মাযহারী প্রমুখ গ্রন্থকার দিয়েছেন। তা এই যে, এ ঘটনায় যা করা হয়েছে এবং যা বলা হয়েছে, তা বেনিয়ামিনের বাসনার

ফলশ্রুতিও ছিল না এবং ইউসুফ (আ)-এর প্রস্তাবের ফলও ছিল না; বরং এসব কাজ ছিল আল্লাহ্র নির্দেশে তাঁরই অপার রহস্যের বহিঃপ্রকাশ। এসব কাজের মাধ্যমে ইয়াকুব (আ)-এর পরীক্ষার বিভিন্ন স্তর পূর্ণতা লাভ করছিল। এ উত্তরের প্রতি স্বয়ং কোরআনের এ আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে **كُنْ لَكَ كُدًّا لَّيْسَ لَكَ بِهِ سُلْطَانٌ**—অর্থাৎ আমি ইউসুফের খাতিরে এমনভাবে তার ভাইকে আটকানোর কৌশল করেছি।

এ আয়াতে পরীক্ষারভাবে এ ফন্দি ও কৌশলকে আল্লাহ্ তা'আলা নিজের কাজ বলে আখ্যায়িত করেছেন। অতএব, এসব কাজ যখন আল্লাহ্র নির্দেশে সম্পন্ন হয়েছে তখন এগুলোকে অবৈধ বলার কোন মানে নাই। এগুলো মুসা ও খিযিরের ঘটনায় নৌকা ডাঙ্গা, বালককে হত্যা করা ইত্যাদির মতই। এগুলো বাহ্যত গোনাহ্র কাজ ছিল বলেই মুসা (আ) তা মেনে নিতে রাজী ছিলেন না। কিন্তু খিযির (আ) সব কাজ আল্লাহ্র নির্দেশে বিশেষ উপযোগিতার অধীনে করে যাচ্ছিলেন। তাই এগুলো গোনাহের কাজ ছিল না।

**قَالُوا يَا لَئِذَا مَا جِئْنَا لِنَفْسِنَا فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ**

অর্থাৎ শাহী ঘোষক যখন ইউসুফ (আ)-এর ভ্রাতাদেরকে চোর বলল, তখন তারা উত্তরে বলল : সভাসদবর্গও আমাদের অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল আছেন যে, আমরা এখানে অশান্তি সৃষ্টি করতে আসিনি এবং আমরা চোর নই।

**قَالُوا فَمَا جَزَاءُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ**—রাজকর্মচারীরা বলল : যদি তোমাদের

কথা মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে যায়, তবে বল, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কি শাস্তি ?

**قَالُوا جَزَاءُ مَنْ رَجَدَ فِي رَحْلِهِ يَهُوَ جَزَاءُ كَذَلِكَ نَجْزِي**

**النَّافِلِينَ ۝**

অর্থাৎ ইউসুফের ভ্রাতাগণ বলল : যার আসবাবপত্র থেকে চোরাই মাল বের হবে, সে নিজেই তার শাস্তি। আমরা চোরকে এমনি ধরনের সাজা দেই।

উদ্দেশ্য, ইয়াকুব (আ)-এর শরীয়তে চোরের শাস্তি এই যে, যার মাল চুরি করে সে চোরকে গোলাম করে রাখবে। রাজকর্মচারীরা এভাবে স্বয়ং ভ্রাতাদের কাছ থেকে ইয়াকুবী শরীয়ত অনুযায়ী চোরের শাস্তি জেনে নিল, যাতে বেনিয়ামিনের আসবাবপত্র থেকে চোরাই মাল বের হলো নিজেদেরই ফয়সাল অনুযায়ী তাকে ইউসুফ (আ)-এর হাতে সোপর্দ করতে বাধ্য হয়।

ذِيَادَاءَ بِأَوْعِيَّتِهِمْ تَهْلُ وَعَاءَ أَخِيهِ --- অর্থাৎ সরকারী তলাশকারীরা

প্রকৃত মড়মত্ত ঢেকে রাখার জন্য প্রথমে অন্য ভাইদের আসবাবপত্র তলাশ করল। প্রথমেই বেনিয়ামিনের আসবাবপত্র খুলল না, যাতে তাদের সন্দেহ না হয়।

ثُمَّ اسْتَكْرَجُوا مِنْ وَعَاءِ أَخِيهِ --- অর্থাৎ সব শেষে বেনিয়ামিনের

আসবাবপত্র খোলা হলে তা থেকে শাহী পাত্রটি বের হয়ে এল।

তখন ভাইদের অবস্থা দেখে কে? লজ্জায় সবার মাথা হেট হয়ে গেল। তারা বেনিয়ামিনকে গাল-মন্দ দিয়ে বলল : তুমি আমাদের মুখে চুনকালি দিলে।

كَذَلِكَ كَدْنَا لَدِئُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ

অর্থাৎ এমনিভাবে আমি ইউসুফের খাতিরে কৌশল করেছি। তিনি বাদশাহর আইনানুযায়ী ভাইকে গ্রেফতার করতে পারতেন না। কেননা, মিসরের আইনে চোরকে মারপিট করে এবং চোরাই মালের দ্বিগুণ মূল্য আদায় করে ছেড়ে দেওয়ার বিধান ছিল। কিন্তু তারা এখানে ইউসুফ-ভ্রাতাদের কাছ থেকেই ইয়াকুবী শরীয়তানুযায়ী চোরের বিধান জেনে নিয়েছিল। এ বিধান দৃষ্টে বেনিয়ামিনকে আটকে রাখা বৈধ হয়ে গেল। এমনিভাবে আল্লাহ তা আলাহ ইচ্ছায় ইউসুফ (আ)-এর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল।

فَرَفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ نَّشَأٍ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلَيْهِمُ

যাকে ইচ্ছা উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করে দেই, যেমন এ ঘটনায় ইউসুফের মর্যাদা তাঁর ভাইদের তুলনায় উচ্চ করে দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক জ্ঞানীর উপরই তদপেক্ষা অধিক জ্ঞানী বিদ্যমান রয়েছে।

উদ্দেশ্য এই যে, জ্ঞানের দিক দিয়ে সৃষ্ট জীবের মধ্যে একজনকে অন্য জনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে। একজন যত বড় জ্ঞানীই হোক, তার মুকাবিলায় আরও অধিক জ্ঞানী থাকে। মানব জাতির মধ্যে যদি কেউ এমন হয় যে, তার চাইতে অধিক জ্ঞানী আর নেই, তবে এ অবস্থায়ও আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জ্ঞান সবারই উর্ধ্বে।

নির্দেশ ও মাস'আলা : আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে কতিপয় নির্দেশ ও মাস'আলা জানা যায়।

(১) وَلَمَّا جَاءَ بِهٖ حَمْلٌ بَعِيرٌ --- আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোন নির্দিষ্ট

কাজের জন্য মজুরি-কিংবা পুরস্কার নির্ধারণ করে যদি এই মর্মে ঘোষণা দান করা হয় যে, যে ব্যক্তি এ কাজ করবে, সে এই পরিমাণ পুরস্কার কিংবা মজুরি পাবে, তবে তা জায়েয হবে, যেমন অপরাধীদেরকে গ্রেফতার করার জন্য কিংবা হারানো বস্তু ফেরত দেওয়ার জন্য এ ধরনের পুরস্কার ঘোষণা সাধারণভাবে প্রচলিত রয়েছে। যদিও এ জাতীয়

লেনদেন ফিকাহ্ শাস্ত্রে বর্ণিত ইজারার সংক্রান্তরূপ নয়, তথাপি এ আয়াতদ্বয়েই তার বৈধতা প্রমাণিত হয়।—(কুরতুবী)

(২) **إِنَّا بِهِ زَعِيمٌ**---দ্বারা বোঝা গেল যে, একজন অন্যজনের পক্ষে আর্থিক

অধিকারের যামিন হতে পারে। সাধারণ ফিকাহ্‌বিদদের মতে এ ব্যাপারে বিধান এই যে, প্রাপক আসল দেনাদার কিংবা যামিন এতদুভয়ের মধ্যে যে কোন একজনের কাছ থেকে তার পাওনা আদায় করে নিতে পারে। যদি যামিনের কাছ থেকে আদায় করা হয়, তবে সে দেনা পরিমাণ অর্থ আসল দেনাদারের কাছ থেকে নিয়ে নেবে।—(কুরতুবী)

(৩) **كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذْ سَأَلُوا**

উপযোগিতার ভিত্তিতে যদি লেনদেনের আকারে এমন পরিবর্তন করা হয়, যার ফলে বিধান পরিবর্তিত হয়ে যায়, তবে তা আইনত জায়েয হবে। ফিকাহ্‌বিদদের পরিভাষায় একে **حيلة** (হীলা) বলা বলা হয়। এর জন্য শর্ত এই যে, এর ফলে যেন শরীয়তের কোন

বিধান বাতিল না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। শরীয়তের বিধান বাতিল হয়ে যায়—এরূপ হীলা সর্বসম্মতভাবে হারাম। যেমন মাকাত থেকে গা বাঁচানোর জন্য কোন হীলা করা অথবা রুমযানের পূর্বে কোন অনাবশ্যক সফরে বের হয়ে পড়া---যাতে রোযা না রাখার অজুহাত সৃষ্টি হয়। এরূপ করা সর্বসম্মতভাবে হারাম। এ জাতীয় হীলা করার কারণে

কোন কোন জাতি আঘাবে নিপতিত হয়েছে। রসুলুল্লাহ্ (সা) এরূপ হীলা করতে নিষেধ করেছেন। এরূপ হীলার আশ্রয় নিলে কোন অবৈধ কাজ বৈধ হয়ে যায় না বরং পাপের মাত্রা দ্বিগুণ হয়। এক পাপ আসল অবৈধ কাজের এবং দ্বিতীয় পাপ অবৈধ হীলার, যা

একদিক দিয়ে আচ্ছাদিত ও রসুলের সাথে প্রচারণার নামান্তর। ইমাম বুখারী **كتاب الجدل** তথা হীলা অধ্যায়ে এ জাতীয় হীলার অবৈধতা প্রমাণ করেছেন।

قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسْرَهَا يُوسُفُ  
 فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرُّ مَكَانًا وَاللَّهُ  
 أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ۖ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا  
 كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ ۗ إِنَّا نُرِيدُكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ۖ قَالَ  
 مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ تَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ ۗ إِنَّا إِذَا  
 ظَلَمْنَا ۖ فَلَمَّا اسْتَيْسُوا مِنْهُ خَاصُّوا نَجِيًّا ۖ قَالَ كَبِيرُهُمْ

أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ آبَاءَكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْتًا مِّنَ اللَّهِ وَ  
 مِّن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ ۖ فَلَن أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّىٰ  
 يَأْذَنَ لِي إِلَىٰ أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ۝ اِرْجِعُوا  
 إِلَىٰ آبَائِكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَا نَارٍ إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ ۚ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا  
 بِمَا عَلَّمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ ۝ وَسئِلَ الْقَرْيَةَ الَّتِي  
 كُنَّا فِيهَا وَالْعَيْرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ۝

(৭৭) তারা বলতে লাগল : যদি সে চুরি করে থাকে, তবে তার এক ভাইও ইতি-  
 পূর্বে চুরি করেছিল। তখন ইউসুফ প্রকৃত ব্যাপার নিজের মনে রাখলেন এবং তাঁদেরকে  
 জানালেন না। মনে মনে বললেন : তোমরা লোক হিসাবে নিতান্ত মন্দ এবং আল্লাহ  
 খুব জ্ঞাত রয়েছেন, যা তোমরা বর্ণনা করছ; (৭৮) তারা বলতে লাগল : হে আশীম,  
 তার পিতা আছেন, যিনি খুবই রক্ষা বয়স্ক। সুতরাং আপনি আমাদের একজনকে তার  
 বদলে রেখে দিন। আমরা আপনাকে অনুগ্রহশীল ব্যক্তিদের একজন দেখতে পাচ্ছি। (৭৯)  
 তিনি বললেন : যার কাছে আমরা আমাদের মাল-পেয়েছি, তাকে ছাড়া আর কাউকে গ্রেফতার  
 করা থেকে আল্লাহ আমাদের রক্ষা করুন। তা হলে তো আমরা নিশ্চিতই অন্যাযকারী  
 হয়ে যাব। (৮০) অতঃপর যখন তারা তাঁর কাছ থেকে নিরাশ হয়ে গেল, তখন পরামর্শের  
 জন্য একান্তে বসল। তাদের জ্যেষ্ঠ ভাই বলল : তোমরা কি জান না যে, পিতা তোমাদের  
 কাছ থেকে আল্লাহর নামে অস্বীকার নিয়েছেন এবং পূর্বে ইউসুফের ব্যাপারেও তোমরা  
 অন্যায করেছ? অতএব আমি তো কিছুতেই এদেশ ত্যাগ করব না, যে পর্যন্ত না পিতা  
 আমাকে আদেশ দেন অথবা আল্লাহ আমার পক্ষে কোন ব্যবস্থা করে দেন। তিনিই সর্বো-  
 ত্তম ব্যবস্থাপক। (৮১) তোমরা তোমাদের পিতার কাছে ফিরে যাও এবং বল পিতা,  
 আপনার ছেলে চুরি করেছে। আমরা তাই বলে দিলাম, যা আমাদের জানা ছিল এবং অদৃশ্য  
 বিষয়ের প্রতি আমাদের লক্ষ্য ছিল না। (৮২) জিজ্ঞাস করুন ঐ জনপদের লোকদেরকে  
 যেখানে আমরা ছিলাম এবং ঐ কাফেলাকে, যাদের সাথে আমরা এসেছি। নিশ্চিতই আমরা  
 সত্য বলছি।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তারা বলতে লাগল যে, (জনাব) যদি সে চুরি করে থাকে, তবে (আশীমের) বিষয় নয়;  
 কেননা) তার এক ভাই (ছিল, সে) ও (এমনভাবে) ইতিপূর্বে চুরি করেছে। 'দুর্গের মনসুর'  
 গ্রন্থে এ কাহিনী এভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে : ইউসুফ (আ)-এর ফুফু তাঁকে লালন-পালন করতেন।

পন্নও সর্বশেষ ফলাফল এটাই হবে যে, এ ধরনের ব্যাপারে চূড়ান্ত ফয়সালা করা অসম্ভব। কেননা, ইসলাম ও খৃস্টীয় ইতিহাসে এ সম্পর্কে যা কিছু লিখিত আছে, সেগুলো এক বিভিন্ন ও পরস্পর বিরোধী যে, একজন গ্রন্থকার যদি স্বীয় গবেষণার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ইঙ্গিতের সাহায্যে কোন একদিক নির্দিষ্ট করেন, তবে অন্য জন এমনিভাবে অন্য দিককে অপ্রাধিকার দান করেন।

দীনের হিফাযতের জন্য গুহায় আশ্রয় গ্রহণের ঘটনা বিভিন্ন শহর ও ভূখণ্ডে অনেক সংঘটিত হয়েছে : ইতিহাসবিদদের মতভেদের একটি বড় কারণ এই যে, খৃস্ট-ধর্মে বৈরাগ্যকে ধর্মের সর্বপ্রধান অঙ্গ মনে করে নেওয়া হয়েছিল। ফলে প্রত্যেক ভূখণ্ড ও প্রত্যেক দেশেই এ ধরনের ঘটনাবলী এক বেশি সংঘটিত হয়েছে যে, কিছু সংখ্যাক লোক আলাহর ইবাদতের জন্য গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করে সারা জীবন সেখানেই কাটিয়ে দিয়েছেন। এখন যেখানে যেখানে এমন কোন ঘটনা ঘটেছে, সেখানেই আসহাবে কাহ্ফের খাণ্ডা হওয়া ইতিহাসবিদদের পক্ষে অসম্ভব ছিল না।

আসহাবে কাহ্ফের স্থান ও কাল : তফসীরবিদ কুরতুবী আন্দালুসী স্বীয় তফসীর গ্রন্থে এস্থলে কিছু শূন্য ও কতিপয় চাক্ষুষ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। বিভিন্ন শহরের সাথে ঘটনাগুলো সম্পর্কযুক্ত। কুরতুবী সর্বপ্রথম বাহহানের রিওয়াকে বর্ণনা করেছেন যে, রকীম রোমের একটি শহরের নাম। এর একটি গুহায় একশ জন লোক শায়িত আছে। মনে হয় তারা যেন ঘুমিয়ে আছে। এরপর তফসীরবিদ ইবনে আতিয়া থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আমি অনেক লোকের মুখে শুনেছি, সিরিয়ার একটি গুহায় কিছুসংখ্যক মৃতদেহ আছে। সেখানকার পাওয়া বলে যে, এরাই আসহাবে কাহ্ফ। গুহায় নিকটে একটি মসজিদ ও একটি গৃহও নির্মিত আছে : একে রকীম বলা হয়। মৃতদেহগুলোর সাথে একটি মৃত কুকুরের কঙ্কালও বিদ্যমান।

দ্বিতীয় ঘটনা আন্দালুস গার্নাতার (স্পেনের গ্রানাডা)। ইবনে আতিয়া বলেন : গার্নাতার 'লাওশা' নামক গ্রামের অদূরে একটি গুহা আছে। একে রকীম বলা হয়। এই গুহায় কয়েকটি মৃতদেহ এবং তাদের সাথে একটি মৃত কুকুরের কঙ্কালও বিদ্যমান আছে। অধিকাংশ মৃতদেহ মাংসবিহীন শুধু অস্থি কঙ্কাল এবং কিছু সংখ্যক মৃতদেহে এখনও মাংস আছে। এভাবে বহু শতাব্দী অতিক্রম হয়েছে, কিন্তু বিসৃষ্ট উপায়ে তাদের কোন অবস্থা জানা যায় না। কিছুসংখ্যক লোক বলে যে, এরাই আসহাবে কাহ্ফ। ইবনে আতিয়া বলেন : এই সংবাদ শুনে আমি ৫০৪ হিজরীতে সেখানে পৌঁছে দেখি, বাস্তবিকই মৃতদেহগুলো তেমনি অবস্থায়ই পড়ে রয়েছে। তাদের নিকটবর্তী স্থানে একটি মসজিদ ও রোমীয় যুগের একটি গৃহ আছে, যাকে রকীম বলা হয়। মনে হয়, প্রাচীনকালে এটা বিসৃষ্ট রাজপ্রাসাদ ছিল। তখনও এর কোন কোন প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান ছিল। এটা একটা জনশূন্য জগলে অবস্থিত ছিল। তিনি আরও বলেন : গার্নাতার উপনিভাগে একটি প্রাচীন শহরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। শহরটি রোমীয় স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শন। শহরের নাম 'ব্লাকিউস' বলা হয়। আমি এর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে অনেক আশ্চর্য বস্তু এবং কবর দেখেছি। আন্দালুসের অধিবাসী হয়েও কুরতুবী

এসব ঘটনা বর্ণনা করার পরও এদের কোন একটিকেও আসহাবে কাহ্ফ বলতে অপ্রস্তুত। ইবনে আতিয়াও চাক্ষুষ দেখা সত্ত্বেও দৃঢ়তার সাথে একথা বলেন না যে, এরাই আসহাবে কাহ্ফ। তাঁরা সাধারণ জনশ্রুতি বর্ণনা করেছেন মাত্র। অপর একজন আন্দালুসী তফসীরবিদ আবু হাইয়্যান সপ্তম শতাব্দীতে (৬৫৪ হিজরীতে) গার্নাতায় জন্মগ্রহণ করেন এবং এখানেই বসবাস করেন। তিনিও তফসীর বাহুরে-মুহীতে গার্নাতার এই গুহার প্রসঙ্গ কুরতুবীর ন্যায়ই উল্লেখ করেছেন। তিনিও ইবনে আতিয়্যার চাক্ষুষ দেখার কথা বর্ণনা করার পর লিখেছেন : আমি যখন আন্দালুসে (অর্থাৎ কাইরোতে পুনর্বাসিত হওয়ার পূর্বে) ছিলাম তখন অনেক মানুষ এই গুহাটি দেখার জন্য গমন করত। তারা বলত যে, যদিও মৃতদেহগুলো এখন পর্যন্ত বিদ্যমান রয়েছে এবং দর্শকরা এগুলো গণনাও করে, কিন্তু সর্বদাই তারা সংখ্যা বর্ণনায় ভুল করে। তিনি আরও লিখেছেন : ইবনে আতিয়া যে স্নার্কিউস শহরের কথা উল্লেখ করেছেন, সেটি গার্নাতার কেবলার দিকে অবস্থিত। আমি নিজে এই শহরে বহুবায় গিয়েছি এবং তাতে বিরীটি বিপ্লবটি অসাধারণ পাথর দেখতে পেয়েছি। অতঃপর আবু হাইয়্যান লিখেছেন :

ويترجع كون اهل الكهف با لا قد لس لكثرة دين النصارى بها  
حتى هي بلاد مملكتهم العظمى .

অর্থাৎ যে কারণে আসহাবে কাহ্ফের আন্দালুসে অবস্থিত হওয়া সম্পর্কে প্রবল ধারণা জন্মে, তা এই যে, সেখানে খৃস্টধর্মের চর্চা প্রবল। এমনকি, এটাই তাঁদের সর্ববৃহৎ ধর্মীয় কেন্দ্র। এ থেকে পরিকল্পনা বোঝা যায় যে, আবু হাইয়্যানের মতে আসহাবে কাহ্ফের আন্দালুসে অবস্থিত হওয়াই অগ্রগণ্য।—(তফসীর কুরতুবী, নবম খণ্ড, ৩৫৬ পৃঃ)

তফসীরবিদ ইবনে জরীর ও ইবনে আবী হাতেম উভয়ই আউফীর দ্বৈতগোষ্ঠীতে হযরত ইবনে আক্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, রুকীম একটি উপত্যকার নাম, যা ফিলিস্তীনের পাদদেশে আয়লার (আক্বাবা) অদূরে অবস্থিত। ইবনে জরীর, ইবনে আবী হাতেম এবং আরও কয়েকজন হাদীসবিদ ইবনে আক্বাস থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন : রুকীম কি, আমার জানা নেই, কিন্তু কা'ব আহবায়কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন যে, রুকীম ঐ জনপদকে বলা হয়, যাতে আসহাব কাহ্ফ গুহার অপ্রমাণ গ্রহণের পূর্বে বসবাস করত।—(রাহুল-আ'আনী)

ইবনে আবী শায়বা, ইবনে মুনিয়ির ও ইবনে আবী হাতেম হযরত ইবনে আক্বাসের উক্তি বর্ণনা করেন যে, আমি হযরত মুয়াবিয়া (রা)-এর সাথে রোমীয়দের মুকাবেলায় একটি জিহাদে অংশগ্রহণ করি, যাকে 'গায়ওয়াতুল মুযীক' বলা হয়। এ সময় আমরা কোরআনে বর্ণিত আসহাবে কাহ্ফের গুহার নিকট উপস্থিত হই। হযরত মুয়াবিয়া গুহার ভিতরে প্রবেশ করে আসহাবে কাহ্ফের মৃতদেহগুলো প্রত্যক্ষ করার ইচ্ছা করলেন। কিন্তু হযরত ইবনে আক্বাস বাধা দিয়ে বললেন : এরূপ করা ঠিক নয়। কেননা, আল্লাহ তা'আলা রসূলুল্লাহ (সা)-কেও তাঁদের মৃতদেহ প্রত্যক্ষ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি তো আপনাকে চাইতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা কোরআনে বলেছেন :



لَوْ اَظْلَمْتُمْ عَلَيْهِمْ لَوْلِيْتُمْ مِنْهُمْ فِرَارًا وَ لَوْلِيْتُمْ مِنْهُمْ رَبْعًا

আপনি তাদেরকে দেখলে পলায়ন করবেন এবং উয়-ভীতিতে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়বেন। কিন্তু হয়রত মুয়াবিয়া ইবনে আব্বাসের বাধা মানলেন না। সম্ভবত এ কারণে যে, কোরআনে তাঁদের যে অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে, সেটা তাঁদের জীবদ্দশায় ছিল। এখনও তাঁদের সে অবস্থা থাকা জরুরী নয়। হয়রত মুয়াবিয়া কয়েকজন লোককে দেখার জন্য প্রেরণ করলেন। তারা ওহায় পৌছে যখন ভিতরে প্রবেশ করতে চাইল, তখন একটি দমকা হাওয়া এসে তাদেরকে গুহা থেকে বের করে দিল।—(রাহুল-মা'আনী ৫ম খণ্ড, ২২৭)

তফসীরবিদদের উল্লিখিত রেওয়াজেত ও উক্তি মোটামুটিভাবে আসহাবে কাহ্ফের তিনটি স্থান নির্দেশ করে। এক. পায়স্য উপসাগরের উপকূলীয় শহর আকাবান্ন (আম্বা) নিকটবর্তী স্থান। হয়রত ইবনে আব্বাসের অধিকাংশ রেওয়াজেত এরই সমর্থন করে।

দুই. ইবনে আতিয়্যার দেখা ও আবু হাইয়্যানের সমর্থন দ্বারা এ ধারণা প্রবল হয় যে, এই গুহাটি গার্নাতা আন্দালুসে অবস্থিত। এ দু'টি স্থানের মধ্য থেকে আকাবান্ন একটি শহর অথবা কোন বিশেষ দাজান-ফোঠার নাম রুকীম হওয়াও বর্ণিত আছে। এমনিভাবে গার্নাতায় গুহা সংলগ্ন বিরাট উয় প্রাচীরের নাম রুকীম বলা হয়েছে। উপরোক্ত উভয় প্রকার রেওয়াজেতের মধ্যে কেউই এরূপ অকাট্য ফয়সালা গ্রহণ করেননি যে, এটাই আসহাবে কাহ্ফের গুহা। বরং উভয় প্রকার রেওয়াজেত স্থানীয় জনশ্রুতি ও কিংবদন্তীর উপর ভিত্তিশীল।

তিন. কুরতুবী, আবু হাইয়্যান, ইবনে জরীর ইত্যাদি প্রায় সকল তফসীর গ্রন্থের রেওয়াজেতে আসহাবে কাহ্ফ যে শহরে বাস করতেন, তার প্রাচীন নাম 'আফসুস' এবং ইসলামী নাম 'তরসুস' বলা হয়েছে। এ শহরটি যে এশিয়া মহাদেশের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত, এ ব্যাপারে ইতিহাসবিদদের মধ্যে সন্দেহ নেই। এতে বোঝা যায় যে, এ গুহাটিও এশিয়া মহাদেশে অবস্থিত। কাজেই এর কোন একটিকে অকাট্যরূপে বিত্ত্ব এবং বাকীগুলোকে ভ্রান্ত বলার কোন প্রমাণ নেই। তিনটি স্থানেরই সমান সম্ভাবনা রয়েছে। বরং এ সম্ভাবনাও কেউ নাকচ করতে পারে না যে, এসব গুহার ঘটনাবলী নির্ভুল হওয়া সত্ত্বেও এগুলো কোরআনে বর্ণিত আসহাবে কাহ্ফের গুহা নাও হতে পারে এবং সে গুহাটি অন্য কোথাও অবস্থিত থাকতে পারে। আর এটাও জরুরী নয় যে, এখানে রুকীম কোন শহর অথবা প্রাচীরেরই নাম হবে, বরং এ সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না যে, রুকীম ঐ ফলকের নাম, যার মধ্যে কোন বাদশাহ আসহাবে কাহ্ফের নাম খোদিত করে গুহার মুখে টাঙ্গিয়ে রেখেছিল।

আধুনিক ইতিহাসবিদদের গবেষণা : আধুনিক যুগের কোন কোন ইতিহাসবিদ ও আলিম খৃস্টান ইতিহাস এবং ইউরোপীয় ইতিহাসের সাহায্যে আসহাবে কাহ্ফের গুহার স্থান ও কাল নির্ণয়ের জন্য মথেষ্ট আলোচনা ও গবেষণা করেছেন।

মাওলানা আবুল কালাম আহাদ আয়লাহ (আকাবা) নিকটবর্তী বর্তমান শহর পাট্টাকে প্রাচীন শহর রুকীম সাব্যস্ত করেছেন। আরব ইতিহাসবিদরা এর নাম লেখেন 'বাল্লা'। তিনি বর্তমান ইতিহাস থেকে এর নিকটবর্তী একটি পাহাড়ে গুহার চিহ্নও বর্ণনা করেছেন, যার সাথে মসজিদ নির্মাণের লক্ষণাদিও দেখা যায়। এর সমর্থনে তিনি লিখেছেন : বাইবেলের ইশীয় গ্রন্থের অধ্যায় ১৮, আয়াত ২৭-এ যে জায়গাকে 'রুকম' অথবা 'রাকেম' বলা হয়েছে, একেই বর্তমানে পাট্টা বলা হয়। কিন্তু এ বর্ণনার সন্দেহ করা হয়েছে যে, ইশীয় গ্রন্থে বনী ইবনে ইরামীনের ত্যাজ্য সম্পত্তি সম্পর্কে যে 'রুকম' অথবা 'রাকেমের' উল্লেখ আছে, সেটা জর্দান নদী ও লুত সাগরের পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। এখানে পাট্টা শহর অবস্থিত হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। এজন্য বর্তমান যুগের প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিতেরা এ বর্ণনা মেনে নিতে ঘোর আপত্তি করেছেন যে, পাট্টা ও রাকেম একই শহর। (এনসাইক্লো পেডিয়া ব্রিটানিকা, মুদ্রণ ১৯৪৬, সপ্তদশ খণ্ড ৬৫৮ পৃঃ)

অধিকাংশ তুফসীরবিদ 'আফসূস' নগরীকে আসহাবে কাহ্ফের স্থান সাব্যস্ত করেছেন। এটি এশিয়া মহাদেশের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত স্যামকুদের সর্ববৃহৎ নগরী ছিল। এর ধ্বংসাবশেষ আজও বর্তমান তুরকের ইজমীর (স্মার্না) শহর থেকে বিশ-পঁচিশ মাইল দক্ষিণে পাওয়া যায়।

হযরত মাওলানা সৈয়দ সুলায়মান মদভীও 'আব্দুল কোরআন' গ্রন্থে পাট্টা শহরের নাম উল্লেখ করে বক্তাবীর ভেতরে রুকীম লিখেছেন। কিন্তু এর কোন প্রমাণ তিনি পেশ করেননি যে, পাট্টা শহরের পুরোনো নাম রুকীম ছিল। মাওলানা হিফযুর রহমান 'কাসাসুল কোরআনে' একেই গ্রহণ করেছেন এবং এর প্রমাণস্বরূপ তায়রাত ও 'সহীফা সুইমান' বরাতে দিয়ে পাট্টা শহরের নাম রাকেম বর্ণনা করেছেন।—(দায়েরাতুল মাআরিফ, আরব থেকে গৃহীত)

জর্দানে আশ্মানের নিকটবর্তী এক শ্মশানভূমিতে একটি গুহার সন্ধান পাওয়া গেলে সরকারী প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ ১৯৬৩ ইং সনে সে স্থানটি খননের কাজ আরম্ভ করে। মাটি ও প্রস্তর সরানোর পর অস্থি ও প্রস্তরে পূর্ণ ছয়টি শবধার ও দু'টি সমাধি আবিষ্কৃত হয়। গুহার দক্ষিণ দিকে পাথরে খোদিত বাইজিন্টিনীয় ভাষায় লিখিত কিছু নকশাও আবিষ্কৃত হয়। স্থানীয় লোকদের ধারণা এই যে, এ স্থানটিই রুকীম এবং এর পাশে আসহাবে কাহ্ফের এই গুহা।

হাকীমুল উম্মাত হযরত খানভী (রহ) বয়ানুল-কোরআনে তুফসীরে হক্কানীর বরাতে দিয়ে আসহাবে কাহ্ফের স্থান সম্পর্কে ঐতিহাসিক তথ্য উদ্ধৃত করে লেখেন : যে অত্যাচারী বাদশাহর ডয়ে পালিয়ে গিয়ে আসহাবে কাহ্ফ গুহার আশ্রয় নিয়েছিলেন, তাঁর সময়কাল ছিল ২৫০ খৃস্টাব্দ। এরপর তিন শ বছর পর্যন্ত তাঁরা যুক্ত অবস্থায় থাকেন। ফলে ৫৫০ খৃস্টাব্দে তাঁদের জাগ্রত হওয়ার ঘটনা ঘটে। রসুলুল্লাহ (সা) ৫৭০ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। এভাবে রসুলুল্লাহ (সা)-র জন্মের ২০ বছর পূর্ব আসহাবে কাহ্ফ নিদ্রা থেকে জাগ্রত হন। তুফসীরে-হক্কানীতেও তাঁদের স্থান 'আফসূস' অথবা 'তুরতুস'

শহর সাব্যস্ত করা হয়েছে, যা এশিয়া মহাদেশে অবস্থিত। বর্তমানেও এর ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান রয়েছে। **والله اعلم بحقيقة الحال**

এসব ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক তথ্য, প্রাচীন তফসীরবিদগণের রেওয়াজেত ও আধুনিক ইতিহাসবিদদের বর্ণনা থেকে পেশ করা হল। আমি পূর্বেই আরম্ভ করেছিলাম যে, কোরআনের কোন আয়াত বোঝা এসব বিষয়ের উপর নির্ভরশীল নয় এবং যে উদ্দেশ্যে কোরআন এ কাহিনী বর্ণনা করেছে, তার কোন জরুরী অংশ এগুলোর সাথে সম্পৃক্ত নয়। রেওয়াজেত ও বর্ণনা এবং এগুলোর ইঙ্গিতাদিও এত বিভিন্নমুখী যে, সমগ্র গবেষণা এবং অধ্যবসায়ের পরও কোনরূপ চূড়ান্ত ফয়সলা সত্ত্ববপর নয়, কিন্তু আজকাল শিক্ষিত মহলে ঐতিহাসিক গবেষণার প্রতি যে অসাধারণ ঝোঁক পরিদৃষ্ট হয়, তার পরিতৃপ্তির জন্য এসব তথ্য উদ্ধৃত করা হল। এগুলো থেকে আনুমানিকভাবে এতটুকু জানা যায় যে, এ ঘটনাটি হয়রত সৈসা (আ)-এর পর এবং রসূল্লাহ্ (সা)-র যমানার কাছাকাছি সময়ে সংঘটিত হয়। অধিকাংশ রেওয়াজেত এ বিষয়ে একমত। দেখা যায় যে, ঘটনাটি আফসূস অথবা তন্নতূস শহরের নিকটে ঘটেছে। **والله اعلم** সত্য এই যে, এসব গবেষণার পরও আমরা সেখানেই দণ্ডায়মান আছি, যেখান থেকে রওয়ানা হয়েছিলাম, অর্থাৎ স্থান নির্ধারণের না কোন প্রয়োজন আছে এবং না কোন নিশ্চিত উপায়ে এটা করা সম্ভব; তফসীরবিদ ইবনে-কাসীর এ কথাই বলেছেন :

قد أخبرنا الله تعالى بذالك وأراد منا فهمه وتدبره ولم  
يخبرنا بمكان هذا الكهف في أي البلاد من الأرض إذ لا فائدة لنا  
فيها ولا قصد شرعى -

অর্থাৎ আমরা তা'আলা আমাদেরকে আসহাবে কাহফের কোরআনে বর্ণিত অবস্থা-সমূহের সংবাদ দিয়েছেন, যাতে আমরা এগুলো বুঝি এবং চিন্তাভাবনা করি। তিনি এ বিষয়ের সংবাদ দেননি যে, ওহাটি কোন জায়গায় এবং কোন শহরে অবস্থিত। কারণ, এর মধ্যে আমাদের কোন উপকার নিহিত নেই এবং শরীয়তের কোন উদ্দেশ্যও এর সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়—(ইবনে-কাসীর, ৩য় খণ্ড ৭৫ পৃঃ)

আসহাবে কাহফের ঘটনা কখন ঘটে এবং ওহায়র আশ্রয় নেয়ার কারণ কি ছিল? কাহিনীর এ অংশের উপরও কোরআনের কোন আয়াত বোঝা মওকুফ নয় এবং কাহিনীর উদ্দেশ্যের উপরও এর বিশেষ কোন প্রভাব নেই। তাই কোরআন ও হাদীসে এ সম্পর্কে কোন বর্ণনা নেই। এ ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক বর্ণনাই একমাত্র সম্ভব। এ কারণেই আব্দু হাইয়ান তফসীর বাহরে-মুহীতে বলেন :

والرواة مختلفون في قصصهم وكيف كان اجتماعهم وخروجهم  
ولم يأت في الحديث الصحيح كيفية ذالك ولا في القرآن

তাদের কাহিনী সম্পর্কে বর্ণনাকারীদের মধ্যে বিস্তারিত মতবিরোধ রয়েছে । এ ব্যাপারেও যতানৈক্য আছে যে, তারা কিভাবে সর্বসম্মত কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করল এবং কিভাবে বের হল ? কোন সহীহ হাদীসে এসব অবস্থা বর্ণিত হয়নি এবং কোরআনও না ।—( বাহরু-মুহীত মঠ খণ্ড, ১০১ পৃঃ )

সবান্ন কৌতুহল নিরুত্তির জন্য উপরে যেমন আসহাবে কাহ্ফের স্থান সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে, তেমনি তাদের ফাল এবং ঘটনার কারণ সম্পর্কেও সংক্ষিপ্ত তথ্য তফসীর ও ঐতিহাসিক রেওয়াজে থেকে লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে, কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী (রহ) তফসীর মাযহাবীতে এ কাহিনীটি বিস্তারিতভাবে বিভিন্ন রেওয়াজে থেকে বর্ণনা করেছেন । কিন্তু এখানে শুধু ঐ সংক্ষিপ্ত ঘটনাই লেখা হচ্ছে, যা ইবনে-কাসীর অনেক পূর্ববর্তী ও পরবর্তী তফসীরবিদদের বরাতে দিয়ে পেশ করেছেন । তিনি বলেন :

আসহাবে কাহ্ফ রাজ বংশের সন্তান এবং কওমের সরদার ছিলেন । কওম মূর্তি-পূজারি ছিল । শহরের বাইরে তাদের একটি বার্ষিক মেলা বসত । সেখানে তারা প্রতিমা পূজা করত এবং জন্তু-জানোয়ার কোরবানি দিত । দাকিয়ানুস নামে তাদের একজন অত্যাচারী বাদশাহ ছিল । সে কওমকে মূর্তিপূজায় বাধ্য করত । একবার যখন সমগ্র জাতি মেলায় সমবেত হল, তখন আসহাবে কাহ্ফের যুবকরাও সেখানে উপস্থিত হল । তারা কওমকে নিজেদের গড়া মূর্তিকে খোদা মনে করতে, তাদের ইবাদত করতে এবং তাদের জন্য কোরবানী করতে দেখল । তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি দান করলেন । ফলে কওমের নিবোধসুলভ কাণ্ডকারখানার প্রতি তাদের ঘৃণা দেখা দিল । তারা বুদ্ধি-বিবেক খাটিয়ে বুঝে ফেললেন যে, এই ইবাদত একমাত্র সে সত্তার জন্য হওয়া উচিত, যিনি আসমান, যমীন ও সমগ্র জগত সৃষ্টি করেছেন । এই ধারণা একই সময়ে যুবকদের মনে জাগ্রত হল এবং তাদের প্রত্যেকেই কওমের নিবোধসুলভ ইবাদত থেকে আত্মরক্ষার জন্য সেখান থেকে প্রস্থান করতে লাগলেন । তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম একজন যুবক সমাবেশ থেকে দূরে একটি রুফের নিচে গিয়ে বসে পড়ল । এরপর দ্বিতীয় একজন এল এবং সেও সে রুফের নিচে বসে পড়ল । এমনিভাবে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম ব্যক্তি আসতে লাগল এবং রুফের নিচে বসতে লাগল । কিন্তু তাদের একজন অপল্প-জনকে চিনত না এবং এখানে আসার উদ্দেশ্যও জানত না । প্রকৃতপক্ষে তাদেরকে এখানে সে শক্তি একত্রিত করেছিল, যা তাদের অন্তরে সীমান সৃষ্টি করেছিল ।

জাতীয়তা সংঘবদ্ধতার আসল ভিত্তি : এই বর্ণনার পর ইবনে-কাসীর বলেন : মানুষ জাতীয়তাবাদকে পারস্পরিক সংঘবদ্ধতার কারণ মনে করে । কিন্তু প্রকৃত সত্য সহীহ বুখারীর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, ঐক্য ও অনৈক্য প্রথমে আত্মসমূহের মধ্যে সৃষ্টি হয় । এর প্রতিক্রিয়া এ জগতের দেহে প্রতিফলিত হয় । আদিকালে যেসব আত্মার মধ্যে সম্প্রীতি ও ঐক্য পয়দা হয়েছে, তারা এ জগতেও পরস্পরে প্রথিত ও এক দলে পরিণত হয় এবং যাদের মধ্যে এই সম্প্রীতি ও পারস্পরিক ঐক্য না থাকে, বরং সেখানে বিচ্ছিন্নতা রয়েছে, তাহলে তাদের মধ্যে এখানেও বিচ্ছিন্নতা থাকবে । আলোচ্য

ঘটনাই এর দৃষ্টান্ত। কিভাবে পৃথক পৃথকভাবে প্রত্যেক ব্যক্তির মনে একই ধারণা সৃষ্টি হয়েছে! এ ধারণাই তাদের সবাইকে অত্যন্ত এক জায়গায় একত্র করে দিয়েছে।

মোটকথা, তারা এক জায়গায় একত্রিত হয়ে গেলেও প্রত্যেকেই নিজের বিশ্বাসকে অপরের কাছ থেকে গোপন করছিল। কারণ, সে যদি বাদশাহর কানে খবর পৌঁছে দেয়, তবে আর রক্ষা নেই—শ্রেকতান্ন হতে হবে। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকার পর এক ব্যক্তি বলল : জাই, আমরা সবাই যে কওমের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এখানে পৌঁছেছি এর কোন কারণ তো অবশ্যই আছে। কাজেই আমাদের একে অপরের ধারণা সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে যাওয়াই সমীচীন। এতে এক ব্যক্তি বলে উঠল : সত্য বলতে কি, আমি আমার কওমকে যে ধর্ম ও যে ইবাদতে লিপ্ত পেয়েছি, আমার বিশ্বাস, তা সম্পূর্ণ বাতিল। ইবাদত তো একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই হওয়া উচিত, জগত সৃষ্টিতে মীর কোন অংশীদার নেই। একথা শুনে অন্যরাও সুযোগ পেয়ে গেল। তাদের প্রত্যেকেই স্বীকার করল যে, এ বিশ্বাসই তাদেরকে কওমের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে এখানে পৌঁছে দিয়েছে।

এখানে এই সমমনা দলটি একে অপরের সঙ্গী ও বন্ধু হয়ে গেল। তারা পৃথকভাবে নিজেদের একটি উপাসনালয় নির্মাণ করল এবং একত্রিত হয়ে তারা আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত করতে লাগল।

কিন্তু আস্তে আস্তে তাদের কথা শহরে ছড়িয়ে পড়ল এবং গুপ্তচররা তাদের সংবাদ বাদশাহর কানে পৌঁছে দিল। বাদশাহ তাদেরকে দরবারে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিলে তারা দরবারে হাজির হল। বাদশাহ তাদেরকে তাদের বিশ্বাস ও তরীকা সম্পর্কে প্রশ্ন করল। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে সাহস দান করলেন। তারা নির্ভয়ে তওহীদের বিশ্বাস ব্যক্ত করে দিল এবং স্বয়ং বাদশাহকেও এর প্রতি দাওয়াত দিল। কোরআনের আয়াতে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে :

وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  
لَنْ نَدْعُو مِن دُونِهَا لَقَدْ عَلِمْنَا أَنَّا شَاطِئًا .

আমি তাদের চিন্তকে দৃঢ় করে দিলাম, তারা যখন উন্মিত হলো। অতঃপর তারা বলল : আমাদের পালনকর্তা নভোমণ্ডল ও ডুমণ্ডলের পালনকর্তা। আমরা কখনও তাঁর পরিবর্তে অন্য কোন উপাসাকে আহ্বান করব না। করলে তা অত্যন্ত গর্হিত হবে।

তারা যখন নির্ভয়ে বাদশাহকে ঈমানের দাওয়াত দিল, তখন বাদশাহ্ অস্বীকার করল এবং তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করল। অতঃপর তাদের দেহ থেকে রাজপুত্রের আড়ম্বরপূর্ণ পোশাক খুলে নিল। বাদশাহ্ তাদেরকে চিন্তা-ভাবনার জন্য কিছু দিনের সময় দিয়ে বলল : তোমরা খুবক। আমি তোমাদেরকে চিন্তা-ভাবনার সুযোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে তাড়াতাড়ি হত্যা করতে চাই না। এখনও যদি তোমরা স্বজাতির ধর্মে ফিরে আস, তবে তোমাদের মর্মান্দা পুনর্বহাল করে দেওয়া হবে, নতুবা তোমাদেরকে হত্যা করা হবে।

মু'মিন বান্দাদের উপর এটা ছিল আল্লাহ্ তা'আলার মেহেরবানী ও রূপা। এ অবকাশ তাদের জন্য পলায়নের পথ খুলে দিল। তারা সেখান থেকে পলায়ন করে ওহায় আত্মগোপন করল।

তুফসীরবিদদের সাধারণ স্বেওয়াম্মেত মতে তারা খৃষ্টধর্মের অনুসারী ছিল। ইবনে-কাসীর ও অন্যান্য তুফসীরবিদ একথা উল্লেখ করেছেন। তবে ইবনে-কাসীর এ মুক্তির ভিত্তিতে এর সাথে একমত হননি যে, তারা খৃষ্টধর্মের অনুসারী হলে মদীনার ইহদীরা তাদের প্রতি শত্রুতাবশত তাদের ঘটনা সম্পর্কে প্রশ্ন করত না এবং তাদের কোন গুরুত্ব দিত না। কিন্তু এটা এমন কোন ভিত্তিই নয় যার কারণে সবগুলো স্বেওয়াম্মেত নাকচ করে দেওয়া যেতে পারে। মদীনার ইহদীরা শুধু একটি আশ্চর্য ঘটনা হওয়ার কারণেই এ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল, যেমন মুলকানুনাইন সম্পর্কিত প্রশ্নও এ কারণেই ছিল। এ ধরনের প্রশ্নে খৃষ্টত্ব ও ইহদীত্বের সাম্প্রদায়িকতা মাঝখানে না আসাই সুস্পষ্ট।

তুফসীর মাযহাবীতে ইবনে ইসহাকের স্বেওয়াম্মেত দৃষ্টে তাদেরকে একত্ববাদী গণ্য করা হয়েছে। খৃষ্টধর্ম বিলুপ্ত হওয়ার পর ওনাওনতি যে কয়েকজন সত্যপন্থী জীবিত ছিল, তারা তাদেরই অন্যতম ছিল। তারা বিসুদ্ধ খৃষ্টধর্ম এবং একত্ববাদে বিশ্বাস করত। ইবনে ইসহাকের স্বেওয়াম্মেতেও অত্যাচারী বাদশাহ্‌র নাম দাকিয়ানুস উল্লেখ করা হয়েছে এবং ওহায় আত্মগোপনের পূর্বে যুবকরা যে শহরে বাস করত, তার নাম আফসুস বলা হয়েছে।

হয়রত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের স্বেওয়াম্মেতেও ঘটনাটি এমনভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং বাদশাহ্‌র নাম দাকিয়ানুস বলা হয়েছে। ইবনে ইসহাকের স্বেওয়াম্মেতে আরও বর্ণিত রয়েছে যে, আসহাবে কাহ্‌ফের জাগ্রত হওয়ার সময় দেশের উপর যেসব খৃষ্টধর্মের অনুসারী লোকের আধিপত্য কায়েম ছিল, তাদের বাদশাহ্‌র নাম ছিল বায়দুসীস।

সব স্বেওয়াম্মেতদৃষ্টে প্রবল ধারণার পর্যায়ে একথা প্রমাণিত হয় যে, আসহাবে কাহ্‌ফ খৃষ্টধর্মের অনুসারী ছিল। তাদের সময়কাল খৃষ্টজন্মের পর এবং যে মুশরিক বাদশাহ্‌র কাছ থেকে তারা পলায়ন করেছিল, তার নাম ছিল দাকিয়ানুস। তিন শত নয় বছর পঞ্চ জাগ্রত হওয়ার সময় যে ঈমানদার ন্যায়পন্থায়ণ বাদশাহ্‌র রাজত্ব ছিল, ইবনে ইসহাকের স্বেওয়াম্মেতে তার নাম 'বায়দুসীস' বলা হয়েছে। এর সাথে বর্তমান যুগের ইতিহাস মিলিয়ে দেখলে আনুমানিকভাবে তাদের সময়কাল নির্দিষ্ট হতে পারে। এর বেশি নির্ণয়ের প্রয়োজনও নেই এবং এর উপায়ও নেই।

আসহাবে কাহ্‌ফ এখনও জীবিত আছে কি? এ সম্পর্কে এটাই বিসুদ্ধ ও সুস্পষ্ট যে, তাদের ওফাত হয়ে গেছে। তুফসীর মাযহাবীতে ইবনে ইসহাকের বিস্তারিত স্বেওয়াম্মেত রয়েছে যে, আসহাবে কাহ্‌ফের জাগরণ, শহরে আশ্চর্য ঘটনার জানাজানি এবং বাদশাহ্‌ বায়দুসীসের কাছে পৌঁছে সাক্ষাতের পর আসহাবে কাহ্‌ফ বাদশাহ্‌র কাছে বিদায় প্রার্থনা করে। বিদায়ী সালামের সাথে তারা বাদশাহ্‌র জন্য দোয়া করে। বাদশাহ্‌র উপস্থিতিতেই তারা নিজেদের শয়নস্থলে গিয়ে শয়ন করে এবং আল্লাহ্ তা'আলা তখনই তাদেরকে মৃত্যুদান করেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের নিশ্চিন্ত রেওয়াজেতটি ইবনে-জরীর ও ইবনে-কাসীর প্রমুখ তফসীরবিদ উল্লেখ করেছেন :

قال قتادة فرأى ابن عباس مع حبيب بن مسلمة فمرأوا كهف  
 فى بلاد الروم فرأوا نبي عظام فقال قائل هذه عظام اهل الكهف  
 فقال ابن عباس فقد بليت عظامهم من اكثر من ثلاث مائة سنة .

কাতাদাহ বলেন : হযরত ইবনে আব্বাস হাবীব ইবনে মাসলামার সাথে এক জিহাদ করেন। রোম দেশে একটি গুহায় কাছ দিয়ে যাবার সময় তাঁরা সেখানে মৃতলোকদের হাড় দেখতে পান। এক ব্যক্তি বলল : এগুলো আসহাবে কাহফের হাড়। হযরত ইবনে আব্বাস বললেন : তাদের হাড়তো তিন শ বছর পূর্বে মৃত্যিকায় পর্যবসিত হয়ে গেছে।

কাহিনীর এসব অংশ কোরআনে নেই এবং হাদীসেও বর্ণিত হয়নি। ঘটনার কোন বিশেষ উদ্দেশ্য অথবা কোরআনের কোন আয়াত বোঝাও এগুলোর উপর নির্ভরশীল নয়। ঐতিহাসিক রেওয়াজেতদৃষ্টে এসব বিষয়ের কোন অকাটা ফয়সাল করা সম্ভবপর নয়। কাহিনীর যেসব অংশ কোরআন স্বয়ং উল্লেখ করেছে, সেগুলোর বিবরণ আয়াতের নিম্নে উল্লেখ করা হবে।

এ পর্যন্ত কোরআন পাক সংক্ষেপে কাহিনী উল্লেখ করেছে। অতঃপর বিস্তারিত বর্ণনা আসছে।

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ  
 وَزِدْنَهُمْ هُدًى ۝ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا  
 رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُو مِنْ دُونِهَا لَقَدْ قُلْنَا  
 إِذَا شَطَطًا ۝ هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهَا آلِهَةً لَوْ لَوْ  
 يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُطُنٍ بَيِّنَةٍ مَن أظْلَمَ مِنِّي افْتَرَى عَلَى اللَّهِ  
 كَذِبًا ۝ وَإِذْ اعْتَرَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأَوْا إِلَى  
 الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ  
 أَمْرِكُمْ مَرْفَقًا ۝

(১৩) আপনার কাছে তাদের ইতিহাসের সঠিকভাবে বর্ণনা করছি। তারা ছিল কয়েকজন যুবক। তারা তাদের পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল এবং আমি তাদের সংগে চলার শক্তি বাক্সে দিয়েছিলাম। (১৪) আমি তাদের মন দৃঢ় করেছিলাম, যখন তারা উঠে দাঁড়িয়েছিল। অতঃপর তারা বলল : আমাদের পালনকর্তা আসমান ও মর্যাদার পালনকর্তা; আমরা কখনও তাঁর পরিবর্তে অন্য কোন উপাস্যকে আহ্বান করব না। যদি করি, তবে তা অত্যন্ত গর্হিত কাজ হবে। (১৫) এরা আমাদেরই স্বজাতি, এরা তাঁর পরিবর্তে অনেক উপাস্য গ্রহণ করেছে। তারা এদের সম্পর্কে প্রকাশ্য প্রমাণ উপস্থিত করে না কেন? যে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা উদ্ভাবন করে, তার চাইতে অধিক গোনাহগার আর কে? (১৬) তোমরা যখন তাদের থেকে পৃথক হলে এবং তারা আল্লাহর পরিবর্তে তাদের ইবাদত করে তাদের থেকে, তখন তোমরা গুহার আগ্রহ গ্রহণ কর। তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের জন্য দূরীভূত করবেন এবং তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কাজকর্মকে ফলপ্রসূ করার ব্যবস্থা করবেন।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আমি আপনার কাছে তাদের ঘটনা সঠিকভাবে বর্ণনা করছি। (এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এর বিপরীতে যা কিছু দুনিয়াতে প্রচলিত রয়েছে, তা সঠিক নয়।) তারা (আসহাবে কাহফ) ছিল কয়েকজন যুবক, তারা তাদের পালনকর্তার প্রতি (সে যুগের খৃষ্টধর্ম অনুযায়ী) বিশ্বাস স্থাপন করেছিল এবং আমি তাদের হিদায়েতে আরও উন্নতি দান করেছিলাম (অর্থাৎ ইমানের গুণাবলী, দৃঢ়তা, বিপদাপদে সবর, সংসার বিমুখতা, পল্লকালের চিন্তা ইত্যাদিও দান করেছিলাম। ইমানের গুণাবলীর মধ্যে একটি ছিল এই যে,) আমি তাদের চিত্ত মজবুত করেছিলাম যখন তারা দৃঢ় হয়ে (পরস্পরে কিংবা বিরুদ্ধবাদী বাদশাহর সামনা সামনি) বলতে লাগল : আমাদের পালনকর্তা তিনি, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের পালনকর্তা। আমরা তাঁর পরিবর্তে অন্য কোন উপাস্যের ইবাদত করব না। (কেননা, খোদা না কফর, যদি এরূপ করি) তাহলে তা অত্যন্ত গর্হিত কাজ হবে। এরা আমাদেরই স্বজাতি; তারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্যান্য উপাস্য গ্রহণ করেছে। (কেননা তাদের কণ্ঠ ও সমসাময়িক বাদশাহ্ সনাই মূর্তিপূজারি ছিল।) অতএব তারা স্বীয় (উপাস্য হওয়া) সম্পর্কে প্রকাশ্য প্রমাণ উপস্থিত করে না কেন? (যেমন একজ্ববাদীরা একজ্ববাদ সম্পর্কে প্রকাশ্য ও নিশ্চিত প্রমাণের অধিকারী।) তার চাইতে অধিক দুর্ভাগ্যী আর কে হবে, যে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা অপবাদ রচনা করে (যে তাঁর কিছুসংখ্যক সমতুল্য ও অংশীদারও রয়েছে)? এবং (তার পরস্পরে বলল : ) তোমরা যখন তাদের থেকে (বিশ্বাসেই) পৃথক হলে এবং তাদের উপাস্যদের (ইবাদত) থেকেও (পৃথক হয়ে গেছ) কিন্তু আল্লাহ থেকে (পৃথক হয়নি; বরং তাঁর কারণে সবকিছু ভাগ করছে) তখন (সমীচীন এই যে,) তোমরা (অনুক) গুহার (যা পরামর্শক্রমে স্থির হয়ে থাকবে) আগ্রহ গ্রহণ কর (যাতে নিরাপদে ও নিশ্চিত্তে আল্লাহর ইবাদত করতে পারে)। তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের প্রতি স্বীয় রহস্যের বিস্তার করবেন এবং তোমাদের



কাজ্জকর্মে সাফল্যের ব্যবস্থা করে দেবেন। (আল্লাহ্‌র কাহ্‌ থেকে এই আশা নিয়ে) ওহাব্ব যাওয়ার সময় তারা সর্বপ্রথম এই দোয়া করে :

رَبَّنَا إِنَّا أَمَّا لَكَ رَحْمَةً وَهَيِّبَةً لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ۝

আনুমানিক জাতব্য বিষয়

فَتِيَّةٌ এর বহুবচন فِتْيَةٌ অর্থ যুবক। তফসীরবিদগণ লিখেছেন,

এ শব্দের মধ্যে ইঙ্গিত আছে যে, কর্ম সংশোধন, চরিত্র গঠন এবং হিদায়েত লাভের উপযুক্ত সময় হচ্ছে যৌবনকাল। যুদ্ধ বয়সে পূর্ববর্তী কর্ম ও চরিত্র এত শক্তভাবে শেকড় গেড়ে বসে যে, যতই এর বিপরীত সত্য পল্লিস্কুট হোক না কেন, তা থেকে বের হয়ে আসা দুরাহ হয়ে পড়ে। রসূলুল্লাহ্‌ (সা)-এর দাওয়াতে বিশ্বাস স্থাপনকারী সাহাবায়ের কিরামেতের মধ্যে অধিকাংশ ছিলেন যুবক।—(ইবনে-কাসীর, আবু হাইয়্যান)

وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ইবনে-কাসীরের বরাত দিয়ে উপরে যে ঘটনা বর্ণনা করা

হয়েছে, তা থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাদের চিত্ত সুদৃঢ় করার ঘটনা তখন হয়েছে, যখন মূর্তিপূজারি অত্যাচারী বাদশাহ্‌ যুবকদেরকে দরবারে হাজির করে জিত্তাসা-বাদ করে। এই জীবন-মরণ সঙ্কটপূর্ণ হত্যার আশংকা সত্ত্বেও আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের অন্তরে স্বীয় মহাবত, ভীতি ও মাহাত্ম্য এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দেন যে, এর মুকাবিলায় হত্যা, মৃত্যু ও সর্বপ্রকার বিপদাপদ সহ্য করার জন্য প্রস্তুত হয়ে পরিকারভাবে স্বীয় ধর্মবিশ্বাস ঘোষণা করে দেয় যে, তারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অন্য কোন উপাস্য ইবাদত করে না—ভবিষ্যতেও করবে না। যারা আল্লাহ্‌র জন্য কোন কাজ করার সংকল্প গ্রহণ করে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাদের এ ধরনের সাহায্য হয়ে থাকে।

فَأُو۟ا۟لِى ٱلْكَهْفِ : ইবনে-কাসীর বলেন : আসহাবে কাহ্‌কের

অবলম্বিত কর্মপন্থা ছিল এই যে, সে শহরে থেকে আল্লাহ্‌র ইবাদত করা যায় না, সে শহর পরিত্যাগ করে ওহাব্ব আশ্রয় নেওয়া উচিত। এটাই সব পরগমনের সূত্র। তাঁরা এরূপ স্থান থেকে হিজরত করে এমন জায়গায় আশ্রয় নেন, যেখানে আল্লাহ্‌র ইবাদত হতে পারে।

وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزْوُرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشَّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ۚ ذَٰلِكَ

مِنْ آيَةِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَنْ تَجِدَ  
 لَهُ لِيًّا مُرْشِدًا ۝ وَتَحْسَبُهُمْ آيَظَافًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ  
 الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ ۝ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّاعَتْ  
 عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتُ مِنْهُمْ فِرَارًا وَكَلِمَاتٍ مِنْهُمْ رُعبًا ۝

(৬৭) তুমি সূর্যকে দেখবে যখন উদিত হয়, তাদের গুহা থেকে পাশ কোটে ডানদিকে চলে যায় এবং যখন অস্ত যায়, তাদের থেকে পাশ কোটে বামদিকে চলে যায়, অথচ তারা গুহার প্রশস্ত চকুরে অবস্থিত। এটা আলাহুর নিদর্শনাবলীর অন্যতম। আল্লাহ্ যাকে সৎপথে চালান সেই সৎপথপ্রাপ্ত এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, আপনি কখনও তার জন্য পথপ্রদর্শনকারী সাহায্যকারী পাবেন না। (৬৮) তুমি মনে করবে তারা জাগ্রত, অথচ তারা নিদ্রিত। আমি তাদেরকে পাশ পরিবর্তন করাই ডানদিকে ও বামদিকে। তাদের কুকুর ছিল সমনের পা দু'টি গুহায় প্রসারিত করে। যদি তুমি উঁকি দিয়ে তাদেরকে দেখতে, তবে গেছন ফিরে পলায়ন করতে এবং তাদের ডয়ে জাতংকপ্রস্তু হয়ে পড়তে।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং (হে সম্বোধিত ব্যক্তি, গুহাটি এমনভাবে অবস্থিত যে,) যখন সূর্য উদিত হয়, তখন তুমি তাকে দেখবে যে, গুহার ডানদিকে পাশ কোটে যায় (অর্থাৎ গুহার প্রবেশ পথ থেকে ডানদিকে পৃথক থাকে) এবং যখন অস্ত যায়, তখন (গুহার) বামদিকে সরতে থাকে (অর্থাৎ তখনও গুহার অভ্যন্তরে স্নোদ প্রবেশ করে না, যাতে তারা স্নোদের খরতাপে কলট না পায়) এবং তারা গুহার একটি প্রশস্ত চকুরে ছিল (অর্থাৎ এ জাতীয় গুহা স্বভাবতই কোথাও অপ্রশস্ত এবং কোথাও প্রশস্ত হয়ে থাকে। তারা গুহার এমন চকুরে ছিল, যা প্রশস্ত, যাতে বাতাস পৌঁছে এবং সংকীর্ণ পলিসরের কারণে মনে অস্থিরতা না আসে।) এটা আল্লাহ্ তা'আলার অন্যতম নিদর্শন (যে, বাহ্যিক কারণাদির বিপরীতে তাদের জন্য আরামের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। সুতরাং জানা গেল যে,) যাকে আল্লাহ্ সৎপথে চালান, সেই সৎপথ পায় এবং যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন আপনি তার জন্য কোন পথপ্রদর্শনকারী সাহায্যকারী পাবেন না। (গুহার যে অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে তা হলো এই যে, তাতে সকালে সূর্যোদয়ের সময়ও ভেতরে স্নোদ প্রবেশ করে না এবং বিকালে সূর্যাস্তের সময়ও প্রবেশ করে না। এটা তখন সম্ভব যখন গুহা উত্তরমুখী অথবা দক্ষিণমুখী হয়। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলার যে ডানদিক বামদিক বলা হয়েছে, তার অর্থ যদি গুহার প্রবেশকারী ডানদিক-বামদিক হয়, তবে গুহাটি উত্তরমুখী। পক্ষান্তরে যদি গুহা থেকে নির্গমনকারী ডানদিক-বামদিক অর্থ হয়, তবে গুহাটি দক্ষিণমুখী হবে।) এবং

(হে সম্বোধিত ব্যক্তি, তারা যখন গুহায় গেল এবং আমি তাদের উপর নিদ্রা চাপিয়ে দিলাম, তখন যদি তুমি তাদেরকে দেখতে, তবে) তুমি তাদেরকে জাগ্রত মনে করতে অথচ তারা ছিল নিদ্রিত। (কেননা, আল্লাহর শক্তি তাদেরকে নিদ্রার লক্ষণাদি থেকে মুক্ত রেখেছিল; যেমন শ্বাস-প্রশ্বাসের পরিবর্তন, দেহ চিলে হয়ে যাওয়া ইত্যাদি। চক্কু বন্ধ হলেও তা নিদ্রার নিশ্চিত আলামত নয়) এবং (নিদ্রার এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে) আমি তাদেরকে (কোন সময়) ডানদিকে এবং (কোন সময়) বামদিকে পার্শ্ব পরিবর্তন করাতাম (এবং এমতাবস্থায়) তাদের কুকুর (যাটি কোন কারণে তাদের সাথে এসে গিয়েছিল, গুহার) প্রবেশদ্বারে সামনের পা দু'টি প্রসারিত করে (বসা) ছিল। (তাদের আল্লাহ প্রদত্ত ভয়ভীতির অবস্থা ছিল এই যে,) যদি (হে সম্বোধিত ব্যক্তি) তুমি তাদেরকে উঁকি দিয়ে দেখতে, তবে পেছন ফিরে পলায়ন করতে এবং তাদের ভয়ে তুমি আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়তে। [এ আয়াতে সাধারণ লোকদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। এতে রুসুল্লাহ (স)-এর ভীত-সন্ত্রস্ত হওয়া জরুরী নয়। এসব ব্যবস্থা আল্লাহ তা'আলা তাদের হিকমতের জন্য করেছিলেন। কেননা, জাগ্রত ব্যক্তিকে হামলা করা সহজ হয় না। দীর্ঘ সময়ের নিদ্রায় পার্শ্ব পরিবর্তন না করলে এক পার্শ্বকে মাটি খেয়ে ফেলত। গুহার প্রবেশপথে কুকুর বসে থাকা যে হিকমতের ব্যবস্থা, তা বলাই বাহুল্য।]

### আনুষ্ঠানিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা আসহাবে কাহফের তিনটি আশ্চর্যজনক অবস্থা বর্ণনা করেছেন। এগুলো তাঁদের কালামত হিসাবে অলৌকিকভাবে প্রকাশ লাভ করেছে।

এক, দীর্ঘকাল পর্যন্ত নিদ্রায় অভিভূত থাকা এবং তাতে খাদ্য ইত্যাদি ছাড়াই জীবিত থাকা সর্বত্রহৎ কালামত ও অলৌকিক কাণ্ড। পরবর্তী আয়াতে এর বিবরণ আসবে। এখানে বলা হয়েছে যে, এই দীর্ঘ নিদ্রাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে গুহার অভ্যন্তরে এমনভাবে নিরাপদ রেখেছিলেন যে, সূর্য তাদের কাছ দিয়ে সকাল-বিকাল অতিক্রম করত কিন্তু গুহার ভেতরে তাদের দেহে রোদ পড়ত না। কাছ দিয়ে অতিক্রম করার উপকারিতা জীবনের স্পন্দন প্রতিষ্ঠা, বাতাস, উত্তাপ ও শৈত্যের সমতা ইত্যাদি ছিল। দেহের উপর রোদ না পড়ায় তাদের দেহ ও পোশাকের হিকমতও হস্তিত।

তাদের উপর রোদ না পড়া গুহার বিশেষ অবস্থানের কারণেও হতে পারে; যেমন গুহার প্রবেশপথ উত্তর কিংবা দক্ষিণে এমনভাবে ছিল যে, রোদ স্বভাবতই ভেতরে প্রবেশ করত না। ইবনে কুতায়্বা-এর বিশেষ অবস্থানস্থল নির্ণয়ের জন্য এরূপ কষ্ট স্বীকার করেছেন যে, অংকশাস্ত্রের মূজনীতির নিরিখে সে স্থানের প্রাথমি, অক্ষাংশ তথা দৈর্ঘ্য দেশান্তর রেখা (Longitude) ও প্রস্থ দেশান্তর রেখা (Latitude) এবং গুহার সমস্ত নির্ণয়ের প্রয়াস পেয়েছেন।—(মায়হারী) এর বিপরীতে বাজাজ্জ বলেন; তাদের উপর থেকে রোদ দূরে থাকা কোন বিশেষ অবস্থানের কারণে নয়; বরং তাদের কালামতের কারণে

অলৌকিকভাবে এটাও ছিল। আয়াতের শেষে **ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ** বাক্য থেকেও বাহ্যত তাই বোঝা যায় যে, রোদ থেকে হিফাযতের এই ব্যবস্থা আল্লাহ তা'আলার অপার শক্তির একটি নিদর্শন ছিল।—(মামহারী)

পরিষ্কার কথা এই যে, তাদের দেহে যাতে রোদ না পড়ে আল্লাহ তা'আলা সেরূপ ব্যবস্থা করেছিলেন। এ ব্যবস্থা গুহার বিশেষ অবস্থানের মাধ্যমে হোক কিংবা রোদের সময় মেঘখণ্ড ইত্যাদির আড়াল করে হোক কিংবা সূর্যের কিরণকে আলৌকিকভাবে তাদের উপর থেকে সরিয়ে দিয়ে হোক। আয়াতে সব সম্ভাবনাই রয়েছে। তন্মধ্যে কোন একটিকে নির্দিষ্ট করার জন্য জোর দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

দীর্ঘ নিদ্রার সময় আসহাবে কাহফ এমতাবস্থায় ছিল যে, দর্শকরা তাদেরকে জাগ্রত মনে করত : দ্বিতীয় অবস্থা বর্ণিত হয়েছে এই যে, আসহাবে কাহফকে এত দীর্ঘকাল নিদ্রায় অভিভূত রাখা সম্ভবও তাদের দেহে নিদ্রার চিহ্ন মাত্র ছিল না। বরং অবস্থা ছিল এরূপ যে, দর্শকরা তাদেরকে জাগ্রত মনে করত। অধিকাংশ তুফসীরবিদ বলেন : তাদের চক্ষু খোলা ছিল। নিদ্রার কারণে দেহে যে তিলাভাব আসে তাও তাদের মধ্যে ছিল না। বাহ্যত এ অবস্থাও অসাধারণ এবং একটি কান্নামতই ছিল। এর বাহ্যত কারণ ছিল তাদের হিফাযত করা—যাতে নিদ্রিত মনে করে কেউ তাদের উপর হামলা না করে অথবা তাদের আস-বাবপত্র চুরি না করে। বিভিন্ন দিকে পার্শ্ব পরিবর্তন থেকেও দর্শকরা তাদেরকে জাগ্রত মনে করতে পারে। এর আরেক কারণ ছিল এই যে, যাতে এক পার্শ্বকে মাটি খেয়ে না ফেলে।

আসহাবে কাহফের কুকুর : সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে, যে গৃহে কুকুর কিংবা কোন প্রাণীর ছবি থাকে তাতে ফেরেশতা প্রবেশ করে না। সহীহ বুখারীর এক হাদীসে ইবনে উমরের রেওয়াজেতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (সা) বলেন : যে ব্যক্তি শিকারী কুকুর অথবা জন্তুদের হিফাযতকারী কুকুর ছাড়া অন্য কুকুর পালন করে প্রত্যহ তাঁর পুণ্য থেকে দু'কিরাত হ্রাস পায়—(কিরাত একটি ছোট ওজনের নাম।) হযরত আবু হুরায়রার রেওয়াজেতে এক তৃতীয় প্রকার কুকুরের ব্যতিক্রম প্রকাশ করা হয়েছে ; অর্থাৎ শস্যক্ষেত্রের হিফাযতের জন্য পালিত কুকুর।

এসব হাদীসের ভিত্তিতে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, আল্লাহর উক্ত আসহাবে কাহফ কুকুর সঙ্গে নিজেদের কেন? এর এক উত্তর এই যে, কুকুর পালনের নিষিদ্ধতা শরীয়তে মুহাম্মদীর বিধান। সম্ভবত খৃস্টধর্মে এটা নিষিদ্ধ ছিল না। দ্বিতীয় জওয়াব এই যে, খুব সম্ভব তাঁরা সম্পদশালী ও পশুপালনকারী ছিলেন। এগুলোর হিফাযতের জন্য কুকুর পালন করতেন। কুকুরের প্রভুভক্তি সুবিদিত। তাঁরা এখন শহর থেকে রওয়ানা হন, তখন কুকুরও তাঁদের অনুসরণ করতে থাকে।

সংসংসর্গের বরকত কুকুরেরও সম্মান বাড়িয়ে দিয়েছে : ইবনে আতিয়া বলেন : আমান প্রদেয় পিতা বলেছেন যে তিনি ৪৬৯ হিজরীতে মিসরের জামে মসজিদে আবুল

ফয়ল জওহরীর একটি ওয়াজ শুনেছেন। তিনি মিম্বরে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন : যে ব্যক্তি সত্বলোকদেরকে ভালবাসে, তাদের নেকীর অংশ সে-ও পায়। দেখ, আসহাবে কাহফের কুকুর তাদেরকে ভালবেসেছে এবং তাদের সঙ্গী হয়ে গেছে। ফলে আল্লাহ তা'আলা কোরআনেও তার কথা উল্লেখ করেছেন।

কুরতুরী স্বীয় তফসীর গ্রন্থে ইবনে অতিয়্যার বর্ণনা উদ্ধৃত করে বলেন : একটি কুকুর যখন সত্বলোক ও গুণীদের সংসর্গের কারণে এই মর্যাদা পেতে পারে, তখন আপনি অনুমান করুন, যেসব ঈমানদার তওহীদী লোক আল্লাহর ওলী ও সত্বলোকদেরকে ভালবাসে, তাদের মর্যাদা কতটুকু হবে? এ ঘটনায় সেসব মুসলমানদের জন্য সান্দ্বনা ও সুসংবাদ রয়েছে, যারা আমলে কাঁচা, কিন্তু রসূলুল্লাহ (সা)-কে মনেপ্রাণে ভালবাসে।

সহীহ বুখারীর হাদীসে হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন : একদিন আমি ও রসূলুল্লাহ (সা) মসজিদ থেকে বের হচ্ছিলাম। মসজিদের দরজায় এক ব্যক্তির সাথে দেখা হল। সে প্রশ্ন করল : ইয়া রসূলুল্লাহ! কিয়ামত কবে হবে? তিনি বললেন : তুমি কিয়ামতের জন্য কি প্রস্তুতি নিয়েছ (যে, আসার জন্য তাড়াহড়া করছ)? এ কথা শুনে লোকটি মনে মনে কিছুটা লজ্জিত হল। অতঃপর সে বলল : আমি কিয়ামতের জন্য অনেক নামায, রোযা ও দান-খয়রাত সঞ্চয় করিনি, কিন্তু আমি আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে ভালবাসি। রসূলুল্লাহ (সা) বললেন : যদি তাই হয়, তবে (শুনে নাও) তুমি (কিয়ামতে) তার সাথেই থাকবে, যাকে তুমি ভালবাস। হযরত আনাস বললেন : রসূলুল্লাহ (সা)-এর মুখে এ কথা শুনে আমরা এতই আনন্দিত হলাম যে, মুসলমান হওয়ার পর এর চাইতে বেশি আনন্দিত কোন সময় হইনি। এরপর হযরত আনাস আরও বলেন : (আলহামদুলিল্লাহ) আমি আল্লাহকে, তাঁর রসূলকে, আবু বকর ও উমরকে ভালবাসি এবং আশা করি যে, তাঁদের সাথেই থাকব—(কুরতুরী)

আসহাবে কাহফকে আল্লাহ তা'আলা এত ভয়ভীতি দান করেছিলেন যে, যে দেখত আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পলায়ন করা ছাড়া উপায় ছিল না : **لَوْ اَطَّلَعْتُمْ عَلَيْهِمْ** বাহ্যত এতে সাধারণ লোককে সম্বোধন করা হয়েছে। কাজেই জরুরী নয় যে, আসহাবে কাহফের ভয়ভীতি রসূলুল্লাহ (সা)-কেও আচ্ছন্ন করতে পারত। আল্লাতে সাধারণ লোককে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, যদি তুমি উঁকি মেরে দেখ, তবে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পলায়ন করবে।

এই ভয়ভীতির কারণ সম্পর্কে আলোচনা অনর্থক। তাই কোরআন ও হাদীস তা বর্ণনা করেনি। সত্য এটাই যে, তাদের হিফাযতের জন্য আল্লাহ তা'আলা এসব অবস্থা সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন। তাদের গায়ে রৌদ পড়ত না। দর্শক তাদেরকে জাগ্রত মনে করত। তাদের ভয়ভীতি দর্শককে আচ্ছন্ন করে দিত যাতে পূর্ণরূপে দেখতে না পারে। এসব অবস্থার উদ্ভব স্বাভাবিক কারণাদির পথে হওয়াও সম্ভবপর এবং কার্নামত হিসাবে অলৌকিক উপায়ে হওয়াও সম্ভবপর। কোরআন ও হাদীস যখন এর কোন বিশেষ কারণ নির্দিষ্ট করেনি, তখন নিছক অনুমানের ভিত্তিতে এ সম্পর্কে আলোচনা করা নিরর্থক।

তফসীর মাযহারীতে এ বক্তব্যকেই অপ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে এবং এর সমর্থনে ইবনে আবী শায়বা, ইবনে মুনিয়র ও ইবনে আবী হাতেমের সনদ দ্বারা হযরত ইবনে আব্বাসের এই ঘটনা উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, তিনি বলেন : আমরা রোমকদের মুকাবিলায় হযরত মুআবিয়া'র সাথে এক জিহাদে শরীক হয়েছিলাম, যা 'গযওয়াতুল মুযীক' নামে খ্যাত। এই সফরে আমরা আসহাবে কাহ্ফের গুহার নিকট দিয়ে গমন করি। হযরত মুআবিয়া আসহাবে কাহ্ফকে জানা ও দেখার জন্য গুহার যেতে চাইলেন। কিন্তু হযরত ইবনে আব্বাস নিষেধ করে বললেন : আল্লাহ্ তা'আলা আপনার চাইতে বড় ও উত্তম ব্যক্তিত্বকে [অর্থাৎ রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে] তাঁদেরকে দেখতে নিষেধ করেছেন। অতঃপর তিনি

لَوْ اَطَعْتُمْ آيَاتِي لَآتَاكُمْ مِنْهُ رِزْقًا غَيْرَ الَّذِي تَأْتُونَ بِهِ ۗ وَلَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَلْيَمْسِكُوا بِسُلْسَلَتِهَا ۗ إِنَّهَا مُمْدُودَةٌ ۗ وَلَقَدْ مَكِّنَّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ قَامُوا رَبَّنَا رَبَّنَا خُذْ لَنَا مِنْهَا رِزْقًا يُسْرًا ۗ إِنَّنَا صَبَرْنَا بِمَا كُنَّا كَانِبِينَ ۗ (সূরা আ'আল, ৩১-৩৩)

আয়াতটি পাঠ করলেন। এ থেকে জানা গেল যে, হযরত ইবনে আব্বাসের মতে আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সম্বোধন করা হয়েছে। কিন্তু হযরত মুআবিয়া ইবনে আব্বাসের মত কবুল করলেন না। (সবুত কারণ এই ছিল যে, তাঁর মতে আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পরিবর্তে সাধারণ লোককে সম্বোধন করা হয়েছে অথবা কোরআন বর্ণিত এই অবস্থা তখনকার, যখন আসহাবে কাহ্ফ জীবিত অবস্থায় নিদ্রাগত ছিলেন। এখন তাদের ওফাতের পর বহু দিন অতিবাহিত হয়েছে। কাজেই এখনও পূর্বের ভয়ভীতি বিদ্যমান থাকা জরুরী নয়। মোটকথা, হযরত মুআবিয়া ইবনে আব্বাসের কথা মানলেন না। তিনি কয়েকজন লোক পাঠিয়ে দিলেন। তারা যখন গুহার প্রবেশ করলেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলা ভীষণ উত্তপ্ত হওয়া প্রেরণ করলেন। ফলে তারা কিছুই দেখতে পারেনি।

—(মাযহারী)

و كَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۗ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ ۗ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۗ قَالُوا رَبِّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ ۗ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ۗ إِنَّهُمْ نَبْتِهَا لِيُرْجَوْا ۗ وَأَعْلَىٰ لَبِئْتُمْ فِي مَلَّتِهِمْ وَلَكِنْ تُفْلِحُوا إِذَا أَبَدًا ۗ

(১১) আমি এমনভাবে তাদেরকে জাগ্রত করলাম, যাতে তারা পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদ করে। তাদের একজন বলল : তোমরা কতকাল অবস্থান করেছ? তাদের কেউ বলল : একদিন অথবা একদিনের কিছু অংশ অবস্থান করেছি। কেউ কেউ বলল : তোমাদের পালনকর্তাই ভাল জানেন তোমরা কতকাল অবস্থান করেছ। এখন তোমাদের একজনকে

তোমাদের এই মুদ্রাসহ শহরে প্রেরণ কর; সে যেন দেখে কোন খাদ্য পবিত্র। অতঃপর তা থেকে যেন কিছু খাদ্য নিয়ে আসে তোমাদের জন্য; সে যেন নগ্নতা সহকারে যায় ও কিছুতেই যেন তোমাদের খবর কাউকে না জানায়। (২০) তারা যদি তোমাদের খবর জানতে পারে, তবে পাথর মেরে তোমাদেরকে হত্যা করবে, অথবা তোমাদেরকে তাদের ধর্মে ফিরিয়ে নেবে। তাহলে তোমরা কখনই সাফল্য লাভ করবে না।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং (আমি যেমন স্বীয় শক্তি বলে তাদেরকে দীর্ঘকাল পর্যন্ত নিদ্রাভিত্তিত রেখেছি) এমনভাবে (এই দীর্ঘ নিদ্রার পর) আমি তাদেরকে জাগ্রত করেছি, যাতে তারা পরস্পরে জিজ্ঞাসাবাদ করে। (যাতে পারস্পরিক জিজ্ঞাসাবাদের ফলে আল্লাহর কুদরত ও হিংস্রতা তাদের কাছে খুলে যায়। (সেমতে) তাদের একজন বললঃ (নিদ্রাবস্থায়) তোমরা কতকাল অবস্থান করেছ? (উত্তরে) কেউ কেউ বললঃ (সম্ভবত) একদিন অথবা একদিনেরও কিছু কম সময় অবস্থান করেছি। অন্য কেউ কেউ বললঃ (এ নিয়ে খোঁজাখুঁজির কি প্রয়োজন?) এ সম্পর্কে তো (সঠিকভাবে) তোমাদের পালন-কর্তাই ভাল জানেন তোমরা কতকাল (নিদ্রায়) অবস্থান করেছ। এখন (এই অনর্থক আলোচনা ছেড়ে জরুরী কাজ করা দরকার। তা এই যে, ) তোমাদের একজনকে তোমাদের এই টাকা (যা তোমাদের কাছে ছিল। কেননা, খরচাদির জন্য তারা কিছু টাক-পয়সাও সাথে এনেছিল। মোটকথা, কাউকে এই টাকা) দিয়ে শহরে প্রেরণ কর। (সেখানে পৌঁছে) সে যেন দেখে কোন খাদ্য হালাল। (এখানে ইবনে-জরীরের রেওয়াজেতে হযরত সায়ীদ ইবনে জুবায়ের থেকে **أزى** শব্দের তফসীর হালাল খাদ্য বর্ণিত আছে। একথা বলা জরুরী ছিল। কারণ, তাদের কওম প্রতিমার নামে জন্তু যবেহ করত এবং বাজারে হারাম গোশত প্রচুর পারস্রিমাণে বিক্রি হত।) অতঃপর তা থেকে সে যেন কিছু খাদ্য নিয়ে আসে এবং বিচক্রপতার সাথে কাজ করে (অর্থাৎ এমন ভাবসাব নিয়ে যাবে যে, কেউ যেন তাকে চিনতে না পারে এবং খাদ্য যাচাই করার মধ্যেও যেন এ কথা জানতে না দেয় যে, সে মূর্তির নামে যবেহকৃত গোশত হারাম মনে করে।) এবং কাউকে যেন তোমাদের বিষয়ে জানতে না দেয়। (কেননা) তারা যদি (অর্থাৎ শহরবাসীরা। তারা তাদেরকে নিজেদের সমান্নার মুশরিক মনে করছিল।) তোমাদের খবর পেয়ে যায়, তবে তোমাদেরকে হয় পাথর মেরে হত্যা করবে, না হয় (জোরজবরদ-স্তিভাবে) তোমাদেরকে তাদের ধর্মে ফিরিয়ে নেবে। এরূপ হলে তোমরা কখনই সাফল্য লাভ করবে না।

### আনুমানিক জাতব্য বিষয়

سَدَقَاتِ

এ শব্দটি তুনা মূলক ও দু'টাক মূলক অর্থ দেয়। এখানে দু'টি ঘটনায় পারস্রিক তুলনা বোঝানো হয়েছে। প্রথম ঘটনা আসহাবে কাহ্নফের দীর্ঘকাল পর্যন্ত

নিদ্রাভিভূত থাকা, যা কাহিনীর শুরুতে **فَضَّرْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الصُّهفِ** **سُنِينَ عَدَدًا** আয়াতে ব্যক্ত করা হয়েছে। দ্বিতীয় ঘটনা দীর্ঘকালীন নিদ্রার পর সুস্থ

এবং স্বাধীন পানাহার সত্ত্বেও সবল ও সুঠাম দেহে জাগ্রত হওয়া। উভয় ঘটনা আলাহুর কুদরতের নিদর্শন হওয়ার ব্যাপারে পরস্পর তুল্য। তাই এ আয়াতে তাদেরকে জাগ্রত করার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে **كَذَلِكَ** শব্দে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তাদের নিদ্রা

যেমন সাধারণ মানুষের অভ্যস্ত নিদ্রার মত ছিল না, তেমনি তাদের জাগরণও সাধারণ জাগরণ থেকে স্বতন্ত্র ছিল। এরপর **لَتَسَاءَلُوْا** বলা হয়েছে, অর্থাৎ যাতে তারা পরস্পরে

জিজ্ঞাসাবাদ করে যে, কতকাল ঘুমানো হয়েছে। এটা জাগ্রত করার আসল কারণ নয়; বরং একটি অভ্যস্ত ঘটনার বর্ণনা। এ কারণেই এর **لام**-কে তফসীরবিদগণ **لام عاقبت** (আবু হাইয়ান, কুরতুবী)

মোটকথা তাদের দীর্ঘ নিদ্রা যেমন কুদরতের একটি নিদর্শন ছিল, এমনিভাবে শত শত বছর পর পানাহার ছাড়া সুস্থ-সবল অবস্থায় জাগ্রত হওয়াও ছিল আলাহুর অপার শক্তির একটি নিদর্শন। আলাহুর এটাও ইচ্ছা ছিল যে, শত শত বছর নিদ্রামগ্ন থাকার বিষয়টি স্বয়ং তারাও জানুক, তাই পারস্পরিক জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে এর সূচনা হয় এবং

সে ঘটনা দ্বারা চূড়ান্ত রূপ নেয়, যা পদ্মবতী **كَذَلِكَ أَخْرَجْنَا** আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ তাদের গোপন রহস্য শহরবাসীরা জেনে ফেলে এবং সময়কাল নির্ণয়ে মতানৈক্য সত্ত্বেও দীর্ঘকাল গুহায় নিদ্রামগ্ন থাকার ব্যাপার সবার মনেই বিশ্বাস জন্মে।

**قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ**—কাহিনীর শুরুতে সংক্ষেপে বলা হয়েছিল যে, গুহার

অবস্থানের সময়কাল সম্পর্কে তাদের পরস্পরের মধ্যে মতানৈক্য হয় এবং তাদের এক দলের উক্তি শুদ্ধ ছিল। এখানে সে কথাগুলি বিবরণ দেওয়া হয়েছে। আসহাবে কাহফের এক বক্তি প্রশ্ন তুলল যে, তোমরা কতকাল নিদ্রামগ্ন রয়েছ? কেউ কেউ উত্তর দিল : একদিন অথবা একদিনের কিছু অংশ। কেননা তারা সকাল বেলায় গুহায় প্রবেশ করেছিল এবং জাগরণের সময়টি ছিল বিকাল। তাই মনে করল যে, এটা সেই দিন যেদিন আমরা গুহায় প্রবেশ করেছিলাম। কিন্তু তাদের মধ্য থেকেই অন্যরা অনুভব করল, যে, এটা সম্ভবত সে দিন নয়। তাহলে কতদিন গেল জানা নেই। তাই তারা বিষয়টি

আলাহুর উপর ছেড়ে দিয়ে বলল : **رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ** অতঃপর তারা এ আলো-



চনাকে অনাবশ্যক মনে করে জরুরী কাজের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল যে, শহর থেকে কিছু খাদ্য আনার জন্য একজনকে প্রেরণ করা হোক।

إِلَى الْمَدِينَةِ — এ শব্দ থেকে জানা গেল যে, গুহার নিকটে একটি বড়

শহর ছিল। সেখানে তারা পূর্বে বসবাস করত। এ শহরের নাম সম্পর্কে আবু হাইয়্যান তফসীর বাহুরে মুহীতে বলেন : যে সময়ে আসহাবে কাহফ এ শহর থেকে বের হয়েছিল তখন তার নাম ছিল 'আফসুস'। বর্তমানে এর নাম 'তরসুস'। কুরতুবী স্বীয় তফসীর গ্রন্থে বলেন : এ শহরের উপর যখন মূর্তিপূজারীদের আধিপত্য ছিল, তখন এর নাম ছিল 'আফসুস'। অতঃপর যখন মুসলমান অর্থাৎ তৎকালীন খলিফাশাসিত শহরটি দখল করে নেয়, তখন এর নাম রেখে দেয় তরসুস।

بِوَرَقِمٍ

থেকে জানা যায় যে, তারা গুহার আসার সময় কিছু টাকা-পয়সাও সাথে এনেছিল। অতএব বোঝা গেল যে, প্রয়োজনীয় ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা বৈরাগ্য ও তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়। —(বাহুরে মুহীত)

أَزْكَىٰ أَزْكَىٰ طَعَامًا — শব্দের অর্থ পাক-সাক। ইবনে জুবায়েরের

তফসীর অনুযায়ী এখানে হালাল খাদ্য বোঝানো হয়েছে। এর প্রয়োজন এজন্য দেখা দেয় যে, যখন তারা শহর থেকে বের হয়েছিল, তখন সেখানে মূর্তিদের নামে যবেহ করা হত এবং বাজারে তা-ই বিক্রি করা হত। তাই প্রেরিত ব্যক্তিকে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, খাদ্য হালাল কিনা, তা যেন যাচাই করে আনা হয়।

মাস'আলা : এ থেকে জানা গেল যে, শহরে কিংবা যে বাজারে অথবা যে হোটেলে অধিকাংশ হারাম খাদ্য প্রচলিত, সেখানকার খাদ্য যাচাই না করে খাওয়া জায়েয নয়।

أَوْ يَرِجْمُوكُمْ

শব্দের অর্থ পাথর মেরে মেরে হত্যা করা। গুহার যাওয়ার পূর্বে বাসখাহ হুমকি দিয়েছিল যে, তোমাদের এ ধর্ম পরিত্যাগ না করলে তোমাদেরকে হত্যা করা হবে। এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, তাদের মতে ধর্ম-ত্যাগীদের শাস্তি ছিল প্রস্তর বর্ষণের মাধ্যমে হত্যা, যাতে সবাই এতে অংশগ্রহণ করে এবং সমগ্র জাতি যেন ক্রোধ প্রকাশ করে হত্যা করে।

ইসলামী শরীয়তে বিবাহিত নারী ও পুরুষের যিনার শাস্তিও প্রস্তর বর্ষণে হত্যা। সত্ত্বত এরও কারণ এই যে, যে ব্যক্তি লজ্জাশরমের সব বাধা ছিন্ন করে এহেন জঘন্য কর্মে লিপ্ত হয়, তার হত্যা প্রকাশ্য স্থানে সব লোকের অংশগ্রহণের মাধ্যমে হওয়া

উচিত। এভাবে তার লাঞ্ছনাও পুরোপুরি হবে এবং মুসলমান কার্যক্ষেত্রে স্বীয় ক্রোধ ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করবে যাতে ভবিষ্যতে জাতির মধ্যে এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয়।

فَا بَعَثُوا أَحَدَكُمْ — আসহাবে কাহফ নিজেদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তিকে

শহরে প্রেরণের জন্য মনোনীত করে এবং খাদ্য আনার জন্য তার কাছে টাকা অর্পণ করে। কুরতুবী বলেন : এ থেকে কয়েকটি মাস'আলা জানা যায়। এক. অর্থ-সম্পদে অংশীদারিত্ব জায়েয। দুই. অর্থ সম্পদে উকিল নিযুক্ত করা জায়েয এবং শরীকানাধীন সম্পদ কোন এক ব্যক্তি অন্যদের অনুমতিক্রমে ব্যয় করতে পারে। তিন. খাদ্যপ্রবোর কয়েকজন সঙ্গী শরীক হলে তা জায়েয; যদিও খাওয়ার পরিমাণ বিভিন্নরূপ হয়—কেউ কম খায় আর কেউ কেউ বেশী খায়।

وَكَذَلِكَ أَعْتَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذِ يَتَنَزَّعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُيُوتًا رَدُّهُمْ أَعْلَمَ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا ۝

(২১) এমনিভাবে আমি তাদের ঘবর প্রকাশ করে দিলাম, যাতে তারা জ্ঞাত হয় যে, আল্লাহর ওয়াদা সত্য এবং কিয়ামত কোন সন্দেহ নেই। যখন তারা নিজেদের কর্তব্য বিষয়ে পরস্পরে বিতর্ক করছিল, তখন তারা বলল : তাদের উপর সৌধ নির্মাণ কর। তাদের পালনকর্তা তাদের বিষয়ে ভাল জানেন। তাদের কর্তব্য বিষয়ে যাদের মত প্রবল হলো, তারা বলল : আমরা অবশ্যই তাদের স্থানে মসজিদ নির্মাণ করব।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং ( আমি যেভাবে স্বীয় কুদরতবলে তাদেরকে নিদ্রামগ্ন করেছি এবং জাগ্রত করেছি ) এমনিভাবে আমি স্বীয় কুদরত ও হিকমত দ্বারা তখনকার লোকদেরকে তাদের বিষয় জানিয়ে দিয়েছি, যাতে ( অন্যান্য অনেক উপকারের মধ্য থেকে একটি উপকার এ-ও হয় যে, ) তারা ( এ ঘটনার সূত্র ধরে ) এ বিষয়ে বিশ্বাস ( অথবা অধিক বিশ্বাস ) অর্জন করে যে, আল্লাহর ওয়াদা সত্য এবং কিয়ামতে কোন সন্দেহ নেই। ( তারা যদি পূর্ব থেকে কিয়ামতে জীবিত হওয়ার ব্যাপারে বিশ্বাসী থেকে থাকে, তবে এ ঘটনা দ্বারা তাদের বিশ্বাস আরও দৃঢ় হবে। পক্ষান্তরে তারা যদি পূর্বে কিয়ামতে অবিশ্বাসী হয়, তবে এ ঘটনা দেখে তাদের বিশ্বাস জন্মাবে। আসহাবে কাহফের জীবদ্দশায় এ ঘটনা ঘটে। এরপর তারা ওহাব মধ্যই প্রাণ ত্যাগ করে। তখন তাদের সম্পর্কে

সমসাময়িক লোকদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়। পল্লবভী আয়াতে এই মতানৈক্য বর্ণিত হয়েছে)। ঐ সময়টিও স্মরণযোগ্য, যখন তখনকার লোকেরা তাদের নিজেদের কর্তব্য সম্পর্কে পারস্পরিক বিতর্ক করছিল। (এই বিতর্ক ছিল গুহার মুখ বন্ধ করার ব্যাপারে, যাতে তাদের মৃতদেহ নিরাপদ থাকে অথবা তাদের স্মৃতিচিহ্ন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়)। তারা বলল : তাদের (গুহার) নিকটে সৌধ নির্মাণ কর। (এরপর মতানৈক্য হলো যে, সৌধটি কি হবে? এই মতানৈক্যের সময়) তাদের পালনকর্তা তাদের (বিভিন্ন মতামতের) বিষয় ভাল জানতেন। (অবশেষে) যারা স্বীয় কর্তব্যে অটল ছিল (অর্থাৎ রাজপরিবারের লোক, যারা তখন সত্যধর্মের অনুসারী ছিল) তারা বলল, আমরা তাদের স্থানে একটি মসজিদ নির্মাণ করব। (মসজিদটি এ বিষয়েরও চিহ্ন হবে যে, তারা স্বয়ং উপাসনাকারী ছিল—উপাস্য ছিল না। অন্য রকম কোন সৌধ নির্মাণ করলে ভবিষ্যত বংশধররা হয়তো তাদেরকেই উপাস্য সাব্যস্ত করে ফেলতে পারত)।

### আনুমানিক জাতব্য বিষয়

وَكَذَلِكَ آعْزَرْنَا عَلَيْهِمْ

এ আয়াতে আসহাবে কাহ্ফের রহস্য শহর-বাসীদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়া, এর রহস্য এবং পরকাল ও কিয়ামতের প্রতি ঈমান ও বিশ্বাস অর্জিত হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। তফসীরে কুরতুবীতে এর সংক্ষিপ্ত ঘটনা এভাবে উল্লিখিত রয়েছে :

আসহাবে কাহ্ফের বিষয় শহরবাসীদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়া : আসহাবে কাহ্ফের প্রস্থানকালে অত্যাচারী ও মুশরিক বাদশাহ্ দাকিয়ানুসের রাজত্ব ছিল। তার মৃত্যুর পর কয়েক শতাব্দী অতিবাহিত হলে শহরের উপর সত্যপন্থী তওহীদবাদী লোকদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। তাদের বাদশাহ্ ছিলেন একজন সৎ ও সাধু ব্যক্তি। তফসীর মায়হারীতে ঐতিহাসিক ব্লোগ্রায়েত দৃষ্টে তার নাম 'বাইদুসীস' লেখা রয়েছে। তার শাসনকালে ঘটনাক্রমে কিয়ামতে মৃতদের পুনরায় জীবিত হওয়ার প্রস্নে মতানৈক্য ছড়িয়ে পড়ে। একদল একে অস্বীকার করতে থাকে। তারা বলে যে, মানবদেহ পচে-গলে অণু-পল্লমাণুর আকারে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ার পর পুনর্বীর জীবিত হওয়া অসম্ভব। বাদশাহ্ বাইদুসীস চিন্তিত হলে যে, কিভাবে তাদের সম্মেহ নিরসন করা যায়। কোন উপায় না দেখে তিনি চেষ্টার পোশাক পরিধান করতে ছাই-এর স্তূপে বসে আল্লাহর কাছে কাম্বাকাটি করলে দোয়া করতে লাগলেন : হে আল্লাহ্, আপনিই তাদের বিশ্বাস সংশোধন ও সৎ পথে ফিরে আসার কোন উপায় করে দিন। একদিনে বাদশাহ্ কাম্বাকাটি ও দোয়ার মশগুল ছিলেন, অপরদিকে আল্লাহ্ তার দোয়া কবুল করার ব্যবস্থা করলেন যে, আসহাবে কাহ্ফের মিত্রাভঙ্গ হলো। তারা তাদের 'তামলিখা' নামক এক ব্যক্তিকে খাদ্য আনার জন্য বাজারে প্রেরণ করল। সে দোকানে পৌঁছল এবং খাদ্যের মূল্য হিসাবে তিন শ বছর পূর্বকার বাদশাহ্ দাকিয়ানুসের আমলে প্রচলিত মুদ্রা পেশ করল। দোকানদার অবাঞ্ছিতমুদ্রে তাকিয়ে রইল। এ মুদ্রা কোথা থেকে এল? কোন আমলের? তা অন্যান্য

দোকানদারকে দেখানো হলো। সবাই বলল : এ ব্যক্তি কোথাও প্রাচীন ধনভাণ্ডার লাভ করেছে। সেখান থেকেই এই মুদ্রা বের করে এনেছে। সে অস্বীকার করে বলল : আমি কোন ধনভাণ্ডার পাইনি এবং কারও কাছ থেকে এ মুদ্রা জানিনি। এটা আমার নিজের।

বাজারীরা তাকে গ্রেফতার করে বাদশাহর সামনে উপস্থিত করল। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, বাদশাহ সাধু ও আল্লাহভক্ত লোক ছিলেন। তিনি প্রাচীন রাজকীয় ধনভাণ্ডারে রক্ষিত সে ফলকটিও দেখেছিলেন, যাতে আসহাবে কাহফের নাম ও তাদের পলায়নের ঘটনা লিপিবদ্ধ ছিল। কারও কারও মতে স্বয়ং অত্যাচারী বাদশাহ দাকিয়ানুস এই ফলকটি লিখিয়েছিল এবং তাতে বলা হয়েছিল যে, এরা দাগী অপরাধী। এদের নাম-ত্বিকানা সংরক্ষিত থাকতে হবে। যখন যেখানে পাওয়া যায়, গ্রেফতার করতে হবে। কোন কোন স্লেওয়ালেতে রয়েছে শাহী দফতরে কিছুসংখ্যক ঈমানদারও ছিল। তারা মৃত্যুপূজাকে ঘৃণা করত এবং আসহাবে কাহফকে সত্যপন্থী মনে করত। তবে তা প্রকাশ করার সাহস তাদের ছিল না। তারা স্মৃতি হিসেবে এই ফলক লিপিবদ্ধ করেছিল। সে ফলকের নামই রুকীম। সে কারণেই আসহাবে কাহফকে আসহাবে রুকীমও বলা হয়।

মোটকথা, বাদশাহ এই ঘটনা সম্পর্কে কিছুটা জ্ঞাত ছিলেন। এ সময় তার আন্তরিক কামনা ছিল এই যে, কোন না কোন উপায়ে মানুষ জানুক যে, মৃতদেহকে পুনরুজ্জীবিত করা আল্লাহ তা'আলার কুদরতের পক্ষে মোটেই অসম্ভব নয়।

এজন্য তামলিখার অবস্থা শুনে বাদশাহর নিশ্চিত বিশ্বাস হলো যে, সে আসহাবে কাহফের একজন। বাদশাহ বললেন : আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করতাম যে, আমাকে তাদের সাথে মিলিয়ে দাও, যারা বাদশাহ দাকিয়ানুসের আমলে ঈমান রক্ষা করার জন্য পলায়ন করেছিলেন। সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা আমার দোয়া কবুল করেছেন। এতে মৃতদেহ জীবিত করে হাশরে একত্র করাকে বিশ্বাস করার মত কোন প্রমাণ নিহিত থাকতে পারে। এরপর বাদশাহ তামলিখাকে বললেন : আমাকে সে গুহায় নিয়ে চল, যেখান থেকে তুমি এসেছ **وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِحَقِيقَةِ الْحَالِ**

বাদশাহ নগরবাসীদের এক বিরাট দল সমভিব্যাহারে গুহায় পৌঁছাল। গুহার নিকটবর্তী হয়ে তামলিখা বলল : আপনারা একটু থামুন। আমি সঙ্গীদেরকে প্রকৃত ব্যাপারটি জানিয়ে দেই যে, এখন বাদশাহ তওহীদবাদী মুসলমান। কওমও মুসলমান। তারা সাক্ষাতের জন্য আগমন করেছে। একথা জানানোর আগে আপনারা গেলে তারা মনে করবে যে, আমাদের শত্রু বাদশাহ চড়াও হয়েছে। সেমতে তামলিখা গুহায় পৌঁছে তাদেরকে আদ্যোপ্রাণ্ড ঘটনা বর্ণনা করল। আসহাবে কাহফ এতে খুব আনন্দিত হলো এবং সসম্মানে বাদশাহকে অভ্যর্থনা জানাল। অতঃপর তারা গুহায় ফিরে গেল। অধিকাংশ স্লেওয়ালেতে রয়েছে, তামলিখা যখন সঙ্গীদেরকে সকল রূডান্ত অবহিত করল, তখনই সবার মৃত্যু হয়ে গেল; বাদশাহর সাথে সাক্ষাত হতে পারেনি। বাহর-মুহীতে আবু হাইয়ান একে একে এই স্লেওয়ালেত উদ্ধৃত করেছেন যে, সাক্ষাতের পর গুহাবাসীরা

বাদশাহ্ ও নগরবাসীদেরকে বলল : এখন আমরা বিদায় হতে চাই। এই বলে তারা গুহার অভ্যন্তরে চলে গেল এবং তখনই আল্লাহ তা'আলা সবাইকে মৃত্যুদান করলেন।

মোটকথা, আল্লাহর কুদরতের এই আশ্চর্য ঘটনাটি নগরবাসীদের সামনে জাঙ্কলামান হয়ে ফুটে উঠল। তা'দের বিশ্বাস হলো যে, যে সত্তা জীবিত মানুষদেরকে তিন শ বছর পর্যন্ত পানাহার ছাড়া জীবিত রাখতে পারেন এবং এত দীর্ঘকাল নিদ্রামগ্ন রাখার পর আবার সুস্থ ও সবল অবস্থায় জাগ্রত করতে পারেন, তাঁর পক্ষে মৃত্যুর পরও মৃত-দেহগুলোকে জীবিত করা মোটেই কঠিন নয়। এই ঘটনার ফলে তাদের অবিশ্বাসের কারণ দূর হয়ে গেল। এখন জানা গেল যে, আল্লাহ তা'আলার কুদরতকে মানবীয় ক্রমতার আলোকে বোঝার চেষ্টা করা মূর্খতা বৈ নয়।

এ বক্তব্যের প্রতিই এ আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে : لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ

لَا رَيْبَ فِيهَا — অর্থাৎ আমি আসহাবে কাহ্ফকে

দীর্ঘকাল পর্যন্ত নিদ্রামগ্ন রাখার পর জাগ্রত করে বসিয়ে দিয়েছি, যাতে লোকেরা বুঝে নেয় যে, আল্লাহর ওয়াদা অর্থাৎ কিয়ামতে মৃতদেরকে জীবিত করার ওয়াদা সত্য এবং কিয়ামতের আগমনে কোন সন্দেহ নেই।

আসহাবে কাহ্ফের ওফাতের পর লোকদের মধ্যে মতানৈক্য : আসহাবে কাহ্ফের মাহাযা ও পবিত্রতা সম্পর্কে কারও দ্বিমত ছিল না। তাদের ওফাতের পর সবাই মনে করল যে, গুহার নিকটে একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করতে হবে। কিন্তু সৌধটি কি ধরনের হবে, এ সম্পর্কে মতানৈক্য দেখা দিল। কোন কোন রেওয়াজেত থেকে জানা যায় যে, নগরবাসীদের মধ্যে তখনও কিছু মূর্তিপূজারী ছিল। তারাও আসহাবে কাহ্ফের যিয়ারতের জন্য আগমন করত। তারা মত দিল যে, কোন জনহিতকর সৌধ নির্মাণ করা হোক। কিন্তু শাসকবর্গ ও বাদশাহ্ মুসলমান ছিলেন এবং তারা ই ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ। তারা প্রস্তাব দিল যে, এখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হোক যা স্মৃতি-চিহ্নও হবে এবং ভবিষ্যতে মূর্তিপূজা থেকে বিরত রাখার কারণও হবে। এখানের মতানৈক্যের উল্লেখ করে মাঝখানে কোরআনের এই বাক্যটি রয়েছে : مَوْمَانِ ۝۱۴ ۝۱۵ ۝۱۶ ۝۱۷ ۝۱۸ ۝۱۹ ۝۲۰ ۝۲۱ ۝۲۲ ۝۲۳ ۝۲۴ ۝۲۵ ۝۲۶ ۝۲۷ ۝۲۸ ۝۲۹ ۝۳۰ ۝۳۱ ۝۳۲ ۝۳۳ ۝۳۴ ۝۳۵ ۝۳۶ ۝۳۷ ۝۳۸ ۝۳۹ ۝۴০ ۝৪১ ۝৪২ ۝৪৩ ۝৪৪ ۝৪৫ ۝৪৬ ۝৪৭ ۝৪৮ ۝৪৯ ۝৫০ ۝৫১ ۝৫২ ۝৫৩ ۝৫৪ ۝৫৫ ۝৫৬ ۝৫৭ ۝৫৮ ۝৫৯ ۝৬০ ۝৬১ ۝৬২ ۝৬৩ ۝৬৪ ۝৬৫ ۝৬৬ ۝৬৭ ۝৬৮ ۝৬৯ ۝৭০ ۝৭১ ۝৭২ ۝৭৩ ۝৭৪ ۝৭৫ ۝৭৬ ۝৭৭ ۝৭৮ ۝৭৯ ۝৮০ ۝৮১ ۝৮২ ۝৮৩ ۝৮৪ ۝৮৫ ۝৮৬ ۝৮৭ ۝৮৮ ۝৮৯ ۝৯০ ۝৯১ ۝৯২ ۝৯৩ ۝৯৪ ۝৯৫ ۝৯৬ ۝৯৭ ۝৯৮ ۝৯৯

— অর্থাৎ তাদের পালনকর্তা তাদের অবস্থা সম্পর্কে ভাল জানেন।

তফসীর বাহরে মুহীতে এ বাক্যের বাখ্যা প্রসঙ্গে দু'টি সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং এটি নগরবাসীদেরই উক্তি। কেননা, তাদের ওফাতের পর যখন স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করার প্রস্তাব গৃহীত হয় তখন মূর্তিসৌধে সাধারণত যাদের স্মৃতিসৌধ, তাদের নাম ও বিশেষ অবস্থাদির শিলালিপি সংযুক্ত করা হয়। এ ক্ষেত্রে আসহাবে কাহ্ফের বংশ ও অবস্থা সম্পর্কে বিভিন্নরূপ কথাবার্তা হয়েছে। যখন তারা কোন সত্য উদ্ঘাটন

করতে পারেনি, তখন নিজেরাই পরিশেষে অক্ষম হয়ে বলেছে : **وَهُمْ أَعْلَمُ بِهِم**

এরপর তারা আসল কাজ অর্থাৎ স্মৃতিসৌধ নির্মাণে মনোনিবেশ করেছে। যারা প্রবল ছিল, তাদের মসজিদ নির্মাণসংক্রান্ত প্রস্তাবটিই গৃহীত হলে।

দুই. এ ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার। এতে বর্তমানকালের বিতর্ককারী ও মতানৈক্য-কারীদেরকে হ'শিয়ার করা হয়েছে যে, তোমরা যখন আসল সত্য জান না এবং জানার উপায়ও তোমাদের কাছে নেই তখন এই আলোচনায় জড়িয়ে অনর্থক কেন সময় নষ্ট কর? রসুলুল্লাহ্ (সা)-র যমানায় ইহদীরা এ ঘটনা সম্পর্কে এ ধরনের ভিত্তিহীন কথা-বার্তা বলত। সত্ত্ববত তাদেরকে হ'শিয়ার করা উদ্দেশ্য।

মাস'আলা : এ ঘটনা থেকে এতটুকু জানা গেল যে, ওলী-দরবেশদের কবরের কাছে নামাযের জন্য মসজিদ নির্মাণ করা গেনোহ্ নয়। এক হাদীসে পয়গম্বরের কবরকে যারা মসজিদে পরিণত করে, তাদের প্রতি অভিসম্পাত করা হয়েছে। এর অর্থ স্বয়ং কবরকে সিজদার জায়গায় পরিণত করা, যা সর্ববাদীসম্মত শিরক ও হারাম।  
—(মায়হারী)

**سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةً رَّأَوْهُمْ كُذِّبُوا، وَيَقُولُونَ خَمْسَةً سَادِسُهُمْ  
كُذِّبُوا رَجَبًا بِالْغَيْبِ، وَيَقُولُونَ سَبْعَةً وَثَامَتُهُمْ كُذِّبُوا قُلْ رَبِّي  
أَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ۗ فَلَا تَحْسَبُوهُمْ إِلَّا مِرًا  
ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا ۝**

(২২) অজ্ঞাত বিষয়ে অনুমানের উপর ভিত্তি করে এখন তারা বলবে : তারা ছিল তিন জন; তাদের চতুর্থটি তাদের কুকুর। একথাও বলবে : তারা পাঁচ জন। তাদের ষষ্ঠটি ছিল তাদের কুকুর। আরও বলবে : তারা ছিল সাতজন। তাদের অষ্টমটি ছিল তাদের কুকুর। বলুন : আমার পালনকর্তা তাদের সংখ্যা ভাল জানেন। তাদের খবর অল্প লোকই জানে। সাধারণ আলোচনা ছাড়া আপনি তাদের সম্পর্কে বিতর্ক করবেন না এবং তাদের অবস্থা সম্পর্কে তাদের কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

যখন আসহাবে কাহফের কাহিনী বর্ণনা করবে, তখন কেউ কেউ বলবে : তারা ছিল তিন জন, চতুর্থটি তাদের কুকুর এবং কেউ কেউ বলবে : তারা ছিল পাঁচ জন, ষষ্ঠটি ছিল তাদের কুকুর। (আর) তারা অজ্ঞাত বিষয় অনুমান করে কথা বলছে এবং

কেউ কেউ বলবে : তারা সাতজন, অষ্টমটি ছিল তাদের কুকুর। আপনি মতভেদ-কারীদেরকে বলে দিন : আমার পালনকর্তা তাদের সংখ্যা খুব বিস্ময়করপে জানেন যে, (এসব বিভিন্ন উক্তির মধ্যে কোন উক্তি বিস্ময়কর না সবই প্রাস্ত)। তাদের সংখ্যা বিস্ময়করপে খুব কম লোকই জানে। সংখ্যা নির্ণয়ের মধ্যে বিশেষ কোন উপকার নিহিত নেই, তাই আয়াতে কোন সুস্পষ্ট ফয়সালা করা হয়নি। কিন্তু হযরত ইবনে আব্বাস ও ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, **أَنَا مِنَ الْقَلِيلِ كَأَنَّا سَهْمَةٌ** অর্থাৎ অল্প সংখ্যকের মধ্যে আমিও একজন। তাদের সংখ্যা ছিল সাত। (দুররে-মনসূর) আয়াতেও এ উক্তির সত্যতার প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কেননা, এ উক্তি উদ্ধৃত করে একে নাকচ করা হয়নি। কিন্তু প্রথমোক্ত দু'টি উক্তি উদ্ধৃত করার পর **رَجَمًا بِالْغَيْبِ** বলে নাকচ করা হয়েছে। **وَاللَّهُ أَعْلَمُ** অতএব (যদি তারা মতভেদ করা থেকে বিরত না হয় তবে) আপনি সাধারণ আলোচনা ছাড়া তাদের সম্পর্কে বিতর্ক করবেন না। (অর্থাৎ **رَجَمًا بِالْغَيْبِ** এবং **قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ** বলে কোরআনে সংক্ষেপে

তাদের ধারণা নাকচ করা হয়েছে। এটাই সাধারণ আলোচনা। তাদের আপত্তির জওয়াবে এর চাইতে বেশি মনোনিবেশ করা এবং স্রীয় দাবি প্রমাণের জন্য বেশি চেষ্টা করা সমীচীন নয়। কারণ, এই আলোচনাতে বিশেষ কোন উপকারিতা নেই।) এবং আপনি তাদের (আসহাবে কাহ্‌ফের) সম্পর্কে এদের কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না। [রসুলুল্লাহ (সা)-কে যেমন এদের আপত্তির উত্তরদানে পরিশ্রম করতে বাধ্য করা হয়েছে, তেমনি এ সম্পর্কে কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেও নিষেধ করা হয়েছে। কেননা, যতটুকু জরুরী ছিল, ততটুকু কোরআনেই এসে গেছে। অনাবশ্যিক জিজ্ঞাসাবাদ ও খোঁজাখুঁজি পরগম্বরের মর্যাদার পরিপন্থী।]

### আনুষ্ঠানিক জাতব্য বিষয়

বিরোধপূর্ণ আলোচনায় কথাবার্তার উত্তম পন্থা : **سَيَقُولُونَ**—অর্থাৎ তারা বলবে।---‘তারা’ কারা---এ সম্পর্কে দু’রকম সম্ভাবনা আছে। এক. এখানে তাদের কথাই বলা হয়েছে, যারা আসহাবে কাহ্‌ফের আমলে তাদের নাম, বংশ ইত্যাদি সম্পর্কে মতভেদ করেছিল। তাদের মধ্যেই কেউ কেউ তাদের সংখ্যা সম্পর্কে প্রথম উক্তি কেউ কেউ দ্বিতীয় উক্তি এবং কেউ কেউ তৃতীয় উক্তি করেছিল।---(বাহর)

দুই. **سَيَقُولُونَ** থাকো নাজরানের খৃস্টান সম্প্রদায়কে বোঝানো হয়েছে। তারা রসুলুল্লাহ (সা)-র সাথে আসহাবে কাহ্‌ফের সংখ্যা সম্পর্কে বিতর্ক করেছিল। নাজরানের খৃস্টান সম্প্রদায় তিন দলে বিভক্ত ছিল। এক দলের নাম ছিল ‘মালকানিয়া’। এরা সংখ্যা সম্পর্কে প্রথম উক্তি, অর্থাৎ তিন বলেছিল। দ্বিতীয় দলের নাম ছিল ‘ওয়াকবিয়া’।

তার দ্বিতীয় সংখ্যা অর্থাৎ পাঁচ বলেছিল। তৃতীয় দল ছিল 'নাসুরীয়া'। তারা তৃতীয় সংখ্যা অর্থাৎ সাত বলেছিল। কেউ কেউ বলেন : তৃতীয় উক্তিটি ছিল মুসলমানদের। অবশেষে রসূলুকাহ্ (স)-র হাদীস এবং কোরআনের ইঙ্গিত দ্বারা তৃতীয় উক্তির বিস্তৃতিই প্রমাণিত হয়।—(বাহরে মুহীত)

وَتَأْمِنُهُمْ—এখানে এ বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য যে, আসহাবে কাহ্ফের সংখ্যা

সম্পর্কে আয়াতে তিনটি উক্তি উল্লেখ করা হয়েছে : তিন, পাঁচ ও সাত। প্রত্যেকটি সংখ্যার পর তাদের কুকুরের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু প্রথমোক্ত দুই উক্তিতে তাদের সংখ্যা ও কুকুরের গণনার মাঝখানে **وَإِذَا طَفَعُوا** (সংযোগকারী ওয়াও)

ব্যবহার না করে বলা হয়েছে **خَمْسَةً سَادَسُهُمْ كَلْبُهُمْ** এবং **ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ**

কিন্তু তৃতীয় উক্তিতে **وَإِذَا طَفَعُوا** এনে **وَتَأْمِنُهُمْ** বলা হয়েছে।

তফসীরবিদগণ এর কারণ এই লিখেন যে, আরবদের কাছে সংখ্যার প্রথম ধাপ ছিল সাত। সাতের পরে সংখ্যা আসত, তা অনেকটা পৃথক বলে গণ্য হত; যেমন আজকাল নয় সংখ্যাটি 'নয় পর্যন্ত একক সংখ্যা শ্রী হয়। দশ থেকে দ্বি-সংখ্যা আরম্ভ হয়। এ কারণেই আরবরা তিন থেকে সাত পর্যন্ত সংখ্যা গণনার ব্যবহার করত না। সাতের পর কোন সংখ্যা বর্ণনা করতে হলে **وَإِذَا طَفَعُوا** এনে পৃথক করে বর্ণনা করত। এ জন্যই এই **وَإِذَا طَفَعُوا** নাম দেয়া হয়।—(মায়হারী)

আসহাবে কাহ্ফের নাম : প্রকৃতপক্ষে কোন সহীহ হাদীস থেকে আসহাবে কাহ্ফের নাম সঠিকভাবে প্রমাণিত নেই। তফসীরী ও ঐতিহাসিক স্নেওয়ারয়েতে বিভিন্ন নাম বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে তাবারানী 'মু'জামে আওসাত' গ্রন্থে বিস্তৃক্ত সনদ সহযোগে হযরত ইবনে আব্বাস থেকে যে স্নেওয়ারয়েত বর্ণনা করেছেন, সেটিই বিস্তৃক্ততর। এতে তাদের নাম নিম্নরূপ উল্লেখ করা হয়েছে :

মুফসালমিনা, তামলিখা, মরতুনুস, সনুনুস, সারিনুতুস, যুনওয়াস, কায়ান্তাতি-য়ুনুস।

فَلَا تَأْمِنُهُمْ إِلَّا مِرَاءَ ظَاهِرِهِمْ وَلَا تَسْتَفْتِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا

অর্থাৎ আপনি আসহাবে কাহ্ফের সংখ্যা প্রভৃতি সম্পর্কে তাদের সাথে কথা বিতর্কে



প্রবৃত্ত হবেন না ; বরং সাধারণ আলোচনা করুন। আপনি নিজেও তাদেরকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না।

বিরোধপূর্ণ ব্যাপারে দীর্ঘ আলোচনা থেকে বিরত থাকা উচিত : বর্ণিত উভয় বাক্যে রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে যে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, তা প্রকৃতপক্ষে আলিম সম্প্রদায়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পথনির্দেশক নীতি। কোন প্রকারে মতবিরোধ দেখা দিলে জরুরী বিষয়গুলো বর্ণনা করা উচিত। এরপরও যদি কেউ অনাবশ্যক আলোচনায় জড়িত হয়ে পড়ে, তবে তার সাথে সাধারণ আলোচনা করে বিতর্ক শেষ করে দেওয়া বাঞ্ছনীয়। নিজের দাবি প্রমাণ করার জন্য উঠে পড়ে লেগে যাওয়া এবং প্রতিপক্ষের দাবি খণ্ডনে অধিক জোর দেয়া অনুচিত। কারণ, এতে বিশেষকোন উপকারিতা নেই। উপরন্তু অতিরিক্ত আলোচনা ও কথা কাটাকাটিতে মূল্যবান সময়ও নষ্ট হয় এবং পরস্পরের মধ্যে তিক্ততা সৃষ্টিরও সম্ভাবনা থাকে।

দ্বিতীয় বাক্যে দ্বিতীয় নির্দেশ এই ব্যক্ত হয়েছে যে, ওহীর মাধ্যমে আসহাবে কাহফ সম্পর্কে যে পরিমাণ তথ্য আপনাকে সরবরাহ করা হয়েছে তাতেই সন্তুষ্ট থাকুন। কারণ এতটুকুই যথেষ্ট। আরও বেশি জানার জন্য হোঁজাখুঁজি ও মানুষের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না। অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করার এক উদ্দেশ্য এমনও হতে পারে যে, তার অভ্যাস ও মূল্যবোধ জনসমক্ষে ফুটে উঠুক—এটাও ও পরগল্পের চরিত্রের পরিপন্থী তাই ভাল ও মন্দ উভয় উদ্দেশ্যে অপরকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَايٍ ؕ إِنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ عُدَا ۖ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۗ  
 وَأَذْكُرُ سِرَّ بَكْرَادًا نَسِيتُ وَقُلْتُ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنَّ رَبِّي لِأَقْرَبَ  
 مِنْ هَذَا رَشْدًا ۖ وَلَيَسْئَلُنِي فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةِ سِنِينَ وَأَزْدَادُوا  
 تِسْعًا ۗ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَيْسَ لَهُ غَيْبٌ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ  
 أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَعَلَىٰ ۗ وَلَا يَشْرِكُ  
 فِي حِكْمَةٍ أَحَدًا ۖ

২৩) আপনি কোন কাজের বিষয়ে বলবেনই না যে, সেটি আমি 'আগামী কাল করব' (২৪) 'আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে' বলা ব্যতিরেকে। যখন ভুলে যান, তখন আপনার পালনকর্তাকে স্মরণ করুন এবং বলুন : আশা করি আমার পালনকর্তা আমাকে এর

চাইতেও নিকটতম সত্যের পথনির্দেশ করবেন। (২৫) তাদের উপর তাদের ওহায় তিন শ' বছর, অতিরিক্ত আরও নয় বছর অতিবাহিত হয়েছে। (২৬) বলুন : তারা কতকাল জব্বান করেছ, তা আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান তাঁরই কাছে রয়েছে। তিনি কত চমৎকার দেখেন ও শুনে। তিনি ব্যতীত তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই। তিনি কাউকে নিজ কর্তৃত্বে শরীক করেন না।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(যদি লোকেরা আপনার কাছে কোন উত্তরসাপেক্ষ বিষয় জিজ্ঞেস করে এবং আপনি উত্তর দানের ওয়াদা করেন, তবে এর সাথে 'ইনশাআল্লাহ্' কিংবা এর সামর্থ্য-বোধক কোন বাক্য অবশ্যই সংযুক্ত করবেন; বরং বিশেষ করে ওয়াদার ক্ষেত্রেই নয়, প্রত্যেক কাজে এর প্রতি লক্ষ্য রাখবেন যে) আপনি কোন কাজের বিষয় এমন বলবেন না যে, আমি তা (উদাহরণত) আগামীকাল করব, কিন্তু আল্লাহর চাওয়াকে (এর সাথে) যুক্ত করে নিন। [ অর্থাৎ 'ইনশাআল্লাহ্' ইত্যাদিও সাথে সাথে বলে দিন। ভবিষ্যতে এমন না হওয়া চাই, যেমন এ ঘটনায় হয়েছে যে, লোকেরা আপনাকে সাহ্ আসহাবে কাহফ ও মুলকারনাইন সম্পর্কে প্রশ্ন করায় আপনি 'ইনশাআল্লাহ্' না বলেই তাদের সাথে আগামীকাল জওয়ার দানের ওয়াদা করেছেন। এরপর পনের দিন পর্যন্ত ওহী আসেনি, যদ্বরূন আপনি খুব চিন্তিত হয়েছেন। এই নির্দেশের সাথে সাথে প্রশ্নকারীদের প্রশ্নের হওয়াব নাথিল হয়। (লুবাব) ] এবং যখন আপনি ঘটনাতক্রে 'ইনশাআল্লাহ্' বলা (জুলে মান, এবং পরে কোন সময় স্মরণ হয়) তবে (তখনই 'ইনশাআল্লাহ্' বলে) আপনার পালনকর্তাকে স্মরণ করণ এবং (তাদেরকে একথাও) বলে দিন যে, আশাকরি আমার পালনকর্তা আমাকে (নবুয়তের প্রমাণ হওয়ার দিক দিয়ে) এর (অর্থাৎ ওহাবাসীর কাহিনীর) চাইতেও সত্যের নিকটতম পথনির্দেশ করবেন। [ উদ্দেশ্য এই যে, তোমরা আমার নবুয়তের পরীক্ষা নেয়ার জন্য আসহাবে কাহফ ইত্যাদির কাহিনী জিজ্ঞেস করলে, যা আল্লাহ্ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে বলে দিয়ে তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করেছেন। কিন্তু আসল কথা এই যে, নবুয়ত সপ্রমাণের জন্য এসব কাহিনীর প্রশ্ন ও উত্তর খুব বড় প্রমাণ হতে পারে না। এ কাজ তো ইতিহাস ভাঙ্গরণ জানা থাকলে সাধারণ লোকও করতে পারে। আমাকে আল্লাহ্ তা'আলা নবুয়ত সপ্রমাণের জন্য এর চাইতেও বড় অকাট্য প্রমাণাদি এবং সু'জিয়া দান করেছেন। তুমথো সবরুহৎ প্রমাণ হচ্ছে স্বপ্ন ফেরআন। সমগ্র বিশ্ব মিলেও এর একটি আয়াতের অনু-করণে কোন সূরা রচনা করতে পারেনি। এ ছাড়া হযরত আদম (আ) থেকে নিরে কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের এমন ঘটনাবলী ওহীর মাধ্যমে আমাকে বলে দিয়েছেন, যেগুলো কালের দিক দিয়েও আসহাবে কাহফ ও মুলকারনাইনের ঘটনার তুলনার অধিক দূরবর্তী এবং যেগুলো সম্পর্কে ভানলাভ করাও ওহী ব্যতীত কারও পক্ষে সম্ভবপর নয়। মোটকথা তোমরা তো আসহাবে কাহফ ও মুলকারনাইনের ঘটনাকে অধিক আশ্চর্যজনক বলে মনে করে এগুলোকেই নবুয়ত পরীক্ষার প্রশ্ন হিসেবে পেশ করেছ, কিন্তু আল্লাহ্ তা'

আমাকে এর চাইতেও অধিক আশ্চর্যজনক বিষয়সমূহের জ্ঞান দান করেছেন) ] এবং আসহাবে কাহ্ফের সংখ্যাগ্ন ব্যাপারে তারা যেমন মতভেদ করে, তেমনি তাদের নিদ্রার সময়কাল সম্পর্কেও তারা বিস্তর মতভেদ করে। আমি এ সম্পর্কে সঠিক কথা বলে দিচ্ছি যে, তারা তাদের গুহায় (নিদ্রিতাবস্থায়) তিন শ' বছরের পর আরও নয় বছর অবস্থান করেছে। (যদি এই সঠিক কথা শুনেও তারা মতভেদ করতে থাকে, তবে) আপনি বলে দিন : আল্লাহ্ তা'আলা তাদের (নিদ্রিত) থাকার সময়কাল (তোমাদের চাইতে) অধিক জানেন। (তাই তিনি যা বলেছেন, তাই সঠিক। আর বিশেষ করে এ ঘটনার ক্ষেত্রেই কেন, তাঁর তো অবস্থা এই যে) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান তাঁরই কাছে রয়েছে। তিনি কত চমৎকার দেখেন ও কত চমৎকার শুনে! তিনি ব্যতীত তাদের অন্য কোন সাহায্যকারী নেই। তিনি কাউকে স্বীয় কতৃৎস্বের শরীক করেন না। (সারকথা এই যে, তাঁর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই এবং শরীকও নেই। এমন মহান সত্তার বিরোধিতাকে খুব ভয় করা উচিত।)

### আনুমানিক জ্ঞাতব্য বিষয়

উল্লিখিত চার আয়াতেই আসহাবে কাহ্ফের কাহিনী সমাপ্ত হচ্ছে। তন্মধ্যে প্রথম দু'আয়াতে রসূলুল্লাহ্ (সা) ও তাঁর উম্মতকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, ভবিষ্যতকালে কোন কাজ করার ওয়াদা বা স্বীকারোক্তি করলে এর সাথে 'ইনশাআল্লাহ্' বাক্যটি যুক্ত করতে হবে। কেননা, ভবিষ্যতে জীবিত থাকবে কিনা, তা কারও জানা নেই। জীবিত থাকলেও কাজটি করতে পারবে কিনা, তারও নিশ্চয়তা নেই। কেহেই মু'মিনের উচিত মনে মনে এবং মুখে স্বীকারোক্তির মাধ্যমে আল্লাহর উপর ভরসা করা ভবিষ্যতে কোন কাজ করার কথা বললে এভাবে বলা পরকার যদি আল্লাহ্ চান, তবে আমি এ কাজটি আপাতীকাল করব। ইনশাআল্লাহ্ বাক্যের অর্থ তাই।

তৃতীয় আয়াতে একটি বিরোধপূর্ণ আলোচনার ফয়সাল করা হয়েছে। এতে আসহাবে কাহ্ফের আমলের লোকদের মতামতও বিভিন্নরূপ ছিল এবং বর্তমান যুগের ইহুদী ও খৃস্টানদের মতামতও বিভিন্নরূপ। অর্থাৎ গুহায় নিদ্রামগ্ন থাকার সময়কাল এ আয়াতে বলে দেয়া হয়েছে যে, এই সময়কাল তিন শ' নয় বছর। কাহিনীর শুরুতে

فَكَّرْنَا عَلَىٰ إِذَا نَهْمٌ فِي الْكَهْفِ سَلِيبِينَ عَدَدًا বলে যে বিষয়টি সংক্ষেপে বলা হয়েছিল, এখানে যেন তাই বর্ণনা করে দেয়া হল।

এরপর চতুর্থ আয়াতে আবার মতভেদকারীদেরকে হ'শিয়ার করা হয়েছে যে, ভোমরা আসল সত্য জান না। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলাই ভাল জানেন, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সব অদৃশ্য বিষয়ে পরিজ্ঞাত, শ্রোতা ও দ্রষ্টা। তিনি তিন শ' নয় বছরের সময়কাল বর্ণনা করেছেন। এতেই সম্বল্ট হয়ে যাওয়া উচিত।

ভবিষ্যত কাজের জন্য ইনশাআল্লাহ্ বলা : 'ল'বাব' গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবান আকাস থেকে প্রথম দু'আয়াতের শানে নূরুল সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, মহান কাফিররা

যখন ইহুদীদের শিক্ষা অনুযায়ী রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আসহাবে কাহফ সম্পর্কে প্রশ্ন করে, তখন তিনি ইনশাআল্লাহ্ না বলেই তাদের সাথে অ'গামীকাল জওয়াব দেয়ার ওয়াদা করেছিলেন। মৈকঠাশীলদেরকে সামান্য ছুটির জন্যও হ'শিয়ান করা হয়! তাই পনের দিন পর্যন্ত কোন ওহী আগমন করেনি। রসূলুল্লাহ্ (সা) খুবই চিন্তিত হলেন। মুশক্কিকরা বিদ্রূপ ও উপহাসের সুযোগ পেল। পনের দিন বিরতির পর যখন এ সূরায় প্রায়ের জওয়াব নামিল হল, তখন এর সাথে হিদায়েতের জন্য এ দু'টি আয়াতও অবতীর্ণ হল যে, ভবিষ্যতে কোন কাজ করার কথা বলা হলে ইনশাআল্লাহ্ বলে এ কথার স্বীকারোক্তি করা উচিত যে, প্রত্যেক কাজ আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। আয়াতদ্বয়কে আসহাবে কাহফের কাহিনীর শেষাংশে সংস্কৃত করা হয়েছে :

মাস'আলা : এ আয়াত থেকে প্রথমত জানা গেল যে, এরূপ ক্ষেত্রে ইনশাআল্লাহ্ বলা মুস্তাহাব। দ্বিতীয়ত যদি ডুলরুমে বাক্যটি না বলা হয়, তবে যখনই স্মরণ হয়, তখনই তা বলা দরকার। আয়াতে বর্ণিত বিশেষ ক্ষেত্রের জন্য এ বিধান। অর্থাৎ শুধু বরকতলাভ ও দাসত্বের স্বীকারোক্তির জন্য এ বাক্য বলা উদ্দেশ্য—কোন শর্ত লাগানো উদ্দেশ্য নয়। কাজেই এ থেকে জরুরী হয় না যে, কেনাবেচা ও পারম্পরিক চুক্তির মধ্যেও অনুরূপ বিধান হবে। কেনাবেচার মধ্যে শর্ত লাগানো হয়, এবং উভয় পক্ষের জন্য শর্ত লাগানোর উপর পারম্পরিক চুক্তি নির্ভরশীল থাকে। এসব ক্ষেত্রেও যদি চুক্তির সময় শর্ত লাগানো ভুলে যায় এবং পরে কোন সময় স্মরণে আসে, তবে যা ইচ্ছা তা শর্ত লাগাতে পারবে না। এ মাস'আলায় কোন কোন ফিকাহবিদ ভিন্ন মতও পোষণ করেন। বিস্তারিত বিবরণ না ফিকাহ গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

তৃতীয় আয়াতে ওহ'য় নিদ্রার সময়কাল তিন শত বছর বলা হয়েছে। কোরআনের পূর্বাঙ্গের বর্ণনা থেকে বাহাত এ কথাই বোঝা যায় যে, এই সময়কাল আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে। ইবনে কাসীরের মতে এটাই পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অধিক-সংখ্যক তফসীরবিদদের উক্তি। আবু হাইয়ান, কুরতুবী প্রমুখ তফসীরবিদও তাই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু হযরত কাভাদাহ প্রমুখ থেকে এ সম্পর্কে আরও একটি উক্তি বর্ণিত আছে। তা এই যে, তিন শত বছরের সময়কালের উক্তিটিও উপরোক্ত মতভেদ-কারীদের কারও কারও পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলার উক্তি হচ্ছে শুধু

اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا বাক্যটি। কেননা, তিন শত নয় বছর নির্দিষ্ট করার কথাটি

যদি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হয়, তবে পরে اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا বলার কোন প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ তফসীরবিদরা বলেন যে, উক্ত বাক্যই আল্লাহ্ তা'আলার নামাম প্রথম বাক্যে বাস্তব ঘটনা বর্ণিত হয়েছে এবং দ্বিতীয় বাক্যে এর সাথে বিরোধ পোষণকারীদেরকে হ'শিয়ান করা হয়েছে যে, যখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সময়কাল বর্ণিত হয়ে গেছে তখন একে মেনে নেয়া অপরিহার্য। তিনিই জানেন। নিছক অনুমান ও মতামতের ভিত্তিতে এর বিরোধিতা করা নিবৃদ্ধিত।

এখানে প্রস্ন হয় যে, কোরআন পাক সময়কাল বর্ণনা প্রসঙ্গে প্রথমে তিন শত বছর বর্ণনা করেছে। এরপর বলেছে যে, এই তিন শতের উপর আরও নয় বেশি। প্রথমেই তিন শত নয় বলেনি কেন? তফসীরবিদগণ এর কারণ লিখেছেন যে, ইহুদী ও খৃস্টানদের মধ্যে সৌর বর্ষের প্রচলন ছিল। এই হিসাবে মোট তিন শত বছরই হয়। ইসলামে চান্দ্র-বর্ষ প্রচলিত। চান্দ্র বর্ষের হিসাবে প্রতি একশত বছরে তিন বছর ক্ষেত্র যায়। তাই তিন শত সৌর বছরে চান্দ্র বছর হিসাবে তিন শত নয় বছর হয়। এই দুই প্রকার বর্ষগণীর পার্থক্য বোঝাবার জন্য উপরোক্ত ভঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে।

এখানে আরও একটি প্রস্ন হয় যে, আসহাবে কাহফের ব্যাপারে সন্ধ্যা তাদের আমলে, অতঃপর রসুলুল্লাহ (সা)-র যুগে ইহুদী ও খৃস্টানদের মধ্যে দু'টি বিষয়ে মতভেদ ছিল। এক. আসহাবে কাহফের সংখ্যা এবং দুই. গুহায় তাদের নিদ্রার সময়কাল। কোরআন পাক উভয় বিষয় একটু পার্থক্য সহকারে বর্ণনা করেছে। সংখ্যান্ন বর্ণনা পরিষ্কার ভাষায় করেনি—ইঙ্গিতে করেছে। অর্থাৎ যে উক্তিটি নিভুল ছিল, তার খণ্ডন করেনি। কিন্তু সময়কাল পরিষ্কার ও স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করে বলেছে :

وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا—কারণ এই

যে, এই বর্ণনা পদ্ধতির মাধ্যমে কোরআন একটি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছে। তা এই যে, সংখ্যার আলোচনা একেবারেই অনর্থক। এর সাথে কোন পাখিব ও ধর্মীয় মাস'আলার সম্পর্ক নেই। তবে দীর্ঘকাল পর্যন্ত মানবীয় অভ্যাসের বিরুদ্ধে নিদ্রামগ্ন থাকা এবং পানাহার ছাড়া সুস্থ ও সবল থাকার এরপর দীর্ঘ দিন পর সুস্থ অবস্থায় উঠে বসা—এগুলোর হাশর ও নশরের দৃষ্টান্ত এবং কিয়ামত ও পরকালের প্রমাণ হতে পারে তাই বিষয়টিকে স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে।

যেসব লোক যু'জিয়া ও অভ্যাস বিরোধী ঘটনাবলী অস্বীকার করে, না হয় প্রাচী-শিক্ষা বিশারদ পাশ্চাত্যের ইহুদী ও খৃস্টান লেখক কতৃক উত্থাপিত আপত্তিতে ভীত হয়ে এগুলিতে নানা ধরনের সদর্থ বর্ণনা করার প্রয়াস পায়, তারা আলোচ্য আয়াতেও হয়রত কাতাদাহর তফসীর অবলম্বন করে তিন শত নয় বছরের সময়কাল তৎকালীন লোকদের উক্তি সাবাস্ত করে খণ্ডন করার প্রয়াস পেয়েছে। কিন্তু তারা এ বিষয়ে চিন্তা করেনি যে,

কাহিনীর শুরুতে **سَلْسَلِينَ** বলা হয়েছে, তা আল্লাহ্ তা'আলার উক্তি ছাড়া কারও উক্তি হতে পারে না। অভ্যাসবিরুদ্ধ ঘটনা ও কারামত প্রমাণ করার জন্য কয়েক বছর নিদ্রামগ্ন থেকে সুস্থ ও সবল অবস্থায় উঠে বসা যথেষ্ট। **وَاللَّهُ أَعْلَمُ**

وَأْتِلْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مَبْدَلَ لِكَلِمَاتِهِ ۗ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ۝ وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ

يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدُوَّةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ  
 عَيْنُكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا  
 قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ۝ وَقُلِ الْحَقُّ  
 مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ۚ إِنَّا أَعْتَدْنَا  
 لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ  
 كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ ۖ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ۝ إِنَّ  
 الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ۝  
 أُولَئِكَ لَهُمْ جَدَّتْ عَدَايُنَا تَجْرِبُهُمْ مِنَ تَحْتِهِمْ أَنْتَهُرُ يُجَلُونَ  
 فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ  
 وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَشَابِهِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ ۖ وَحَسُنَتْ  
 مُرْتَفَقًا ۝

(২৭) আগনির প্রতি আপনার পালনকর্তার যে কিতাব প্রত্যাদিষ্ট করা হয়েছে, তা পাঠ করুন। তাঁর বাক্য পরিবর্তন করার কেউ নেই। তাঁকে বাতীত আপনি কখনই কোন আশ্রয়ের স্থান পাবেন না। (২৮) আগনি নিজেকে তাদের সংসর্গে আবদ্ধ রাখুন যারা সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের পালনকর্তাকে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে আহ্বান করে এবং আপনি পৃথিবী জীবনের সৌন্দর্য কামনা করে তাদের থেকে নিজের দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবেন না। যার মনকে আমি আমার সম্বল থেকে গাফিল করে দিয়েছি, যে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং যার কার্যকলাপ হচ্ছে সীমা অতিক্রম করা, আপনি তাঁর অনুগত্য করবেন না। (২৯) বলুন : 'সত্য তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত। অতএব যার ইচ্ছা, বিশ্বাস স্থাপন করুক এবং যার ইচ্ছা জমানা করুক।' আমি জালিমদের জন্য অগ্নি প্রস্তুত করে রেখেছি, যার বেটনী তাদেরকে পরিবেষ্টন করে থাকবে। যদি তারা পানীয় প্রার্থনা করে, তবে পূ'জের ন্যায় পানীয় দেওয়া হবে যা তাদের মুখমণ্ডল দৃষ্ণ করবে। কত নিরুচ্চ পানীয় এবং খুবই মন্দ আশ্রয়! (৩০) যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সং কर्म সম্পাদন করে আমি সংকর্মশীলদের পুরস্কার

নষ্ট করি না। (৩৬) তাদেরই জন্য আছে বসবাসের জায়গাত। তাদের পাদদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয় নহরসমূহ। তাদের তথায় স্বর্ণ-কংকনে অলংকৃত করা হবে এবং তারা পাতলা ও মোটা রেশমের সবুজ কাপড় পরিধান করবে এমতাবস্থায় যে, তারা সিংহাসনে সমাসীন হবে। চমৎকার প্রতিদান এবং কত উত্তম আশ্রয়।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং (আপনার কাজ এতটুকু যে) আপনার প্রতি আপনার পালনকর্তার যে কিতাব নাখিল করা হয়েছে, তা (লোকদের সামনে) পাঠ করুন। (এর বেশি চিন্তা করবেন না যে, বড় লোকেরা যদি ইসলামের বিরোধিতা করতে থাকে, তবে ইসলামের উন্নতি কিভাবে হবে। কেননা! আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং এর ওয়াদা করেছেন। এবং) তাঁর বাক্যকে (অর্থাৎ ওয়াদাসমূহকে) কেউ পরিবর্তন করতে পারবে না। (অর্থাৎ সারা বিশ্বের বিরোধিতার মিলেও আল্লাহকে ওয়াদা পূর্ণ করা থেকে নিরন্তর করতে পারবে না। আল্লাহ নিজে যদিও পরিবর্তন করতে সক্ষম, কিন্তু তিনি পরিবর্তন করবেন না।) এবং (যদি আপনি আল্লাহর বিধান বর্জন করে বড়লোকদের মনোরঞ্জন করেন, তবে) আপনি আল্লাহ ব্যতীত কখনই কোন আশ্রয়ের স্থান পাবেন না। (শরীয়তের প্রমাণাদির ভিত্তিতে আল্লাহর বিধান বর্জন করা রসুলুল্লাহ (সা)-র পক্ষে অসম্ভব, কিন্তু এখানে তাকীদের জন্য অসম্ভবকে ধরে নেওয়ার পর্যায়ে একথা বলা হয়েছে)। এবং (আপনাকে যেমন কাফিরদের ধনী ও বড়লোকদের দিক থেকে বেপরওয়া থাকার আদেশ দেওয়া হয়েছে, তেমনি মুসলমান নিঃস্বদের অবস্থার প্রতি আরও মনোযোগ দেওয়ার জন্য আপনাকে আদেশ করা হচ্ছে। সুতরাং) আপনি নিজেকে তাদের সাথে (উঠাবসার) আবদ্ধ রাখুন, যারা সকাল-সন্ধ্যায় (অর্থাৎ সব সময়) তাদের পালনকর্তার ইবাদত শুধু তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করে (কোন পাখিব ঊদ্দেশ্যে নয়) এবং পাখিব জীবনের সৌন্দর্য কামনা করে আপনি তাদের থেকে নিজের দৃষ্টি (অর্থাৎ মনোযোগ) ফিরিয়ে নেবেন না। (পাখিব জীবনের সৌন্দর্য কামনা করে—অর্থ বড়লোকেরা মুসলমান হয়ে গেলে ইসলামের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে। এ আশ্রিতে বলা হয়েছে যে ধন-সম্পদ দ্বারা ইসলামের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায় না, বরং আন্ত-নিকতা ও আনুগত্য দ্বারা বৃদ্ধি পায়। দরিদ্র মুসলমানদের মধ্যেও আন্তনিকতা ও আনুগত্য থাকলে তাতে ইসলামের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে। (গরীব মুসলমানদেরকে মজলিস থেকে সরিয়ে দেওয়া সম্পর্কে) এরূপ ব্যক্তির আবদার মানবেন না, যার মনকে আমি (তার হঠকান্ধিতার শাস্তিস্বরূপ) আমার সম্মুখ থেকে গাফিল করে রেখেছি। সে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং তার এ অবস্থা (অর্থাৎ প্রবৃত্তির অনুসরণ) সীমা অতিক্রম করেছে। আপনি (সে কাফির সরদারদেরকে বলে দিন : (এ) সত্য (ধর্ম) তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত। অতএব যার ইচ্ছা, বিশ্বাস স্থাপন করুক আশ্রয় ইচ্ছা, কাফির থাকুক। (আমার কোন লাভ ক্ষতি নেই। লাভ ক্ষতি স্বয়ং তারই। তা এই যে) নিশ্চয় আমি জালিমদের জন্য (দোষখের) আঙুন প্রস্তুত করে রেখেছি, যার বলয় তাদেরকে পরিবেষ্টন করবে। (অর্থাৎ বলয়গুলোও আঙুনের তৈরি। হাদীসে রয়েছে.

তারা এই বলয় অতিক্রম করতে পারবে না।) যদি তারা (পিপাসায় কাতর হয়ে) পানীয় প্রার্থনা করে, তবে এমন পানীয় দ্বারা তাদের প্রার্থনা পূর্ণ করা হবে, যা (কুশ্রী হওয়ার দিক দিয়ে) তেলের গানের মত হবে (এবং এত উত্তপ্ত হবে যে, কাছে আনতেই) মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে। (ফলে মুখমণ্ডলের চামড়া উঠে যাবে। হাদীসে তাই বলা হয়েছে।) কতই না নিকৃষ্ট হবে সে পানীয় এবং কতই না মন্দ জামগা হবে সে দোষ। (এ হচ্ছে বিশ্বাস স্থাপন না করার ক্রটি। এখন বিশ্বাস স্থাপন করার লাভ বর্ণিত হচ্ছে —) নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎ কর্ম সম্পাদন করে, আমি সৎ কর্মীদের প্রতিদান নষ্ট করি না। এমন লোকদের জন্য সর্বদা বসবাসের বাগান রয়েছে। তাদের (বাসস্থানের) তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হবে নহর। তাদেরকে সেখানে স্বর্ণ-কংকনে অলংকৃত করা হবে এবং তারা পাতলা ও মোটা রেশমের সবুজ পশ্মিধেয় পশ্মিধান করবে (এবং) সেখানে সিংহাসনে হেলান দিয়ে উপবেশন করবে। কি চমৎকার প্রতিদান এবং (জান্নাত) কতই না উত্তম আশ্রয়।

### জানুবারিক জাতব্য বিষয়

দাওয়াত ও তাবলীগের বিশেষ রীতি : **وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ** এ আয়াতের শানে-

নুযুল প্রসঙ্গে কয়েকটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। সবগুলোই আয়াত অবতরণের কারণ হতে পারে। বগদী বর্ণনা করেন, মক্কার সরদার ওয়ায়না ইবনে হিস্ন রসূলুল্লাহ (স)-র দরবারে উপস্থিত হয়। তখন তাঁর কাছে হযরত সালমান ফারেসী (রা) উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি ছিলেন দরিদ্র সাহাবীদের অন্যতম। তাঁর পোশাক ছিন্ন এবং আকার-আকৃতি ফকীরের মত ছিল। তাঁর মত আশ্রও কিছুসংখ্যক দরিদ্র ও নিঃস্ব সাহাবী মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। ওয়ায়না বলল : এই লোকদের কারণেই আমরা আপনার কাছে আসতে পারি না এবং আপনার কথা শুনতে পারি না। এমন ছিন্নমূল মানুষের কাছে আমরা বসতে পারি না। আপনি হয় তাদেরকে মজলিস থেকে সরিয়ে রাখুন, না হয় আমাদের জন্য আলাদা এবং তাদের জন্য আলাদা মজলিস অনুষ্ঠান করুন।

ইবনে যব্বার ইহ, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের রেওয়াজেতে বর্ণনা করেন যে, উমাইয়া ইবনে খলফ জমহী রসূলুল্লাহ (স)-কে পরামর্শ দেন যে, দরিদ্র, নিঃস্ব ও ছিন্নমূল মুসলমানদেরকে আপনি নিজের কাছে রাখবেন না, বরং কুরায়শ সরদারদেরকে সাথে রাখুন। এরা আপনার ধর্মে দীক্ষিত হয়ে গেলে ধর্মের ধুব উন্নতি হবে।

এ ধরনের ঘটনার পরিপ্ৰেক্ষিতে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়—এতে তাদের পরামর্শ গ্রহণ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। শুধু নিষেধই নয়—আদেশ দেওয়া

হয়েছে যে, **وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ**—অর্থাৎ আপনি নিজেকে তাদের সাথে বেঁধে রাখুন।

এর অর্থ এরূপ নয় যে, কোন সময় পৃথক হবেন না। বরং উদ্দেশ্য এই যে, সম্পর্ক ও মনোযোগ তাদের প্রতি নিবদ্ধ রাখুন। কাজে-কর্মে তাদের কাছ থেকেই পরামর্শ নিন।





أَكُلَهَا وَلَمْ تَظَلِمِ مِنْهُ شَيْئًا ۖ وَذَجَرْنَا خِلَاءَهُمْ نَهَارًا ۖ وَكَانَ لَهُ  
 ثَمَرٌ ۖ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ  
 نَفْرًا ۖ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ۖ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ  
 تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا ۖ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً ۖ وَلَئِنْ رُدِدْتُ  
 إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ۖ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ  
 وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ  
 نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّكَ رَجُلًا ۖ لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ  
 بِرَبِّي أَحَدًا ۖ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ ۖ  
 لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ۖ إِنْ تَرَىٰ أَنَا أَقْلَمَ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا ۖ  
 فَعَسَىٰ رَبِّي أَنْ يُوْتِيَنَّ خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا  
 حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ۖ أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا  
 غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا ۖ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأُصْبِحَ يُقْلِبُ  
 كَفْبِهِ عَلَىٰ مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ  
 يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا ۖ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ  
 مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ۖ هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ  
 الْحَقِّ ۖ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ۖ

(৩২) আপনি তাদের কাছে দু'শক্তির উদাহরণ বর্ণনা করুন। আমি তাদের একজনকে দু'টি আঙ্গুরের বাগান দিয়েছি এবং এ দু'টিকে খর্জুর রূপে ছারা পরিবেষ্টিত করেছি এবং দু'-এর মাঝখানে করেছি শস্যক্ষেত্র। (৩৩) উভয় বাগানই ফসলাদান করে

এবং তা থেকে কিছুই হ্রাস করত না এবং উভয়ের ফাঁকে ফাঁকে আমি নহর প্রবাহিত করেছি। (৩৪) সে ফল গেল। অতঃপর কথা প্রসঙ্গে সন্নীকে বলল : আমার ধন-সম্পদ তোমার চাইতে বেশী এবং জনবলে আমি অধিক শক্তিশালী। (৩৫) নিজের প্রতি জুলুম করে সে তার বাগানে প্রবেশ করল। সে বলল : আমার মনে হয় না যে, এ বাগান কখনও ধ্বংস হয়ে যাবে। (৩৬) এবং আমি মনে করি না যে, কিয়ামত অনূর্নিত হবে। যদি কখনও আমার পালনকর্তার কাছে আমাকে পৌঁছে দেওয়া হয়, তবে সেখানে এর চাইতে উৎকৃষ্ট পাব। (৩৭) তার সন্নী তাকে কথা প্রসঙ্গে বলল : তুমি তাঁকে অস্বীকার করছ, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, অতঃপর বীর্ষ থেকে, অতঃপর পূর্ণাঙ্গ করেছেন তোমাকে মানবাকৃতিতে? (৩৮) কিন্তু আমি তো একথাই বলি, আল্লাহ্‌ই আমার পালনকর্তা এবং আমি কাউকে আমার পালনকর্তার শরীক মানি না। (৩৯) যদি তুমি আমাকে ধনে ও সন্তানে তোমার চাইতে কম দেখ, তবে যখন তুমি তোমার বাগানে প্রবেশ করলে তখন একথা কেন বললে না; আল্লাহ্‌ যা চান, তাই হয়। আল্লাহ্র দেওয়া ব্যতীত কোন শক্তি নেই। (৪০) জাশা করি আমার পালনকর্তা আমাকে তোমার বাগান অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কিছু দেবেন এবং তার (তোমার বাগানের) উপর আসমান থেকে আশুন প্রেরণ করবেন। অতঃপর সকাল বেলায় তা পরিষ্কার ময়দান হয়ে যাবে। (৪১) অথবা সকালে তার পানি শুকিয়ে যাবে। অতঃপর তুমি তা তালাশ করে জানতে পারবে না। (৪২) অতঃপর তার সব ফল ধ্বংস হয়ে গেল এবং সে তাতে যা ব্যয় করেছিল, তার জন্য সকলে হাত কচলিয়ে আরুপ করতে লাগল। বাগানটি কাঠসহ পুড়ে গিয়েছিল। সে বলতে লাগল : হায়, আমি যদি কাউকে আমার পালনকর্তার সাথে শরীক না করতাম! (৪৩) আল্লাহ্‌ ব্যতীত তাকে সাহায্য করার কোন লোক হল না এবং সে নিজেও প্রতিকার করতে পারল না। (৪৪) এরূপ ক্ষেত্রে সব অধিকার সত্য আল্লাহ্র। তারই পুরস্কার উত্তম এবং তারই প্রদত্ত প্রতিদান শ্রেষ্ঠ।

### তক্ষসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং আপনি (দুনিয়ার ক্ষণভঙ্গুরতা ও পরকালের স্থায়িত্ব প্রকাশ করার জন্য) দু'বাক্তির উদাহরণ (যাদের মধ্যে বন্ধুত্ব ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল) বর্ণনা করুন (যাতে কাফিরদের ধারণা বাতিল হয়ে যায় এবং মুসলমানরা সান্ত্বনা লাভ করে)। তাদের এক-জনকে (যে ধর্মবিমূখ ছিল) আমি আঙ্গুরের দু'টি বাগান দিয়েছিলাম এবং এ দু'টিকে খর্জুর বৃক্ষ দ্বারা পরিবেষ্টিত করেছিলাম এবং উভয় (বাগান) এর মাঝখানে করেছিলাম শস্যক্ষেত্র। উভয় বাগান পুরোপুরি ফলদান করত এবং কোনটির ক্ষেতেই সামান্যও ঝুটি হত না (সাধারণ বৃক্ষ এর বিপরীত। কোন সময় কোন বৃক্ষে এবং কোন বছর সব বৃক্ষে ফল কম আসে।) এবং উভয় বাগানের ফাঁকে ফাঁকে নহর প্রবাহিত করেছিলাম। তার কাছে অন্নও ধনসম্পদ ছিল। অতঃপর (একদিন) সে সন্নীকে কথা প্রসঙ্গে বলল : আমার ধনসম্পদ তোমার চাইতে বেশী এবং জনবলেও আমি অধিক শক্তিশালী। (উদ্দেশ্য এই যে, তুমি আমার পথকে বাতিল এবং আল্লাহ্র কাছে অপছন্দনীয় বলে থাক। এখন তুমি নিজেই

দেখে নাও যে, কে ভাল? তোমার দাবী সত্যিক হলে ব্যাপার উল্টো হত। কেননা, শত্রুকে কেউ ধনৈর্ঘর্য দান করে না এবং বন্ধুকে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত করে না।) এবং সে (সঙ্গীকে সাথে নিয়ে) নিজের উপর অপরাধ (কুফর) প্রতিষ্ঠিত করতে করতে বাগানে প্রবেশ করল (এবং) বলল: আমি তো মনে করি না যে, এই বাগান (আমার জীবদ্দশায়) কখনও বন্দবাদ হয়ে যাবে। (এ থেকে বোঝা গেল যে, সে আল্লাহর অস্তিত্ব ও তাঁর কুদরতে বিশ্বাসী ছিল না। শুধু বাহ্যিক হিকামতের ব্যবস্থা দেখে সে একথা বলেছে)। এবং (এমনিভাবে) আমার মনে হয় না যে, কিয়ামত হবে এবং যদি (অসম্ভবকে ধরে নেওয়ার পর্যায়ে) কিয়ামত হয়েই যায় এবং আমি আমার পালনকর্তার কাছে পৌঁছানো হই (যেমন, তুমি মনে কর) তবে অবশ্যই এ বাগানের চাইতে অনেক উত্তম জায়গা আমি পাব। কেননা, জাহা্নতের জায়গা যে দুনিয়া থেকে উত্তম, তা-তো তুমিও স্বীকার কর। একথাও তুমি স্বীকার কর যে, জাহা্নত আল্লাহর প্রিয় বাসান্দা পাবে। আমি যে প্রিয় এর লক্ষণাদি তো দুনিয়াতেই দেখতে পাই। আমি আল্লাহর প্রিয় না হলে এমন বাগান কিরূপে পেতাম। তাই তোমার স্বীকারোক্তি অনুযায়ীও আমি সেখানে দুনিয়ার চাইতে উত্তম বাগান পাব। (তার এসব কথা শুনে) তার (দীনদার দরিদ্র) সঙ্গী বলল: তুমি কি (তওহীদ ও কিয়ামত অস্বীকারের মাধ্যমে) তাকে অস্বীকার করছ যিনি তোমাকে (প্রথমে) মাটি থেকে [হযরত আদম (আ)-এর মধ্যস্থতায়] সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর (তোমাকে) বাঁস থেকে (মাতৃগর্ভে সৃষ্টি করেছেন এবং) অতঃপর তোমাকে সুস্থ-সবল মানুষ বানিয়েছেন? (এতদসত্ত্বেও তুমি যদি তওহীদ ও কিয়ামত অস্বীকার করতে চাও কর) কিন্তু আমি বিশ্বাস রাখি যে, আল্লাহ্ আমার পালনকর্তা এবং আমি তাঁর সাথে কাউকে শরীক করি না। (আল্লাহর একত্ব ও কুদরত যখন প্রত্যেক বস্তুর উপর প্রতিষ্ঠিত তখন বাগানের উন্নতি ও হিকামতের সব ব্যবস্থা যে কোন সময় একেজো হয়ে বাগান ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। তাই মহা ব্যবস্থাপক আল্লাহর প্রতি দৃষ্টি রাখাই তোমার উচিত ছিল।) তুমি যখন তোমার বাগানে পৌঁছেছিলে, তখন একথা কেন বললে না যে, আল্লাহ্ যা চান, তাই হয় (এবং) আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত (কারও) কোন শক্তি নেই। (যত দিন আল্লাহ্ চাইবেন, এ বাগান থাকবে এবং যখন চাইবেন ধ্বংস হয়ে যাবে)। যদি তুমি আমাকে ধনসম্পদ ও সম্ভানে কম দেখ (যে কারণে তুমি নিজেকে প্রিয় মনে করছ), তবে আমি সে সময়টি নিকটবর্তী দেখছি, যখন আমার পালনকর্তা আমাকে তোমার বাগানের চাইতে উত্তম বাগান দেবেন (দুনিয়াতেই কিংবা পরকালে) এবং তার (অর্থাৎ তোমার বাগানের) উপর আসমান থেকে কোন নির্ধারিত বিপদ (অর্থাৎ সাধারণ কারাগারের মধ্যস্থতা ছাড়াই) প্রেরণ করবেন। ফলে বাগানটি হঠাৎ একটি পল্লিকার ময়দান হয়ে যাবে অথবা তার পানি (যা নহেরে প্রবাহিত রয়েছে) সম্পূর্ণ নিশেন (ভূগর্ভে) নেমে (শুকিয়ে) যাবে। অতঃপর তুমি (তা পুনর্বার আনার ও বের করার) চেষ্টাও করতে পারবেন না। (এখানে ধার্মিক সঙ্গী অধার্মিকের বাগানের জওলাব দিয়েছে), কিন্তু সম্ভান সম্পর্কে কোন জওলাব দেয়নি। এর কারণ সম্ভবত এই যে, সম্ভানের প্রাচুর্য তখনই সূক্ষর হয় যখন তাদের লাজন-পাজনের জন্য প্রচুর অর্থ-সম্পদও থাকে। অন্যথায় তা বিপদ বৈ নয়। এ বাফের সারমর্ম এই যে, দুনিয়াতে আল্লাহ্ তোমাকে

ধনেস্বর্ষ দান করেছেন, এটাই তোমার কুবিশ্বাসী হওয়ার কারণ। ধন-সম্পদকে তুমি আল্লাহর প্রিয় হওয়ার লক্ষণ মনে করে নিয়েছ এবং আমার ধন-সম্পদ নেই বলে তুমি আমাকে আল্লাহর অপ্রিয় মনে করছ। দুনিয়ার ধনদৌলতকে আল্লাহর প্রিয় হওয়ার ভিত্তি মনে করাটাই বড় ধোঁকা ও বিভ্রান্তি। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দুনিয়ার নিয়ামত সাপ, বিপ্লু, ব্যাঘ্র ও দুর্ভিক্ষ সবাইকে দান করেন। পরকালের নিয়ামতই আল্লাহর কাছে প্রিয় হওয়ার আসল মাপকাঠি। পরকালের নিয়ামত অক্ষয় এবং দুনিয়ার নিয়ামত ধ্বংসশীল) এবং (এই কথাবার্তার পর ঘটনা এই ঘটল যে) তার সব ধনসম্পদ ধ্বংস হয়ে গেল এবং সে তাতে যা ব্যয় করেছিল তার জন্য হাত কচলিয়ে আক্ষেপ করতে লাগল। বাগানটি কাঠামোসহ ভুমিসাৎ হয়ে গিয়েছিল। সে বলতে লাগলঃ হায় আমি যদি কাউকে আমার পালনকর্তার সাথে শরীক না করতাম। (এ থেকে জানা গেল যে, বাগান ধ্বংস হওয়ার পর তার বুঝতে বাধী রইল না যে, কুফর ও শিরকের কারণেই এ বিপদ এসেছে। কুফর না করলে প্রথমত বোধ হয় এ বিপদই আসত না, আর এলেও তার প্রতিদান পরকালে পাওয়া যেত। এখন ইহকাল ও পরকাল উভয় ক্ষেত্রে শুধু ক্ষতিই ক্ষতি। কিন্তু এতটুকু আফসোস ও পন্থিতাপ দ্বারা তার ঈমান প্রমাণিত হয় না। কেননা এই পন্থিতাপ দুনিয়ার ক্ষতির কারণে হয়েছে। অতঃপর আল্লাহর তওহীদ ও কিয়ামতের স্বীকৃতি প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তাকে মুমিন বলা যায় না।) এবং আল্লাহ বাতীত তাকে সাহায্য করার কোন লোকজন হল না (সে নিজের জনবল ও সন্তানাদির উপর গর্ব করত, তাও শেষ হল।) এবং সে নিজে (আমার কাছে থেকে) প্রতিশোধ নিতে পারল না। এরূপ ক্ষেত্রে সাহায্য করা একমাত্র সত্য আল্লাহরই কাজ। (পরকালেও) তারই সওয়াব সর্বোত্তম এবং (দুনিয়াতেও) তাঁরই পুরস্কার সর্বশ্রেষ্ঠ (অর্থাৎ প্রিয় বান্দাদের কোন ক্ষতি হয়ে গেলে উভয় জাহানে তার শুভ ফল পাওয়া যায়, কিন্তু কাফির পুরোপুরিই ক্ষতিগ্রস্ত হয়)।

### আনুশঙ্গিক জাতব্য বিষয়

ثُمَّ - وَكَانَ لَكُمْ ثَمْرٌ শব্দের অর্থ বৃক্ষের ফল এবং সাধারণ ধনসম্পদ। এখানে

হযরত ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ ও কাতাদাহ থেকে দ্বিতীয় অর্থ বর্ণিত হয়েছে। (ইবনে কাসীর) কামুস গ্রন্থে আছে, ثُمَّ শব্দটি বৃক্ষের ফল এবং নানা বস্তুধর্মের ধন-সম্পদের অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ থেকে জানা যায় যে, লোকটির কাছে শুধু ফলের বাগান ও শস্যক্ষেত্রই ছিল না, বরং স্বর্ণ-রৌপ্য ও বিলাস-ব্যসনের যাবতীয় সাজসরঞ্জামও বিদ্যমান ছিল। স্বয়ং তার বাক্য, যা কোরআনে বর্ণিত হয়েছে **لَا أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَا لَا** ও এ অর্থই বোঝায়।

مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ—শো'আবুল ঈমানে হযরত আনাসের রেওয়াজে

ক্রমে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ কোন পছন্দনীয় বস্তু দেখার পর যদি

مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ বলে দেওয়া হয়, তবে কোন বস্তু তার ক্ষতি করতে

পান্নবে না। (অর্থাৎ পছন্দনীয় বস্তুটি নিরাপদ থাকবে) কোন কোন স্নেহম্মতে আছে, প্রিয় ও পছন্দনীয় বস্তু দেখে এই কলেমা পাঠ করলে তা 'চোখ লাগা' বা বদ নজর থেকে নিরাপদ থাকবে।

حَسْبَانَا—হযরত কাতাদাহরু মতে এর তফসীর আশাব। ইবনে আব্বাস

এর অর্থ নিয়েছেন অগ্নি এবং কেউ কেউ অর্থ নিয়েছেন প্রসঙ্গ বর্ষণ। <sup>وَأُحِيطُ بِثَمَرِهِ</sup> এর

বাহ্যিক অর্থ এই যে, তার বাগান ও ধনসম্পদের উপর কোন নৈসর্গিক বিপদ পতিত হল। ফলে সব ধ্বংস হয়ে গেল। কোরআন পরিষ্কার ভাবে কোন বিশেষ বিপদের নামোল্লেখ করেনি। বাহ্যত বোঝা যায় যে, কোন নৈসর্গিক আগুন এসে সবগুলো জ্বালিয়ে দিয়েছে। যেমন, হযরত ইবনে আব্বাস থেকেও <sup>حَسْبَانَا</sup> শব্দের তফসীরে আগুনই বর্ণিত আছে। <sup>وَاللَّهُ أَعْلَمُ</sup>

وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ

فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيحُ وَكَانَ

اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ۝ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ

الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرًا أَمْ لَمْ

وَيَوْمَ نُسَبِّحُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ

مِنْهُمْ أَحَدًا ۝ وَعَرَضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفَاءً لَقَدْ حِثَّمْتُمْ مَتَاعًا

خَلَقْتُمْ أَوْلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا ۝

وَوَضِعَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ

وَيَقُولُونَ يَوْمَئِذٍ هَذَا الْكِتَابُ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا

كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا ۖ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ

رَبُّكَ أَحَدًا ۝

(৪৫) তাদের কাছে পাখিব জীবনের উপমা বর্ণনা করুন। তা পানির ন্যায় যা আমি আকাশ থেকে নাখিল করি। অতঃপর এর সংমিশ্রণে শ্যামল-সবুজ ভূমি জ লতা-পাতা নির্গত হয়, অতঃপর তা এমন গুরু চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় যে, বাতাসে উড়ে যায়। আল্লাহ এ সবকিছুর উপর শক্তিমান। (৪৬) ধনৈর্ধর্য ও সন্তান-সন্ততি পাখিব জীবনের সৌন্দর্য এবং স্থায়ী সৎকর্মসমূহ আপনার পালনকর্তার কাছে প্রতিদান প্রাপ্তি ও আশা লাভের জন্য উত্তম। (৪৭) যেদিন আমি পর্বতসমূহকে পরিচালনা করব এবং আপনি পৃথিবীকে দেখবেন একটি উন্মুক্ত প্রান্তর এবং আমি মানুষকে একত্র করব অতঃপর তাদের কাউকে ছাড়ব না। (৪৮) তারা আপনার পালনকর্তার সামনে গণ হবে সান্নি-বদ্ধভাবে এবং বলি হবে : তোমরা আমার কাছে এসে গেছ; যেমন তোমাদেরকে প্রথম বার সৃষ্টি করেছিলাম। না, তোমরা তো বলতে যে, আমি তোমাদের জন্য কোন প্রতিশ্রুত সময় নির্দিষ্ট করব না। (৪৯) আর আমলনামা সামনে রাখা হবে। তাতে যা আছে; তার কারণে আপনি অপরাধীদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত দেখবেন। তারা বলবে : হায় অফসোস, এ কেমন আমলনামা! এ যে ছোট বড় কোন কিছুই বাদ দেয়নি --- সবই এতে রয়েছে। তারা তাদের কৃতকর্মকে সামনে উপস্থিত পাবে। আপনার পালনকর্তা কারও প্রতি জুলুম করবেন না।

#### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(ইতিপূর্বে পাখিব জীবন ও তার রূপভঙ্গুরতা একটি ব্যক্তিগত উদাহরণের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছিল। এখন এ বিষয়টিই একটি সামগ্রিক দৃষ্টান্তের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হচ্ছে।) আপনি তাদের কাছে পাখিব জীবনের উদাহরণ বর্ণনা করুন; তা পানির ন্যায় যা আমি আকাশ থেকে নাখিল করি। অতঃপর এর (পানি) দ্বারা ভূমি জ উদ্ভিদ খুব ঘন হয়ে উঠে। অতঃপর তা (সে সবুজ-শ্যামল ও তরতাজা হওয়ার পর শুকিয়ে) এমন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় যে, বাতাসে উড়ে যায়। (দুনিয়ার অবস্থাও তাই। আজ সুখ-স্বাস্থ্যসৌন্দর্যের দেখা গেলে কাল তার নাম-নিশানাও অবশিষ্ট থাকবে না।) আল্লাহ তা'আলা সব কিছুর উপর শক্তিমান। (যখন ইচ্ছা, সৃষ্টি করেন---উন্নতি দান করেন এবং যখন ইচ্ছা, ধ্বংস করে দেন। পাখিব জীবনের যখন এই অবস্থা এবং ধনৈর্ধর্য ও সন্তান-সন্ততি (যখন) পাখিব জীবনের শোভা (এবং তারাই আনুমানিক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত, তখন স্বয়ং ধনৈর্ধর্য ও সন্তান-সন্ততি তো আরও বেশী দ্রুত ধ্বংসশীল হবে।) এবং স্বীয় সৎ-কর্মসমূহ আপনার পরওয়ারদিগারের কাছে (অর্থাৎ পরকালে এ দুনিয়ার চাইতে) প্রতিদানের দিক দিয়েও (হাজার গুণ) উত্তম এবং আশার দিক দিয়েও (হাজার গুণ) উত্তম। (অর্থাৎ সৎ কর্ম দ্বারা যেসব আশা করা হয়, সেগুলো পরকালে অবশ্যই পূর্ণ হবে এবং আশার চাইতেও বেশী সওয়াব পাওয়া যাবে। দুনিয়ার আসবাবপত্র এর বিপরীত। এর দ্বারা দুনিয়াতেও মানুষের আশা পূর্ণ হয় না এবং পরকালে তো আশা পূরণের কোন সম্ভাবনাই নেই।) সেদিনের কথা স্মরণ করা উচিত, যেদিন আমি পাহাড়গুলো (তাদের অবস্থান থেকে) সরিয়ে দেব (প্রথমে এরূপ হবে। তারপর পাহাড়গুলো চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে

যাবে।) এবং আপনি পৃথিবীকে দেখবেন একটি উন্মুক্ত প্রান্তর (কেননা পাহাড়-পর্বত, বৃক্ষলতা, ঘনবাড়ী ইত্যাদি কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না) এবং আমি সবাইকে (কবর থেকে উদ্ধৃত করে হাশরের ময়দানে) সমবেত করব এবং (সেখানে না এনে) তাদের কাউকে ছাড়বে না। তারা সবাই আপনার পালনকর্তার সামনে (অর্থাৎ হিসাবের কাঠ-গড়ায়) সান্নিধ্যভাবে পেশ হবে (কেউ কারও আড়ালে আত্মগোপন করার সুযোগ পাবে না। তাদের মধ্যে যারা কিয়ামত অস্বীকার করত, তাদেরকে বলা হবে : ) দেখ শেষ পর্যন্ত তোমরা আমার কাছে (পুনর্জন্ম লাভ করে) এসে গেছ; যেমন আমি তোমাদেরকে প্রথমবার (অর্থাৎ দুনিয়াতে) সৃষ্টি করেছিলাম (কিন্তু তোমরা প্রথম জন্ম দেখা সত্ত্বেও এ পুনর্জন্মে বিশ্বাসী হওনি) বরং তোমরা মনে করত যে, আমি তোমাদের (পুনর্জন্ম সৃষ্টির জন্য) কোন প্রতিশ্রুত সময় নির্দিষ্ট করব না। আর আমলনামা (ডান হাতে অথবা বাম হাতে দিয়ে তার সামনে) রেখে দেওয়া হবে, (যেমন; অন্য এক আয়াতে আছে <sup>٨٥٨</sup> <sup>٨٥٩</sup> <sup>٨٦٠</sup> <sup>٨٦١</sup> <sup>٨٦٢</sup> <sup>٨٦٣</sup> <sup>٨٦٤</sup> <sup>٨٦٥</sup> <sup>٨٦٦</sup> <sup>٨٦٧</sup> <sup>٨٦٨</sup> <sup>٨٦٩</sup> <sup>٨٧٠</sup> <sup>٨٧١</sup> <sup>٨٧٢</sup> <sup>٨٧٣</sup> <sup>٨٧٤</sup> <sup>٨٧٥</sup> <sup>٨٧٦</sup> <sup>٨٧٧</sup> <sup>٨٧٨</sup> <sup>٨٧٩</sup> <sup>٨٨٠</sup> <sup>٨٨١</sup> <sup>٨٨٢</sup> <sup>٨٨٣</sup> <sup>٨٨٤</sup> <sup>٨٨٥</sup> <sup>٨٨٦</sup> <sup>٨٨٧</sup> <sup>٨٨٨</sup> <sup>٨٨٩</sup> <sup>٨٩٠</sup> <sup>٨٩١</sup> <sup>٨٩٢</sup> <sup>٨٩٣</sup> <sup>٨٩٤</sup> <sup>٨٩٥</sup> <sup>٨٩٦</sup> <sup>٨٩٧</sup> <sup>٨٩٨</sup> <sup>٨٩٩</sup> <sup>٩٠٠</sup> <sup>٩٠١</sup> <sup>٩٠٢</sup> <sup>٩٠٣</sup> <sup>٩٠٤</sup> <sup>٩٠٥</sup> <sup>٩٠٦</sup> <sup>٩٠٧</sup> <sup>٩٠٨</sup> <sup>٩٠٩</sup> <sup>٩١٠</sup> <sup>٩١١</sup> <sup>٩١٢</sup> <sup>٩١٣</sup> <sup>٩١٤</sup> <sup>٩١٥</sup> <sup>٩١٦</sup> <sup>٩١٧</sup> <sup>٩١٨</sup> <sup>٩١٩</sup> <sup>٩٢٠</sup> <sup>٩٢١</sup> <sup>٩٢٢</sup> <sup>٩٢٣</sup> <sup>٩٢٤</sup> <sup>٩٢٥</sup> <sup>٩٢٦</sup> <sup>٩٢٧</sup> <sup>٩٢٨</sup> <sup>٩٢٩</sup> <sup>٩٣٠</sup> <sup>٩٣١</sup> <sup>٩٣٢</sup> <sup>٩٣٣</sup> <sup>٩٣٤</sup> <sup>٩٣٥</sup> <sup>٩٣٦</sup> <sup>٩٣٧</sup> <sup>٩٣٨</sup> <sup>٩٣٩</sup> <sup>٩٤٠</sup> <sup>٩٤١</sup> <sup>٩٤٢</sup> <sup>٩٤٣</sup> <sup>٩٤٤</sup> <sup>٩٤٥</sup> <sup>٩٤٦</sup> <sup>٩٤٧</sup> <sup>٩٤٨</sup> <sup>٩٤٩</sup> <sup>٩٥٠</sup> <sup>٩٥١</sup> <sup>٩٥٢</sup> <sup>٩٥٣</sup> <sup>٩٥٤</sup> <sup>٩٥٥</sup> <sup>٩٥٦</sup> <sup>٩٥٧</sup> <sup>٩٥٨</sup> <sup>٩٥٩</sup> <sup>٩٦٠</sup> <sup>٩٦١</sup> <sup>٩٦٢</sup> <sup>٩٦٣</sup> <sup>٩٦٤</sup> <sup>٩٦٥</sup> <sup>٩٦٦</sup> <sup>٩٦٧</sup> <sup>٩٦٨</sup> <sup>٩٦٩</sup> <sup>٩٧٠</sup> <sup>٩٧١</sup> <sup>٩٧٢</sup> <sup>٩٧٣</sup> <sup>٩٧٤</sup> <sup>٩٧٥</sup> <sup>٩٧٦</sup> <sup>٩٧٧</sup> <sup>٩٧٨</sup> <sup>٩٧٩</sup> <sup>٩٨٠</sup> <sup>٩٨١</sup> <sup>٩٨٢</sup> <sup>٩٨٣</sup> <sup>٩٨٤</sup> <sup>٩٨٥</sup> <sup>٩٨٦</sup> <sup>٩٨٧</sup> <sup>٩٨٨</sup> <sup>٩٨٩</sup> <sup>٩٩٠</sup> <sup>٩٩١</sup> <sup>٩٩٢</sup> <sup>٩٩٣</sup> <sup>٩٩٤</sup> <sup>٩٩٥</sup> <sup>٩٩٦</sup> <sup>٩٩٧</sup> <sup>٩٩٨</sup> <sup>٩٩٩</sup> <sup>١٠٠٠</sup> <sup>١٠٠١</sup> <sup>١٠٠٢</sup> <sup>١٠٠٣</sup> <sup>١٠٠٤</sup> <sup>١٠٠٥</sup> <sup>١٠٠٦</sup> <sup>١٠٠٧</sup> <sup>١٠٠٨</sup> <sup>١٠٠٩</sup> <sup>١٠١٠</sup> <sup>١٠١١</sup> <sup>١٠١٢</sup> <sup>١٠١٣</sup> <sup>١٠١٤</sup> <sup>١٠١٥</sup> <sup>١٠١٦</sup> <sup>١٠١٧</sup> <sup>١٠١٨</sup> <sup>١٠١٩</sup> <sup>١٠٢٠</sup> <sup>١٠٢١</sup> <sup>١٠٢٢</sup> <sup>١٠٢٣</sup> <sup>١٠٢٤</sup> <sup>١٠٢٥</sup> <sup>١٠٢٦</sup> <sup>١٠٢٧</sup> <sup>١٠٢٨</sup> <sup>١٠٢٩</sup> <sup>١٠٣٠</sup> <sup>١٠٣١</sup> <sup>١٠٣٢</sup> <sup>١٠٣٣</sup> <sup>١٠٣٤</sup> <sup>١٠٣٥</sup> <sup>١٠٣٦</sup> <sup>١٠٣٧</sup> <sup>١٠٣٨</sup> <sup>١٠٣٩</sup> <sup>١٠٤٠</sup> <sup>١٠٤١</sup> <sup>١٠٤٢</sup> <sup>١٠٤٣</sup> <sup>١٠٤٤</sup> <sup>١٠٤٥</sup> <sup>١٠٤٦</sup> <sup>١٠٤٧</sup> <sup>١٠٤٨</sup> <sup>١٠٤٩</sup> <sup>١٠٥٠</sup> <sup>١٠٥١</sup> <sup>١٠٥٢</sup> <sup>١٠٥٣</sup> <sup>١٠٥٤</sup> <sup>١٠٥٥</sup> <sup>١٠٥٦</sup> <sup>١٠٥٧</sup> <sup>١٠٥٨</sup> <sup>١٠٥٩</sup> <sup>١٠٦٠</sup> <sup>١٠٦١</sup> <sup>١٠٦٢</sup> <sup>١٠٦٣</sup> <sup>١٠٦٤</sup> <sup>١٠٦٥</sup> <sup>١٠٦٦</sup> <sup>١٠٦٧</sup> <sup>١٠٦٨</sup> <sup>١٠٦٩</sup> <sup>١٠٧٠</sup> <sup>١٠٧١</sup> <sup>١٠٧٢</sup> <sup>١٠٧٣</sup> <sup>١٠٧٤</sup> <sup>١٠٧٥</sup> <sup>١٠٧٦</sup> <sup>١٠٧٧</sup> <sup>١٠٧٨</sup> <sup>١٠٧٩</sup> <sup>١٠٨٠</sup> <sup>١٠٨١</sup> <sup>١٠٨٢</sup> <sup>١٠٨٣</sup> <sup>١٠٨٤</sup> <sup>١٠٨٥</sup> <sup>١٠٨٦</sup> <sup>١٠٨٧</sup> <sup>١٠٨٨</sup> <sup>١٠٨٩</sup> <sup>١٠٩٠</sup> <sup>١٠٩١</sup> <sup>١٠٩٢</sup> <sup>١٠٩٣</sup> <sup>١٠٩٤</sup> <sup>١٠٩٥</sup> <sup>١٠٩٦</sup> <sup>١٠٩٧</sup> <sup>١٠٩٨</sup> <sup>١٠٩٩</sup> <sup>١١٠٠</sup> <sup>١١٠١</sup> <sup>١١٠٢</sup> <sup>١١٠٣</sup> <sup>١١٠٤</sup> <sup>١١٠٥</sup> <sup>١١٠٦</sup> <sup>١١٠٧</sup> <sup>١١٠٨</sup> <sup>١١٠٩</sup> <sup>١١١٠</sup> <sup>١١١١</sup> <sup>١١١٢</sup> <sup>١١١٣</sup> <sup>١١١٤</sup> <sup>١١١٥</sup> <sup>١١١٦</sup> <sup>١١١٧</sup> <sup>١١١٨</sup> <sup>١١١٩</sup> <sup>١١٢٠</sup> <sup>١١٢١</sup> <sup>١١٢٢</sup> <sup>١١٢٣</sup> <sup>١١٢٤</sup> <sup>١١٢٥</sup> <sup>١١٢٦</sup> <sup>١١٢٧</sup> <sup>١١٢٨</sup> <sup>١١٢٩</sup> <sup>١١٣٠</sup> <sup>١١٣١</sup> <sup>١١٣٢</sup> <sup>١١٣٣</sup> <sup>١١٣٤</sup> <sup>١١٣٥</sup> <sup>١١٣٦</sup> <sup>١١٣٧</sup> <sup>١١٣٨</sup> <sup>١١٣٩</sup> <sup>١١٤٠</sup> <sup>١١٤١</sup> <sup>١١٤٢</sup> <sup>١١٤٣</sup> <sup>١١٤٤</sup> <sup>١١٤٥</sup> <sup>١١٤٦</sup> <sup>١١٤٧</sup> <sup>١١٤٨</sup> <sup>١١٤٩</sup> <sup>١١٥٠</sup> <sup>١١٥١</sup> <sup>١١٥٢</sup> <sup>١١٥٣</sup> <sup>١١٥٤</sup> <sup>١١٥٥</sup> <sup>١١٥٦</sup> <sup>١١٥٧</sup> <sup>١١٥٨</sup> <sup>١١٥٩</sup> <sup>١١٦٠</sup> <sup>١١٦١</sup> <sup>١١٦٢</sup> <sup>١١٦٣</sup> <sup>١١٦٤</sup> <sup>١١٦٥</sup> <sup>١١٦٦</sup> <sup>١١٦٧</sup> <sup>١١٦٨</sup> <sup>١١٦٩</sup> <sup>١١٧٠</sup> <sup>١١٧١</sup> <sup>١١٧٢</sup> <sup>١١٧٣</sup> <sup>١١٧٤</sup> <sup>١١٧٥</sup> <sup>١١٧٦</sup> <sup>١١٧٧</sup> <sup>١١٧٨</sup> <sup>١١٧٩</sup> <sup>١١٨٠</sup> <sup>١١٨١</sup> <sup>١١٨٢</sup> <sup>١١٨٣</sup> <sup>١١٨٤</sup> <sup>١١٨٥</sup> <sup>١١٨٦</sup> <sup>١١٨٧</sup> <sup>١١٨٨</sup> <sup>١١٨٩</sup> <sup>١١٩٠</sup> <sup>١١٩١</sup> <sup>١١٩٢</sup> <sup>١١٩٣</sup> <sup>١١٩٤</sup> <sup>١١٩٥</sup> <sup>١١٩٦</sup> <sup>١١٩٧</sup> <sup>١١٩٨</sup> <sup>١١٩٩</sup> <sup>١٢٠٠</sup> <sup>١٢٠١</sup> <sup>١٢٠٢</sup> <sup>١٢٠٣</sup> <sup>١٢٠٤</sup> <sup>١٢٠٥</sup> <sup>١٢٠٦</sup> <sup>١٢٠٧</sup> <sup>١٢٠٨</sup> <sup>١٢٠٩</sup> <sup>١٢١٠</sup> <sup>١٢١١</sup> <sup>١٢١٢</sup> <sup>١٢١٣</sup> <sup>١٢١٤</sup> <sup>١٢١٥</sup> <sup>١٢١٦</sup> <sup>١٢١٧</sup> <sup>١٢١٨</sup> <sup>١٢١٩</sup> <sup>١٢٢٠</sup> <sup>١٢٢١</sup> <sup>١٢٢٢</sup> <sup>١٢٢٣</sup> <sup>١٢٢٤</sup> <sup>١٢٢٥</sup> <sup>١٢٢٦</sup> <sup>١٢٢٧</sup> <sup>١٢٢٨</sup> <sup>١٢٢٩</sup> <sup>١٢٣٠</sup> <sup>١٢٣١</sup> <sup>١٢٣٢</sup> <sup>١٢٣٣</sup> <sup>١٢٣٤</sup> <sup>١٢٣٥</sup> <sup>١٢٣٦</sup> <sup>١٢٣٧</sup> <sup>١٢٣٨</sup> <sup>١٢٣٩</sup> <sup>١٢٤٠</sup> <sup>١٢٤١</sup> <sup>١٢٤٢</sup> <sup>١٢٤٣</sup> <sup>١٢٤٤</sup> <sup>١٢٤٥</sup> <sup>١٢٤٦</sup> <sup>١٢٤٧</sup> <sup>١٢٤٨</sup> <sup>١٢٤٩</sup> <sup>١٢٥٠</sup> <sup>١٢٥١</sup> <sup>١٢٥٢</sup> <sup>١٢٥٣</sup> <sup>١٢٥٤</sup> <sup>١٢٥٥</sup> <sup>١٢٥٦</sup> <sup>١٢٥٧</sup> <sup>١٢٥٨</sup> <sup>١٢٥٩</sup> <sup>١٢٦٠</sup> <sup>١٢٦١</sup> <sup>١٢٦٢</sup> <sup>١٢٦٣</sup> <sup>١٢٦٤</sup> <sup>١٢٦٥</sup> <sup>١٢٦٦</sup> <sup>١٢٦٧</sup> <sup>١٢٦٨</sup> <sup>١٢٦٩</sup> <sup>١٢٧٠</sup> <sup>١٢٧١</sup> <sup>١٢٧٢</sup> <sup>١٢٧٣</sup> <sup>١٢٧٤</sup> <sup>١٢٧٥</sup> <sup>١٢٧٦</sup> <sup>١٢٧٧</sup> <sup>١٢٧٨</sup> <sup>١٢٧٩</sup> <sup>١٢٨٠</sup> <sup>١٢٨١</sup> <sup>١٢٨٢</sup> <sup>١٢٨٣</sup> <sup>١٢٨٤</sup> <sup>١٢٨٥</sup> <sup>١٢٨٦</sup> <sup>١٢٨٧</sup> <sup>١٢٨٨</sup> <sup>١٢٨٩</sup> <sup>١٢٩٠</sup> <sup>١٢٩١</sup> <sup>١٢٩٢</sup> <sup>١٢٩٣</sup> <sup>١٢٩٤</sup> <sup>١٢٩٥</sup> <sup>١٢٩٦</sup> <sup>١٢٩٧</sup> <sup>١٢٩٨</sup> <sup>١٢٩٩</sup> <sup>١٣٠٠</sup> <sup>١٣٠١</sup> <sup>١٣٠٢</sup> <sup>١٣٠٣</sup> <sup>١٣٠٤</sup> <sup>١٣٠٥</sup> <sup>١٣٠٦</sup> <sup>١٣٠٧</sup> <sup>١٣٠٨</sup> <sup>١٣٠٩</sup> <sup>١٣١٠</sup> <sup>١٣١١</sup> <sup>١٣١٢</sup> <sup>١٣١٣</sup> <sup>١٣١٤</sup> <sup>١٣١٥</sup> <sup>١٣١٦</sup> <sup>١٣١٧</sup> <sup>١٣١٨</sup> <sup>١٣١٩</sup> <sup>١٣٢٠</sup> <sup>١٣٢١</sup> <sup>١٣٢٢</sup> <sup>١٣٢٣</sup> <sup>١٣٢٤</sup> <sup>١٣٢٥</sup> <sup>١٣٢٦</sup> <sup>١٣٢٧</sup> <sup>١٣٢٨</sup> <sup>١٣٢٩</sup> <sup>١٣٣٠</sup> <sup>١٣٣١</sup> <sup>١٣٣٢</sup> <sup>١٣٣٣</sup> <sup>١٣٣٤</sup> <sup>١٣٣٥</sup> <sup>١٣٣٦</sup> <sup>١٣٣٧</sup> <sup>١٣٣٨</sup> <sup>١٣٣٩</sup> <sup>١٣٤٠</sup> <sup>١٣٤١</sup> <sup>١٣٤٢</sup> <sup>١٣٤٣</sup> <sup>١٣٤٤</sup> <sup>١٣٤٥</sup> <sup>١٣٤٦</sup> <sup>١٣٤٧</sup> <sup>١٣٤٨</sup> <sup>١٣٤٩</sup> <sup>١٣٥٠</sup> <sup>١٣٥١</sup> <sup>١٣٥٢</sup> <sup>١٣٥٣</sup> <sup>١٣٥٤</sup> <sup>١٣٥٥</sup> <sup>١٣٥٦</sup> <sup>١٣٥٧</sup> <sup>١٣٥٨</sup> <sup>١٣٥٩</sup> <sup>١٣٦٠</sup> <sup>١٣٦١</sup> <sup>١٣٦٢</sup> <sup>١٣٦٣</sup> <sup>١٣٦٤</sup> <sup>١٣٦٥</sup> <sup>١٣٦٦</sup> <sup>١٣٦٧</sup> <sup>١٣٦٨</sup> <sup>١٣٦٩</sup> <sup>١٣٧٠</sup> <sup>١٣٧١</sup> <sup>١٣٧٢</sup> <sup>١٣٧٣</sup> <sup>١٣٧٤</sup> <sup>١٣٧٥</sup> <sup>١٣٧٦</sup> <sup>١٣٧٧</sup> <sup>١٣٧٨</sup> <sup>١٣٧٩</sup> <sup>١٣٨٠</sup> <sup>١٣٨١</sup> <sup>١٣٨٢</sup> <sup>١٣٨٣</sup> <sup>١٣٨٤</sup> <sup>١٣٨٥</sup> <sup>١٣٨٦</sup> <sup>١٣٨٧</sup> <sup>١٣٨٨</sup> <sup>١٣٨٩</sup> <sup>١٣٩٠</sup> <sup>١٣٩١</sup> <sup>١٣٩٢</sup> <sup>١٣٩٣</sup> <sup>١٣٩٤</sup> <sup>١٣٩٥</sup> <sup>١٣٩٦</sup> <sup>١٣٩٧</sup> <sup>١٣٩٨</sup> <sup>١٣٩٩</sup> <sup>١٤٠٠</sup> <sup>١٤٠١</sup> <sup>١٤٠٢</sup> <sup>١٤٠٣</sup> <sup>١٤٠٤</sup> <sup>١٤٠٥</sup> <sup>١٤٠٦</sup> <sup>١٤٠٧</sup> <sup>١٤٠٨</sup> <sup>١٤٠٩</sup> <sup>١٤١٠</sup> <sup>١٤١١</sup> <sup>١٤١٢</sup> <sup>١٤١٣</sup> <sup>١٤١٤</sup> <sup>١٤١٥</sup> <sup>١٤١٦</sup> <sup>١٤١٧</sup> <sup>١٤١٨</sup> <sup>١٤١٩</sup> <sup>١٤٢٠</sup> <sup>١٤٢١</sup> <sup>١٤٢٢</sup> <sup>١٤٢٣</sup> <sup>١٤٢٤</sup> <sup>١٤٢٥</sup> <sup>١٤٢٦</sup> <sup>١٤٢٧</sup> <sup>١٤٢٨</sup> <sup>١٤٢٩</sup> <sup>١٤٣٠</sup> <sup>١٤٣١</sup> <sup>١٤٣٢</sup> <sup>١٤٣٣</sup> <sup>١٤٣٤</sup> <sup>١٤٣٥</sup> <sup>١٤٣٦</sup> <sup>١٤٣٧</sup> <sup>١٤٣٨</sup> <sup>١٤٣٩</sup> <sup>١٤٤٠</sup> <sup>١٤٤١</sup> <sup>١٤٤٢</sup> <sup>١٤٤٣</sup> <sup>١٤٤٤</sup> <sup>١٤٤٥</sup> <sup>١٤٤٦</sup> <sup>١٤٤٧</sup> <sup>١٤٤٨</sup> <sup>١٤٤٩</sup> <sup>١٤٥٠</sup> <sup>١٤٥١</sup> <sup>١٤٥٢</sup> <sup>١٤٥٣</sup> <sup>١٤٥٤</sup> <sup>١٤٥٥</sup> <sup>١٤٥٦</sup> <sup>١٤٥٧</sup> <sup>١٤٥٨</sup> <sup>١٤٥٩</sup> <sup>١٤٦٠</sup> <sup>١٤٦١</sup> <sup>١٤٦٢</sup> <sup>١٤٦٣</sup> <sup>١٤٦٤</sup> <sup>١٤٦٥</sup> <sup>١٤٦٦</sup> <sup>١٤٦٧</sup> <sup>١٤٦٨</sup> <sup>١٤٦٩</sup> <sup>١٤٧٠</sup> <sup>١٤٧١</sup> <sup>١٤٧٢</sup> <sup>١٤٧٣</sup> <sup>١٤٧٤</sup> <sup>١٤٧٥</sup> <sup>١٤٧٦</sup> <sup>١٤٧٧</sup> <sup>١٤٧٨</sup> <sup>١٤٧٩</sup> <sup>١٤٨٠</sup> <sup>١٤٨١</sup> <sup>١٤٨٢</sup> <sup>١٤٨٣</sup> <sup>١٤٨٤</sup> <sup>١٤٨٥</sup> <sup>١٤٨٦</sup> <sup>١٤٨٧</sup> <sup>١٤٨٨</sup> <sup>١٤٨٩</sup> <sup>١٤٩٠</sup> <sup>١٤٩١</sup> <sup>١٤٩٢</sup> <sup>١٤٩٣</sup> <sup>١٤٩٤</sup> <sup>١٤٩٥</sup> <sup>١٤٩٦</sup> <sup>١٤٩٧</sup> <sup>١٤٩٨</sup> <sup>١٤٩٩</sup> <sup>١٥٠٠</sup> <sup>١٥٠١</sup> <sup>١٥٠٢</sup> <sup>١٥٠٣</sup> <sup>١٥٠٤</sup> <sup>١٥٠٥</sup> <sup>١٥٠٦</sup> <sup>١٥٠٧</sup> <sup>١٥٠٨</sup> <sup>١٥٠٩</sup> <sup>١٥١٠</sup> <sup>١٥١١</sup> <sup>١٥١٢</sup> <sup>١٥١٣</sup> <sup>١٥١٤</sup> <sup>١٥١٥</sup> <sup>١٥١٦</sup> <sup>١٥١٧</sup> <sup>١٥١٨</sup> <sup>١٥١٩</sup> <sup>١٥٢٠</sup> <sup>١٥٢١</sup> <sup>١٥٢٢</sup> <sup>١٥٢٣</sup> <sup>١٥٢٤</sup> <sup>١٥٢٥</sup> <sup>١٥٢٦</sup> <sup>١٥٢٧</sup> <sup>١٥٢٨</sup> <sup>١٥٢٩</sup> <sup>١٥٣٠</sup> <sup>١٥٣١</sup> <sup>١٥٣٢</sup> <sup>١٥٣٣</sup> <sup>١٥٣٤</sup> <sup>١٥٣٥</sup> <sup>١٥٣٦</sup> <sup>١٥٣٧</sup> <sup>١٥٣٨</sup> <sup>١٥٣٩</sup> <sup>١٥٤٠</sup> <sup>١٥٤١</sup> <sup>١٥٤٢</sup> <sup>١٥٤٣</sup> <sup>١٥٤٤</sup> <sup>١٥٤٥</sup> <sup>١٥٤٦</sup> <sup>١٥٤٧</sup> <sup>١٥٤٨</sup> <sup>١٥٤٩</sup> <sup>١٥٥٠</sup> <sup>١٥٥١</sup> <sup>١٥٥٢</sup> <sup>١٥٥٣</sup> <sup>١٥٥٤</sup> <sup>١٥٥٥</sup> <sup>١٥٥٦</sup> <sup>١٥٥٧</sup> <sup>١٥٥٨</sup> <sup>١٥٥٩</sup> <sup>١٥٦٠</sup> <sup>١٥٦١</sup> <sup>١٥٦٢</sup> <sup>١٥٦٣</sup> <sup>١٥٦٤</sup> <sup>١٥٦٥</sup> <sup>١٥٦٦</sup> <sup>١٥٦٧</sup> <sup>١٥٦٨</sup> <sup>١٥٦٩</sup> <sup>١٥٧٠</sup> <sup>١٥٧١</sup> <sup>١٥٧٢</sup> <sup>١٥٧٣</sup> <sup>١٥٧٤</sup> <sup>١٥٧٥</sup> <sup>١٥٧٦</sup> <sup>١٥٧٧</sup> <sup>١٥٧٨</sup> <sup>١٥٧٩</sup> <sup>١٥٨٠</sup> <sup>١٥٨١</sup> <sup>١٥٨٢</sup> <sup>١٥٨٣</sup> <sup>١٥٨٤</sup> <sup>١٥٨٥</sup> <sup>١٥٨٦</sup> <sup>١٥٨٧</sup> <sup>١٥٨٨</sup> <sup>١٥٨٩</sup> <sup>١٥٩٠</sup> <sup>١٥٩١</sup> <sup>١٥٩٢</sup> <sup>١٥٩٣</sup> <sup>١٥٩٤</sup> <sup>١٥٩٥</sup> <sup>١٥٩٦</sup> <sup>١٥٩٧</sup> <sup>١٥٩٨</sup> <sup>١٥٩٩</sup> <sup>١٦٠٠</sup> <sup>١٦٠١</sup> <sup>١٦٠٢</sup> <sup>١٦٠٣</sup> <sup>١٦٠٤</sup> <sup>١٦٠٥</sup> <sup>١٦٠٦</sup> <sup>١٦٠٧</sup> <sup>١٦٠٨</sup> <sup>١٦٠٩</sup> <sup>١٦١٠</sup> <sup>١٦١١</sup> <sup>١٦١٢</sup> <sup>١٦١٣</sup> <sup>١٦١٤</sup> <sup>١٦١٥</sup> <sup>١٦١٦</sup> <sup>١٦١٧</sup> <sup>١٦١٨</sup> <sup>١٦١٩</sup> <sup>١٦٢٠</sup> <sup>١٦٢١</sup> <sup>١٦٢٢</sup> <sup>١٦٢٣</sup> <sup>١٦٢٤</sup> <sup>١٦٢٥</sup> <sup>١٦٢٦</sup> <sup>١٦٢٧</sup> <sup>١٦٢٨</sup> <sup>١٦٢٩</sup> <sup>١٦٣٠</sup> <sup>١٦٣١</sup> <sup>١٦٣٢</sup> <sup>١٦٣٣</sup> <sup>١٦٣٤</sup> <sup>١٦٣٥</sup> <sup>١٦٣٦</sup> <sup>١٦٣٧</sup> <sup>١٦٣٨</sup> <sup>١٦٣٩</sup> <sup>١٦٤٠</sup> <sup>١٦٤١</sup> <sup>١٦٤٢</sup> <sup>١٦٤٣</sup> <sup>١٦٤٤</sup> <sup>١٦٤٥</sup> <sup>١٦٤٦</sup> <sup>١٦٤٧</sup> <sup>١٦٤٨</sup> <sup>١٦٤٩</sup> <sup>١٦٥٠</sup> <sup>١٦٥١</sup> <sup>١٦٥٢</sup> <sup>١٦٥٣</sup> <sup>١٦٥٤</sup> <sup>١٦٥٥</sup> <sup>١٦٥٦</sup> <sup>١٦٥٧</sup> <sup>١٦٥٨</sup> <sup>١٦٥٩</sup> <sup>١٦٦٠</sup> <sup>١٦٦١</sup> <sup>١٦٦٢</sup> <sup>١٦٦٣</sup> <sup>١٦٦٤</sup> <sup>١٦٦٥</sup> <sup>١٦٦٦</sup> <sup>١٦٦٧</sup> <sup>١٦٦٨</sup> <sup>١٦٦٩</sup> <sup>١٦٧٠</sup> <sup>١٦٧١</sup> <sup>١٦٧٢</sup> <sup>١٦٧٣</sup> <sup>١٦٧٤</sup> <sup>١٦٧٥</sup> <sup>١٦٧٦</sup> <sup>١٦٧٧</sup> <sup>١٦٧٨</sup> <sup>١٦٧٩</sup> <sup>١٦٨٠</sup> <sup>١٦٨١</sup> <sup>١٦٨٢</sup> <sup>١٦٨٣</sup> <sup>١٦٨٤</sup> <sup>١٦٨٥</sup> <sup>١٦٨٦</sup> <sup>١٦٨٧</sup> <sup>١٦٨٨</sup> <sup>١٦٨٩</sup> <sup>١٦٩٠</sup> <sup>١٦٩١</sup> <sup>١٦٩٢</sup> <sup>١٦٩٣</sup> <sup>١٦٩٤</sup> <sup>١٦٩٥</sup> <sup>١٦٩٦</sup> <sup>١٦٩٧</sup> <sup>١٦٩٨</sup> <sup>١٦٩٩</sup> <sup>١٧٠٠</sup> <sup>١٧٠١</sup> <sup>١٧٠٢</sup> <sup>١٧٠٣</sup> <sup>١٧٠٤</sup> <sup>١٧٠٥</sup> <sup>١٧٠٦</sup> <sup>١٧٠٧</sup> <sup>١٧٠٨</sup> <sup>١٧٠٩</sup> <sup>١٧١٠</sup> <sup>١٧١١</sup> <sup>١٧١٢</sup> <sup>١٧١٣</sup> <sup>١٧١٤</sup> <sup>١٧١٥</sup> <sup>١٧١٦</sup> <sup>١٧١٧</sup> <sup>١٧١٨</sup> <sup>١٧١٩</sup> <sup>١٧٢٠</sup> <sup>١٧٢١</sup> <sup>١٧٢٢</sup> <sup>١٧٢٣</sup> <sup>١٧٢٤</sup> <sup>١٧٢٥</sup> <sup>١٧٢٦</sup> <sup>١٧٢٧</sup>



বর্ণনা করেছেন। সहीহ মুসলিম ও তিরমিযী হযরত আবু হুরায়রার বাচনিক রসূলুল্লাহ্ (সা)-র এ উক্তি বর্ণনা করেছেন যে,

— سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ —

اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

কলেমাটি আমার কাছে সেসব বস্তুর চাইতে অধিক প্রিয়,

যেগুলোর উপর সূর্যকিরণ পতিত হয় অর্থাৎ সারা বিশ্বের চাইতে।

হযরত জাবের বলেন : لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ কলেমাটি অধিক পরি-

মাণে পাঠ কর! কেননা, এটি রোগ ও কষ্টের নিরানকইটি অধ্যায় দূর করে দেয়। তদ্ব্যতীত সবচাইতে নিশ্চিন্তের কষ্ট হচ্ছে চিন্তাভাবনা।

এ কাল্পণেই আলোচ্য আয়াতে بِأَقْيَامِ مَا لَكَات শব্দটির তফসীর হযরত ইবনে আব্বাস, ইক্রামা ও মুজাহিদ তাই করেছেন যে, এর দ্বারা উপরোক্ত কলেমা-সমূহ পাঠ করা বোঝানো হয়েছে। সায়ীদ ইবনে জুবায়র, মসরুফ ও ইবরাহীম বলেন যে, بِأَقْيَامِ مَا لَكَات -এর অর্থ পাঞ্জগানা নামায।

হযরত ইবনে আব্বাস থেকে অপর এক রেওয়াজেতে রয়েছে যে, بِأَقْيَامِ مَا لَكَات বলে উপরোক্ত কলেমাসহ সাধারণ সৎ কর্ম বোঝানো হয়েছে—তা পাঞ্জগানা নামাযই হোক অথবা অন্যান্য সৎ কর্ম হোক—সবই এর অন্তর্ভুক্ত। হযরত কাতাদাহ্ থেকে এ তফসীরই বর্ণিত হয়েছে—(মাযহারী)

এ তফসীর কোরআনের শব্দাবলীতে অনুকূল বটে। কেননা, بِأَقْيَامِ مَا لَكَات -এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে স্থায়ী সৎ কর্মসমূহ। বলাবাহুল্য সব সৎ কর্মই আলাহর কাছে স্থায়ী ও প্রতিষ্ঠিত। ইবনে জরীর, তাবারী ও কুরতুবী এ তফসীরই পছন্দ করেছেন।

হযরত আলী (রা) বলেন : শস্যক্ষেত্র দু'রকম : দুনিয়ার ও পরকালের। দুনিয়ার শস্যক্ষেত্র হচ্ছে অর্থসম্পদ ও সম্ভান-সমৃদ্ধি আর পরকালের শস্যক্ষেত্র হচ্ছে স্থায়ী সৎকর্মসমূহ। হযরত হাসান বসরী বলেন : بِأَقْيَامِ مَا لَكَات হচ্ছে মানুষের নিয়ত ও ইচ্ছা। এর উপরই সৎ কর্মসমূহের গ্রহণযোগ্যতা নির্ভরশীল।

ওবায়দ ইবনে উমর বলেন : بِأَقْيَامِ مَا لَكَات হচ্ছে নেক কন্যা সম্ভান। তার পিতামাতার জন্য সর্বস্বত্ব সওয়াবের ডাণ্ডার। রসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বর্ণিত হযরত আয়েশার এক রেওয়াজেতে এর সমর্থন করে। রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন, আমি উম্মতের এক ব্যক্তিকে দেখছি, তাকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার আদেশ হয়েছে। তখন তার নেক কন্যারা তাকে জড়িয়ে ধরল এবং কান্নাকাটি ও শোরগোল করতে লাগল।

তারা আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করল : ইয়া! আল্লাহ, তিনি দুনিয়াতে আমাদের প্রতি খুবই অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদের লালন-পালনে শ্রম স্বীকার করেছেন। তখন আল্লাহ তা'আলা দয়া করে তাকে ক্ষমা করে দিলেন।---(কুরতুবী)

لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ

হবে : আজ তোমরা এমনভাবে খালি হাতে কোন আসবাবপত্র না নিয়ে আমাদের সামনে এসেছ, যেমন আমি প্রথমে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলাম। বোখারী, মুসলিম ও তিরমিহীতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের বাচনিক বর্ণিত রয়েছে যে, একবার রসূলুল্লাহ (সা) এক ডাষণ প্রসঙ্গে বললেন : লোকসকল, তোমরা কিয়ামতে তোমাদের পালনকর্তার সামনে খালি পায়, খালি শরীরে পায় হেঁটে উপস্থিত হবে। সেদিন সর্বপ্রথম মাকে পোশাক পরানো হবে, তিনি হবেন হযরত ইব্রাহীম (আ)। একথা শুনে হযরত আয়েশা প্রঙ্গ করলেন : ইয়া রসূলুল্লাহ, সব নারী-পুরুষই কি উলঙ্গ হবে এবং একে অপরকে দেখবে? তিনি বললেন : সেদিন প্রত্যেককেই এমন ব্যস্ততা ও চিন্তা ঘিরে রাখবে যে, কেউ কান্নাও প্রতি দেখার সুযোগই পাবে না। সবারই দৃষ্টি থাকবে উপরের দিকে।

কুরতুবী বলেন : এক হাদীসে বলা হয়েছে, মৃতরা বরষাধে একে অপরের সাথে নিজ নিজ কাফন পন্নিহিত অবস্থায় মোলাকাত করবে। এই হাদীসটি উপরোক্ত হাদীসের পন্নিপন্থী নয়। কেননা এ হাদীসে কবর ও বরষাধের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে; আর উপরোক্ত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে হাশরের ময়দানের অবস্থা। কোন কোন রেওয়াজে আছে, মৃত ব্যক্তি সে পোশাকেই হাশরের ময়দানে উথিত হবে, যাতে তাকে দাফন করা হয়েছিল। হযরত ওমর (রা) বলেন : মৃতদেরকে ভাল কাফন দিয়ো। কেননা তারা কিয়ামতের দিন এ কাফন পন্নিহিত হয়েই উথিত হবে। কেউ কেউ এ হাদীসটিকে শহীদদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলেছেন। কেউ কেউ বলেন : এটা সম্ভব যে, হাশরের ময়দানে কিছু লোক পোশাক পন্নিহিত অবস্থায় এবং কিছু লোক উলঙ্গ অবস্থায় উথিত হবে। এভাবে উভয় প্রকার হাদীসের মধ্যে সম্ভব সাধিত হয়ে যায়। ---(মামহারী)

করমানুশারী প্রতিদান : وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا

বাসীরা তাদের কৃতকর্মকে উপস্থিত পাবে। তফসীরবিদগণ এর অর্থ সাধারণভাবে এরূপ বর্ণনা করেন যে, নিজ নিজ কৃতকর্মের প্রতিদানকে উপস্থিত পাবে। শ্রেয় উক্তাদ হযরত মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (র) বলতেন : এরূপ অর্থ বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই। বহু হাদীস এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয় যে, এ সব কৃতকর্মই ইহকাল ও পরকালের প্রতিদান ও শাস্তির রূপ পন্নিগ্রহ করবে। তাদের আকার-আকৃতি সেখানে পন্নিবর্তিত হয়ে যাবে। সৎ কর্মসমূহ জাহান্নামের নিলামতের আকার ধারণ করবে আর মন্দ কর্মসমূহ জাহান্নামের আঙন ও সাপ বিচ্ছু হয়ে যাবে।

হাদীসে আছে, যারা যাকাত দেন না, তাদের মাল কবরে একটি বড় সাপের আকার ধারণ করে তাদেরকে দংশন করবে এবং বলবে **إِنَّمَا مَالِك** আমি তোমার মাল। সৎ কর্ম সূত্রী মানুষের আকারে কবরের নিঃসন্ন অবস্থায় আতংক দূর করার জন্য আগমন করবে। কোরবানীর জন্ত পুলসিরাতে সওয়ারী হবে। মানুষের গোনাহ বোঝার আকারে প্রত্যেকের মাথার চাঙ্গিয়ে দেওয়া হবে।

কোরআনে ইয়াতীমের মাল অনিয়মভাবে উদ্ধরণকারীদের সম্পর্কে **إِنَّمَا يَأْكُلُونَ**

**فِي بَطُونِهِمْ نَارًا** বলা হয়েছে। অর্থাৎ তারা উদরে আগুন ভর্তি করছে। এসব আয়াত ও য়েওয়ামতকে সাধারণত রূপক অর্থে ধরা হয়। উপরোক্ত বক্তব্য মেনে নিলে এগুলোতে রূপক অর্থের আশ্রয় নেওয়ার প্রয়োজন নেই। সবগুলো আমল অর্থেই থাকে।

কোরআনে ইয়াতীমের অবৈধ অর্থসম্পদকে আগুন বলা হয়েছে। সত্য এই যে, তা এখনও আগুনই বটে, কিন্তু এর প্রতিক্রিয়া অনুভব করার জন্য এ জগত থেকে চলে যাওয়া শর্ত। উদাহরণত কেউ দিয়াশলাইর বাষ্পকে আগুন বললে তা নির্ভুল হবে, কিন্তু এধর দাহিকশক্তি অনুভব করতে হলে ঘর্ষণ শর্ত। এমনিভাবে কেউ পেট্রোলকে আগুন মনে করলে তা শুদ্ধ হবে; তবে এর জন্য আগুনের সামান্যতম সংস্পর্শ শর্ত।

এর সারমর্ম এই দাঁড়ায় যে, মানুষ দুনিয়াতে সদাসৎ যেসব কর্ম করে; সেগুলোই পরকালে প্রতিদান ও শাস্তির রূপ ধারণ করবে। তখন এগুলোর প্রতিক্রিয়া ও আলামত এ দুনিয়া থেকে ভিন্নরূপ হবে।

وَأَذَقْنَا لِلْمَلِكَةِ اسْجُدًا وَالْإِدْمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ  
 كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ  
 أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ  
 بَدَلًا ۝ مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلَقَ  
 أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُمْ مُتَّخِذِينَ عَضُدًا ۝ وَيَوْمَ يَقُولُ  
 نَادُوا شُرَكَاءِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا  
 لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا ۝ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا

أَنَّهُمْ مُوَاعِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرَفًا ۖ وَقَدَّصَرْنَا  
 فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ۚ وَكَانَ الْإِنْسَانُ  
 أَكْثَرُ شَيْءٍ جَدَلًا ۝ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ  
 الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةٌ الْأُولِينَ  
 أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا ۝ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ  
 وَمُنذِرِينَ ۚ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا  
 بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا ۝ وَمَنْ أَظْلَمُ  
 مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ  
 يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ  
 وَقْرًا ۚ وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَنْ يَهْتَدُوا إِلَّا إِذَا أَبَدَا ۝ وَرَبُّكَ  
 الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ ۚ لَوْ يُؤَاخِذُهم بِمَا كَسَبُوا الْعَجَلُ لَهُمُ  
 الْعَذَابُ ۚ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَّنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْعِدًا ۝  
 وَسِلكَ الْقُرْآنِ أَهْلكَهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلكِهِمْ  
 مَوْعِدًا ۝

(৫০) যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম : আদমকে সিজদা কর, তখন সবাই সিজদা করল ইবলীস ব্যতীত। সে ছিল জিনদের একজন। সে তার পালনকর্তার আদেশ অমান্য করল। অতএব তোমরা কি আমার পরিবার্তে তাকে এবং তার বংশধরকে বক্ররূপে গ্রহণ করছ? অথচ তারা তোমাদের শত্রু। এটা জালিমদের জন্য খুবই নিকট বদল। (৫১) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃজনকালে আমি তাদেরকে সাক্ষ্য রাখিনি এবং তাদের নিজেদের সৃজনকালেও না। এবং আমি এমনও নই যে, বিদ্রোহকারীদেরকে সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করব। (৫২) যে দিন তিনি বলবেন : তোমরা আমাদেরকে আমার শরীক

মনে করতে তাদেরকে ডাক। তারা তখন তাদেরকে ডাকবে, কিন্তু তারা এ আহবানে সাড়া দেবে না। আমি তাদের মধ্যস্থলে রেখে দেব একটি মৃত্যু গহবর। (৫৩) অপরাধীরা আগুন দেখে বুঝে নেবে যে, তাদেরকে তাতে পতিত হতে হবে এবং তারা তা থেকে রাস্তা পরিবর্তন করতে পারবে না। (৫৪) নিশ্চয় আমি এ কোরআনে মানুষকে নানাভাবে বিভিন্ন উপকার দ্বারা আমার বাণী সুঝিয়েছি। মানুষ সব বস্তু থেকে অধিক তর্কপ্রিয়। (৫৫) হিদায়ত আসার পর এ প্রতীক্ষাই শুধু মানুষকে বিশ্বাস স্থাপন করতে এবং তাদের পালনকর্তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে বিরত রাখে যে, কখন আসবে তাদের কাছে পূর্ববর্তীদের স্বীতিনীতি অথবা কখন আসবে তাদের কাছে আশাব সামনা-সামনি। (৫৬) আমি রসূলগণকে সুসংবাদ-দাতা ও ভয় প্রদর্শনকারীরূপেই প্রেরণ করি এবং কাফিররাই মিথ্যা অবলম্বনে বিতর্ক করে, তা দ্বারা সত্যকে বার্থ করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে এবং তারা আমার নিদর্শনাবলীও হাদ্দারা তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করা হয়, সেগুলোকে ঠাট্টারূপে গ্রহণ করেছে। (৫৭) তার চাইতে অধিক জালিম কে, যাকে তার পালনকর্তার কালাম দারা বোঝানো হয়, অতঃপর সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তার পূর্ববর্তী কৃতকর্মসমূহ জুলে যায়? আমি তাদের অন্তরের উপর পর্দা রেখে দিয়েছি, যেন তা না বুঝে এবং তাদের কানে রয়েছে বধিরতার বোঝা। যদি আপনি তাদেরকে সৎ পথের প্রতি দাওয়াত দেন, তবে কখনই তারা সৎ পথে আসবে না। (৫৮) আপনাদের পালনকর্তা ক্ষমাশীল, দয়ালু; যদি তিনি তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের জন্য পাকড়াও করেন, তবে তাদের শাস্তি ত্বরান্বিত করতেন, কিন্তু তাদের জন্য রয়েছে একটি প্রতিশ্রুত সময়, যা থেকে তারা সরে যাওয়ার জায়গা পাবে না। (৫৯) এসব জনপদও তাদেরকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি, যখন তারা জালিম হয়ে গিয়েছিল এবং আমি তাদের ধ্বংসের জন্য একটি প্রতিশ্রুত সময় নির্দিষ্ট করেছিলাম।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং (সে সময়টিও স্মরণযোগ্য) যখন আমি ফেরেশতাদেরকে আদেশ দিলাম : আদম (আ)-কে সিজদা কর, তখন সবাই সিজদা করল ইবলীস ব্যতীত। সে ছিল জিনদের একজন। সে তার পালনকর্তার আদেশ অমান্য করল। (কেমনা জিন সৃষ্টির প্রধান উপাদান হচ্ছে আগুন। অগ্নিপাদানের তাগিদ হল অনুগত না থাকা। কিন্তু এ উপাদানজনিত তাগিদের কারণে ইবলীসকে ক্ষমার মনে করা হবে না। কারণ এ উপাদানজনিত তাগিদকে আত্মাহ্বর ভয় দ্বারা পরাভূত করা সম্ভবপর ছিল।) অতএব এরপরও কি তোমরা তাকে এবং তার বংশধরকে (সন্তান-সন্ততি ও অনুসারীদেরকে) আমার পরিবর্তে বক্ররূপে গ্রহণ করছ? (অর্থাৎ আমার আনুগত্য ত্যাগ করে তার কথামত চলছ)? অথচ সে (ইবলীস ও তার দলবল) তোমাদের শত্রু। (সর্বদাই তোমাদের ক্ষতি করার চিন্তায় ব্যাপ্ত থাকে)। এটা অর্থাৎ ইবলীস ও (তার বংশধরের বন্ধু) জালিমদের জন্য খুবই মন্দ বদল। ('বদল' বলার কারণ এই যে, বক্রুতো আমাকেই বানানো উচিত ছিল, কিন্তু তারা আমার বদলে শয়তানকে বন্ধু বানিয়েছে; বরং শুধু

বজুই নয়, তাকে আল্লাহর শরীকও মেনে নিয়েছে। অথচ) আমি তাদেরকে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টির সময় (সাহায্য অথবা পরামর্শের জন্য) ডাকিনি এবং স্বয়ং তাদের সৃষ্টির সময়ও (ডাকিনি অর্থাৎ একজনকে পরদা করার সময় অন্যজনকে ডাকিনি) এবং আমি এমন (অক্ষম) নই যে, (কাউকে বিশেষ করে) বিভ্রান্তকারীদেরকে (অর্থাৎ শয়তানদের) নিজ বাহবল বানাব! (অর্থাৎ সাহায্যের প্রত্যাশী সে-ই হয়, যে নিজে শক্তিশালী ও সক্ষম নয়)। আর (তোমরা এখানে তাদেরকে আল্লাহর শরীক মনে কর; কিয়ামতে আসল স্বরূপ জানা যাবে)। স্মরণ কর, যেদিন আল্লাহ্ তা'আলা (মুশরিকদেরকে) বলবেন : তোমরা যাদেরকে আমার শরীক মনে করতে, তাদেরকে (সাহায্যের জন্য) আহ্বান কর। তারা তাদেরকে আহ্বান করবে, কিন্তু তারা জবাবই দেবে না। আমি তাদের মধ্যস্থলে একটি আড়াল করে দেব। (যাতে তারা সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে যায় নতুবা আড়াল ব্যতীতও তাদের সাহায্য করা সম্ভবপর ছিল না)। অপরাধীরা দোষথকে দেখবে, অতঃপর বিশ্বাস করবে যে, তাদেরকে তথায় পতিত হতে হবে এবং তারা তা থেকে পল্লিব্রাণের কোন পথ পাবে না। আমি এই কোন্নআনে মানুষের (হিদায়তের) জন্য সব নূকম উৎকৃষ্ট বিষয়বস্তু নানাভাবে বর্ণনা করেছি। (এ সম্বন্ধে অবিশ্বাসী) মানুষ তর্কে সবার উপরে। (জিন ও জীবজন্তুর মধ্যে যদিও চেতনা ও অনুভূতি আছে, কিন্তু তারা এত তর্ক-বিতর্ক করে না)। হিদায়ত আসার পর (যার তাগিদ ছিল বিশ্বাস স্থাপন করা) মানুষকে বিশ্বাস স্থাপন করতে এবং তাদের পালনকর্তার কাছে (কুফর ও গোনাহর জন্য) ক্ষমা প্রার্থনা করতে কোন কিছু বিরত রাখেনা, কিন্তু এই প্রতীক্ষা যে, পূর্ববর্তী লোকদের (ধ্বংস ও আযাবের) স্তীতিনীতি তাদের কাছে আসুক অথবা তাদের কাছে আযাব সামনাসামনি আসুক। (উদ্দেশ্য এই যে, তাদের অবস্থা থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, তারা আযাবেরই অপেক্ষা করেছে। নতুবা অন্য সব প্রমাণাদি তো পূর্ণ হয়ে গেছে।) আমি রসূলগণকে শুধু সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারীরূপে প্রেরণ করি। (যার জন্য মু'জিবা ইত্যাদির মাধ্যমে যথেষ্ট প্রমাণাদি তাদের সাথে দেওয়া হয়। এর অতিরিক্ত কোন কিছু তাদের কাছে ফরমায়েণ করা মুর্থতা)। এবং কাফিররা মিথ্যা অবলম্বনে বিতর্ক করে যাতে তা দ্বারা সত্যকে বার্থ করে দেয়। তারা আমার নিদর্শনাবলী এবং যশ্দ্বারা (অর্থাৎ যে আযাব দ্বারা) তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করা হয়েছিল, সেগুলোকে ঠাট্টারূপে গ্রহণ করেছে। তার চাইতে অধিক জালিম কে, যাকে তার পালনকর্তার কালাম দ্বারা বোঝানো হয়, অতঃপর সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং নিজ হস্তদ্বয় দ্বারা যা কিছু (গোনাহ) সঞ্চয় করেছে, তাকে (অর্থাৎ তার পরিণামকে) ভুলে যায়? আমি তাদের অন্তরের উপর পর্দা রেখে দিয়েছি, যেন তা (অর্থাৎ সত্য বিষয় তারা) না বোঝে এবং (তা শোনা থেকে) তাদের কানে ছিপি এঁটে রেখেছি। (ফলে তাদের অবস্থা এই যে) আপনি যদি তাদেরকে সৎ পথের দিকে দাওয়াত দেন, তবে কখনই তারা সৎ পথে আসবে না। (কেননা তারা কানদিয়ে সত্যের দাওয়াত শোনে না, অন্তর দ্বারা বোঝে না। কাজেই আপনি চিন্তা করবেন না।) এবং (আযাবের বিলম্ব দেখে) তারা যে মনে করেছে, আযাব আসবেই না, এর কারণ এই যে, আপনার পালনকর্তা ক্ষমাশীল, দয়ালু (তাই সময় দিয়ে রেখেছেন, যাতে তাদের চৈতন্যোদয় হয় ও বিশ্বাস স্থাপন করে, ফলে তাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া

হায়। নতুবা তাদের কার্যকলাপ এমন যে) যদি তিনি তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদেরকে পাকড়াও করতেন, তবে তাদের শাস্তি ত্বরান্বিত করতেন। (কিন্তু তিনি এরূপ করেন না)। তাদের (শাস্তির) জন্য একটি প্রতিশ্রুত সময় আছে (অর্থাৎ কিয়ামতের দিন) যার এদিকে (অর্থাৎ পূর্বে) কোন আশ্রয়ের জায়গা পাবে না (অর্থাৎ সে সময়টি আসার আগে কোন আশ্রয়-স্থলে আশ্রয়গোপন করে তা থেকে পরিত্রাণ পাবে না)। এবং (পূর্ববর্তী কাফিরদের ক্ষেত্রে এ রীতি প্রয়োগ করা হয়েছে। সেমতে) এসব জনপদ (যাদের কাহিনী প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত), যখন তারা (অর্থাৎ এদের অধিবাসীরা) জালিম হয়ে গিয়েছিল, আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি এবং তাদের ধ্বংসের জন্য আমি প্রতিশ্রুত সময় নির্দিষ্ট করেছিলাম। (এমনিভাবে বর্তমান লোকদের জন্যও সময় নির্দিষ্ট রয়েছে)।

### আনুমানিক জাতব্য বিষয়

ইবলীসের সন্তান-সন্ততি ও বংশধরও আছে : **وَنُورِيَّةَ**—এ শব্দ থেকে

বোঝা যায় যে, শয়তানেস্ত সন্তান-সন্ততি ও বংশধর আছে। কেউ কেউ বলেন : এখানে **نُورِيَّةَ** অর্থাৎ বংশধর বলে সাহায্যকারী দল বোঝানো হয়েছে। কাজেই শয়তানের ঔরসজাত সন্তানাদি হওয়া জরুরী নয়। কিন্তু হামায়দী রচিত 'কিতাবুল জমা বাইনাস সহীহাইন' গ্রন্থে হযরত সালমান ফারসীর স্নেহস্নায়ুতে উল্লিখিত একটি সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে উপদেশ দিয়ে বলেন : তুমি তাদের মধ্য থেকে হয়ো না যারা সবার আগে বাজারে প্রবেশ করে অথবা যারা সবার শেষে বাজার থেকে বের হয়। কেননা বাজার এমন জায়গা, যেখানে শয়তান ডিমবাচ্চা প্রসব করে নেবে। এ থেকে জানা যায় যে, ডিম থেকে শয়তানের বংশধর বৃদ্ধি পায়। এই হাদীসটি উদ্ধৃতি করে কুরতুবী বলেন : শয়তানের যে সাহায্যকারী বাহিনী আছে, এ কথা তো অকাট্যরূপেই প্রমাণিত আছে, ঔরসজাত সন্তান হওয়া সম্পর্কেও এ হাদীস থেকে প্রমাণ পাওয়া গেল।

**وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرُ شَيْءٍ جَدًّا**—সমগ্র সৃষ্টজীবের মধ্যে মানুষ সর্বাধিক

তর্কপ্রিয়। এর সমর্থনে হযরত আনাস (রা) থেকে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে; রসূলুল্লাহ (সা) বলেন : 'কিয়ামতের দিন কাফিরদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তিকে পেশ করা হবে। তাঁকে প্রশ্ন করা হবে : আমার প্রেরিত রসূল সম্পর্কে তোমার কর্মপন্থা কেমন ছিল? সে বলবে : পরওয়ানদিগার, আমি তো আপনার প্রতি, আপনার রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিলাম এবং তাঁদের আনুগত্য করেছিলাম। আল্লাহ তা'আলা বলবেন : তোমার আমলনামা সামনে রাখা হয়েছে। এতে তো এমন কিছু নেই। লোকটি বলবে : আমি এই আমলনামা মানি না। আল্লাহ বলবেন : আমার কেরেশ-তারা তোমার দেখাশোনা করত। তারা তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়। লোকটি বলবে :





(৬০) যখন মুসা তাঁর যুবক (সঙ্গী)-কে বললেন : দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে না পৌঁছা পর্যন্ত আমি আসব না অথবা আমি যুগ যুগ ধরে চলতে থাকব। (৬১) অতঃপর যখন তাঁরা দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে পৌঁছালেন, তখন তাঁরা নিজেদের মাছের কথা ডুলে গেলেন। অতঃপর মাছটি সমুদ্রে সুড়ঙ্গপথ সৃষ্টি করে নেমে গেল। (৬২) যখন তাঁরা সেস্থানটি অতিক্রম করে গেলেন, মুসা সঙ্গীকে বললেন : আমাদের নাশ্তা আন। আমরা এই সফরে পরিপ্রান্ত হয়ে পড়েছি। (৬৩) সে বলল : আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, আমরা যখন প্রস্তরখণ্ডে আশ্রয় নিয়েছিলাম, তখন আমি মাছের কথা ডুলে গিয়েছিলাম। শয়তানই আমাকে একথা স্মরণ রাখতে ডুলিয়ে দিয়েছিল। মাছটি আশ্চর্যজনকভাবে সমুদ্রে নিজের পথ করে নিয়েছে। (৬৪) মুসা বললেন : আমরা তো এ স্থানটিই খুঁজছিলাম। অতঃপর তারা নিজেদের চিহ্ন ধরে ফিরে চললেন। (৬৫) অতঃপর তাঁরা আমার বান্দাদের মধ্যে এমন একজনের সাক্ষাৎ পেলেন, যাকে আমি আমার পক্ষ থেকে রহমত দান করেছিলাম ও আমার পক্ষ থেকে দিয়েছিলাম এক বিশেষ জ্ঞান। (৬৬) মুসা তাঁকে বললেন : আমি কি এ শর্তে আপনার অনুসরণ করতে পারি যে, সত্যাপথের যে জ্ঞান আপনাকে শেখানো হয়েছে, তা থেকে আমাকে কিছু শিক্ষা দেবেন? (৬৭) তিনি বললেন : আপনি আমার সাথে কিছুতেই ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারবেন না। (৬৮) যে বিষয় বোঝা আপনার আন্তর্ভাষী নয়, তা দেখে আপনি ধৈর্যধারণ করবেন কেমন করে? (৬৯) মুসা বললেন : আল্লাহ্ চাহেন তো আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাঠান এবং আমি আপনার কোন আদেশ অমান্য করব না। (৭০) তিনি বললেন : যদি আপনি আমার অনুসরণ করেনই তবে কোন বিষয়ে আমাকে প্রমত্ত করবেন না, যে পর্যন্ত না আমি নিজেই সে সম্পর্কে আপনাকে কিছু বলি।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং সে সময়টি স্মরণ কর, যখন মুসা (আ) নিজের খাদেমকে [তার নাম ছিল 'ইউশা' (বোখারী)] বললেন : আমি (এই সফরে) অনবরত চলতে থাকব, যে পর্যন্ত না সে স্থানে পৌঁছে যায়, যেখানে দুই সমুদ্র পরস্পর মিলিত হয়েছে, অথবা এমনিই যুগ যুগ ধরে চলতে থাকব। এই সফরের কারণ ছিল এই যে, একবার মুসা (আ) বনী ইসরাঈলের সভায় ওয়াহ কল্পলে জনৈক ব্যক্তি জিত্তেস করল : বর্তমানে মানুষের মধ্যে সবচাইতে জানী কে? তিনি বললেন : আমি। উদ্দেশ্য এই ছিল যে, আল্লাহ্ নৈকট্য-লাভে যেসব জ্ঞান সহায়ক, সেগুলোতে আমার সমান কেউ নেই। এটা বলা নির্ভুল ছিল। কেননা তিনি আল্লাহ্ তা'আলার একজন মহানুভব পয়গম্বর ছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর সমান কেউ জানী ছিল না। কিন্তু বাহ্যিক তাঁর এ ভাষার অর্থ দাঁড়ায় ব্যাপক। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে কথাবার্তায় সতর্কতা শিক্ষা দিতে চাইলেন। তাই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বলা হল : দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে অবস্থানকারী আমার এক বান্দা আপনার চাইতে অধিক জ্ঞানের অধিকারী। উদ্দেশ্য এই ছিল যে, কতক বিষয়ে সে আপনার চাইতে

অধিক জ্ঞান রাখা, যদিও আল্লাহর নৈকট্যলাভে সেগুলো সহায়ক নয়। কিন্তু এর ভিত্তিতে জওয়াবে নিজকে 'অধিক জানী' বলা উচিত হয়নি। একথা শুনে মুসা (আ) তাঁর সাথে সাক্ষাতের আগ্রহ প্রকাশ করলেন এবং তাঁর কাছে পৌঁছার উপায় জিজ্ঞেস করলেন। আল্লাহ তা'আলা বললেন : একটি নিষ্পাণ মাছ সাথে নিয়ে সফর করুন। যেখানে মাছটি হারিয়ে যাবে, সেখানেই আমার সে বান্দার সাক্ষাত পাবেন।

তখন মুসা (আ) 'ইউশা'-কে সাথে নেন এবং উপরোক্ত কথা বলেন। অতঃপর যখন (চলতে চলতে) তাঁরা দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে পৌঁছালেন, [তখন সেখানে একটি প্রস্তরখণ্ডে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। মাছটি আল্লাহর আদেশে জীবিত হয়ে সমুদ্রে পতিত হল। 'ইউশা' জাগ্রত হয়ে মাছটি পেলেন না। ইচ্ছা ছিল, মুসা (আ) জাগ্রত হলে তাঁকে জানাবেন। কিন্তু একথা তাঁর মোটেই স্মরণ ছিল না। সম্ভবত পরিবার-পরিজন ও দেশের চিন্তা তাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল। নতুবা এমন আশ্চর্যজনক বিষয় ভুলে যাওয়ার কথা নয়। কিন্তু যে ব্যক্তি সদাসর্বদা মু'জিয়া প্রত্যক্ষ করে, তার মন থেকে কোন চিন্তার কারণে নিশ্চিন্তা আশ্চর্যজনক বিষয় উধাও হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। মুসা (আ)-র জিজ্ঞেস করার সুযোগ হল না। এভাবে] তাঁরা তাঁদের মাছের কথা ভুলে গেলেন এবং মাছটি (ইতিপূর্বে জীবিত হয়ে) সমুদ্রে পথ করে চলে গেল। অতঃপর যখন তাঁরা (সেখান থেকে) সম্মুখে এগিয়ে গেলেন (এবং অনেক দূরে পৌঁছে গেলেন) তখন মুসা (আ) খাদেমকে বললেন : আমাদের নশ্তা আন। আমরা এই সফরে (অর্থাৎ আজকের মনযিলে) অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছি। পূর্বকার মনযিলসমূহে এত ক্লান্ত হইনি। এর কারণ বাহ্যিক গন্তব্যস্থল অতিক্রম করে যাওয়া ছিল। খাদেম বলল : আপনি লক্ষ্য করেছেন কি (যে, এক আশ্চর্য ব্যাপার হয়ে গেছে), যখন আমরা প্রস্তরখণ্ডের নিকটে অবস্থান করছিলাম, (এবং ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, তখন মাছটির একটি ঘটনা ঘটে গিয়েছিল। আমার ইচ্ছা ছিল আপনাকে জানাব, কিন্তু আমি অন্য চিন্তার বাস্তব হয়ে পড়েছিলাম বলে) তখন মাছের (আলোচনার) কথা ভুলে গিয়েছিলাম। শয়তানই আমাকে এ কথা স্মরণ রাখতে ভুলিয়ে দিয়েছিল। (ঘটনা এই যে) মাছটি জীবিত হওয়ার পর আশ্চর্যজনকভাবে সমুদ্রে নিজের পথ করে নিয়েছে। (এক আশ্চর্যজনক বিষয় তো ছিল মাছটির জীবিত হওয়া। দ্বিতীয় আশ্চর্যজনক বিষয় ছিল এই যে, মাছটি সমুদ্রে যে পথ দিয়ে চলেছিল, সেই পথের পানি অলৌকিকভাবে সুড়ঙ্গের মত হয়ে গিয়েছিল। পরে সম্ভবত সুড়ঙ্গ বন্ধ হয়ে গেছে।) মুসা [(আ) এ কাহিনী শুনে বললেন] আমরা তো এ স্থানটিই খুঁজছিলাম (সেখানেই ফিরে যাওয়া উচিত)। অতঃপর তাঁরা নিজেদের পদচিহ্ন দেখে দেখে ফিরে চললেন (সম্ভবত রাস্তাটি সড়ক ছিল না, তাই পায়ের চিহ্ন দেখতে হয়েছে)। অতঃপর (সেখানে পৌঁছে) তাঁরা আমাদের মধ্যে একজনের (অর্থাৎ শিখিরের) সাক্ষাত পেলেন, যাকে আমি বিশেষ রহমত (অর্থাৎ আমার সন্তুষ্টি) দান করেছিলাম (রহমতের অর্থ বেলায়েত ও নবুয়ত উভয়টি হওয়া সম্ভবপর) এবং আমার কাছ থেকে (অর্থাৎ উপার্জনের মাধ্যম ছাড়াই) শিখিয়েছিলাম বিশেষ জ্ঞান। [অর্থাৎ সৃষ্টিরহস্যের জ্ঞান। পরবর্তী ঘটনাবলী থেকে তা জানা যাবে। আল্লাহর নৈকট্য-

লাভে এই জ্ঞানের কোন প্রভাব নেই। যে জ্ঞান নৈকট্যালাভে সহায়ক, তা হচ্ছে আল্লাহর রহস্যের জ্ঞান। এতে মুসা (আ) অগ্রণী ছিলেন। মোটকথা] মুসা [ (আ) তাঁকে সালাম করলেন এবং তাঁকে ] বললেন : আমি কি আপনার সাথে থাকতে পারি ( অর্থাৎ আমাকে আপনার সাথে থাকার অনুমতি দিন ) এই শর্তে যে, যে উপকারী জ্ঞান আপনাকে ( আল্লাহর পক্ষ থেকে ) শেখানো হয়েছে, তা থেকে আমাকে কিছু শিক্ষা দেবেন ? তিনি বললেন : আপনি আমার সাথে থেকে ( আমার ক্রিয়াকর্মে ) ধৈর্য ধরতে পারবেন না ( অর্থাৎ আপনি আমার ফার্মকলাপের ব্যাপারে অনধিকার চর্চা করবেন। শিক্ষা সম্পর্কিত ব্যাপারে শিক্ষার্থী শিক্ষককে অনভিপ্রেত ও অসমরোচিতভাবে প্রশ্ন করলে তা অনধিকার চর্চা হয়ে পড়ে এবং ফলে সহঅবস্থান কঠিন হয়ে পড়ে )। এমন বিষয় সম্পর্কে ( এরকম ব্যাপারে ) আপনি কি করে ধৈর্য ধরবেন, যা আপনার জ্ঞানের আওতার বাইরে ( অর্থাৎ কারণ জানা না থাকার কারণে বিষয়টি বাহ্যত শরীয়তবিরোধী মনে হবে। আপনি শরীয়তবিরোধী কাজে চুপ থাকতে পারবেন না। ) মুসা (আ) বললেন : ( না ) ইনশাআল্লাহ আপনি আমাকে ধৈর্যশীল ( অর্থাৎ সংযমী ) পাবেন এবং আমি আপনার কোন আদেশ অমান্য করব না। ( উদাহরণত বাধা দিতে নিষেধ করলে বাধা দেব না। এমনভাবে অন্য কোন বিষয়েও বিরুদ্ধাচরণ করব না )। তিনি বললেন : ( আচ্ছা ) যদি আপনি আমার সাথে থাকতে চান, তবে ( লক্ষ্য রাখবেন যে ) আমাকে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করবেন না, যে পর্যন্ত না আমি নিজেই সে সম্পর্কে আপনাকে কিছু বলি।

আনুশঙ্গিক জাভাব্য বিষয়

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاٰهُ ۖ

মুসা ইবনে ইমরান (আ)-কে বোঝানো হয়েছে। নওফল বাব্বালী অন্য এক মুসার সাথে এ ঘটনাকে সম্বন্ধযুক্ত করেছেন। সহীহ্ বোখারীতে হযরত ইবনে আক্বাসের পক্ষ থেকে তার তীব্র খণ্ডন বর্ণিত রয়েছে।

فتى - এর শাব্দিক অর্থ যুবক। শব্দটিকে কোন বিশেষ ব্যক্তির সাথে সম্বন্ধ

করা হলে অর্থ হয় খাদেম। কেমননা, অধিকাংশ ক্ষেত্রে শক্তিশালী যুবক দেখে খাদেম রাখা হয়, যে সবক্কম কাজ সম্পন্ন করতে পারে। উভ্য ও খাদেমকে যুবক বলে ডাকা একটি ইসলামী শিষ্টাচার। ইসলামের শিক্ষা এই যে, চাকরদেরকেও গোলাম অথবা চাকর বলে সম্বোধন করা না; বরং ভাল খেতাব দ্বারা ডাক। এখানে فتى শব্দটিকে মুসা (আ)-র দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে। তাই অর্থ হবে মুসা (আ)-র খাদেম। হাদীসে বর্ণিত রয়েছে, এই খাদেম ছিল ইউশা ইবনে নূন ইবনে ইফরায়ীম ইবনে ইউসুফ (আ)। কোন কোন রেওয়াজেতে রয়েছে যে, সে মুসা (আ)-র ভাগ্নেয় ছিল। কিন্তু এ সম্পর্কে কোন চূড়ান্ত ফয়সালা করা যায় না। সহীহ্ রেওয়াজেতে প্রমাণিত রয়েছে যে, তার নাম ছিল ইউশা ইবনে নূন। অবশিষ্ট অবস্থার প্রমাণ নেই।---(কুরতুবী)

مَجْمَعُ الْبَحْرَيْنِ

—এর শাব্দিক অর্থ দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থল। বলা বাহুল্য,

এ ধরনের স্থান দুনিয়াতে অসংখ্য আছে। এখানে কোন্ জায়গা বোঝানো হয়েছে, কোরআন ও হাদীসে তা নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। তাই ইজিত ও লক্ষণাদিদুগেট তফসীরবিদদের উক্তি বিভিন্নরূপ। কাতাদাহ্ বলেন : পায়স্য উপসাগর ও রোম সাগরের সঙ্গমস্থল বোঝানো হয়েছে। ইবনে আতিয়্যার মতে আজ্জাবাইফানের নিকটে একটি স্থান, কেউ কেউ জর্দান নদী ও ভূমধ্যসাগরের মিলনস্থলের কথা বলেছেন। ফেই বলেন : এ স্থানটি তুজায় অবস্থিত। ইবনে আবী কা'বের মতে এটি আফ্রিকা় অবস্থিত। সুদীর মতে এটি আর্মেনিয়ায় অবস্থিত (অনেকের মতে বাহরে-আন্দালুস ও বাহরে মুহীতের সঙ্গমস্থলই হচ্ছে এই স্থান। মোট-কথা, এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, আল্লাহ্ তা'আলা মুসা (আ)-কে সে স্থানটি নির্দিষ্ট করে বলে দিয়েছিলেন।—(কুরতুবী)

হযরত মুসা (আ) ও শিথিরের কাহিনী : সহীহ্ লোখারী ও মুসলিমে হযরত উবাই ইবনে কা'বের রেওয়াজেতে ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন : একদিন হযরত মুসা (আ) বনী ইসরাঈলের এক সভায় ভাষণ দিচ্ছিলেন। জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করল : সব মানুষের মধ্যে অধিক জানী কে? হযরত মুসা (আ)-র জানামতে তাঁর চাইতে অধিক জানী আর কেউ ছিল না। তাই বলেন : আমি সবার চাইতে অধিক জানী। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নৈকটাত্মিক বান্দাদেরকে বিশেষভাবে গড়ে তোলেন। তাই এ জওয়াব তিনি পছন্দ করলেন না। এখানে বিষয়টি আল্লাহ্‌র উপর ছেড়ে দেয়াই ছিল আদব। অর্থাৎ একথা বলে দেয়া উচিত ছিল যে, আল্লাহ্ তা'আলাই ভাল জানেন, কে অধিক জানী। এ জওয়াবের কারণে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে মুসা (আ)-কে তিরস্কার করে ওহী নাযিল হল যে, দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে অবস্থানকারী আমার এক বান্দা আপনার চাইতে অধিক জানী। [একথা শুনে মুসা (আ) প্রার্থনা জানালেন যে, তিনি অধিক জানী হলে তাঁর কাছ থেকে জ্ঞান লাভের জন্য আমার সফর করা উচিত]। তাই বললেন : ইয়া আল্লাহ্ আমাকে তাঁর স্থাননা বলে দিন। আল্লাহ্ বললেন : থলিয়্যার মধ্যে একটি মাছ নিয়ে নিন এবং দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলের দিকে সফর করুন। যেখানে পৌঁছার পর মাছটি নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে, সেখানেই আমার এই বান্দার সাফাত পাবেন। মুসা (আ) নির্দেশমত থলিয়্যার একটি মাছ নিয়ে রওয়ানা হয়ে গেলেন। তাঁর সাথে তাঁর খাদেম ইউশা ইবনে নুনও ছিল। পথিমধ্যে একটি প্রস্তরখণ্ডের উপর মাথা রেখে তাঁরা হুমিয়ে পড়লেন। এখানে হঠাৎ মাছটি নড়াচড়া করতে লাগল এবং থলিয়া থেকে বের হয়ে সমুদ্রে চলে গেল। (মাছের জীবিত হলে সমুদ্রে চলে যাওয়ার সাথে সাথে আরও একটি মু'জিযা এই প্রকাশ পেল যে) মাছটি সমুদ্রের যে পথ দিয়ে চলে গেল, আল্লাহ্ তা'আলা সেই পথে পানির স্রোত বজ্র করে দিলেন। ফলে সেখানে পানির মধ্যে একটি সড়ঙ্গের মত হয়ে গেল। ইউশা ইবনে নুন এই আশ্চর্যজনক ঘটনা নিরীক্ষণ করেছিল। মুসা (আ) নিদ্রিত ছিলেন। যখন জাগ্রত হলেন, তখন ইউশা ইবনে নুন মাছের এই আশ্চর্যজনক ঘটনা তাঁর কাছে বলতে ডুলে গেলেন। এবং সেখান

থেকে সামনে রওয়ানা হয়ে গেলেন। পূর্ণ একদিন একরাত সফর করার পর সকাল বেলায় মুসা (আ) খাদেমকে বললেন : আমাদের নাশতা আন। এই সন্ধ্যাে হাথোষ্টে ক্লাস্ত হয়ে পড়েছি। রসুলুল্লাহ্ (সা) বলেন : গন্তব্যস্থল অতিক্রম করার পূর্বে মুসা (আ) মোটেই ক্লাস্ত হননি। নাশতা চাওয়ার পর ইউশা ইবনে নূনের মাছের ঘটনা গনে পড়ল। সে ভুলে যাওয়ার ওয়র পেশ করে বলল : শয়তান আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল। অতঃপর বলল : মৃত মাছটি জীবিত হয়ে আশ্চর্যজনকভাবে সমুদ্রে চলে গেছে। তখন মুসা (আ) বললেন : সে স্থানটিই তো আমাদের লক্ষ্য ছিল। (অর্থাৎ মাছের জীবিত হয়ে নিরুদ্দেশ হওয়ার স্থানটিই ছিল গন্তব্যস্থল)।

সেমতে তৎক্ষণাৎ তাঁরা ফিরে চললেন এবং স্থানটি পাওয়ার জন্যে পূর্বের পথ ধরেই চললেন। প্রস্তরখণ্ডের নিকট পৌঁছে দেখলেন, এক ব্যক্তি আপাদমস্তক চাদরে আবৃত হয়ে শুয়ে আছে। মুসা (আ) তদবস্থায়ই সালাম করলে খিযির (আ) বললেন : এই (জনমানবহীন) প্রান্তরে সালাম কোথা থেকে এল? মুসা (আ) বললেন : আমি মুসা। হযরত খিযির প্রশ্ন করলেন : বনী ইসরাঈলের মুসা? তিনি জওয়াব দিলেন : হ্যাঁ, আমি বনী ইসরাঈলের মুসা। আমি আপনার কাছ থেকে ঐ বিশেষ জ্ঞান অর্জন করতে এসেছি, যা আদ্বাহ্ তা'আলা আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন।

হযরত খিযির বললেন : আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধরতে পারবেন না। হে মুসা, আমাকে আদ্বাহ্ তা'আলা এমন এক জ্ঞান দান করেছেন, যা আপনার কাছে নেই; পক্ষান্তরে আপনাকে এমন জ্ঞান দিয়েছেন, যা আমি জানি না। মুসা (আ) বললেন : ইনশাআদ্বাহ্, আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন। আমি কোন কাজে আপনার বিরোধিতা করব না।

হযরত খিযির বললেন : যদি আপনি আমার সাথে থাকতেই চান, তবে কোন বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করবেন না, যে পর্যন্ত না আমি নিজে তার স্বরূপ বলে দেই।

একথা বলার পর উভয়ে সমুদ্রের পাড় ধরে চলতে লাগলেন। ঘটনাক্রমে একটি নৌকা এসে গেলে তাঁরা নৌকার আন্বেহণের ব্যাপারে কথাবার্তা বললেন। মাথিরা হযরত খিযিরকে চিনে ফেলল এবং কোন রকম পারিশ্রমিক ছাড়াই তাঁদেরকে নৌকার ভুলে নিল। নৌকার চড়েই খিযির কুড়ালের সাহায্যে নৌকার একটি তুঙা তুলে ফেললেন। এতে হযরত মুসা (আ) (স্থির থাকতে পারলেন না---) বললেন : তারা কোন প্রকার পারিশ্রমিক ছাড়াই আমাদেরকে নৌকায় তুলে নিয়েছে। আপনি কি এরই প্রতিদানে তাদের নৌকা ভেঙ্গে দিলেন, যাতে সবাই ডুবে যায়? এতে আপনি অতি মন্দ কাজ করলেন। খিযির বললেন : আমি পূর্বেই বলেছিলাম, আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধরতে পারবেন না। তখন মুসা (আ) ওয়র পেশ করে বললেন : আমি আমার ওয়াদার কথা ভুলে গিয়েছিলাম। আমার প্রতি রুশট হবেন না।

রসুলুল্লাহ্ (সা) এ ঘটনা বর্ণনা করে বলেন : হযরত মুসা (আ)-র প্রথম আপত্তি ভুলক্রমে, দ্বিতীয় আপত্তি শর্ত হিসেবে এবং তৃতীয় আপত্তি ইচ্ছাক্রমে হয়েছিল (ইতিমধ্যে) একটি পাখী এসে নৌকার এক প্রান্তে বসল এবং সমুদ্র থেকে এক চক্ষু

পানি তুলে নিল। খিযির মুসা (আ)-কে বললেন : আমার জ্ঞান এবং আপনার জ্ঞান উভয়ে মিলে আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞানের মুকাবিলার এমন তুলনাও হয়না যেমনটি এ পাখীর চঞ্চুর পানির সাথে রয়েছে সমুদ্রের পানি।

অতঃপর তাঁরা নৌকা থেকে নেমে সমুদ্রের কূল ধরে চলতে লাগলেন। হঠাৎ খিযির একটি বালককে অন্যান্য বালকদের সাথে খেলা করতে দেখলেন। খিযির স্বহস্তে বালকটির মস্তক তাঁর দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিলেন। বালকটি মরে গেল। মুসা (আ) বললেন : আপনি একটি নিস্শাপ প্রাণকে বিনা অপরাধে হত্যা করেছেন। এ যে বিরাট গোনাহর কাজ করলেন! খিযির বললেন : আমি তো পূর্বেই বলেছিলাম, আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধরতে পারবেন না। মুসা (আ) দেখলেন, এ ব্যাপারটি পূর্বাগেকা গুরুতর। তাই বললেন : এরপর যদি কোন প্রস্ন করি, তবে আপনি আমাকে পৃথক করে দেবেন। আমার ওয়স-আপত্তি চূড়ান্ত হয়ে গেছে।

অতঃপর আবার চলতে লাগলেন। এক গ্রামের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় তারা গ্রামবাসীদের কাছে খাবার চাইলেন। তারা সোজা অস্বীকার করে দিল। হযরত খিযির এই গ্রামে একটি প্রাচীরকে পতনান্মুখ দেখতে পেলেন। তিনি নিজ হাতে প্রাচীরটি সোজা করে দিলেন। মুসা (আ) বিস্মিত হয়ে বললেন : আমরা তাদের কাছে খাবার চাইলে তারা দিতে অস্বীকার করল অথচ আপনি তাদের এত বড় কাজ করে দিলেন; ইচ্ছা করলে এর পারিশ্রমিক তাদের কাছ থেকে আদায় করতে পারতেন। খিযির বললেন :

هَذَا فِرَاقٌ بَيْنِي وَبَيْنَكَ — অর্থাৎ এখন শর্ত পূর্ণ হয়ে গেছে। এটাই আমার ও

আপনার মধ্যে বিচ্ছেদের সময়।

এরপর খিযির উপরোক্ত ঘটনারূপের স্বরূপ মুসা (আ)-র কাছে বর্ণনা করে বললেন :

ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ مَبْرَأًا — অর্থাৎ এ হচ্ছে সে সর্ব ঘটনার স্বরূপ; যেগুলো দেখে আপনি ধৈর্য ধরতে পারেন নি। রুসুলুল্লাহ্ (সা) সম্পূর্ণ ঘটনার বর্ণনা করে বললেন : মুসা (আ) যদি আরও কিছুক্ষণ ধৈর্য ধরতেন, তবে তাদের আন্নও কিছু জানা যেত।

বোখারী ও মুসলিমে বর্ণিত এই দীর্ঘ হাদীসে পরিষ্কার উল্লেখ রয়েছে যে, মুসা বলতে বনী ইসরাঈলের পরগণ্ডর মুসা (আ) এবং তাঁর যুবক সঙ্গীর নাম ইউশা ইবনে নূন এবং দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে যে বান্দার কাছে মুসা (আ)-কে প্রেরণ করা হয়েছিল, তিনি ছিলেন খিযির (আ)। অতঃপর আয়াতসমূহের তফসীর দেখুন।

সফরের কতিপয় আদব এবং পরগণ্ডরসুলভ সংকল্পের একটি নমুনা :

لَا أُبْرِحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْفَىٰ حَقْبًا — এ বাক্যটি হযরত

মুসা (আ) তাঁর সফরসঙ্গী ইউশা ইবনে নূনকে বলেছিলেন। এর উদ্দেশ্য ছিল সফরের দিক ও

গন্তব্যস্থল সম্পর্কে তাঁর সঙ্গীকে অবহিত করা। সফরের জরুরী বিষয়াদি সম্পর্কে সঙ্গীকে অবহিত করাও একটি আদব। অহংকারীরা তাদের খাদেম ও পরিচারকদেরকে সম্বোধনেরই যোগ্য মনে করেন না এবং নিজের সফর সম্পর্কে কোন কিছুই বলে না।

حَقْبًا শব্দটি حَقْبَةٌ এর বহুবচন। আভিধানিক অর্থে আশি বছরে এক হকবা।

কান্নও কারও মতে আরও বেশী সময়ে এক হকবা হয়। এর কোন নির্দিষ্ট সীমা নেই। মুসা (আ) সঙ্গীকে বলে দিলেন যে, আজ্জাহর নির্দেশ অনুযায়ী আমাকে দুই সমুদ্রের সন্ন্যাসস্থলে পৌঁছাতে হবে। আমার সংকল্প এই যে, যতদিনই লাগুক, গন্তব্যস্থলে না পৌঁছা পর্যন্ত সফর অব্যাহত রাখব। আজ্জাহ তা'আলার আদেশ পালনে পন্নগছরদের সংকল্প এমনি দৃঢ় হয়ে থাকে।

খিযিরের চাইতে মুসা (আ)-র প্রেচ্ছত্ব, তার বিশেষ প্রশিক্ষণ ও মুজিবা :

فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا لِسِيًّا حَوْثُمًا فَاتَّخَذَ سَبِيلًا فِي الْبَحْرِ سَرَبًا

কোরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, হযরত মুসা (আ) পন্নগছর কুলের মধ্যেও বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। আজ্জাহ তা'আলার সাথে কথাপকথনের বিশেষ মর্যাদা তাঁর অনন্য বৈশিষ্ট্য। হযরত খিযিরের নব্বয়ত সম্পর্কেও মতভেদ রয়েছে। যদি নবী মেনেও নেয়া যায়, তবে তিনি রসূল ছিলেন না। তাঁর কোন প্রস্থ নেই এবং কোন বিশেষ উম্মতও নেই। তাই মুসা (আ) হযরত খিযিরের চাইতে সর্বা-বহুমান বহুগুণে প্রেচ্ছ। কিন্তু আজ্জাহ তা'আলা নৈকট্যশীলদের সামান্যতম হুষ্টিও সংশোধন করেন। তাঁদের প্রশিক্ষণের খাতিরে সামান্যতম হুষ্টির জন্যেও তিরস্কার করা হয় এবং সে মাগকাতিতেই তাঁদের দ্বারা হুষ্টি পূরণ করিয়ে নেয়া হয়। আগাগোড়া কাহিনীটি এই বিশেষ প্রশিক্ষণেরই বহিঃপ্রকাশ। 'আমি সর্বাধিক জানী' মুসা (আ)-র মুখ থেকে অসতর্ক মুহূর্তে একখাটি বের হয়ে গেলে আজ্জাহ তা'আলা তা অপছন্দ করেন। তাঁকে হুঁশিয়ার করার জন্য এমনি এক বান্দার ঠিকানা তাঁকে দিলেন, যার কাছে আজ্জাহ প্রদত্ত বিশেষ জ্ঞান ছিল। সেই জ্ঞান মুসা (আ)-র কাছে ছিল না। যদিও মুসা (আ)-র জ্ঞান মর্তব্যের দিক দিয়ে প্রেচ্ছ ছিল, কিন্তু তিনি সেই বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন না। এদিকে আজ্জাহ তা'আলা মুসা (আ)-কে জানার্জনের অসীম প্রেরণা দান করেছিলেন। ফলে নতুন জ্ঞানের কথা শুনেই তিনি তা অর্জন করার জন্য শিক্ষার্থীর বেশে সফর করতে প্রস্তুত হয়ে গেলেন এবং আজ্জাহ তা'আলার কাছেই খিযিরের ঠিকানা জিজ্ঞেস করলেন। এখানে প্রশ্নাধিকার বিময় এই যে, আজ্জাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে এখানেই খিযিরের সাথে মুসা (আ)-র সাক্ষাত অনায়াসে ঘটাতে পারতেন অথবা মুসা (আ)-কেই পরিষ্কার ঠিকানা বলে দিতে পারতেন। ফলে সেখানে পৌঁছা কষ্টকর হত না। কিন্তু ঠিকানা অস্পষ্ট রেখে বলা হয়েছে যে, যেখানে মৃত মাহ জীবিত হয়ে নিক-ক্দেশ হয়ে যাবে, সেখানেই খিযিরকে পাওয়া যাবে।

বোখারীর হাদীস থেকে মাছ সম্পর্কে জানা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকেই খলিয়াম মাছ রেখে দেয়ার নির্দেশ হয়েছিল! তবে তা খাবার হিসেবে রাখার আদেশ হয়েছিল, না অন্য কোন উদ্দেশ্যে—তা জানা যায় না। তবে উভয় সম্ভাবনাই রয়েছে। তাই কোন কোন তফসীরবিদ বলেন যে, এই ভাজা কব্জা মাছটি খাওয়ার জন্য রাখা হয়েছিল এবং তারা তা থেকে সফরকালে আহারও করেছেন। মাছটির অর্ধেক জীবিত হয়ে সমুদ্রে চলে যায়।

ইবনে আতিয়া ও অন্য কয়েকজন একথাও বর্ণনা করেছেন যে, মাছটি মু'জিয়া হিসেবে পরবর্তীকালে জীবিত ছিল এবং অনেকে তা দেখেছে বলেও দাবি করেছে। মাছটির এক পাখি অক্ষত এবং অপর পাখি ভক্ষিত ছিল। ইবনে আতিয়া নিজেও দেখেছেন বলে বর্ণনা করেছেন।—(কুরতুবী)

কোন কোন তফসীরবিদ বলেন যে, নাশতার খলে ছাড়া পৃথক একটি খলেতে মাছ রাখার নির্দেশ হয়েছিল। এ তফসীর থেকেও বোঝা যায় যে, মাছটি মৃত ছিল। কাজেই জীবিত হয়ে সমুদ্রে চলে যাওয়া একটি মু'জিয়াই ছিল।

হযরত খিযিরের অস্পষ্ট স্মৃতি কানা দেয়ার বিষয়টিও হযরত মুসা (আ)-র জন্য এক পরীক্ষা বৈ কিছুই ছিল না। এ পরীক্ষার উপর আরও পরীক্ষা ছিল এই যে,

শ্রিক গল্পবাহুলে পৌছে তিনি মাছের কথা ভুলে গেলেন। আয়াতে **نَسِيَ حُوتَهُمَا** বলে

তাদের উভয়ের ভুলে যাওয়ার কথা ব্যক্ত করা হয়েছে। কিন্তু বোখারীর হাদীসে বর্ণিত কাহিনী থেকে জানা যায় যে, মাছটি জীবিত হয়ে সমুদ্রে চলে যাওয়ার সময় মুসা (আ) নিদ্রিত ছিলেন। শুধু ইউশা ইবনে নুন এ আশ্চর্য ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেছিল এবং জাগ্রত হওয়ার পর মুসা (আ)-কে জানাবার ইচ্ছা করছিল। কিন্তু পরে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ভুলে ফেল রাখেন। সুতরাং আয়াতে 'উভয়ে ভুলে গেলেন' কথাটা এমন হবে, যেমন

অন্য এক আয়াতে **يُخْرِجُ مِنْهُمَا التُّرُوتُ وَالْمُرْجَانُ** বলে মিঠা সমুদ্র ও

লবণাক্ত সমুদ্র উভয়টি থেকে মোতি আহরিত হওয়ার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। অথচ মোতি শুধু লবণাক্ত সমুদ্র থেকেই আহরিত হয়। কিন্তু **تَغْلِبُهَا** এর কায়দা অনুযায়ী এরূপ লেখার পদ্ধতি সাধারণভাবে প্রচলিত রয়েছে। এটাও সম্ভব যে, সেখান থেকে সামনের দিকে চলার সময় তারা উভয়েই মাছটি সন্ধানের কথা বিস্মৃত ছিলেন। তাই আয়াতে ভুলে যাওয়াকে উভয়ের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

মোটকথা, মাছের বিষয়টি ভুলে না গেলে ব্যাপার সেখানেই শেষ হয়ে যেত। অথচ মুসা (আ)-র দ্বিতীয় পরীক্ষা নেয়া উদ্দেশ্য ছিল। তাই উভয়েই মাছের কথা ভুলে গেলেন এবং পূর্ণ একদিন ও একরাত্রির পথ অতিক্রম করার পর ক্ষুধা ও ক্লান্তি অনুভব করলেন। এটা ছিল তৃতীয় পরীক্ষা। কেননা, এর আগেও ক্ষুধা ও ক্লান্তি অনুভব করা উচিত ছিল। ফলে সেখানেই মাছের কথা স্মরণ হয়ে যেত এবং এত দূরবর্তী সফরের



প্রয়োজন হত না; কিন্তু মুসা (আ) আরও একটু কণ্ট করুক, এটাই ছিল আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা। তাই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার পর ক্ষুধা ও ক্লান্তি অনুভূত হয় এবং মাছের কথা মনে পড়ে। অতঃপর সেখান থেকেই তাঁরা পদচিহ্ন অনুসরণ করে ফিরে চলেন।

মাছের সমুদ্রে চলে যাওয়ার কথাটি প্রথমবার **سَرَى** শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। এর অর্থ সুড়ঙ্গ। পাহাড় রাস্তা তৈরি করার জন্য অথবা শহরে ভূগর্ভস্থ পথ তৈরি করার উদ্দেশ্যে সুড়ঙ্গ খনন করা হয়। এ থেকে জানা গেল যে, মাছটি সমুদ্রে যেদিকে যেত, সেদিকে একটি সুড়ঙ্গের মত পথ তৈরি হয়ে যেত। বুখারীর হাদীস থেকে তাই জানা যায়। দ্বিতীয়বার যখন ইউশা ইবনে নুন দীর্ঘ সফরের পর এ ঘটনাটি উল্লেখ করে, তখন **وَأَخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا** শব্দে বর্ণনা করা হয়েছে। উভয় বর্ণনার মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। কেননা পানিতে সুড়ঙ্গ তৈরি হওয়া অসম্ভব একটা অভ্যাসবিরুদ্ধ আশ্চর্য ঘটনা।

হযরত খিযিরের সাথে সাক্ষাত এবং তাঁর নবুয়তের প্রমাণ : কোরআন পাকে ঘটনার এই মূল ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হয়নি; বরং **عَبْدٌ مِّنْ عِبَادِنَا** (আমার বান্দাদের একজন। বলা হয়েছে। বুখারীর হাদীসে তাঁর নাম খিযির উল্লেখ করা হয়েছে। খিযির অর্থ সবুজ-শ্যামল। সাধারণ তফসীরবিদগণ তাঁর এই নামকরণের কারণ প্রসঙ্গে বলেন যে, তিনি যেখানে বসতেন, সেখানেই ঘাস উৎপন্ন হয়ে যেত, মাটি যেরূপই হোক না কেন। কোরআন পাক একথাও বর্ণনা করে যে, খিযির পরগম্বর ছিলেন না একজন ওলী ছিলেন। কিন্তু সাধারণ আলিমদের মতে তিনি যে নবী ছিলেন, একথা কোরআনে বর্ণিত ঘটনাবলী দ্বারা প্রমাণিত হয়। কেননা, এই সফরে যে কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে তন্মধ্যে কয়েকটি নিশ্চিতরূপেই শরীয়তবিরোধী। আল্লাহর ওহী বাতীত শরীয়তের নির্দেশ কোনরূপ ব্যতিক্রম হতে পারে না। নবী ও পরগম্বর ছাড়া আল্লাহর ওহী কেউ পেতে পারে না। ওলী ব্যক্তিও কাশফ ও ইলহামের মাধ্যমে কোন কোন বিষয় জানতে পারেন, কিন্তু তা এমন প্রমাণ নয়, যাঁর ভিত্তিতে শরীয়তের কোন নির্দেশ পরিবর্তন করা যায়। অতএব প্রমাণিত হল যে, খিযির আল্লাহর নবী ছিলেন। তাঁকে ওহীর মাধ্যমে কিছু সংখ্যক শরীয়তবিরোধী বিশেষ বিধান দান করা হয়েছিল। তিনি যা কিছু করেছেন, তা এই ব্যতিক্রমী বিধানের অনুসরণে করছেন। কোরআনের নিম্নোক্ত বাক্যে তাঁর পক্ষ থেকেও এ বিষয়টি প্রকাশ করা হয়েছে : **وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي** অর্থাৎ আমি নিজের পক্ষ থেকে কোন কিছু করিনি; বরং আল্লাহর নির্দেশে করেছি।

মোটকথা, সাধারণ আলিমদের মতে হযরত খিমির (আ) ও একজন নবী। তবে আন্ধাহর পক্ষ থেকে তাঁকে কিছু অপাধিব দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল এবং এ সম্পর্কিত জ্ঞানও দান করা হয়েছিল। মুসা (আ) এগুলো জানতেন না। তাই তিনি আপত্তি উত্থাপন করেছিলেন। তফসীর কুরতুবী, বাহরে মুহীত, আবু হাইয়ান প্রভৃতি গ্রন্থে এই বিষয়বস্তু বিভিন্ন ভঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে।

কোন ওলীর পক্ষে শরীয়তের বাহ্যিক নির্দেশ জ্ঞান্য করা জায়েয নয় : অনেক মূর্খ, পথভ্রষ্ট, সূফীবাদের কলংকস্বরূপ লোক একথা বলে বেড়ায় যে, শরীয়ত ভিন্ন জিনিস আর তরীকত ভিন্ন জিনিস। অনেক বিষয় শরীয়তে হারাম, কিন্তু তরীকতে হালাল। কাজেই কোন ওলীকে প্রকাশ্য কবীরী গোনাহে লিপ্ত দেখেও আপত্তি করা ঠিক নয়। উপরোক্ত আলোচনা থেকেই জানা গেল যে, তাদের এসব কথা পরিকার ধর্মদ্রোহিতা ও বাতিল। হযরত খিমির (আ)-কে দুনিয়ার কোন ওলীর মাগকাতিতে বিচার করা যায় না। এবং শরীয়তের বিরুদ্ধে তাঁর কোন কাজকে বৈধ বলা যায় না।

শিষ্যের জন্য গুরুর অনুসরণ অপরিহার্য : **هَلْ أَتَيْكَ عَلَىٰ أَنْ تَعْلَمَ**

**مَا عَلِمْتَ رَشْدًا** এখানে হযরত মুসা (আ) আন্ধাহর নবী ও শীর্ষস্থানীয় রসূল

হওয়া সত্ত্বেও হযরত খিমিরের কাছে সবিনয় প্রার্থনা করেছেন যে, আমি আপনার জ্ঞান শিক্ষা করার জন্য আপনার সাহচর্য কামনা করি। এ থেকে বোঝা গেল যে, শিষ্য শ্রেষ্ঠ হলেও গুরুর প্রতি সম্মান ও ব্রহ্মা প্রদর্শন এবং তাঁর অনুসরণ করা ওয়াজিব! এটাই জ্ঞানার্জনের আদব।—(কুরতুবী, মাযহারী)

শরীয়ত বিরুদ্ধ কাজে নিষিকার থাকা আলিমের পক্ষে জায়েয নয় :

**أَفَلَا لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۚ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ خَبْرًا**

হযরত খিমির (আ) মুসা (আ)-কে বললেন, আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধরতে পারবেন না। আসল তথা যখন আপনার জানা নেই, তখন ধৈর্য ধরবেনই বা কেমন করে? উদ্দেশ্য এই যে, আমি যে জ্ঞানলাভ করেছি, তা আপনার জ্ঞান থেকে ভিন্ন ধরনের। তাই আমার কাজকর্ম আপনার কাছে আপত্তিকর তৈর্যবে। আসল তথা আপনাকে না বলা পর্যন্ত আপনি নিজ কর্তব্যের খাতিরে আপত্তি করবেন।

মুসা (আ) স্বয়ং আন্ধাহর পক্ষ থেকে তাঁর কাছে গমনের এবং তাঁর কাছ থেকে জ্ঞানার্জনের নির্দেশ পেয়েছিলেন। তাই তাঁর কোন কাজ প্রকৃতপক্ষে শরীয়তবিরোধী হবে না, এ ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত ছিলেন। তাই তিনি ধৈর্যধারণের ওয়াদা করে নিলেন। নতুবা এরূপ ওয়াদা করাও কোন আলিমের জন্য জায়েয নয়। কিন্তু পরে শরীয়ত সম্পর্কে ধর্মীয় মর্যাদাবোধের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে কৃত ওয়াদা ভুলে গেলেন।

প্রথম ঘটনাটি তেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। শুধু নৌকাওয়ালাদের আর্থিক ক্ষতি অথবা পানিতে ডুবে যাওয়ার নিছক সম্ভাবনাই ছিল, যা পরে বাস্তবে পরিণত হয়নি। কিন্তু পরবর্তী ঘটনাবলীতে মুসা (আ) আপত্তি না করার ওয়াদাও করেননি। বালক হত্যার ঘটনা দেখে তিনি তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং এ প্রতিবাদের জন্য কোন ওয়রও পেশ করেননি। শুধু এতটুকু বললেন যে, ভবিষ্যতে প্রতিবাদ করলে আমাকে সাহচর্য দান না করার অধিকার আপনায় থাকবে। কেননা, শরীয়তবিরুদ্ধ কাজ বরদাশত করা কোন নবী ও রসূলের পক্ষে সম্ভবপর নয়। তবে প্রকৃতপক্ষেও যেহেতু পয়গম্বর ছিলেন, তাই অবশেষে এই রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয় যে, এসব ঘটনা খিমির (আ)-এর জন্য শরীয়তের সাধারণ নিয়মবহির্ভূত করে দেয়া হয়েছিল এবং তিনি ওহীর প্রত্যাদেশ অনুযায়ীই এগুলো সম্পাদন করেছিলেন।---( মাযহারী )

মুসা (আ)-এর জ্ঞান ও খিমির (আ)-এর জ্ঞানের একটি মৌলিক পার্থক্য এবং উভয়ের বাহ্যিক বৈপরীত্য সমাধান : এখানে স্রভাবতই প্রশ্ন হয় যে, খিমির (আ)-এর বর্ণনা অনুযায়ী তাঁর জ্ঞান মুসা (আ)-র জ্ঞান থেকে ভিন্ন ধরনের ছিল। কিন্তু উভয় জ্ঞানই যখন আল্লাহ প্রদত্ত তখন উভয়ের বিধি-বিধান বৈপরীত্য ও বিরোধ কেন? এ সম্পর্কে তফসীর মাযহারীতে হযরত কাযী সানাউল্লাহ পানিপথীর বক্তব্য সত্যের অধিক নিকটবর্তী এবং আকর্ষণীয়। আমি তাঁর বক্তব্যের যে মর্ম বুঝতে পেরেছি, তার সার-সংক্ষেপ নিম্নে উদ্ধৃত করা হল :

আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে ওহী ও নবুয়তের মর্যাদায় ভূষিত করেন, সাধারণত তাঁদেরকে জন-সংস্কারের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। তাঁদের প্রতি প্রস্থ ও শরীয়ত নাযিল করা হয়। এগুলোতে জনগণের হিদায়েত ও সংশোধনের নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ থাকে। কোরআন পাকে যত নবী রসূলের নাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁদের সবার উপরই শরীয়তের আইন প্রয়োগ ও সংশোধনের দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল। তাঁদের কাছে আগত ওহীও ছিল এই দায়িত্বের সাথে সম্পর্কযুক্ত। কিন্তু অপরদিকে কিছু সৃষ্টিরহস্য সম্পর্কিত দায়িত্বও তাঁদের উপর রয়েছে। সে সবার জন্য সাধারণভাবে ফেরেশতাগণ নিয়োজিত রয়েছেন। কিন্তু কোন কোন পয়গম্বরকেও আল্লাহ তা'আলা এ ধরনের দায়িত্ব পালনের জন্য বিশেষভাবে নিযুক্ত করেছেন। হযরত খিমির (আ) তাঁদেরই একজন। সৃষ্টিরহস্য সম্পর্কিত দায়িত্ব আনুষঙ্গিক ঘটনাবলীর সাথে সম্পর্ক; যেমন অমুক ডুবন্ত ব্যক্তিকে উদ্ধার করা হোক অথবা অমুককে নিপাত করা হোক অথবা অমুককে উন্নতি দান করা হোক। এগুলোর বিধি-বিধানও জন-গণের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়। এসব আনুষঙ্গিক ঘটনার মধ্যে কিছুসংখ্যক এমনও থাকে যে, এক ব্যক্তিকে নিপাত করা শরীয়তের আইনবিরুদ্ধ, কিন্তু অপাখিব আইনে এই বিশেষ ব্যাপারটিকে শরীয়তের সাধারণ আইনের আওতার বাইরে রেখে ঐ পয়গম্বরের জন্য বৈধ করে দেয়া হয়, যার যিস্মান্ন সৃষ্টিরহস্য সম্পর্কিত এই বিশেষ দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে। এমতাবস্থায় শরীয়তের আওতাবহির্ভূত বিশেষ পরিস্থিতিজনিত এই নির্দেশটি শরীয়তের আইন-বিশেষজ্ঞদের জানা থাকে না। ফলে তারা একে হারাম বলতে বাধ্য হন এবং যাকে এট আইন থেকে পৃথক রাখা হয়, তিনি যথাস্থানে সত্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকেন।

মোটকথা যেখানে বৈপরীত্য দেখা যায়, সেখানে প্রকৃত প্রস্তাবে বিপরীত নয় বরং আনুসঙ্গিক ঘটনা শরীয়তের সাধারণ আইন থেকে ব্যতিক্রম থাকে মাত্র। আবু হাইয়ান বাহরে-মুহীতে বলেন :

الجمهور على أن الخضر نبى وكان عمه معرفة بواطنه  
أوحيت إليه وعلم موسى الأحكام والفتيا بالظاهر-

তাই এই ব্যতিক্রমটি নবুয়ত সম্পর্কিত ওহীর মাধ্যমে হওয়া জরুরী। কোন কাশফ ও ইলহাম এই ব্যতিক্রমের জন্য যথেষ্ট নয়। হযরত খিযির কতৃক বালক হত্যা শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম ছিল, কিন্তু তাঁকে সৃষ্টিগতভাবে শরীয়তের এই আইনের উর্ধ্বে রেখে এ কাজের জন্য আদেশ করা হয়েছিল। নবী নয়—এমন কোন ব্যক্তিকে তাঁর মাপকাঠিতে বিচার করে কোন হারামকে হালাল মনে করা—যেমন শুণ্ড সূফীদের মধ্যে প্রচলিত আছে—সম্পূর্ণ ধর্মদ্রোহিতা ও ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার নামান্তর।

ইবনে আবী শায়বা হযরত ইবনে আক্বাসের ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, একবার নাজদাহ হারুরী (খারেজী) ইবনে আক্বাসের কাছে পত্র লিখল যে, হযরত খিযির (আ) নাবালেগ বালককে কিরূপে হত্যা করলেন, অথচ রসুলুল্লাহ্ (সা) নাবালেগ হত্যা করতে নিষেধ করেছেন? ইবনে আক্বাস জওয়াবে লিখলেনঃ কোন বালক সম্পর্কে যদি তোমার ঐ জ্ঞান অজিত হয়ে যায়, যা খিযির (আ)-এর অজিত হয়েছিল, তবে তোমার জন্যও নাবালেগ হত্যা করা জায়েয হয়ে যাবে। উদ্দেশ্য এই :য, খিযির (আ) নবুয়তের ওহীর মাধ্যমে এই জ্ঞান লাভ করেছিলেন। রসুলুল্লাহ্ (সা)-র পদ নবুয়ত বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে এখন এই জ্ঞান কেউ লাভ করতে পারবে না।---(মাহহারী)

এ ঘটনা থেকে এ কথা জানা গেল যে, কোন ব্যক্তিকে শরীয়তের আইনের উর্ধ্বে সাব্যস্ত করার অধিকার একমাত্র ওহীর অধিকারী পয়গম্বরেরই রয়েছে।

فَانطَلَقَا بِهِ حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا ۖ قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا ۚ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ۖ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۖ قَالَ لَا تَأْتُوا خِدْيَ بِمَا نَسِيتُ وَلَا تَزِدْهُنَّ مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ۖ فَانطَلَقَا بِهِ حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ ۖ قَالَ أَقْتَلْتَنِي نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ ۚ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا ۖ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۖ

قَالَ إِنْ سَأَلْتَكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصِغِبْنِي ۖ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ  
 لَدُنِّي عُذْرًا ۝ فَانطَلَقَا ۖ حَتَّىٰ إِذَا أَتَىٰ أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا  
 أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ  
 يَنْقُضَ فَاقَامَهُ ۖ قَالَ كَوْفُوتٌ لَّتَخَذَنَّ عَلَيْهِ أَجْرًا ۖ قَالَ هَذَا  
 فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ ۖ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ۝

(৭১) অতঃপর তারা চলতে লাগল; অবশেষে যখন তারা নৌকায় আরোহণ করল, তখন তিনি তাতে ছিদ্র করে দিলেন। মুসা বললেন: আপনি কি এর আরোহীদেরকে ডুবিয়ে দেয়ার জন্য এতে ছিদ্র করে দিলেন? নিশ্চয়ই আপনি একটি গুরুতর মন্দ কাজ করলেন। (৭২) তিনি বললেন: আমি কি বলিনি যে, আপনি আমার সাথে কিছুতেই ধৈর্য ধরতে পারবেন না। (৭৩) মুসা বললেন: আমাকে আমার জুলের জন্য অপরাধী করবেন না এবং আমার কাজে আমার উপর কঠোরতা আরোপ করবেন না। (৭৪) অতঃপর তারা চলতে লাগল। অবশেষে যখন একটি বালকের সাক্ষাত পেল, তখন তিনি তাকে হত্যা করলেন। মুসা বললেন: আপনি কি একটি নিষ্পাপ জীবন শেষ করে দিলেন প্রাণের বিনিময় ছাড়াই? নিশ্চয়ই আপনি তো এক গুরুতর অন্যায় কাজ করলেন। (৭৫) তিনি বললেন: আমি কি বলিনি যে, আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধরে থাকতে পারবেন না। (৭৬) মুসা বললেন: এরপর যদি আমি আপনাকে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করি তবে আপনি আমাকে সাথে রাখবেন না। আপনি আমার পক্ষ থেকে অভিযোগমুক্ত হয়ে গেছেন। (৭৭) অতঃপর তারা চলতে লাগল; অবশেষে যখন একটি জনপদের অধিবাসীদের কাছে পৌঁছে তাদের কাছে খাবার চাইল, তখন তারা তাদের আতিথেয়তা করতে অস্বীকার করল। অতঃপর তারা সেখানে একটি পতনোন্মুখ প্রাচীর দেখতে পেল, সেটি তিনি সোজা করে দাঁড় করিয়ে দিলেন। মুসা বললেন: আপনি ইচ্ছা করলে তাদের কাছ থেকে এর পরিপ্রমিত ক আদায় করতে পারতেন। (৭৮) তিনি বললেন: এখানেই আমার ও আপনার মধ্যে সম্পর্কহীন হল। এখন যে বিষয়ে আপনি ধৈর্য ধরতে পারেন নি, আমি তার তাৎপর্য বলে দিচ্ছি।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(মোটকথা পরস্পরের মধ্যে কথাবার্তা সাব্যস্ত হয়ে গেল।) অতঃপর উভয়েই (কোন একদিকে) চলতে লাগলেন; (সন্ত বত তাঁদের সাথে ইউশা'ও ছিল। কিন্তু সে মুসা (আ)-এর অধীনে ছিল। তাই দু'জনেরই উল্লেখ করা হয়েছে।) অবশেষে

( তাঁরা চলতে চলতে যখন এমন জায়গায় গিয়ে পৌঁছলেন, যেখানে নৌকায় আরোহণ করার প্রয়োজন দেখা দিল, তখন) উভয়েই নৌকায় আরোহণ করলেন, এ সময়ে তিনি (নৌকার একটি তক্তা উঠিয়ে) তাতে ছিঁদ্র করে দিলেন। মুসা (আ) বললেনঃ আপনি কি এর আরোহীদেরকে ডুবিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে এতে ছিঁদ্র করে দিলেন? আপনি একটি গুরুত্বর (আশংকার) কাজ করলেন। তিনি বললেনঃ আমি কি বলিনি যে, আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধারণ করতে পারবেন না? (অবশেষে তাই হয়েছে। আপনি অপাকার শ্রিক রাখতে পারলেন না।) মুসা (আ) বললেনঃ (আমি ভুলে গিয়েছিলাম।) আপনি আমার ভুলের জন্য আমাকে অপরাধী করবেন না এবং আমার এই (অনুসরণের) কাজে আমার উপর (এমন) কঠোরতা আরোপ করবেন না। (হাতে জুলন্তুটিও মার্জন করা যায় না। ব্যাপারটি এখানেই শেষ হয়ে গেল।) অতঃপর উভয়েই (নৌকা থেকে নেমে সামনে) চলতে লাগলেন; অবশেষে যখন একটি (নাবাগেগ) বাগকের সাক্ষাত পেলেন; তখন তিনি তাকে হত্যা করলেন। মুসা (আ) (অস্থির হয়ে) বললেনঃ আপনি কি একটি নিষ্পাপ জীবনকে শেষ করে দিলেন (তাও) কোন প্রাণের বদলা ছাড়াই? নিশ্চয় আপনি এক বিরাট অন্যায় কাজ করলেন। (প্রথমত এটা নাবাগেগের হত্যা, যাকে খুনের বদলেও হত্যা করা যায় না। তদুপরি সে তো কাউকে হত্যাও করেনি। এ কাজটি প্রথম কাজের চাইতেও গুরুত্বর। কেননা, প্রথম কাজে ছিল শুধু আর্থিক ক্ষতি। আরোহীদের নিমজ্জিত হওয়ার আশংকা, কিন্তু তা রোধ করা হয়েছিল। এ ছাড়া নাবাগেগ বাগক সর্বপ্রকার পোনাহ্ থেকে মুক্ত।) তিনি বললেনঃ আমি কি বলিনি যে, আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধরতে পারবেন না? মুসা (আ) বললেনঃ (হাক, এবারও ক্ষমা করুন, কিন্তু) এরপর যদি আমি আপনাকে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করি, তবে আপনি আমাকে সাথে রাখবেন না! নিশ্চয় আপনি আমার পক্ষ থেকে (চূড়ান্তরূপে) নির্দোষ হয়ে গেছেন। [এবার মুসা (আ)-ভুলের জন্য কোন ওষুধ পেশ করেননি। এতে বোঝা যায় যে, এ প্রমাণি তিনি পয়গম্বরসুলভ মর্যাদার ভিত্তিতে ইচ্ছাকৃতভাবেই করেছিলেন।] অতঃপর উভয়েই সামনে চলতে লাগলেন; অবশেষে যখন একটি জনপদের অধিবাসীদের কাছে পৌঁছে তাদের কাছে খাবার চাইলেন (যে, আমরা অতিথি;) তখন তারা তাঁদের আতিথেয়তা করতে অস্বীকার করল। ইতিমধ্যে তারা সেখানে একটি পতনোন্মুখ প্রাচীর দেখতে পেলেন। তখন তিনি তাকে (হাতের ইশারায় মূর্জিয়াস্বরূপ) সোজা করে দিলেন। মুসা (আ) বললেনঃ আপনি ইচ্ছা করলে তাদের কাছ থেকে এর পান্নিগ্রমিক আদায় করতে পারতেন। (কলে আমাদের অভাবও দূর হত এবং তাদেরও অভদ্রতার সংশোধন হয়ে যেত।) তিনি বললেনঃ এ হচ্ছে আমার ও আপনার বিচ্ছেদের সমর (যেমন আপনি নিজেই বলেছিলেন।) এবার আমি সে বিষয়ের স্বরূপ বলে দিচ্ছি, যে বিষয়ে আপনি ধৈর্য ধরতে পারেননি? — পরবর্তী আয়াতে তা বর্ণিত হবে।

আনুশঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

أَخْرَجْنَاهَا لِلْفُرْقِ أَهْلِهَا — বুঝারী ও মুসলিমের হাদীসে আছে, খিমির (আ)

কুড়াল দ্বারা নৌকার একটি তক্তা বের করে দেন। ফলে নৌকার পানি ঢুকে নিমজ্জিত হওয়ার আশংকা দেখা দেয়। এ কারণেই মুসা (আ) প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠেন। কিন্তু ঐতিহাসিক রেওয়াজেতে বর্ণিত আছে যে, পানি নৌকার প্রবেশ করেনি—মু'জিবার কারণে হোক কিংবা খিমির (আ) কর্তৃক এর কিছুটা মেরামত করার কারণে হোক। বগতীর রেওয়াজেতে আছে যে, এই তক্তার জায়গায় খিমির (আ) একটি কাঁচ লাগিয়ে দেন। কোরআনের পূর্বাঙ্গের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, নৌকা ডুবিয়ে কোন দুর্ভটনা ঘটেনি। এর দ্বারা উপরোক্ত রেওয়াজেতগুলো সমর্থিত হয়।

حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَ غُلَامًا —আরবী ভাষায় غلام শব্দের অর্থ নাবালগ বা লক।

যে বালককে খিমির (আ) হত্যা করেন, তার সম্পর্কে অধিকাংশ তফসীরবিদ বলেন যে, সে নাবালক ছিল। পরবর্তী বাক্য نَفْسًا زَكِيَّةً শব্দ থেকেও তাঁর নাবালকত্বের সমর্থন পাওয়া যায়। কেননা, زَكِيَّةً শব্দের অর্থ পোনাহ্ থেকে পবিত্র। এ দু'গটি হয় পয়গম্বরদের মধ্যে পাওয়া যায়, না হয় নাবালগ বাচ্চাদের মধ্যে পাওয়া যায়। নাবালগদের আমলনামায় কোন পোনাহ্ লিপিবদ্ধ করা হয় না।

أَهْلَ قَرْيَةٍ —হযরত খিমির (আ) যে জনপদে পৌঁছেন এবং যার অধিবাসীরা

তাঁর আতিথেয়তা করতে অস্বীকার করে, হযরত ইবনে আব্বাসের রেওয়াজেতে সেটিকে এশাকিয়া ও ইবনে সীরীনের রেওয়াজেতে ‘আইকা’ বলা হয়েছে। হযরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত আছে যে, সেটি ছিল আন্দালুসের একটি জনপদ। — (মাহহারী)

وَاللَّهُ أَعْلَمُ

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ

أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ۝

وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَ

كُفْرًا ۚ فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ۝

وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا

وَكَانَ أَبُوهُمَا صَاحِبًا ۚ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيُخْرِجَا

كَرَاهِمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ۗ ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ  
مَا لَمْ تَشْعُرْ عَلَيْهِ صَبْرًا ۝

(৭৯) নৌকাটির ব্যাপার—সেটি ছিল কয়েকজন দরিদ্র ব্যক্তির। তারা সমুদ্রে জীবিকা অন্বেষণ করত। আমি ইচ্ছা করলাম যে, সেটিকে ভূটিমুক্ত করে দেই। তাদের অপরদিকে ছিল এক বাদশাহ। সে বলপ্রয়োগে প্রত্যেকটি নৌকা ছিনিয়ে নিত। (৮০) বালকটির ব্যাপার—তার পিতামাতা ছিল ইমানদার। আমি আশংকা করলাম যে, সে অবাধ্যতা ও কুফর দ্বারা তাদেরকে প্রভাবিত করবে। (৮১) অতঃপর আমি ইচ্ছা করলাম যে, তাদের পালনকর্তা তাদেরকে মহত্তর তার চাইতে পবিত্রতায় ও ভালবাসায় ঘনিষ্ঠতর একটি শ্রেষ্ঠ সন্তান দান করুক। (৮২) প্রাচীরের ব্যাপার—সেটি ছিল নগরের দু'জন পিতৃহীন বালকের। এর নিচে ছিল তাদের গুপ্তধন এবং তাদের পিতা ছিল সৎকর্মপরায়ণ। সুতরাং আপনাব্যাপার পালনকর্তা দয়াবশত ইচ্ছা করলেন যে, তারা যৌবনে পদার্পণ করুক এবং নিজেদের গুপ্তধন উদ্ধার করুক। আমি নিজ মতে এটা করিনি। আপনি যে বিষয়ে ধৈর্যধারণ করতে অক্ষম হয়েছিলেন, এটাই তার ব্যাখ্যা।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এবং সে নৌকার ব্যাপার—সেটি ছিল কয়েকজন দরিদ্র ব্যক্তির। তারা (এরই মাধ্যমে) সমুদ্রে মেহনত-মজুরি করত। (এর দ্বারাই তারা জীবিকা নির্বাহ করত।) আমি ইচ্ছা করলাম যে, সেটিকে ভূটিমুক্ত করে দেই। (কারণ,) তাদের সামনের দিকে একজন (অত্যাচারী) বাদশাহ ছিল। সে প্রতিটি (উৎকৃষ্ট) নৌকা জোর-জবরদস্তি করে ছিনিয়ে নিত। (আমি নৌকাটিকে ভূটিমুক্ত করে বাহ্যত অকেজা করে না দিলে এটিও ছিনিয়ে নেয়া হত। ফলে দরিদ্র মজুরদের জীবিকার অবলম্বন শেষ হয়ে যেত। এটিই ছিল ছিদ্র করার উপকারিতা।) বালকটির ব্যাপার —তার পিতামাতা ছিল ইমানদার। (বালকটি বড় হলে কাকির ও জালিম হত। পিতামাতা তাকে খুব ভালবাসত।) অতএব আমি আশংকা করলাম যে, সে অবাধ্যতা ও কুফরের মাধ্যমে তাদেরকেও না আবার প্রভাবিত করে দেয়! (অর্থাৎ পুত্রের ভালবাসায় তারাও না ধর্মদ্রোহী হয়ে যায়।) সুতরাং আমি ইচ্ছা করলাম যে, (তাকে তো শেষ করে দেয়া দরকার। অতঃপর) তার পরিবর্তে তাদের পালনকর্তা তাদেরকে পবিত্রতায় ও ভালবাসার ঘনিষ্ঠতায় তার চাইতে শ্রেষ্ঠ সন্তান (ছেলে কিংবা মেয়ে) দান করুক। প্রাচীরের ব্যাপার—সেটি ছিল নগরের দু'জন এতীম বালকের। এর নিচে ছিল তাদের কিছু গুপ্তধন (যা তাদের পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে তারা পেয়েছিল) এবং তাদের (মৃত) পিতা ছিল সৎকর্ম-পরায়ণ ব্যক্তি। তার সৎপরায়ণতার বরকতে আল্লাহ তা'আলা তার ধন সংরক্ষিত রাখতে চাইলেন। প্রাচীর এই সুস্থর্তে পড়ে গেলে সবাই গুপ্তধন লুটে-পুটে নিয়ে নিত।



এতীম বালকদের অভিভাবক সত্ত্বত দেশে ছিল না যে, এর ব্যবস্থা করবে) তাই আগনার পালনকর্তা দয়ামত চাইলেন যে, তারা উভয়েই যৌবনে পদার্পণ করুক এবং নিজেদের গুপ্তধন উদ্ধার করুক। (আমি আল্লাহর আদেশে এসব কাজ করেছি এবং এর মধ্যে) কোন কাজ আমি নিজ মতে করিনি। আপনি যে বিষয়ে ধৈর্যধারণ করতে অক্ষম হয়েছিলেন, এটা হল তার স্বরূপ। [ওয়াদানুযায়ী আমি তা বর্ণনা করে দিলাম! অতঃপর খিযির (আ) বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।]

### আনুমানিক জাতব্য বিষয়

مَا السَّفِينَةُ فَكَأَنْتَ لِمَسَاكِينٍ — কা'ব আহবাব থেকে বর্ণিত রয়েছে

যে, এই নৌকাটি যে দরিদ্রদের ছিল, তারা ছিল দশ ভাই। তন্মধ্যে পাঁচ জন ছিল বিকলাঙ্গ। অবশিষ্ট পাঁচ ভাই মেহনত-মজুরি করে সবার জীবিকার ব্যবস্থা করত। সমুদ্রে নৌকা চালিয়ে ভাড়া উপার্জন করাই ছিল তাদের মজুরি।

মিসকীনের সংজ্ঞা : কারও কারও মতে মিসকীন এমন ব্যক্তি, যার কাছে কিছুই নেই। কিন্তু আলোচ্য আয়াত থেকে মিসকীনের সঠিক সংজ্ঞা এই জানা যায় যে, অত্যাবশ্যকীয় অভাব পূরণ করার পর যার কাছে নিসাব পরিমাণ মালও অবশিষ্ট থাকে না, সে-ও মিসকীনের অন্তর্ভুক্ত। কেমনা আয়াতে যাদেরকে মিসকীন বলা হয়েছে, তাদের কাছে কমপক্ষে একটি নৌকা তো ছিল, যার মূল্য নিসাবের চাইতে কম নয়। কিন্তু নৌকাটি অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনাদি পূরণে নিয়োজিত ছিল। তাই তাদেরকে মিসকীন বলা হয়েছে।—  
(মাযহারী)

مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا — বগভী হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা

করেন যে, নৌকাটি যেরদিকে যাচ্ছিল, সেখানে একজন জালিম বাদশাহ্ এই পথে চলাচলকারী সব নৌকা ছিনিয়ে নিত। হযরত খিযির এ কারণে নৌকার একটি তক্তা উপড়িয়ে দেন, যাতে জালিম বাদশাহ্ নৌকাটি ভাঙ্গা দেখে ছেড়ে দেয় এবং দরিদ্ররা বিপদের হাত থেকে বেঁচে যায়। মওলানা রুমী চমৎকার বলেছেন :

گر خضرد و بکر گشتی را شکست  
صد رستی د و شکست خضر هست

وَأَمَّا الْفُلَامُ — হযরত খিযির (আ) যে বালকটি হত্যা করেন, তার স্বরূপ

এই বর্ণনা করেছেন যে, তার সত্ত্বাবে কুফর ও পিতামাতার অবাধ্যতা নিহিত ছিল। তার পিতামাতা ছিল সৎ কর্মপরায়ণ লোক। হযরত খিযির (আ) বলেন : আমার আশংকা ছিল

যে, ছেলেরি বড় হয়ে সৎ কর্মপরায়ণ পিতামাতাকে বিব্রত করবে এবং কষ্ট দেবে। সে ফুকরে লিপ্ত হয়ে পিতামাতার জন্য কিতনা হয়ে দাঁড়াবে এবং তার ভালবাসায় পিতামাতার ঈমানও বিপন্ন হয়ে পড়বে।

---অর্থাৎ **فَارِدْنَا أَنْ يَبْدُلَهُمَا رَيْبًا خَيْرًا مِثْلَهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رَحْمًا**

এজনা আমি ইচ্ছা করলাম, যে আল্লাহ তা'আলা এই সৎ কর্মপরায়ণ পিতামাতাকে এ ছেলের পরিবর্তে তার চাইতে উত্তম সন্তান দান করুক, যার কাজকর্ম ও চরিত্র পবিত্র হবে এবং সে পিতামাতার হকও পূর্ণ করবে।

আয়াতে **أَرَدْنَا وَخَشِينَا** ক্রিয়াপদে উত্তম পুরুষের বহুবচন ব্যবহার করা

হয়েছে। এর একটি সম্ভাব্য কারণ এই যে, খিমির (আ) এ দু'টি ক্রিয়াপদকে নিজের এবং আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্বন্ধ করেছেন। আর এটাও সম্ভব যে, নিজের দিকেই সম্বন্ধ করেছেন। এমতাবস্থায় **أَرَدْنَا**-এর অর্থ এই যে, আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করলাম। কেননা এক ছেলের পরিবর্তে অন্য উত্তম ছেলে দান করা একান্তভাবেই আল্লাহ তা'আলার কাজ। এতে খিমির অথবা অন্য কেউ শরীক হতে পারেন না।

এখানে প্রশ্ন হয় যে, ছেলেরি কাফির হবে এবং পিতামাতাকে পথভ্রষ্ট করবে--- এ বিষয়টি যদি আল্লাহর জানে ছিল তবে তাই বাস্তবায়িত হওয়া জরুরী ছিল। কেননা আল্লাহর জানের বিরুদ্ধে কোন কিছু হতে পড়েন না।

উত্তর এই যে, আল্লাহর জান এই শর্তসহ ছিল যে, সে প্রাপ্তবয়স্ক হলে কাফির হবে এবং পিতামাতার জন্য বিপদ হবে। এরপর যখন সে পূর্বেই নিহত হয়েছে, তখন এই ঘটনা আল্লাহর জানের বিপক্ষে নয়।---(মাহহারী)

ইবনে আবী শাল্বা, ইবনে মুনিযির ও ইবনে আবী হাতেম আতিয়্যার বাচনিক বর্ণনা করেন যে, নিহত ছেলের পিতামাতাকে আল্লাহ তা'আলা তার পরিবর্তে একটি কন্যা দান করেন, যার গর্ভে দু'জন নবী জন্মগ্রহণ করেন। কোন কোন রেওয়াজে রয়েছে যে, তার গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণকারী (নবীর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা একটি বিরাট উল্লেখ্যতকে হিদায়েত দান করেন !

---**وَتَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا**---হযরত আব্দারদা রসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেন

যে, প্রাচীরের নিচে রক্ষিত ইসরাঈমী বালকদের গুপ্তধন ছিল স্বর্ণ-রৌপ্যের ভাণ্ডার--- (তিরমিযী, হাকিম)

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন : সেটি ছিল স্বর্ণের একটি ফলক। তাতে নিশ্নলিখিত উপদেশ বাক্যসমূহ লিখিত ছিল : হযরত উসমান ইবনে আফফান (রা)-ও এই রেওয়াজেতটি রসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন। (কুরতুবী)

১. বিস্মিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম ।
২. সে ব্যক্তির ব্যাপারটি আশ্চর্যজনক, যে তরুদীনে বিশ্বাস করে অথচ চিন্তা-যুক্ত হয় ।
৩. সে ব্যক্তির ব্যাপারটি আশ্চর্যজনক, যে আল্লাহ্ তা'আলাকে বিশ্বিকদাতারূপে বিশ্বাস করে ; এরপর প্রয়োজনতিরিক্ত পরিশ্রম ও অনর্থক চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করে ।
৪. সে ব্যক্তির ব্যাপারটি আশ্চর্যজনক, যে মৃত্যুতে বিশ্বাস রাখে ; অথচ আনন্দিত ও প্রফুল্ল থাকে ।
৫. সে ব্যক্তির ব্যাপারটি আশ্চর্যজনক, যে পল্লকালের হিসাবনিকাশে বিশ্বাস রাখে, অথচ সৎ কাজে গাফিল হয় ।
৬. সে ব্যক্তির ব্যাপারটি আশ্চর্যজনক যে দুনিয়ার নিত্যনৈমিত্তিক পরিবর্তন জেনেও নিশ্চিত হয়ে বসে থাকে ।
৭. না-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্ ।

পিতামাতার সৎকর্মের উপকার সন্তান-সন্ততিরূপে পায় : **وَكَانَ أَبُوهُمَا**

**مَالِكًا** ---এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, হযরত শিবির (আ)-এর মাধ্যমে ইয়াতীম বালাকদের জন্য রক্ষিত গুপ্তধনের হিফায়ত এজনা করানো হয় যে, তাদের পিতা একজন সৎ কর্ম-পরায়ণ আল্লাহর প্রিয় বান্দা ছিলেন। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তার সন্তান-সন্ততির উপকারার্থে এ বাবস্থা করেন। মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির বলেন : আল্লাহ্ তা'আলা এক বান্দার সৎ কর্মপরায়ণতার কারণে তার পরবর্তী সন্তান-সন্ততি বংশধর ও প্রতিবেশীদের হিফায়ত করেন। --- (মাযহারী)

হযরত শিবরী (র) বলতেন : আমি এই শহর এবং সমগ্র এলাকার জন্য শক্তির কারণ। তাঁর ওফাতের পর তাঁর দাফন সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে দায়লামের কাফিররা দাজ্জনা নদী অতিক্রম করে বাগদাদ নগরী অধিকার করে। তখন সবাই বলাবলি করতে থাকে যে, আমাদের উপর দ্বিগুণ বিপদ চেপেছে অর্থাৎ শিবরীর ওফাত ও দায়লামের পতন।---(কুরতুবী: ১৯ খণ্ড, ২৯ পৃঃ)

তরুদীনের মাযহারীতে বলা হয়েছে, আয়াতে এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, আলিম ও সৎ কর্মপরায়ণদের সন্তান-সন্ততিদের খাতির করা এবং তাদের প্রতি স্নেহপরায়ণ হওয়ার উচিত, যে পর্যন্ত না তারা পুরোপুরি পাপচ্যারে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

**أَنْ يَبْلُغُوا أَشُدَّ** -এর বহুবচন। অর্থ শক্তি এবং সে

বয়স, যাতে মানুষ পূর্ণ শক্তি অর্জন এবং ভালমন্দের পার্থক্য করতে সক্ষম হয়। ইমাম আবু হানীফার মতে পঁচিশ বছর বয়ঃক্রম এবং কানুও মতে চল্লিশ বছর বয়ঃক্রম।

কেননা, কোরআন পাকে রয়েছে

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً

—(মাহারী)

পয়গম্বরসুলভ অলংকার ও আদবের একটি দৃষ্টান্ত : এ দৃষ্টান্তটি বোঝার আগে একটি জরুরী বিষয় বুঝে নেওয়া দরকার। তা এই যে, দুনিয়াতে কোন ভাল অথবা মন্দ কাজ আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতিরেকে সম্পন্ন হতে পারে না। ভালমন্দ সবই আল্লাহর সৃজিত এবং তাঁর ইচ্ছার অধীন। যে সব বিষয়কে মন্দ বলা হয়, সেগুলো বিশেষ ব্যক্তি অথবা বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অবশ্যই মন্দ কথিত হওয়ার যোগ্য, কিন্তু সামগ্রিক বিশ্বের প্রকৃতির জন্য সবই জরুরী এবং আল্লাহর সৃষ্টি হিসাবে সবই উত্তম ও রহস্যের উপর নির্ভরশীল।

کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں

মোটকথা দুনিয়াতে যেসব বিপদ ও দুর্ঘটনা ঘটে সেগুলো আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত ঘটেতে পারে না। এদিক দিয়ে প্রত্যেক ভাল ও মন্দের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলাকে বলা যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর সৃষ্টির দৃষ্টিকোণে কোন মন্দই মন্দ নয়। তাই আল্লাহ তা'আলাকে মন্দের স্রষ্টা না বলা আদব। কোরআনে উল্লিখিত হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর বাক্য এ আদবই শিক্ষা দেয়। তিনি বলেন :

أَلَّذِي يَطْعَمَنِي وَيَسْقِينِي وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي

তিনি পানাহার করানোকে আল্লাহর প্রতি সম্পূর্ণ করেছেন এবং অসুস্থ হওয়ার সময় আরোগ্য দান করাকেও আল্লাহর প্রতিই সম্পূর্ণ করেছেন, কিন্তু মাঝখানে অসুস্থ হওয়াকে নিজের প্রতি সম্পূর্ণ করে إِذَا مَرِضْتُ বলেছেন অর্থাৎ যখন আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি, তখন আল্লাহ তা'আলা আমাকে আরোগ্য দান করেন। এরূপ বজেননি যে, যখন আল্লাহ আমাকে অসুস্থ করে দেন তখন আরোগ্যও দান করেন।

এবার হযরত খিম্বি (আ)-এর বাক্যের প্রতি লক্ষ্য করুন। নৌকা ভাঙ্গার ইচ্ছা বাহ্যত একটি দুর্ঘণীয় ও মন্দ ইচ্ছা। তাই এ ইচ্ছাকে নিজের প্রতি সম্বন্ধযুক্ত করে أَرَدْتُ বলেছেন। অতঃপর বালক হত্যা ও তার পরিবর্তে উত্তম সন্তান দান করার মধ্যে হত্যা ছিল মন্দ কাজ এবং উত্তম সন্তান দান করা ছিল ভাল কাজ। তাই এতদুভয়ের ইচ্ছার ক্ষেত্রে বহুবচন প্রয়োগ করে أَرَدْنَا অর্থাৎ 'আমরা ইচ্ছা করলাম' বলেছেন; যাতে বাহ্যিক মন্দ কাজটি নিজের সাথে এবং ভাল কাজটি আল্লাহর সাথে সম্বন্ধযুক্ত হয়। তৃতীয় ঘটনায় প্রাচীর সোজা করে ইয়াতিমদের গুপ্তধনের হেফায়ত করা একটি সম্পূর্ণত ভাল কাজ।

তাই একে পুরোপুরি আল্লাহর দিকে সম্পূর্ণ করে **فَارَادَ رَبُّكَ** অর্থাৎ 'আপনার পালনকর্তা ইচ্ছা করলেন' বলেছেন।

হযরত খিযির (আ) জীবিত আছেন, না ওফাত হয়ে গেছে : হযরত খিযির (আ) জীবিত আছেন, না তাঁর ওফাত হয়ে গেছে; এ বিষয়ের সাথে কোরআনে বর্ণিত ঘটনার কোন সম্পর্ক নেই। তাই কোরআন ও হাদীসে স্পষ্টত এ সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করা হয়নি। কোন কোন রেওয়াজে ও উক্তি থেকে তাঁর অদ্যাবধি জীবিত থাকার কথা জানা যায়। কোন কোন রেওয়াজে থেকে এর বিপরীত বিষয় জানা যায়। ফলে এ ব্যাপারে সর্বকালেই আলিমদের বিভিন্নরূপ মতামত পরিলক্ষিত হয়েছে। যাদের মতে তিনি জীবিত আছেন, তাদের প্রমাণ হচ্ছে মুহাদ্দরা'ক হাকিম কর্তৃক হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত একটি রেওয়াজে। তাতে বলা হয়েছে : যখন রসূলুল্লাহ (সা)-র ওফাত হয়ে যায়, তখন সাদাকালো দাড়িওয়াল জৈনিক ব্যক্তি আগমন করে এবং ডিড়ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করে কান্নাকাটি করতে থাকে। এই আগন্তুক সাহাবায়ের কিয়ামের দিকে মুখ করে বলতে থাকে :

ان في الله عزاء من كل مصيبة وعوفا من كل فائت وخلفا  
من كل هالك فالى الله فانيبوا والية فارغبوا فانها المهروم  
من حرم الثواب -

আল্লাহর দরবারেই প্রত্যেক বিপদ থেকে সবার আছে, প্রত্যেক বিলুপ্ত বিষয়ের প্রতি-  
দান আছে এবং তিনিই প্রত্যেক ধ্বংসশীল বস্তুর স্থলাভিষিক্ত। তাই তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন  
কর এবং তাঁর কাছেই আগ্রহ প্রকাশ কর। কেননা যে ব্যক্তি বিপদের সওয়াব থেকে বঞ্চিত  
হয়, সে-ই প্রকৃত বঞ্চিত।

আগন্তুক উপরোক্ত বাক্য বলে বিদায় হয়ে গেলে হযরত আবু বকর (রা) ও  
আলী (রা) বললেন : ইনি হযরত খিযির (আ)। এ রেওয়াজেতে বর্ণনা করাই এ গ্রন্থের  
বিশিষ্ট্য।

মুসলিমের হাদীসে আছে যে, দাজ্জাল মদীনার নিকটবর্তী এক আয়গায় পৌঁছলে  
মদীনা থেকে এক ব্যক্তি তার মুকাবিলার জন্য বের হবেন। তিনি তৎকালীন লোকদের  
মধ্যে প্রেষ্ঠতম হবেন কিংবা প্রেষ্ঠতম লোকদের অন্যতম হবেন। আবু ইসহাক বলেন : এ  
ব্যক্তি হবেন হযরত খিযির (আ)।

ইবনে আবিদ দুনিয়া 'কিতাবুল হাওয়ালিক' বর্ণনা করেন যে, হযরত আলী  
(রা) হযরত খিযির (আ)-এর সাথে সাক্ষাত করলে তিনি তাঁকে একটি দোয়া বলে দেন।  
যে ব্যক্তি এই দোয়া প্রত্যেক নামাযের পর পাঠ করবে; সে বিরাট সওয়াব, মাগকিরা'ত ও  
রহমত পাবে। দোয়াটি এই :

يَا مَنْ لَا يَشْفَعُ سَمِعَ عَنْ سَمِعٍ وَيَا مَنْ لَا تَغْلُظُ الْمَسَاكِلَ وَيَا مَنْ

لَا يَبْرُمُ مِنَ الْحَاحِ الْمَلْحِينِ أَنْ قُلِي بَرْدَ عَفْوِكَ وَحِلَاوَةَ مَغْفِرَتِكَ

“হে ঐ সত্তা, যার এক কথা শোনা অন্য কথা শোনায় প্রতিবন্ধক হয় না, হে ঐ সত্তা, যাকে একই সময়ে করা লাগে কোটি প্রসন্ন বিভ্রান্ত করে না এবং হে ঐ সত্তা যিনি দোষায় পীড়াপীড়ি করলে এবং বারবার বললে বিরক্ত হন না, আমাকে তোমার ক্রমায় স্বাদ আশ্বাদন করনাও এবং তোমার মাগফিরাতের স্বাদ দান কর।”

অতঃপর এ প্রহুই হযরত এই ঘটনা, এই দোয়া এবং হযরত খিযির (আ)-এর সাথে সাক্ষাতের ঘটনা হযরত উমর (রা)-এর থেকেও বর্ণিত আছে।

পক্ষান্তরে যারা হযরত খিযির (আ)-এর জীবদ্দশা অস্বীকার করে, তাদের বড় প্রমাণ হচ্ছে সহীহ মুসলিমে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস। হযরত ইবনে উমর বলেন : রসূলুল্লাহ (সা) জীবনের শেষ দিকে এক রাত্রে আমাদেরকে নিয়ে ইশার নামায পড়েন। নামায শেষে তিনি দাঁড়িয়ে যান এবং নিম্নোক্ত কথাগুলো বলেন :

أرأيتكم ليلتكم هذه فان على رأس ماثة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الارض احد -

‘তোমরা কি আজকের রাতটি লক্ষ্য করছ? এই রাত থেকে একশ বছর অতীত বলে আজ যারা পৃথিবীতে আছে, তাদের কেউ জীবিত থাকবে না।’

হযরত ইবনে উমর অতঃপর বলেন : এই রেওয়াজেত সম্পর্কে অনেকই অনেক নুকম কথাবার্তা বলে। কিন্তু রসূলুল্লাহ (সা)-র উদ্দেশ্য ছিল এই যে, এক শ বছর অতীত হলে এ শতাব্দী শেষ হয়ে যাবে।

মুসলিমে এ রেওয়াজেতটি হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ থেকেও প্রায় এমনি বর্ণিত আছে। কিন্তু রেওয়াজেতটি বর্ণনা করার পর আল্লামা কুরতুবী বলেন এর ভাষায় তাদের পক্ষে কোন প্রমাণ নেই, যারা খিযির (আ)-এর জীবদ্দশাকে অস্বীকার করে। কেননা, এতে যদিও সমগ্র মানবজাতির জন্য ব্যাপক ভাষা তাগিদ সহকারে প্রয়োগ করা হয়েছে, কিন্তু প্রত্যেক আদম সন্তানই এই ব্যাপকতার অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ, আদম সন্তানদের মধ্যে হযরত ইসা (আ)-ও একজন। তিনি ওফ্রাত পান নি। এবং মিহতও হননি। কাজেই হাদীসে ব্যবহৃত **على الارض** শব্দের মধ্যে যে আলিফলাম রয়েছে, বাহ্যত তা **وهم** -এর অর্থ দেয়। এবং এর অর্থ আরব ভূমি ইয়াজুজ-মাজুজের দেশ, প্রাচ্যদেশ ও দ্বীপপুঞ্জ—যেগুলোর নামও আরবরা কোনদিন শোনেনি। এ গুলোসহ সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠ হাদীসে বোঝানো হয়নি! এ হচ্ছে আল্লামা কুরতুবীর বক্তব্য।

কেউ কেউ খিমির (আ)-এর জীবদ্দশা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে বলে যে, তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আমলে জীবিত থাকলে তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে ইসলামের সেবায় আত্মনিয়োগ করা তাঁর জন্য অপরিহার্য ছিল। কেননা হাদীসে বলা হয়েছে **لَوْ كَانَ**

**مُوسَىٰ حَيًّا لَمَا وَسَّعَ إِلَّا تَبَا عَى**—অর্থাৎ মুসা (আ) জীবিত থাকলে আমার অনুসরণ করা ছাড়া তাঁরও গত্যন্তর ছিল না। ( কারণ আমার আগমনের ফলে তাঁর ধর্ম রহিত হয়ে গেছে )। কিন্তু এটা অসম্ভব নয় যে, খিমির (আ)-এর জীবন ও নবুয়ত সাধারণ পয়গম্বরদের থেকে ভিন্নরূপ হবে। তাঁকে আল্লাহর পক্ষ থেকে সৃষ্টিগত দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। তাই তিনি সাধারণ মানুষ থেকে আলাদাভাবে নিজের কাজে নিয়োজিত আছেন। শরীয়তে মুহাম্মদীর অনুসরণের ব্যাপারে এটা সম্ভব যে, তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা)-র নবুয়তের পর এ শরীয়তেরই অনুসরণ করে চলেছেন। **وَاللَّهُ أَعْلَمُ**

আবু হাইয়্যান বাহুরে মুহীত গ্রন্থে খিমির (আ)-র সাথে কয়েকজন বুয়ূর্গের সাক্ষাতের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সাথে সাথে একথাও বলেছেন যে, **وَالْجَمُورُ عَلَىٰ**

**أَنَّهُ مَاتَ**—অর্থাৎ সাধারণ আলিমদের মতে তাঁর ওফাত হয়ে গেছে।—(ষষ্ঠ খণ্ড ১৪৭ পৃঃ)

তফসীর মাযহাজীতে কাযী সানাউল্লাহ বলেন : হযরত সাইয়্যেদ আহমদ সরহিন্দী মুজান্দিদে আলফে সানী তাঁর কাশ্ফের মাধ্যমে যে কথা বলেছেন, তাঁর মধোই সব বিতর্কের সমাধান নিহিত আছে। তিনি বলেন : আমি নিজে কাশ্ফ জগতে হযরত খিমির (আ)-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করছি। তিনি বলেছেন : আমি ও ইলয়াস (আ) উভয়েই জীবিত নই। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এরূপ ক্রমতা দান করেছেন যে, আমরা জীবিত মানুষের বেশ ধারণা করে বিভিন্নভাবে মানুষের সাহায্য করি।

আমি পূর্বেই বলেছি যে, হযরত খিমির (আ)-এর মৃত্যু ও জীবদ্দশার সাথে আমাদের কোন বিশ্বাসগত অথবা কর্মগত মাস'আলা জড়িত নয়। এ কারণেই কোন জান ও হাদীসে এ সম্পর্কে স্পষ্টভাবে কোন কিছু বলা হয়নি। তাই এ ব্যাপারে অভিরিক্ত আলোচনা ও খোঁজাখুঁজির প্রয়োজন নেই। কোন একদিকের উগর বিশ্বাস রাখাও আমাদের জন্য জরুরী নয়। কিন্তু প্রমাণ জনগণের মধ্যে বহল প্রচলিত, তাই উল্লিখিত বিবরণ উদ্ধৃত করা হয়েছে।

**وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقُرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ۗ إِنَّا مَكِّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَابْنَهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ۗ سَبَبًا ۗ فَاسْتَبَعِ سَبَبًا ۗ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ ۗ**

وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا هُ قُلْنَا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِمَّا اَنْ تَعَذِّبَ وَاِمَّا  
 اَنْ تَتَّخِذَ فِيْهِمْ حُسْنًا ۝ قَالَ اِمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نَعَذِّبُهٗ ثُمَّ  
 يُّرَدُّ اِلَىٰ رَبِّهٖ فَيُعَذِّبُهٗ عَذَابًا شَدِيْدًا ۝ وَاِمَّا مَن اٰمَنَ وَعَمِلَ صٰلِحًا  
 فَلَهٗ جَزَاءٌ اَحْسَنُ ۝ وَسَنُقُوْلُ لَهٗ مِّنْ اٰمْرِنا۟ يَسْرًا ۝

(৬৩) তারা আপনাকে মূলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলুন : আমি তোমাদের কাছে তার কিছু অবস্থা বর্ণনা করব। (৬৪) আমি তাকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম এবং প্রত্যেক বিষয়ের কার্যোপকরণ দান করেছিলাম। (৬৫) অতঃপর তিনি এক কার্যোপকরণ অবলম্বন করলেন। (৬৬) অবশেষে তিনি যখন সূর্যের অন্তাচলে পৌঁছলেন; তখন তিনি সূর্যকে এক পৃথিবী জলাশয়ে অস্ত যেতে দেখলেন এবং তিনি তথায় এক সম্প্রদায়কে দেখতে গেলেন। আমি বললাম হে মূলকারনাইন! আপনি তাদেরকে শাস্তি দিতে পারেন অথবা তাদেরকে সদয়ভাবে গ্রহণ করতে পারেন। (৬৭) তিনি বললেনঃ যে কেউ সীমালঙ্ঘনকারী হবে, আমি তাকে শাস্তি দেব। অতঃপর তিনি তাঁর পালনকর্তার কাছে ফিরে যাবেন। তিনি তাকে কঠোর শাস্তি দেবেন। (৬৮) এবং যে বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে তার জন্য প্রতিদান রয়েছে কল্যাণ এবং আমার কাছে তাকে সহজ নির্দেশ দেবে।

### তুফসীরের সার-সংক্ষেপ

মূলকারনাইনের প্রথম সফর : তারা আপনাকে মূলকারনাইনের অবস্থা জিজ্ঞেস করে। [এর কারণ লিখিত রয়েছে এই যে, তাঁর ইতিহাস প্রায় বিলুপ্ত হতে চলেছিল। এ কারণেই এই কাহিনীর অভিন্নিত বিষয়াদি, যা কোবরআনে উল্লিখিত হয়নি, সে সম্পর্কে আজ পর্যন্ত ইতিহাসে তাঁর মতবিরোধ পরিস্ফুট হয়। এ কারণেই কোরাইশরা মদীনার ইহুদীদের পরামর্শে এ কাহিনীটি প্রমের অন্তর্ভুক্ত করেছিল। তাই কোবরআনে বর্ণিত এ ঘটনার বিবরণ রসুলুল্লাহ (সা)-র নবুয়তের সুস্পষ্ট প্রমাণ।] আপনি বলে দিন : আমি এখনই তোমাদের কাছে তার অবস্থা বর্ণনা করব। (অতঃপর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কাহিনীর বর্ণনা শুরু হয়েছে যে, মূলকারনাইন একজন প্রবল প্রতাপশালিত বাদশাহ ছিলেন)। আমি তাকে পৃথিবীতে রাজত্ব দান করেছিলাম এবং আমি তাঁকে সব নিকম সাজসজ্জাম দিয়েছিলাম, (যম্বা'রা তিনি রাষ্ট্রীয় পরিষ্করণসমূহ বাস্তবায়িত করতে পারতেন)। অতঃপর তিনি (পাশ্চাত্য দেশসমূহ জয় করার মানসে) এক পথ অবলম্বন করলেন (এবং সফর করতে লাগলেন)। অবশেষে তিনি যখন (চলতে চলতে মধ্যবর্তী শহরগুলো পদানত করে) সূর্যের অন্তাচলে (অর্থাৎ পশ্চিম প্রান্তের সর্বশেষ জনবসতি



পর্যন্ত) পৌঁছলেন, তখন সূর্যকে তিনি এক পক্ষিল জলাশয়ে অস্ত যেতে দেখলেন। (সম্ভবত এন্স অর্থ সমুদ্র! সমুদ্রের পানি অধিকাংশ কাল দৃষ্টিগোচর হয়। সূর্য প্রকৃতপক্ষে সমুদ্রে অস্ত যায় না। কিন্তু সমুদ্র দিগন্ত হলে মনে হয় যেন, সমুদ্রেই অস্ত যাচ্ছে।) এবং তখন তিনি এক সম্প্রদায়কে দেখতে পেলেন। (পল্লবতী আয়াত **أَمَّا مَن ظَلَمَ** থেকে বোঝা যায় যে, তারা কাফির ছিল।) আমি (ইলহামের মাধ্যমে অথবা তৎকালীন পরগম্বরের মধ্যস্থতায় তাকে) বললাম : হে মুলকারনাইন, (এই সম্প্রদায় সম্পর্কে তোমাকে দু'ব্লকম ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে) হয় (তাদেরকে প্রথমেই হত্যা ইত্যাদির মাধ্যমে) শাস্তি দেবে, না হয় তাদের ব্যাপারে সদয় ব্যবহার করতে হবে (অর্থাৎ তাদেরকে ঈমানের দাওয়াত দেবে। যদি না মানেন তবে হত্যা করবে। তবলীগ ও দাওয়াত ছাড়াই প্রথমে হত্যা করার ক্ষমতা সম্ভবত একারণে দেওয়া হয়েছিল যে, পূর্বে কোন উপায়ে তাদের কাছে ঈমানের দাওয়াত পৌঁছেছিল। কিন্তু দ্বিতীয় পথ, আগে দাওয়াত পরে হত্যা—এটা যে উত্তম, তা ইঙ্গিতে বর্ণনা করা হয়েছে এবং **الْبَخَّازِ حَسَنٌ** শব্দ দ্বারা তা ব্যক্ত করা হয়েছে।) মুলকারনাইন বললেন : (আমি দ্বিতীয় পথ অবলম্বন করে প্রথমে তাদেরকে ঈমানের দাওয়াত দেব।) কিন্তু (দাওয়াতের পর) যে জালিম হবে, তাকে আমি (হত্যা ইত্যাদির) শাস্তি দেব (এ শাস্তি হবে পাখিব) অতঃপর সে (মৃত্যুর পর) তার পালন-কর্তার কাছে ফিরে যাবে। তিনি তাকে (দোষের) কর্তার শাস্তি দেবেন এবং যে (দাওয়াতের পর) বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং সৎকর্ম করবে, তার জন্য (পরকালেও) প্রতিদানে কল্যাণ রয়েছে এবং আমিও (দুনিয়াতে) আমার ব্যবহারে তাকে সহজ (ও নম্র) কথা বলব। (অর্থাৎ কার্যক্ষেত্রে কঠোরতা করার প্রসঙ্গ উঠে না, কথাগুণ কঠোরতা করা হবে না।)

### জানুয়ারিক জাতব্য বিষয়

**وَيَسْأَلُونَكَ**—অর্থাৎ তারা আপনাকে প্রশ্ন করে। কান্না প্রশ্ন করেছিল, এ

সম্পর্কে রেওয়াজেত থেকে জানা যায় যে, তারা ছিল মক্কার কেশরাইশ সম্প্রদায়। মাদীনার ইহুদীরা তাদেরকে রসুলুল্লাহ্ (স)-র নব্বুত ও সততা যাচাই করার জন্য তিনটি প্রশ্ন বলে দিয়েছিল : রাহ, আসহাবে কাহফ ও মুলকারনাইন সম্পর্কে। তন্মধ্যে দু'টি প্রশ্নের জওয়াব পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে তৃতীয় প্রশ্নের জওয়াব বর্ণিত হয়েছে যে, মুলকারনাইন কে ছিল এবং তার কি অবস্থা ছিল? —(বাহুরেমুহীত)

মুলকারনাইন কে ছিলেন, কোন যুগে ও কোন দেশে ছিলেন এবং তার নাম মুলকারনাইন হল কেন? মুলকারনাইন নামকরণের হেতু সম্পর্কে বহু উক্তি ও তীব্র মতভেদ পরিদৃষ্ট হয়। কেউ বলেন : তাঁর মাথার চুলের দু'টি গুচ্ছ ছিল। তাই মুলকারনাইন, (দুই গুচ্ছওয়ালা) আখ্যায়িত হয়েছেন। কেউ বলেন : পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যদেশসমূহ জয়

করার কারণে যুলকারনাইন খেতাবে ভূষিত হয়েছেন। কেউ এমনও বলেছেন যে, তার মাথায় শিং এর অনুরূপ দু'টি চিহ্ন ছিল। কোন কোন রেওয়াজে রয়েছে যে, তার মাথার দুই দিকে দু'টি ক্ষত চিহ্ন ছিল। وَاللَّهُ عَلِيمٌ কিন্তু এটা নিশ্চিত যে, কোরআন স্বয়ং তাঁর নাম যুলকারনাইন রাখেনি; বরং ইহদীরা এ নাম বলেছিল। বোধ হয় তিনি তাদের কাছে এ নামেই খ্যাত ছিলেন। যুলকারনাইনের ঘটনা সম্পর্কে কোরআন পাক যা বর্ণনা করেছে, তা এই :

তিনি একজন সৎ ও ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ ছিলেন এবং পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যদেশ-সমূহ জয় করেছিলেন। এসব দেশে তিনি সুবিচার ও ইনসাফের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁকে লক্ষ্য অর্জনের জন্য সর্বপ্রকার সাজসরঞ্জাম দান করা হয়েছিল। তিনি দিগ্বিজয়ে বের হয়ে পৃথিবীর তিন প্রান্তে পৌঁছেছিলেন—পাশ্চাত্যের শেষ প্রান্তে, প্রাচ্যের শেষ প্রান্তে এবং উত্তরে পর্বতমালার পাদদেশ পর্যন্ত। এখানেই তিনি দুই পর্বতের মধ্যবর্তী গিরিপথকে একটি সুবিশাল লৌহ প্রাচীর দ্বারা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ফলে ইয়াজ্জুজ-মাজ্জুজের চুটতরাজ থেকে এলাকার জনগণ নিরাপদ হয়ে যায়।

রসুলুল্লাহ্ (সা)-র নবুয়ত ও সত্যতা যাচাই করার উদ্দেশ্যে, প্রয় উত্থাপনকারী ইহদীরা এই জওয়াব শুনে সন্তুষ্ট হয়ে যায়। তারা আর অতিরিক্ত কোন প্রশ্ন করেনি যে, তার নাম কেন যুলকারনাইন ছিল এবং তিনি কোন দেশে কোন যুগে বিদ্যমান ছিলেন? এতে বোঝা যায় যে, এসব প্রশ্নকে স্বয়ং ইহদীরাও অনাবশ্যক ও অনর্থক মনে করেছে। বলা বাহুল্য, কোরআন পাক ইতিহাস ও কাহিনীর ততটুকু অংশই উল্লেখ করে, যতটুকুর সাথে কোন ধর্মীয় বা পাথিব উপকার জড়িত থাকে অথবা যার উপর কোন জরুরী বিষয় জানা নির্ভরশীল থাকে। তাই এসব বিষয় কোরআন পাক বর্ণনা করেনি এবং কোন সহীহ হাদীসেও এসব প্রশ্নের উত্তর নেই। যেহেতু কোরআন পাকের কোন আয়াত বোঝা এ গুলোর উপর নির্ভরশীল নয়, তাই পূর্ববর্তী সাহাবী ও তাবেয়ীগণও এসব বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দেননি।

এখন এসব প্রশ্ন সমাধানের একমাত্র সম্ভব হচ্ছে ঐতিহাসিক রেওয়াজে অথবা বর্তমান তওরাত ও ইঞ্জীল। বলা বাহুল্য, উপস্থ পত্রি পরিবর্তন ও পরিবর্তনের ফলে বর্তমান তওরাত এবং ইঞ্জীলও তাদের ঐশী গ্রন্থের মর্যাদা হারিয়ে ফেলেছে। এগুলো এখন বলতে গেলে ইতিহাস গ্রন্থের পর্যায়ভুক্ত। এগুলো বর্তমানে প্রাচীন ঐতিহাসিক রেওয়াজে এবং ইসরাঈলী কিসুসা-কাহিনীতে পরিপূর্ণ। এসব কাহিনীর কোন সনদ নেই এবং কোন যমানার সুধীরদের কাছেও এগুলো নির্ভরযোগ্য পরিগণিত হয়নি। তফসীরবিদগণও এ ব্যাপারে যা কিছু লিখেছেন, তাও এক ধরনের ঐতিহাসিক রেওয়াজেত্তর সমষ্টি মাত্র। ফলে তাদের মধ্যে মতভেদের অন্ত নেই। বর্তমানকালে ইউরোপীয়রা ইতিহাসকে অত্যধিক গুরুত্ব দান করেছে। তারা এ বিষয়ের গবেষণায় অপরি-সীম অধ্যবসায় ও পরিশ্রম নিয়োজিত করেছে। প্রাচীন ধর্মসাবশেষ খনন করে সেখান থেকে বিভিন্ন শিলালিপি উদ্ধার করেছে এবং সেগুলোর সাহায্যে পুরাতত্ত্বের স্বরূপ আবিষ্কারে অদ্ভুত-

পূর্ব কৃতিত্ব অর্জন করেছে। কিন্তু প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ খনন করে প্রাপ্ত শিলালিপির মাধ্যমে কোন ঘটনার সমর্থনে সাহায্য পাওয়া গেলেও সেগুলো দ্বারা ঘটনার পাঠোদ্ধার সম্ভবপর নয়। এর জন্য ঐতিহাসিক রেওয়াজেত সমূহই ভিত্তি হতে পারে। এসব ব্যাপারে প্রাচীন-কালের ঐতিহাসিক রেওয়াজেত সমূহের অবস্থা একটু আগেই জানা গেছে যে, এ উল্লেখ মর্যাদা কিসসা-কাহিনীর চাইতে অধিক নয়। প্রাচীন ও আধুনিক তফসীরবিদগণও স্ব-স্ব গ্রন্থে এসব রেওয়াজেত ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতেই উদ্ধৃত করেছেন। এখানেও এ দৃষ্টিভঙ্গিতেই যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু লেখা হচ্ছে। মাওলানা হিফযুর রহমান সাহেব 'কিসাসুল-কোরআন' গ্রন্থে এ ঘটনার পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। ইতিহাসের কৌতুহলী পাঠক সেখানে দেখে নিতে পারেন।

কোন কোন রেওয়াজেতে রয়েছে যে, সমগ্র বিশ্ব শাসনক্রমতা প্রতিষ্ঠাকারী চারজন সন্ন্যাসি অভিযুক্ত হয়েছেন। তন্মধ্যে দু'জন ছিলেন মু'মিন এবং দু'জন কাফির। মু'মিন দু'জন হলেন হযরত সোলায়মান (আ) ও যুলকারনাইন এবং কাফির দু'জন নমরাদ ও বখতে নসর।

অশ্চর্যের বিষয় এই যে, যুলকারনাইন নামে পৃথিবীতে একাধিক ব্যক্তি খ্যাতি লাভ করেছেন এবং এটাও অশ্চর্যের ব্যাপার যে, প্রতি যুগের যুলকারনাইনের সাথে সিকান্দার (আলেকজান্ডার) উপাধিষ্টিও যুক্ত রয়েছে।

খৃস্টের প্রায় তিনশ' বছর পূর্বে সিকান্দার নামে একজন সন্ন্যাসি প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত ছিলেন। তাকে সিকান্দার গ্রীক, মকদুনী, ক্রামী, ইত্যাদি উপাধিতেও স্মরণ করা হত। তার মন্ত্রী ছিলেন এরিস্টটল এবং তিনি দারার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাকে হত্যা করে তার রাজ্য জয় করেন। সিকান্দার নামে খ্যাতিলাভকারী সর্বশেষ ব্যক্তি তিনিই ছিলেন। তার কাহিনী জগতে অধিক প্রসিদ্ধ। কেউ কেউ তাকেও কোরআনে উল্লিখিত যুলকারনাইন বলে অভিযুক্ত দিয়েছেন। এটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কেননা তিনি অগ্নিপূজারি মুশরিক ছিলেন। কোরআন পাকে যে যুলকারনাইনের উল্লেখ রয়েছে, তার নবী হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে, কিন্তু ইমানদার ও সৎকর্মপন্থায় হওয়ার ব্যাপারে সবাই একমত। কোরআনের আয়াত এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়।

হাক্কেজ ইবনে কাসীর 'আল বেদায়াহ ওয়া রেহায়াহ' গ্রন্থে ইবনে আসাকিরের বরাতে দিয়ে তার পূর্ণ বংশতালিকা লিপিবদ্ধ করেছেন, যা উপরে পৌঁছে হযরত ইব্রাহীম (আ) এর সাথে মিলে যায়। তিনি বলেছেন : এই সিকান্দারই গ্রীক, মিসরী, মকদুনী নামে পরিচিত। তিনি নিজের নামে আলেকজান্দ্রিয়া শহর পত্তন করেন। রোমের ইতিহাস তার আমল থেকেই আরম্ভ হয়। তার আমল প্রথম সিকান্দার যুলকারনাইন থেকে দু'হাজার বছরেরও অধিককাল পর। তিনিই দারাকে হত্যা করেন এবং পারস্য সন্ন্যাসীদেরকে পরাভূত করে তাদের দেশ জয় করেন। কিন্তু এই ব্যক্তি ছিল মুশরিক। তাকে কোরআনে উল্লিখিত যুলকারনাইন বলা নিতান্তই ভুল। ইবনে কাসীরের ভাষা এরূপ :

فاما ذوالقرنين الثانی فهو اسكندر بن فيلبس بن مصریم  
 بن هرمس بن ميطون بن رومی بن لنطی بن یونان بن یاشث بن  
 یونان بن شرخون بن رومیة بن شرفط بن توفیل بن رومی بن الاصغر  
 بن یقز بن العیص بن اسحاق بن ابراهیم الخلیل علیه الصلوة  
 والسلام کذا نسبة العافظ ابن عساکرفی تاریخة المقدونی اليونانی  
 المصری بانى اسکندریة الذى یورخ بايامه الروم وكان  
 متاخراً عن الاول بدهرطویل وكان هذا قبل المسيح بنحو من ثلثمائة  
 سنة وكان ارطاطا لیس الفلیسوف وزیرة وهو الذى قتل دارا بن  
 دارا واذل ملوک الفرس وارطاطا ارضهم وانما نبهنا علیه لان كثيراً  
 من الناس یعتقدانها واحد وان المذكور فی القرآن هو الذى  
 كان ارطاطا لیس وزیرة فیقع بسبب ذلك خطأ كبير وفساد عریض  
 طویل فان الاول كان عبداً مؤمناً صالحاً وملكاً عادلاً وكان وزیرة  
 الضمر وقد كان نبیا علی ما قررنا قبل هذا واما الثانی فكان  
 مشركاً كان وزیرة فیلسوفاً وقد كان بین زما نیهما ازید من الفی  
 سنة فابین هذا من هذا لا یتویان ولا یشتبهان الا علی غبی لا یعرف  
 حقاً ثق الامور -

হাদীস ও ইতিহাসবিদ ইবনে কাসীরের এই বক্তব্যে প্রথমত জানা গেল যে, সিকান্দার বাদশাহ যিনি ঈসা (আ)-র তিন শত বছর পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছেন, দারা ও পারস্য সম্রাটদের সাথে যুদ্ধ মুক্ত হয়েছে এবং যিনি আলেকজান্দ্রিয়া শহরের প্রতিষ্ঠাতা, তিনি কোরআনে বর্ণিত মুলকারনাইন নন। কতিপয় বড় বড় তফসীরবিদও এই বিশ্বাস্তিতে পতিত হয়েছেন। আবু হাইয়ান বাহুরে-মুহীতে এবং আল্লামা আলুসী রুহুল মা'আনীতে তাকে কোরআনে বর্ণিত মুলকারনাইন বলে দিয়েছেন।

দ্বিতীয়ত **إذ كان نبياً** বাক্য থেকে জানা গেল যে, ইবনে কাসীরের মতে তাল্ল নবী হওয়ার খাঙ্গাটি প্রবল। কিন্তু অধিকাংশ সাহাবী ও তাবয়ীগণের উক্তি স্বয়ং ইবনে কাসীর আবু তোফায়েরের রেওয়াজেতক্রমে হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, মুলকারনাইন নবী বা ফেরেশতা ছিলেন না; বরং একজন সৎ কর্মপরায়ণ মুসলমান ছিলেন। তাই কোন কোন আলিম বলেছেন যে, **إذ** এর সর্বনাম দ্বারা মুলকারনাইনকে নয়—খিয়র (আ) কে বোঝানো হয়েছে।

এখন প্রশ্ন থেকে যায় যে, তবে কোরআনে বর্ণিত মুলকারনাইন কে এবং কোন মুগে ছিলেন? এ সম্পর্কেও আলিমদের উক্তি বিভিন্নরূপ। ইবনে কাসীরের মতে তার আমল ছিল সিকান্দার গ্রীক মকদুনী থেকে দু'হাজার বছর পূর্বে হযরত ইব্রাহীম (আ)-

এর আমল। তার উজির ছিলেন হযরত খিযির (আ)। ইবনে কাসীর 'আলবেদায়াহ্ ওয়ালেহায়াহ্' গ্রন্থে এ রেওয়াজেতও বর্ণনা করেছেন যে, মুলকারনাইন পদব্রজে হস্তের উদ্দেশে আগমণ করলে হযরত ইব্রাহীম (আ) মক্কা থেকে বের হয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানান, তার জন্য দোয়া করেন এবং কিছু উপদেশও প্রদান করেন। তফসীর ইবনে কাসীরে আয-রুকীয়্য বরাতে দিয়ে বর্ণিত আছে যে, মুলকারনাইন ইব্রাহীম (আ)-এর সাথে তওফাক করেন এবং কুরবানি করেন।

আবু রায়হান আল-বেরুনী 'কিতাবুল আসরিফ বাকীয়া আনিল কুরানিল খালীয়া' গ্রন্থে বলেন : কোরআনে বর্ণিত মুলকারনাইন হচ্ছে আবু বকর ইবনে সুমাই ইবনে উমর ইবনে আফরীকায়স হিমইয়ারী। তিনি দিগ্বিজয়ী ছিলেন। তুকা হিমইয়ারী ইয়ামেনী তার কবিতায় তার জন্য গর্ববোধ করে বলেছেন : আমার দাদা মুলকারনাইন মুসলমান ছিলেন। কবিতা এই :

قد كان ذوالقربن جدي مسلما  
ملكا علاني الارض غير مبعود  
بلغ المشارق والمغرب يبتغي  
اسباب ملك من كوريم سيد

আবু হাইয়ান বাহরেমুহীতে এ রেওয়াজেতটি বর্ণনা করেছেন। ইবনে কাসীরও 'আল-বেদায়াহ্ ওয়ালেহায়াহ্' গ্রন্থে এর উল্লেখ করার পর বলেন : এই মুলকারনাইন তিন জন ইয়ামেনী সন্ত্রাটের মধ্যে প্রথম সন্ত্রাট ছিলেন। সে-ই সাবা' কুপের মোকদ্দমায় হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর পক্ষে ন্যায় ফয়সালা দিয়েছিলেন। এ সমুদয় রেওয়াজেতে মুলকারনাইনের ব্যক্তিত্ব, নাম ও বংশ পরম্পরা সংক্রান্ত মতভেদ সত্ত্বেও তার আমল হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর আমল বলে ব্যক্ত করা হয়েছে।

মওলানা হিফযুর রহমান কিসাসুল কোরআনে মুলকারনাইন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাঁর আলোচনার সারমর্ম এই যে, কোরআনে বর্ণিত মুলকারনাইন হচ্ছেন পালস্যের সে সন্ত্রাট, যাকে ইহদীরা খোরাস, গ্রীকরা সায়রাস, পারসিকরা গোলশ এবং আনবরা কায়খসরু নামে অভিহিত করে। তার আমল ইব্রাহীম (আ)-এর অনেক পরে বনী ইসরাঈলের অন্যতম পন্নগধর দানিয়াল (আ)-এর আমল বর্ণনা করা হয়। এ আমল দানীর হত্যাকাণ্ডী সিকান্দার মকদুদীর আমলের কাছাকাছি হয়ে যায়। কিন্তু মওলানা সাহেবও ইবনে কাসীর প্রমুখের ন্যায় কঠোর ভাষায় বিরোধিতা করে বলেছেন যে, মুলকারনাইন সে সিকান্দার মকদুদী হতে পারে না, যার উজির ছিলেন দার্শনিক এরিস্টটল। কারণ, তিনি ছিলেন মুশরিক এবং মুলকারনাইন ছিলেন মু'মিন, সং কর্মপরায়ণ।

মওলানা সাহেবের বক্তব্যের সার-সংক্ষেপ এই যে, সূরা বনী ইসরাঈলে বনী ইসরাঈলের দু'বার দুর্কর্ম ও হাঙ্গামায় লিপ্ত হওয়ার কথা উল্লেখ করে দুই বারের শক্তি বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। হাঙ্গামা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে :

بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عَبَادًا لَّنَا أَوْلَىٰ بِأَسْ شِدِيدٍ فَجَاءُوا خَلَالَ الدِّيَارِ

(অর্থাৎ তোমাদের হাঙ্গামার শাস্তিস্বরূপ আমি তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কিছু সংখ্যক কঠোর যোদ্ধা বাস্কাকে প্রেরণ করব। তারা তোমাদের ঘরে ঘরে অনুপ্রবেশ করবে।)

এখানে কঠোর যোদ্ধা বলে বখতে নসর ও তার দলবলকে বোঝানো হয়েছে। তারা বায়তুল মোকাদ্দাসে চল্লিশ হাজার এবং কোন কোন রেওয়াজে মতে সত্তর হাজার ইহুদীকে হত্যা করে এবং লক্ষাধিক বনী ইসরাঈলকে বন্দী করে গরু-ছাগলের মত হাঁকিয়ে বাবেলে নিয়ে যায়। এরপর কোরআন পাক বলেন : **ثُمَّ رَدْنَا لَكُمْ الْكُرَّةَ عَلَيْهِمْ**

(অর্থাৎ আমি পুনরায় তোমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে জয়ী করলাম।) বিজয়ের এই ঘটনাটি সম্রাট কায়খসরু তথা খোরাসের হাতে সংঘটিত হয়। সে ছিল ইমানদার, সৎকর্ম-পরায়ণ। সে বখতে নসরের মুকাবিলা করে বন্দী বনী ইসরাঈলকে তার অধিকার থেকে মুক্ত করে পুনরায় ফিলিস্তীনে পুনর্বাসিত করে এবং ধ্বংসস্থাপে পরিণত বায়তুল-মোকাদ্দাসকেও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে। বায়তুল-মোকাদ্দাসের যেসব গুপ্তধন ও গুরুত্ব-পূর্ণ সাজসরঞ্জাম বখতে নসর এখান থেকে বাবেলে স্থানান্তরিত করেছিল, সে সেগুলোও উদ্ধার করে বনী ইসরাঈলের অধিকারে সমর্পণ করে। এভাবে সে বনী ইসরাঈলের কথা ইহুদীদের ত্রাণকর্তারূপে পরিগণিত হয়।

নবুয়ত পরীক্ষা করার জন্য মদীনার ইহুদীরা কোরায়শদের জন্য যে প্রয়োগ বর্জাই করে, তাতে যুলকারনাইন সম্পর্কিত প্রয়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, ইহুদীরা তাকে তাদের ত্রাণকর্তারূপে সম্মান ও উজ্জ্বলতা করত।

মওলানা হিফযুর রহমান সাহেব তাঁর এ বক্তব্যের স্বপক্ষে বর্তমান তওরাত থেকে বনী ইসরাঈলের পয়গম্বরগণের ডবিষাধাণী থেকে এবং ঐতিহাসিক রেওয়াজে থেকে প্রচুর দলীল-প্রমাণ পেশ করেছেন। কেউ আরও বেশি জানতে চাইলে মওলানা সাহেবের পুস্তকটি পাঠ করতে পারেন। এসব রেওয়াজে উল্লেখ করার মাধ্যমে যুলকারনাইনের ব্যক্তিত্ব ও তার মুগ সম্পর্কে ইতিহাস ও তফসীরবিদদের সবগুলো উক্তি বর্ণনা করে দেওয়াই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। তন্মধ্যে কার উক্তি প্রবল, এ সিদ্ধান্ত নেওয়া আমার উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা কোরআন যেসব বিষয়ের দাবি করেনি এবং হাদীসও যেসব বিষয় বর্ণনা করেনি, সেগুলো নির্ণয় ও নিদিষ্ট করার দায়িত্বও আমার উপর বর্তায় না! তন্মধ্যে যে উক্তিই প্রবল ও নির্ভুল প্রমাণিত হবে, তাতেই কোরআনের লক্ষ্য অর্জিত হবে। **وَاللَّهُ أَعْلَمُ** এখন আয়াতসমূহের তফসীর দেখুন :

قُلْ مَا نَلُّوْا عَلَيْكُمْ مَثَلًا نَّ كُرًا — এখানে প্রাধান্যযোগ্য বিষয় এই যে, কোর-

আন পাক **نَّ كُرًا** সংলগ্ন শব্দ ছেড়ে **مَثَلًا نَّ كُرًا** এ দু'টি শব্দ কেন ব্যবহার করল ?

চিন্তা করলে দেখতে পাবেন, এ দু'টি শব্দের মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কোরআন পাক মূল-কারনাইনের আদ্যপ্রান্ত কাহিনী বর্ণনা করার ওয়াদা করেনি; বরং তার আলোচনার একাংশ উল্লেখ করার কথা বলেছে। উপরে মূলকারনাইনের নাম ও বংশ পরম্পরা সম্পর্কে যে ঐতিহাসিক আলোচনা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, কোরআন পাক একে অনাবশ্যক মনে করে বাদ দেওয়ার কথা প্রথমেই ঘোষণা করে দিয়েছে।

وَأْتَيْنَا ۙ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا—আরবী অভিধানে سَبَب শব্দের অর্থ এমন

নস্তু যন্ত্রদ্বারা লক্ষ্য অর্জনে সাহায্য নেওয়া হয়। যন্ত্রপাতি, বৈষয়িক উপায়াদি, জ্ঞানবৃদ্ধি, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি সবই এর অন্তর্ভুক্ত।---( বাহ্‌রে মুহীত )

রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ব্যবস্থার জন্য একজন সম্রাট ও রাষ্ট্রনায়কের পক্ষে যেসব বিষয়

অত্যাবশ্যকীয়, مِنْ كُلِّ شَيْءٍ বলে সেগুলোই বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তা'আলা মূলকারনাইনকে ন্যায়বিচার, শাস্তিশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও দেশ বিজয়ের জন্য সে যুগে যেসব বিষয় প্রয়োজনীয় ছিল, সবই দান করেছিলেন।

فَاتَّبَع سَبِيًّا—অর্থাৎ সব রকম ও দুনিয়ার সর্বত্র পৌঁছান উপকরণাদি তাকে দান করা হয়েছিল, কিন্তু সে সর্বপ্রথম পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্তে পৌঁছার উপকরণাদি কাজে লাগায় !

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ—অর্থাৎ তিনি পশ্চিম প্রান্তে সে সীমা

পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন, যার পরে কোন জনবসতি ছিল না।

حَمِيَّةٌ—এ: শাব্দিক অর্থ কালো জলাভূমি অথবা কাদা।

এখানে সে জলাশয়কে বোঝানো হয়েছে, যার নিচে কালো রঙের কাদা থাকে। ফলে পানির রঙও কালো দেখায়। সূর্যকে এরূপ জলাশয়ে তাস্ত যেতে দেখার অর্থ এই যে, দর্শক মাত্রই অনুভব করে যে, সূর্য এই জলাশয়ে অস্ত যাচ্ছে। কেননা এরপর কোন বসতি অথবা স্থলভাগ ছিল না। আপনি যদি সূর্যাস্তের সময় এমন কোন ময়দানে উপস্থিত থাকেন যার পশ্চিম দিকে দূরদূরান্ত পর্যন্ত কোন পাহাড়, বৃক্ষ, দালান-কোঠা ইত্যাদি না থাকে, তবে আপনার মনে হবে যেন সূর্যটি মাটির অভ্যন্তরে প্রবেশ করছে।

وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا—অর্থাৎ ঐ কালো জলাশয়ের কাছে মূলকারনাইন

এক সম্প্রদায়কে দেখতে পেলেন। আয়াতের পরবর্তী অংশ থেকে জানা যায় যে, সম্প্রদায়টি ছিল কাকির। তাই আল্লাহ তা'আলা মূলকারনাইনকে ক্ষমতা দান করলেন যে,

তুমি ইচ্ছা করলে প্রথমেই সবাইকে তাদের কুফরের শাস্তি প্রদান কর এবং ইচ্ছা করলে তাদের সাথে সদয় ব্যবহার কর; অর্থাৎ প্রথমে দাওয়াত, তবলীগ ও উপদেশের মাধ্যমে তাদেরকে ইসলাম ও ইমান কবুল করতে সম্মত কর। এরপর যারা মানে, তাদেরকে প্রতিদান এবং যারা না মানে তাদেরকে শাস্তি দাও। প্রত্যুত্তরে মুলকারনাইন দ্বিতীয় পথই অবলম্বন করে বললেন : আমি প্রথমে তাদেরকে উপদেশের মাধ্যমে সরল-পথে আনার চেষ্টা করব। এরপরও যারা কুফরে দৃঢ়পদ থাকবে, তাদেরকে শাস্তি দেব। পক্ষান্তরে যারা বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং সৎকর্ম করবে, তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দেব।

قُلْنَا يَا آلِ كُرَيْشٍ ۖ— থেকে জানা যায় যে, মুলকারনাইনকে

আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই সম্বোধন করে এ কথা বলেছেন। মুলকারনাইনকে নবী সাব্যস্ত করা হলে এতে কোন প্রশ্ন দেখা দেয় না যে, ওহীর মাধ্যমেই তাঁকে বলা হয়েছে। কিন্তু তাঁকে নবী না মানলে কোন পরমেশ্বরের মধ্যস্থতায়ই তাঁকে এই সম্বোধন করা হয়ে থাকবে। যেমন, রেওয়াজেতসমূহে বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত খিমির (আ) তাঁর সাপে ছিলেন। এছাড়া এটা নবুয়তের ওহী না হলে আভিধানিক ওহী হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে; যেমন হযরত মুসা (আ)-র জননীর জন্য কোরআনে وَأَوْحَيْنَا ۖ বলা হয়েছে। অথচ তিনি যে নবী ও রসূল ছিলেন না, সে কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু আবু হাইয়ান বাহুরে মুহীতে বলেন : এখানে মুলকারনাইনকে সে আদেশ দেওয়া হয়েছে, তা হচ্ছে হত্যা ও শাস্তির আদেশ। এ ধরনের আদেশ নবুয়তের ওহী ব্যতীত দেওয়া যায় না—কাশফ, ইলহাম অথবা অন্য কোন উপায়ে তা হতে পারে না। তাই, হয় মুলকারনাইনকে নবী মানতে হবে, না হয় তাঁর আমলে একজন নবীর উপস্থিতি স্বীকার করতে হবে, যার মাধ্যমে তাঁকে সম্বোধন করা হয়েছে। এছাড়া অন্য কোন সম্ভাবনাই বিগুহু নয়।

ثُمَّ اتَّبِعْ سَبِيلَ ۙ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُمُ ۙ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ يَجْعَلْ لَهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا ۙ كَذٰلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خَيْرًا ۙ

(৮৯) অতঃপর তিনি এক উপায় অবলম্বন করলেন। (৯০) অবশেষে তিনি যখন সূর্যের উদয়াচলে পৌঁছলেন, তখন তিনি তাকে এমন এক সম্প্রদায়ের উপর উদয় হতে দেখলেন, যাদের জন্য সূর্যতাপ থেকে আশ্রয়কার কোন আড়াল আমি সৃষ্টি করিনি। (৯১) প্রকৃত ঘটনা এমনিই। তাঁর স্বভাষ আমি সম্যক অবগত আছি।



তফসীরের সার-সংক্ষেপ

অতঃপর (পশ্চিমের দেশসমূহ জয় করার পর প্রাচ্যদেশসমূহ জয় করার ইচ্ছায় প্রাচ্যের দিকে) তিনি এক পথ ধরলেন! অবশেষে যখন সূর্যের উদয়াচলে (অর্থাৎ পূর্ব-দিকে জনবসতির শেষ প্রান্তে) পৌঁছলেন, তখন সূর্যকে এমন জাতির উপর উদয় হতে দেখলেন, যাদের জন্য আমি সূর্যের তাপ থেকে আশ্রয়কার কোন আড়াল রাখিনি। (অর্থাৎ সেখানে এমন এক জাতি বাস করত, যারা রৌদ্র-কিরণ থেকে আশ্রয়কার জন্য কোন গৃহ অথবা তাঁবু নির্মাণে অভ্যস্ত ছিল না; বরং তারা সম্ভবত পোশাক-পরিচ্ছদও পরিধান করত না। জন্তু-জানোয়ারের মত উন্মুক্ত মাঠে বসবাস করত।) এ ব্যাপারটি এমনিই। মূলকারনাইনের কাছে যা কিছু (আসবাবপত্র) ছিল, আমি তার রক্তাক্ত সম্যক অবগত আছি। [এতে নবুয়ত পরীক্ষার্থে মূলকারনাইন সম্পর্কে প্রয়োগকারীদেরকে এ বিষয়ে হুঁশিয়ার করা হয়েছে যে, আমি যা কিছু বলছি তা সঠিক জ্ঞান ও অবগতির ভিত্তিতেই বলছি; সাধারণ ঐতিহাসিক গল্প নয়। এতে মুহাম্মদ (সা)-এর নবুয়তের সত্যতা ফুটে উঠে।]

আনুষঙ্গিক জাতব্য বিষয়

মূলকারনাইন পূর্বপ্রান্তে যে জাতিকে বসবাস করিতে দেখেছেন, কোরআন পাক তাদের সম্পর্কে বলেছে যে, তারা গৃহ, তাঁবু, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদির দ্বারা রৌদ থেকে আশ্রয়লাভ করত না, কিন্তু তাদের ধর্ম ও ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে কিছুই বলেনি এবং মূলকারনাইন তাদের সাথে কি ব্যবহার করেছেন, তাও ব্যক্ত করেনি। বলাবাহুল্য, তারাও কাফিরই ছিল এবং মূলকারনাইন তাদের সাথেও এমন ব্যবহারই করেছেন, যা পশ্চিমা জাতির সাথে করেছেন বলে উপরে বর্ণিত হয়েছে। তবে এখানে তা বর্ণনা করার প্রয়োজন মনে করা হয়নি। কারণ, পূর্ববর্তী ঘটনার আলোকেই তা বোঝা যায়। (বাহরে নুহাত)

ثُمَّ اتَّبِعْ سَبَبًا ۝۱۱۱ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا  
 لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ۝۱۱۲ قَالُوا يَا قَوْمِ انْفِرُوا بِنَرَيْنِ إِن يَأْجُوزَ وَمَا جُوزَ  
 مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا  
 وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ۝۱۱۳ قَالَ مَا مَكْنِي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ  
 أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ۝۱۱۴ أَلْتَوْنِي رَبِّ الْحَدِيدِ ۝۱۱۵ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَسَ  
 بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا ۝۱۱۶ حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ اتُّونِي

أُفِرِّغْ عَلَيْهِ قَطْرًا ۖ فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَبْطَهُرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ  
 نَقْبًا ۖ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي ۖ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ  
 وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ۖ

(৯২) জাবার তিনি এক পথ ধরলেন। (৯৩) অবশেষে যখন তিনি দুই পর্বত প্রাচীরের মধ্যস্থলে পৌঁছলেন, তখন তিনি সেখানে এক জাতিকে পেলেন, যারা তার কথা একবারেই বুঝতে পারছিল না। (৯৪) তারা বলল : হে মূলকারনাইন, ইয়াজুজ ও মাজুজ দেশে অশান্তি সৃষ্টি করছে। আপনি বললে আমরা আপনার জন্য কিছু কর ধার্য করব এই শর্তে যে, আপনি আমাদের ও তাদের মধ্যে একটি প্রাচীর নির্মাণ করে দেবেন। (৯৫) তিনি বললেন : আমার পালনকর্তা আমাকে যে সামর্থ্য দিয়েছেন, তাই যথেষ্ট। অতএব তোমরা আমাকে শ্রম দিনে সাহায্য কর। আমি তোমাদের ও তাদের মধ্যে একটি সুদৃঢ় প্রাচীর নির্মাণ করে দেব। (৯৬) তোমরা আমাকে লোহার পাত এনে দাও। অবশেষে যখন পাহাড়ের মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থান পূর্ণ হয়ে গেল, তখন তিনি বললেন : তোমরা হাঁপের দম দিতে থাক। অবশেষে যখন তা জাপুনে পরিণত হল, তখন তিনি বললেন : তোমরা গলিত তামা নিয়ে এস, আমি তা এর উপরে ঢেলে দিই। (৯৭) অতঃপর ইয়াজুজ ও মাজুজ তার উপরে আরোহণ করতে পারল না এবং তা ভেদ করতেও সক্ষম হল না। (৯৮) মূলকারনাইন বললেন : এটা আমার পালনকর্তার অনুগ্রহ। যখন আমার পালনকর্তার প্রতিশ্রুত সময় আসবে, তখন তিনি একে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবেন এবং আমার পালনকর্তার প্রতিশ্রুতি সত্য।

### তফসীরের সারসংক্ষেপ

অতঃপর (পশ্চিম ও পূর্বদেশ জয় করে) তিনি আরেক দিকে পথ ধরলেন। (কোরআন এ দিকের নাম উল্লেখ করেনি, কিন্তু জনবসতি অধিকতর উত্তরদিকে। তাই তফসীরবিদগণ একে উত্তর দেশসমূহের সফর স্থির করেছেন। ঐতিহাসিক সাক্কা-প্রমাণও এরই সমর্থন করে।) অবশেষে তিনি যখন দুই পর্বতের মধ্যস্থলে পৌঁছলেন, তখন সেখানে এক জাতিকে দেখতে পেলেন, যারা (ভাষা ও অভিধান সম্পর্কে অজ্ঞ মানবের জীবন-স্বাপনের কারণে) তাঁর কথা একবারেই বুঝত না। (এ থেকে জানা যায় যে, তারা শুধু ভাষা সম্পর্কেই অজ্ঞ ছিল না; কেননা বুদ্ধি-জ্ঞান থাকলে ভিন্নভাষীদের কথাবার্তাও ইশারা-ইঙ্গিতে বুঝে নেয়া যায়। বরং পাশব ও মানবের জীবন-স্বাপন পদ্ধতি তাদেরকে বুদ্ধিজ্ঞান থেকেও বঞ্চিত করে রেখেছিল। কিন্তু এরপর বোধ হয় কোন দোভাষীর সাহায্যে) তারা বলল : হে মূলকারনাইন, ইয়াজুজ ও মাজুজ (যারা পর্বতশ্রেণীর অপসরণে বাস করে, আমাদের এই) দেশে (মাঝে মাঝে এসে প্রচুর) অশান্তি সৃষ্টি করছে। (অর্থাৎ হত্যা ও লুণ্ঠন করছে। তাদের মুকাবিলা করার শক্তি আমাদের নেই। অতএব আমরা কি



পথে বাধা ছিল। কিন্তু উভয়ের মধ্যবর্তী গিরিপথ দিয়ে এসে তারা আক্রমণ চালাত। হুলকারনাইন এই গিরিপথটি বন্ধ করে দেন।

زَبْرًا لِّتُكْدِرِينَ -- শব্দটি ৪ - এর বহুবচন। এর অর্থ পাত। এখানে

কৌশলও বোঝানো হয়েছে। গিরিপথ বন্ধ করার জন্য নিমিত্তব্য প্রাচীর ইট-পাথরের পরিবর্তে লোহার পাত ব্যবহার করা হয়েছিল।

لَمَّا كَانَتْ يَوْمَئِذٍ مُّسْتَقِيمًا -- দুই পাহাড়ের বিপরীতমুখী দুই দিক :

قَطْرًا -- অধিকাংশ তুফসীরবিদের মতে এর অর্থ গলিত তামা। কারও কারও মতে গলিত লোহা অথবা রাত্তা। -- (কুরতুবী)

وَكُلًّا مَّا سَلَّوْاْ -- অর্থাৎ যে বস্তু চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে সমতল হয়ে যায়।

ইয়াজ্জ-মাজ্জ কারা এবং কোথায়? হুলকারনাইনের প্রাচীর কোথায় অবস্থিত : ইয়াজ্জ-মাজ্জ সম্পর্কে ইসরাঈলী স্নেওয়ালেত ও ঐতিহাসিক কিসসা-কাহিনীতে অনেক ভিত্তিহীন অলৌকিক কথাবার্তা প্রচলিত রয়েছে। কোন কোন তুফসীরবিদও এগুলো ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে উদ্ধৃত করেছেন, কিন্তু স্বয়ং তাঁদের কাছেও এগুলো নির্ভর-যোগ্য নয়। কোরআন পাক তাদের সংক্ষিপ্ত অবস্থা বর্ণনা করেছে এবং রসুলুল্লাহ (সা)ও প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সম্পর্কে উদ্ভূত করেছেন। ঈমান ও বিশ্বাস স্থাপনের বিষয় ততটুকুই, যতটুকু কোরআন ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। তুফসীর, হাদীস ও ইতিহাসবিদগণ এর অতিরিক্ত যেসব ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক অবস্থা বর্ণনা করেছেন, সেগুলো বিশুদ্ধও হতে পারে এবং অশুদ্ধও হতে পারে। ইতিহাসবিদগণের বিভিন্নমুখী উক্তিগুলো নিছক ইঙ্গিত ও অনুমানের উপর ভিত্তিহীন। এগুলো শুদ্ধ কিংবা অশুদ্ধ হলেও তার কোন প্রভাব কোরআনের বক্তব্যের উপর পড়ে না।

আমি এখানে সর্বপ্রথম এ সম্পর্কিত সহীহ ও নির্ভরযোগ্য হাদীসগুলো উল্লেখ করছি। এরপর প্রয়োজন অনুসারে ঐতিহাসিক স্নেওয়ালেতও বর্ণনা করা হবে।

ইয়াজ্জ-মাজ্জ সম্পর্কে হাদীসের বর্ণনা : কোরআন ও হাদীসের স্পষ্ট বর্ণনা থেকে এতটুকু নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, ইয়াজ্জ-মাজ্জ মানব সম্প্রদায়ভূক্ত। অন্যান্য মানবের মত তারাও নূহ (আ)-এর সন্তান-সন্ততি। কোরআন পাক স্পষ্টতই বলেছে :

وَجَعَلْنَا رِبْعَهُمُ الْبَنِيَّةَ -- অর্থাৎ নূহের মহাপ্রাবনের পর দুনিয়াতে যত

মানুষ আছে এবং থাকবে, তারা সবাই নূহ (আ)-এর সন্তান-সন্ততি হবে। ঐতিহাসিক স্নেওয়ালেত এ ব্যাপারে একমত যে, তারা ইয়াজ্জের বংশধর। একটি দুর্বল হাদীস

থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। তাদের অবশিষ্ট অবস্থা সম্পর্কে সর্বাধিক বিস্তারিত ও সহীহ হাদীস হচ্ছে হযরত নাওয়াস ইবনে সামআন (রা)-এর হাদীসটি। এটি সহীহ মুসলিম ও অন্য সব নির্ভরযোগ্য হাদীস গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে। হাদীসবিদগণ একে সহীহ আখ্যা দিয়েছেন। এতে দাঈদের আবির্ভাব, ইসা (আ)-র অবতরণ, ইয়াজ্জ-মাজ্জের অভ্যুত্থান ইত্যাদির পূর্ণ বিবরণ উল্লিখিত আছে। হাদীসটির অনুবাদ নিম্নরূপ :

হযরত নাওয়াস ইবনে সামআন (রা) বলেন : রসূলুল্লাহ (সা) একদিন ভোর বেলা দাঈদের আলোচনা করলেন। আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি তার সম্পর্কে এমন কিছু কথা বললেন, যশ্বারা মনে হচ্ছিল যে, সে নেহাতই তুচ্ছ ও নগণ্য ; ( উদাহরণত সে কানা হবে। ) পক্ষান্তরে কিছু কথা এমন বললেন, যশ্বারা মনে হচ্ছিল যে, তার ফিতনা অত্যন্ত ভয়াবহ ও কঠোর হবে। ( উদাহরণত জান্নাত ও দোমখ তার সাথে থাকবে এবং অন্যান্য আন্নও অস্বাভাবিক ও ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা ঘটবে। ) রসূলুল্লাহ (সা)-র বর্ণনার ফলে ( আমরা এমন ভীত হয়ে পড়লাম ) যেন দাঈজাল খজুর নুকের ঝাড়ের মধ্যেই রয়েছে। ( অর্থাৎ অদূরেই বিরাজমান রয়েছে। ) বিকালে যখন আমরা রসূলুল্লাহ (সা)-র দরবারে উপস্থিত হলাম, তখন তিনি আমাদের মনের অবস্থা আঁচ করে নিলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন : তোমরা কি বুঝেছ ? আমরা আরম্ভ করলাম : আপনি দাঈজালের আলোচনা প্রসঙ্গে এমন কিছু কথা বলেছেন, যাতে বোঝা যায় যে, তার ব্যাপারটি নেহাতই তুচ্ছ এবং আরও কিছু কথা বলেছেন, যাতে মনে হয়, সে খুব শক্তিসম্পন্ন হবে এবং তার ফিতনা হবে খুব গুরুতর। এখন আমাদের মনে হয়েছে, যেন সে আমাদের নিকটেই খজুর নুকের ঝাড়ের মধ্যে সুক্ষ্মে আছে। রসূলুল্লাহ (সা) বললেন : তোমাদের সম্পর্কে আমি যেসব ফিতনার আশংকা করি, তন্মধ্যে দাঈজালের তুলনায় অন্যান্য ফেতনা অধিক ভয়ের যোগ্য। ( অর্থাৎ দাঈজালের ফিতনা এতটুকু গুরুতর নয়, যতটুকু তোমরা মনে করছ। ) যদি আমার জীবদ্দশায় সে আবির্ভূত হয়, তবে আমি নিজে তার মুকাবিলা করব। ( কাজেই তোমাদের চিন্তাদিবত হওয়ার কোন কারণ নেই। ) পক্ষান্তরে সে যদি আমার পরে আসে, তবে প্রত্যেকেই নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী তাকে পরাভূত করার চেষ্টা করবে। আমার অনুপস্থিতিতে আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মুসলমানের সাহায্যকারী। ( তার লক্ষণ এই যে ) সে সুবক, ঘন কৌকড়ানো চুলওয়ালো হবে। তার একটি চক্ষু উপরের দিকে উত্থিত হবে ( এবং অপর চক্ষুটি হবে কানা। ) যদি আমি ( কুৎসিত চেহারার ) কোন ব্যক্তিকে তার সাথে তুলনা করি, তবে সে হচ্ছে আবদুল ওযযা ইবনে-কুত্ন। ( জাহেলিয়াত আমলে কুৎসিত চেহারায় 'বনু-খোযাআ' গোত্রের এ গোত্রটির তুলনা ছিল না। ) যদি কোন মুসলমান দাঈজালের সম্মুখীন হয়ে যায়, তবে সূরা কাহ্ফের প্রথম আয়াতগুলো পড়ে নেওয়া উচিত। ( এতে সে দাঈজালের ফিতনা থেকে নিরাপদ হয়ে যাবে। ) দাঈজাল সিয়য়া ও ইরাকের মধ্যবর্তী স্থান থেকে বের হয়ে তত্বদিকে হাঙ্গামা সৃষ্টি করবে। হে আল্লাহর বান্দারা, তোমরা তার মুকাবিলার সুদৃঢ় থাক।

আমরা আরম্ভ করলাম : ইয়া রসূলুল্লাহ, সে কতদিন থাকবে ? তিনি বললেন : সে চল্লিশ দিন থাকবে, কিন্তু প্রথম দিন এক বছরের সমান হবে। দ্বিতীয় দিন এক মাসের

এবং তৃতীয় দিন এক সপ্তাহের সমান হবে। অবশিষ্ট দিনগুলো সাধারণ দিনের মতই হবে। আমরা আরম্ভ করলাম, ইয়া রসূলান্নাহ, যে দিনটি এক বছরের সমান হবে, আমরা কি তাতে শুধু এক দিনের (পাঁচ ওয়াত্ত) নামাযই পড়ব? তিনি বললেন : না; বরং সময়ের অনুমান করে পূর্ণ এক বছরের নামায পড়তে হবে। আমরা আবার আরম্ভ করলাম : ইয়া রসূলান্নাহ, সে কেমন প্রুতগতিতে সফর করবে? তিনি বললেন : সে মেঘখণ্ডের মত প্রুত চলবে, যার পেছনে অনুকূল বাতাস থাকে। দাজ্জাল কোন সম্প্রদায়ের কাছে পৌঁছে তাকে মিথ্যা ধর্মবিশ্বাসের প্রতি দাওয়াত দেবে। তারা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করলে সে মেঘমালাকে বর্ষণের আদেশ দেবে। ফলে বৃষ্টি বহিত হবে এবং মাটিকে আদেশ দেবে; ফলে সে শস্যশ্যামলা হয়ে যাবে। (তাদের চতুর্পদ জন্তু তাতে চরবে।) সজ্জায় যখন জন্তুগুলো ফিরে আসবে, তখন তাদের কুঁজ পূর্বের তুলনায় উঁচু হবে এবং স্তন দুধে পরিপূর্ণ থাকবে। এরপর দাজ্জাল অন্য সম্প্রদায়ের কাছে যাবে এবং তাদেরকেও কুফরের দাওয়াত দেবে। কিন্তু তারা তার দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করবে। সে নিরাশ হয়ে ফিরে গেলে সেখানকার মুসলমানরা দুর্ভিক্ষে পতিত হবে। তাদের কাছে কোন অর্থব্যক্তি থাকবে না! সে শস্যবিহীন অনূর্বর ভূমিকে সম্বোধন করে বলবে : তোর ঞপ্তখন বাইরে নিয়ে আয়। সেমতে ভূমির ঞপ্তখন তার পেছনে পেছনে চলবে; যেমন মৌমাছিরা তাদের সরদানের পেছনে পেছনে চলে। অতঃপর দাজ্জাল একজন উরপুর যুবক ব্যক্তিকে ডাকবে এবং তাকে তরবারির আঘাতে শিখণ্ডিত করে দেবে। তার উত্তর খণ্ড এতটুকু দূরত্বে রাখা হবে; যেমন তাঁর নিষ্কেপকারী ও তার লক্ষ্যবস্তুর মাঝখানে থাকে। অতঃপর সে তাকে ডাক দেবে! সে (জীবিত হয়ে) দাজ্জালের কাছে প্রকুল চিত্তে চলে আসবে। ইতিমধ্যে আল্লাহ তা'আলাই হযরত ইসা (আ)-কে নামিয়ে দিবেন। তিনি দু'টি রঙিন চাদর পরে দামেস্ক মসজিদের পূর্ব দিককার সাদা মিনারে ফেরেশতাদের পাখার উপর পা রেখে অবতরণ করবেন। তিনি যখন মস্তক অবনত করবেন, তখন তা থেকে পানির ফোঁটা পড়বে। (মনে হবে যেন এখনই গোসল করে এসেছেন।) তিনি যখন মস্তক উঁচু করবেন, তখনও মোমবাতির মত স্বচ্ছ পানির ফোঁটা পড়বে। তাঁর স্বাস-প্রশ্বাস যে কাফিরের গায়ে লাগবে, সে সেখানেই মত্তে যাবে। তাঁর স্বাস-প্রশ্বাস তাঁর দৃষ্টির সমান দূরত্বে পৌঁছাবে। হযরত ইসা (আ) দাজ্জালকে খুঁজতে খুঁজতে বাবুলুদে গিয়ে তাকে ধরে ফেলবেন। (এই জনপদটি এখনও বাবুলুদে মোকাদ্দাসের অদূরে এ নামেই বিদ্যমান।) সেখানে তাকে হত্যা করবেন। এরপর তিনি জনসমক্ষে আসবেন, স্নেহভরে মানুষের চেহারা হাত বুলাবেন এবং তাদেরকে জামাতের সুউচ্চ মর্শাদার সুসংবাদ শোনাবেন।

এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করবেন : আমি আমার বান্দাদের মধ্য থেকে এমন লোক বের করব যাদের মুন্কাবিলা করার শক্তি কারও নেই। কাজেই আপনি মুসলমানদেরকে সমবেত করে তুর পর্বতে চলে যান। (সেমতে তিনিই তাই করবেন।) অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইয়াজ্জ-মাজ্জের রাস্তা খুলে দেবেন। তাদের শ্রুত চলার কারণে মনে হবে যেন উপর থেকে পিছলে নিচে এসে পড়ছে। তাদের

প্রথম দলটি তবরিয়্যা উপসাগরের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় তাঁর পানি পান করে এমন অবস্থা করে দেবে যে, দ্বিতীয় দলটি এসে সেখানে কোন দিন পানি ছিল, একথা বিশ্বাস করতে পারবে না।

ঈসা (আ) ও তাঁর সঙ্গীরা তুর পর্বতে আশ্রয় নেবেন। অন্য মুসলমানরা নিজ নিজ দুর্গে ও নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেবে। পানাহারের বস্তুসামগ্রী সাথে থাকবে, কিন্তু তাতে ঘাটতি দেখা দেবে। ফলে একটি গরুর মস্তককে একশ দীনারের চাইতে উত্তম মনে করা হবে। হযরত ঈসা (আ) ও অন্য মুসলমানরা কষ্ট লাঘবের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন। (আল্লাহ্ দোয়া কবুল করবেন।) তিনি মহামারী আকারে রোগ-ব্যধি পাঠাবেন। ফলে অল্পসময়ের মধ্যে ইয়াজুজ-মাজুজের গোষ্ঠী সবাই মরে যাবে। অতঃপর ঈসা (আ) সঙ্গীদেরকে নিয়ে তুর পর্বত থেকে নিচে নেমে এসে দেখবেন পৃথিবীতে তাদের মৃতদেহ থেকে অর্ধ হাত পরিমিত স্থানও খালি নৈই এবং (মৃতদেহ পচে) অসহ্য দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে। (এ অবস্থা দেখে পুনরায়) হযরত ঈসা (আ) ও তাঁর সঙ্গীরা আল্লাহর দরবারে দোয়া করবেন (যেন এই বিপদও দূর করে দেয়া হয়।) আল্লাহ্ তা'আলা এ দোয়াও কবুল করবেন এবং বিরাতীকার পাখী প্রেরণ করবেন, যাদের স্বাভাবিক হবে উটের স্বাভাবিক মত। (মৃতদেহগুলো উড়িয়ে যেখানে আল্লাহ্ ইচ্ছা করবেন, সেখানে ফেলে দেবে।) কোন কোন রেওয়াজেতে রয়েছে মৃতদেহগুলো সমুদ্রে নিক্ষেপ করবে। এরপর রুগ্নি বসিত হবে। কোন নগর ও বন্দর এ রুগ্নি থেকে বাদ থাকবে না। ফলে সমগ্র ভূপৃষ্ঠ ধৌত হয়ে কাঁচের মত পরিষ্কার হয়ে যাবে। অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা ভূপৃষ্ঠকে আদেশ করবেন : তোমার পেটের সমুদয় ফল-ফুল উদ্গিরণ করে দাও এবং নতুনভাবে তোমার বরকতসমূহ প্রকাশ কর। (ফলে তাই হবে এবং এমন বরকত প্রকাশিত হবে যে,) একটি ডালিম একদল লোকের আহ্বানের জন্য যথেষ্ট হবে এবং মানুষ তার ছাল দ্বারা ছাতা তৈরি করে ছায়া লাভ করবে। দুধে এত বরকত হবে যে, একটি উঁকুর দুধ একদল লোকের জন্য, একটি গাভীর দুধ এক গোত্রের জন্য এবং একটি ছাগলের দুধ একটি পরিবারের জন্য যথেষ্ট হবে। (চল্লিশ বছর যাবত এই অসাধারণ বরকত ও শান্তিশুখলা অব্যাহত থাকার পর যখন কিয়ামতের সময় সমাগত হবে; তখন) আল্লাহ্ তা'আলা একটি মনোরম বায়ু প্রবাহিত করবেন। এর পরশে সব মুসলমানের বগলের নিচে বিশেষ এক প্রকার রোগ দেখা দেবে এবং সবাই মৃত্যুশুখে পতিত হবে; শুধু কাফির ও দুষ্ট লোকেরাই অবশিষ্ট থেকে যাবে। তারা ভূপৃষ্ঠে জন্তু-জানোয়ারের মত খোলাখুলি অপকর্ম করবে। তাদের উপরই কিয়ামত আসবে।

হযরত আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদেব রেওয়াজেতে ইয়াজুজ-মাজুজের কাহিনীর আরও অধিক বিবরণ পাওয়া যায়। তাতে রয়েছে : তবরিয়্যা উপসাগর অতিক্রম করার পর ইয়াজুজ-মাজুজ বায়তুল মোকাদ্দাস সংলগ্ন পাহাড় জাবালুল-খমরে আরোহণ করে ঘোষণা করবে : আমরা পৃথিবীর সমস্ত অধিবাসীকে হত্যা করেছি। এখন আকাশের অধিবাসীদেরকে খতম করার পালা। সেমতে তারা আকাশের দিকে তীর নিক্ষেপ করবে।

আল্লাহর আদেশে সে তীর রক্তরঞ্জিত হয়ে তাদের কাছে ফিরে আসবে (যাতে বোকারা এই ভেবে আনন্দিত হবে যে, আকাশের অধিবাসীরাও শেষ হয়ে গেছে।)

দাঈজালের কাহিনী প্রসঙ্গে হযরত আবু সাইদ খুদরীর রেওয়াজেতে আরও উল্লেখ রয়েছে যে, দাঈজাল মদীনা মুন'ওয়ারা থেকে দূরে থাকবে। মদীনার পথসমূহে আসাও তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না। সে মদীনার নিকটবর্তী একটি লবণাক্ত ভূমিতে আগমন করবে। তখন সমসাময়িক এক মহান ব্যক্তি তার কাছে এসে বলবেন : আমি পূর্ণ বিশ্বাস সহকারে বলছি যে, তুই সে দাঈজাল যার সংবাদ রসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে দিয়েছিলেন। (একথা শুনে) দাঈজাল বলবে : লোক সকল ! যদি আমি এ ব্যক্তিকে হত্যা করে পুনরায় জীবিত করে দেই, তবে আমি যে খোদা এ ব্যাপারে তোমরা সন্দেহ করবে কি? সবাই উত্তর দেবে : না। অতঃপর সে লোকটিকে হত্যা করে পুনরায় জীবিত করে দিবে। লোকটি জীবিত হয়ে দাঈজালকে বলবেন : এবার আমার বিশ্বাস আরও বেড়ে গেছে যে, তুই-ই সে দাঈজাল। দাঈজাল তাকে পুনরায় হত্যা করতে চাইবে কিন্তু সমর্থ হবে না।—( মুসলিম )

সহীহ বোখারী ও মুসলিমে আবু সাইদ খুদরীর বাচনিক বর্ণিত রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ)-কে বলবেন, আপনি আপনার সন্তানদের মধ্য থেকে জাহান্নামীদেরকে তুলে আনুন। তিনি আশ্চর্য করবেন, হে পরওয়ারদিগার তারা কারা? আল্লাহ তা'আলা বলবেন : প্রতি হাজারে নয় শত নিরানব্বই জন জাহান্নামী এবং মাত্র একজন জান্নাতী। একথা শুনে সাহাবয়ে কিয়াম শিউরে উঠলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন ইয়া রসূলুল্লাহ, আমাদের মধ্যে সে একজন জান্নাতী কে হবে? তিনি উত্তরে বললেন : চিন্তা করো না। এই নয় শত নিরানব্বই জন জাহান্নামী তোমাদের মধ্য থেকে এক এবং ইয়াজুজ-মাজুজের মধ্য থেকে এক হাজারের হিসেবে হবে। মুস্তাদরাক হাকিমে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমরের বাচনিক বর্ণিত রয়েছে, রসূলুল্লাহ (সা) বলেন : আল্লাহ তা'আলা সমগ্র মানবজাতিকে দশ ভাগে ভাগ করেছেন। তন্মধ্যে নয় ভাগে রয়েছে ইয়াজুজ-মাজুজের লোক আর অবশিষ্ট এক ভাগে সারা বিশ্বের মানুষ।—( রাহুল মা'আনী )

ইবনে-কাসীর 'আল বেদায়্য ওয়াম্মেহায়্যাহ্' গ্রন্থে এসব রেওয়াজেতে উল্লেখ করে বলেন : এতে বোঝা যায় যে, ইয়াজুজ-মাজুজের সংখ্যা সমগ্র বিশ্বের জনসংখ্যার চাইতে অনেক বেশি হবে।

মসনদ আহমদ ও আবু দাউদে হযরত আবু হোরায়রার রেওয়াজেতে বর্ণিত রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (সা) বলেন : ঈসা (আ) অবতরণের পর চল্লিশ বছর দুনিয়াতে অবস্থান করবেন। মুসলিমের এক রেওয়াজেতে সাতবছরের কথা বলা হয়েছে। 'ফতহুল বারী' গ্রন্থে হাকেম ইবনে হাজার একে অশুদ্ধ সাব্যস্ত করে চল্লিশ বছর মেয়াদকেই শুদ্ধ বলেছেন। হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী এই দীর্ঘ সময় সুখ-শান্তিতে অতিবাহিত হবে এবং অসংখ্য বরকত প্রকাশ পাবে। পরস্পরের মধ্যে হিংসা ও শত্রুতার লেশমাত্র থাকবে না। দু'ব্যক্তির মধ্যে কোন সময় ঝগড়া-বিবাদ হবে না।—( মুসলিম ও আহমদ )



বোখারী হযরত আবু সাঈদ খুদরীর র়েওয়ানেতে রসূলুল্লাহ (সা)-র উক্তি বর্ণনা করেন যে, ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাবের পরও বায়তুল্লাহর হজ্জ ও ওমরা অব্যাহত থাকবে।—( মাযহারী )

বোখারী ও মুসলিম হযরত যম্নব বিনতে জাহশের র়েওয়ানেতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (সা) একদিন সূম থেকে এমন অবস্থায় জেগে উঠলেন যে, তাঁর মুখমণ্ডল ছিল রক্তিমাত এবং মুখে এই বাক্য উচ্চারিত হচ্ছিল :

لا انا الا الله ويل للعرب من شرق قد اقترب فتح اليوم من ردم  
يا جوج وما جوج مثل هذه وحلق تسعين -

“আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আরবদের ধ্বংস নিকটবর্তী। আজ ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীরে এতটুকু ছিদ্র হয়ে গেছে। অতঃপর তিনি রুকাসুলি ও তর্জনী মিলিয়ে রক্ত তৈরি করে দেখান।

হযরত যম্নব (রা) বলেন : একথা শুনে আরম্ভ করলাম : ইয়া রসূলুল্লাহ আমাদের মধ্যে সংকর্মপন্নায়ন মোক জীবিত থাকতেও কি ধ্বংস হয়ে যাবে? তিনি বললেন : হ্যাঁ, ধ্বংস হতে পারে, যদি অনাচারের অধিক্য হয়।—( আল বেদায়্যা ওয়াল্লেহায়্যাহ্ ) ইয়াজুজ-মাজুজের প্রাচীরে রক্ত পরিমাপ ছিদ্র হয়ে যাওয়া আসল অর্থেও হতে পারে এবং রূপক হিসেবে প্রাচীরটি দুর্বল হয়ে যাওয়ার অর্থেও হতে পারে। --(ইবনে কাসীর, আবু হাইয়্যান )

মসনদ আহ্মদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজা হযরত আবু হোরাইরার র়েওয়ানেতে বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : ইয়াজুজ-মাজুজ প্রত্যহ সূর্যোদয়নাইনের দেয়ালটি খুঁড়তে থাকে। খুঁড়তে খুঁড়তে তারা এলৌহ প্রাচীরের প্রান্ত সীমার এত কাছাকাছি পৌঁছে যায় যে, অপরপার্শ্বের আলো দেখা যেতে থাকে। কিন্তু তারা এ কথা বলে কিন্নে যায় যে, বাকী অংশটুকু আগামীকাল খুঁড়বে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা প্রাচীরটিকে পূর্ববৎ মজবুত অবস্থায় কিন্নিয়ে নেন। পরের দিন ইয়াজুজ-মাজুজ প্রাচীর খননে নতুনভাবে আত্মনিয়োগ করে। খননকার্যে আত্মনিয়োগ ও আল্লাহ পাক থেকে তা মেরামতের এ খারা ততদিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে, যতদিন ইয়াজুজ-মাজুজকে বহু রাখা আল্লাহর ইচ্ছা রয়েছে। যেদিন আল্লাহ তা'আলা ওদেরকে মুক্ত করার ইচ্ছা করবেন, সেদিন ওরা মেহনত শেষে বলবে : আল্লাহ ইচ্ছা করলে আমরা আগামীকাল অবশিষ্ট অংশটুকু খুঁড়ে উপরে চলে যাব। ( আল্লাহর নাম ও তাঁর ইচ্ছার উপর নির্ভর করার কারণে সেদিন ওদের তওফীক হয়ে যাবে। ) অতএব পরের দিন তারা প্রাচীরের অবশিষ্ট অংশকে তেমনি অবস্থায় পাবে এবং তারা সেটুকু খুঁড়েই প্রাচীর ভেদ করে ফেলবে। তিরমিযী এই র়েওয়ানেতেটি

أبوعوانة عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة

সূত্রে বর্ণনা করে বলেন :

— غريب لانفرقة الامن هذا الوجه — ইবনে কাসীর তাঁর তফসীরে রেওয়াজ-  
য়েভাটি বর্ণনা করেন বলেন :  
— اسناد لا جيد قوى ولكن مثلها في رفعة نكارة —  
এর সনদ উত্তম ও শক্তিশালী, কিন্তু মূল বক্তব্যটি রসুলুল্লাহ্ (স)-র স্কিনা, তা সুবিদিত নয়।

ইবনে-কাসীর 'আল-বেদায়্যা-ওয়াম্মেহায়্যাহ্' গ্রন্থে এ হাদীস সম্পর্কে বলেন :  
যদি মেনে নেয়া হয় যে, হাদীসের মূল বক্তব্যটি রসুলুল্লাহ্ (স)-র নয়; বরং কা'ব  
আহবানের বর্ণনা তবে এটা যে ধর্তব্য ও নির্ভরযোগ্য নয়, তা স্পষ্ট। পক্ষান্তরে যদি  
একে রসুলুল্লাহ্ (স)-এর বক্তব্য সাব্যস্ত করা হয়, তবে হাদীসের উদ্দেশ্য এই যে,  
ইমাজুজ-মাজুজের প্রাচীর খনন করার কাজটি তখন শুরু হবে, যখন তাদের আবির্ভাবের  
সময় নিকটবর্তী হবে। কোরআনে বলা হয়েছে যে, এই প্রাচীর ছিন্ন করা যাবে না এটা  
তখনকার অবস্থা, যখন মূলকারনাইন প্রাচীরটি নির্মাণ করেছিলেন। কাজেই এতে কোন  
বৈপরীত্য নেই। তাছাড়া আয়াও বলা যায় যে, কোরআনে ছিন্ন বলে এপার-ওপার ছিন্ন  
বোঝানো হয়েছে। হাদীসে পক্ষিকার বলা হয়েছে যে, তাদের এ ছিন্ন এপার-ওপার হবে।  
(বেদায়্যা, ২য় খণ্ড, ১১২ পৃঃ)

হাকেম ইবনে হাজার 'কতহল বারী' গ্রন্থে এই হাদীসটি আবদ ইবনে-হাম্মাদ  
ও ইবনে-হাক্বানের বরাতে দিয়েও উদ্ধৃত করে বলেছেন : তারা সবাই হযরত কাভাদাহ্  
থেকে বর্ণনা করেছেন এবং কোন কোন হাদীসে সনদের ব্যক্তিবর্গ সহীহ বোখারী  
ব্যক্তিবর্গ। তিনি হাদীসটি যে রসুলুল্লাহ্ (স)-র উক্তি এ বিষয়ে কোন সন্দেহ প্রকাশ  
করেননি। তিনি ইবনে আরাবীর বরাতে দিয়ে বর্ণনা করেন যে, এ হাদীসে তিনটি মুঞ্জিয়া  
রয়েছে। এক, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের চিন্তাধারা এদিকে নিবিষ্ট হতে দেননি সে, প্রাচীর  
খননের কাজ অবিরাম দিবারাত্র অব্যাহত রাখবে। নতুবা দিন ও রাত্রির কর্মসূচী আলাদা  
আলাদা নির্ধারণ করে কাজ সমাপ্ত করা এত বড় জাতির পক্ষে মোটেই কঠিন ছিল না।  
দুই, আল্লাহ্ তা'আলা প্রাচীরের উপরে উঠার পক্ষিকরনা থেকেও তাদের চিন্তাধারাকে  
সরিয়ে রেখেছেন। অথচ ওয়াহ্ব ইবনে-গুনাকেরহর রেওয়াজেত থেকে জানা যায় যে,  
তারা কুমিশিরে পাল্লদনী ছিল। সব লোকম যত্নপাতি তাদের কাছে ছিল। তাদের  
তুখুও বিভিন্ন প্রকার রুকুও ছিল। কাজেই প্রাচীরের উপরে আরোহণ করার উপায়  
সৃষ্টি করা তাদের পক্ষে কঠিন ছিল না। তিন, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তাদের মনে  
'ইনশাআল্লাহ্' বলার কথা আগ্রহ হজ না। তাদের বের হওয়ার নির্ধারিত সময় আসলেই  
কেবল তাদের মুখ দিয়ে এ বাক্য উচ্চারিত হবে।

ইবনে-আরাবী বলেন : এ হাদীস থেকে আলও জানা যায় যে, ইমাজুজ-মাজুজের  
মাঝে কিছুসংখ্যক লোক এমনও রয়েছে, যারা আল্লাহর অস্তিত্ব ও ইচ্ছায় বিশ্বাস রাখে।  
এটাও সম্ভব যে, বিশ্বাস ছাড়াই আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মুখ দিয়ে এ বাক্য উচ্চারিত  
করিয়ে দিবেন এবং এর বরকতে তারা তাদের উদ্দেশ্যে সিঙ্কিলাভ করবে। —(আসারাতুস  
সান্না, সৈয়দ মুহাম্মদ, ১৫৪ পৃঃ) কিন্তু বাস্তব বোঝা যায় যে, তাদের কাছেও পয়-  
গম্বরদের দাওয়াত পৌঁছেছে। নতুবা কোরআনের বর্ণনা অনুযায়ী তাদের জাহান্নামের শাস্তি

না হওয়াই উচিত। কোরআন বলে : وَمَا كُنَّا مَعَدَّ بِهِيَ حَتَّىٰ نُنْعِثَ رَسُولًا

—এতে বোঝা যায় যে, তারাও ঈমানের দাওয়াত লাভ করেছে। কিন্তু তারা কুফরকে আঁকড়ে রেখেছে। তাদের কিছু সংখ্যক লোক আব্রাহামের অস্তিত্ব ও ইচ্ছায় বিশ্বাসী হবে। তবে নিসালত ও আখিরাতে বিশ্বাস স্থাপন না করা পর্যন্ত শুধু এতটুকু বিশ্বাসই ঈমানের জন্য যথেষ্ট নয়। মোটকথা ইনশাআল্লাহ্ কালেমা বলার পরও কুফরের অস্তিত্ব থাকতে পারে।

হাদীসসমূহের বর্ণনা থেকে অজিত ফলাফল : উল্লিখিত হাদীসসমূহে ইয়াজুজ-মাজুজ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে নিম্নলিখিত বিষয়াদি প্রমাণিত হয়েছে :

১. ইয়াজুজ-মাজুজ সাধারণ মানুষের মতই মানুষ এবং নূহ (আ)-র সন্তান-সন্ততি। অধিকাংশ হাদীসবিদ ও ইতিহাসবিদগণ তাদেরকে ইয়াকেস ইবনে নূহের বংশধর সাব্যস্ত করেছেন। একথাও বলা বাহুল্য যে, ইয়াকেসের বংশধর নূহ (আ)-র আমল থেকে মূলকারনাইনের আমল পর্যন্ত দূরদূরান্তরে বিভিন্ন গোত্রে ও বিভিন্ন জনপদে ছড়িয়ে পড়েছিল। যেসব সম্প্রদায়ের নাম ইয়াজুজ-মাজুজ, জরুরী নয় যে, তারা সবাই মূলকারনাইনের প্রাচীরের উপরে আবদ্ধ হয়ে গেছে। তাদের কিছু গোত্র ও সম্প্রদায় প্রাচীরের এপারেরও থাকতে পারে। কিন্তু ইয়াজুজ-মাজুজ শুধু তাদেরই নাম, যারা বর্বর অসভ্য ও রক্তপিপাসু, জালিম। মোগল তুর্কী অথবা মঙ্গোলীয় জাতি যারা সভ্যতা লাভ করেছে, ওরাও তাদের অন্তর্ভুক্ত হলেও তারা নামের বাইরে।

২. ইয়াজুজ-মাজুজের সংখ্যা বিশ্বের সমগ্র জনসংখ্যার চাইতে অনেক গুণ বেশী, কমপক্ষে এক ও দেশের ব্যবধান।—(২নং হাদীস)

৩. ইয়াজুজ-মাজুজের যেসব সম্প্রদায় ও গোত্র মূলকারনাইনের প্রাচীরের কাছগে ওপারে আবদ্ধ হয়ে গেছে, তারা কিয়ামতের সন্নিকটবর্তী সময় পর্যন্ত এভাবেই আবদ্ধ থাকবে। তাদের বেঙ্গ হওয়ার সময় মেহদী (আ)-র আবির্ভাব, অতঃপর দাজ্জালের আগমনের পরে হবে, যখন ঈসা (আ) অবতরণ করে দাজ্জালের নিধন কার্য সমাপ্ত করবেন।—(১নং হাদীস)

৪. ইয়াজুজ-মাজুজের মুক্ত হওয়ার সময় মূলকারনাইনের প্রাচীর বিধ্বস্ত হয়ে সমতলভূমির সমান হয়ে যাবে।—(কোরআন) তখন ইয়াজুজ-মাজুজের অগণিত লোক একযোগে পর্বতের উপর থেকে অবতরণের সময় দ্রুতগতির কারণে মনে হবে যেন তারা পিছলে পিছলে নিচে গড়িয়ে পড়ছে। এই অপরিসীম বর্বর মানবগোষ্ঠীর সাধারণ জন-বসতি ও সমগ্র পৃথিবীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। তাদের হত্যাকাণ্ড ও লুটতরাজের মুকাবিলা করার সাধ্য কারও থাকবে না। আব্রাহাম রসূল হযরত ঈসা (আ) ও আব্রাহামের আদেশে মুসলমানদেরকে সাথে নিয়ে তুর পর্বতে আশ্রয় নেবেন এবং যেখানে যেখানে কেব্রা ও সংরক্ষিত স্থান থাকবে, সেখানেই আচ্ছগোপন করে প্রাণ রক্ষা করবেন। পানাহারের রসদ-সামগ্রী নিঃশেষ হওয়ার পর জীবনধারণের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের

মূল্য আকাশচুম্বী হয়ে যাবে। এই বর্বর জাতি অবশিষ্ট জনবসতিকে খতম করে দেবে এবং নদ-নদীর পানি নিঃশেষে পান করে ফেলবে।—(১ নং হাদীস)

৫. হযরত ইসা (আ) ও তাঁর সঙ্গীদেরই দোয়ার এই পঙ্গপালসদৃশ অগণিত লোক নিপাত হয়ে যাবে। তাদের মৃতদেহ সমগ্র ভূপৃষ্ঠকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে এবং দুর্গন্ধের কাণ্ডে পৃথিবীতে বাস করা দুর্ভা হইবে পড়বে।—(১নং হাদীস)

৬. অতঃপর ইসা (আ) ও তাঁর সঙ্গীদেরই দোয়ার তাদের মৃতদেহ সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত অথবা অদৃশ্য করে দেয়া হবে এবং বিশ্বব্যাপী বৃষ্টির মাধ্যমে সমগ্র ভূপৃষ্ঠকে ধুয়ে পাক-সাক করা হবে।—(১ নং হাদীস)

৭. এরপর প্রায় চল্লিশ বছর পৃথিবীতে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত থাকবে। ভূপৃষ্ঠ তার বরুকতসমূহ উদ্‌গিরণ করে দিবে। কেউ দরিদ্র থাকবে না এবং কেউ কাউকে বিদ্রোহ করবে না। সর্বত্রই শান্তি ও সুখ বিরাজ করবে।—(৩নং হাদীস)

৮. শান্তি ও শৃঙ্খলার সময় কা'বা গৃহের হজ্জ ও ওমরাহ অব্যাহত থাকবে।—( ৪ নং হাদীস )

হাদীসে প্রমাণিত রয়েছে যে, হযরত ইসা (আ)-র ওফাত হবে এবং তিনি রসুলুল্লাহ (সা)-র রওমা মোবারকে সমাহিত হবেন! অর্থাৎ তিনি হজ্জ ও ওমরার উদ্দেশ্যেই হেজাজ সফর করার সময় ওফাত পাবেন।—( মুসলিম )

৯. রসুলুল্লাহ (সা)-র জীবনের শেষভাগে স্বপ্ন-ওহীর মাধ্যমে তাঁকে দেখানো হয় যে, মুলকাননাইনের প্রাচীরে একটি ছিদ্র হয়ে গেছে। তিনি একে আনবদের ধ্বংস ও অবনতির লক্ষণ বলে সাব্যস্ত করেন। প্রাচীরে ছিদ্র হয়ে যাওয়াকে কেউ কেউ প্রকৃত অর্থেও নিম্নেছেন এবং কেউ কেউ রূপক অর্থে বুঝেছেন যে, প্রাচীরটি এখন দুর্বল হয়ে পড়েছে, ইয়াজ্জ-মাজ্জের বের হওয়ার সময় নিকটে এসে গেছে এবং এর আলামত আনব জাতির অধঃপতনরূপে প্রকাশিত হবে। **والله اعلم**

১০. হযরত ইসা (আ) অবতরণের পর পৃথিবীতে চল্লিশ বছর অবস্থান করবেন —( ৩ নং হাদীস ) তাঁর পূর্বে হযরত মাহ্‌দী (আ)-এর অবস্থানকাল চল্লিশ বছর হবে। তন্মধ্যে কিছুকাল হবে উভয়ের সহযোগিতায়। সৈয়দ শরীক বরমজী “আসারাতুসসান্নাহ্‌ গ্রন্থের ১৪৫ পৃষ্ঠায় লেখেন : দা'আলের হত্যা ও শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ইসা (আ) চল্লিশ বছর অবস্থান করবেন এবং তাঁর মোট অবস্থানকাল হবে পঁয়তাল্লিশ বছর। ১১২ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে : হযরত মাহ্‌দী (আ) হযরত ইসা (আ)-র ক্লিশের উপর কয়েক বছর আগে আবির্ভূত হবেন এবং তাঁর মোট অবস্থানকাল হবে চল্লিশ বছর। এভাবে পাঁচ অথবা সাত বছর পর্যন্ত উভয়ে একত্রে বসবাস করবেন। এই উভয় কালের বৈশিষ্ট্য হবে এই যে, সমগ্র ভূপৃষ্ঠে ন্যায় ও সুবিচারের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। ভূপৃষ্ঠ তার সব বরুকত ও গুণতধন উদ্‌গিরণ করে দেবে। কেউ ফকির-মিসকীন থাকবে না। পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও প্রতিহিংসার লেশমাত্র থাকবে না। অবশ্য মেহদী (আ)-র

শেষ আমলে দাঙ্কাল এসে মক্কা-মদীনা বায়তুল-মোকাদ্দাস ও তুর পর্বত বাতীত সর্বত্র দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও ফিতনা ছড়িয়ে দেবে। এই ফিতনাটি হবে বিশ্বের সর্ববৃহৎ ফিতনা। দাঙ্কালের অবস্থান ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা মাত্র চল্লিশ দিন স্থায়ী হবে। তন্মধ্যে প্রথম দিন এক বছরের দ্বিতীয় দিন এক মাসের এবং তৃতীয় দিন এক সপ্তাহের সমান হবে। আর অবশিষ্ট দিনগুলো হবে সাধারণ দিনেরই মতো। এখানে প্রকৃতপক্ষে দিনগুলো এমন দীর্ঘ করে দেয়া যেতে পারে। কেননা শেষ যুগে প্রায় সব ঘটনাই অভ্যাসবিরুদ্ধ ঘটবে। এমনও সম্ভব যে, দিন তো প্রকৃতপক্ষে স্বাভাবিকই থাকবে কিন্তু হাদীস থেকে জানা যায় যে, দাঙ্কাল হবে অসাধারণ যাদুকর। কাজেই তার যাদুর প্রভাবে দিব্যারাত্রির পরিবর্তন সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে ধরা না-ও পড়তে পারে। তারা একে একই দিন দেখবে ও মনে করবে। হাদীসে সে দিনে সাধারণ দিন অনুযায়ী অনুমান করে নামায পড়ার আদেশ বর্ণিত রয়েছে। এ থেকেও এ বিষয়ের সমর্থন পাওয়া যায় যে, প্রকৃতপক্ষে দিব্যারাত্র পরিবর্তিত হতে থাকবে, কিন্তু মানুষ তা অনুভব করবে না। তাই এই এক বছরের দিনে তিন শ' ঘণ্টা দিনের নামায আদায় করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। নতুবা দিনটি প্রকৃতপক্ষে একদিন হলে শরীয়তের নীতি অনুযায়ী তাতে একদিনের নামাযই করায় হত। মোটকথা দাঙ্কালের মোট অবস্থানকাল এমনি ধরনের চল্লিশ দিন হবে।

এরপর হযরত ঈসা (আ) অবতরণ করে দাঙ্কালকে হত্যা করার মাধ্যমে তার ফিতনারও অবসান ঘটাবেন। কিন্তু এর সাথে সাথেই ইয়াজুজ-মাজুজ বের হবে। তারা তুপুর্কের সর্বত্র হত্যা ও লুটতরাজ করবে। তাদের অবস্থানকালও কয়েকদিন মাত্র হবে। এরপর হযরত ঈসা (আ)-র দোয়াক তারা সবাই একযোগে মানা যাবে। মোটকথা, হযরত মেহদীর আমলের শেষ ভাগে এবং ঈসা (আ)-র আমলের শুরুভাগে দাঙ্কাল ও ইয়াজুজ-মাজুজের দু'টি ফিতনা সংঘটিত হবে। এগুলো সারা বিশ্বের মানুষকে তখনই করে দেবে। এই কয়েক দিনের পূর্বে এবং পরে সমগ্র বিশ্বে ন্যায় ও সুবিচার, শান্তি ও বরকত এবং ফল ও শস্যের অভূতপূর্ব আধিক্য হবে। হযরত ঈসা (আ)-র আমলে ইসলাম বাতীত কোন কালেমা ও ধর্মের অস্তিত্ব থাকবে না, কোন দীন-দুঃখী থাকবে না। হিংস্র এবং বিমাতৃ জীবজন্তুও একে অপরকে কণ্ট দিবে না।

ইয়াজুজ-মাজুজ ও হুলকারনাইনের প্রাচীর সম্পর্কিত এ সব তথ্য কোরআন ও হাদীস উশ্মতকে অবহিত করেছে। এগুলোর প্রতি বিশ্বাস রাখা জরুরী এবং বিরোধিতা করা না-জায়েয। হুলকারনাইনের প্রাচীর কোথায় অবস্থিত? ইয়াজুজ-মাজুজ কোন জাতি? তারা কোথায় বসবাস করে? এ সব ভৌগোলিক আলোচনার উপর ইসলামের কোন আকীদা-বিশ্বাস এবং কোরআনের কোন আয়াতের মর্ম ও ব্যাখ্যা নির্ভরশীল নয়। এতদসত্ত্বেও বিরোধী পক্ষের আখোল-তা'বোল বকাবকির জওয়াব এবং অতিরিক্ত জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে আলিমরা এগুলো সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন। এ আলোচনার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হচ্ছে :

কুরতুবী স্বয়ং তফসীর গ্রন্থে সুন্দীর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, ইয়াজুজ-মাজুজের বাইশটি গোত্রের মধ্য থেকে একশটি গোত্রকে হুলকারনাইনের প্রাচীর দ্বারা আবদ্ধ

কল্পে দেয়া হয়েছে। একটি গোত্র প্রাচীরের এপারে রয়েছে গেছ। আর সে গোত্রটি হল তুর্ক। এরপর কুরতুবী বলেনঃ রসুলুল্লাহ্ (সা) তুর্কদের সম্পর্কে যেসব কথা বলেছেন, সেগুলো ইয়াজ্জ-মাজ্জের সাথে খাপ খায়। শেষ যমানীয় তাদের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধের কথা সহীহ মুসলিমে বর্ণিত রয়েছে। অতঃপর কুরতুবী বলেনঃ বর্তমান সময় তুর্ক জাতির বিপুলসংখ্যক লোক মুসলমানদের মুকাবিলা করার জন্য অগ্রসরমান। তাদের সন্তিক সংখ্যা আলাহ তা'আলাই জানেন। তিনিই মুসলমানদেরকে তাদের অনিষ্ট থেকে বাঁচাতে পারেন। মনে হয় যেন তারা ইয়াজ্জ-মাজ্জের অথবা কমপক্ষে তাদের অগ্রসেনাদল।— (কুরতুবী, একাদশ খণ্ড, ৫৮ পৃঃ কুরতুবী সময়কাল মঠ হিজরী। তখন তাতারীদের ফিতনা প্রকাশ পায় এবং তারা ইসলামী খিলাফতকে তছনছ করে দেয়। ইসলামী ইতিহাসে তাদের এই ফিতনা সুবিদিত। তাতারীরা যে মোগল তুর্কদের বংশধর; তাও প্রসিদ্ধ।) কিন্তু কুরতুবী তাদেরকে ইয়াজ্জ-মাজ্জের সমতুল্য এবং অগ্রসেনাদল সাব্যস্ত করেছেন। তাদের ফিতনাকে ইয়াজ্জ-মাজ্জের আবির্ভাব বজেননি, যা কিয়ামতের অন্যতম আলামত। কেননা, মুসলিমের হাদীসে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, ইসা (আ)-র অবতরণের পর তাঁর আমলে ইয়াজ্জ-মাজ্জের আবির্ভাব হবে।

এ কারণেই আল্লামা আলুসী তফসীরে রাহুল মা'আনীতে যারা তাতারীদেরকে ইয়াজ্জ-মাজ্জ সাব্যস্ত করে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ভাষায় প্রতিবাদ করে বলেছেনঃ এরূপ ধারণা করা প্রকাশ্য রুকমের পথপ্রলুপ্ততা এবং হাদীসের বর্ণনার সরাসরি বিরুদ্ধাচরণ। তবে তিনিও বলেছেন যে, নিঃসন্দেহে তাতারীদের ফিতনা ইয়াজ্জ-মাজ্জের ফিতনার সমতুল্য।—(১৬শ খণ্ড, ৪৪ পৃঃ) বর্তমান যুগে কিছু সংখ্যক ইতিহাসবিদ বর্তমান রাশিয়া অথবা চীন অথবা উভয়কেই ইয়াজ্জ-মাজ্জ সাব্যস্ত করেন। তাদের উদ্দেশ্য যদি কুরতুবী ও আলুসী মতই হয় যে, তাদের ফিতনা ইয়াজ্জ-মাজ্জের ফিতনার সমতুল্য, তবে তা ভ্রান্ত হবে না। কিন্তু তাঁরা যদি তাদেরকেই কিয়ামতের অজামতরূপে কেশরআন ও হাদীসে বর্ণিত ইয়াজ্জ-মাজ্জের আবির্ভাব হিসেবে সাব্যস্ত করেন, যার সময় ইসা (আ)-র অবতরণের পরে বলা হয়েছে, তবে তা নিশ্চিতই ভ্রান্তি, পথপ্রলুপ্ততা ও হাদীসের বর্ণনার বিরুদ্ধাচরণ হবে।

খ্যাতনামা ইতিহাসবিদ ইবনে খালদুন স্বীয় ইতিহাস গ্রন্থের ভূমিকায় সপ্ত ভূখণ্ডের মধ্য থেকে ষষ্ঠ ভূখণ্ডের আলোচনায় ইয়াজ্জ-মাজ্জ, মূলকারনাইনের প্রাচীর এবং তাদের অবস্থানস্থল সম্পর্কে ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণজনিত নিম্নরূপ বক্তব্য রেখেছেনঃ

সপ্তম ভূখণ্ডের নবম অংশে পশ্চিমদিকে তুর্কীদের কাঙ্ক ও চর্কস নামে অধিহিত গোত্রসমূহ বসবাস করে এবং পূর্বদিকে ইয়াজ্জ-মাজ্জের বসতি অবস্থিত তাদের উভয়ের মধ্যস্থলে কনকশাস পর্বতমালা অবস্থিত। পূর্বে বলা হয়েছে যে, এই পর্বতমালা চতুর্থ ভূখণ্ডের পূর্বদিকে অবস্থিত ভূমধ্যসাগর থেকে শুরু হয়ে এই ভূখণ্ডেরই শেষ উত্তর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। এরপর ভূমধ্যসাগর থেকে পৃথক হয়ে উত্তর পশ্চিম দিকে বিস্তৃত হয়ে পঞ্চম ভূখণ্ডের নবম অংশে প্রবেশ লাভ করেছে। এখান থেকে তা আবার প্রথম দিকে মোড় নিয়েছে এবং সপ্তম ভূখণ্ডের

নবম অংশে প্রবেশ করেছে। এখানে পৌছে তা দক্ষিণ থেকে উত্তর-পশ্চিম হয়ে চলে গেছে। এই পর্বতমালা মাঝখানে সিকান্দরী প্রাচীর অবস্থিত, আমরা এইমাত্র মাত্র উল্লেখ করেছি এবং কোরআনও মাত্র সংবাদ দিয়েছে।

আবদুল্লাহ ইবনে খরদামবাহ স্বীয় ভূগোল গ্রন্থে আব্বাসী খলীফা ওয়ালিদ বিলাহর একটি স্বপ্ন বর্ণনা করেছেন। তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, প্রাচীর খুলে গেছে। এতে তিনি অস্থির হয়ে উঠে বসেন এবং অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য তাঁর মুখপাত্র সান্নামকে প্রেরণ করেন। সে ফিরে এসে এই প্রাচীরের অবস্থা বর্ণনা করে।—(ইবনে খলদুনের ‘মুকাদ্দামা’ ৭৯ পৃঃ)

আব্বাসী খলীফা ওয়ালিদ বিলাহ কর্তৃক মুলকান্নাইনের প্রাচীর পর্যবেক্ষণের জন্যে একটি দল প্রেরণ করা এবং তাদের পর্যবেক্ষণ করে ফিরে আসার কথা ইবনে কাসীরও ‘আল বেদায়্যা ওয়ালেহায়হ’ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তাতে আরও বর্ণিত রয়েছে যে, এই প্রাচীর নৌহনিমিত। এতে বড় বড় তালাবজল সরঞ্জামও আছে এবং এটি উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত। তফসীর কবীর ও তাবারী এই ঘটনা বর্ণনা করে লিখেছেন : **হে-যাকি** এই প্রাচীর পরিদর্শন করে ফিরে আসতে চায়, গাইড তাকে এমন লতাপাতাবিহীন প্রান্তরে পৌছে দেয়, যা সমরখন্দের বিপরীত দিকে অবস্থিত। —(তফসীর কবীর, ৫ম খণ্ড ৫১ পৃঃ)

শ্রেয় উস্তাদ হযরত মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ) ‘আকীদাতুল ইসলাম ফী হায়াতে দীসা (আ) গ্রন্থে ইয়াজুজ-মাজুজ ও মুলকান্নাইনের প্রাচীরের অবস্থা প্রসঙ্গক্রমে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু যতটুকু বর্ণনা করেছেন তা অনুসন্ধান ও রেওয়াজেতের মাপকাঠিতে উৎকৃষ্ট পর্যায়ে। তিনি বলেন : দুক্কতকারী ও বর্বর মানুষদের লুঠন থেকে আত্মরক্ষার জন্য পৃথিবীতে এক নয়—বহু জায়গায় প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছে। এগুলো বিভিন্ন বাদশাহগণ বিভিন্ন স্থানে নির্মাণ করেছেন। তন্মধ্যে সর্ববৃহৎ ও সর্ব-প্রসিদ্ধ হচ্ছে চীনের প্রাচীর। এর দৈর্ঘ্য আবু হাইয়ান আন্দালুসী (ইরানের শাহী দরবারের ঐতিহাসিক) বার শত মাইল বর্ণনা করেছেন; এর প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন চীন সম্রাট ‘ফুগফু’। এর নির্মাণের তারিখ আদম (আ)—এর অবতরণের তিন হাজার চার শত ষাট বছর পর বর্ণনা করা হয়। এই চীন প্রাচীরকে মোগলরা ‘আনকুদাহ’ এবং তুর্কীরা ‘বুলকুরক’ বলে থাকে। তিনি আরও বলেন : এমনি ধরনের আরও কয়েকটি প্রাচীর বিভিন্নস্থানে পরিদৃষ্ট হয়।

মাওলানা হিফজুর রহমান সিহওয়ারী (রহ) কাসাসুল কোরআনে বিশদ্রিতভাবে শাহ সাহেবের উপরোক্ত বর্ণনার ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা করেছেন। এর সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপ :

ইয়াজুজ-মাজুজের লুঠন ও ধ্বংসকাজ সাধনের পরিধি বিশাল এলাকাব্যাপী বিস্তৃত ছিল। একদিকে ককেশিয়ার পাদদেশে বসবাসকারীরা তাদের জুলুম ও নির্মাতনের শিকার ছিল এবং অপরদিকে তিব্বত ও চীনের অধিবাসীরাও ছিল সর্বরূপ তাদের আক্রমণের লক্ষ্যস্থল। এই ইয়াজুজ-মাজুজের অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষার জন্য বিভিন্ন

সময় বিভিন্ন স্থানে একাধিক প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে সর্ববৃহৎ ও প্রসিদ্ধ প্রাচীর হচ্ছে চীনের প্রাচীর। উপরে এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় প্রাচীর মধ্য এশিয়ার বুখারা ও তিরমিশের নিক্ষটে অবস্থিত। এর অবস্থানস্থলের নাম দরবন্দ! এই প্রাচীরটি খ্যাতনামা মোগল সম্রাট তৈমুরের আমলে বিদ্যমান ছিল। স্নায় সম্রাটের বিশেষ সভাসদ সীলা বর্জর জর্মনীও তার গ্রহে এর কথা উল্লেখ করেছেন। আন্দালুসের সম্রাট ফাষ্টাইলের দূত ক্যাকুও তার ভ্রমণ কাহিনীতে এর উল্লেখ করেছেন। ১৪০৩ খৃষ্টাব্দে যখন তিনি সম্রাটের দূত হিসেবে তৈমুরের দরবান্দে পৌছেন, তখন এ স্থান অতিক্রম করেন। তিনি লিখেন : বাবুল হাদীসের প্রাচীর মুসেলের ঐ পথে অবস্থিত, যা সমরখন্দ ও ভারতের মধ্যস্থলে বিদ্যমান।—(তফসীলে জওয়াহরুল-কোরআন, তানভাভী, ৯ম খণ্ড, ১৯৮ পৃঃ)

তৃতীয় প্রাচীর রাশিয়ান এলাকা দাগিস্তানে অবস্থিত। এটিও দরবন্দ ও বাবুল আবওয়াল নামে খ্যাত। ইয়াকুত হমভী 'মুজামুল বুলদানে,' ইদরীসী 'জুগন্নাকিফা'য় এবং বুস্তানী 'দায়েরাতুল মা'আরিক' এর অবস্থা বিস্তারিত লিপিবদ্ধ করেছেন। এর সান্ন-সংক্ষেপ নিম্নরূপ :

দাগিস্তানে দরবন্দ একটি রাশিয়ান শহর। শহরটি কাম্পিয়ান সাগরের পশ্চিম তীরে অবস্থিত। এটি ৩° উত্তর অক্ষাংশ থেকে ৪৩° উত্তর অক্ষাংশ এবং ১৫° পূর্ব দ্রাঘিমা থেকে ৪৮° পূর্ব দ্রাঘিমা পর্যন্ত বিস্তৃত। একে দরবন্দে নওশেরওয়ী নামেও অভিহিত করা হয়। তবে বাবুল-আবওয়াল নামে তা বিশেষ প্রসিদ্ধ।

চতুর্থ প্রাচীর বাবুল আবওয়াল থেকে পশ্চিম দিকে ককেশিয়ান সুউচ্চ মালভূমিতে অবস্থিত। সেখানে দুই পাহাড়ের মধ্যস্থলে দাগিয়াল নামে একটি প্রসিদ্ধ গিরিপথ রয়েছে। এই চতুর্থ প্রাচীরটি এখানে কাকফকায অথবা জাবালে-কোফা অথবা কাক পর্বতমালার প্রাচীর নামে খ্যাত। বুস্তানী এ সম্পর্কে লেখেন :

এবং এরই (অর্থাৎ বাবুল-আবওয়াল প্রাচীরের) নিকটে আরও একটি প্রাচীর রয়েছে, যা পশ্চিম দিকে এগিয়ে গেছে। সম্ভবত পারস্যবাসীরা উত্তরাঞ্চলীয় বর্বরদের কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য এটি নির্মাণ করেছেন। এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পর্কে সঠিক ও বিস্তৃত কোন বর্ণনা জানা যায়নি। প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে কেউ কেউ একে সিকান্দরের প্রতি, কেউ কেউ পারস্য সম্রাট নওশেরওয়ীর প্রতি এর সম্বন্ধ নির্দেশ করেছেন। ইয়াকুত বলেন : গম্বিত তামা দ্বারা এটি নিমিত্ত হয়েছে।  
—(দায়েরাতুল-মা'আরিক ৭ম খণ্ড, ৬৫ পৃঃ)

এসব প্রাচীর সবগুলোই উত্তরদিকে অবস্থিত এবং প্রায় একই উদ্দেশ্যে নিমিত্ত হয়েছে। তাই এগুলোর মধ্যে মূলকারনাইনের প্রাচীর কোনটি, তা নির্ণয় করা কঠিন। শেষোক্ত দুটি প্রাচীরের ব্যাপারেই অধিক মন্তব্যতা দেখা দিয়েছে। কেননা, উত্তরস্থানের নাম দরবন্দ এবং উত্তরস্থলে প্রাচীরও বিদ্যমান রয়েছে। উল্লিখিত চারটি প্রাচীরের মধ্যে সবচাইতে বড় ও সবচাইতে প্রাচীন চীনের প্রাচীর মূলকারনাইনের প্রাচীর নয়, এ



বিষয়ে সবাই একমত। এটি উত্তরদিকে নয়—দূরপ্রাচ্যে অবস্থিত। কোরআন পাকের ইঙ্গিত দ্বারা বোঝা যায় যে, যুলকারনাইনের প্রাচীরটি উত্তর ভূখণ্ডে অবস্থিত।

এখন উত্তর ভূখণ্ডে অবস্থিত তিনটি প্রাচীর সম্পর্কিত পর্যালোচনা বাকী রয়ে গেল। তন্মধ্যে মাসউদী, ইসভাখরী, হমভী প্রমুখ ইতিহাসবিদ সাধারণভাবে সে প্রাচীরকে যুলকারনাইনের প্রাচীর বলেন, যা দাগিস্তান অথবা ককেশিয়ার এলাকা বাবুল-আবওয়ালের দরবন্দ নামক স্থানে কাস্পিয়ানের তীরে অবস্থিত। বুখারা ও তিরমিযির দরবন্দে অবস্থিত প্রাচীরকে যারা যুলকারনাইনের প্রাচীর বলেছেন, তারা সম্ভবত দরবন্দ নাম দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। এখন যুলকারনাইনের প্রাচীরের অবস্থানকাল প্রায় নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। অর্থাৎ দু'টি প্রাচীরের মধ্যে ব্যাপার সীমিত হয়ে গেছে। এক দাগিস্তান ককেশিয়ার এলাকা বাবুল-আবওয়ালের দরবন্দের প্রাচীর এবং দুই, আনুও উদে কাকফায় অথবা কাক অথবা ককেশাস পর্বতমালায় অবস্থিত প্রাচীর; উভয় স্থানে প্রাচীরের অস্তিত্ব ইতিহাসবিদদের কাছে প্রমাণিত রয়েছে।

হযরত মওলানা আনওয়ার শাহ্ কাস্মীরী (রহ) 'আকীদাতুল ইসলাম' গ্রন্থে উভয় প্রাচীরের মধ্য থেকে ককেশাস পর্বতমালায় অবস্থিত প্রাচীরকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন যে, এটিই যুলকারনাইন নির্মিত প্রাচীর।

যুলকারনাইনের প্রাচীর এখনও বিদ্যমান রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে, না ভেঙ্গে গেছে; ইউরোপীয় ইতিহাস ও ভূগোল বিশেষজ্ঞরা আজকাল উপরোক্ত প্রাচীর-সমূহের কোনটির অস্তিত্বই স্বীকার করেন না। তারা এ কথাও স্বীকার করেন না যে, ইয়াজুজ-মাজুজের পথ অদ্যাবদি বন্ধ রয়েছে। এরই ভিত্তিতে কোন কোন মুসলমান ইতিহাসবিদও এ কথা বলতে লিখতে শুরু করেছেন যে, কোরআন ও হাদীসে বর্ণিত ইয়াজুজ-মাজুজ বহু পূর্বেই বের হয়ে গেছে। কেউ কেউ হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দীতে খাটিকার বেগে উদ্ভিত ভাতারীদেরকেই এর নিদর্শন সাব্যস্ত করেছেন। কেউ কেউ বর্তমান যুগের পরাশক্তি রাশিয়া চীন, ও ইউরোপীয়দেরকে ইয়াজুজ-মাজুজ বলে দিয়ে ব্যাপারটি সাস করে দিয়েছেন। কিন্তু উপরে রূহুল মা'আনীর বরাতে দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। সহীহ হাদীসসমূহ অস্বীকার করা ছাড়া কেউ একথা বলতে পারে না। কোরআন পাক ইয়াজুজ-মাজুজের অভ্যুত্থানকে কিয়ামতের আগামত হিসেবে বর্ণনা করেছে। নাওয়ারম ইবনে সামআন প্রমুখ বর্ণিত সহীহ মুসলিমের হাদীসে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, ইয়াজুজ-মাজুজের ঘটনাটি ঘটবে দাঙ্কালের আবির্ভাব এবং ঈসা (আ)-র অবতরণ ও দাঙ্কাল হত্যার পরে। দাঙ্কালের আবির্ভাব এবং ঈসা (আ)-র অবতরণ যে আজও পর্যন্ত হয়নি, তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

তবে যুলকারনাইনের প্রাচীর বর্তমানে ভেঙ্গে গেছে এবং ইয়াজুজ-মাজুজের কোন কোন গোত্র এপারে চলে এসেছে—একথা বলাও কোরআন ও হাদীসের কোন সুস্পষ্ট বর্ণনার পরিপন্থী নয়—যদি মেনে নেয়া হয় যে, তাদের সমগ্র পৃথিবীকে ধ্বংসস্থাপে পরিণত-

কারী সর্বশেষ ও সর্বধ্বংসী হামলা এখনও হয়নি; বরং তা উপরে বর্ণিত দাজ্জালের আবির্ভাব এবং সীসা (আ)-র অবতরণের পরে হবে।

এ ব্যাপারে হয়রত উস্তাদ আদ্বামা কাম্মীরী (রহ)-এর সূচিস্থিত বক্তব্য এই : ইউরোপীয়দের এ বক্তব্যের কোন গুরুত্ব নেই যে, তারা সমগ্র ভূপৃষ্ঠ তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখেছে যে, কোথাও এই প্রাচীরের অস্তিত্ব নেই। কেননা, স্বয়ং তাদেরই এ ধরনের বর্ণনা বিদ্যমান রয়েছে যে, পর্যটন ও অন্বেষণের উচ্চতম শিখরে পৌঁছা সত্ত্বেও অনেক অরণ্য, সমুদ্র ও দ্বীপ সম্পর্কে তারা অদ্যাবধি জ্ঞানলাভ করতে পারেনি। এ ছাড়া একরূপ সম্ভাবনাও দূরবর্তী নয় যে, কথিত প্রাচীরটি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও পাহাড়সমূহের পতন ও পারস্পরিক সংযুক্তির কারণে তা একটি পাহাড়ের আকার ধারণ করে ফেলেছে; কিয়ামতের পূর্বে প্রাচীরটি ভেঙ্গে যাবে অথবা দূরবর্তী পথ ধরে ইয়াজ্জ-মাজ্জের কিছু গোল এপারে এসে যাবে—কোরআন ও হাদীসের কোন অকাটা প্রমাণ এ বিষয়েরও পরিপন্থী নয়। যুলকারনাইনের প্রাচীর কিয়ামত পর্যন্ত অক্ষয় থাকবে—এর পক্ষে বড় প্রমাণ হচ্ছে কোরআনে

পাকের আয়াত <sup>٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠ ١٠١ ١٠٢ ١٠٣ ١٠٤ ١٠٥ ١٠٦ ١٠٧ ١٠٨ ١٠٩ ١١٠ ١١١ ١١٢ ١١٣ ١١٤ ١١٥ ١١٦ ١١٧ ١١٨ ١١٩ ١٢٠ ١٢١ ١٢٢ ١٢٣ ١٢٤ ١٢٥ ١٢٦ ١٢٧ ١٢٨ ١٢٩ ١٣٠ ١٣١ ١٣٢ ١٣٣ ١٣٤ ١٣٥ ١٣٦ ١٣٧ ١٣٨ ١٣٩ ١٤٠ ١٤١ ١٤٢ ١٤٣ ١٤٤ ١٤٥ ١٤٦ ١٤٧ ١٤٨ ١٤٩ ١٥٠ ١٥١ ١٥٢ ١٥٣ ١٥٤ ١٥٥ ١٥٦ ١٥٧ ١٥٨ ١٥٩ ١٦٠ ١٦١ ١٦٢ ١٦٣ ١٦٤ ١٦٥ ١٦٦ ١٦٧ ١٦٨ ١٦٩ ١٧٠ ١٧١ ١٧٢ ١٧٣ ١٧٤ ١٧٥ ١٧٦ ١٧٧ ١٧٨ ١٧٩ ١٨٠ ١٨١ ١٨٢ ١٨٣ ١٨٤ ١٨٥ ١٨٦ ١٨٧ ١٨٨ ١٨٩ ١٩٠ ١٩١ ١٩٢ ١٩٣ ١٩٤ ١٩٥ ١٩٦ ١٩٧ ١٩٨ ١٩٩ ٢٠٠ ٢٠١ ٢٠٢ ٢٠٣ ٢٠٤ ٢٠٥ ٢٠٦ ٢٠٧ ٢٠٨ ٢٠٩ ٢١٠ ٢١١ ٢١٢ ٢١٣ ٢١٤ ٢١٥ ٢١٦ ٢١٧ ٢١٨ ٢١٩ ٢٢٠ ٢٢١ ٢٢٢ ٢٢٣ ٢٢٤ ٢٢٥ ٢٢٦ ٢٢٧ ٢٢٨ ٢٢٩ ٢٣٠ ٢٣١ ٢٣٢ ٢٣٣ ٢٣٤ ٢٣٥ ٢٣٦ ٢٣٧ ٢٣٨ ٢٣٩ ٢٤٠ ٢٤١ ٢٤٢ ٢٤٣ ٢٤٤ ٢٤٥ ٢٤٦ ٢٤٧ ٢٤٨ ٢٤٩ ٢٥٠ ٢٥١ ٢٥٢ ٢٥٣ ٢٥٤ ٢٥٥ ٢٥٦ ٢٥٧ ٢٥٨ ٢٥٩ ٢٦٠ ٢٦١ ٢٦٢ ٢٦٣ ٢٦٤ ٢٦٥ ٢٦٦ ٢٦٧ ٢٦٨ ٢٦٩ ٢٧٠ ٢٧١ ٢٧٢ ٢٧٣ ٢٧٤ ٢٧٥ ٢٧٦ ٢٧٧ ٢٧٨ ٢٧٩ ٢٨٠ ٢٨١ ٢٨٢ ٢٨٣ ٢٨٤ ٢٨٥ ٢٨٦ ٢٨٧ ٢٨٨ ٢٨٩ ٢٩٠ ٢٩١ ٢٩٢ ٢٩٣ ٢٩٤ ٢٩٥ ٢٩٦ ٢٩٧ ٢٩٨ ٢٩٩ ٣٠٠ ٣٠١ ٣٠٢ ٣٠٣ ٣٠٤ ٣٠٥ ٣٠٦ ٣٠٧ ٣٠٨ ٣٠٩ ٣١٠ ٣١١ ٣١٢ ٣١٣ ٣١٤ ٣١٥ ٣١٦ ٣١٧ ٣١٨ ٣١٩ ٣٢٠ ٣٢١ ٣٢٢ ٣٢٣ ٣٢٤ ٣٢٥ ٣٢٦ ٣٢٧ ٣٢٨ ٣٢٩ ٣٣٠ ٣٣١ ٣٣٢ ٣٣٣ ٣٣٤ ٣٣٥ ٣٣٦ ٣٣٧ ٣٣٨ ٣٣٩ ٣٤٠ ٣٤١ ٣٤٢ ٣٤٣ ٣٤٤ ٣٤٥ ٣٤٦ ٣٤٧ ٣٤٨ ٣٤٩ ٣٥٠ ٣٥١ ٣٥٢ ٣٥٣ ٣٥٤ ٣٥٥ ٣٥٦ ٣٥٧ ٣٥٨ ٣٥٩ ٣٦٠ ٣٦١ ٣٦٢ ٣٦٣ ٣٦٤ ٣٦٥ ٣٦٦ ٣٦٧ ٣٦٨ ٣٦٩ ٣٧٠ ٣٧١ ٣٧٢ ٣٧٣ ٣٧٤ ٣٧٥ ٣٧٦ ٣٧٧ ٣٧٨ ٣٧٩ ٣٨٠ ٣٨١ ٣٨٢ ٣٨٣ ٣٨٤ ٣٨٥ ٣٨٦ ٣٨٧ ٣٨٨ ٣٨٩ ٣٩٠ ٣٩١ ٣٩٢ ٣٩٣ ٣٩٤ ٣٩٥ ٣٩٦ ٣٩٧ ٣٩٨ ٣٩٩ ٤٠٠ ٤٠١ ٤٠٢ ٤٠٣ ٤٠٤ ٤٠٥ ٤٠٦ ٤٠٧ ٤٠٨ ٤٠٩ ٤١٠ ٤١١ ٤١٢ ٤١٣ ٤١٤ ٤١٥ ٤١٦ ٤١٧ ٤١٨ ٤١٩ ٤٢٠ ٤٢١ ٤٢٢ ٤٢٣ ٤٢٤ ٤٢٥ ٤٢٦ ٤٢٧ ٤٢٨ ٤٢٩ ٤٣٠ ٤٣١ ٤٣٢ ٤٣٣ ٤٣٤ ٤٣٥ ٤٣٦ ٤٣٧ ٤٣٨ ٤٣٩ ٤٤٠ ٤٤١ ٤٤٢ ٤٤٣ ٤٤٤ ٤٤٥ ٤٤٦ ٤٤٧ ٤٤٨ ٤٤٩ ٤٥٠ ٤٥١ ٤٥٢ ٤٥٣ ٤٥٤ ٤٥٥ ٤٥٦ ٤٥٧ ٤٥٨ ٤٥٩ ٤٦٠ ٤٦١ ٤٦٢ ٤٦٣ ٤٦٤ ٤٦٥ ٤٦٦ ٤٦٧ ٤٦٨ ٤٦٩ ٤٧٠ ٤٧١ ٤٧٢ ٤٧٣ ٤٧٤ ٤٧٥ ٤٧٦ ٤٧٧ ٤٧٨ ٤٧٩ ٤٨٠ ٤٨١ ٤٨٢ ٤٨٣ ٤٨٤ ٤٨٥ ٤٨٦ ٤٨٧ ٤٨٨ ٤٨٩ ٤٩٠ ٤٩١ ٤٩٢ ٤٩٣ ٤٩٤ ٤٩٥ ٤٩٦ ٤٩٧ ٤٩٨ ٤٩٩ ٥٠٠ ٥٠١ ٥٠٢ ٥٠٣ ٥٠٤ ٥٠٥ ٥٠٦ ٥٠٧ ٥٠٨ ٥٠٩ ٥١٠ ٥١١ ٥١٢ ٥١٣ ٥١٤ ٥١٥ ٥١٦ ٥١٧ ٥١٨ ٥١٩ ٥٢٠ ٥٢١ ٥٢٢ ٥٢٣ ٥٢٤ ٥٢٥ ٥٢٦ ٥٢٧ ٥٢٨ ٥٢٩ ٥٣٠ ٥٣١ ٥٣٢ ٥٣٣ ٥٣٤ ٥٣٥ ٥٣٦ ٥٣٧ ٥٣٨ ٥٣٩ ٥٤٠ ٥٤١ ٥٤٢ ٥٤٣ ٥٤٤ ٥٤٥ ٥٤٦ ٥٤٧ ٥٤٨ ٥٤٩ ٥٥٠ ٥٥١ ٥٥٢ ٥٥٣ ٥٥٤ ٥٥٥ ٥٥٦ ٥٥٧ ٥٥٨ ٥٥٩ ٥٦٠ ٥٦١ ٥٦٢ ٥٦٣ ٥٦٤ ٥٦٥ ٥٦٦ ٥٦٧ ٥٦٨ ٥٦٩ ٥٧٠ ٥٧١ ٥٧٢ ٥٧٣ ٥٧٤ ٥٧٥ ٥٧٦ ٥٧٧ ٥٧٨ ٥٧٩ ٥٨٠ ٥٨١ ٥٨٢ ٥٨٣ ٥٨٤ ٥٨٥ ٥٨٦ ٥٨٧ ٥٨٨ ٥٨٩ ٥٩٠ ٥٩١ ٥٩٢ ٥٩٣ ٥٩٤ ٥٩٥ ٥٩٦ ٥٩٧ ٥٩٨ ٥٩٩ ٦٠٠ ٦٠١ ٦٠٢ ٦٠٣ ٦٠٤ ٦٠٥ ٦٠٦ ٦٠٧ ٦٠٨ ٦٠٩ ٦١٠ ٦١١ ٦١٢ ٦١٣ ٦١٤ ٦١٥ ٦١٦ ٦١٧ ٦١٨ ٦١٩ ٦٢٠ ٦٢١ ٦٢٢ ٦٢٣ ٦٢٤ ٦٢٥ ٦٢٦ ٦٢٧ ٦٢٨ ٦٢٩ ٦٣٠ ٦٣١ ٦٣٢ ٦٣٣ ٦٣٤ ٦٣٥ ٦٣٦ ٦٣٧ ٦٣٨ ٦٣٩ ٦٤٠ ٦٤١ ٦٤٢ ٦٤٣ ٦٤٤ ٦٤٥ ٦٤٦ ٦٤٧ ٦٤٨ ٦٤٩ ٦٥٠ ٦٥١ ٦٥٢ ٦٥٣ ٦٥٤ ٦٥٥ ٦٥٦ ٦٥٧ ٦٥٨ ٦٥٩ ٦٦٠ ٦٦١ ٦٦٢ ٦٦٣ ٦٦٤ ٦٦٥ ٦٦٦ ٦٦٧ ٦٦٨ ٦٦٩ ٦٧٠ ٦٧١ ٦٧٢ ٦٧٣ ٦٧٤ ٦٧٥ ٦٧٦ ٦٧٧ ٦٧٨ ٦٧٩ ٦٨٠ ٦٨١ ٦٨٢ ٦٨٣ ٦٨٤ ٦٨٥ ٦٨٦ ٦٨٧ ٦٨٨ ٦٨٩ ٦٩٠ ٦٩١ ٦٩٢ ٦٩٣ ٦٩٤ ٦٩٥ ٦٩٦ ٦٩٧ ٦٩٨ ٦٩٩ ٧٠٠ ٧٠١ ٧٠٢ ٧٠٣ ٧٠٤ ٧٠٥ ٧٠٦ ٧٠٧ ٧٠٨ ٧٠٩ ٧١٠ ٧١١ ٧١٢ ٧١٣ ٧١٤ ٧١٥ ٧١٦ ٧١٧ ٧١٨ ٧١٩ ٧٢٠ ٧٢١ ٧٢٢ ٧٢٣ ٧٢٤ ٧٢٥ ٧٢٦ ٧٢٧ ٧٢٨ ٧٢٩ ٧٣٠ ٧٣١ ٧٣٢ ٧٣٣ ٧٣٤ ٧٣٥ ٧٣٦ ٧٣٧ ٧٣٨ ٧٣٩ ٧٤٠ ٧٤١ ٧٤٢ ٧٤٣ ٧٤٤ ٧٤٥ ٧٤٦ ٧٤٧ ٧٤٨ ٧٤٩ ٧٥٠ ٧٥١ ٧٥٢ ٧٥٣ ٧٥٤ ٧٥٥ ٧٥٦ ٧٥٧ ٧٥٨ ٧٥٩ ٧٦٠ ٧٦١ ٧٦٢ ٧٦٣ ٧٦٤ ٧٦٥ ٧٦٦ ٧٦٧ ٧٦٨ ٧٦٩ ٧٧٠ ٧٧١ ٧٧٢ ٧٧٣ ٧٧٤ ٧٧٥ ٧٧٦ ٧٧٧ ٧٧٨ ٧٧٩ ٧٨٠ ٧٨١ ٧٨٢ ٧٨٣ ٧٨٤ ٧٨٥ ٧٨٦ ٧٨٧ ٧٨٨ ٧٨٩ ٧٩٠ ٧٩١ ٧٩٢ ٧٩٣ ٧٩٤ ٧٩٥ ٧٩٦ ٧٩٧ ٧٩٨ ٧٩٩ ٨٠٠ ٨٠١ ٨٠٢ ٨٠٣ ٨٠٤ ٨٠٥ ٨٠٦ ٨٠٧ ٨٠٨ ٨٠٩ ٨١٠ ٨١١ ٨١٢ ٨١٣ ٨١٤ ٨١٥ ٨١٦ ٨١٧ ٨١٨ ٨١٩ ٨٢٠ ٨٢١ ٨٢٢ ٨٢٣ ٨٢٤ ٨٢٥ ٨٢٦ ٨٢٧ ٨٢٨ ٨٢٩ ٨٣٠ ٨٣١ ٨٣٢ ٨٣٣ ٨٣٤ ٨٣٥ ٨٣٦ ٨٣٧ ٨٣٨ ٨٣٩ ٨٤٠ ٨٤١ ٨٤٢ ٨٤٣ ٨٤٤ ٨٤٥ ٨٤٦ ٨٤٧ ٨٤٨ ٨٤٩ ٨٥٠ ٨٥١ ٨٥٢ ٨٥٣ ٨٥٤ ٨٥٥ ٨٥٦ ٨٥٧ ٨٥٨ ٨٥٩ ٨٦٠ ٨٦١ ٨٦٢ ٨٦٣ ٨٦٤ ٨٦٥ ٨٦٦ ٨٦٧ ٨٦٨ ٨٦٩ ٨٧٠ ٨٧١ ٨٧٢ ٨٧٣ ٨٧٤ ٨٧٥ ٨٧٦ ٨٧٧ ٨٧٨ ٨٧٩ ٨٨٠ ٨٨١ ٨٨٢ ٨٨٣ ٨٨٤ ٨٨٥ ٨٨٦ ٨٨٧ ٨٨٨ ٨٨٩ ٨٩٠ ٨٩١ ٨٩٢ ٨٩٣ ٨٩٤ ٨٩٥ ٨٩٦ ٨٩٧ ٨٩٨ ٨٩٩ ٩٠٠ ٩٠١ ٩٠٢ ٩٠٣ ٩٠٤ ٩٠٥ ٩٠٦ ٩٠٧ ٩٠٨ ٩٠٩ ٩١٠ ٩١١ ٩١٢ ٩١٣ ٩١٤ ٩١٥ ٩١٦ ٩١٧ ٩١٨ ٩١٩ ٩٢٠ ٩٢١ ٩٢٢ ٩٢٣ ٩٢٤ ٩٢٥ ٩٢٦ ٩٢٧ ٩٢٨ ٩٢٩ ٩٣٠ ٩٣١ ٩٣٢ ٩٣٣ ٩٣٤ ٩٣٥ ٩٣٦ ٩٣٧ ٩٣٨ ٩٣٩ ٩٤٠ ٩٤١ ٩٤٢ ٩٤٣ ٩٤٤ ٩٤٥ ٩٤٦ ٩٤٧ ٩٤٨ ٩٤٩ ٩٥٠ ٩٥١ ٩٥٢ ٩٥٣ ٩٥٤ ٩٥٥ ٩٥٦ ٩٥٧ ٩٥٨ ٩٥٩ ٩٦٠ ٩٦١ ٩٦٢ ٩٦٣ ٩٦٤ ٩٦٥ ٩٦٦ ٩٦٧ ٩٦٨ ٩٦٩ ٩٧٠ ٩٧١ ٩٧٢ ٩٧٣ ٩٧٤ ٩٧٥ ٩٧٦ ٩٧٧ ٩٧٨ ٩٧٩ ٩٨٠ ٩٨١ ٩٨٢ ٩٨٣ ٩٨٤ ٩٨٥ ٩٨٦ ٩٨٧ ٩٨٨ ٩٨٩ ٩٩٠ ٩٩١ ٩٩٢ ٩٩٣ ٩٩٤ ٩٩٥ ٩٩٦ ٩٩٧ ٩٩٨ ٩٩٩ ١٠٠٠ ١٠٠١ ١٠٠٢ ١٠٠٣ ١٠٠٤ ١٠٠٥ ١٠٠٦ ١٠٠٧ ١٠٠٨ ١٠٠٩ ١٠١٠ ١٠١١ ١٠١٢ ١٠١٣ ١٠١٤ ١٠١٥ ١٠١٦ ١٠١٧ ١٠١٨ ١٠١٩ ١٠٢٠ ١٠٢١ ١٠٢٢ ١٠٢٣ ١٠٢٤ ١٠٢٥ ١٠٢٦ ١٠٢٧ ١٠٢٨ ١٠٢٩ ١٠٣٠ ١٠٣١ ١٠٣٢ ١٠٣٣ ١٠٣٤ ١٠٣٥ ١٠٣٦ ١٠٣٧ ١٠٣٨ ١٠٣٩ ١٠٤٠ ١٠٤١ ١٠٤٢ ١٠٤٣ ١٠٤٤ ١٠٤٥ ١٠٤٦ ١٠٤٧ ١٠٤٨ ١٠٤٩ ١٠٥٠ ١٠٥١ ١٠٥٢ ١٠٥٣ ١٠٥٤ ١٠٥٥ ١٠٥٦ ١٠٥٧ ١٠٥٨ ١٠٥٩ ١٠٦٠ ١٠٦١ ١٠٦٢ ١٠٦٣ ١٠٦٤ ١٠٦٥ ١٠٦٦ ١٠٦٧ ١٠٦٨ ١٠٦٩ ١٠٧٠ ١٠٧١ ١٠٧٢ ١٠٧٣ ١٠٧٤ ١٠٧٥ ١٠٧٦ ١٠٧٧ ١٠٧٨ ١٠٧٩ ١٠٨٠ ١٠٨١ ١٠٨٢ ١٠٨٣ ١٠٨٤ ١٠٨٥ ١٠٨٦ ١٠٨٧ ١٠٨٨ ١٠٨٩ ١٠٩٠ ١٠٩١ ١٠٩٢ ١٠٩٣ ١٠٩٤ ١٠٩٥ ١٠٩٦ ١٠٩٧ ١٠٩٨ ١٠٩٩ ١١٠٠ ١١٠١ ١١٠٢ ١١٠٣ ١١٠٤ ١١٠٥ ١١٠٦ ١١٠٧ ١١٠٨ ١١٠٩ ١١١٠ ١١١١ ١١١٢ ١١١٣ ١١١٤ ١١١٥ ١١١٦ ١١١٧ ١١١٨ ١١١٩ ١١٢٠ ١١٢١ ١١٢٢ ١١٢٣ ١١٢٤ ١١٢٥ ١١٢٦ ١١٢٧ ١١٢٨ ١١٢٩ ١١٣٠ ١١٣١ ١١٣٢ ١١٣٣ ١١٣٤ ١١٣٥ ١١٣٦ ١١٣٧ ١١٣٨ ١١٣٩ ١١٤٠ ١١٤١ ١١٤٢ ١١٤٣ ١١٤٤ ١١٤٥ ١١٤٦ ١١٤٧ ١١٤٨ ١١٤٩ ١١٥٠ ١١٥١ ١١٥٢ ١١٥٣ ١١٥٤ ١١٥٥ ١١٥٦ ١١٥٧ ١١٥٨ ١١٥٩ ١١٦٠ ١١٦١ ١١٦٢ ١١٦٣ ١١٦٤ ١١٦٥ ١١٦٦ ١١٦٧ ١١٦٨ ١١٦٩ ١١٧٠ ١١٧١ ١١٧٢ ١١٧٣ ١١٧٤ ١١٧٥ ١١٧٦ ١١٧٧ ١١٧٨ ١١٧٩ ١١٨٠ ١١٨١ ١١٨٢ ١١٨٣ ١١٨٤ ١١٨٥ ١١٨٦ ١١٨٧ ١١٨٨ ١١٨٩ ١١٩٠ ١١٩١ ١١٩٢ ١١٩٣ ١١٩٤ ١١٩٥ ١١٩٦ ١١٩٧ ١١٩٨ ١١٩٩ ١٢٠٠ ١٢٠١ ١٢٠٢ ١٢٠٣ ١٢٠٤ ١٢٠٥ ١٢٠٦ ١٢٠٧ ١٢٠٨ ١٢٠٩ ١٢١٠ ١٢١١ ١٢١٢ ١٢١٣ ١٢١٤ ١٢١٥ ١٢١٦ ١٢١٧ ١٢١٨ ١٢١٩ ١٢٢٠ ١٢٢١ ١٢٢٢ ١٢٢٣ ١٢٢٤ ١٢٢٥ ١٢٢٦ ١٢٢٧ ١٢٢٨ ١٢٢٩ ١٢٣٠ ١٢٣١ ١٢٣٢ ١٢٣٣ ١٢٣٤ ١٢٣٥ ١٢٣٦ ١٢٣٧ ١٢٣٨ ١٢٣٩ ١٢٤٠ ١٢٤١ ١٢٤٢ ١٢٤٣ ١٢٤٤ ١٢٤٥ ١٢٤٦ ١٢٤٧ ١٢٤٨ ١٢٤٩ ١٢٥٠ ١٢٥١ ١٢٥٢ ١٢٥٣ ١٢٥٤ ١٢٥٥ ١٢٥٦ ١٢٥٧ ١٢٥٨ ١٢٥٩ ١٢٦٠ ١٢٦١ ١٢٦٢ ١٢٦٣ ١٢٦٤ ١٢٦٥ ١٢٦٦ ١٢٦٧ ١٢٦٨ ١٢٦٩ ١٢٧٠ ١٢٧١ ١٢٧٢ ١٢٧٣ ١٢٧٤ ١٢٧٥ ١٢٧٦ ١٢٧٧ ١٢٧٨ ١٢٧٩ ١٢٨٠ ١٢٨١ ١٢٨٢ ١٢٨٣ ١٢٨٤ ١٢٨٥ ١٢٨٦ ١٢٨٧ ١٢٨٨ ١٢٨٩ ١٢٩٠ ١٢٩١ ١٢٩٢ ١٢٩٣ ١٢٩٤ ١٢٩٥ ١٢٩٦ ١٢٩٧ ١٢٩٨ ١٢٩٩ ١٣٠٠ ١٣٠١ ١٣٠٢ ١٣٠٣ ١٣٠٤ ١٣٠٥ ١٣٠٦ ١٣٠٧ ١٣٠٨ ١٣٠٩ ١٣١٠ ١٣١١ ١٣١٢ ١٣١٣ ١٣١٤ ١٣١٥ ١٣١٦ ١٣١٧ ١٣١٨ ١٣١٩ ١٣٢٠ ١٣٢١ ١٣٢٢ ١٣٢٣ ١٣٢٤ ١٣٢٥ ١٣٢٦ ١٣٢٧ ١٣٢٨ ١٣٢٩ ١٣٣٠ ١٣٣١ ١٣٣٢ ١٣٣٣ ١٣٣٤ ١٣٣٥ ١٣٣٦ ١٣٣٧ ١٣٣٨ ١٣٣٩ ١٣٤٠ ١٣٤١ ١٣٤٢ ١٣٤٣ ١٣٤٤ ١٣٤٥ ١٣٤٦ ١٣٤٧ ١٣٤٨ ١٣٤٩ ١٣٥٠ ١٣٥١ ١٣٥٢ ١٣٥٣ ١٣٥٤ ١٣٥٥ ١٣٥٦ ١٣٥٧ ١٣٥٨ ١٣٥٩ ١٣٦٠ ١٣٦١ ١٣٦٢ ١٣٦٣ ١٣٦٤ ١٣٦٥ ١٣٦٦ ١٣٦٧ ١٣٦٨ ١٣٦٩ ١٣٧٠ ١٣٧١ ١٣٧٢ ١٣٧٣ ١٣٧٤ ١٣٧٥ ١٣٧٦ ١٣٧٧ ١٣٧٨ ١٣٧٩ ١٣٨٠ ١٣٨١ ١٣٨٢ ١٣٨٣ ١٣٨٤ ١٣٨٥ ١٣٨٦ ١٣٨٧ ١٣٨٨ ١٣٨٩ ١٣٩٠ ١٣٩١ ١٣٩٢ ١٣٩٣ ١٣٩٤ ١٣٩٥ ١٣٩٦ ١٣٩٧ ١٣٩٨ ١٣٩٩ ١٤٠٠ ١٤٠١ ١٤٠٢ ١٤٠٣ ١٤٠٤ ١٤٠٥ ١٤٠٦ ١٤٠٧ ١٤٠٨ ١٤٠٩ ١٤١٠ ١٤١١ ١٤١٢ ١٤١٣ ١٤١٤ ١٤١٥ ١٤١٦ ١٤١٧ ١٤١٨ ١٤١٩ ١٤٢٠ ١٤٢١ ١٤٢٢ ١٤٢٣ ١٤٢٤ ١٤٢٥ ١٤٢٦ ١٤٢٧ ١٤٢٨ ١٤٢٩ ١٤٣٠ ١٤٣١ ١٤٣٢ ١٤٣٣ ١٤٣٤ ١٤٣٥ ١٤٣٦ ١٤٣٧ ١٤٣٨ ١٤٣٩ ١٤٤٠ ١٤٤١ ١٤٤٢ ١٤٤٣ ١٤٤٤ ١٤٤٥ ١٤٤٦ ١٤٤٧ ١٤٤٨ ١٤٤٩ ١٤٥٠ ١٤٥١ ١٤٥٢ ١٤٥٣ ١٤٥٤ ١٤٥٥ ١٤٥٦ ١٤٥٧ ١٤٥٨ ١٤٥٩ ١٤٦٠ ١٤٦١ ١٤٦٢ ١٤٦٣ ١٤٦٤ ١٤٦٥ ١٤٦٦ ١٤٦٧ ١٤٦٨ ١٤٦٩ ١٤٧٠ ١٤٧١ ١٤٧٢ ١٤٧٣ ١٤٧٤ ١٤٧٥ ١٤٧٦ ١٤٧٧ ١٤٧٨ ١٤٧٩ ١٤٨٠ ١٤٨١ ١٤٨٢ ١٤٨٣ ١٤٨٤ ١٤٨٥ ١٤٨٦ ١٤٨٧ ١٤٨٨ ١٤٨٩ ١٤٩٠ ١٤٩١ ١٤٩٢ ١٤٩٣ ١٤٩٤ ١٤٩٥ ١٤٩٦ ١٤٩٧ ١٤٩٨ ١٤٩٩ ١٥٠٠ ١٥٠١ ١٥٠٢ ١٥٠٣ ١٥٠٤ ١٥٠٥ ١٥٠٦ ١٥٠٧ ١٥٠٨ ١٥٠٩ ١٥١٠ ١٥١١ ١٥١٢ ١٥١٣ ١٥١٤ ١٥١٥ ١٥١٦ ١٥١٧ ١٥١٨ ١٥١٩ ١٥٢٠ ١٥٢١ ١٥٢٢ ١٥٢٣ ١٥٢٤ ١٥٢٥ ١٥٢٦ ١٥٢٧ ١٥٢٨ ١٥٢٩ ١٥٣٠ ١٥٣١ ١٥٣٢ ١٥٣٣ ١٥٣٤ ١٥٣٥ ١٥٣٦ ١٥٣٧ ١٥٣٨ ١٥٣٩ ١٥٤٠ ١٥٤١ ١٥٤٢ ١٥٤٣ ١٥٤٤ ١٥٤٥ ١٥٤٦ ١٥٤٧ ١٥٤٨ ١٥٤٩ ١٥٥٠ ١٥٥١ ١٥٥٢ ١٥٥٣ ١٥٥٤ ١٥٥٥ ١٥٥٦ ١٥٥٧ ١٥٥٨ ١٥٥٩ ١٥٦٠ ١٥٦١ ١٥٦٢ ١٥٦٣ ١٥٦٤ ١٥٦٥ ١٥٦٦ ١٥٦٧ ١٥٦٨ ١٥٦٩ ١٥٧٠ ١٥٧١ ١٥٧٢ ١٥٧٣ ١٥٧٤ ١٥٧٥ ١٥٧٦ ١٥٧٧ ١٥٧٨ ١٥٧٩ ١٥٨٠ ١٥٨١ ١٥٨٢ ١٥٨٣ ١٥٨٤ ١٥٨٥ ١٥٨٦ ١٥٨٧ ١٥٨٨ ١٥٨٩ ١٥٩٠ ١٥٩١ ١٥٩٢ ١٥٩٣ ١٥٩٤ ١٥٩٥ ١٥٩٦</sup>

ও কানুনের পন্থায় হচ্ছে। কোরআন ও হাদীসে বর্ণিত সেই কিতনা এমন অকল্পিত হত্যাযজ্ঞ, লুটতরাজ রক্তপাতের মাধ্যমে হবে, যা পৃথিবীর গোটা জনমণ্ডলীকেই ধ্বংস ও বরবাদ করে দেবে। বরং এর সারমর্ম আবার এই দাঁড়ায় যে, দুকৃতকারী ইয়াজ্জ-মাজ্জেরই কিছু গোত্র এপারে এসে সভ্য হয়ে গেছে। তারাই ইসলামী দেশসমূহের জন্য নিঃসন্দেহে বিরাট ফিতনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু ইয়াজ্জ-মাজ্জের সেসব বর্বর গোত্র হত্যা ও রক্তপাত ছাড়া কিছুই জানে না, তারা এখন পর্যন্ত আজ্জাহর বাণীর তফসীর অনুযায়ী এপারে আসেনি। সংখ্যার দিক দিয়ে তারাই হবে বেশি। তাদের আবির্ভাব কিয়ামতের কাছাকাছি সময়ে হবে।

দ্বিতীয় প্রমাণ হচ্ছে তিরমিযী ও মসনদ আহমদের একটি হাদীস। তাতে উল্লিখিত রয়েছে যে, ইয়াজ্জ-মাজ্জ প্রত্যহই প্রাচীরটি খনন করে। প্রথমত এই হাদীসটি ইবনে কাসীরের মতে معلول - দ্বিতীয়ত এতেও এ বিষয়ের বর্ণনা নেই যে, ইয়াজ্জ-মাজ্জ যে দিন 'ইনশাআল্লাহ' বঙ্গার বরকতে প্রাচীরটি অতিক্রম করবে, সেদিনটি কিয়ামতের কাছাকাছিই হবে। এই হাদীসে এ বিষয়েরও কোন প্রমাণ নেই যে, ইয়াজ্জ-মাজ্জের গোটা জাতি এই প্রাচীরের পাশচাত্তে আবদ্ধ থাকবে। কাজেই তাদের কিছু দল অথবা গোত্র হয়তো দুর্দুরান্তের পথ অতিক্রম করে এপারে এসে গেছে। আজকালকার শক্তিশালী সামুদ্রিক জাহাজের মাধ্যমে এরূপ হওয়া অসম্ভব নয়। কোন কোন ইতিহাসবিদ এ কথাও লিপিবদ্ধ করেছেন যে, ইয়াজ্জ-মাজ্জ দীর্ঘ সামুদ্রিক সফরের মাধ্যমে এপারে আসার পথ পেয়ে গেছে। উপরোক্ত হাদীস এর পরিপন্থী নয়।

মোট কথা; কোরআন ও হাদীসে এরূপ কোন প্রকাশ্য ও অকাষ্ঠ প্রমাণ নেই যে, মূলকারণনাইনের প্রাচীর কিয়ামত পর্যন্ত অক্ষয় থাকবে অথবা কিয়ামতের পূর্বে এপারের মানুষের উপর তাদের প্রারম্ভিক ও মামুলী আক্রমণ হতে পারবে না। তবে তাদের চূড়ান্ত জয়বহ ও সর্বনাশা আক্রমণ কিয়ামতের পূর্বে সেই সময়েই হবে, যে সময়ের কথা ইতিপূর্বে ব্যঙ্গব্যঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে। সারকথা এই যে, কোরআন ও হাদীসের বর্ণনার ভিত্তিতে ইয়াজ্জ-মাজ্জের প্রাচীর ভেঙ্গে রাস্তা খুলে গেছে বলে যেমন অকাষ্ঠ কল্পসাপনা করা যায় না; তেমনি এ কথাও বলা যায় না যে, প্রাচীরটি কিয়ামত পর্যন্ত কায়েম থাকা জরুরী। উত্তরদিকেরই সম্ভাবনা রয়েছে। **والله اعلم بحقيقة الحال**

وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ  
فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا ۝ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا ۝ الَّذِينَ  
كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غَطَاٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ۝



يُحْسِنُونَ صُنْعًا ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا أَيُّهَا رَبِّمَّزَلْنَا ۝ فَلَا تَقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ۝ ذٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمَ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا اٰيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّٰتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ۝ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا لَا يَبْغُوْنَ عَنْهَا حَوْلًا ۝

(১০২) কাফিররা কি মনে করে যে, তারা আমার পরিবর্তে আমার বান্দাদেরকে অভিজ্ঞতাবক্রূপে গ্রহণ করবে? আমি কাফিরদের অভ্যর্থনার জন্য জাহান্নামকে প্রস্তুত করে রেখেছি। (১০৩) বলুন : আমি কি তোমাদেরকে সেসব লোকের সংবাদ দেব, যারা কর্মের দিক দিয়ে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত? (১০৪) তারাই সে লোক, যাদের প্রচেষ্টা পৃথিবীজীবনে বিফল হয়; অথচ তারা মনে করে যে, তারা সৎকর্ম করেছে। (১০৫) তারাই সে লোক, যারা তাদের পালনকর্তার নিদর্শনাবলী এবং তার সাথে সাক্ষাতের বিষয় অস্বীকার করে। ফলে তাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়। সুতরাং কিয়ামতের দিন তাদের জন্য আমি কোন গুরুত্ব স্থির করব না। (১০৬) জাহান্নাম—এটাই তাদের প্রতিফল; কারণ, তারা কাফির হয়েছে এবং আমার নিদর্শনাবলী ও রসূলগণকে বিপ্রণের বিষয়রূপে গ্রহণ করেছে। (১০৭) যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম সম্পাদন করে, তাদের অভ্যর্থনার জন্য আছে জান্নাতুল ফিরদাউস। (১০৮) সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, সেখানে থেকে স্থান পরিবর্তন করতে চাইবে না।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

এরপরও কি কাফিররা মনে করে যে, আমার পরিবর্তে আমার বান্দাদেরকে (অর্থাৎ যারা আমার মালিকানাধীন এবং আমারই আদেশের গোলাম, ইচ্ছাকৃতভাবেই অথবা অনিচ্ছাকৃতভাবে তাদেরকে) অভিজ্ঞতাবক্রূপে (অর্থাৎ উপাস্য ও অভাব পূরণকারী) রূপে গ্রহণ করবে? (এটা শিরক ও পরিষ্কার কুফর)। আমি কাফিরদের অভ্যর্থনার জন্য জাহান্নামকে প্রস্তুত করে রেখেছি। (ব্যস্মলে অভ্যর্থনা বলা হয়েছে। তারা যদি তাদের স্বকল্পিত সৎ কর্মের জন্য গর্ববোধ করে এবং এ কারণে নিজেদেরকে মুক্তিপ্রাপ্ত, আশাব থেকে মুক্তি মনে করে, তবে) আপনি (তাদেরকে) বলুন : আমি কি তোমাদেরকে এমন লোকদের সংবাদ দেব, যারা কর্মের দিক দিয়ে সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত? তারা সেসব লোক, পৃথিবীজীবনে যাদের কৃত পরিশ্রম (সৎ কর্ম সম্পাদন যা করেছিল) সবই বিফলে গেছে এবং তারা (মুর্খতাবশত) মনে করেছে যে, তারা ভাল কাজই করেছে। (অন্তঃপর

তাদের উদাহরণ এমনভাবে বর্ণনা করা হচ্ছে, যাতে তাদের পল্লিভ্রম বিফল হওয়ার কারণও জানা যায় এবং প্রসঙ্গক্রমে কর্ম বিফল হওয়ার বিষয়াদিরও বিশ্লেষণ হয়ে যায়। অর্থাৎ তারা সেসব লোক, যারা তাদের পালনকর্তার নিদর্শনাবলী এবং তাঁর সাথে সাক্ষাৎ (অর্থাৎ কিয়ামত) অস্বীকার করে। (তাই) তাদের সব (সৎ) কর্ম নিষ্ফল হয়ে গেছে। অতএব, কিয়ামতের দিন আমি তাদের (সৎকর্মের) জন্য সামান্য ওজনও স্থির করব না। (বরং) তাদের প্রতিফল তাই হবে (যা উপরে বর্ণিত হয়েছে, অর্থাৎ) জাহান্নাম। কারণ, তারা কুফর করছিল এবং (এই কুফরের একটি শাখা এমনও ছিল যে) আমার নিদর্শনাবলী ও রসূলগণকে উপহাসের বিষয়রূপে গ্রহণ করেছিল। (অতঃপর তাদের বিপরীতে ঈমানদারদের অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে যে) নিশ্চয় যারা বিশ্বাস করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, তাদের অভ্যর্থনার জন্য রয়েছে ফিরদাউসের উদ্যান। সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে (তাদেরকে কেউ বের করবে না) এবং সেখান থেকে অন্যত্র যেতে চাইবে না।

### আনুমানিক জাতব্য বিষয়

— اَفَكَسَبَ الَّذِينَ كَفَرُوا اَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُوْنِي اَوْلِيَاءَ

তুফসীর বাহরে মুহীতে বর্ণিত আছে যে, এ ক্ষেত্রে কিছু বাক্য উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ **فَيَجِدُ بِهِمْ نِفْعًا وَيَنْتَفِعُونَ بِذَلِكَ اِلَّا تَضَارُّ** — উদ্দেশ্য এই যে, এসব কাফির আমার পরিবর্তে আমার বান্দাদেরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করছে; তারা কি মনে করে যে, এ কাজ তাদেরকে উপকৃত করবে এবং এ দ্বারা তাদের কিছুটা কল্যাণ হবে? এই জিজ্ঞাসা অস্বীকারবোধক। অর্থাৎ এরূপ মনে করা ভ্রান্তি ও মূর্খতা।

**عِبَادِي** (আমার দাস) বলে এখানে ফেরেশতা এবং সেসব পয়গম্বরগণকে বোঝানো হয়েছে দুনিয়াতে যাদেরকে উপাস্য ও আঞ্জাহর শরীকরূপে স্থির করা হয়েছে; যেমন হযরত ওয়ালের ও ইসা (আ)। কিছু সংখ্যক আরবফেরেশতাদেরও উপাসনা করত, পক্ষান্তরে ইহুদীরা, ওয়ালের (আ)-কে এবং খৃষ্টানরা হযরত ইসা (আ)-কে আঞ্জাহর

শরীকরূপে গ্রহণ করেছে। তাই আয়াতে **الَّذِينَ كَفَرُوا** বলে কাফিরদের এসব দলকেই বোঝানো হয়েছে। কোন কোন তুফসীরবিদ এখানে 'আমার বান্দা' অর্থ নিয়েছেন শয়তান। সুতরাং **الَّذِينَ كَفَرُوا** -এর অর্থ হবে যারা শয়তান ও স্বিনের উপাসনা করে। কেউ কেউ 'আমার বান্দা' অর্থ ও সৃজিত এবং মালিকানাধীন বস্তু গ্রহণ করে একে ব্যাপকাকার করে দিয়েছেন। ফলে আঙন, মূতি, তারকা ইত্যাদি মিথ্যা উপাস্যও

এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। তফসীরের সান্ন-সংক্ষেপে এ অর্থের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে! বাহ্যে মুহীত প্রভৃতি গ্রন্থে প্রথম তফসীরকেই প্রবল সাব্যস্ত করা হয়েছে।

وَلِيٍّ—এটি—أَوْلِيَاءَ এর বহুবচন। আয়বী ভাষায় এ শব্দ অনেক অর্থে

ব্যবহৃত হয়। এখানে এর অর্থ কার্যনির্বাহী, অস্তাব পুরণকারী, যা সত্তা উপাস্যের বিশেষ গুণ। উদ্দেশ্য, তাদেরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করা।

أَلَّا خَسِرِينَ أَعْمَالًا—এখানে প্রথম দুই আয়াতে এমন ব্যক্তি ও দলকে অন্তর্ভুক্ত

করেছে, যারা কোন কোন বিষয়কে সৎ মনে করে তাতে পরিশ্রম করে। কিন্তু আল্লাহর কাছে তাদের সে পরিশ্রম বৃথা এবং সে কর্মও নিষ্ফল। কুরতুবী বলেন, এ অবস্থা দু'টি কারণে সৃষ্টি হয়। এক. ভ্রান্তবিশ্বাস এবং দুই. নোক দেখানো মনোবৃত্তি। অর্থাৎ সব বিশ্বাস ও ঈমান ঠিক নয়, সে যত ভাল কাজই করুক, যত পরিশ্রমই করুক, পরকালে সবই বৃথা ও নিষ্ফল প্রতিপন্ন হবে।

এমনিভাবে যে ব্যক্তি মানুষকে সম্বলিত করার জন্য লোকদেখানো মনোবৃত্তি নিয়ে কাজ করে সে-ও তার সে কাজের সওয়ার থেকে বঞ্চিত হবে। এই ব্যাপক অর্থের দিক দিয়ে কোন কোন সাহাবী খারিজী সম্প্রদায়কে এবং কোন কোন তফসীরবিদ মৃত্যামিলা, রাওয়াক্ষেয ইত্যাদি বিভ্রান্ত সম্প্রদায়কে আলোচ্য আয়াতের লক্ষ্য সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু পরবর্তী আয়াতে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, এখানে সেসব কাফিরকে বোঝানো হয়েছে, যারা আল্লাহর নিদর্শনাবলী এবং কিয়ামত ও পরকাল অস্বীকার করে।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَاءِ

য়ান, মাযহারী প্রভৃতি গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, এখানে প্রকৃত উদ্দেশ্য হল সেসব কাফির সম্প্রদায়, যারা আল্লাহ, কিয়ামত ও হিসাব-কিতাব অস্বীকার করে। কিন্তু বাহ্যত তারাও এর ব্যাপক অর্থের সাথে সম্পর্কহীন হতে পারে না, যাদের অপবিশ্বাস তাদের কর্মকে বরবাদ ও পরিশ্রম নিষ্ফল করে দেয়। হযরত অজী ও সা'দ (রা) প্রমুখ সাহাবী থেকে এ ধরনের উক্তি বর্ণিত আছে।—(কুরতুবী)

فَلَا تُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَنًا—অর্থাৎ তাদের আমল বাহ্যত কিয়ামত

বলে দেখা যাবে, কিন্তু হিসাবের দাঁড়ি-পাল্লায় তার কোন ওজন হবে না। কেননা কুফর ও শিরকের কারণে তাদের আমল নিষ্ফল ও গুরুত্বহীন হয়ে যাবে।

বোখারী ও মুসলিমে আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর রেওয়াজে মতে রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন : কিয়ামতের দিন জনৈক দীর্ঘদেহী স্থূলকায় ব্যক্তি আসবে, আল্লাহর কাছে মাছির

ডানার সমপরিমাণও তার ওজন হবে না। অতঃপর তিনি বলেন, যদি এর সমর্থন চাও, তবে কোরআনের এই আয়াত পাঠ করঃ

فَلَا تُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَنًا

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন : কিয়ামতের দিন এমন এমন কাজকর্ম করা হবে, যেগুলো স্থূলতার দিক দিয়ে মদীনার পাহাড়সমূহের সমান হবে, কিন্তু ন্যায্য-বিচারের দাঁড়ি-পাল্লায় এগুলোর কোন ওজনই থাকবে না।

فردوس—এর অর্থ সবুজে ঘেরা উদ্যান। এটি আরবী

শব্দ, না অনারব এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। যারা অনারব বলেন, তারাও ফারসী রোমী, না সুরহায়নী ইত্যাদি সম্পর্কে নানা মত পোষণ করেন।

বোখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন : তোমরা মখন আঞ্জাহর কাছে প্রার্থনা কর, তখন জামাতুল-ফিরদাউসের প্রার্থনা কর। কেননা, এটি জামাতের সর্বোৎকৃষ্ট স্তর। এর উপরেই আঞ্জাহর আরশ এবং এখান থেকেই জামাতের সব নহর প্রবাহিত হয়েছে।—(কুরতুবী)

لا يبعون عنها حولا—উদ্দেশ্য এই যে, জামাতের এ স্থানটি তাদের জন্য

অক্ষয় ও চিরস্থায়ী নিয়ামত। কেননা, আঞ্জাহ তা'আলা এ আদেশ জারি করে দেবেন, যে জামাতে প্রবেশ করেছে, তাকে সেখান থেকে কখনও বের করা হবে না। কিন্তু এখানে একটি আশংকা ছিল এই যে, এক জায়গায় থাকতে থাকতে অতিষ্ঠ হয়ে যাওয়া মানুষের একটি স্বভাব। সে স্থান পরিবর্তনের ইচ্ছা করে। যদি জামাতের বাইরে কেথাও যাওয়ার অনুমতি না থাকে, তবে জামাতও একটি কয়েদখানার মত মনে হতে থাকবে। আলোচ্য আয়াতে এর জওয়াব দেওয়া হয়েছে যে, জামাতকে অন্যান্য গৃহের আলোকে দেখা মুখতা বৈ নয়। যে ব্যক্তি জামাতে যাবে, জামাতের নিয়ামত ও চিন্তাকর্ষক পরিবেশের সামনে দুনিয়াতে দেখা ও ব্যবহার করা বস্তুসমূহ তার কাছে নগণ্য ও তুচ্ছ মনে হবে। জামাত থেকে বাইরে যাওয়ার কল্পনাও কোন সময় কারও মনে জাগবে না।

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لَكَلِمَتِي رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ  
كَلِمَتِي وَلَوْ جُنَّا بِمِثْلِهِ مَدَادًا ۝ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى  
إِلَيَّ إِلَهًا إِلَهُكُمْ اللَّهُ وَاحِدٌ ۚ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا  
صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ۝



(১০৯) বলুন : আমার পালনকর্তার কথা, লেখার জন্যে যদি সমুদ্রের পানি কালি হয়, তবে আমার পালনকর্তার কথা শেষ হওয়ার আগেই সে সমুদ্র নিঃশেষিত হয়ে যাবে। সাহায্যার্থে অনুরূপ আরেকটি সমুদ্র এনে দিলেও। (১১০) বলুন : আমিও তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের ইলাহই একমাত্র ইলাহ। অতএব, যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তার পালনকর্তার ইবাদতে কাউকে শরীক না করে।

### তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আপনি লোকদেরকে বলে দিন : যদি আমার পালনকর্তার বাণী (অর্থাৎ যেসব বাক্য আল্লাহ্ তা'আলার গুণাবলী ও উৎকর্ষ বোঝায় এবং এসব বাক্য দ্বারা কেউ আল্লাহ্‌র গুণাবলী ও উৎকর্ষ বর্ণনা করে, তবে এসব বাণী) লিপিবদ্ধ করার জন্য সমুদ্র (অর্থাৎ সমুদ্রের পানি) কালি হয় (এবং তন্দ্বারা লেখা শুরু করে) তবে আমার পালনকর্তার বাণী শেষ হওয়ার আগেই সমুদ্র নিঃশেষিত হয়ে যাবে (এবং সব কথা আয়ত্তে আসবে না) ; যদিও সমুদ্রের অনুরূপ আরেকটি সমুদ্র (এর) সাহায্যার্থে আমি এনে দেই (তবুও সে বাণী শেষ হবে না, অথচ দ্বিতীয় সমুদ্রও শেষ হয়ে যাবে। এতে বোঝা গেল যে, আল্লাহ্‌র বাণী অসীম। তাঁর পরিবর্তে কাফিররা হাদেদেরকে আল্লাহ্‌র শরীকরূপে গ্রহণ করেছে, তাদের মধ্যে কেউ এমন নয়। তাই বিশেষ করে তিনিই একমাত্র উপাস্য ও পালনকর্তা। কাজেই হাদেদেরকে) আপনি (একথাও) বলে দিন : আমি তো তোমাদের সবার মতই একজন মানুষ (খোদায়ীর দাবীদার নই এবং ফেরেশতা হওয়ার দাবী করি না। তবে হ্যাঁ) আমার কাছে (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে) ওহী আসে (এবং) তোমাদের সত্য মা'বুদই একমাত্র মা'বুদ। অতএব, যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাৎ কামনা করে (এবং তার প্ৰিয়পাত্র হতে চায়), সে যেন আমাকে রসূল স্বীকার করে, আমার শরীয়ত অনুযায়ী সৎ কর্ম সম্পাদন করতে থাকে এবং তার পালনকর্তার ইবাদতে কাউকে শরীক না করে।

### জানুয়ারিক আতব্য বিষয়

হাদীসে বর্ণিত শানে-নুসুল থেকে সূরা কাহ্‌ফের শেষ আয়াতে উল্লিখিত বাক্য।  
 وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدٌ  
 সন্মুখে জানা যায় যে, এখানে উল্লিখিত শিরক দ্বারা 'গোপন শিরক' অর্থাৎ স্ফিয়া তথা লোক দেখানো মনোবৃত্তি বোঝানো হয়েছে।

ইমাম হাকেম তাঁর মুত্তাদরাকে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, জনৈক মুসলমান আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করত এবং মনে মনে কামনা করত যে, জনসমাজে শৌর্ষবীর্য প্রচলিত হোক। তাঁরই সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতটি

অবতীর্ণ হয়। (এ থেকে জানা গেল যে, জিহাদে এরূপ নিয়ত করলে জিহাদের সওয়াব পাওয়া যায় না।)

'ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে আবিদ্দুনিয়া' 'নিকতাবুল ইখলাসে' তাউস থেকে বর্ণনা করেন যে, একবার জনৈক সাহাবী রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে বললেন : আমি মাঝে মাঝে যখন কোন সৎকর্ম সম্পাদনের অথবা ইবাদতের উদ্যোগ গ্রহণ করি, তখন আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টিই থাকে আমার উদ্দেশ্য; কিন্তু সাথে সাথে একামনাও মনে জাগে যে, লোকেরা আমার কাজটি দেখুক। রসূলুল্লাহ্ (সা) একথা শুনে চূপ হয়ে রইলেন। অবশেষে উল্লিখিত আয়াত অবতীর্ণ হয়।

আবু নঈম 'তারীখে আসাকির' গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর স্নেহস্নায়ুতে লিখেছেন : জুনদুব ইবনে সুহায়ের যখন নামায পড়তেন, সোয়া রাখতেন অথবা দান-খয়রাত করতেন এবং এসব আমলের কারণে লোকদেরকে তার প্রশংসা করতে দেখতেন, তখন মনে মনে খুব আনন্দিত হতেন। ফলে আমল আরও বাড়িয়ে দিতেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নামিল হয়।

এসব স্নেহস্নায়ুতের সারমর্ম এই যে, আয়াতে সিন্নাকারীর গোপন শিরক থেকে বারণ করা হয়েছে। আমল আল্লাহ্-র উদ্দেশ্যে হলেও যদি তার সাথে কোনরূপ সুখ্যাতি ও প্রভাব-প্রতিপত্তির বাসনা থাকে, তবে তাও একপ্রকার গোপন শিরক। এর ফলে মানুষের আমল বরবাদ বরং ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়।

কিন্তু অন্য কতিপয় সহীহ হাদীস থেকে এর বিপরীতও জানা যায়। উদাহরণত তিরমিযী হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন : একবার তিনি রসূলুল্লাহ্-র কাছে আরুয করলেন, আমি মাঝে মাঝে আমার ঘরের ভিতরে জায়নামাযে (নামাযরাত) থাকি। হঠাৎ কোন ব্যক্তি এসে গেলে আমার কাছে ভাল লাগে যে, সে আমাকে নামাযরাত অবস্থায় দেখেছে। এটা কি সিন্না হবে? রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : আবু হুরায়রা, আল্লাহ্ তোমার প্রতি রহম করুন। এমতাবস্থায় তুমি দু'টি সওয়াব পাবে। একটি তোমার সে গোপন আমলের জন্য যা তুমি পূর্ব থেকে করছিলে এবং দ্বিতীয়টি তোমার প্রকাশ্য আমলের জন্য যা লোকটি আসার পর হয়েছে। (এটা সিন্না নয়)।

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত রয়েছে, একবার হযরত আবুযর গিফারী (রা) রসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জিজ্ঞেস করলেন : এমন ব্যক্তি সম্পর্কে বলুন, যে কোন সৎ কর্ম করার পর মানুষের মুখে তার প্রশংসা শোনে। রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন : **لَيْسَ عَاجِلٌ بِعَرَى** **لِلْمُؤْمِنِ** অর্থাৎ এটা তো মু'মিনের নগদ সুসংবাদ (যে তার আমল আল্লাহ্ তা'আলা কবুল করেছেন এবং বান্দাদের মুখে তার প্রশংসা করিয়েছেন)।

তফসীরে মাযহারীতে বলা হয়েছে, প্রথমোক্ত স্নেহস্নায়ুতের তাৎপর্য এই যে, নিজের আমল বা রা আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির সাথে সৃষ্টজীবের সন্তুষ্টি অথবা নিজের

সুখ্যাতি ও প্রভাব-প্রতিপত্তির নিয়তকে শরীক করে নেওয়া এমনকি, লোকমুখে প্রশংসা শুনে আমল আরও বাড়িয়ে দেওয়া। এটা নিঃসন্দেহে স্টিয়া ও গোপন শিরক।

তিস্মিমিয়া ও মুসলিমে বণিত শেষোক্ত স্টিয়ায়ত্তেত্তেত্তে সম্পর্ক হল সে অবস্থার সাথে যে, আমল খাঁটিভাবে আল্লাহর জন্যই হয়ে থাকে, লোকমুখে সুখ্যাতি ও প্রশংসার প্রতি প্রাক্কপ থাকে না। অতঃপর যদি আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ করে লোকের মাঝে তার প্রসিদ্ধি সম্পন্ন করে দেন এবং মানুষের মুখ দিয়ে প্রশংসা করিয়ে দেন, তবে স্টিয়ার সাথে এ আমলের কোন সম্পর্ক নেই। এটা মু'মিনের জন্য (আমল কবুল হওয়ার) অগ্রিম সুসংবাদ। এভাবে বাহ্যত পরস্পর বিরোধী উভয় প্রকার স্টিয়ায়ত্তেত্তে মধ্যে সম্বন্ধ সাধিত হয়ে যায়।

স্টিয়ার অন্তর্ভুক্ত পরিণতি এবং উজ্জ্বল হাদীসের কঠোর সতর্কবাণী : হযরত মাহমুদ ইবনে লবীদ (রা) বলেন, রসুলুল্লাহ (সা) বলেছেন : আমি তোমাদের সম্পর্কে যে বিষয়ে সর্বাধিক আশংকা করি, তা হচ্ছে ছোট শিরক। সাহাবায়ে কিরামা নিবেদন করলেন : ইয়া রাসুলুল্লাহ, ছোট শিরক কি? তিনি বললেন : স্টিয়া। —(আহমদ)

বায়হাকী শোয়াবুল-ইমান গ্রন্থে হাদীসটি উদ্ধৃত করে তাতে অতিরিক্ত আরও বর্ণনা করেছেন যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা যখন বান্দাদের কাজকর্মের প্রতিদান দেবেন, তখন স্টিয়াকার লোকদেরকে বলবেন : 'তোমরা তোমাদের কাজের প্রতিদান নেয়ার জন্য তাদের কাছে যাও, যাদেরকে দেখানোর উদ্দেশ্যে তোমরা কাজ করছিলেন। এরপর দেখ, তাদের কাছে তোমাদের জন্য কোন প্রতিদান আছে কি না।'

হযরত আবু হুরায়রার স্টিয়ায়ত্তেত্তে রসুলুল্লাহ (সা) বলেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন : আমি শরীকদের সাথে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার উর্ধে। যে ব্যক্তি কোন সৎ কর্ম করে এবং তাতে আমার সাথে অন্যকেও শরীক করে, আমি সেই আমল শরীকদের জন্য ছেড়ে দেই। অন্য এক স্টিয়ায়ত্তেত্তে রয়েছে, আমি সেই আমল থেকে মুক্ত ; সে আমলকে খাঁটিভাবে আমি তার জন্যই করে দেই, যাকে সে আমার সাথে শরীক করেছিল।—(মুসলিম)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রসুলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তি সুখ্যাতি লাভের জন্য সৎ কর্ম করে আল্লাহ তা'আলাও তার সাথে এমনি ব্যবহার করেন ; যার ফলে সে হুণিত ও লাজ্জিত হয়ে যায়।—(আহমদ, বায়হাকী, বাযহারী)

তকসীর কুরতুবীতে আছে, হযরত হাসান বসরী (র)-কে ইখলাস ও স্টিয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন : ইখলাসের দ্বারা হচ্ছে সৎ ও ভাল কর্মের গোপনীয়তা পসন্দ করা এবং মন্দ কর্মের গোপনীয়তা পসন্দ না করা। এরপর যদি আল্লাহ তা'আলা তোমার আমল মানুষের কাছে প্রকাশ করে দেন, তবে তুমি একথা বল : হে আল্লাহ, এটা আপনার অনুগ্রহ ও কৃপা ; আমার কর্ম ও প্রচেষ্টার ফল নয়।

হাকীম, তিস্মিমিয়া হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রসুলুল্লাহ (সা) শিরকের আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন : **هو فيكم اخفى من دبيب**

للذم! অর্থাৎ পিঁপড়ার নিঃশব্দ গতির মতই শিরক তোমাদের মধ্যে গোপনে অনুপ্রবেশ করবে। তিনি আরও বলেন : আমি তোমাদেরকে একটি উপায় বলে দিচ্ছি যা করলে তোমরা বড় শিরক ও ছোট শিরক (অর্থাৎ রিয়া) থেকে নিরাপদ থাকতে পারবে। তোমরা

দৈনিক তিনবার এই দোয়া পাঠ করো : **اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَشْرِكَ بِكَ** ;

**وَأَنَا أَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُ لِمَا لَا أَعْلَمُ**

সূরা কাহফের কতিপয় ক্বশীলত ও বৈশিষ্ট্য : হযরত আবুদ্বারদা বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সা) বলেন : যে ব্যক্তি সূরা কাহফের প্রথম দশ আয়াত মুখস্থ রাখবে, সে দাজ্জালের ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকবে।—( মুসলিম, আহমদ, আবু দাউদ, নাসায়ী )

ইমাম আহমদ, মুসলিম ও নাসায়ী আবুদ্বারদার এই রেওয়াজেতে একথাও বর্ণনা করেছেন যে, যে ব্যক্তি সূরা কাহফের শেষ দশ আয়াত মুখস্থ রাখবে, সে দাজ্জালের ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকবে।

হযরত আনাসের রেওয়াজেতে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন : যে ব্যক্তি সূরা কাহফের প্রথম ও শেষ আয়াতগুলো পাঠ করবে, তার জন্য আপাদমস্তক এক নূর হবে এবং যে ব্যক্তি পূর্ণ সূরা পাঠ করবে তার জন্য মাটি থেকে আকাশ পর্যন্ত নূর হবে।—( ইবনুস-সুন্নী, আহমদ )

হযরত আবু সায়ীদের রেওয়াজেতে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন : যে ব্যক্তি জুমআর দিন পূর্ণ সূরা কাহফ পাঠ করে, পন্থবতী জুমআ পর্যন্ত তার জন্য নূর হয়ে যায়।—( হাকিম, মায়হারী )

জনৈক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের কাছে বলল : আমি মনে মনে ঘুম থেকে জেগে নামায পড়তে ইচ্ছা করি ; কিন্তু ঘুম প্রবল হয়ে যায়। তিনি বললেন : তুমি যখন ঘুমাতে যাও তখন সূরা কাহফের শেষ আয়াতগুলো **قُلْ لَوْ كَان**

**الْبَحْرُ مَدًّا** থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত পাঠ কর। এর ফলে তুমি যখন জাগার উদ্দেশ্য করবে, আল্লাহ তা'আলা তখনই তোমাকে জাগিয়ে দেবেন।—( ছালবী )

মসনদে-দারেমীতে আছে, যির ইবনে হবায়শ হযরত আবদাহকে বললেন : যে ব্যক্তি সূরা কাহফের এই শেষ আয়াতগুলো পাঠ করে ঘুমাতে, সে যে সময় জাগার নিয়ত করবে, সে সময়ই জেগে যাবে। আবদাহ বলেন : আমি বারবার আমলটি পরীক্ষা করে দেখেছি, ঠিক তাই হয়।

একটি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ : ইবনে আব্বাসী বলেন : আমাদের শায়খ তুরতুসী বলতেন : তোমার মূল্যবান জীবনের সময়গুলো যেন সমসাময়িকদের সাথে প্রতিযোগিতা

ও বন্ধু-বান্ধবের মেলামেশার মধ্যেই অতিবাহিত হয়ে না যায়। দেখ, আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াত দ্বারা তাঁর বর্ণনা সমাপ্ত করেছেন :

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

অর্থাৎ যে ব্যক্তি তাঁর পালনকর্তার সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎ কর্ম সম্পাদন করে এবং তাঁর পালনকর্তার ইবাদতে যেন কাউকে শরীক না করে।

—(কুরতুবী)

[WWW.ALQURANS.COM](http://WWW.ALQURANS.COM)

### শেষ নিবেদন

আজ ১৩৯০ হিজরী সনের যিলকদ মাসের ৮ তারিখ রোজ রহম্পতিবার দুপুর বেলা সূরা কাহ্‌ফের এই তফসীর সম্পূর্ণ সমাপ্ত হয়। আল্লাহ্ তা'আলার অশেষ ফযল ও রহমতে, এমন এক সময়-সজ্জিকণে কোরআন করীমের প্রথমার্ধের কিছু বেশী অংশের তরজমা সম্পূর্ণ হল, যখন আমার বয়সসীমা ৭৬তম বর্ষপরিক্রমায় যাত্রা শুরু করেছে। যে সময়ে আমি শারীরিক দুর্বলতার সাথে সাথে দীর্ঘ দু'বছর ধরে বিভিন্ন ধরনের রোগেও আক্রান্ত এবং মানসিক চিন্তার ভীড়ও অপরিসীম। এতদসত্ত্বেও আমি হতাশ নই, বরং অত্যন্ত আশাবাদী যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর অপার ফযল ও রূপায় কোরআনে করীমের অবশিষ্ট তফসীরও সম্পূর্ণ করার তওফীক দান করবেন।

ଆମର ମନୋବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଆମି-ମାନିଷ୍ଟିତ  
ସୂଚକ, ତାହା ଆମର ଆତ୍ମାରେ ଆତ୍ମାରେ ଆତ୍ମାରେ  
କେବଳ ମନ କରେ କେବଳ କେବଳ କେବଳ ।